শ্রীমদ্ভাগবত-মহাপুরাণ অনুধ্যান

(দ্বিতীয় ভাগ)

Talkes delivered by Swami Samarpanananda on *Bhagavat Mahapuran* before the students of Indian Spiritual Heritage Diploma Course at Ramakrishna Vivekananda University, Belur Math
(Transcribed and Edited by Amit Ray Chaudhuri)

দশম স্কন্ধ

সব দিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে দশম স্কন্ধই ভাগবতের সব থেকে মাহাত্ম্যপূর্ণ স্কন্ধ। দশম স্কন্ধ মূলতঃ শ্রীকৃষ্ণের অবতার তত্ত্ব আর অবতারের লীলাকে আধার করেই হিন্দু ধর্মের ভক্তিশাস্ত্রে বিশেষ স্থান করে নিয়েছে। এই দশম স্কন্ধে প্রচুর কাহিনী আছে, কাহিনী আমাদের কাছে অতটা গুরুত্ব নয়, সাহিত্যের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কাজও প্রচুর আছে, সেটাও আমাদের কাছে তত গুরুত্ব নয়, আমরা সেই জায়গা গুলিতেই আলোকপাত করছি যেখানে যেখানে ঋষি মুনিদের আধ্যাত্মিকতার উচ্চ উচ্চ চিন্তাগুলি লুকিয়ে আছে। তাঁরা আধ্যাত্মিকতাকে কীভাবে দেখতেন সেটাই আমরা তুলে ধরার চেষ্টা করছি। সমগ্র ভাগবতে কি আছে, ভাগবতের মূল বক্তব্যকে কেউ যদি জানতে চায় তাহলে ভাগবতের শুধু দশম স্কন্ধটা পড়লেই হবে। ঠিক ঠিক ভক্তি কি জিনিষ, ভক্তি কাকে বলে, কত ভাবে ভক্তি করা যায়, দশম স্কন্ধ ছাড়া ভক্তির এত কিছু একসাথে আর কোথাও পাওয়া যাবে না। শ্রীরামকৃষ্ণ যত রকম ভক্তির কথা বলেছেন, ভক্তি সম্পর্কিত ঠাকুরের যত সহজ সরল কথা কথামৃতে উল্লেখ করা হয়েছে তার সবটাই এই ভাগবতের দশম স্কন্ধ থেকেই আধার করে বলা হয়েছে।

ভাগবতের দশম স্কন্ধ অধ্যয়ন করার সময় খুব শ্রদ্ধা ভক্তি সহকারে অধ্যয়ন করতে হবে, অন্যান্য বই যেমন বাড়ির অন্য কাজও করছি আর মাঝে মাঝে বইও পড়ছি, কিন্তু ভাগবতের দশম স্কন্ধের ক্ষেত্রে তা করলে হবে না, দশম স্কন্ধ অধ্যয়ন করা মানে ওতেই একেবারে ডুবে যেতে হবে। যতক্ষণ এর মধ্যে একেবারে ডুবে যেতে না পারছে ততক্ষণ দশম স্কন্ধ তার জন্য নয়। সম্পূর্ণ নিজেকে একান্ত করে নিয়ে শ্রীকৃষ্ণের লীলার মধ্যে ভক্তিরসে নিজেকে হারিয়ে না ফেললে দশম স্কন্ধের অন্তর্নিহিত ভাবকে কেউ ধারণা করতে পারবে না।

এর আগে বংশ আর বংশানুচরিত বিশেষ করে সূর্যবংশ আর চন্দ্রবংশ নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা শোনার পর পরীক্ষিৎ শুকদেবকে বলছেন ***যদোশ্চ ধর্মশীলস্য নিতরাং মুনিসত্তম। তত্রাংশেনাবতীর্ণস্য বিষ্ণোর্বীর্যাণি শংস নঃ।। অবতীর্য যদোর্বংশে ভগবান্ ভূতভাবনঃ। কৃতবান্ যানি বিশ্বাত্মা তানি নো বদ বিস্তরাৎ।।১০/১/২-৩।*** ‘হে ভগবন্! আপনি সূর্যবংশ আর চন্দ্রবংশের কথা বললেন, তার সাথে যযাতির থেকে সৃষ্ট যদু বংশের ইতিহাসও আপনার কাছ থেকে বিস্তারিত ভাবে শুনলাম। পরিবর্তি কালে এই যদুবংশে স্বয়ং ভগবান নিজ অংশ রূপে বলরামকে সঙ্গে নিয়ে শ্রীকৃষ্ণ রূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, আপনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরম পবিত্র চরিত্রকথা আমাদের শোনান। হে শুকদেব! আপনি যে এত কথা বললেন সব শোনার পর এখন শ্রীকৃষ্ণের চরিতকথা শুনতে আমার খুব আগ্রহ হচ্ছে। সমস্ত প্রাণীর অন্তরাত্মা ভগবান যদুবংশে অবতীর্ণ হয়ে যে সব মাধুর্যপূর্ণ এবং মনোমুগ্ধকারী দিব্য দিব্যাতীত লীলা করেছিলেন, আপনি সবিস্তারে তার বর্ণনা করুন’।

ভাগবতে ঈশ্বর সম্বন্ধে বিভিন্ন ধারণার স্থান

কয়েকটি জিনিষ বুঝে নিলে আমাদের ভাগবত বা যে কোন ধর্মগ্রন্থ বুঝতে বা ধারণা করতে সুবিধা হবে। সাধারণ মানুষ সব সময় ভগবান বলতে মনের মধ্যে ধারণা করে রেখেছে আকাশে কোথাও স্বর্গ আছে আর ভগবান সেখানে কোথাও বসে আছেন। সেখানে বসে তাঁর নানা রকম ইচ্ছা হচ্ছে আর আমরা সেই ইচ্ছানুযায়ী সব কিছু করে যাচ্ছি। ঠাকুর এদের বলছেন অধম ভক্ত। এর থেকে একটু উপরে যারা তারা মনে করে ভগবান অন্তর্যামী রূপে আমাদের সবার ভেতরেই আছেন। এরা হল মধ্যম ভক্ত। যিনি ঠিক ঠিক ভক্ত তিনি দেখেন ঈশ্বরই সব কিছু হয়েছেন, তিনি ছাড়া আর কিছু নেই। এঁরাই হলেন উত্তম ভক্ত। ভাগবতাদি গ্রন্থ এই তিন ধরণের ভক্তের ঈশ্বর সম্বন্ধে তিন ধরণের ধারণাকে নিয়েই আলোচনা করছে। কিন্তু তার মূল লক্ষ্য হল সবাইকে উত্তম ভক্তের দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া। ভাগবত কখন সখন মধ্যম ভক্তের অন্তর্যামী রূপী ভগবানকে নিয়েও আলোচনা করে। আমরা যখন অধম ভক্তের কথা বলি, তখন যে অর্থে অধম ভক্ত বলি সেই

অর্থে ভক্তিশাস্ত্রে অধম বলা হয় না। কারণ, ভগবান ওই ভাবেও আছেন, তিনি যদি অন্তর্যামী হয়ে থাকতে পারেন, তাহলে তিনি ঈশ্বর রূপেও আছেন, ঈশ্বর মানে যিনি ঈশন্ করেন অর্থাৎ যিনি সবাইকে শাসন করছেন। আবার তিনি ছাড়া অন্য কিছু নেই। এই ব্যাপারে এনাদের খুব প্রিয় যুক্তি হল – ভগবান আছেন আমরা সবাই মেনেই চলছি। কিন্তু কোন কোন ধর্মাবলম্বীরা বলেন তিনি আমাদের বিভিন্ন উপাদান দিয়ে তৈরী করেছেন। তাহলে ভগবান আর তাঁর উপাদান আলাদা হতে হবে, উপাদান তাহলে ভগবানের বাইরে। এই তত্ত্বকে মেনে নিলে এমন কিছু জিনিষ এসে যাবে যা ভগবানের বাইরে। ভগবানের বাইরে যদি কিছু থাকে সেটা হয়ে যাবে অনীশ্বর, অনীশ্বর মানে যার কোন অস্তিত্ব নেই। সেইজন্য ভগবানের বাইরে কিছু থাকাটা যুক্তিতে দাঁড়ায় না। এখানে তাই যুক্তির শেষ কথা গিয়ে দাঁড়ায়, ঈশ্বরই সব কিছু হয়েছেন। কিন্তু যাঁরা গোঁড়া ভক্ত অথচ পণ্ডিত, যেমন মাধ্বাচার্য বিরাট পণ্ডিত কিন্তু গোঁড়া ভক্ত, তাঁরা বলেন ঈশ্বর আলাদা জীব আলাদা। মাধ্বাচার্য এমন ঘোর দ্বৈতবাদী ছিলেন যে, যদি কেউ তাঁর যুক্তিকে না মানেন তাহলে তাঁকে কুস্তি করে মাটিতে ফেলে মানিয়ে ছাড়বেন। মাধ্বাচার্যের দ্বৈতবাদে আবার ইসলাম ও খ্রীশ্চান ধর্মে অনেক মিল পাওয়া যাবে। কিন্তু তিনি একেবারে যুক্তি দিয়ে দেখিয়ে গেছেন পুরো বেদ, উপনিষদ, গীতা, ভাগবতের একটাই বক্তব্য – ঈশ্বর আলাদা, জীব আলাদা, জগৎ আলাদ। মাধ্বাচার্যের এমন এমন যুক্তি আছে যা অদ্বৈত বেদান্ত আজ পর্যন্ত তার উত্তর দিতে পারেনি। কিন্তু আমরা এত যুক্তির মধ্যে যাবো না, ঠাকুর বলছেন – যে দেখছে ঈশ্বর বাইরে সে অধম ভক্ত। অধম বলতে খারাপ অর্থে নেওয়া যাবে না। সেও ভক্ত কিন্তু তার দৃষ্টিটা এতটুকু ছোট্ট গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ। ঠাকুর যেমন আবার বলছেন ভক্তির সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিকও আছে। ভক্তি ভক্তিই তার আবার সত্ত্ব, রজ ও তম কি করে হতে পারে! কিন্তু টাইপটা আলাদা। যদি কারুর ভক্তি তামসিক ভক্তি হয়ে থাকে তাতে কোন দোষ নেই, ভক্তিই তো আছে, সেও ঈশ্বরের কাছেই পৌঁছাবে। এগুলো মানুষের মানসিক গঠনের উপর নির্ভর করে, তাই এই নিয়ে বেশী নাড়ানাড়ি না করা, বেশী বিচার না করাই ভালো।

ঠাকুর বলছেন শুধু নিজের সন্তানকে ভালোবাসার নাম মায়া, সবার সন্তানকে ভালোবাসার নাম দয়া। এখানে মায়া মানে বেদান্তের মায়া নয়, এই মায়ার অর্থ হল খুব ছোট্ট গণ্ডীর মধ্যে নিজের ভালোবাসাকে সীমিত রাখা। কিন্তু আমাদের কাউকে না কাউকে তো ভালোবাসতে হবে। আমি যদি কাউকে ভালোই না বাসতে পারি তাহলে জগৎকে আমি কি করে ভালোবাসব! আগে জগতের একজনকে অন্তত ভালোবাসতে শিখতে হবে। তাই এই মায়া না আসা পর্যন্ত ভেতরে দয়ার ভাব আসবে না। এই ভালোবাসাই যখন গভীর থেকে গভীরতার দিকে যেতে থাকে, সেখান থেকে মানুষ আস্তে আস্তে এগোতে শুরু করে। যখন মায়ের প্রথম সন্তান হয় তখন মায়ের মন শুধু ওই সন্তানের উপরেই পড়ে থাকে, সন্তানের বাইরে মা আর কিছু দেখতে পায় না। সন্তানের প্রতি মায়ের ভালোবাসা যে কত গভীর হতে পারে ভালোবাসার এই গভীরতা মা ছাড়া আর কেউ অনুভব করতে পারবে না। কিন্তু এই মায়েরই চার পাঁচটা সন্তান হয়ে গেলে, তারপর ঠাকুরমা হওয়ার পর তার ব্যক্তিত্ব যখন সম্প্রসারিত হতে শুরু করে তখন দেখা যায় তার ভালোবাসাটা পুরো পাড়া প্রতিবেশীদের প্রতি ছড়িয়ে গেছে। ভালোবাসা শুরু হয় এক থেকে। ঠাকুর যে মায়া আর দয়ার কথা বলছেন, তিনি এটা একটা দর্শনের তত্ত্বের দিক থেকে বলছেন। ভালোবাসা যদি নিজের পরিবারের মধ্যেই সীমিত থাকে তখন সেখানে আনন্দ হবে ঠিকই কিন্তু সে নিজেকে একটা গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখে, যার ফলে দুঃখটাও ঘন ঘন এবং বেশী পরিমাণে আসে। এর থেকে বেরোবার একটাই পথ নিজের ব্যক্তিত্বকে আরও সবার মধ্যে বিস্তার করা।

উপরে ঈশ্বর রয়েছেন, সেখান থেকে তিনি আমাদের ভালো-মন্দ, সুখ-দুঃখ দিচ্ছেন, এই ধারণা নিয়ে যারা চলে তাদের স্বভাবে ছেলেমানুষী ভাবটাই বেশী থাকে। ছেলেমানুষীর স্বভাব হল, নিজে কোন দোষ করলে সব সময় অপরের ঘাড়ে দোষটা চাপিয়ে দেওয়া। শৈশবে এরা নিজেদের দোষ মা-বাবার উপর চাপায়। কয়েকটি ভাই-বোন হয়ে যাওয়ার পর তাদের উপর দোষটা চাপিয়ে দেয়। বিয়ের পর এরাই স্ত্রী হলে স্বামীর উপর আর স্বামী হলে স্ত্রীর উপর সব দোষ চাপিয়ে দেবে। এটাই ছেলেমানুষী। পরের ধাপে যখন একটু বুদ্ধির বিকাশ হয় তখন সব দোষ গোবিন্দের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে বলে 'হায় ভগবান! তুমি আমাকে এই দুঃখ দিলে'! ভগবানের কাছে তুমি কি এতই গুরুত্বপূর্ণ যে বেছে বেছে তিনি তোমাকেই দুঃখ দিলেন! ভগবানের কি আর

কোন কাজকর্ম নেই! বেছে বেছে তোমাকেই দুঃখ দিতে যাবেন! এগুলোই বোকাদের ধর্ম। এই ধরণের লোকেদের কষ্টের শেষ নেই, এরাই হেঁদিয়ে হেঁদিয়ে কেঁদে কেঁদে মরে। ভাগবত এদের ছেলেমানুষী চিন্তাটাও গ্রহণ করবে, অন্তর্যামী রূপী ভগবানকেও নেবে আর ঈশ্বরই সব কিছু হয়েছেন এই ভাবকেও সামনে নিয়ে আসবে। কিন্তু ভাগবতের, শুধু ভাগবত নয়, হিন্দুদের যে কোন ভক্তিশাস্ত্রের সব সময় মূল উদ্দেশ্য মানুষকে উচ্চ চিন্তা থেকে উচ্চতর চিন্তার দিকে নিয়ে যাওয়া। শাস্ত্র কখনই বলবে না যে তুমি যে চিন্তা করছ এটা ভুল, তুমি উচ্চ চিন্তা করতে পারছো না ঠিক আছে, এখন এই ছেলেমানুষী ভাব নিয়েই ভক্তি করে যাও। সেখান থেকে ধীরে ধীরে তার বুদ্ধি যেমন যেমন বিকশিত হতে থাকে তেমন তেমন একটু একটু করে উচ্চতর চিন্তা দিয়ে তাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

ভাগবতের প্রারম্ভিক পর্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছিল যে, মহাভারত রচনার করার পরেও ব্যাসদেব মানসিক তৃপ্তি ও শান্তি পাচ্ছিলেন না। তাঁর মনের মধ্যে সব সময় একটা অবসাদ ও অতৃপ্তির ভাব যেন নাড়া দিত। ব্যাসদেবের মানসিক অতৃপ্তি ও অশান্তির অবস্থা নারদ জানতে পেরে ব্যাসদেবকে বলেছিলেন 'দ্যাখো বাবা! তুমি এক মহান কালজয়ী বিশাল সাহিত্য রচনা করেছ ঠিকই, কিন্তু তাতে তুমি ভগবানের কথা সেই অর্থে বিশেষ ভাবে বর্ণনা করোনি। মহাভারতে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, যুদ্ধ, নীতিকথা খুবই আছে কিন্তু ঈশ্বরের কথা সেভাবে কিছুই নেই। সেইজন্য তোমাকে বলছি, তুমি ভগবানের কথা কিছু লেখ'। যদিও এর আগের স্কন্ধগুলিতে কিছু কিছু ভগবানের স্বরূপের কথা এবং বিভিন্ন অবতারে লীলাকথার বর্ণনা করা হয়েছে, কিন্তু দশম স্কন্ধে পুরোপুরি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলাকথারই বর্ণনা করা হয়েছে।

পরীক্ষিৎ শুকদেবকে বলছেন 'আমার এই শরীর, যে শরীরে আমি আপনার সামনে দাঁড়িয়ে আছি, এই শরীরকে যিনি অশ্বত্থামা দ্বারা নিক্ষিপ্ত ব্রহ্মাস্ত্র থেকে রক্ষা করেছিলেন এবং কৌরব আর পাণ্ডব বংশের যিনি সহায় ছিলেন, তাঁর কথা আপনি আমাকে বলুন'। পরীক্ষিৎএর মূল বক্তব্য হল শ্রীকৃষ্ণ শুধুমাত্র ভগবান, যিনি সাক্ষাৎ নারায়ণ, জগতের মঙ্গলার্থে যিনি অবতার রূপে নেমে এসেছেন, সেই তিনি আমার উপর বিশেষ কৃপা করেছেন। ব্যাপারটা দু রকমের হয়, শ্রীরামকৃষ্ণ অবতার রূপে এসেছেন, সাক্ষাৎ নারায়ণ, তার একটা মাহাত্ম্য আছে, আবার সেই সাক্ষাৎ নারায়ণ কারুর উপর বিশেষ কৃপা করেছেন, তার ক্ষেত্রে সেটা হয়ে গেল দ্বিগুণ, একেই তিনি ভগবান আবার তিনি তাঁকে বিশেষ কৃপা করেছেন। তাই পরীক্ষিৎ বলছেন যে আমি তাঁর ব্যাপারে বিশেষ রূপে আগ্রহি, আপনি তাঁর সম্বন্ধে বিস্তারতি ভাবে বলুন।

ঈশ্বর ভেতরে থেকে অমৃতত্ব ও বাইরে থেকে মৃত্যু দেন

এখানে ভাগবতে খুব সুন্দর একটি শ্লোক আসছে, এই শ্লোকের মাধ্যমে বোঝা যায় হিন্দুধর্মে ঈশ্বরের বৈশিষ্ট্য এবং ঈশ্বর ও জীবের সম্পর্ক নিয়ে চিন্তা-ভাবনা কীভাবে এগিয়েছে। শুকদেবের কাছে পরীক্ষিৎ জানতে চাইছেন ***বীর্যাণি তস্যাখিলদেহভাজামন্তর্বহিঃ পুরুষকালরূপৈঃ। প্রযচ্ছতো মৃত্যুমুতামৃতং চ মায়ামনুষ্যস্য বদস্ব বিদ্বন্।।১০/১/৭।*** 'বিদ্বজ্জনরা বলেন এই যে শ্রীকৃষ্ণ, তিনিই স্বয়ং নারায়ণ, আর দেহধারী সমস্ত প্রাণীর ভেতরে অন্তর্যামী রূপে অবস্থিত হয়ে সবাইকে তিনি তাঁর অমৃতত্ব ও বীর্য দান করে যাচ্ছেন আবার বাইরে থেকে তিনিই মৃত্যু দিচ্ছেন। হে মুনিবর! সেই মায়া-মনুষ্যধারী ভগবানের ঐশ্বর্য ও মাধুর্য রসে পরিপূর্ণ লীলাকথা আমাদের বলুন'। এই শরীর কেন চলছে? ভগবান আমাদের শরীরের ভেতরে অন্তর্যামী রূপে আছেন বলেই এই শরীরটা চলছে। তিনি যদি ভেতরে না থাকেন তাহলে এই শরীরটাই একটা জড় পদার্থ রূপে পড়ে থাকবে। এই মানবদেহ যতক্ষণ সজীব আছে ততক্ষণ মানব চেষ্টা করলে মুক্তি লাভ পর্যন্ত করতে পারে। তার মানে, যিনি নারায়ণ, যিনি ভেতর থেকে অমৃতত্ব দিচ্ছেন, তিনি চাইলে আমাদের মুক্তিও দিয়ে দিতে পারেন। একদিকে তিনি ভেতরে বসে অমৃতত্ব দিচ্ছেন আবার তিনি বাইরে থেকে সর্বব্যাপী কাল রূপে সবাইকে গ্রাস করে নিচ্ছেন। কালের অর্থ হয় সময়। কিন্তু এখানে কাল মানে মৃত্যু, কাল রূপে তিনি সব গ্রাস করে নেন। এটাই ভগবানের লীলা – একদিকে তিনি অন্তর্যামী রূপে আমাদের অমৃতত্ব দান করছেন তিনিই আবার কাল হয়ে আমাদের গ্রাস করছেন।

পরীক্ষিৎ তখন উত্তরার গর্ভে, সেই সময় অশ্বত্থামা পরীক্ষিতের উদ্দেশ্যে চালিয়ে দিয়েছিল ব্রহ্মাস্ত্র। যুধিষ্ঠির তখন শ্রীকৃষ্ণের একান্ত শরণাপন্ন হয়ে নিতান্ত কাতর স্বরে বলছেন 'আমাদের বংশ লোপ পেতে চলেছে, হে প্রভু! আপনি রক্ষা করুন'। যুধিষ্ঠিরের কাতর অনুরোধে শ্রীকৃষ্ণ তখন উত্তরার গর্ভে প্রবেশ করে নিজের আবরণ দিয়ে ব্রহ্মাস্ত্র থেকে পরীক্ষিৎকে রক্ষা করলেন। ব্রহ্মাস্ত্রের তাপ পরীক্ষিৎ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারছিল না, কিন্তু ব্রহ্মাস্ত্রের আলোটা দেখতে পাচ্ছিল আর বুঝতে পারছিল আমাকে একজন রক্ষা করছেন। জন্ম নেওয়ার পর সেই সদ্যোজাত শিশু সবার মুখের দিকে তাকিয়ে ঈক্ষণ করে বুঝতে চেষ্টা করছিল, কে সেই তিনি যিনি মায়ের গর্ভে আমাকে রক্ষা করেছিলেন। জন্মের পর পরীক্ষা বা ঈক্ষণ করছিলেন বলে তাঁর নাম হয়েছিল পরীক্ষিৎ। সেই পরীক্ষিৎ এখন শুকদেবের কাছে জানতে চাইছেন সেই ভগবানের কি বৈশিষ্ট্য, যিনি ভেতরে থেকে সমস্ত প্রাণীকে অমৃতত্ব আর বীর্য প্রদান করছেন আর বাইরে থেকে তিনি মৃত্যু দিচ্ছেন।

হিন্দুদের একটা খুব দৃঢ় ধারণা হল, যখন জীবাত্মা শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে তখন জীবাত্মা এই শরীরটাকে একটা যন্ত্র রূপে নিয়ে বাইরে থেকে জল, বাতাস, খাদ্য গ্রহণ করে এই শরীরের রক্ষণা-বেক্ষণের কাজ চালাতে থাকে। এই প্রক্রিয়াকে আমরা বলতে পারি self maintaining and self correcting system। যেমন গাড়িতে পেট্রল ডিজেল দিলে গাড়ি চলতে থাকবে। কিন্তু ফিজিক্সের এ্যনট্রপি নিয়মের জন্য বাইরে থেকে যে বাতাস, জলীয় পদার্থ, তাপ গাড়ীর উপর অনবরত পড়ছে, তার ফলে গাড়ির শক্তি ক্রমশ ক্ষয় হয়ে দুর্বল হয়ে পড়তে থাকে। সেইজন্য গাড়ির রক্ষণা-বেক্ষণের জন্য মাঝে মাঝে গ্যারেজে পাঠিয়ে দিয়ে তার হারানো শক্তিটা ফিরিয়ে আনা হয়। কিন্তু প্রাণীদের ক্ষেত্রে, আমাদের প্রত্যেকের শরীরের নিজস্ব একটা internal correcting system রয়েছে। শরীরের যা কিছু মেরামতি সবই ভেতর থেকে হয়। সেইজন্য আমাদের শরীরের শক্তিটা সব সময় ভেতর থেকেই আসে, বাইরে থেকে কিছু জুড়ে দেওয়া হয় না। বাইরে থেকে যে শক্তিটা শরীরের উপর কাজ করে তাকে আমরা বলতে পারি Destructive Energy, আর ভেতর থেকে যে শক্তি কাজ করে তার নাম দেওয়া যেতে পারে Info Energy। মানুষের শরীরের মধ্যে যে জিনগুলো রয়েছে এগুলো প্রত্যেকটিই খুব ছোট্ট ছোট্ট যন্ত্র, যার কাজ হল information processing করা, information processing করা মানে আমরা যে খাওয়া-দাওয়া করছি তার ফলে একটা সেল থেকে আরেকটা সেল জন্ম নিচ্ছে, যে সেল খারাপ হয়ে যাচ্ছে বা মরে যাচ্ছে তাকে system থেকে সরিয়ে দিচ্ছে। আমাদের শরীরটা একটি বিরাট বড় যন্ত্রের মত কিন্তু তার কাজের পদ্ধতি অত্যন্ত সূক্ষ্ম, যেখানে সব সময় information processing হচ্ছে। এই information processingএর জন্য কিছু energy দরকার, সেই energy আমরা খাদ্য, বাতাস, জল থেকে পেয়ে যাই। এখানেও আমাদের শরীরের যে জীবন রক্ষা হচ্ছে, এই রক্ষাটা আমাদের শরীরের ভেতর থেকেই হচ্ছে। এখন কোন্ সেল থেকে রক্ষা হচ্ছে সেটা আমাদের কাছে গুরুত্ব নয়। আমরা জানি আত্মা আছেন, আত্মা এই শরীরকে ধারণ করে আছেন, এই শরীরকে রক্ষা করার জন্য জল, বাতাস, খাদ্য দরকার। এই রক্ষাটা কি পদ্ধতিতে হচ্ছে সেটা বার করা ধর্মের কাজ নয়, এই কাজ বিজ্ঞান করবে। সেইজন্য এই সব ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের সাথে আমাদের ধর্মের কোন বিরোধ নেই। আমরা জানি শরীরের রক্ষণা-বেক্ষণের জন্য তাকে বীর্য, শক্তি তিনিই ভেতর থেকে দিচ্ছেন আবার বাইরে থেকে তিনিই মৃত্যু দেন।

কাশীপুর উদ্যানবাটীতে গলায় ক্যানসার রোগে আক্রান্ত হয়ে ঠাকুর শয্যাশায়ী। সেই অবস্থায় একদিন স্বামীজীর গর্ভধারিণী ভুবনেশ্বরী দেবী কাশীপুরে এসেছেন ঠাকুরের সঙ্গে ঝগড়া করতে। বলছেন 'সামনে আইন পরীক্ষা, নরেন একেবারেই পড়াশুনা করছে না, সারাদিন ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়ায়'। শুনে ঠাকুর সঙ্গে সঙ্গে বলছেন 'নরেন তুই শিগ্গিরি বাড়ি যা, বাড়ি গিয়ে লেখাপড়ায় মন দে'। নরেনকে নিয়ে তাঁর মা গাড়ি করে যাচ্ছেন আর নরেনকে বলছেন 'দেখলিতো, ঠাকুরও বলছেন তোকে বাড়িতে গিয়ে পড়াশোনাটা করতে'। নরেন বলছেন 'হ্যাঁ, তিনি চোরকে বলেন চুরি কর আর গৃহস্থকে বলেন জেগে থাক। তা, তিনি সাপ হয়ে কামড়ান আর ওঝা হয়ে ঝাড়েন'। সবটাই তাঁর, ভালোটাও তাঁর মন্দটাও তাঁর। সেই ভগবানের লীলাকথা পরীক্ষিৎ শুকদেবের কাছে শুনতে চাইছেন।

এটাই ভগবানের লীলার এক অনন্য বৈশিষ্ট্য, যেটা সাধারণ মানুষ বা কোন দেবতাও পারবেন না। অন্যান্য যত জীব আছে, দেবতা, গন্ধর্ব, মানুষ, যাই বলুন এরা সবাই শুধু একটা জিনিষই পারে কিন্তু ভগবান দুটো বিপরীত ধর্মী জিনিষ করতে পারেন। প্রাণীর সঙ্গে ভগবানের এটাই পার্থক্য। ভগবান আমাদের জীবনও দিতে পারেন আবার মৃত্যুও দিতে পারেন, কেননা দুটোরই তিনি পারে কিনা। সমুদ্র মন্থনের সময় লক্ষ্মী উঠে এলেন, উঠে এসে তিনি খুঁজে বেড়াচ্ছেন কার কাছে আশ্রয় নেবেন। ঋষি, মুনি, দেবতা সবারই মধ্যে লক্ষ্মী কিছু না কিছু দোষ বা ঘাটতি দেখছেন, কিন্তু ভগবান বিষ্ণুর কাছে গিয়ে দেখছেন তাঁর কোন দিকে ভ্রুক্ষেপই নেই, লক্ষ্মীদেবীর দিকেও তাঁর কোন দৃষ্টি নেই। লক্ষ্মীদেবী তখন বিষ্ণুর আশ্রয় নিলেন। কারণ তিনি এই জগতের সব কিছুর বাইরে। তিনি রাগ আর বিরাগ এই দুটোরই পারে, সেইজন্য তিনি এই দুটোই দিতে পারেন। একটা জিনিষের প্রতি আসক্তি তিনিই দিচ্ছেন আবার সেই জিনিষের প্রতি বৈরাগ্য সেটাও তিনিই দেন। একটা জিনিষের প্রতি যে প্রবৃত্তি আসে সেটাও তিনি দেন আবার সেই জিনিষ থেকে সরে আসার যে নিবৃত্তি সেটাও তিনিই দেন, কারণ তিনি এই দুটোরই পারে।

দেহবোধকে ছাড়িয়ে যাওয়া

পরীক্ষিৎ বলছেন ***নৈষাতিদুঃসহা ক্ষুণ্মাং ত্যক্তোদমপি বাধতে। পিবন্তং ত্বন্মুখাম্ভোজচ্যুতং হরিকথামৃতম্।।১০/১/১৩।*** এটি একটি খুব সুন্দর শ্লোক। 'হে শুকদেব! আমার মৃত্যু আসন্ন। আমি শুধু অন্নই নয়, জল পর্যন্ত পরিত্যাগ করে দিয়েছি, তথাপি এই দুঃসহ ক্ষুধা-তৃষ্ণা (কারণ আমি মুনির গলায় মৃত সাপ ঝুলিয়ে অন্যায় কাজ করেছিলাম) আমাকে সামান্যতম কষ্ট দিচ্ছে না। তার কারণ আমি আপনার শ্রীমুখনিঃসৃত ভগবৎলীলামৃত অবিরাম পান করে চলেছি'। মানুষ খাওয়া-দাওয়া না করে থাকতে পারবে কিন্তু জল ছাড়া বেশী দিন থাকতে পারবে না। কিন্তু শুকদেবের মুখ থেকে অবিরাম ঝর্না ধারার মত শ্রীহরিকথামৃত নিঃসৃত হয়ে চলেছে, সেই হরিকথামৃত শ্রবণ করতে করতে পরীক্ষিতের দেহবোধই চলে গেছে।

আমাদের মনের মধ্যে শরীর ও ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে বাইরে থেকে অনবরত নানা রকমের তথ্য ঢুকছে, যার জন্য আমাদের একটা পারিপার্শ্বিকতার বোধ তৈরী হয়ে যায়। এই পারিপার্শ্বিকতার বোধ থেকে আরও বড় হল শরীর বোধ। এর থেকে উপরে হল এই শরীর বোধকে ছাড়িয়ে যাওয়া। ঠাকুর বলছেন যার দাঁতের ব্যাথা হয় তার মন সব সময় দাঁতের উপর পড়ে থাকে। মা নিজের সন্তানকে খুব ভালোবাসে, কিন্তু মায়ের শরীরের কোন অঙ্গের ব্যাথা যদি একটা মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়ে প্রচণ্ড কষ্ট পায়, তখন সেই মা সন্তানকেও আদর করতে চাইবে না। এখানেই বোঝা যায় নিজের শরীর কত প্রিয়। কিন্তু এই দেহবোধও কোন কোন সময় আমাদের চলে যায়, কোন ভালো সিনেমা বা উত্তেজনাপূর্ণ খেলা দেখার সময় কিছুক্ষণের জন্য আমাদের দেহবোধটা চলে যায়। এগুলো সাময়িক আর এই দেহবোধ চলে যাওয়াটাও কৃত্রিম, মন বাইরে নিজের একটা ভালো লাগার বস্তুর প্রতি আটকে আছে। কিন্তু ঈশ্বরীয় কথা শুনতে শুনতে যখন ঈশ্বরের দিকে মন পুরোপুরি চলে যায় তখনও কিন্তু খাওয়া-পড়ার দিকে আর মন থাকে না। আমরা হয়তো ভাববো ঈশ্বরীয় কথাও তো বাইরে থেকে আসছে, কান দিয়ে ভেতরে যাচ্ছে, ঈশ্বরীয় কথাও তো টিভি বা সিনেমা দেখার মত হল। কিন্তু এই ক্ষেত্রে তা হয় না। আমার ভেতরে যিনি অন্তর্যামী শুদ্ধাত্মা রূপে রয়েছেন তিনিই আমার প্রকৃত স্বরূপ। এখানে ঈশ্বরীয় কথার যে শব্দগুলো ভেতরে প্রবেশ করছে এগুলো উদ্দীপন মাত্র, তখন কি হয়, বাইরের জগৎ থেকে মনটা গুটিয়ে এমনকি নিজের শরীর বোধ থেকেও গুটিয়ে আমার যে প্রকৃত স্বরূপ সেই অন্তর্যামীর দিকে চলে যায়। তখন এই শরীরে কি হচ্ছে, জগতে কি হচ্ছে সেদিকে আর মন যেতে চায় না।

আগেকার দিনে যাঁরা সত্যিকারের সতী ছিলেন, স্বামীর প্রতি এত ভালোবাসা যে স্বামী মারা যাওয়ার পর নিজেও বেঁচে থাকতে চাইতেন না, তাই নিজে থেকেই তাঁরা সতী হয়ে যেতে চাইতেন। বেন্টিং সাহেবের সময় যখন সতীদাহের উপর খুব কড়া আইন চালু হল তখন অনেক সতীই এই আইন মানতে চাইতেন না। তাঁরা তখন নিয়ম করলেন একটা আগুন জ্বালানো হবে সেই আগুনে তুমি হাত রাখবে, তোমার হাতে যদি জ্বালা অনুভব না হয় তাহলেই তুমি সতী হতে পারবে। দেখা যেত যাঁরা ওই রকম সত্যিকারের নিজে থেকেই

সতী হতে চাইতেন তাঁদের কোন বোধই হতো না। এটাকেই কিছু স্বার্থান্বেষী লোভী মানুষ জোর জুলুম করে মেয়েদের পুড়িয়ে মারার রাস্তা বার করে নিল। মানুষ জীবনে নিশ্চয়ই কাউকে ভালোবাসতে পারে, এমন ভালোবাসতে পারে যে তার জন্য সে নিজের জীবনও দিয়ে দিতে চাইবে। কিন্তু ঈশ্বরীয় প্রেম হল তাঁর নিজের প্রকৃত স্বরূপের প্রতি প্রেম। নিজের স্বরূপে মানুষ চলে গেলে তখন ওই স্বরূপের বাইরে যা কিছু আছে সবই তার কাছে অর্থহীন হয়ে পড়ে। কোন কিছুর সাথেই সে আর নিজেকে জড়াতে চাইবে না। এই ভাবটাই পরীক্ষিতের কথায় প্রকাশ পাচ্ছে, *নৈষাতিদুঃসহা ক্ষুণ্মাং* পেটের ক্ষুধা আর কণ্ঠের তৃষ্ণা এই দুটোকে সহ্য করা অত্যন্ত দুরূহ। ক্ষুধার জ্বালা আর পিপাসা এমন এক কষ্টকর অবস্থা যে এর জন্য মানুষ যে কোন কিছু করতে রাজী হয়ে যায়। কিন্তু শুকদেবের মুখ থেকে অবিরাম হরিকথা শুনতে শুনতে পরীক্ষিতের এই দুটোর বোধই চলে গেছে *ত্যক্তোদমপি বাধতে*।

পাকা বুদ্ধি

পরীক্ষিতের শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক অনেক প্রশ্ন শুনে শুকদেব তাঁকে খুব সুন্দর বলছেন ***সম্যগ্ব্যবসিতা বুদ্ধিস্তব রাজর্ষিসত্তম। বাসুদেবকথায়াং তে যজ্জাতা নৈষ্ঠিকী রতিঃ।।১০/১/১৫।*** এই শ্লোকের আলোচনা করার আগে কয়েকটি কথা আমাদের মনে রাখতে হবে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে সাধারণ অবস্থায় মন আর বুদ্ধি সব সময় আলাদা থাকে, বুদ্ধি যেটা করবো বলে নিশ্চয় করে, মন সব সময় তার বিপরীতে আচরণ করতে চাইবে। মহাপুরুষদের ক্ষেত্রে মন আর বুদ্ধি এক হয়ে যায়। অন্য দিকে পাঁচ ছয় বাচ্চাদেরও মন বুদ্ধি এক থাকে। তফাৎ হল, বাচ্চাদের বুদ্ধি মনের সাথে এক হয়ে যায় আর মহাপুরুষদের বা ঋষিদের মন বুদ্ধির সাথে এক হয়ে যায়। কামিনী-কাঞ্চনে ভোগ করবো কি করবো না, ঋষিদের মনে এই প্রশ্নই উঠবে না। বুদ্ধির দুটো দিক, একটা হল জানা আর দ্বিতীয় হল সেই অনুসারে আচরণ করা। জানা আর সেই অনুযায়ী আচরণ করাটা আয়ত্ত হয় অধ্যাবসায়ের দ্বারা। অনেক দিন ধরে লেগে থেকে থেকে, দিনের পর দিন অনুশীলন করতে করতে বুদ্ধিটা ওই ভাবে তৈরী হয়ে যায়। এটাকেই গীতায় বলছেন ধৃতি, ধৃতি মানে কোন কিছুকে ধরে রাখা। যেমন, যাঁরা আজকে ঘন্টার পর ঘন্টা জপ করেন কিন্তু প্রথমের দিকে তাঁদের জপ করতে ভালো লাগতো না। কিন্তু ধীরে ধীরে অনেক দিন ধরে জপ করতে করতে জপের ব্যাপারে বুদ্ধিটা এখন পাল্টে গেছে। শুকদেব এই কথাই পরীক্ষিৎকে বলছেন *সম্যগ্ব্যবসিতা বুদ্ধিস্তব*, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলাকথা শ্রবণ করতে হয়, এই ব্যাপারে তোমার যে সহজ সরল এবং সুদৃঢ় প্রীতি জন্মে গেছে এটাই তোমার অধ্যাবসায়ের পরিচয়। তোমার বুদ্ধি পাকা বুদ্ধি।

মৃত্যু যখন শিয়রে এসে দাঁড়ায় তখন সবারই বুদ্ধি ভ্রমিত হয়ে যায়। ঠাকুর বলছেন – ঘোর বিষয়ী লোক মরতে যাচ্ছে, তখনও তার মুখ দিয়ে হরিকথা বেরোবে না, বলবে 'পিদ্দিমের সলতেটা কমিয়ে দাও, তেল পুড়ছে'। পরীক্ষিৎও মৃত্যুর জন্য দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু তাঁর বুদ্ধিটা পাকা হয়ে গেছে। সিদ্ধ পুরুষ এবং ঋষিদের মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার এই চারটেই ঈশ্বরের প্রতি সমর্পিত। যেদিন কারুর এই চারটেই ঈশ্বরের প্রতি চলে যাবে, সেদিন থেকে তার মনে আর কোন সঙ্কল্প-বিকল্প উঠবে না, বুদ্ধিও শুধু ঈশ্বরকে ধরে রেখেছে আর অহঙ্কার হল আমি ঈশ্বরের। এর পরেও অনেক রকম বিঘ্ন আসবে, কিন্তু ওই অবস্থায় বিঘ্নগুলো ঈশ্বরের দিকে চলার পথে কোন প্রতিবন্ধকতা তৈরী করতে পারবে না। সাধনা মানেই চিত্ত, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার এই চারটেকে এক করে দেওয়া। আমাদের অহঙ্কার জনিত সমস্ত আবেগকে পাল্টানোর জন্য বুদ্ধিকে প্রচণ্ড শক্তিশালী করে তুলতে হয়। বুদ্ধি শক্তিমান হয় একমাত্র গুরুবাক্য আর শাস্ত্রকথা শ্রবণ করে সেই অনুসারে জীবনকে পরিচালিত করার দ্বারা।

আমরা সবাই কম বেশী শাস্ত্রের কিছু কথা, ধর্মের কথা জানি কিন্তু তাও তো আমাদের *সম্যগ্ব্যবসিত বুদ্ধিঃ* হচ্ছে না। মুণ্ডকোপনিষদের ভাষ্যে আচার্য শঙ্কর খুব স্পষ্ট করে পরা বিদ্যার ব্যাপারে বলছেন – শাস্ত্রের তত্ত্বগুলিকে ধারণা করার জন্য নানান রকম সাধনা করে করে নিজের মনকে আগে তৈরী করতে হবে। যতক্ষণ শাস্ত্রজ্ঞান সাধনার সঙ্গে যুক্ত না থাকে ততক্ষণ শাস্ত্রের কথা অপরা বিদ্যাতেই থেকে যাবে। ঠাকুর বলছেন মানব জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বর দর্শন। ঠাকুরের এই কথা শুনে বা পাঠ করে আমিও মানব জীবনের উদ্দেশ্য জেনে

গেলাম। কিন্তু আমার কাছে এই বিদ্যাটা সম্পূর্ণ ভাবে অপরা বিদ্যাই থেকে যাবে যতক্ষণ না সাধনা করে একে পরা বিদ্যায় নিয়ে যাচ্ছি। পরা বিদ্যাতে নিয়ে যাওয়ার জন্য বুদ্ধির দরকার। আগেই বলা হয়েছে বুদ্ধির দুটো দিক, একটা হল জ্ঞান, দ্বিতীয় দিক হল আচরণ। ঠাকুরের কথা আমার জানা হয়ে গেছে, কিন্তু এই জানাটা নিকৃষ্ট জানা, এখানে আমার শব্দ জ্ঞান হয়েছে, অর্থ জ্ঞান হয়নি। অর্থ জ্ঞানের জন্য সাধনা করতে হয়। সাধনার দ্বারা নিজেকে প্রস্তুত করে নিতে হবে, প্রস্তুতি না থাকলে শাস্ত্রের কথা শুনলেও কোন কাজে আসবে না, শাস্ত্রের শব্দ জ্ঞানই শুধু হবে। শব্দ জ্ঞান মানেই সব অপরা বিদ্যার অন্তর্গত। অপরা বিদ্যার বুদ্ধি জীবনের অন্তিম সময়ে কোন কাজে আসবে না। এটাই ঠাকুর তাঁর খুব সহজ সরল কথায় বলছেন – টিয়া পাখি এমনি সময়ে রাম রাম করে কিন্তু বেড়ালে ধরলে ট্যাঁ ট্যাঁ করে। কিন্তু পরীক্ষিতের মন এমন এক উচ্চ অবস্থায় চলে গেছে যেখানে সে মৃত্যুকে এত কাছে দেখতে পেয়েও তাঁর মধ্যে মৃত্যুজনিত ভয়ের কোন চিহ্ন নেই।

শুকদেব তখন বলছেন – ***বাসুদেবকথাপ্রশ্নঃ পুরুষাংস্ত্রীন্ পুনাতি হি। বক্তারং পৃচ্ছকং শ্রোতৃংস্তৎ পাদসলিলং যথা।।১০/১/১৬।*** ভগবানের লীলাকথার ব্যপারে যখন কোন প্রশ্ন করা হয় তখন '*বক্তারং পৃচ্ছকং শ্রোতৃংস্তৎ পাদসলিলং যথা*' – অর্থাৎ যিনি প্রশ্ন করেছেন, যিনি উত্তর দিচ্ছেন আর এর যাঁরা শ্রোতা এই তিনজনই পবিত্র হয়ে যান। *পাদসলিলং* কথার দুটো অর্থ হয়, একটা হল ভগবানের চরণামৃত, আর দ্বিতীয় আরেকটি অর্থ হয় ভগবানের চরণ থেকে যে জল প্রবাহিত হচ্ছে, মানে গঙ্গার কথা বলা হচ্ছে। বলছেন যেমন চরণামৃত পান, গঙ্গাজল আর শালগ্রাম শীলার স্পর্শ দ্বারা সবাই পবিত্র হয়ে যায়, ঠিক সেই রকম নিখিলকলুষহারি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরতিকথা প্রশ্নকর্তা, বক্তা আর শ্রোতা তিন জনকেই পবিত্র করে। এগুলোকে বলা হয় অর্থবাদ। অর্থবাদকে বলা হয় বিদ্যার স্তুতি। বেদের যেখানে অর্থ বার করা হয় সেখানেও একটা আবশ্যকি শর্ত দেওয়া থাকে যে, বেদের অর্থ করতে গেলে সব সময় এই অর্থবাদ করতে হবে। সাধারণ মানুষ শাস্ত্রের কথা শুনতে চায় না, পড়তে তো চাইই না। তখন শাস্ত্রের কথা শোনাবার জন্য মিষ্টি মিষ্টি কথা দিয়ে এদের শাস্ত্রের প্রতি আগ্রহটা তৈরী করা হয়। ঠাকুরও বলছেন, একটু আঁশ ধোয়া জল না দিলে ছোকড়া গুলো ছিটকে বেরিয়ে যাবে। চৈতন্য মহাপ্রভুও সংসারী লোকদের হরিনাম সংকীর্তনে আকর্ষিত করার জন্য এই ধরণের পন্থা অবলম্বন করেছিলেন। আচার্য শঙ্করও অর্থবাদের পূর্ণ অনুমোদন করে গেছেন। অর্থবাদের আরেকটি নাম গ্রন্থস্তুতি। এই গ্রন্থ পাঠ করলে তোমার কি কি উপকার হবে যদি না বলা হয় তাহলে সাধারণ মানুষ শাস্ত্র কথার প্রতি আকৃষ্ট হবে না।

পুরাণের ট্রাডিশানে একমাত্র নারায়ণই অবতার হয়ে আসেন, শিব অবতার হন না, তিনি সাক্ষাৎ আসেন, আবার অন্য কোন দেবীরাও অবতার হন না। পুরাণের একটা খুব সাধারণ বৈশিষ্ট্য হল, ভগবান নারায়ণকে অবতার হয়ে আসার প্রারম্ভিক কাহিনী সব পুরাণে একই ভাবে উপস্থাপনা করা হয়। জগতে কারুর একটা সমস্যা হয়, সে তখন সেই সমস্যা নিয়ে ব্রহ্মার কাছে দৌড়ে যাবে, ব্রহ্মা আবার সেটা ক্ষীরসাগরে গিয়ে ভগবান বিষ্ণুকে জানাবেন, তখন সেই সমস্যার সমাধানের জন্য ভগবান অবতরণ করেন। পুরাণে সবচেয়ে বেশী সমস্যা হয় পৃথিবীর। পৃথিবী তখন একটা গরুর রূপ ধারণ করে ব্রহ্মার কাছে গিয়ে বলবে আমি পাপের বোঝা আর বহন করতে পারছি না, আপনি কিছু করুন। তখন ব্রহ্মা আবার যাবেন ভগবান বিষ্ণুর কাছে। বিষ্ণু তখন বলবেন – ঠিক আছে আমি অবতার রূপ ধারণ করে যাচ্ছি। অধ্যাত্ম রামায়ণেও এই একই কাহিনী। কিন্তু সেখানে বলা হয় রাবণের পাপে সবাই জর্জরিত। তখন ভগবান বিষ্ণু শ্রীরামচন্দ্র রূপে অবতার হয়ে রাবণকে বধ করবেন। এখানে এবার কংসাদিকে বধ করবার জন্য ভগবান স্বয়ং নররূপ ধারণ করে আবির্ভূত হবেন।

এখানেও পৃথিবীর সমস্যা হয়ে গেছে, সে এখন গরুর রূপ ধারণ করে ব্রহ্মার কাছে গেছে। এটা জানা যায় না পৃথিবীর যখনই কোন সমস্যা হয় সে কেন সব সময় গরু রূপই ধারণ করে প্রথমে ব্রহ্মার কাছে যাবে। পৃথিবী যদি নিজে ব্রহ্মার কাছে চলে যায় তাহলে তো মাধ্যাকর্ষণের কক্ষ পথ থেকে পৃথিবী ছিটকে যাবে। তাই পৃথিবী সব সময় গরুর রূপ ধারণ করে। গরু খুব পবিত্র, পৃথিবী যেমন সব কিছু দিয়ে আমাদের রক্ষা করে, গরুও আমাদের বিভিন্ন ভাবে রক্ষা করে। ব্রহ্মা যদি দেখেন এই সমস্যা আমি নিজেই মিটিয়ে দিতে পারবো

তখন তিনি পৃথিবীকে একটা কিছু বর দিয়ে সমস্যাটা সামলে দেন। আর সমস্যা যদি ব্রহ্মার ক্ষমতার বাইরে থাকে তখন তিনি অন্য দেবতাদের ও গরু রূপী পৃথিবীকে সঙ্গে নিয়ে ভগবান বিষ্ণুর কাছে যাবেন, শিবপুরাণে শিবের কাছে যাবেন। এরপর ভগবান বিষ্ণু কিংবা শিব একটা বর দেবেন, এভাবে কাহিনী এগোতে থাকবে। সমস্ত পুরাণের এটাই বাঁধা-ধরা গৎ। অধ্যাত্ম রামায়ণেও আমরা একই কাহিনী পাই।

জ্ঞান লাভের প্রক্রিয়া

তত্র গত্বা জগন্নাথং দেবদেবং বৃষাকপিম্। পুরুষং পুরুষসূক্তেন উপতস্থে সমাহিতঃ।।১০/১/২০।
যাই হোক সব দেবতা, ব্রহ্মা আর পৃথিবী সবাই মিলে ক্ষীর সাগরের তীরে যেখানে ভগবান যোগনিদ্রায় শায়িত হয়ে আছেন, সেখানে পৌঁছে গেলেন। যিনি সবার অন্তর্যামী রূপে ভেতরে বিরাজ করে থাকেন তিনি আবার বাইরে কি করে শয়ন করে থাকেন? আসলে এই কাহিনীগুলো হল রূপক, একটা উচ্চ তত্ত্বকে বোঝানোর জন্য এই ধরণের কাহিনীর অবতারণা করতে হয়। সেখানে ভগবানকে সবাই বেদের পুরুষসূক্তম দিয়ে বন্দনা করলেন। সূক্ত হল ভগবান বা দেবতাদের উদ্দেশ্যে প্রার্থনার সঙ্কলন। তখনকার সময় আজকের মত জপের প্রচলন ছিল না, বেদের এই ধরণের সূক্তগুলিকে আবৃত্তি করার উপর তখনকার দিনে বেশী জোর দেওয়া হত। শ্রীশ্রীচণ্ডীতেও আমরা দেখি সূরথ রাজা ও সমাধি বৈশ্য দেবীসূক্তের জপ করে দেবীর আরাধনা করছেন। বেদে ভগবান বা ঈশ্বরকে 'পুরুষ' শব্দ দিয়ে সম্বোধন করা হয়। পুর মানে দূর্গ বা কেল্লা বা শহর, পুরে যিনি শয়ন করেন তিনিই পুরুষ। অর্থাৎ আমাদের শরীরের ভেতরে যিনি অন্তর্যামী রূপে আছেন, তাঁকেই পুরুষ বলছেন। এই পুরুষের স্বরূপকে নিয়ে যেখানে আলোচনা করা হয়েছে তাকেই বলছেন পুরুষসূক্তম্। পুরুষসূক্তম্ হিন্দুদের কাছে একটি অত্যন্ত পবিত্র ও শক্তিশালী মন্ত্র।

বলছেন *তত্র গত্বা জগন্নাথং দেবদেবং বৃষাকপিম্*, সবারই কষ্ট, যন্ত্রণা, ক্লেশ দূর করেন একমাত্র ভগবানই, তিনিই আবার সবার অভিলাষ অকাতরে পূর্ণ করেন, কারণ তিনিই সমস্ত জগতের স্বামী। ব্রহ্মা সবাইকে নিয়ে সেখানে গিয়ে সেই জগতের স্বামী, সকলের আরাধ্য ভগবানকে পুরুষসূক্তম্ দিয়ে স্তুতি করলেন, স্তুতি করতে করতে ব্রহ্মা সমাধিতে লীন হয়ে গেলেন। ঠাকুর বলছেন – সন্ধ্যা গায়ত্রীতে লয় হয়, গায়ত্রী প্রণবে লয় হয়, ওঁ সমাধিতে লয় হয়। আমরা এর আগে মন বুদ্ধিকে নিয়ে আলোচনা করেছিলাম, যার বুদ্ধি বেশী শক্তিশালী তার মন ডান দিক বাম দিক করতে পারে না। বুদ্ধি যতক্ষণ খুব শক্তিশালী না হয় ততক্ষণ তার পক্ষে সমাধিবান হওয়া সম্ভব নয়। ঠাকুর যে সন্ধ্যা গায়ত্রীর কথা বলছেন বা এখানে পুরুষসূক্তমের কথা বলা হচ্ছে, এই স্তুতি করতে করতে মনটা যখন অন্তর্মুখী হয়ে গেল তখন স্তুতির শব্দগুলো কমে আসে, আরও অন্তর্মুখী হতে হতে একটা জায়গায় এসে আর কোন শব্দ থাকে না, তখন পুরোপুরি নৈঃশব্দে চলে যায়, নৈঃশব্দে চলে গেলেই সমাধিতে ডুবে গেল। সমাধিতে কি হয়? আমাদের মনের একটাই কাজ, তা হল জ্ঞান লাভ করা। চিত্ত যখন খুব চঞ্চল থাকে কিংবা মন যদি খুব শক্তিশালী থাকে তখন বিক্ষিপ্ত জ্ঞান আসে। মন যখন অন্তর্মুখী হতে হতে গভীরে নৈঃশব্দের কাছাকাছি চলে যায় তখন আরও গভীর জ্ঞান আসে। সমাধিতে এই গভীর জ্ঞানই গভীরতম জ্ঞান হয়। সমাধিবান পুরুষের সমাধিতে তাঁদের ভেতরে জ্ঞান ভেসে ওঠে, এই জ্ঞানই যখন সমাধি থেকে নেমে এসে তিনি মুখে উচ্চারণ করবেন সেটাই হয়ে যাবে বেদ। সাধারণ অবস্থায় মানুষ যখন কোন জ্ঞান লাভ করে তখন সেটা আবর্জনার মত। যখন মৌনে চলে গিয়ে মনের প্রশান্তির গভীরে যে জ্ঞান আসে, সেই জ্ঞান খুব গভীর, এই জ্ঞান দিয়ে কবিতার জন্ম দেওয়া যায়, বিজ্ঞানের অনেক তত্ত্বকে জানা যায়, এই জ্ঞান মানবজাতিকে দিশা দেয়। কিন্তু সমাধিতে মানুষ যে জ্ঞান উপলব্ধি করে এই জ্ঞানই চিরন্তন শাশ্বত জ্ঞান। ঠাকুর বলছেন ব্রহ্মই কালী, কালীই ব্রহ্ম, এই জ্ঞান ঠাকুরের সমাধি অবস্থাতে উপলব্ধি হয়েছে, এই জ্ঞানই শাশ্বত, সনাতন সত্য, এই জ্ঞানকেই বলছেন গভীরতম। গায়ত্রীমন্ত্রও একটা গভীরতম জ্ঞানের ব্যঞ্জনা, যেটা বিশ্বামিত্র ঋষি সমাধি অবস্থায় প্রত্যক্ষ করেছিলেন।

মানুষের মন সব সময় তিনটে গুণের সমন্বয়ে তৈরী। কারুর মন তমোগুণী, কারুর রজোগুণী আবার কারুর মন সত্ত্বগুণের হয়, আবার কারুর তমো-রজো বা সত্ত্ব-রজো মিলিয়েও হয়। এই তিনটে গুণকে আধার

করে মনকে পাঁচটি শ্রেণিতে বিভাগ করা হয়েছে – ক্ষিপ্ত, মূঢ় বা বিমূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র ও নিরুদ্ধ। মন এই পাঁচটা অবস্থায় থাকে। আমরা যদি নিজেদের দিকে তাকাই তাহলেও আমরা দেখতে পাই বিভিন্ন সময় মন বিভিন্ন অবস্থায় থাকে। ক্ষিপ্ত, বিক্ষিপ্ত এই শব্দগুলো বাংলায় যে ক্ষিপ্ত বলে সেই ক্ষিপ্ত নয়, এগুলো হল শাস্ত্রের বিশেষ পরিভাষা।

প্রথমটা হল ক্ষিপ্ত, এই অবস্থায় মন পুরোপুরি ছড়িয়ে থাকে। গুণের দিকে দিয়ে এই অবস্থায় মন তমস গুণে আচ্ছন্ন থাকে। মন যখন তমোগুণে থাকে তখন মন ছড়িয়ে থাকে। পাঁচটা জিনিষকে নিয়ে মন চঞ্চল হয়ে আছে, কখন এদিকে তাকাচ্ছে কখন সেদিকে তাকাচ্ছে, একটা কিছু করছে সেটা শেষ না করে আরেকটা কিছুতে নেমে পড়ছে, আবার ওটাও করছে, সেটাও করছে। ছোট বাচ্চাদের মন সব সময় চঞ্চল থাকে। মনের এই চঞ্চলতাই তমোগুণের লক্ষণ। মন নির্দিষ্ট একটা কিছুতে বা জায়গায় স্থির হয়ে থাকবে না, মন এই এখানে রয়েছে কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই আবার অন্য কোথাও চলে যাচ্ছে। যারা অত্যন্ত নিম্ন প্রকৃতির, পশুর মত চরিত্র তাদের মনের স্বাভাবিক অবস্থা হল ক্ষিপ্ত। ক্ষিপ্ত মন মানে চিত্তবৃত্তির অবস্থায় সব সময় থাকা। মূঢ় বা বিমূঢ়তে সুখ-দুঃখের অনুভব খুব তীব্র থাকে। মনটা সব সময় মোহাচ্ছন্ন আর ছড়িয়ে থাকে বলে এদের হিংসা বৃত্তি প্রচুর, যার জন্য সব সময় অপরের ক্ষতি করতে চায়। সন্ত্রাসবাদীরা যারা খুন করে বেড়ায় এরা সব বিমূঢ় অবস্থায় আছে। অসুর, দানব এদের মনের এই অবস্থাটাই স্বাভাবিক। মূঢ় বা বিমূঢ়ও তমোগুণের লক্ষণ। তমের মধ্যে একটা হল active আরেকটা হল non-active, active যখন বেশী হয়ে যায় তখন ক্ষিপ্ত আর active যখন কম হয়ে যায় তখন সেটা হয়ে যায় মূঢ় বা বিমূঢ়। বিক্ষিপ্ত হচ্ছে এর থেকে একটু উপরে, বিক্ষিপ্তে মনটা একটু একটু করে কুড়িয়ে আনতে সক্ষম হতে থাকে। মনের শক্তি একটু যেন জেগে উঠেছে অর্থাৎ রজোগুণটা অনেক বেড়ে গেছে। যদিও আমরা পাগলকে বিক্ষিপ্ত বলি কিন্তু এর একটা বিশেষ অর্থ আছে, এই বিক্ষিপ্তের অর্থ কিন্তু পাগল নয়। এই অবস্থায় মনকে একটা জায়গাতে স্থির করার চেষ্টা করছে এবং হঠাৎ কিছুক্ষণের জন্য মনটা কুড়িয়ে একটা জায়গাতে স্থিত হয়ে যায়। মায়েরা যখন রান্নাবান্না করেন তখন কত একাগ্র হয়ে কাজ করেন। কিন্তু বেশী সময় ওই অবস্থায় থাকতে পারে না। একাগ্র হয়ে কাজ না করলে সেটাই মূঢ় বা ক্ষিপ্ত হয়ে যাবে। বিক্ষিপ্ত হল দেবতাদের মনের স্বাভাবিক অবস্থা। একমাত্র মানুষের মধ্যেই এই তিনটে অবস্থা থাকতে পারে। আর একই মানুষের একই দিনে মন সব কটি অবস্থায় থাকতে পারে।

এই তিনটের উপরে হল একাগ্র অবস্থা। একাগ্রে মন one pointed হয়ে যায়। এটাই সাধকদের অবস্থা। মন এখন সত্ত্বগুণের প্রাচুর্যে ভর্তি হয়ে আছে। এদের কার্য ক্ষমতা প্রচণ্ড থাকে, যদিও রজোগুণ এদের থাকে। পরমহংসরা যখন কাজ করেন তখন তাঁরা সব কাজ একাগ্র ভাবে করেন। সাধকরাও যখন কাজ করে তখন একাগ্র ভাবে কাজ করে। সাধক ও সিদ্ধ দুজনের কাজের মধ্যে তফাৎ থাকবে, কিন্তু দুজনেরই কাজে একাগ্র থাকবে। সাধারণ মানুষেরও মন এই রকম একাগ্র হয়, যখন কোন খুব উত্তেজনামূলক ক্রিকেট ম্যাচ দেখবে তখন পুরো টিভিতে খেলা দেখার মধ্যে একাগ্র হয়ে আছে, কিন্তু এটা বিক্ষিপ্ত অবস্থা, এখানে মন অনেকটা কুড়িয়ে আনা হয়েছে, কিন্তু একাগ্র অবস্থা বলা যাবে না। একাগ্র মন হল, যাদের মন স্বাভাবিক ভাবে সত্ত্বগুণে উঠে গেছে। স্বাভাবিক সত্ত্বগুণ না থাকলে মন একাগ্র অবস্থায় যাবে না। উচ্চতর সাধকদের মন স্বাভাবিক ভাবে একাগ্র অবস্থায় থাকবে আর তাঁদের কার্য ক্ষমতা প্রচণ্ড হবে। স্বামীজী বলছেন – রজোগুণের জোরে কখন কাজ হয় না, কাজ হয় সত্ত্বগুণের জোরে। কারণ সত্ত্বগুণ মানুষকে অনাসক্তের দিকে নিয়ে যায়, ফলে তাঁর কার্য ক্ষমতা অনেক বেশী। কাজ মানে রজোগুণ, রজোগুণের কাজ একটা তমোগুণের দিক থেকে আসে আরেকটা সত্ত্বগুণের দিকে থেকে আসে। যাঁর কাজ সত্ত্বগুণের দিক থেকে আসে তিনি কাজের ব্যাপারে প্রচণ্ড কুশল ও ক্ষমতা সম্পন্ন হন আর যখন ধ্যানে বসবেন তখন পুরোপুরি একাগ্র হয়ে যাবেন।

এই চারটের পর আসে নিরুদ্ধ। নিরুদ্ধ চিত্ত বৃত্তি নয়, চিত্তের অবস্থা। কারণ সেখানে সমস্ত বৃত্তি থেমে গেছে। একাগ্রতে একটাই বৃত্তি আছে, অন্য কোন বৃত্তি নেই। ওই একটা বৃত্তি ছাড়া তিনি অন্য কিছু জানেন না। স্বামী বিরজানন্দ মহারাজ শ্যামলাতালে দোতালায় থাকতেন। নীচের তলায় ডাস্টবিন ছিল, ডাস্টবিনে

অদরকারী কাগজ-পত্র রাখা থাকত। শ্যামলাতালে কাঠ কয়লা ব্যবহার হত। একজন এসে ঘর পরিষ্কার করার পর কিছু কাঠ কয়লা সমেত নোংরা ডাস্টবিনে ফেলেছে। কাঠ কয়লাতে তখনও সামান্য একটু আগুন ছিল। ডাস্টবিনের কাগজে প্রথম আগুন ধরে গেলে। শ্যামলাতালে সব কাঠের বাড়ি। সেখান থেকে পুরো বাড়িতে আগুন ছড়িয়ে গেল। পুরো ঘর ধুয়োতে ভরে গেছে। ধুয়ো দোতলাতেও ছড়িয়ে গেছে। মহারাজ দোতালায় তখনও চিঠি লিখে যাচ্ছেন। সেবকরা দেখতে পেয়ে দৌড়ে গেছে। ইতিমধ্যে আগুনের শিখা বেরিয়ে গেছে। সেবকরা তাড়াতাড়ি করে ঘর থেকে সরাচ্ছেন। মহারাজ তখনও বুঝতেই পারছেন না কি হয়েছে। ওনার পুরো ঘর ধুয়োতে ভরে গেছে, তখনও তিনি চিঠি লিখে যাচ্ছেন, কোন হুঁশ নেই। মহারাজের মন একাগ্র হয়ে আছে, শুধু চিঠি লিখে যাচ্ছেন। যেটা করছেন সেটাই করছেন, তার বাইরে আর কিছু নেই, এটাই single বৃত্তি। কিন্তু নিরুদ্ধ অবস্থায় ওই একটা বৃত্তিও নেই। কোন বৃত্তিই নেই, মন নিরুদ্ধ অবস্থায়, এটাই সমাধি।

প্রথমে মনের চারটে অবস্থা, ক্ষিপ্ত, ক্ষিপ্ত থেকে মূঢ় অবস্থা, মূঢ় থেকে বিক্ষিপ্ত আর বিক্ষিপ্ত থেকে একাগ্র। একাগ্র থেকে নিরুদ্ধে যখন চলে গেল তখন আর কোন বৃত্তি থাকছে না। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে একাগ্রকে অতিক্রম করে নিরুদ্ধে যাওয়া যায় না, তার জন্য চাই বিশেষ সাধনা। একাগ্র অবস্থা হল শুদ্ধ সত্ত্বগুণে পরিপূর্ণ। সত্ত্বগুণও কিন্তু বেঁধে রাখে, গীতায় বলছেন *সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ*, সত্ত্বগুণী সুখ আর জ্ঞান এই দুটো জিনিষকে ছাড়তে চায় না। যদিও ভক্তি একটা পথ, জ্ঞান একটা পথ, কর্ম একটা পথ, এগুলো কখন মেলে না, কিন্তু ভক্তি পথে একাগ্র অবস্থাই ঠিক ঠিক দ্বৈতের অবস্থা। একাগ্র হয়ে যখন ঈশ্বরের সাক্ষাৎ দর্শন হচ্ছে, ওই ঈশ্বর দর্শনজনিত যে সুখ ও আনন্দের অনুভব হয়ে সেটাকে সাধক কখন ছাড়তে চায় না। সেইজন্য সে নিরুদ্ধতে যেতেই চাইবে না। যদি কোন ভাবে নিরুদ্ধতে চলে যায়, যোগসূত্র পুরো বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে যাবে, সে তখন বলবে *তদাদ্রষ্টুস্বরূপে অবস্থানম্*। যদি আমি নিরুদ্ধ অবস্থায় চলে যাই তখন আমার যে বাস্তবিক স্বরূপ, সেই স্বরূপে অবস্থান হয়ে যাবে। যখনই কারুর প্রতি আমাদের ভালোবাসা থাকে তখন এই ভালোবাসা আমাকে একাগ্রই হতে দেবে না, নিরুদ্ধ অনেক দূরের কথা। ভালোবাসা হল মনের চিত্ত আর অহঙ্কারের অবস্থায় থাকা। আমার চিত্তকে আমার ভালোবাসার জন দখল করে রেখেছে ‘ওর প্রতি আমার ভালোবাসা আছে’। তখন হয় ক্ষিপ্ত, না হয় মূঢ় আর খুব বেশী হলে বিক্ষিপ্ত এই তিনটের মধ্যে ঘোরাফেরা করবে। যতক্ষণ এই বোধ ‘আমার স্ত্রী আমাকে খুব ভালোবাসে’ বা ‘আমার ছেলে আমার প্রাণ’ থাকবে ততক্ষণ এই বোধ আমাদের একাগ্রতেও যেতে দেবে না, নিরুদ্ধের তো কোন প্রশ্নই নেই। আমি বেলুড় মঠের সন্ন্যাসী, আমি বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ে শাস্ত্র পড়াই, এই আমি যখন সমাধি অবস্থায় যাবে তখন কি নিজেকে আমি সন্ন্যাসী বা আচার্য রূপে দেখবে? কোন দিন দেখবে না। যখন আমি নিজেকে সন্ন্যাসী মনে করছি তখন কিন্তু আমি চিত্ত বৃত্তির সঙ্গে জড়িয়ে আছি। কি বৃত্তি? আমি একজন সন্ন্যাসী, এই সন্ন্যাসী বৃত্তির বোধ। তার মানে, আমি যোগের পথে আর এগোতে পারবো না, কারণ ক্ষিপ্ত, মূঢ় আর বিক্ষিপ্ত এই তিনটের মধ্যেই ঘুরতে থাকব। একাগ্রে তো যেতেই পারবো না, আর নিরুদ্ধ মানে সমস্ত বৃত্তি শান্ত হয়ে গিয়ে সমাধি অবস্থায় চলে যাওয়া, সেইজন্য নিরুদ্ধের কোন প্রশ্নই হতে পারে না। সমস্ত বৃত্তি শান্ত হয়ে যাওয়া মানে, যত রকমের বৃত্তি হতে পারে, জগতের ব্যাপারে আর নিজের ব্যাপারে যত রকমের চিন্তা ভাবনা হতে পারে সব বন্ধ হয়ে যাবে। যে জগৎ এত দিন সূচনা দিয়ে যাচ্ছিল, সেটা তো অনেক আগে বন্ধ হয়ে গেছে, নিরুদ্ধ অবস্থায় ভেতর থেকেও কোন চিন্তা-ভাবনা উঠছে না।

ব্রহ্মা এখন সমাধিতে লীন হয়ে গেছেন। সমাধিতে ব্রহ্মার জ্ঞান লাভ হয়ে গেছে। কি জ্ঞান লাভ হল? ভগবান তখন আবির্ভূত হয়ে বলছেন ‘আমি জানি পৃথিবীতে এই এই সমস্যা দেখা দিয়েছে, আমি যাব পৃথিবীতে, কিন্তু তার আগে দেবতারা যত আছে সবাই তোমরা যদু বংশে গিয়ে জন্ম নাও’। এই জ্ঞান লাভের পর ব্রহ্মা সমাধি থেকে ব্যুত্থিত হয়ে দেবতাদের বলছেন ‘ভগবানের কথা আমি শুনেছি, ভগবানের লীলাতে সাহায্য করার জন্য তোমরা এখন সবাই গিয়ে যদুকুলে জন্ম গ্রহণ কর, ভগবান আরো বলে দিলেন যে তাঁর প্রিয়তমা লক্ষ্মী তিনি শ্রীরাধা হয়ে সেখানে জন্ম নেবেন আর তাঁর সেবার জন্য অন্য অনেক গোপীরাও যাবেন’।

ঠাকুর কি সমাধিতে কখন এই ধরণের কথা শুনেছিলেন? হ্যাঁ, ঠাকুরও শুনেছিলেন, যখন তিনি সমাধিতে লীন হয়ে থাকতে চাইছেন তখন তাঁকে মা বলছেন 'তুই ভাবমুখে থাক'।

অংশাবতার ও কলাবতার

বাসুদেবকলানন্তঃ সহস্রবদনঃ স্বরাট্। অগ্রতো ভবিতা দেবো হরেঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া।।১০/১/২৪।
মজার ব্যাপার হল যাঁরা শ্রীকৃষ্ণলীলার খুব ভক্ত তাঁরা শ্রীরাধাকে লক্ষ্মী রূপেই দেখেন। কিন্তু গুজরাটের দিকে শ্রীরাধাকে লক্ষ্মী রূপে মানা হয় না, ওখানে রুক্মিণীকেই লক্ষ্মী রূপে মানা হয়। কিন্তু যাঁরা ভক্তিমার্গী, বিশেষ করে বৃন্দাবনের ভক্তরা শ্রীরাধাকেই লক্ষ্মীদেবী রূপে মানেন। তারপর বলছেন – যিনি শেষনাগ আছেন, তিনি আমার দাদা বলরাম হয়ে জন্ম নেবেন। এখানে খুব সুন্দর একটা বিশ্লেষণ আছে, বলছেন, শেষনাগ হচ্ছেন ভগবানের কলা – *বাসুদেবকলানন্তঃ*। কথামৃতে ঠাকুর প্রায়ই এই প্রশ্ন করছেন 'তোমার কি মনে হয়'? যদি বলা হল 'আপনাকে অবতার বলেই মনে হয়'। তখন আবার জিজ্ঞেস করছেন 'কলা না অংশ'? অনেক ভক্তই কলা আর অংশে গোলমাল করে ফেলেন। কলা আর অংশ ভাগবতের নিজস্ব তত্ত্ব। অংশ বললে ভগবানের যে কোন ভাগ নিয়ে আসা যেতে পারে, এক ভাগ, কি দুই ভাগ, বা পয়েন্ট এক ভাগ, জিরো পয়েন্ট এক ভাগ, পয়েন্ট দুই ভাগ বার তার চাইতে বেশীও হতে পারে। আর কলা হয় ষোলটি, চন্দ্রমার যেমন ষোলটি কলা। যখন কলা বলা হয় তখন তা কখনই শতকরা ছয় ভাগের নীচে যাবে না, এক কলা, দুই কলা, তিন কলা – এখানে এক কলার নীচে হয় না। অংশ অবতারে ছোটও হতে পারে বেশীও হতে পারে, শতকরা নব্বুই ভাগও হতে পারে, কত হবে বলা মুশকিল। কিন্তু কলার ক্ষেত্রে এক কলার নীচে সে আর আসবে না। এখানে যে কলা বলছেন, মানে কলা অবতার উচ্চতম অবতার। আর অংশ অবতার খুব ছোট। এই ব্যাপারটা অনেকেই গোলমাল করে ফেলে। কিন্তু ভাগবতের এই শ্লোকটা জানা থাকলে বুঝতে অসুবিধা হবে না।

শেষনাগ ছিলেন কলা অবতার। ভগবানের যে অংশ অবতার তিনিও অনন্ত। কেননা ভগবান নিজে যদি অনন্ত হন, তাহলে তাঁর অংশটাও অনন্ত হবে। অনন্তের কোন অংশ হয় না। এটাই অদ্বৈতের মূল তত্ত্ব। আমাদের মন আসলে পুরোপুরি সান্ত, আমরা অনন্ত বলতে বড়জোর সমুদ্র, আকাশকে ভাবব, কিন্তু এগুলোও সান্ত। অনন্তের ভাব পুরো আলাদা। একটা উপমার সাহায্যে এই অনন্তের ভাবকে কিছুটা বোঝান যেতে পারে। মনে করা যাক একটা হোটেল আছে, হোটলের প্রত্যেকটি ঘরে এক, দুই, তিন, চার সব নম্বর দেওয়া আছে, আর এই রকম অনন্ত সংখ্যার ঘর আছে। এইভাবে হোটেলের ঘরের সংখ্যা অনন্ত। আর প্রত্যেকটি ঘরেই লোক আছে। এবার হঠাৎ একজন লোক এসে বলল আমাকে একটা ঘর দিন। এখন তাকে কীভাবে ঘরের ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে? আমার যদি দশটা ঘর থাকে, এখন দশটা ঘরে দশ জন লোক আছে, আরেক জন লোক এলে তাকে আর জায়গা দেওয়া যাবে না। কিন্তু এই হোটেলে অনন্ত সংখ্যার ঘর আছে, আর প্রত্যেকটি ঘরে লোক আছে, এখন আরেক জন লোক এলে তাকে ঘর দিতে পারা যাবে কিনা? খুব সহজেই জায়গা দেওয়া যাবে। কীভাবে? এক নম্বরে যে আছে তাকে বলা হবে দুই নম্বর ঘরে চলে যেতে, দুই নম্বর ঘরের লোককে বলবে তিন নম্বর ঘরে চলে যান, তিনকে বলবে চারে চলে যান। এখন পুরো সিরিজটা এভাবে নড়তে শুরু করবে। শেষে কোথায় থামবে? কোথাও থামবে না, কেননা ঘরের সংখা অনন্ত। শুধু একজনকেই নয়, যদি অনন্ত সংখ্যায় লোক এসে যায়, তখনও এই ভাবে অনন্ত লোককে ঢুকিয়ে দেওয়া যাবে। এই হোটেলের যে মুনাফা হবে, তখন কত মুনাফা হবে? মুনাফাও অনন্ত হবে। যদি লোকসান হয় তাহলে লোকসানও অনন্ত হবে। অনন্ত লোকসানের পর কত মুনাফা থাকবে, মুনাফাও অনন্ত থাকবে। অনন্তের কথা বললেই লোকের মাথা ঘুরে যাবে। এই কারণেই অনন্ত ব্যাপারটা আমরা ধারণা করতে পারিনা। এই অনন্তকে ধারণা করা যায় না বলেই বিভিন্ন মতবাদের, দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের সৃষ্টি হয়। অনন্তকে আমরা যে মনোভাব নিয়ে দেখব, আধ্যাত্মিকতার ব্যাপারে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিও সেইভাবে তৈরী হবে। এখন এই গল্পে একটা অনন্ত সংখ্যার ঘর বিশিষ্ট হোটেল ব্যবসার কথা বলা হল, যেখানে ক্ষতির পরিমাণ অনন্ত, লাভের পরিমাণ অনন্ত। কত ট্যাক্স ভরতে হয়েছে? অনন্ত ট্যাক্স দিতে হয়েছে। এগুলো শুনলে আমাদের গাঁজাখুরির গল্প বলেই মনে হবে। কিন্তু অনন্তের বিচার করতে গেলে এভাবেই বিচার করে ধারণা করতে হয়, আর এই ব্যাপারটাই হয়। যাঁরা অনন্তের

এই সূক্ষ্ম ব্যাপারটা ধরতে পারবেন তাঁরাই একমাত্র বলবেন – হ্যাঁ, এটা পুরোপুরি যুক্তিযুক্ত ও সম্ভব, তাঁরাই অদ্বৈতবাদকে ধরতে পারবেন, তা নাহলে অদ্বৈত তত্ত্ব বোঝা অসম্ভব। সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে অনন্তকে কিছুতেই বোঝা যায় না। অনন্তের অংশ অনন্তই হবে সেটা কখনই অংশ হবে না। পূর্ণ থেকে পূর্ণ নিয়ে নিলে পূর্ণই থাকবে। অনন্ত থেকে অনন্ত বিয়োগ দিলে কত হবে? অনন্তই হবে শূন্য কখনই হবে না। যদি শূন্য আর অনন্তকে নিয়ে খেলা করা হয় তাহলে যে কোন একটা জিনিষ দিয়ে অন্য যে কোন জিনিষকে প্রমাণ করে দেওয়া যায়। পদার্থ বিজ্ঞানে যখন infinite এসে যায় তখন বিজ্ঞানীরা সব কিছু ওখানেই বন্ধ করে হাত গুটিয়ে নেয়, বলে এর পর আর কোন নিয়ম চলবে না। অনন্তকে ধরা খুব মুশকিল, অঙ্কের বিশারদরাও অনন্তের ব্যাপারে হাত তুলে দেয়। এই ফরমুলাটা মাথায় বসিয়ে নিলে অনন্তের ব্যাপারে ধারণা করা সহজ হবে, তা হল অনন্তকে অনন্তের সঙ্গে যোগ করলে অনন্তই থাকবে, আবার অনন্ত থেকে অনন্তকে যদি সরিয়ে দেওয়া হয় তখনও অনন্তই থাকবে। এই সূক্ষ্ম ব্যাপারটা আমাদের মন মেনে নিতে চায়না, সেইজন্যই আমরা ঈশ্বর তত্ত্ব বুঝতে বা ধারণা করতে পারিনা। অনন্তের ধারণা না হলে ঈশ্বর তত্ত্বের ধারণাও কোন দিন হবে না।

যাই হোক, ভগবানের এবার পুরো দলবল, শেষনাগ, যোগমায়া, দেবতারা বিভিন্ন জায়গায় অবতরণ করে গেছেন। ভাগবতের দশম স্কন্ধ শুধু ভক্তি শাস্ত্রই নয়, ভক্তির পরাকাষ্টা। যাঁরা ভগবদ্ভক্তি রসে একেবারে ডুবে থাকতে চান তাঁদের জন্য ভাগবত ছাড়া আর অন্য কোন শাস্ত্র নেই, ভক্তির মাহাত্ম্য বর্ণনায় ভাগবতের উপরে আর কোন শাস্ত্র নেই। কিন্তু যাঁরা একেবারে ভক্তি রসে হারিয়ে যেতে চান তাঁদের আগেকার দিনের বিভিন্ন পণ্ডিত ও আচার্যদের দ্বারা রচিত ভাষ্য সহ অত্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে শুধু এই দশম স্কন্ধ অধ্যয়ন করে যেতে হবে। শ্লোকের এক একটি শব্দকে কত ভাবে অর্থ করা যেতে পারে, এক একটি ছোট্ট ঘটনাকে কত ভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে তাই নিয়ে এনারা পাতার পর পাতা শুধু ব্যাখ্যাই দিয়ে গেছেন। প্রত্যেকটি শব্দের অর্থ বা ব্যাখ্যা ভক্তকে গভীর ভাব রাজ্যে পৌঁছে দেবে। এর যে কোন একটা ব্যাখ্যাকে ধ্যানের বিষয় করে ভক্তিমার্গের সাধক ভগবদ্ভক্তির অতিন্দ্রীয় অনুভূতির ভাব রাজ্যে খুব অনায়াসেই বিচরণ করতে পারবেন।

কাহিনী আমাদের সবারই মোটামুটি জানা। অনেক কাল আগে যদুবংশে শূরসেন নামে এক রাজা ছিলেন। শূরসেনের বংশেই কংসের জন্ম হয়। বসুদেবও এই বংশে শূর নামে এক রাজার পুত্র ছিলেন। বসুদেবের পুত্র বলে শ্রীকৃষ্ণকে বাসুদেব বলা হয়। কংসের বাবা উগ্রসেন তখন মথুরার রাজা ছিলেন, সেই অনুসারে কংস মথুরার রাজকুমার ছিলেন, তাঁর জ্যাঠতুতো বা খুড়তুতো বোন ছিলেন দেবকী। বসুদেবের সাথে দেবকীর বিবাহ হয়েছে। বিয়ে করে নববধুকে নিয়ে বসুদেব রথে করে যাচ্ছেন, আর খুব উৎসাহ ও আনন্দ সহকারে সেই রথের সারথি হয়েছেন কংস স্বয়ং। সেই সময় আকাশে এক দৈববাণী হল – রে মুর্খ! যে দেবকীকে এত আদর যত্ন খাতির করে নিয়ে যাচ্ছিস, সেই দেবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তানই তোকে বধ করবে। দৈববাণী শুনেই কংস খুব ভয় পেয়ে ঘাবড়ে গেছে।

ঠাকুর বলছেন কলিযুগে দৈববাণী হয় না, বাচ্চার মুখ বা পাগলের মুখ দিয়ে দৈববাণী হয়। পুরাণ কখনই ইতিহাসমূলক গ্রন্থ রূপে গ্রহণযোগ্য নয়। পুরাণে সাধারণতঃ ভাবরাজ্যের বর্ণনাই বেশী থাকে। এগুলোও ভাবরাজ্যের কথা। একটা হয় মনোরাজ্য, জগতের যা কিছু দেখছি, যেগুলোকে আমরা বাস্তব বলে মনে করছি, এগুলো সবই মনোরাজ্যে বিচরণ করে। বাস্তবিক বলে আসলে কিছু নেই, যা কিছু হচ্ছে আমাদের মনের ভেতরেই হচ্ছে, মনের বাইরে কিছু হয় না। কিন্তু তার থেকেও বেশী গুরুত্বপূর্ণ হল, বিশেষ করে যারা ভক্ত তাদের জন্য, ভাবরাজ্য। কথামৃতে ঠাকুর ভাব নিয়ে অনেক কথা বলছেন, যেমন – ভাবের ঘরে চুরি করতে নেই, ভাব পাকা কর, একটা ভাবকে অবলম্বন কর ইত্যাদি। বাস্তবিক শ্রীকৃষ্ণ বা বাস্তবিক শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদের কোন কাজে লাগবে না। বাস্তবিক শ্রীরামকৃষ্ণ কামারপুকুরে জন্ম নিয়েছিলেন, কাশীপুরে শরীর ত্যাগ করলেন, এই শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদের কোন কাজে আসবে না, কাজে লাগবে ভাবরূপী শ্রীরামকৃষ্ণ। শ্রীরামকৃষ্ণ যে ভাবের মূর্তরূপ সেই ভাবকে আমাদের জীবনে প্রতিফলিত করাটাই প্রধান কর্তব্য। সাধক কবি যখন ভাবপুরুষদের বর্ণনা করেন তখন তাতে কোন আর ঐতিহাসিক বর্ণনা থাকে না। যার জন্য দেখা যায় ঠাকুরকে নিয়ে এখন

পর্যন্ত যত কিছু লেখালেখি হয়েছে সবই ঐতিহাসিক বর্ণনা। একমাত্র শ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথিই ঠাকুরের একটু ভাব নিয়ে লেখা হয়েছে, কতটা সত্য কতটা ভাব নিয়ে লেখা হয়েছে ধরা খুব কঠিন। কিন্তু ঠাকুর যে ঘরে ঘরে ঢুকবেন এই ব্যাপারটা হতে এখনও সময় লাগবে, কারণ আমরা এখনও ঐতিহাসিক শ্রীরামকৃষ্ণকেই দেখছি। যতক্ষণ ঐতিহাসিক শ্রীরামকৃষ্ণ, ঐতিহাসিক বিবেকানন্দকে দেখা হবে ততক্ষণ ঠাকুর, স্বামীজী কখনই ঘরে ঘরে ঢুকবেন না। ভাগবত পুরানে শ্রীকৃষ্ণের যত বর্ণনা পাওয়া যায়, সবই শ্রীকৃষ্ণের ভাবরাজ্যের বর্ণনা। এখানে ঐতিহাসিক কিছুই নেই, ঐতিহাসিক শুধু এটুকুই আছে, লোককথায় শ্রীকৃষ্ণ দেবকী ও বসুদেবের গৃহে জন্ম গ্রহণ করেছেন। পরের ঐতিহাসিক ঘটনা আসবে, সেখান থেকে শ্রীকৃষ্ণ আরেকজনের বাড়িতে স্থানান্তরিত হয়ে গেছেন। তৃতীয় ঐতিহাসিক হবে, সেখান থেকে কোন কারণে তিনি আবার মথুরায় ফিরে এসেছেন। মাত্র তিন চারটে বাক্যে এই কয়েকটি ঐতিহাসিক ঘটনাকে পার করে দেওয়া যাবে। কিন্তু যাঁরা সাধক কবি তাঁরা ভাবের যোগানটা দিয়ে যাবেন। ভাবের এই যোগান যদি না থাকে তাহলে ভক্ত কোন দিন ভক্তি করতে পারবে না। ভক্ত যখন ভগবান বা তার ইষ্টের ধ্যান করে তখন ইষ্টের লীলা চিন্তন, রূপ চিন্তন আর গুণ চিন্তনই করে। ধ্যান যখনই হয় তখন এই তিনটে জিনিষের উপরই ধ্যান হয়। দীক্ষা নেওয়ার সময় গুরু শিষ্যকে ইষ্টের রূপটা বলে দেন। ইষ্টের রূপের উপর সাধনা করতে করতে সাধক এগোতে থাকে। ইষ্টের গুণ চিন্তন করার জন্য শাস্ত্রে কিছু কিছু ভগবানের তত্ত্ব বা গুণের বর্ণনা পাওয়া যায়। আর লীলা চিন্তনের জন্য এই ভাগবতাদি গ্রন্থ। অবতারের লীলার বর্ণনাতে ভাগবত হল শ্রেষ্ঠতম গ্রন্থ। মহাভারতে যেখানে শ্রীকৃষ্ণের ব্যাপারে কয়েকটি বাক্যে বলে দেওয়া হয়েছে, সেই কথাগুলোই কীভাবে পুরো একটা ভাবে পরিবর্তিত করে দেওয়া যেতে পারে, তারই প্রতিভা আমরা ভাগবতেই পাই। এই যে দেবকীকে কংস রথে করে নিয়ে যাচ্ছেন, আকাশবাণী হচ্ছে এগুলো সব ভাবরাজ্যের বর্ণনা। প্রকৃতপক্ষে আমাদের কারুরই ধ্যান হয় না, আমাদের জন্য তাই লীলা চিন্তন খুব গুরুত্বপূর্ণ।

যাই হোক আকাশবাণীতে কংস শুনতে পেল, তুমি যাকে এত খাতির করে নিয়ে যাচ্ছ, তারই অষ্টম সন্তান তোমাকে বধ করবে। কংসকে ভাগবত প্রথম থেকেই মহাপাপী বলে আসছে। পুরাণের বৈশিষ্ট্যই হল পুরাণ যাকে নায়ক বানাবে তার চরিত্রকে সব সময় সাদা রাখা হবে, আর যাকে খল নায়ক বানাবে তার চরিত্রকে সব সময় কালো রঙের বানাবে। তবে পূর্ণাঙ্গ সাহিত্য রচনা করতে হলে সাদার মধ্যে একটু কালোর ছিটা আর কালোর মধ্যে একটু সাদা ফোঁটা দিতে হবে। সেইজন্য পুরাণের কাহিনীকে পুরোপুরি আক্ষরিক অর্থে নিতে নেই। এখন কংসকে ক্রূর কীভাবে দেখতে হবে, একটা বাক্যে বলে দিলে তো হবে না, কংস যে মহাপাপী সেটাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। সেটাকে দেখাবার জন্য দেখানো হচ্ছে, তখনই কংস রথের গতিমুখ পরিবর্তন করে সোজা গারদে নিয়ে এসে দেবকীকে বন্দী করে বধ করবার জন্য উদ্যত হল।

প্রাণীর জন্মের সাথে তার মৃত্যুও জন্ম নেয়

বসুদেব খুব বুদ্ধিমান, আর তার সাথে সৎ ও ঋষিতুল্য পুরুষ ছিলেন। বসুদেব জানতেন কোন প্রকারে এই উপস্থিত কালটুকু পার করে দেওয়াটাই এখন আশু কর্তব্য। ঢিলেমি করার জন্য কংসকে বুঝিয়ে তিনি বলছেন ***মৃত্যুর্জন্মবতাং বীর দেহেন সহ জায়তে। অদ্য বাব্দশতান্তে বা মৃত্যুর্বৈ প্রাণিনাং ধ্রুবঃ।।১০/১/৩৮।*** 'যিনি জন্ম নেন তাঁর শরীরের সঙ্গেই তাঁর মৃত্যুও জন্ম নেয়। আজ হোক বা একশো বছর পরেই হোক প্রাণীমাত্রেরই মৃত্যু নিশ্চিত'। আপনি আমি যে জন্ম নিয়েছি, আমাদের মৃত্যুও কিন্তু আমাদের সাথে সাথেই এসেছে। কিন্তু আমরা মৃত্যুকে মেনে নিতে পারি না। যোগশাস্ত্রে এর কারণ খুব সুন্দর ভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। যোগশাস্ত্রে *অবিদ্যাহস্মিতারাগদ্বেষাভিনিবেশাঃ পঞ্চক্লেশাঃ* এই পাঁচটি ক্লেশজনক বিঘ্নের কথা বলা হয়। এর মধ্যে অভিনিবেশ মানে জীবনের প্রতি মমত্ব, জীবনকে ধরে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা। আমরা যে যতই বলি আমি মরে গেলেই ভাল, কিন্তু দুর্ভাগ্য এটাই যে আমরা কেউই মরতে চাইনা, যুধিষ্ঠির বলছেন পৃথিবীর সব থেকে আশ্চর্য হল আমরা সবাইকে মৃত্যুমুখে পতিত হতে দেখছি কিন্তু আমি মনে করছি আমার মৃত্যু হবে না, আসলে আমরা নিজের মৃত্যুর কথা ভাবতেই পারিনা। একটা ছোট্ট পিঁপড়েকেও মারতে যান সেও মরার আগে একটা মরণ কামড় দেবে। এই জগতের যা কিছু আছে প্রত্যেকেই এই অবিদ্যার কারণে মনে একেবারে দৃঢ় ভাবে গেঁথে রেখেছে যে আমি মরব না। যারা সাধক, যারা বিবেক বিচার করেন, যারা পণ্ডিত তারাও

অস্মিতাকে, অর্থাৎ আমি বোধটাকে ছেড়ে দেন, রাগ-দ্বেষকেও ছেড়ে দেন কিন্তু অভিনিবেশকে মানে বেঁচে থাকার ইচ্ছাকে ছাড়তে পারেন না। মানুষ নিজের সন্তানের মাধ্যমে বেঁচে থাকতে চায়, সেইজন্য সে চায় তার যেন সন্তান হোক। বড় বড় মন্দির করিয়ে নেয়, বা কোথাও কিছু দান করল তারপর পাথরে নিজের নাম খোদাই করে অমর হয়ে থাকতে চায়।

আসলে আকাশবাণী শোনার পর থেকেই কংসের মনে প্রচণ্ড ভয় ঢুকে গেছে। দুটো অবস্থায় মানুষ কাউকে আক্রমণ করে, এক যখন খুব ভয় পেয়ে যায় আর দুই রেগে গেল। আক্রমণ করার তৃতীয় কোন পরিস্থিতি হয় না। আমাদের সবার মস্তিষ্কে একটা ছোট্ট অংশ আছে যার বায়োলজিক্যাল নাম এ্যমিগডালা (Amygdala)। সরিসৃপ জাতীয় যত প্রাণী আছে ওদের মস্তিষ্ক মানেই এ্যমিগডালা, এ্যমিগডালা ছাড়া ওদের আর কিছু নেই। এ্যমিগডালা শুধু চারটে কাজ পারে, লড়াই করতে পারে, পালাতে পারে – তোমার সামনের শত্রু যদি দুর্বল হয় তাহলে তাকে আক্রমণ কর, শত্রু যদি তোমার থেকে বলশালী হয় তাহলে তার থেকে পালাও। তৃতীয় কাজ হল খাদ্য বাছাই করা, এটা আমার খাদ্য, এটা আমার খাদ্য নয়। আর চতুর্থ কাজ সন্তান উৎপাদন করা। এই চারটে কাজ ছাড়া এ্যমিগডালা আর কিছু করতে পারে না। প্রাণী যত উন্নত হতে থাকে তার মস্তিষ্কের এই এ্যমিগডালার আকারটা তত ছোট হতে থাকে। যত রকম নিম্ন যোনির প্রাণী আছে, বিশেষ করে সরীসৃপ জাতীয় প্রাণীর মধ্যে এ্যমিগডালা ছাড়া আর কিছু নেই, তাই এরা শুধু এই চারটে কাজই করতে পারে, লড়াই করতে পারে, পালাতে পারে, কোনটা তার খাদ্য বুঝতে পারে আর সন্তান উৎপাদন করতে পারে। ডিম থেকে যখন সাপের বাচ্চাগুলো বেরোতে থাকে, সাপের তো অত বুদ্ধি নেই, বাচ্চাগুলো কিলবিল করছে, সাপের মা ভাবছে এগুলো আমার শত্রু, তখনই সে নিজের বাচ্চাগুলোকে গপ্ গপ্ করে খেতে শুরু করে। ওখান থেকে যে দু চারটে পালিয়ে যায় তাতেই আমরা অস্থির হয়ে যাই, পুরো সাপ বেঁচে থাকলে সারা বিশ্বময় শুধু সাপেরাই রাজত্ব করত। কিন্তু যখন তাকে কোণঠাসা করে দেবেন, সে যতই ভয় পেয়ে থাকুক এবার কিন্তু ভয় তার থাকবে না, সব ভয় ক্রোধে পরিণত হয়। সেইজন্য দেখতে হয় কেউ যদি ভয় পেয়ে যায় আগে তার ভয়টাকে দূর করতে হবে আর তার রাগটা ঠাণ্ডা করে দিতে হবে।

বসুদেব কংসের সাথে ঠিক তাই করছেন 'হে বীর! সবারই জন্মের সঙ্গে মৃত্যুরও জন্ম হয়। তুমিও একদিন মরবে, আমিও একদিন মারা যাব। তুমি যে আকাশবাণী শুনে ভীত হয়েছ, এখানে ভীত হওয়ার তো কোন কারণ নেই, কারণ তোমার মৃত্যু আজ না হোক কাল হবে'। এখানে বলছেন *অদ্য বাব্দশতান্তে* হয় আজকে তা নাহলে একশ বছর পরে মরতে তো তোমাকে হবে, সবাইকেই মরতে হবে। এই জগতে যদি চিরন্তন বিধান বলে কিছু থাকে তাহলে তা হল মৃত্যু। একটাই ধ্রুব সত্য, গীতায় বলছেন *জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ*, যে জন্মেছে তাকে মরতে হবে। জগতের সব কিছু নিয়মের পরিবর্তন হতে পারে কিন্তু মৃত্যুর এই নিয়মের কখনই পরিবর্তন হবে না।

এই শ্লোকটি পড়লেই অবাক হয়ে যেতে হয় – জন্মের সঙ্গে মৃত্যুও জন্ম নিয়েছে। এটা খুব মজার ব্যাপার যে, কিছু দিন আগে মডার্ন বায়োলজিতে যাঁরা জেনেটিকস বিজ্ঞানী তাঁরাও বলতে শুরু করেছেন, যখন কোন সেল জন্ম নেয় তখন প্রত্যেকটি সেলের মধ্যে একটা বিশেষ জিন থাকে, বৈজ্ঞানিক পরিভাষাতে যাকে টেলেরোম বলা হচ্ছে। টেলেরোমের একটা নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্য আছে। এর কাজ হল আয়ু মাপা। সময়ের সাথে সাথে ওর ওই দৈর্ঘ্যের মাপটা ছোট হতে থাকে। সময়ের সাথে সাথে টেলেরোমের আকারটা যেমন যেমন ছোট হতে থাকে ঠিক সেই অনুপাতে মানুষের আয়ুও কমতে থাকে। যে মুহূর্তে জিরোতে এসে গেল তক্ষুণি সে মরে যাবে। এই একটা সেল মরে গেলে সব কটা সেল মরে যাবে। মজার জিনিষ হল, যখন শরীরের জন্ম হয় তখন ঐ জিনটারও জন্ম হয়। শুরুতে যে সেল ছিল তার যে মাপ ছিল, ধরুন এক আঙুল ছিল সেটা এতদিনে অর্ধেক আঙুল হয়ে গেছে, এখন শরীরে নতুন যে সেল জন্ম নেবে সেটাও অর্ধেক আঙুল নিয়ে জন্ম নেবে। তারপর অর্ধেক আঙুল থেকে আরো ছোট হয়ে সিকি ভাগ হয়ে গেল, তখন যে নতুন সেল জন্ম নেবে তার সাইজও সিকি ভাগ হবে। আর যখনই ঐ জিনটা জিরোতে পৌঁছে যাবে তখনই মানুষ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বে। শুধু মানুষই নয়, প্রত্যেক প্রাণীরই এই ভাবে মৃত্যু হবে। টাইম বোমায় যেমন টাইমারটা টিক্ টিক্ টিক্ টিক্ করে

সময় কমতে থাকে, প্রাণীর মৃত্যুর ক্ষেত্রে বাস্তবে ঠিক তাই হয়। পরীক্ষাতে হাতেনাতে প্রমাণিত হয়ে গেছে। তবে টেলেরোমের দৈর্ঘ্যটা প্রত্যেক প্রাণীর আলাদা থাকে। আরও মজার যে, আমাদের শরীরের যেমন সব সেল গুলির রক্ষণা-বেক্ষণ হচ্ছে, কিন্তু টেলেরোম এমন একটা জিন যে আপনা থেকেই কমতে থাকে, এর রক্ষণা-বেক্ষণ করার কিছু নেই। এর কাজই হল আয়ু মাপা। সেইজন্য এখনকার জেনেটিকস বিজ্ঞানীরা আমাদের কোন সেলকে বার করে বলে দিতে পারবেন আমাদের আর কত দিন আয়ু আছে। দুর্ঘটনায় মারা যাওয়া বা খুন করে কাউকে মেরে ফেলাটা আলাদা।

বসুদেব এটাই বলছেন, তখনকার দিনের লোকেরা তাঁদের সহজাত জ্ঞান থেকে স্বতঃস্ফুর্ত ভাবে বলেছেন। এনাদের ফিজিক্সের কথা, বায়োলজির কথা জিজ্ঞেস করুন তাঁরা বলবেন আমরা অত কিছু জানিনা, কিন্তু এখানে ওনারা সোজাসুজি বলে দিলেন শরীরের জন্মের সাথে মৃত্যুও জন্ম নেয়। আজকের দিনে মলিক্যুলার বায়োলজির বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করলেন যে হ্যাঁ, প্রাণী যখন জন্ম নেয়, তখনই তার জিনের মধ্যে একটা সেলও জন্ম নেয়, আর তার যে নির্দিষ্ট একটা মাপ থাকে সেই মাপটা কমতে থাকে। কিন্তু সবচেয়ে মজার ব্যাপার হল কমার হারটা সবার ক্ষেত্রে এক রকম হবে না। মনে করুন ঐ জিনটা এক মিটার লম্বা, প্রথম বছরে এক সেন্টিমিটার করে কমছে। এই হারে কমলে আমাদের সবার একশ বছর আয়ু হওয়ার কথা। কখন কখন এমনও হতে পারে কোন বছরে পাঁচ সেন্টিমিটার কমে যাবে, আবার কখন কখন এমনও হবে পাঁচ বছরে এক সেন্টিমিটার কমবে। মানুষ যদি উপোসাদি করে তাহলে কমার হারটা ধীর গতিতে হবে। আবার যে খুব আনন্দে থাকে, অনেক বন্ধু বান্ধব আছে, তারও কমার হার ধীর গতিতে হবে। যাদের আবার কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ আর সব সময় উদ্বেগের মধ্যে থাকে তাদের কমার হার খুব দ্রুত গতিতে চলবে। ভোগের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। কেননা চার্চিল অনেক বছর বেঁচেছিলেন, তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে আপনার এত বয়স হয়ে গেছে কিন্তু আপনার শরীর এত ফিট থাকার রহস্যটা কি। চার্চিল খুব বিখ্যাত একটা উক্তি করেছিলেন, তিনি বলছেন – আমি যখন ছোট ছিলাম তখন ডাক্তাররা আমাকে বলেছিল মদ খাবে না আর সিগারেট খাবে না, তাহলে তোমার শরীর ভালো থাকবে, আমি ডাক্তারদের কথা শুনিনি সেইজন্য এত ফিট আছি। চার্চিল মদ খেতেন আর প্রচুর ধূমপান করতেন। এর সঙ্গে তাই ভোগের কোন সম্পর্ক নেই। এর কমার হারটা নির্ধারিত হয় আমাদের মনের আবেগের উপর। আমরা যে বলি তোমার মৃত্যু এগিয়ে আসছে, এটা কোন কথার কথা নয়, সত্যিই আমাদের সবারই মৃত্যু ঠিক এইভাবেই এগিয়ে আসছে। টেলেরোমের কমার গতিটা একটু ধীরে করতে পারি কিন্তু কমাটা বন্ধ কোন দিন হবে না। মূল কথা হল – জন্মের সঙ্গে মৃত্যুও জন্ম নেয়, Birth certificateএর সাথে ভগবান Death certificateটাও পাঠিয়ে দেন। বর্তমান যুগের বিজ্ঞানীরা যাকে বলছেন – physical basis of death, তাকেই ভাগবতে বলছেন spiritual basis of death। আমরা আবার বিজ্ঞানীদের থেকে এক ধাপ আগে চলি, পরীক্ষিতের মৃত্যুকেও আমাদের হিসাবের মধ্যে নিয়ে আসি, অপঘাতে মৃত্যুকেও আমরা এর মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছি। ঢুকিয়ে দিয়ে বলছি – তোমার যখন জন্ম হয়েছে তখন তোমার মৃত্যুটাও একই সঙ্গে নির্ধারিত হয়ে এসেছে। বিজ্ঞানীরা শুধু এর একটা দিককে নিয়ে এসেছে, আমরা বাকি যত factor আছে সবটাকে মিলিয়েই বলছি। কখনও কেন তাড়াতাড়ি কমছে, আবার কখনও কেন আস্তে আস্তে কমছে, এগুলোকে তারা এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। আবার অনেকে বলবেন তোমার কর্মের উপর নির্ভর করে এর কমা বাড়ার হার নির্ধারিত হয়। কিন্তু জন্ম-মৃত্যুকে নিয়ে আলোচনা করা আমাদের কাজ নয়, আমাদের কাজ হল এই মনুষ্য জীবনকে কীভাবে সার্থক করা যায় আর জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে কীভাবে বেরিয়ে আসা যায়।

জীবাত্মার নতুন শরীর আশ্রয় নেওয়ার ব্যাপারে ভাগবতের মত

বসুদেব কংসকে জীবের মৃত্যু সম্পর্কিত আরেকটি মতের কথা বলছেন ***ব্রজংস্তিষ্ঠন্ পদৈকেন যথৈবৈকেন গচ্ছতি। যথা তৃণজলৌকৈবং দেহী কর্মগতিং গতঃ।।১০/১/৪০।*** মানুষ চলার সময় একটি পা জমিতে ঠিকমত রেখে তবেই অপর পা উত্তোলন করে অথবা জোঁক যেমন তার সামনের অংশটা এগিয়ে দিয়ে একটা আশ্রয় নিয়ে পেছনের আশ্রয়টা ছেড়ে দেয়, ঠিক তেমনি জীবাত্মার যখন শরীর ছেড়ে দেওয়ার সময় হয়

তখন আরেকটা আশ্রয় অর্থাৎ জীব নিজ কর্মানুসারে নতুন কোন দেহ ধারণ করে পূর্বের শরীরটা ছেড়ে দেয়। সেই দেহ যে সব সময় স্থূল শরীর হবে তা নয়, প্রেতাত্মাও হতে পারে বা দেব শরীর বা বায়ু শরীরও হতে পারে, অর্থাৎ কোন একটা শরীর ধারণ করে নেয়, শুধু বাতাস হয়ে থাকে তা নয়। তাই জোঁকের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে – *জলৌপবৎ*, যেমন জোঁক আগে সামনের জমিটা ধরে নিয়ে তারপর পেছনের আশ্রয়টা ছাড়ে। ছান্দোগ্য উপনিষদেও ঠিক এই ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু গীতাতে অন্য ভাবে বলছেন *বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ*, বায়ু যেমন গন্ধকে বহন করে নিয়ে যায় ঠিক তেমনি জীবাত্মা আমাদের শরীরের তন্মাত্রাগুলো, মানে বুদ্ধিবৃত্তি বা সংস্কারগুলিকে নিয়ে শরীর থেকে বেরিয়ে যায়, তারপর একটা অন্য শরীরকে আশ্রয় করে। এই দুটো মত আমাদের শাস্ত্রে পাওয়া যায়। একটা মতে আমরা যে রকম কর্ম করেছি সেই কর্মানুসারে একটা শরীর এমনিতে তৈরী হয়েই যায়। সেই শরীর স্বর্গের দেবতাদের শরীর হতে পারে, কিন্তু মূল কথা হল জীবাত্মা কখন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে না। ভাগবত এখানে বলছে জীবাত্মা আগে একটা শরীর না ধরা পর্যন্ত বর্তমান শরীরটাকে ছাড়বে না। পাখি একটা ডাল থেকে উড়ে আরেকটা ডালে গিয়ে বসবে। জীবাত্মার ক্ষেত্রে তা হয় না, জীবাত্মা সব সময় আগে একটা শরীর ধরে নেয়। বৃদ্ধাবস্থায় শরীর জীর্ণ হয়ে গেছে, বিছানায় নিস্তেজ অসার হয়ে পড়ে আছে, তবুও মরতে চায় না, পড়েই আছে, হয়তো কোমাতেই দিনের পর দিন পড়ে আছে, শরীর ছাড়ছেই না। ভাগবতেই এর কারণটা বলে দিচ্ছে, জীবাত্মা ঠিক করতে পারছে না কোন শরীরটা নেবে। কিন্তু এর আগের শ্লোকেই বসুদেব বলছেন ***দেহে পঞ্চত্বমাপন্নে দেহী কর্মানুগোঽবশঃ। দেহান্তরমনুপ্রাপ্য প্রাক্তনং ত্যজতে বপুঃ।।১০/১/৩৯।*** দেহের বিনাশের সময় হলে জীব নিজের কর্মানুসারে নতুন শরীর গ্রহণ করে আর আগের শরীরটা ছেড়ে দেয়, এই ব্যাপারে জীবের কোন স্বাধীনতা নেই। কর্ম তাকে টেনে নিয়ে চলে যায়।

জাগ্রত ও স্বপ্ন – বেদান্ত ও ভাগবতের দৃষ্টিভঙ্গীর সমন্বয়

বসুদেব কংসকে বিরাট লম্বা ভাষণ দিয়ে যাচ্ছেন। এরকমটি করো না ভাই, সবাই নিজের কর্মের নিয়মে চলছে। অনেক রকম ভাবে কংসকে বসুদেব বোঝাতে চেষ্টা করলেন, নানা রকমের ভয়, ভেদনীতি অবলম্বন করলেন যাতে তার বুদ্ধিভেদ হয়ে যায়, কিন্তু কংস নিজের অবস্থা থেকে কিছুতেই নড়বে না। বসুদেব দেখলেন এখন একটা বিপদ এসেছে। বিপদের ক্ষেত্রে যেটা করা উচিত, তা হল যতটা পারা যায় বিপদের সময়টাকে দূরে ঠেলে দেওয়া। যেমন বলে *'শুভস্য শীঘ্রম্ অশুভস্য কালহরণম্'*। বসুদেবও যথারীতি সময়কে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছেন। অনেক কথা বলার পর এবার তিনি স্বপ্নের ব্যাপার নিয়ে এসে কংসকে বলছেন ***স্বপ্নে যথা পশ্যতি দেহমীদৃশং মনোরথেনাভিনিবিষ্টচেতনঃ। দৃষ্টশ্রুতাভ্যাং মনসানুচিন্তয়ন্ প্রপদ্যতে তৎ কিমপি হ্যপস্মৃতিঃ।। ১০/১/৪১।*** স্বপ্নে আমরা অনেক কিছু দেখি, কখন ভালো কিছু দেখছি আবার কখন খারাপ কিছু হতে দেখছি। যতক্ষণ স্বপ্নের মধ্যে থাকি ততক্ষণ আমরা স্বপ্নের মধ্যে একাত্ম হয়ে যাই, স্বপ্নের মধ্যেই হাসছি, স্বপ্নের মধ্যেই কাঁদছি। এমন একাত্ম হয়ে যাই যে স্বপ্নাবস্থায় স্বপ্নের দৃশ্য গুলি সত্য মনে হয়।

যোগশাস্ত্রে বলছে *প্রমাণ-বিপর্যয়-বিকল্প-নিদ্রা-স্মৃতয়ঃ* আমাদের মনে সব সময় এই পাঁচ ধরনের বৃত্তির খেলা চলতে থাকে। প্রমাণ মানে right knowledge, ইন্দ্রিয় দিয়ে যা কিছু জানছি, দেখছি, শাস্ত্রের কথা পড়ে এবং গুরুর মুখে শুনে যে জ্ঞান হচ্ছে, এরপর সব কিছুকে আমি যেভাবে যুক্তি দিয়ে দাঁড় করাচ্ছি, সবটাই প্রমাণের মধ্যে আসছে। প্রমাণ আমাদের কাছে যতটা সত্য স্বপ্ন ততটাই সত্য আর স্মৃতিও ততটাই সত্য। আমাদের মন যখন এই পাঁচটি বৃত্তির যে কোন একটি বৃত্তির রূপ নেবে তখন ওটাই সত্য বলে মনে হবে। যে মন দিয়ে আমরা বিজ্ঞানকে জানছি সেই মন দিয়েই আমরা ধর্মকেও জানছি। ধর্ম যদি মনের ভুল হয় তাহলে তোমার বিজ্ঞানটাও মনের ভ্রান্তি। তাই স্বপ্ন যদি মিথ্যা হয় তাহলে জাগ্রত অবস্থাটাও মিথ্যা। মাণ্ডুক্যকারিকাতে ঠিক এই কথাই বলা হয়েছে। ব্যাপারটা খুবই সহজ ও সরল যুক্তি। আমরা যা কিছু দেখছি, এই মাইক্রোফোন, এই বোতল সব কোথায় দেখছি? আমি বোতল দেখছি এর অর্থটা কি? আমি কি বোতলটা বাইরে দেখছি, নাকি ভেতরে দেখছি? এই বোতলের ছবি আলোর মাধ্যমে আমার চোখের উপর পড়ছে, চোখের স্নায়ু সেই ছবিকে বহন করে আমার মস্তিষ্কে পাঠিয়ে দিচ্ছে। মস্তিষ্কে এসে বোতলের একটা ইমেজ তৈরী হচ্ছে, এরপর আমার

আগের আগের যে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা আছে তার সাথে মিলিয়ে মিলিয়ে আমি দেখছি এখানে একটা বোতল রয়েছে। কিন্তু যা কিছু হওয়ার সব আমার ভেতরেই হচ্ছে। অথচ জিনিষটাকে দেখছি বাইরে। এই যে বোতল থেকে আমার চোখের দূরত্ব, বোতলের সাইজ, বোতলের রঙ যা কিছু দেখছি সবই আমার মস্তিষ্কের ভেতরেই হচ্ছে, অথচ আমি বোতলকে দেখছি বাইরে। এটাই আজব ব্যাপার।

এই ব্যাপারটা আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে আমাদের যোগশাস্ত্র বুঝে নিয়ে সূত্রে লিপিবদ্ধ করে দিয়েছে, বোঝার ব্যাপারটা আরও আগে হয়ে গেছে। আর পাশ্চাত্য বিজ্ঞান সবে এগুলোতে ঢুকতে শুরু করেছে। শুধু তাই নয়, আমাদের মস্তিষ্কে জাগ্রত অবস্থায় যা কিছু হচ্ছে স্বপ্নের অবস্থাতে ঠিক একই জিনিষ আসছে, নতুন কিছু আসছে না। স্বপ্নে মস্তিষ্কে যে আলাদা কোন পর্দা আসছে, মস্তিষ্কের কোন স্নায়ু বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, এসব কিছুই হচ্ছে না, একই জিনিষ হয়ে চলেছে। জাগ্রত অবস্থায় যে নিউরোন কাজ করছে, স্বপ্নাবস্থায় সেই একই নিউরোন কাজ করছে। অথচ আমরা সবাই বলছি স্বপ্নটা মিথ্যা, কিন্তু স্বপ্নকে যে মস্তিষ্ক দিয়ে জানছি, জাগ্রতেও তো সেই একই মস্তিষ্ক দিয়ে জানছি। এগুলোকে বেশী বিশ্লেষণ করলে আর সংসার ধর্ম করা যাবে না, এগুলো তাই সন্ন্যাসীদের ধর্ম। অথচ খুবই সহজ যুক্তি, একবার একটু বোঝার চেষ্টা করলেই জাগ্রত আর স্বপ্নের মধ্যে কোন তফাৎ আছে কি নেই পরিষ্কার হয়ে যাবে। বাজারে কোন সব্জীওয়ালার কাছে আমি আলু কিনতে গেছি, আমি জানি সব্জীওয়ালার এক কিলোর বাটখারাটা ন'শ গ্রামের। এখানে এমন তো কখনই হবে না যে, যখন আলুর ওজন করবে সেটা ন'শ গ্রাম হবে আর পটল ওজন করার সময় এক কিলো হয়ে যাবে! আলু আর পটল দুটো ক্ষেত্রে ন'শ গ্রাম ওজনই হবে। গোলমেলে বাটখারা মানে কোন সময়ই সঠিক ওজন পাওয়া যাবে না। আমাদের মস্তিষ্কও যদি গোলমেলে হয় তখন দুটো ক্ষেত্রেই ভুল দেখাবে। একটা জায়গায় ঠিক আরেকটা জায়গায় বেঠিক দেখাবে না। স্বপ্ন যদি মিথ্যা হয়, স্মৃতি যদি কল্পনা হয়, বিপর্যয় যদি কল্পনা হয় তাহলে জাগ্রতটা কি করে কল্পনা না হয়ে সত্য হয়ে যাবে! কারণ স্বপ্ন, স্মৃতি, বিপর্যয়, জাগ্রত ইত্যাদি সবই তো এই মন দিয়েই হচ্ছে। এটাই বেদান্তের মৌলিক সিদ্ধান্ত, এখান থেকেই বেদান্তের দুঃসাহসিক অভিযান শুরু হয়।

বেদান্ত প্রথমেই বলবে তুমি তোমার মনকে আগে ভালো করে বিশ্লেষণ কর। অথচ আজ থেকে কয়েক হাজার বছর আগে নিউরোনের কোন ধারণাই ছিল না। আমাদের পূর্বজরা কত গভীর ভাবে চিন্তা করে জিনিষটাকে সহজ যুক্তি দিয়ে দাঁড় করিয়ে দিলেন যে, বিপর্যয় বিকল্প যদি মিথ্যা হয়, তাহলে স্বপ্নটাও মিথ্যা, স্বপ্ন যদি মিথ্যা হয় তাহলে স্মৃতিও মিথ্যা, স্মৃতি যদি মিথ্যা হয় তাহলে প্রমাণটাও মিথ্যা। প্রমাণকে আবার তিনটে ভাগে বিভক্ত করা হয়, প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ প্রমাণ। প্রত্যক্ষ মানে পাঁচটা ইন্দ্রিয় দিয়ে যা কিছু জানছি, অনুমান হল যুক্তি আর শব্দ প্রমাণ মানে শাস্ত্র। তাহলে বিশ্লেষণের চরম অবস্থায় যখন বুক ফাটা অবস্থায় চলে যাবে তখন দেখবে স্বপ্ন যতটা মিথ্যা, কল্পনা যতটা মিথ্যা, জাগ্রত ততটাই মিথ্যা, বেদ ততটাই মিথ্যা। আসলে এটাই একমাত্র সত্য, সেইজন্য শাস্ত্র বলছে *তত্র বেদা অবেদা ভবতি*, ওই জায়গায় গিয়ে বেদের আর কোন মূল্য থাকে না। তখন কথামৃতও উড়ে যাবে, সব কিছুকেই উড়ে যেতে হবে।

যোগশাস্ত্র যেমন জাগ্রত স্বপ্নের ব্যাপারকে সরাসরি আমাদের সামনে নিয়ে আসবে, ভাগবতও ঠিক একই কথা বলবে কিন্তু যেহেতু ভক্তিশাস্ত্র তাই একটু মিষ্টি মিষ্টি করে কাহিনীর মাধ্যমে আমাদের সামনে এগুলোকে তুলে ধরবে। এখানে বসুদেব কংসকে একই কথা বলছেন, তবে একটু অন্য ভাবে। মানুষ যখন স্বপ্ন দেখে তখন সে তার সাথে একাত্ম হয়ে যায়, ঠিক তেমনি জাগ্রত অবস্থায় যখন মানুষ কোন কিছুর চিন্তা করে তখন চিন্তা করতে করতে তার শরীর ও পারিপার্শ্বিক সব কিছুর বোধ চলে গিয়ে সেই চিন্তার মধ্যে হারিয়ে যায়। ঠিক তেমনি জীব কর্মকৃত কামনা এবং কামনাকৃত কর্মের বশে দেহান্তরে গিয়ে নিজের পূর্বের শরীরের কথা ভুলে যায়। স্বামীজী পুনর্জন্ম নিয়ে অনেক কথাই বলেছেন, ঠাকুর কিন্তু সেই তুলনায় পুনর্জন্ম নিয়ে খুব বেশী কথা বলেননি। হিন্দু ধর্ম আর পুনর্জন্ম এই দুটোকে কখন আলাদা করা যায় না। পুনর্জন্মের বিরুদ্ধে বড় যুক্তি হল, পুনর্জন্ম যদি থাকে তাহলে আগের জন্মের কথা আমরা কেউ মনে রাখতে পারি না কেন।

ভর্জিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মনস্তাত্ত্বিক দর্শনের অধ্যাপক ইয়ান স্টিভেনসন পুনর্জন্মের উপর অনেক case study করেছিলেন। বাচ্চারা তাদের পূর্ব জন্মের কথা কীভাবে মনে রাখে আর পাঁচ-ছয় বছর হতে হতে কীভাবে তারা পূর্ব জন্মের কথা ভুলে যায় এর উপর ওনার প্রচুর case study আছে। আমরাও আমাদের বাচ্চা বয়সের কোন কিছুই মনে রাখাতে পারি না, কিন্তু ওই বাচ্চা বয়স থেকেই আমাদের একটা সংস্কার তৈরী হয়ে গেছে। আর মাঝে মাঝে আমাদের মনের মধ্যে হঠাৎ একটা চিন্তন ভেসে ওঠে। কেন ভেসে ওঠে? কারণ আমরা আমাদের বর্তমান শরীরের সাথে, আমাদের পারিপার্শ্বিকতার সাথে গভীর ভাবে জড়িয়ে আছি। এরপর আবার যখন আমরা আরেকটা শরীরের চলে যাবো তখন ওই শরীর আর ওই পারিপার্শ্বিকতার সাথে এতো গভীর ভাবে জড়িয়ে যাব যে, আমাদের আগের শরীরের কথা, আগের পারিপার্শ্বিক অবস্থার কথা ধীরে ধীরে ভুলে যাই। কিন্তু মাঝে মাঝে কিছু কিছু স্মৃতির ঝলক ভেসে ওঠে। তবে এই স্মৃতি এত ক্ষণিকের জন্য ভেসে ওঠে যে আমরা ধরতেও পারি না। এইভাবে প্রত্যেক মানুষের মনে তার পূর্ব পূর্ব জন্মের স্মৃতি ফিরে আসে, কিন্তু খুব আবছা আর ক্ষণিকের জন্য আসে বলে আমরা ধরতে পারি না। কিন্তু সংস্কার গুল পুরো দমে আসবে। একজন দুষ্ট, একজন ভালো, একজন ত্যাগী, একজন ভোগী এই ব্যাপার গুলো জন্ম জন্ম ধরে চলে আসছে।

সেইজন্য বলা হয় ঈশ্বরের কাছে নিজের ব্যক্তিত্বের সুষম বিকাশের জন্যই প্রার্থনা করতে হয়। কিন্তু আমাদের সমস্ত প্রার্থনা জাগতিক কামনার চাহিদা পূরণের একটা বিরাট লম্বা তালিকা। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা সব সময় করতে হয় ত্যাগ বৈরাগ্যের জন্য। কারণ আমাদের বাস্তবিক স্বরূপ হলেন শুদ্ধ আত্মা, সেই শুদ্ধ আত্মা সংসারের মাঝখানে এসে জগতের চাকচিক্য দেখছে। এই চাকচিক্য দেখতে গিয়ে কখন কষ্ট পাচ্ছে, কখন মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছে। আমাদের যত দুঃখ-কষ্ট, তার মূলে কিন্তু কামনা-বাসনা। এটা আবার মজার ব্যাপার যে, যারা ঘোর বিষয়ী, যারা ভোগের মধ্যে গলা পর্যন্ত ডুবে আছে তাদের কষ্ট অনেক কম হয়, কিন্তু যারা সাধন পথে থাকে তাদের কষ্টটা অনেক বেশী। সাধক মানে, সে এবার রাজধানী এ্যক্সপ্রেসের আরোহী হয়ে গেছে, রাজধানী ট্রেনের স্টেশন গুলো খুব তাড়াতাড়ি আসে। মালগাড়ী যাচ্ছে তো যাচ্ছেই, যেখানে দাঁড়িয়ে পড়ছে সেখানেই ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকছে। কখন একটা গভীর জঙ্গলের মধ্যে দাঁড়িয়ে পড়ল, কখন বড় স্টেশনের আউটারে থেমে থাকছে। ভোগীরাও যখন দুঃখ-কষ্টের মধ্যে পড়ে তখন সেখানেই দু-বছর, দশ বছর পড়েই থাকে, আবার যখন সুখের মধ্যে পড়ে তখন সেখানেও টানা অনেক বছর সুখের মধ্যে দিয়ে চলতে থাকে। ভোগীরা মালগাড়ীর মত একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে। কিন্তু যারা সাধক তাদের ক্ষেত্রে সুখটাও ঝট ঝট করে আসে আবার চলে যায়, দুঃখটাও ঝট ঝট করে আসে আবার চলে যায়। সন্ন্যাসীদের তো এই ব্যাপারটা প্রচণ্ড গতিতে আসে আর যায়। সন্ন্যাসীর যদি একই অবস্থা ভাবে অনেক দিন চলতে থাকে তাহলে বুঝতে হবে তাঁর সাধনায় কিছু গোলমাল আছে। স্বামী যতীশ্বরানন্দজীর খুব বিখ্যাত 'ধ্যান ও আধ্যাত্মিক জীবন' বইতে এক জায়গায় বলছেন if everything is going well with your life then there is something wrong with your spiritual joyrney। যদি দেখা যায় তোমার জীবনে সব কিছু ভালো ভাবে চলছে তাহলে বুঝতে হবে তোমার আধ্যাত্মিক জীবনে কিছু গোলমাল আছে। তাই আধ্যাত্মিক সাধকদের বলা হয় তোমার যে যে জিনিষের প্রতি আকর্ষণ আছে, জাগতিক কোন কিছুকে খুব ভালো লাগছে, কোন ব্যক্তির প্রতি আকর্ষণ, টাকা-পয়সার প্রতি লোভ, নাম-যশের আকাঙ্খা আছে, তুমি ঠাকুরের কাছে মাথা ঠুকে ঠুকে প্রার্থনা কর এই ভালা লাগা, লোভ, আকর্ষণ, আকাঙ্খা যেন আমার মনে থেকে বিদায় নেয়। ঠাকুর এই প্রার্থনা শোনেন। কারণ এটাই তো ঠাকুরের ভাব, আত্মার তো এটাই স্বরূপ। আত্মা যে এই জগৎকে ধরে রেখেছে, এই জগৎ আর আত্মার মধ্যে কোন মিল নেই, দুটোই বিপরীত ধর্মী। যেমনি প্রার্থনা করা হল তেমনি আত্মা আস্তে আস্তে এই জগৎকে ছেড়ে দেয়। যাদের মধ্যে প্রচুর ক্রোধ আছে, তারা যদি প্রার্থনা করে বলে, হে ঠাকুর! আমার ক্রোধটা যেন চলে যায়। তার ক্রোধটা কিন্তু এবার চলে যেতে শুরু করবে।

সনাতন সত্যই দৈনন্দিন জীবনের মূল্যবোধের ভিত্তি

বসুদেব কংসকে এই কথাই এখানে বলছেন – যখনই কারুর মনে প্রচণ্ড কামনা-বাসনা আসে, আমার এই হোক, সেই হোক, তখনই ধীরে ধীরে তার কাঙ্খিত বিষয়গুলোই এসে পড়ে আর তার শরীরটাও সেই

রকমই হয়ে যায়। বসুদেব কংসকে বুঝিয়ে যাচ্ছেন। এত কথা বলার পর বসুদেব বলছেন ***তস্মান্ন কস্যচিদ্ দ্রোহমাচরেৎ স তথাবিধঃ। আত্মনঃ ক্ষেমমন্বিচ্ছন্ দ্রোগ্ধুর্বৈ পরতো ভয়ম্।।১০/১/৪৪।*** এটাই জগতের নিয়ম, যে ব্যক্তি নিজের মঙ্গল কামনা করে তার কখনই কারুর প্রতি দ্রোহ ভাব রাখতে নেই। আমি আমার প্রারব্ধ কর্মবশতঃ কিছু করছি, অন্যজন তার প্রারব্ধ কর্মবশতঃ অন্য কিছু করছে, তাই বুদ্ধিমান পুরুষরা কারুর প্রতি বৈর ভাব রেখে কোন কাজ করেন না। *আত্মনঃ ক্ষেমমন্বিচ্ছন্ দ্রোগ্ধুর্বৈ পরতো ভয়ম্,* যারা দ্রোহ আর ভয় বশতঃ কর্ম করে তারা ইহজীবনেও কষ্ট পায়, পরলোকেও কষ্ট পায় আর শত্রুর কথা ভেবে ভয়ে ভয়ে থাকে।

ভারতের মূল্যবোধের চিন্তা-ভাবনার সাথে বিশ্বের সমস্ত ধর্মের মূল্যবোধের চিন্তা-ভাবনাকে যদি বিচার করা হয় তাহলে দেখা যাবে সব জায়গাতে একই মৌলিক চিন্তা-ভাবনা কাজ করছে। এই যে আমাদের খুব সনাতন মূল্যবোধে বলা হয় *বসুধৈব কুটুম্বকম্,* সারা বিশ্বই তোমার পরিবার। কেন বলছেন সারা বিশ্ব তোমার পরিবার, আমরা তো জানি আমি আলাদা, ওরা আলাদা? কারণ আমাদের কাছে আত্মা ছাড়া কিছু নেই। এই বিশ্বে যা কিছু দেখছি সবই তাঁর বিভিন্ন রূপ। আমার দুর্ভাগ্য যে আমি এক দেখতে পারছি না। যদি তাত্ত্বিক ভাবে আমরা মেনে নিই আত্মা ছাড়া কিছু নেই, তখন স্বাভাবিক ভাবেই সারা বিশ্বকে একটি পরিবার বলেই মেনে নিতে হবে। তখন কারুর প্রতি হিংসার ভাব, দ্রোহ ভাব থাকবে না, কারুর প্রতি কম ভালোবাসা বা বেশী ভালোবাসা আসবে না। আত্মা ছাড়া কিছু নেই এটাই চরম সত্য। এই চরম সত্যই আমাদের দৈনন্দিন জীবনে মূল্যবোধ হয়ে আসে। ওই চরম সত্যকেই মূল্যবোধের মাধ্যমে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে পরিবেশন করা হয়। যেমন আমাদের মূল্যবোধের শিক্ষা দিতে গিয়ে বলা হয় ‘সদা সত্য কথা বলিবে’। কেন সত্য কথা বলতে হবে? কারণ মিথ্যা কথা বলা মানে কাউকে ঠকানো, কাউকে বোকা বানানো। যদি ঠাকুরের অশেষ কৃপায় কারুর মন উন্নত হয়ে গিয়ে সে যদি দেখে সবাই সেই ভগবান, তখন কি সে কাউকে বোকা বানাতে চাইবে? আমি কি ঠাকুরের কাছে গিয়ে মিথ্যা কথা কখন বলতে পারব? পরম সত্য এভাবেই মূল্যবোধের মাধ্যমে পরিবেশন করে আমাদের দৈনন্দিন জীবন যাত্রার পথকে সুগম করে লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। পরম সত্য আর মূল্যবোধ সব সময়ই এক। একটা হয় মৌলিক সিদ্ধান্ত আর সেই মৌলিক সিদ্ধান্তের আবার কিছু অনুসিদ্ধান্ত হয়। মৌলিক সিদ্ধান্ত হল আত্মাই আছেন, ঈশ্বর ছাড়া কিছু নেই। এই মৌলিক সিদ্ধান্তের অনুসিদ্ধান্ত হল কাউকে দ্রোহ করবে না, মিথ্যা কথা বলবে না, কোন কিছুর জন্য শোক করো না, যেটা তোমার কাছে নেই সেটার জন্য লোভ করো না ইত্যাদি। বসুদেব এখানে আত্মতত্ত্ব নিয়ে কিছু বলছেন না, তিনি শুধু জীবের ধর্ম নিয়ে বলে যাচ্ছেন। বসুদেব কংসকে ওই পরম সত্যের অনুসিদ্ধান্তের কথাই বলে যাচ্ছেন। এই অনুসিদ্ধান্ত অনুযায়ী বসুদেব বলছেন – আপনি এই রকম করবেন না, কারণ সংস্কার আপনাকে টেনে নিয়ে চলে যাবে। এইসব বলার পর বলছেন – আপনার বয়স কম, সবে দেবকীর বিবাহ হয়েছে, দেবকীর শরীরে এখনও সব মঙ্গল চিহ্নগুলো রয়েছে।

বুদ্ধিমান বুদ্ধি দ্বারা মৃত্যুকে সব সময় পিছিয়ে দেয়

এত ভাবে বোঝাবার পরেও কংস কিন্তু মানছে না। শুকদেব এখানে খুব সুন্দর কথা বলছেন। আটচল্লিশ নম্বর শ্লোকটি খুব মজার। বলছেন ***মৃত্যুর্বুদ্ধিমতাপোহ্যো যাবদ্বুদ্ধিবলোদয়ম্। যদ্যসৌ ন নিবর্তেত নাপরাধোঽস্তি দেহিনঃ।।১০/১/৪৮।*** যারা বুদ্ধিমান পুরুষ, যতক্ষণ তাদের বুদ্ধি সক্রিয় আর শারীরিক ও মানসিক শক্তি সহায় থাকে, ততক্ষণ তাদের উচিত মৃত্যুকে যতটা পারা যায় দূরে ঠেলে দেওয়ার চেষ্টা করা। যত রকম ভাবে পারো মৃত্যুকে সরাতে থাকো, শেষ বিন্দু পর্যন্ত বুদ্ধিকে প্রয়োগ করে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা করা উচিৎ। ভাগবত হল মোক্ষশাস্ত্র, কিন্তু জীবনকে এনারা অত্যন্ত মূল্য দেন। তার কারণ হল, আমরা এই দুর্লভ মনুষ্য জীবন পেয়েছি, মৃত্যুর পর কি সংস্কার নিয়ে কোন যোনিতে গিয়ে জন্ম নেব কোন ঠিক নেই। স্বামীজী তাঁর গুরুভাইদের বলছেন ‘ভাই! এই জন্মে যে করে হোক তাড়াতাড়ি করে জো সো করে জ্ঞান লাভ করে নাও। মরার পর আমাদের অবশ্যই মানব দেহেই জন্মাব এতে কোন সন্দেহ নেই, কারণ আমরা খারাপ কাজ কিছু করিনি। আর মুমুক্ষুও হব, কিন্তু মহাপুরুষঃ সংশ্রয়, ঠাকুরের সঙ্গ আর পাবো না’। এই

জীবনে আমরা যে সুযোগ সুবিধাগুলো পাচ্ছি, একটু যদি ছিটকে অন্য কোথাও জন্ম নিয়ে নিই তখন এই মহা সুযোগ আর সুবিধা নাও পেতে পারি। মহাভারতে বিশ্বমিত্রকে নিয়ে একটা খুব সুন্দর কাহিনী আছে। প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষে বিশ্বামিত্র ক্ষুধার্ত হয়ে এক চণ্ডালের বাড়ি থেকে মড়া কুকুরের মাংস চুরি করে খেতে গেছেন। চণ্ডালের হাতে ধরা পড়ে যেতেই চণ্ডাল বিশ্বামিত্র মুনিকে বলছে 'হায় ভগবান! আপনি এত বড় ঋষি হয়ে কী নোংরা কাজ করছেন'! সেটা শুনে বিশ্বামিত্র আবার চণ্ডালকে বলছেন 'ভাই! মরার পর স্বর্গ আছে কি নেই কে জানে! কিন্তু এই জীবনটা যে আছে এই ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। এখন না খেয়ে যদি আমি মরেই যায় তাহলে তো আমার সবই গেল। আগে কুকুরের মাংস খেয়ে আমার প্রাণ বাঁচাতে চাই। যদি বেঁচে যাই তাহলে এই পাপ কাজের প্রায়শ্চিত্ত পরে করে নেওয়ার আমি অনেক সুযোগ পাবো কিন্তু এই জীবন চলে গেলে এই জন্মের অনেক সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যাবে'। জীবনকে আমাদের হিন্দু সমাজ অত্যন্ত মূল্য দেয়। মহাভারতে বিশ্বামিত্র ঠিক এই কথাই বলছেন, জীবন এত মূল্যবান, এই জীবন দিয়ে আপনার যা কিছু করার করতে পারবেন, আপনি স্বর্গ চান – এই শরীর দিয়ে হবে। আপনি অর্থ কাম ভোগ করতে চান – এই শরীর দিয়েই করতে হবে। আপনি ধর্ম করতে চান – এই শরীর দিয়েই করতে হবে। আপনি মোক্ষ প্রাপ্তি করতে চান – তাও এই শরীর দিয়েই হবে। ভাগবতও ঠিক এই কথাই এই শ্লোকে বলছে – যদি দেখ মৃত্যু খুব কাছে এসে যাচ্ছে তখন বুদ্ধি দিয়ে, শক্তি দিয়ে আগে এই শরীরটাকে বাঁচাতে শেষ বিন্দু দিয়ে চেষ্টা করে যাও।

একটা খুব মজার গল্প আছে। এক দুর্বৃত্ত ছিল, তাকে রাজা ফাঁসির হুকুম দিয়েছেন। ফাঁসির হুকুম যখন হয়ে গেছে তখন তো তার খেলা শেষ। তখন সে রাজাকে বলছে 'রাজামশাই! আপনি যে আমাকে ফাঁসি দিচ্ছেন, আমি কিন্তু সাধারণ লোক নই, আমি ঘোড়াকে উড়তে শিখিয়ে দিতে পারি'। রাজা তখন তার ফাঁসির দিনটা পিছিয়ে দিয়ে বলছে 'আমি তোমাকে ছ'মাস সময় দিচ্ছি, এই ছ'মাসের মধ্যে তুমি আমার এই ঘোড়াকে উড়তে শিখিয়ে দাও, ছ'মাসের মধ্যে যদি তুমি না পার, তাহলে তোমার খেলা শেষ'। ছ'মাসের জন্য সে এখন মুক্ত। তার বন্ধুরা তাকে বলল 'আরে কেন তুমি তোমার মৃত্যুকে ছয় মাস দেরী করিয়ে দিলে, ঘোড়া কখন কি উড়তে পারে! আর তুমি কি কখন ঘোড়াকে উড়তে শেখাতে পারবে?' তখন সেই লোকটি বন্ধুদের খুব সুন্দর বলছে 'ছয় মাসের মধ্যে অনেক কিছুই হতে পারে, এই রাজাটা মরে যেতে পারে, যদি মরে যায়তো আমি বেঁচে গেলাম, মাঝখানে হয়তো আমারও স্বাভাবিক মৃত্যু এসে যেতে পারে, আর কে জানে যে ঘোড়া উড়তে পারে না, শিখেও তো যেতে পারে'। মানে সব রকমের সম্ভবনা আছে। অশুভ জিনিষকে যতটা পারো পেছনে সরিয়ে দাও, একটু যখন নিঃশ্বাস নেওয়ার সময় পেয়ে গেলে, তারপরে দেখা যাবে। যখন সমস্যার ঝড় ওঠে তখন যতটা পারা যায় সময় পার করে নেওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ। আমারতো বিনাশের সময় হয়ে গেছে, কিন্তু ঐ মুহুর্তটাকে যতটা আপনি ঠেলবেন ততটা বেঁচে আসার সম্ভবনা বেড়ে যায়। বিভিন্ন কারণ থাকতে পারে। প্রথমে একটা কালের বিধান আছে, একটা গ্রহের ফের চলছে, ঐ সময়টায় সর্বনাশ হতে পারে, একটু যদি ঠেলে দেওয়া যায় তাহলে ঐ গ্রহের ফেরটা পেরিয়ে যাবে। একমাত্র সন্ন্যাসীর জীবনের প্রতিও কোন আসক্তি থাকবে না, মৃত্যুর প্রতিও কোন আসক্তি থাকবে না। অন্য দিকে জ্ঞানীরা তো জীবনমুক্ত হয়ে গেছেন, তাঁদের কাছে মৃত্যু বলে কিছু নেই। কিন্তু যারা সংসারী, যাদের দেহবোধ প্রবল তাদের সব দিক দিয়ে জীবনের সুরক্ষা সব সময় করে যেতে হবে।

বসুদেব যখন দেখলেন এত কথাতেও কংসের মতিভ্রমকে ঠিক করা গেলো না, তখন তিনিও এই নীতি অবলম্বন করে বললেন 'আমাদের সন্তানদের থেকেই তো তোমার মৃত্যু হবে, দেবকীর থেকে তো তোমার মৃত্যু হবে না, তবে তুমি কেন মিছিমিছি দেবকীকে হত্যা করতে চাইছ। যখন যেমন যেমন দেবকীর সন্তান হবে সেই সন্তানকে তোমার হাতে তুলে দিলেই তো হল'। বসুদেবের এই প্রস্তাব কংসের মনঃপূত হওয়াতে মেনে নিল।

সাধু, বিদ্বান ও সত্যসঙ্কল্প পুরুষের লক্ষণ

দেবকী আর বসুদেবকে জেলে বন্দী করে রাখা হয়েছে। এই নিয়ে একজন মজা করে বলছিল – কংসটা সত্যিই একটা বোকা ছিল, যদি জেলেই রাখলে তাহলে দুজনকে এক ঘরে না রেখে আলাদা রাখলে

তো সন্তানই আর হতো না, সব ঝামেল ওখানেই মিটে যেত। যাই হোক, প্রথম ছেলের জন্ম হওয়ার পর বসুদেব সেই সন্তানকে নিয়ে কংসের হাতে তুলে দিয়েছেন। ততক্ষণে কংসের মাথা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। কংস তো মামা হয়, তার মধ্যে একটা করুণার ভাব উদয় হল, কংস বাচ্চাটাকে ছেড়ে দিল। দৈববাণীতে তো অষ্টম পুত্রের কথা বলেছিল, প্রথম পুত্রকে কেন মিছিমিছি বধ করব! এই যে বসুদেব নিজের সন্তানকে বুকে করে সন্তানের হত্যাকারীর হাতে তুলে দিতে এসেছেন আর তাই দেখে কংসের মনে যে করুণার ভাব উদয় হয়েছে তখন শুকদেব পরীক্ষিৎকে বলছেন ***কিং দুঃসহং ন সাধূনাং বিদুষাং কিমপেক্ষিতম্। কিমকার্যং কদর্যাণাং দুস্ত্যজং কিং ধৃতাত্মনাম্।*** *।১০/১/৫৮।* যাঁরা সাধুপুরুষ, বিদ্বান, যাঁরা সত্যসঙ্কল্প তাঁদের কাছে এই জগতে এমন কোন কঠিন কাজ নেই, যে কাজের তাঁরা অনুষ্ঠান করতে পারবেন না। যিনি সত্যসঙ্কল্প পুরুষ, যিনি সত্যে প্রতিষ্ঠিত তিনি যা চাইবেন তাই হবে। যোগশাস্ত্রে বলছেন *সত্যপ্রতিষ্ঠায়াং ক্রিয়াফলাশ্রয়ত্বম্* যিনি সত্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যান, তাঁর মুখ থেকে যা বেরোবে সেটাই ঘটবে। বন্ধ্যাকে যদি বলে দেন তোমার সন্তান হবে, সেই বন্ধ্যার সন্তান হতে বাধ্য। *ক্রিয়াফলাশ্রয়ত্বম্* মানে কর্ম না করেই সেই কর্মের ফল তাঁর পায়ে এসে পড়ে যাবে। প্রকৃতি অসহায়, কিছু করার নেই, প্রকৃতিকে পাল্টে যেতে হবে। সত্যে প্রতিষ্ঠিত পুরুষকে তাই প্রকৃতি যমের মত ভয় পায়। আমাদের প্রকৃতি সব কিছু করার ক্ষমতা দিয়ে দেবে কিন্তু সত্যে কখন প্রতিষ্ঠিত হতে দেবে না। চুরি না করা, ব্রহ্মচর্যে প্রতিষ্ঠিত থাকা এগুলো প্রকৃতির কাছে কিছুই নয়। কিন্তু কেউ যখন সত্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যান তাঁর সামনে প্রকৃতি কেঁচো হয়ে যায়। সেইজন্য প্রকৃতি সব সময় এমন পরিস্থিতি তৈরী করে দেবে যে আমাকে মিথ্যা কথা বলতেই হবে, মানে প্রকৃতি আমাকে সব সময় মিথ্যাবাদী বানিয়ে রাখতে চাইবে। এই যে বসুদেব নিজের সন্তানকে বুকে করে নিয়ে এসেছেন তাতে অনেকেরই বুক কেঁপে উঠেছে – *কিং দুঃসহং*, এমন কোন দুঃসাহসের কাজ নেই যে সত্যসঙ্কল্প পুরুষ করতে পারবেন না। নিজের সদ্যোজাত সন্তানকে নিয়ে এসে বসুদেব বলছেন – আপনাকে কথা দিয়েছিলাম, আপনি আমার সন্তানদের মারতে চেয়েছিলেন, এই আমার সন্তানকে আপনার হাতে তুলে দিলাম, নিন একে মেরে ফেলুন।

আটান্ন নম্বর শ্লোকে চারটে মূল বক্তব্য – ১) *কিং দুঃসহং ন সাধূনাং*, সাধুপুরুষরা সব কষ্ট সহ্য করে নেন। ২) *বিদুষাং কিমপেক্ষিতম্*, বিদ্বান পুরুষ কোন কিছুর অপেক্ষায় থাকেন না, অর্থাৎ জগতের কারুর কাছে কোন কিছুর প্রত্যাশা করেন না। ৩) *কিমকার্যং কদর্যাণাং*, নীচ পুরুষরা যে কোন ঘৃণিত কার্য করতে পারে। ৪) *দুস্ত্যজং কিং ধৃতাত্মনাম্*, যাঁর ধৃতি আছে (যিনি ভগবানকে হৃদয়ে ধারণ করেছেন) তিনি সব কিছু ত্যাগ করতে পারেন। কংস দেখছে জীবন আর মৃত্যুর প্রতি বসুদেবের সমান ভাব। এটাই সন্ন্যাসীর লক্ষণ। আর যারা ঠিক ঠিক ভক্ত তারাও তো সন্ন্যাসীই। জ্ঞান আর ভক্তিতে কোথাও কোন তফাৎ নেই। জ্ঞানীর সাধনা হল আত্মা ছাড়া কিছু নেই, ভক্তের সাধনা ঈশ্বর ছাড়া কিছু নেই। কংসের মনে এখন করুণা এসে গেছে আর অন্য দিকে তার স্থির সিদ্ধান্ত যে আকাশবাণীতে তো অষ্টম গর্ভের সন্তানের কথা বলা হয়েছিল, তাই এই পুত্রের থেকে আমার ভয়ের কোন কারণ নেই। বসুদেবকে কংস বলল 'তুমি এই শিশুপুত্রকে নিয়ে তোমার ঘরে ফিরে যাও'। বসুদেবও 'তবে তাই হোক' বলে তাঁর পুত্রকে নিয়ে ফিরে এলেন।

নারদের বাক্যে কংসের মতিভ্রম

এইখানে এসে সর্বলোকে বিচরণশীল দেবর্ষি নারদ একটা ভূমিকা নিয়ে নিলেন। কারণ কংসের এখনও পাপ পূর্ণ হয়নি। পাপ পূর্ণ না হলে ভগবান কংসকে বধ করবেন না। নারদ এবার কংসকে গিয়ে বলছেন – দেবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তানের হাতে তোমার মৃত্যু হবে বলছ, কিন্তু কোন দিক থেকে অষ্টম হবে সেই হিসাবটা কি করেছ? সামনের দিকে থেকে অষ্টম, না কি পেছন দিক থেকে অষ্টম? আর যদুবংশের যত লোক আছে সব কটা হল দেবতাদের অবতার। নারদ এমন ভাবে সব কিছু উপস্থাপনা করেছেন তাতে কংসের স্বাভাবিক হয়ে যাওয়া মাথাটা আবার তালগোল পাকিয়ে গেল। আসল ব্যাপার এখনও যদি কয়েকটা বাচ্চাকে হত্যা না করে দেয় কংসের পাপ পূর্ণ হবে না। এগুলোই পুরাণের বিশেষত্ব। ইতিহাস আর পুরাণের পার্থক্য এখানেই ধরা পড়ে। ইতিহাস সব সময় কাব্যকে আশ্রয় করে চলে। ঠিক ঠিক কাব্য বলতে একমাত্র বাল্মীকি রামায়ণকেই বোঝায়। বাল্মীকি কখনই কোন চরিত্রকে পুরো সাদা বা সম্পূর্ণ কালো রঙে অঙ্কিত করবেন না। পুরাণে এসে

এই ব্যাপারটা একেবারে পাল্টে দিয়ে হয় পুরোটাই সাদা নয়তো পুরোটাই কালো রঙে আঁকবেন। সেই কারণে পুরাণকে কখনই সাহিত্যের নিরিখে সম্মান দেওয়া হয় না। সাহিত্য বলতে বাল্মীকি রামায়ণ, এখানে শ্রীরামচন্দ্রের মধ্যেও কিছু দুর্গুণ আছে আবার রাবণের মধ্যে কিছু ভালো গুণও আছে। পুরাণ যাঁকে ভগবান বানিয়ে দেবে তার মত আর ভালো লোক কেউ হবে না, আর তাঁর যিনি বিরোধী তার মত জঘন্য খারাপ লোক দুনিয়াতে আর কেউ নেই।

কংসকে তার সাগরেদরাও বোঝাচ্ছে তুমি যে দেবকী আর বসুদেবকে এক সঙ্গে কারাগারে রাখবে, আর এদের যে এক এক করে সন্তান হবে, তখন কোন সন্তান এক নম্বর, কে দুই নম্বর আর অষ্টম নম্বরের সন্তান তুমি বুঝবে কি করে? শুনে কংস ভয় পেয়ে ঠিক করে নিল প্রত্যেকটি সন্তানকেই আমি মারব। কিন্তু শুধু মারলেই হবে না, যতটা নৃশংস ভাবে মারা যেতে পারে দেখাতে হবে। এটাও পুরাণের একটা বৈশিষ্ট্য। বাল্মীকি রামায়ণে কোথাও বর্ণনা করে বলবে না যে রাবণ মানুষকে কেটে কেটে তার মাংস খাচ্ছে। এক জায়গায় রাবণ অবশ্য বলছে সীতা যদি সাত দিনের মধ্যে আমাকে বিবাহ করতে রাজী না হয় তাহলে ওকে কেটে ওর মাংস রান্না করে সকালে আমার ব্রেকফাস্টে যেন দিয়ে দেওয়া হয়। এটা হল সীতাকে ভয় দেখানোর একটা কাব্যিক বর্ণনা। পুরাণে কখন এই জিনিষ দাঁড়াবে না, সেখানে কুচি কুচি করে কাটার বর্ণনা করা হবে, অর্থাৎ যতটা কালো রঙ ঢালা যেতে পারে ঢালতে থাকবে, যাতে আমাদের মনে ঘৃণার ভাব জাগে। কংসও তাই বাচ্চাগুলো জন্মাচ্ছে আর এক এক করে দুম্ করে দেওয়ালে আছাড় দিয়ে মেরে ফেলছে। ভিলেনকে যতক্ষণ না কালো রঙ দিতে পারছে ততক্ষণ দৃশ্যটা জমবে না। বাল্মীকি এই জিনিষ কখনই করবেন না। এমনকি ব্যাসদেব তিনিও দুর্যোধন বা দুঃশাসনকে পুরো কালো রঙ দিচ্ছেন না, ধোঁয়াশে করে ছেড়ে দিয়েছেন। কিন্তু পরবর্তিকালে এই চরিত্রগুলো নিয়ে যখন কিছু সাহিত্য রচনা করা হয়েছে সেখানে আবার পুরোটাই কালো রঙ করে ছেড়ে দিয়েছে। আসলে এদের কারুরই ব্যাসদেব বা বাল্মীকির মত সেই সাহিত্য প্রতিভা নেই। শ্রীকৃষ্ণের মত, শ্রীরামচন্দ্রের মত চরিত্রের মধ্যেও কিছু দোষের বর্ণনা করবেন অথচ তাঁকে মহাপুরুষ বা সুপারম্যানের পর্যায়ে নিয়ে যাবেন, এর জন্য বিরাট প্রতিভার দরকার। এই ধরণের ক্ষমতা বা প্রতিভা সব কবি বা সাহিত্যিকের থাকে না।

নিউ ডিসকভারি বইতে এক জায়গায় আছে, পল ডয়সন যিনি এত বড় পণ্ডিত ছিলেন, উপনিষদের অনুবাদ করেছিলেন, যিনি কিছু দিন স্বামীজীর সঙ্গও করেছিলেন, তিনিও স্বামীজীর কিছু ব্যাপারে নিন্দা করেছিলেন। যে জিনিষগুলো নিয়ে তিনি স্বামীজীর নিন্দা করেছেন সেগুলোর ব্যাপারে কারুরই আপত্তি থাকার কথা নয়। কিন্তু নিন্দা করতে গিয়ে আরও দুচার কথা বাড়িয়ে নিজের তরফে লিখেছেন, সেখানেই আপত্তি করা হয়। সাধারণ মানুষ যখন মহাপুরুষদের খুব কাছ থেকে দেখে তখন তাঁদের কিছু কিছু ব্যবহারিক ক্রিয়াকলাপ তাদের কাছে আপত্তিজনক মনে হতে পারে। যেমন প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ঠাকুরের নামে বলছেন, শ্রীরামকৃষ্ণ বিবাহ করে নিজের স্ত্রীর সঙ্গ না করে একজন নারীকে উপেক্ষা করেছেন, এটি তিনি অত্যন্ত গর্হিত কাজ করেছেন। প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের এই মন্তব্য শুনে পরে ম্যাক্সমুলার প্রচণ্ড আপত্তি করে বলেছিলেন ব্রহ্মচর্য ধর্ম পালন ভারতবর্ষের উচ্চতম আদর্শ, এই উচ্চতম আদর্শকে নিয়ে প্রতাপচন্দ্রের নিন্দা করা কখনই উচিত নয়। যে কোন মহাপুরুষের কোন না কোন কিছুকে আশ্রয় করে নিন্দুকরা নিন্দা করার অনেক সুযোগ পেয়ে যাবে। কারণ পারফেকশান্ জিনিষটা কখনই কোথাও হয় না। যাঁরা খুব উচ্চমানের প্রতিভাবান সাহিত্যিক বা কবি তাঁরা ওই দোষ বা খুঁতটা দেখিয়েও তাঁকে মহাপুরুষের পর্যায়ে দাঁড় করিয়ে দিতে পারেন। এই ধরণের কবিদের থেকে যাঁরা একটু নীচের দিকে হন তাঁরা হয় পুরো সাদা নয়তো পুরোটাই কালো রঙে ছুপিয়ে দেবেন। পাঁচশ বছর পরেই হয়তো নাটক লেখা হবে যেখানে ঠাকুর, স্বামীজীকে বিরাট মহাপুরুষ বানাবার জন্য গিরিশ ঘোষ, কালিপদ ঘোষকে পুরোটাই কালো রঙে বর্ণনা করা হবে।

কংসকেও এই রকম এক জঘন্য নৃশংস পুরুষ তৈরী করতে হবে। ততক্ষণে তার মন্ত্রীরা তাকে উল্টো বুঝিয়ে দিল – আপনি এসব একদম ভাবতে যাবেন না, আপনি মরে গেলে আমাদেরও নাশ হয়ে যাবে। বড়

নেতারা ভোটে হেরে গেলে সেই নেতার কোন সমস্যা হয় না, কিন্তু তার দলের যত ক্যাডারদের অবস্থা সর্বনাশ হয়ে যায়। রাজা মরে গেলে, কিংবা যুদ্ধে হেরে গেলে রাজার সাগরেদ্‌গুলিকেই আগে সবাই পিটিয়ে মেরে ফেলে। এই সব বলে তো দেবর্ষি নারদ চলে গেলেন, তখন বলছেন ***দেবকীং বসুদেবং চ নিগৃহ্য নিগড়ৈর্গৃহে। জাতং জাতমহন্‌ পুত্রং তয়োরজনশঙ্কয়া।১০/১/৬৬।*** এবার কংস দেবকী আর বসুদেবকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে কারাগারে নিক্ষেপ করে দিল। এদের সন্তানের মধ্যে কোনটাতে যে বিষ্ণু আসবে কংস বুঝতে পারছে না, কংসের মাথাকে পুরোপুরি তালগোল পাকিয়ে দিয়ে নারদ ঋষি চলে গেছেন। এবার কংসও এক এক করে দেবকী সন্তান জন্ম নিচ্ছে আর তাদের নৃশংস ভাবে বধ করে যাচ্ছেন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের প্রাক্‌কালীন বর্ণনা

ষষ্ঠ গর্ভের সন্তান মারা যাওয়ার পর যখন সপ্তম গর্ভ জন্ম নেবে তখন ভগবান শেষনাগকে, যাঁকে শ্রীঅনন্তনাগ নামেও অভিহিত করা হয়, বললেন – এবার তুমি গিয়ে সপ্তম গর্ভে প্রবিষ্ট হও। এর আগে আমরা ভাবরাজ্যের কথা বলেছিলাম। এই ধরণের কাহিনীকে কখনই ঐতিহাসিক ঘটনা রূপে দেখতে নেই। এই সব কাহিনীকে নিয়ে ভক্ত সাধক চিন্তা করবে, ধ্যান করবে, লীলা রূপে দেখবে। এইভাবে দেখার ফলে নিজের ভেতরে একটা আধ্যাত্মিক উত্থান হয়। ভাগবতের ব্যাখ্যাকাররা এই কাহিনীগুলোকে তাঁদের ব্যাখ্যার মাধ্যমে একটা আধ্যাত্মিক তাৎপর্য দেওয়ার চেষ্টা করেন। মাধ্বাচার্য হলেন ভাগবতের একজন বিরাট ভাষ্যকার। মাধ্বাচার্যের নিজস্ব মত হল, বেদের সব মন্ত্রকে এক ভাবেই ব্যাখ্যা করা যায়। মহাভারতের যত শ্লোক আছে তার প্রত্যেকটি শ্লোককে তিন রকম ব্যাখ্যা দেওয়া যায় – কাহিনী রূপে করা যায়, মনস্তাত্ত্বিক দিক দিয়ে করা যায় আবার আধ্যাত্মিকতার দিক দিয়ে ব্যাখ্যা দেওয়া যায়। কিন্তু ভাগবতের প্রত্যেকটি বক্তব্যকে চব্বিশ রকমের ব্যাখ্যা করা যায়।

শেষনাগের অবতার হওয়ার ব্যাখ্যা

এখানেও ভাষ্যকাররা শেষনাগের অবতার হয়ে আসার এই ছোট্ট ঘটনাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলছেন, শেষনাগ রাম অবতারে শ্রীরামের ছোট ভাই লক্ষণ হয়ে এসেছিলেন। পিতার আদেশে শ্রীরামচন্দ্র যখন চৌদ্দ বছরের জন্য বনে যাওয়ার প্রস্তুত হয়েছেন, সেই সময় লক্ষণ তাঁকে অনেক ভাবে আটকানোর চেষ্টা করেছিলেন। লক্ষণ দাদাকে বলছেন 'দাদা! আমি আপনাকে কোন মতে বনে যেতে দিতে রাজী নই। আমাদের পিতা একজন কামী পুরুষ, স্ত্রীর কামে পড়ে আপনাকে এই রকম আদেশ দিয়েছেন। চলুন, আপনি আর আমি মিলে এই কামী পুরুষকে কারাগারে বন্দী করে দিই। আর ভরতের হয়ে কেউ যদি দাঁড়াতে চায় আমি একাই তাদের শেষ করে দেব'। লক্ষণের কথা শেষ হওয়ার পর শ্রীরামচন্দ্র মিষ্টি করে মা কৌশল্যাকে জিজ্ঞেস করছেন 'মা! তোমার কি অভিমত'? কৌশল্যা বলছেন 'তোমার যদি ঠিক মনে হয় তাহলে লক্ষণ যা বলছে তাই কর'। এটা হল বাল্মীকি রামায়ণের বর্ণনা। বাল্মীকি ইতিহাস দেখেছেন, তিনি রামায়ণের ঘটনার অনেক কাছে ছিলেন। তিনি মানুষের মন খুব গভীর ভাবে কাছ থেকে পর্যবেক্ষণ করেছেন। কৌশল্যা বলছেন 'আমি সারাটা জীবন সতীন কৈকেয়ীর গঞ্জনা সহ্য করে এসেছি। এই আশা নিয়ে আমি এত দিন সব কিছু সহ্য করে এসেছি যে, বুড়ো বয়সে তুমি রাজা হলে একটু সুখের মুখ দেখব। কিন্তু সেই সুখও আমার কপালে নেই, এই দুঃখকে নিয়েই বাকী জীবন কাটাতে হবে'। কৌশল্যা নিজের জীবনকে নিয়ে এতটাই বিমর্ষ যে নিজের স্বামীকে জেলে ঢুকিয়ে দিতে বলছেন! ভাগবতে এসে এগুলোই ভাবরাজ্যে ঢুকে গেছে। ব্যাখ্যাকাররা এখানে একটু অন্য ভাবে ব্যাখ্যা করছেন। লক্ষণ একটু কৌশল্যার দিকে তাকালেন, মা কিন্তু তাঁর কথাতে সায় দিলেন না, ইত্যাদি। ইতিহাস আর ভাবরাজ্যে বিরাট ব্যবধান। এখানে ব্যাখ্যাকাররা ভাবরাজ্যে ঢুকে বলছেন – রামাবতারে লক্ষণ শ্রীরামচন্দ্রকে অনেক ভাবে বনে যাওয়া থেকে আটকাবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু ছোট ভাই হওয়াতে তিনি দাদাকে তখন আটকাতে পারেননি। কিন্তু এবার আমি শ্রীরামচন্দ্রের দাদা হয়ে যাচ্ছি, ভগবানকে আমি এবার শাসন করতে পারবো। এখানে পুরো ব্যাপারটাই যেন একটা নাটকের মত চলছে, যে দৃশ্যগুলো এই জগতের নাট্যমঞ্চে অভিনীত হয়ে চলেছে।

ভাগবতে তন্ত্র মতে শক্তি আরাধনার উল্লেখ

যাই হোক ভগবান শেষনাগকে পাঠিয়ে দিলেন সপ্তম গর্ভে। অন্য দিকে ভগবান তাঁর যোগমায়াকে পাঠিয়ে দিলেন ব্রজপুরে বসুদেবের আরেক পত্নী রোহিনীর গর্ভে। এখানে আর কিন্তু লক্ষ্মীর কথা আসছে না, ঈশ্বরের যে মায়া শক্তি, সেই যোগমায়ার কথা বলা হচ্ছে, সেই যোগমায়াকে ভগবান বলছেন 'হে যোগমায়া! তুমি গোকুলে নন্দ বাবার ঘরে রোহিনীর গর্ভে জন্ম নাও, এদিকে দেবকীর গর্ভে আমার জন্ম হবে আর ওদিকে তোমার জন্ম হবে'। পরে অবশ্য দুজনের স্থান বদল করে নেওয়া হবে। এখানে এসে আমরা একটু প্রসঙ্গ থেকে সরে গিয়ে পুরাণের ইতিহাস নিয়ে কয়েকটি কথা আলোচনা করছি।

বেদে যত দেবতাদের কথা বলা হয়েছে তাঁদের মধ্যে ইন্দ্রের ক্ষমতা সব থেকে বেশী। ইন্দ্রকে সবাই মানতেন, পূজো করতেন, যজ্ঞে ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে আহুতি দিতেন। পুরাণে এসে তিনজন দেবতা বেশী প্রাধান্য পেয়ে গেলেন – ব্রহ্মা, বিষ্ণু আর শিব। ব্রহ্মার প্রতি সম্মান যদিও বিভিন্ন কারণে ভারতে জায়গা করে নিতে পারেনি, কিন্তু অন্য দিকে বিষ্ণু আর শিবের বিরাট আধিপত্য হয়ে গেল। বেদের সময়ে বিষ্ণু যদিও একজন অতি সাধারণ দেবতা ছিলেন, কিন্তু পুরাণে এসে বিষ্ণু বিরাট শক্তি পেয়ে গেলেন। পরের দিকের পুরাণগুলিতে বিষ্ণু একটি প্রধাণ চরিত্র হয়ে দাঁড়ালেন। ঠিক তেমনি শিব বেদের সময় আদিবাসীদের দেবতা ছিলেন। সেই শিবও পুরাণে এসে বিরাট প্রাধাণ্য পেয়ে গেলেন। কিন্তু বেদের পরবর্তি সময়ে এই পরিবর্তনের থেকে আরও গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হল শক্তিপূজার প্রাধাণ্য। শক্তিপূজা পুরোপুরি পৌরাণিক পূজা, কারণ বেদে সেইভাবে শক্তি পূজা ছিল না। প্রথমের দিকে বিষ্ণুপত্নী লক্ষ্মীকে যেখানে নিয়ে আসা হয়েছে, সেই লক্ষ্মীর পূজা তখনও প্রচলন হয়নি। ভারতের বৈদিক সময়ে একটা বড় সম্প্রদায়ভুক্ত গোষ্টি ছিল যাঁরা বেদের ধর্মে না গিয়ে বেদের পাশাপাশি অন্য কোন ধর্মের অনুশীলন করতেন, এটাই পরে গিয়ে তন্ত্র-দর্শন রূপে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। প্রথমের দিকে ভারতে তন্ত্র কোন দিন একটা সুসংবদ্ধ দর্শন রূপে পরিচিত ছিল না। এই দুটি শাখা, বেদের শাখা আর তন্ত্রের শাখা আদিমকাল থেকে ভারতে পাশাপাশি চলে আসছে, কেউ জানে না কোনটা আগে কোনটা পরে। তবে এই ব্যাপারে সবাই নিশ্চিত যে, দুটোই প্রাগৈতিহাসিক। বেদের ঋষিরা তাঁরা তাঁদের যোগ্য শিষ্যদের বেদের সব কিছুর শিক্ষা দিতে থাকলেন, এই ভাবে বেদ পুরোপুরি একটা মজবুত সংরক্ষণ পেয়ে গেল। অন্য দিকে তন্ত্র ছিল মন্ত্রবিদ্যা, এই মন্ত্রবিদ্যাকে তন্ত্রের গুরুরা উপযুক্ত শিষ্য না পেলে শেখাতেন না। তার ফলে তন্ত্রের কোন শাখা কোথায় ছিল, কোন শাখা হারিয়ে গেছে কারুরই জানা নেই। পরের দিকে যাদের কাছে তন্ত্রের কিছু পুঁথি ছিল তারা আবার কাউকে হয়তো শিখিয়েছে, কিন্তু সেখান থেকে কোন ভাবে লোকচক্ষুর আড়ালে তন্ত্র বৌদ্ধ ধর্মে প্রবেশ করে গেল। বৌদ্ধ ধর্ম থেকে সেটা আবার তিব্বতে চলে গেল। তিব্বত থেকে অন্য একটা রূপ নিয়ে তন্ত্র আবার হিন্দু ধর্মে ফিরে এল। এইভাবে তন্ত্র একটা রহস্যময় ও বিচিত্র রূপ নিয়ে হিন্দু ধর্মে জায়গা করে নিয়েছে।

ভাগবতে যেভাবে যোগমায়ার কথা বলা হয়েছে, এই যোগমায়ার কথা আমরা বেদে পাইনা। কিছু দেবীর কথা বেদেই আছে কিন্তু যোগমায়াকে যেভাবে ভাগবত নিয়ে এসেছে সেই ভাবে বেদে পাওয়া যাবে না। হিন্দু ধর্ম এমনই একটি ধর্ম, যে ধর্ম মানুষ যত রকম ভাবে সাধনা করে ঈশ্বরের জ্ঞান লাভ করেছে সব সাধন পদ্ধতিকেই স্থান দিয়েছে, এবং কোন না কোন শাস্ত্র সেই সাধন পদ্ধতির একটা মর্যাদাপূর্বক বর্ণনা দিয়ে মান্যতা দিয়েছে। ভাগবতের এই জায়গাতেও যোগমায়া বা ঈশ্বরের মায়া শক্তিকে যাঁরা সাধনার অঙ্গ করেছেন বা ভবিষ্যতে করবেন তাঁদের জন্য শক্তিকে ভাগবত একটা বিশেষ মর্যাদার স্থান দিয়ে দিল। ভাগবতের এই তিনটে শ্লোকে বোঝা যায় সেই সময় হিন্দু ধর্মে কীভাবে তন্ত্র প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করেছে। প্রথম শ্লোকে ভগবান তাঁর যোগমায়াকে বলছে ***অর্চিষ্যন্তি মনুষ্যাস্ত্বাং সর্বকামেবরেশ্বরীম্। ধূপোপহারবলিভিঃ সর্বকামবরপ্রদাম্।।১০/২/১০।*** এই যে তুমি অবতারের কাজে সাহায্য করবে এর জন্য জগতে তোমাকে সবাই ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য নিবেদন করে পূজো করবে। এখানে কিন্তু যজ্ঞাদির দ্বারা পূজো করার কথা বলা হচ্ছে না, বেদের যজ্ঞই ছিল প্রধান কিন্তু এখানে যজ্ঞ ছাড়াও অন্য ভাবে কীভাবে অর্চনা করতে হয় দেখানো হয়েছে।

পরবর্তি কালে আমাদের যে পূজা পদ্ধতি অনুসরণ করা হচ্ছিল এবং ইদানিং যে পূজা পদ্ধতি প্রচলিত আছে, এই পূজা পদ্ধতির শুরু হয়েছে পুরাণের সময় থেকে। *সর্বকামবরেশ্বরী*, ভগবান বলছেন তোমাকে যারা এভাবে পূজো করবে অর্থাৎ তোমার ভক্তদের তুমি সব রকম প্রার্থনা, সঙ্কল্প, অভিলাষা, ইচ্ছা পূরণ করতে পারবে, তুমি নিজেই তাদের বরপ্রদান করতে পারবে। তার মানে, তোমার ভক্তদের সঙ্কল্প সিদ্ধি হবে। তন্ত্র সাধনায় বা শক্তি সাধনায় সঙ্কল্প ও সঙ্কল্প সিদ্ধি একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। তন্ত্র সাধনার বৈশিষ্ট্য হল একই মন্ত্র দিয়ে, একই পূজো দিয়ে সঙ্কল্পটা যদি পাল্টে দেওয়া হয় তাহলে সিদ্ধিটাও পাল্টে যাবে। ধরুন চাকরিতে একটা প্রমোশন পাওয়ার সঙ্কল্প নিয়ে আমি একটা বিশেষ মন্ত্র দিয়ে মায়ের পূজা করছি, আবার ওই একই মন্ত্র দিয়ে অন্য আরেকজন যদি ভক্তি লাভের সঙ্কল্প নিয়ে মায়ের পূজা করে তাহলে কিন্তু দুজনের ক্ষেত্রে দু রকম ফলই দেবে। কারণ এখানে বলছেন যেমনটি তোমার ভক্ত সঙ্কল্প করবে তেমনটি তাকে সিদ্ধি দেওয়ার ক্ষমতা তোমার হবে। বেদের দেবতাদের এই ক্ষমতা ছিল না। বৈদিক মন্ত্র আর তন্ত্রের মন্ত্রের মধ্যে এটি একটি বড় মৌলিক পার্থক্য।

আর বলছেন ***নামধেয়ানি কুর্বন্তি স্থানানি চ নরা ভুবি। দুর্গেতি ভদ্রকালীতি বিজয়া বৈষ্ণবীতি চ।। কুমুদা চণ্ডিকা কৃষ্ণা মাধবী কন্যকেতি চ। মায়া নারায়ণীশানী শারদেত্যম্বিকেতি চ।।১০/২/১১-১২।*** তুমি আমার এই কার্যে সহায়তা করলে বলে পৃথিবীতে মানুষ তোমাকে বিভিন্ন স্থানে পীঠাদি স্থাপন করে দুর্গা, বিজয়া, ভদ্রকালী, বৈষ্ণবী, কুমুদা, চণ্ডিকা, কৃষ্ণা, মাধবী, কন্যা, মায়া, নারায়ণী, ঈশানী, সারদা, অম্বিকা প্রভৃতি নানা নামে তোমার আবাহন করবে। ভগবান যোগমায়াক একটা বর দিয়ে দিলেন। যদিও ভাগবত ভক্তিগ্রন্থ কিন্তু ঠিক ঠিক শক্তির বর্ণনা এখানেই এসে যাচ্ছে। তন্ত্রে যে শক্তি আরাধনার তত্ত্ব আছে সেই তত্ত্বটাই পুরাণের ভাবধারারতে এসে মিলে গেল। যোগমায়াকে নিয়ে এসে তন্ত্রকে ভাগবতে মিলিয়ে দেওয়া হল।

সঙ্কর্ষণ ও বলরাম নামের ব্যাখ্যা

তারপর বলছেন ***গর্ভসংকর্ষণাৎ তং বৈ প্রাহুঃ সংকর্ষণং ভুবি। রামেতি লোকরমণাদ্ বলং বলবদুচ্ছ্রয়াৎ।।১০/২/১৩।*** শ্রীকৃষ্ণের আগে দেবকীর গর্ভে যে সন্তান আসছে, সেই গর্ভকে স্থানান্তরিত করা হবে রোহিনীর গর্ভে, আর তিনি বলরাম হয়ে সেখানে জন্ম নেবেন। এই গর্ভকে দেবকীর গর্ভ থেকে আকর্ষণ করে স্থানান্তরিত করা হবে বলে ওনার নাম হবে সঙ্কর্ষণ আর *রামেতি লোকরমণাদ্*, মানুষ তাঁর রাম নামে আনন্দ ও প্রীতি লাভ করবে এবং *বলবদুচ্ছ্রয়াৎ*, তাঁর ভেতর প্রচণ্ড বল থাকবে সেইজন্য এই দুটো মিলিয়ে তাঁর নাম বলরাম। আজকাল প্রায়ই হাসপাতালে বাচ্চা বদলের ঘটনা শোনা যায়। কোন মায়ের ছেলে হয়েছে সেই বাচ্চাকে পাল্টে দিয়ে যার মেয়ে হয়েছে তার কাছে রেখে মেয়েটাকে যার ছেলে হয়েছে তার কাছে রেখে দেবে। লিঙ্গ বদল, টেস্ট টিউব বেবী, বাচ্চা বদল সব কিছুর অভিজ্ঞতা সেই প্রাচীন কালেই এনাদের হয়ে গিয়েছিল। তাও কবে? যিশু খ্রীস্টের জন্মের অনেক আগে এগুলো লিখিত আকারে চলে এসেছে, তার মানে আরো কত আগে থেকে এসবের অভিজ্ঞতা তাঁদের হয়ে গেছে জানা যায় না। খুবই আশ্চর্যের যে, এই ধরণের জিনিষ যে হতে পারে, তার চিন্তা-ভাবনা আমাদের পূর্বজদের মাথায় অনেক আগেই ছিল। হিন্দু শাস্ত্রে এগুলোকে খুব বেশী মূল্য দেয় না। কোথা থেকে জন্ম নিচ্ছে, কার কাছ থেকে জন্ম নিচ্ছে, কিসে জন্ম নিয়েছে এগুলো এনাদের কাছে কোন ব্যাপারই ছিল না, আমাদের এখানে সব কিছু থেকেই জন্ম নেওয়া যায়। ঋষিরা একটা হরিণের গর্ভ থেকেও জন্ম নিয়েছেন, একটা ঘট থেকেও জন্ম নিয়েছেন, যজ্ঞের অগ্নিকে মন্থন করছেন তখন সেখান থেকেও জন্ম নিচ্ছেন। ঋষিদের কাছে এসবের কোন গুরুত্ব ছিল না, তাঁদের কাছে এই শরীর থেকে জীবাত্মারই বেশী গুরুত্ব। শরীরকে যে কোন জায়গা থেকে ব্যক্ত করে দেওয়া যায়, জীবাত্মা থাকলেই হল। জীবাত্মা যদি থাকে তাহলে আর কোন সমস্যা নেই। আধুনিক বিজ্ঞানে যত ভাবে সন্তান উৎপাদনের কথা বলা হয়েছে তার সব বর্ণনা আমাদের গ্রন্থগুলোতে চার-পাঁচ হাজার বছর আগেই করে দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে।

এখানে খুব সুন্দর বলছেন ***ভগবানপি বিশ্বাত্মা ভক্তানামভয়ঙ্করঃ। আবিবেশাংশভাগেন মন আনকদুন্দুভেঃ।।১০/২/১৬।*** রাজা যখন কোন গরীব প্রজার বাড়ি যান, তিনি জানেন সামান্য প্রজা আমার কি

খাতির করবে! রাজাকে খাতির করার সামর্থই তার নেই। তাই রাজা তার লোকজনদের দিয়ে নিজের সব জিনিষপত্র আগে পাঠিয়ে দেন। ভগবান এবার আসছেন, তাঁকে খাতির যত্ন করার সামর্থ কার আছে! তিনি নিজের খাতির যত্ন নিজেই করেন। সেইজন্য বলে, যাঁর হৃদয়ে যখন ঈশ্বরের জ্ঞান উৎপন্ন হওয়ার সময় হয় তখন ভগবানের বিশেষ কিছু চিহ্ন তাঁর মধ্যে ফুটে উঠতে থাকে। তিনি তো সবারই ভেতরে আছেন, কিন্তু এবার প্রকাশটা হবে, প্রকাশ হবার আগে ভগবানের বিশেষ চিহ্নগুলো তার মধ্যে পরিলক্ষিত হতে শুরু হয়ে যায়। কি রকম চিহ্ন? যার ভেতরে ঈশ্বরের প্রকাশ হতে যাচ্ছে প্রথমে দেখা যাবে তার ব্যবহারটাই অন্য রকম হয়ে গেছে। কামিনী-কাঞ্চন থেকে তার মন সরে আসবে, স্বভাব বিনম্র হয়ে যাবে, কথাবার্তা মৃদু হয়ে যাবে, জগতের প্রতি তার কোন আকর্ষণ থাকবে না। সত্ত্বগুণের যা যা বর্ণনা আমাদের শাস্ত্রে দেওয়া হয়েছে, সত্ত্বগুণের সব লক্ষণ তার মধ্যে প্রকাশ হতে থাকবে। এই গুণগুলো সর্বগুণেশ্বর ভগবানই তার মধ্যে দিয়ে দেন। ভক্তিশাস্ত্রে বলে, শুভ সংস্কার ভগবানই দেন, তার কারণ তিনি যদি কোন মানুষের মধ্যে শুভ সংস্কার না দেন তাহলে একজন মানুষের পক্ষে শাস্ত্রের কথা ধারণা করা দূরে থাকুক, শ্রবণ করার ইচ্ছাই হবে না। ভগবান এখন এই কাজই করতে শুরু করেছেন, এক এক করে তাঁর কাজের জন্য সবাইকে পাঠাতে শুরু করেছেন।

ভগবানের বসুদেব ও দেবকীর শরীরকে আশ্রয়

যোগমায়া আর শেষনাগ এসে গেছেন। *ভগবানপি বিশ্বাত্মা ভক্তানামভয়ঙ্করঃ* ভগবান সর্বব্যাপী, তিনি সবাইকে অভয়প্রদান করেন, সেই সর্বব্যাপী যিনি তিনি কোথায় যাবেন? একটা ঘরের যত মাপ ঠিক সেই মাপের একটা খাট ঘরে রাখা আছে। এবার যদি খাটটাকে নাড়াতে হয় তখন কোথায় খাটকে নাড়াবে? নাড়াবার মত জায়গাই তো ঘরে নেই। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে তিনিই যদি থাকেন, আর তিনি যদি অনন্তই হয়ে থাকেন তাহলে তিনি যাবেনটা কোথায়? তিনি জন্মাবেনই বা কি করে? সেইজন্য আচার্য শঙ্কর গীতার ভাষ্যে প্রথমেই বলছেন *দেহবানিব জাত ইত চ লোকনুগ্রহং কুর্বন্ লক্ষ্যতে,* যেন তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ভগবান যিনি অনন্ত তাঁর আবার আসা যাওয়া কোথায় হবে! স্বামী প্রেমেশানন্দ মহারাজ তাঁর গানে ঠাকুরকে বলছেন অরূপ সায়রে লীলা লহরী, অরূপের সাগর সেই সাগরে যেন একটা ছোট্ট লীলার ঢেউ উঠেছে। এবার তিনি ভক্তকে তাঁর লীলা আস্বাদন করাবারর জন্য মানব শরীর ধারণ করে পৃথিবীতে আসছেন। আর তিনি যত কাজকর্ম করবেন সেটাও মানুষের মতই করবেন। আমাদের সাথে অবতারের পার্থক্য হল আমাদের কাঁধে কর্মের একটা বিরাট বোচকা রয়েছে। এই কর্মের বোঝা আমাদের নাকে দড়ি দিয়ে কাজ করিয়ে নেয়, যখন ইচ্ছে হবে আমাদের শরীর নাশ করিয়ে দেবে। কর্ম যখন যার ঘাড়ে বসে সব কাজ করায় তখন তাকে বলছেন দেহবান। দেহবান মানেই দেহের প্রতি অভিমান বা আসক্তি থাকবে। যাঁর দেহের প্রতি কোন আসক্তি নেই, যিনি কর্মের দ্বারা প্রেরিত হয়ে কিছু করেন না, সেই তিনিই যখন মানব শরীর ধারণ করেন তখন তাঁকে আচার্য বলছেন *দেহবানিব জাত*। আমাদের কেন জন্ম হয়েছে? কর্মের দ্বারা প্রেরিত হয়ে জন্ম হয়েছে। ভগবানের কেন জন্ম হয়েছে? নিজের ইচ্ছায় হয়েছে। নিজের ইচ্ছাটা আবার পাগলের মত বা বাচ্চা ছেলের খামখেয়ালীপনার মত তা নয়। কেন ইচ্ছে হয়েছে? আচার্য শঙ্কর বলছেন *ভূতানুজিঘৃক্ষয়া* লোকের মঙ্গলের জন্য। স্বামীজী ঠাকুরের নামে গানে বলছেন *লোকাতীতোহপ্যহহ ন জহৌ লোককল্যাণমার্গম্......,* শ্রীরামকৃষ্ণ ভগবান, তিনি লোকাতীত। কিন্তু কখনই এমন অবস্থা তাঁর দেখা যায় না যে, লোককল্যাণের মার্গ থেকে তিনি এতটুকু বিচ্যুত হয়েছেন।

সেই ভগবান এখন বসুদেবের মনের ভেতরে প্রবেশ করে গেছেন। এবার ওখান থেকে শক্তি স্থাপন হবে দেবকীর গর্ভে। অবতার যখন কোন শরীর ধারণ করতে ইচ্ছা করেন তখন তাঁর মায়ের গর্ভের দরকার হয়, কিন্তু শক্তির প্রকাশের জন্য মায়ের গর্ভের দরকার পড়ে না। সেইজন্য আমাদের যত দূর্গা, কালী শক্তিরূপিণী দেবী আছেন এনাদের সব সময় প্রাকট্য হয়। প্রাকট্য আর অবতার এই দুটোতে তফাৎ আছে। প্রাকট্য মানে, যখনই কোথাও অশুভ শক্তি মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে, দেবী যদি সেই অশুভ শক্তিকে বিনাশ করার ইচ্ছা করেন তখনই হঠাৎ তিনি একটা শরীর নিয়ে দাঁড়িয়ে যাবেন। কিন্তু অবতারকে একটা গর্ভের ভেতর দিয়ে আসতে হয়। ভগবান এখানে একটা শরীরকে অবলম্বন করে নিজেকে প্রকাশ করেন। সেইজন্য ঠিক ঠিক বলতে গেলে বলা উচিৎ যিনি ভগবান তিনিই শ্রীরামকৃষ্ণ দেহ আশ্রয় করে লীলা করেছেন।

বসুদেবের ভেতরে ভগবানের শক্তি এসে যাওয়ার পর কি হল? ***স বিভ্রৎ পৌরুষং ধাম ভ্রাজমানো যথা রবিঃ। দুরাসদোঽতিদুর্ধর্ষো ভূতানাং সম্বভুব হ।।১০/২/১৭।*** পরমপুরুষের সেই দিব্য জ্যোতি হৃদয়ে ধারণ করে বসুদেবের শরীরটা সূর্যসম তেজোময় হয় উঠল। সেখান থেকে শেষ পর্যন্ত দেবকীর গর্ভে এখন ভগবান এসে গেছেন। ভগবান এখানে কিন্তু বসুদেবকে মাধ্যম করে এসেছেন। বসুদেবকে মাধ্যম করে যখন দেবকীর গর্ভে ভগবান এসে গেলেন তখন দেবকীর শরীর অন্য রকম হয়ে গেল। খ্রীশ্চান ট্রাডিশানে যেমন দিব্য আবির্ভাবের ধারণা নিয়ে আসা হয়েছে, শ্রীকৃষ্ণের ক্ষেত্রে তা হয়নি, বসুদেবের শরীরের মাধ্যমেই এসেছেন।

ভাগবতে এখানে খুব সুন্দর বর্ণনা করা হচ্ছে – ***সা দেবকী সর্বজগন্নিবাসনিবাসভূতা নিতরাং ন রেজে। ভোজেন্দ্রগেহেঽগ্নিশিখেব রুদ্ধা সরস্বতী জ্ঞানখলে যথা সতী।।১০/২/১৯।*** যিনি ভগবান, তিনি সারা জগতের নিবাসস্থান, সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ভগবানেই বাস করে, সেই ভগবান এসে আশ্রয় নিয়েছেন দেবকীর গর্ভে অর্থাৎ দেবকীই এখন সেই ভগবানের নিবাসস্থান, এটাই পরম আশ্চর্যের। মানুষের মনে বিরাটের একটা কল্পনার ছবি ফুটিয়ে তোলার জন্য এই ধরণের কাব্যিক বর্ণনা করা হয়। টেবিলের উপর একটা গ্লাশ আছে, গ্লাশটা বাতাসের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে, সেই বাতাস আবার গ্লাশের মধ্যেও আছে। গ্লাশের ভেতরের বাতাস আর বাইরের বাতাসের মধ্যে কোন তফাৎ নেই। ঠিক তেমনি পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে আকাশতত্ত্ব আছে। সেই আকাশতত্ত্বের মধ্যেই এই গ্লাশ বিদ্যমান, গ্লাশটাও আকাশতত্ত্ব আর এই গ্লাশের মধ্যে যা আছে সেটাও আকাশতত্ত্ব। একদিকে যিনি ভগবান তাঁর মধ্যে সমগ্র জগৎ বিরাজমান, তিনিই আবার দেবকীর গর্ভে আশ্রয় নিয়েছেন। ভগবানের অবতারতত্ত্ব ঠিক এভাবেই ব্যাখ্যা করা হয়। কিন্তু আমার আপনার ক্ষেত্রে হবে ভগবান ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ রূপে আমাদের মধ্যে বিরাজ করছেন। অন্যান্য অবতারের ক্ষেত্রে কখন কলা কখন অংশ বলা হয়। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের ক্ষেত্রে ভগবান নিজে, মানে পূর্ণাবতার হয়ে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হতে যাচ্ছেন।

‘জ্ঞানখল’ শব্দের তাৎপর্য

এখানে ‘জ্ঞানখল’ শব্দের অর্থ, জ্ঞানী পুরুষের নিজের ভেতরের জ্ঞানকে বাইরে প্রকাশ হতে না দেওয়া। কোন বিষয়ের উপর আপনার হয়তো খুব ভালো জ্ঞান আছে অথচ আপনি সেই জ্ঞানকে বাইরে প্রকাশ করছেন না, আপনি কোথাও আপনার এই জ্ঞান নিয়ে নিজেকে জাহির করছেন না। আপনি তখন হয়ে গেলেন জ্ঞানখল। বিহারে দেখা যায় কেউ হয়তো খুব খেটেখুটে একটা গাড়ি কিনল, গাড়ি কেনার পর গাড়িতে কত রকমের লাইট লাগাবে, ব্রেক মারলে এক রকম আলো জ্বলবে, চললে এক রকম আলো, দাঁড়িয়ে থাকলে এক রকম আলো, কত ঝকমকানি, আর কত রকমের মিউজিক, এক কিলো মিটার দূর থেকেই বোঝা যাবে ওর গাড়িটা আসছে। কিন্তু যারা সত্যিকারের বড়লোক, প্রত্যেক বছর পুরনো গাড়ি বেচে দিয়ে নতুন গাড়ি কেনে, তাদের গাড়িতে এইসব পাঁয়তারা কিছু দেখতে পাওয়া যাবে না। এই ধরণের বড়লোকেরা হয়ে গেলেন টাকাখল। তাদের কাছে টাকা-পয়সা, ধনসম্পদ যা আছে সেটাকে ঢেকে রেখেছে, বাইরের লোক জানতেই পারে না যে লোকটি ধনবান। জ্ঞানখলও ঠিক তাই। একটু যাদের বিদ্যা বুদ্ধি আছে সে চারিদিকে ফরর্ ফরর্ করে দেখিয়ে বেড়াবে। সে বিজ্ঞান নিয়েও বলছে, রাজনীতি নিয়েও বলছে, শাস্ত্র নিয়েও বলছে, সব বিষয়ে নিজেকে জাহির করে বেড়াবে। কিন্তু যিনি প্রকৃত জ্ঞানী, যিনি শ্রেষ্ঠতম বিদ্যাকে অর্জন করে নিয়েছেন, তিনি কখন মুখ খুলবেনই না, এঁরাই ঠিক ঠিক জ্ঞানখল হয়ে যান। একেই বলা হয় জ্ঞানখল, জ্ঞান যেটা ভেতরে আছে সেটাকে ঢেকে রাখেন, কখনই প্রকাশ হতে দেন না। যেমন মৌচাকে মধু থাকে, মধু বাইরে থেকে বোঝা যায় না, কিন্তু একটা লোহার বা কাঠের দণ্ড দিয়ে একটু খোঁচা দিলে টপ্ টপ্ করে মধু ঝড়তে থাকে। জ্ঞানখল শব্দটি ভাগবতের একেবারে নিজস্ব, কিন্তু খুবই তাৎপর্যপূর্ণ এবং গভীর ব্যঞ্জনাময় ভাবযুক্ত।

বলছেন দেবকী হলেন ঠিক ঠিক জ্ঞানখল। দেবকীর গর্ভে সাক্ষাৎ ভগবান নারায়ণ আশ্রয় নিয়েছেন, কিন্তু তাঁর মুখে, শরীরে কোন রকমের পরিবর্তন হল না। দেবকীর মধ্যে এমনই শক্তি যে তিনি ভগবানকে গর্ভে ধারণ করার জন্য শরীরে যে দিব্য কান্তিময় ভাবটা প্রস্ফুটিত হয়েছে, সেই দিব্য ভাবকে পুরো ঢেকে দিয়ে জ্ঞানখল হয়ে গেছেন। শ্রেষ্ঠ বিদ্যাটা নিজের ভেতরে চাপা দিয়ে বাইরের কারুকে বুঝতে না দেওয়ার মত

দেবকীও নিজের শরীরের দিব্য কান্তিময় ভাবটা চাপা দিয়ে দিলেন। যেমন একটা কুঁজোর মধ্যে যদি একটা দীপ জ্বালিয়ে রেখে দেওয়া হয় তখন দীপের আলো বাইরে যায় না। কিন্তু কুঁজোর বদলে যদি কোন কাঁচের আবরণের মধ্যে দীপটা রাখা হয় তখন পুরো আলোটাই ছড়িয়ে পড়ে। ঠাকুর বলছেন সত্ত্বগুণী সাধক মশারীর ভেতরে ধ্যান করবে, সবাই মনে করছে উনি ঘুমোচ্ছেন। এটাই জ্ঞানখল। জ্ঞানখলের দুটো দিক – একটা হল তাঁর জ্ঞান আছে কিন্তু কেউ জানে না, কখন হয়তো কেউ একটু খোঁচা দিল, তখন মৌচাকে খোঁচা দিলে যেমন মধু ঝড়ে পড়ে ঠিক তেমনি তাঁর ভেতর থেকেও মধু ঝড়ে পড়বে। আর দ্বিতীয় হল, তাঁর ভেতরে ঈশ্বরের অনুভূতির যে জ্ঞান উপলব্ধি হয়েছে সেটা যেন বাইরের কেউ টের না পায়। ঈশ্বরের অনুভূতি লাভের জন্য তাঁর যে সাধন ভজন, তাঁর সিদ্ধির অবস্থা, এগুলো যেন কেউ কখন টের না পায়। আসলে জ্ঞানখল হল আধ্যাত্মিক সাধনা রাজ্যের একটি বিশেষ সাধনা।

ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই আত্মজ্ঞানীর দ্বারা লোকসংগ্রহ কার্য হয়ে থাকে

এই জগতে যা কিছু আছে সবই জড়। শরীর, মন, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি সব জড়। সেইজন্য কারুরই কোন ক্ষমতা নেই যে কিছু বোধ করবে। বোধ করার ক্ষমতা একমাত্র আত্মারই আছে। কিন্তু আত্মা আর বুদ্ধির একটা মেল বন্ধন তৈরী হয়, যে মেল বন্ধন দিয়ে এই জগৎ এই ভাবে চলছে। অজ্ঞানীরা মনে করে বুদ্ধিটাই আত্মা। সেখান থেকে যখন এক ধাপ নীচে আসে তখন মনে করে আমার ইন্দ্রিয়টাই আত্মা। তার থেকে আরও এক ধাপ নীচে যারা তারা মনে করে আমার শরীরটাই আত্মা। এর থেকেও যারা নীচে বিষয়ের মধ্যে পড়ে আছে তারা মনে করে আমার ব্যাঙ্ক ব্যালেন্সটাই আমার আত্মা, মেয়েরা মনে করে আমার শাড়ী-গয়নাই আত্মা, আমার সন্তানই আমার আত্মা। তাহলে জ্ঞান মানে হল আত্মাকে আত্মা রূপে জানা আর অজ্ঞান মানে জড় বস্তুকে অর্থাৎ অনাত্মকে আত্মা রূপে জানা। যখন টাকা-পয়সা, গয়না সম্পত্তির মধ্যে নিজেকে জড়িয়ে ফেলছে তখন এটাই অজ্ঞান, এগুলো পেলে আনন্দ হচ্ছে, না পেলে বা যেটা আছে সেটা চলে গেলে চোখের জল ফেলছে এটাই অজ্ঞান, নিজের দেহের প্রতি আকর্ষণ এটাই অজ্ঞান। নিজের বুদ্ধি বৃত্তির উপর যখন বিরাট ভরসা ও অহঙ্কার তখন এটাই অজ্ঞান। মজার ব্যাপার হল এই অজ্ঞানটা আত্মাতেই বোধ হয়। আমরা কোন বস্তুকে যেভাবে জানি আত্মাকে সেই ভাবে জানা যায় না। সাধনার খুব উচ্চ অবস্থায় যখন সাধক হৃদয়ে অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ আকারে আলোর জ্যোতি দর্শন করেন, তখন আত্মাই এই জ্যোতিকে দেখছেন।

যতক্ষণ বুদ্ধি যা কিছু দেখছে ততক্ষণ সব মিথ্যাই দেখছে। সেইজন্য আমাদের দর্শন শাস্ত্রে বলা হয়, ঈশ্বরের সাকার রূপ যখন দর্শন হয় তখন সেই দর্শন মনের এলাকাতেই হয়। ঠাকুর যখন মা কালীর রূপ দেখছেন সেটাও মনের এলাকাতেই দেখছেন। এই ধরণের দর্শনকে কখনই ঠিক ঠিক আত্মজ্ঞান বলা হয় না। তোতাপুরী তাই ঠাকুরকে দিয়ে আরও সাধনা করিয়ে নিচ্ছেন। জ্ঞান অসি দিয়ে মায়ের রূপকে যে ঠাকুর দ্বিখণ্ডিত করে দিচ্ছেন তার মানে, মনের যত এলাকা আছে তাকে কেটে খণ্ডিত করে সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। এগুলো আমাদের মত মানুষের ধারণা করা খুব কঠিন, আমাদের কাছে এগুলো শব্দ মাত্র। আত্মজ্ঞানে প্রথম উপলব্ধি হয় আত্মা ছাড়া কিছু নেই। সেইজন্য কোন আত্মজ্ঞানী লোকশিক্ষার কাজ করতে পারেন না। কারণ তিনি সবাইকে শুদ্ধ আত্মা দেখছেন, শুদ্ধ আত্মা শুদ্ধ আত্মাকে কি উপদেশ দেবেন! তাহলে ঠাকুর যে নরেনকে বটবৃক্ষের মত হতে বলছেন, তোর ছায়ায় সবাই আশ্রয় নেবে, কেন বলছেন ঠাকুর? ঠাকুরই অন্য জায়গায় এর ব্যাখ্যা দিচ্ছেন, কোন কোন আত্মজ্ঞানীর মধ্যে তিনি একটা ছোট্ট আবরণ দিয়ে দেন। এই আবরণের উল্টো দিকে যখন তিনি চলে যান তখন দেখেন আত্মা ছাড়া কিছু নেই, যখন আবরণের এই দিকে থাকেন তখন জগৎকে দেখেন, তখনই তিনি লোকসংগ্রহের জন্য কাজ করেন। সেইজন্য ঈশ্বরের ইচ্ছা ছাড়া কেউ কখন উপদেশ দিতে পারে না। যদি জ্ঞানী পুরুষকে ঈশ্বর আদেশ না দেন তখন তিনি দেখবেন ঈশ্বর ছাড়া কিছু নেই, তখন তিনি কাকে উপদেশ দিতে যাবেন! আমি আপনি সবাই সাধারণ জীব, আমাদের সাধারণ জীব রূপে দেখার যে বুদ্ধি, ওই বুদ্ধি নিয়ে আসার জন্য তো আত্মজ্ঞানীকে আবার আত্মজ্ঞানের ওই উচ্চস্তর থেকে এক ধাপ নেমে আসতে হবে। তা নাহলে সেটা কোথা থেকে আসবে? ঈশ্বরই আত্মজ্ঞানীর মধ্যে এই আবরণটা দিয়ে দেন। এটাকেই বলে ভাবমুখ। ঠাকুর যত উপদেশ দিয়েছেন সব এই ভাবমুখ অবস্থায়

থেকে উপদেশ দিতেন। যাঁরাই লোকসংগ্রহ কার্যে থাকেন তাঁরা এই ভাবমুখের মত একটা অবস্থায় থাকেন। যখনই তাঁরা চাইবেন তখনই আবার সমাধিতে লীন হয়ে যাবেন। আবার যখন তিনি চাইবেন তখন তাঁকে ওই সমাধি অবস্থা থেকে টেনে এই জগতের মাঝখানে নামিয়ে দেন। স্বামীজী চাইছেন জ্ঞানখল হয়ে থাকতে। কিন্তু ঠাকুর ভগবান, তিনি স্বামীজীকে আদেশ করছেন 'তোকে মায়ের কাজ করতে হবে'। প্রত্যেক আত্মজ্ঞানীর জ্ঞানখল হওয়াই জীবনের উদ্দেশ্য থাকে। স্বামীজীরও তাই উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু জ্ঞানের প্রচার প্রসার যখন হয় তখন ঠাকুরের ইচ্ছাতেই হয়, কাকে দিয়ে তিনি এই কার্য করাবেন সেটাও তিনিই ঠিক করেন।

ব্রহ্মা ও দেবতাদিকৃত ভগবানের স্তুতি

ভাগবতের কাহিনী অনুসারে বসুদেব আর দেবকী দুজনেই কংসের কারাগারে আবদ্ধ ছিলেন। কিন্তু ভাগবতের বর্ণনা অনুসারে কতকগুলি পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতিকে বিচার করলে অন্য রকম মনে হবে। কারণ রোহিণী ছিলেন বসুদেবের আরেক পত্নী, তিনিও যখন গর্ভবতী হলেন তখন একটু সন্দেহ হয়। বসুদেব কারাগারে আবদ্ধ থাকলে রোহিণী কি করে গর্ভবতী হবেন! অন্য দিকে কারাগারে আবদ্ধ থাকার জন্য দেবকী জ্ঞানখল হয়ে গেলেন, দেবকীর প্রকাশ বাইরে আসতে পারেনি। কিন্তু বসুদেবের মধ্যে সেই প্রকাশটা ছিল। সেইজন্য মনে হতে পারে যে কারাগারের বাইরে বসুদেবের আসা-যাওয়া করার সুযোগ ছিল, কিন্তু দেবকী পুরোপুরী গৃহবন্দী ছিলেন। এখন বলছেন ***ইতি ঘোরতমাদ্ ভাবাৎ সন্নিবৃত্তঃ স্বয়ং প্রভুঃ। আস্তে প্রতীক্ষংস্তজ্জন্ম হরের্বৈরানুবন্ধকৃৎ।।১০/২/২৩।*** কংস তখন মথুরার একচ্ছত্র অধিপতি, সে ইচ্ছা করলে দেবকীকে হত্যা করে দিতে পারতো, কিন্তু তার মনে হল, একে নারী, তায় আবার নিজের বোন আবার গর্ভবতী এই অবস্থায় ওকে বধ করলে কী পাপ লেগে যাবে কে জানে, এইসব ভেবে দেবকীকে হত্যা করার চিন্তা মাথা থেকে নামিয়ে দিয়েছে। ভক্তিশাস্ত্রের ধর্মানুসারে বলা যায় কংস যদি দেবকীকে বধ করে দিতে তাহলে লীলা পোষ্টাই হত না। ঠাকুরও বলছেন জটিলা-কুটিলা না থাকলে লীলা পোষ্টাই হয় না। মূল কথা ভগবান দেবকীর গর্ভে এসে গেছেন। কিন্তু কংসের ভেতরে ভগবানের প্রতি এমন বৈর ভাব উদয় হয়ে গেছে যে, চারিদিকে শুধু শ্রীকৃষ্ণের ছায়াই দেখছে, এই বুঝি শ্রীকৃষ্ণ আসছে। কংস খেতে যাচ্ছে, ঘুমোতে যাচ্ছে, সব সময় মনের মধ্যে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণকেই দেখছে। এটাকেই ভক্তিশাস্ত্রে বলে বৈর ভাব। অধ্যাত্ম রামায়ণে আরও বিস্তারিত ভাবে এই বৈর ভাবের বর্ণনা করা হয়েছে।

এদিকে দেবকীর মধ্যে ভগবান এসে গেছেন অন্য দিকে কংসের এই অবস্থা, এরই মধ্যে ব্রহ্মা আর শিব দুজনে এসেছেন ভগবানকে দর্শন করতে, যিনি অনন্ত তিনি এবার শরীর ধারণ করছেন। যিনি অনন্ত তিনি শরীর ধারণ করবেন এর থেকে বেশী কী আশ্চর্য হতে পারে। ভাগবত হল বিষ্ণুপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণে বিষ্ণুকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে, তাই এখানে ব্রহ্মা আর শিব এসে বিষ্ণুর স্তুতি করছেন। শিবপুরাণে আবার ব্রহ্মা আর বিষ্ণু এসে শিবের স্তুতি করেন এবং ও ব্রহ্মপুরাণেও এইভাবে শিব ও বিষ্ণু এসে ব্রহ্মার স্তুতি করেন। আমরা লীলাপ্রসঙ্গেও দেখতে পাই, শ্রীশ্রীঠাকুর যখন তাঁর মাতা চন্দ্রমণির গর্ভে তখন চন্দ্রমণিরও অনেক দিব্য দর্শন হয়েছিল, বিভিন্ন সময়ে তিনি অনেক দেবী ও দেবতার দর্শন পেয়েছিলেন। তবে আমাদের মনে রাখতে হবে এগুলো সবই ভাবরাজ্যের কথা। ভাবরাজ্যের কথা মানেই একটা সাধারণ জিনিষকে দিব্য ভাবে দেখা। যতক্ষণ দিব্য ভাবে না দেখা হয় ততক্ষণ ওই দেখাটা আধ্যাত্মিক পুষ্টি লাভে কোন কাজে আসে না। ভাবরাজ্যের ঘটনাকে দৃশ্য জগতের যুক্তি তর্ক দিয়ে বিচার করা যায় না। ভাবরাজ্যের যুক্তি তর্ক নিজের মত চলে। যাই হোক কংসের কারাগারে ব্রহ্মা, শিব ও অন্যান্য দেবতারাও এসে উপস্থিত হয়েছেন। এনারা এখন সেই অনন্ত ভগবান, যিনি এখন মানব রূপ ধারণ করে অবতীর্ণ হতে যাচ্ছেন, তাঁর স্তুতি করছেন।

যাঁরা আধ্যাত্মিক জীবন যাপন করতে চাইছেন তাঁরা ভাগবত থেকে তাঁদের সাধনার অনেক উপাদান সংগ্রহ করে নেওয়ার সুযোগ পেতে পারেন। প্রথমতঃ আধ্যাত্মিক জীবনে তিন ধরণের ধ্যান করার কথা বলা হয়। এই তিন ধরণের ধ্যান করলে সাধকের সময়টা ভালোর দিকে অতিবাহিত হয় আর ভাব পাকা হয়। এই তিনটে ধ্যান হল – গুণচিন্তন, লীলাচিন্তন আর রূপচিন্তন। ভাগবত এই তিন রকম ধ্যানেরই শিক্ষা দেয়। দীক্ষা

নেওয়ার সময় আমাদের গুরুরা ইষ্টের একটা রূপের কথা বলে দেন। কিন্তু গুণচিন্তন আর লীলাচিন্তনের কথা আমাদের সেভাবে বলে দেওয়া হয় না। গুণচিন্তন ও লীলাচিন্তন অন্তর্মুখী সাধনার একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। সাধারণ মানুষ যেভাবে ঠিক ঠিক ঠাকুরের গুণচিন্তন করবে, সেভাবে ঠাকুরের উপর এখনও পর্যন্ত সেই রকম কোন শাস্ত্রই লেখা হয়নি। সেইজন্য ঠাকুরের ঠিক ঠিক নিজস্ব ভাবকে ধারণা করা এবং ধারণা করে সেই ভাবকে পাকা করতে এখনও অনেক বছর লেগে যাবে। এখনও পর্যন্ত ঠাকুরের প্রামাণ্য জীবনীটুকুই লেখা হয়েছে। কথামৃতে ঠাকুরের কথাগুলো লিপিবদ্ধ হয়েছে। কিন্তু ঠাকুরের যে নিজস্ব গুণ, তিনি পরব্রহ্ম স্বরূপ, সেই সম্বন্ধে এখনও সেই ধরণের উপযোগী কোন শাস্ত্র লেখা হয়নি। এখনও পর্যন্ত আমরা ভাগবত, রামায়ণের ভাবকেই ঠাকুরের উপর আরোপ করে চালিয়ে যাচ্ছি। এখানে যে স্তুতির বর্ণনা করা হয়েছে, এটাই হল ঠিক ঠিক গুণচিন্তন। ব্রহ্মাদি দেবতারা তাঁদের স্তুতিতে ভগবান বিষ্ণুর অখণ্ড রূপের বর্ণনা করছেন।

ব্রহ্মা, শিব ও অন্যান্য দেবতারা কংসের কারাগারে দিব্য শরীরে উপস্থিত হয়ে ভগবানের স্তুতি করতে শুরু করেছেন। এই শ্লোকটি খুব সুন্দর একটি শ্লোক, ***সত্যব্রতং সত্যপরং ত্রিসত্যং সত্যস্য যোনিং নিহিতং চ সত্যে। সত্যস্য সত্যমৃতসত্যনেত্রং সত্যাত্মকং ত্বাং শরণং প্রপন্নাঃ।।১০/২/২৬।*** শুধু সত্যকে নিয়েই কত ভাবে সুললিত ছন্দে বলছেন – হে প্রভু আপনি হলেন সত্য সঙ্কল্প, মানে আপনি যেটা ভাবেন সেটাই হয়। সেই কারণে সত্য সাধনই আপনাকে প্রাপ্তির শ্রেষ্ঠ সাধন। ঠাকুরও বলছেন কলিযুগে সত্যই তপস্যা। ঠাকুরের ভাগবত খুব প্রিয় গ্রন্থ ছিল। *ত্রিসত্যং*, জগতের সৃষ্টি, প্রলয় আর সংসারের যে স্থিতি এই ত্রিবিধ অসত্য অবস্থার মধ্যেও আপনি সত্যরূপেই বিরাজমান। কারণ সংসারের যখন বিনাশ হয়ে যায় তখন আপনি একমাত্র থেকে যান। সচ্চিদানন্দের এটাকেই বলে সৎ। গীতাতে ভগবান বলছেন *নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ*, সৎএর নাশ হয় না, অসতের ভাব হয় না, ভাব হয় না মানে দেখা যায় না। কিন্তু এই বোতল আছে চোখের সামনে দেখতে পারছি, কিন্তু একদিন এর নাশ হবে। এদিকে বলছেন যেটা সৎ তার নাশ হয় না, আর যেটা অসৎ তার ভাব হয় না, মানে প্রকট হয় না। কিন্তু বোতল তো প্রকট হয়েছে দেখতে পাচ্ছি, আবার এর নাশও হবে। এই কারণেই বেদান্ত সাধারণের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন বলা হয়। আসলে এই যে বলছি এখানে বোতল আছে, এখানে দুটো বুদ্ধি কাজ করছে, একটা বোতল বুদ্ধি আর একটা অস্তি বুদ্ধি, বোতল আছে এই বুদ্ধি। বোতল যখন নাশ হয়ে যায় তখন অস্তি বুদ্ধিটা থেকে যায়, অস্তি বুদ্ধিটা কখন যায় না। এই অস্তি বুদ্ধি আছে বলেই বোতলটা নাশ হয়ে যাওয়ার পরেও আমি দেখব এই গ্লাশ আছে, চেয়ার-টেবিল সব কিছু আছে। এই 'আছে' বুদ্ধিটা স্থায়ী আর 'আছে' বুদ্ধির উপর বোতল বুদ্ধিটা অস্থায়ী। সমুদ্রের মত অস্তি বুদ্ধিটা থেকে যায় আর তার উপরে ঢেউয়ের মত নানান রকমের জিনিষ খেলা করতে থাকে। এই নানা রকমের জিনিষ সৎ নয়, আর একেবারেই যে এগুলো নেই তাও নয়। সেইজন্য একে বলা হয় অসৎ। অসৎ মানে গতকাল ছিল না, আজকে আছে, আগামীকাল থাকবে না। সৎই চিরন্তন, সৎএর উপরেই নানান রকমের ঢেউয়ের খেলা চলে। এই সৎ যিনি তিনিই ভগবান। শ্লোকে এটাই বলছেন – জগতের উৎপত্তির আগে, জগতের বিনাশের পর আবার জগৎ যখন আছে, এই তিনটে অবস্থার সব কটি অবস্থাতে আপনিই থাকেন। ঢেউয়ের উৎপত্তির আগেও সমুদ্র ছিল, ঢেউয়ের নাশ হয়ে গেলেও সমুদ্র আছে, ঢেউ যখন আছে তখনও সমুদ্র আছে। সেইজন্য বলছেন আপনি ত্রিসত্য। এই জগৎ হল সেই সৎএর উপর নাম আর রূপের খেলা। ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ এবং ব্যোম এই পঞ্চভূতের মধ্যে তিনি অন্তর্যামী রূপে অবস্থিত বলেই এই দৃশ্যমান জগৎ সত্য রূপে প্রতিভাসিত। আপনিই সত্যস্বরূপ, *ত্রিসত্যং*।

তারপরে আবার বলছেন *সত্যস্য যোনিম্*, এখনে যত কটি 'সত্য' বলা হয়েছে প্রত্যেকটি সত্যের আলাদা আলাদা অর্থ। *সত্যস্য যোনিম্* বলতে বলছেন আপনি হলেন *যোনিম্*, যোনিম্ মানে যেখান থেকে জন্ম হয়। কার জন্ম হয়? সত্যের, আপনার থেকেই সত্যের জন্ম হয়। এই অর্থ করলে তো গীতার দর্শনের বিরুদ্ধে চলে যাবে। আসলে বলতে চাইছেন ভগবানই তো আছেন, ভগবান ছাড়া তো আর কিছু নেই। তাহলে ভগবান আবার কার যোনি হবেন? ভগবানের বাইরে যদি কিছু থাকত তাহলেই তো জন্মের ব্যাপার আসতো, কিন্তু ভগবান ছাড়া তো কিছু নেই, তাই তিনি কাকে আবার জন্ম দিতে যাবেন। পরম সত্য ভগবান এই ব্যাপারে

কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু ব্যবহারিক জগতে যখন নামছি তখন তো বহু দেখছি। আচার্য শঙ্কর তাই বারবার দুটো সত্তার কথা বলছেন ব্যবহারিক সত্তা আর পারমার্থিক সত্তা। আমি, আপনি, জগৎ সবই সত্য কিন্তু এটাই ব্যবহারিক সত্তা, এর বাস্তবিক সত্তা হল পারমার্থিক। ব্যবহারিক সত্তাটাও সত্য। যেমন এই বোতল আছে, এই বোতলটা সত্য, কিন্তু এই বোতলটা যত না সত্য তার থেকে বেশী সত্য হল বোতলের প্লাস্টিকের সত্তাটা। প্লাস্টিক যত সত্য তার থেকে বেশী সত্য হল এর কার্বন উপাদানগুলো। কার্বনের থেকেও যদি বেশী সত্যকে জানতে চাইব তখন এসে যাবে ইলেক্ট্রন প্রোটন। ইলেক্ট্রন প্রোটন থেকে বেশী সত্য এনার্জী। বিজ্ঞান এইভাবে বস্তুর চরম সত্যে উপনীত হয়। কিন্তু আমাদের ধর্মশাস্ত্র অন্য দিক দিয়ে বস্তুর পরম তত্ত্বের দিকে এগিয়ে চলে। তাঁরা দেখালেন পঞ্চ মহাভূতই (আকাশ, অগ্নি, বায়ু, জল ও পৃথিবী) শেষ সত্য। কিন্তু সেই সত্যেরও যোনি আপনি। এই পঞ্চ তত্ত্ব কোথা থেকে জন্ম নিয়েছে? ভগবান থেকেই জন্ম নিয়েছে। কিন্তু সাংখ্যদর্শনের মতে এই পঞ্চ মহাভূত প্রকৃতি থেকে জন্ম নেয়। কিন্তু ভাগবত বলছে, শুধু ভাগবতই নয়, বেদান্তের শেষ কথা ব্রহ্মসূত্রও প্রথমেই বলছে *জন্মাদস্য যতঃ,* ঈশ্বর থেকেই সব কিছুর জন্ম।

শুধু তাই নয়, *নিহিতং চ সত্যে,* ওই যে জিনিষগুলোর মধ্যে যা আছে তার ভেতরেও সত্য আপনি। যেমন আমার মা, মা হলেন আমার যোনি, আমার জন্ম আমার মা থেকে কিন্তু আমার মা আমার মধ্যে ঢুকে নেই। কিন্তু ভগবান সব কিছুর যোনি, তিনিই সব কিছুর জন্ম দিচ্ছেন আবার সব কিছুর মধ্যে তিনিই ঢুকে আছেন। ঈশ্বর ছাড়া কিছু নেই এটাই মূল কথা। *সত্যস্য সত্যমৃতসত্যনেত্রং,* জগতের যা কিছু আছে তার পারমার্থিক রূপ আপনিই, অর্থাৎ সব কিছু পারমার্থিক সত্তা আপনি। এই জগতের পথপ্রদর্শক আপনি আর আপনাকে পাওয়ার একটাই পথ, সত্যকে অবলম্বন করা। আপনি হলেন *সত্যাত্মকং,* সত্যই আপনার আত্মা। এই সত্য কিন্তু 'সদা সত্য কথা বলিবে' সেই সত্য নয়। এই সত্য সৎকে বলা হচ্ছে, *সত্তা মাত্রম্,* অর্থাৎ তিনিই আছেন। তিনিই আছেন বলতে বোঝায় তাঁর বাইরে যা আছে সেটা মিথ্যা।

দেশ, কাল ও বস্তুতে পরিচ্ছিন্ন, এই তিনটে দিয়ে যা সীমিত এবং যার মধ্যে ষড়্‌বিকার আছে সেটাই অসৎ। যেমন এই বোতল, বোতলটা এই টেবিলে আছে, অন্য টেবিলে বোতলটা নেই। এইভাবে বোতলটা দেশে সীমিত হয়ে গেল, সেইজন্য এটা অসৎ। কিন্তু প্লাস্টিক রূপে এখানেও আছে আবার অন্য জায়গাতেও আছে। তাহলে তো বোতল অসৎ নয়। না, কালের বিচারে তখন প্লাস্টিক অসৎ হয়ে যাবে। কারণ একশ বছর আগে প্লাস্টিক ছিল না, কিন্তু এখন আছে। তাহলে কালের মধ্যে প্লাস্টিক সীমিত হয়ে গেল। আর বস্তু রূপে তো সীমিত হয়েই আছে। কারণ লোহার মধ্যে প্লাস্টিক নেই। যে কোন জিনিষ যা দেশ, কাল ও বস্তুতে আবদ্ধ থাকে সেটাই অসৎ। ভগবান কিন্তু এই তিনটের কোথাও আবদ্ধ নেই। সেইজন্য শ্রীরামকৃষ্ণ যদি শুধু রামকৃষ্ণলোকে থাকেন বলা হয় তাহলে ঠাকুরকে অসৎ বানিয়ে দেওয়া হবে। ভালো লোকের মধ্যে ঠাকুর আছেন, খারাপ লোকের মধ্যে ঠাকুর নেই, তাহলে ঠাকুর অসৎ হয়ে গেলেন।

এই জায়গাতে এসেই অন্যান্য ধর্ম থেকে হিন্দু ধর্ম পুরোপুরি আলাদা হয়ে যায়। অন্যান্য ধর্মে বলে ভগবান ভালো লোকের মধ্যে থাকেন, বদমাইশদের মধ্যে শয়তান থাকে। অন্যান্য ধর্মে বলে জগতের কিছু কাজ ভগবান করেন, কিছু কাজ শয়তান করে। কিন্তু হিন্দুদের কাছে সব কিছুই ভগবান হয়েছেন। বৈকুণ্ঠও ভগবানের আবার নরকও ভগবানের, ভালোটাও ভগবানের খারাপটাও ভগবানের, শুভ-অশুভ যা কিছু আছে সবই তিনি। আমাকে ঠিক করতে হবে আমি কি চাই। ঠাকুর ভালো উপমা দিচ্ছেন একজনের কাছে একটা রঙের গামলা ছিল। যে যেই রঙে কাপড় ছুপাতে চাইত তাকে সেই রঙের গামলায় চুবিয়ে সেই রঙ করে দিত। কেউ কাপড়ে লাল রঙ চাইছে, ওই গামলাতে চুবিয়ে লাল রঙ করে দিত, কেউ নীল রঙ চাইছে ওই একই গামলাতে চুবিয়ে সে নীল রঙে কাপড় ছুপিয়ে দিচ্ছে। একজন জিজ্ঞেস করছে আপনি কি রঙে ছুপে আছেন। গামলাওয়ালা বলছে তোমার কি রঙ লাগবে সেটা আগে বল। ঠাকুরের এই উপমার তাৎপর্য হল – ঈশ্বর হলেন এই রঙের গামলা, যে যা চাইছে তিনি তাকে তাই দিচ্ছেন। আমাদের ঠিক করতে হবে আমরা কি চাইছি। সত্যি কথা বলতে কি হিন্দু ধর্ম একেবারে সাধারণ মানুষের জন্য নয়। খুব উচ্চ মন ও উচ্চ আধার না হলে

হিন্দু ধর্মের দর্শন বেদান্তের কথা ধারণা করা খুব কঠিন। আচার্য শঙ্কর বলছেন তরুণ অবস্থায় যুবক ছেলে শুধু সুন্দরী তরুণীকে খুঁজে বেড়ায়। তাহলে যুবক ভগবানকে কোথায় দেখছে? ওই সুন্দরী তরুণীর মধ্যে দেখছে। ঠিক তেমনি একজন দস্যু, যে মানুষের সর্বস্ব লুট করে নেয়, সে টাকার মধ্যে ভগবানকে দেখছে। যুবক, দস্যু এরা একটা ক্ষুদ্র জিনিষের মধ্যে ভগবানকে আবদ্ধ করে দিচ্ছে। ফলে এদের কষ্টটাও বেশী। তরুণ তরুণীর প্রতি আকৃষ্ট হবে, মানুষ নেশা করবে, মানুষ মৈথুন করবে, এতে কোন দোষ নেই। এটাই এদের স্বাভাবিকত্ব। তবে এটা ঠিক, এদের মধ্যে ভগবানের গুণ নেই, আর ভগবানকেও পাবে না। মনুস্মৃতিতে বলছেন *ন মাংসভক্ষণে দোষো ন মদ্যে ন চ মৈথুনে। প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা।।৫/৫৬।* মাংস খাওয়া, মদ্য পান করা ও মৈথুন করা এগুলো দোষের কিছু নয়। কিন্তু যাঁরা এগুলো করেন না, তাঁরাই মহৎ। একটা ছেলে মেয়ের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে এতে কোন দোষ নেই, কিন্তু যে আকৃষ্ট হচ্ছে না সেই মহৎ। নিজের নাতির প্রতি ভালোবাসা থাকাটা স্বাভাবিক, না থাকাটাই অস্বাভাবিক। কিন্তু যখন সবারই নাতির প্রতি একটা স্নেহ ভালোবাসা থাকবে তখন বুঝতে হবে তার মধ্যে সাধুপুরুষের গুণ প্রকাশ পেয়েছে। জগতে থাকতে গেলে এই বোধ থাকবে – এ আমার বেশী প্রিয়, এ আমার কম প্রিয়। ঠাকুরেরও নরেন, রাখালের প্রতি ভালোবাসাটা বেশী ছিল। কিন্তু তিনি ওই ভালোবাসাতে আবদ্ধ ছিলেন না। সাধারণ মানুষ যাকে ভালোবাসে সে তার মধ্যেই আবদ্ধ থাকে। এখানে যে বলা হচ্ছে ঈশ্বর ছাড়া কিছু নেই তাতে এটাই বোঝায় স্বর্গটাও ঈশ্বরের, নরকটাও ঈশ্বরের, সদাচারও তাঁর, দুরাচারও তাঁর। তুমি যেটা খারাপ মনে করছ সেটাও ঈশ্বর, যেটা ভালো মনে করছ সেটাও ঈশ্বর, তুমি নিজে ঠিক কর তুমি কি চাইছ। তবে তুমি যেটা চাইবে তার ফলটাও তোমাকে নিতে হবে। সদাচার করলে তুমি এই ফল পাবে, দুরাচার করলে এই ফল পাবে। শেষে বলছেন, *ত্বাং শরণং প্রপন্নাঃ* হে প্রভু! এটাই আপনার স্বরূপ, আমি আপনার শরণাগত, আপনার চরণকমলে আমার মাথা নত করছি। কারণ ভগবান ছাড়া আর কার কাছে শরণ নেবে! আমাদের দুর্ভাগ্য যে, যার অর্থ আর ক্ষমতা আছে তার কাছেই আমরা শরণ নিই, তার কাছেই মাথা নত করি।

আমরাও বলি ঠাকুর হলেন সত্যস্বরূপ। ঠাকুর বারবার বলছেন সত্যই কলির তপস্যা। ঠাকুরের এই কথা ভাগবতেই বলা হয়েছে, সত্যে অবিচল থেকেই ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। ঠাকুরের যখন সত্যের আঁট ছিল তখন তাঁর এমন অবস্থা ছিল যে তিনি যেটা বলবেন সেটাই তাঁকে করতে হবে, যদি বলতেন ঝাউতলায় যাবো, বাহ্যে না পেলেও একবার ঝাউতলায় ঘুরে আসতে হবে। কিন্তু কোন কোন সময় তিনিও ব্যবহারে সত্যের আঁট রাখেননি। বিয়ের সময় শ্রীশ্রীমাকে প্রতিবেশীদের কাছ থেকে গয়না ধার করে এনে কনের সাজে সাজাতে হয়েছিল। মায়ের বাড়ির লোকদের ধারণা ছিল এই গয়নাগুলো শ্রীশ্রীমায়ের শ্বশুড় বাড়ীরই। বিয়ের পর সেই গয়না প্রতিবেশীকে ফেরত দেওয়ার সময় মায়ের শরীর থেকে সেই গয়না ঠাকুর নিজেই খুলেছিলেন। মায়ের বাড়ির লোকেরা বুঝে গেছেন সব গয়না ধার করা। ওনারা যখন রেগেমেগে শ্রীমাকে জয়রামবাটিতে নিয়ে চলে গেলেন, তখন ঠাকুর বলছেন 'নিয়ে যাক না তাতে কি হয়েছে, বিয়েতো আর ফেরত নিয়ে যেতে পারবে না'। মহাভারত এবং অন্যান্য স্মৃতিশাস্ত্রেও বলছে বিয়ের সময় মিথ্যে কথা বলা চলে, ঠাকুরও তাই করলেন এবং শাস্ত্রের কথা সিদ্ধ করে দেখালেন। কীভাবে? বিয়ের সময় এই ধরণের জিনিষ করা চলে। কনে বা পাত্র পক্ষ থেকে বলা হয়, হ্যাঁ আমাদের প্রচুর টাকা-পয়সা, গয়না আছে। পরে দেখা গেল কিছুই নেই। শ্রীমায়ের জন্য গয়না ধার করে নিয়ে আসা হল, কোনটাই তাঁদের নয়। আবার ঠাকুরের কাছে কামারপুকুরের মেয়েরা দুপুরে ঈশ্বরীয় লীলা কাহিনী, গান শুনতে আসত। বাড়ির লোকেরা আপত্তি করতে পারে, তাই ঠাকুর তাদের শিখিয়ে দিলেন মেলার নাম করে এখানে আসবে, দু পয়সা দিয়ে মেলা থেকে হাড়ি কিনবে আর এখানে চলে আসবে। ঠাকুরের যখন সত্যের আঁট ছিল তখন এক রকম, কিন্তু ঐ আঁট নিয়ে জগৎ চলে না। সেইজন্য হচ্ছে সত্য সঙ্কল্প, সত্য সঙ্কল্প মানে – আমি যেটা সঙ্কল্প করলাম সেটাই হবে। ঠাকুর আবার মন মুখ এক করতে বলছেন। আবার বলছেন সংসারে সব কাজ করবে কিন্তু মনে মনে জানবে এরা আমার কেউ নয়, কিন্তু কাজ করার সময় দেখাবে সবাই যেন আমার কত আপনার। এখানে মন আর মুখতো এক হল না। এগুলোই ধর্মের সূক্ষ্ম গতি, প্রচুর সাধনা না থাকলে এসব কথার ধারণা করা যায় না।

সংসার বৃক্ষের বর্ণনা

শ্রীকৃষ্ণ দেবকীর গর্ভেই আছেন, এখনো তাঁর জন্ম হয়নি। স্তুতি করে দেবতাদিরা বলছেন – আপনি হলেন মধুর বাণী আর সমদর্শনের প্রবর্তক – মানে, কীভাবে মিষ্টি করে কথা বলতে হয়, সমান ভাবে সবাইকে কীভাবে দেখতে হয়, এই ভাবগুলি আপনিই প্রবর্তন করেন। কারুর প্রতি আপনি শত্রু ভাবাপন্ন নন। আর এই সংসার কি? ***একায়নোঽসৌ দ্বিফলস্ত্রিমূলশ্চতূরসঃ পঞ্চবিধঃ ষড়াত্মা। সপ্তত্বগষ্টবিটপো নবাক্ষো দশচ্ছদী দ্বিখগো হ্যাদিবৃক্ষঃ।। ১০/২/২৭।*** এক থেকে দশ সংখ্যাকে অবলম্বন করে কয়েকটি শব্দ তৈরী করে পুরো সংসার-চিত্রকে ফুটিয়ে তুলেছেন। প্রতিভা কি জিনিষ! এই সব শ্লোক না পড়লে বোঝা যায় না। শ্লোকের শেষে বলছেন, এই যে সংসার, এটি এক সনাতন বৃক্ষ, এই সংসারের কখনই নাশ হয় না। ইসলাম বা খ্রীশ্চান ধর্মে ভগবান ইচ্ছা করলেন আর সংসার দাঁড়িয়ে গেল, সৃষ্টির ব্যাপারে হিন্দুদের কাছে এই তত্ত্ব একেবারেই দাঁড়াবে না। এই সংসার অনাদি, অনাদি কাল থেকে এই সংসার চলে আসছে আর চলতেই থাকবে। সংসার কবে সৃষ্টি হল, এই প্রশ্ন কাদের? বিজ্ঞানীদের প্রশ্ন, এই সমস্যা বিজ্ঞানীদের। হিন্দুদের কাছে সৃষ্টির শুরু নিয়ে কোন সমস্যা নেই, কারণ আমাদের কাছে সংসার অনাদি। গীতাতেও এই ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে *ঊর্দ্ধমূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্*।

মুণ্ডকোপনিষদে বলছেন *দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া*, এই বৃক্ষে দুটি পাখি বাস করে, একটি পাখি জীবের প্রতিনিধি আর অন্য পাখিটি ঈশ্বর। শ্লোকের শেষে এই একই কথা বলছেন *দ্বিখগো হ্যাদিবৃক্ষঃ*, এই অনাদি বৃক্ষে দুটি পাখি বাস করে, জীব আর পরমাত্মা। তাহলে কটি সত্তা? আসলে এই ধরণের বাক্য থেকেই হিন্দু শাস্ত্রে অনেক বিতর্ক সৃষ্টি হয়। বিচার করলে এখানে তিনটে সত্তা এসে যাবে – জীব, ঈশ্বর আর সংসার। যাঁরা মাধ্বাচার্যের মত ঘোর দ্বৈতবাদী, তাঁরা এই শ্লোককে আধার করে তিনটে সত্তাকেই সত্য রূপে স্বীকার করে সেইমত তাঁদের সাধনার পথ অবলম্বন করেন – ভগবান আছেন, জীব আছেন সেইজন্য সংসারও আছে, সংসার না হলে জীব হবে না। রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী মতে ঈশ্বর আছেন জীবও আছে, কিন্তু দুটো সত্তা আলাদা, যেমন গাছ আর গাছের পাতা, ফুল, ফল আলাদা। পাতা, ফুল, ফল এগুলো হল গাছের সাথে অঙ্গ-অঙ্গী সম্পর্ক। কিন্তু বেদান্ত মতে একটিই সত্তা, তিনিই আছেন। তাহলে বেদান্তের দৃষ্টিতে জীব, ঈশ্বর আর বটবৃক্ষকে কি ভাবে ব্যাখ্যা করা হবে? সেইজন্য আমরা প্রথম দিন থেকে বলে আসছি ভাগবত অত্যন্ত কঠিন ও দুর্বোধ্য শাস্ত্র। কারণ ভাগবতের একই শ্লোককে আধার করে খুব সহজেই অনেক দর্শন দাঁড় করিয়ে দেওয়া যায়। বেদান্ত খুব সহজ ভাবে বলে দেবে – এই যে সংসার বৃক্ষ এটি দেশ, কাল ও বস্তুতে পরিচ্ছিন্ন। সংসার আর ভগবান দুটো অনন্ত সত্তা কখন একসাথে চলতে পারে না, তা নাহলে সংসারই ভগবান হয়ে যাবে। এর আগের শ্লোকেই বলছেন *সত্যব্রতং সত্যপরং ত্রিসত্যং সতস্য যোনিম্*, সংসার পঞ্চ তন্মাত্রা দিয়ে নির্মিত, এই পঞ্চ তন্মাত্রার যোনি আপনি। তার মানে সংসার সনাতন নয়, সনাতন নয় মানে সচ্চিদানন্দ নয়। তবে হ্যাঁ, অনেক দিন ধরে এই সংসার বৃক্ষ চলে আসছে। আমার ঠাকুর্দা এই রকমই দেখে এসেছিলেন, তাঁর ঠাকুর্দাও এই ভাবেই সংসার বৃক্ষকে দেখে এসেছেন, সেখান থেকে ধারণা হয়ে গেছে সংসার বৃক্ষ অনাদি। জগৎ এই ভাবেই দেখা যাচ্ছে বলে বলছেন সনাতন। সনাতন মানে, ঈশ্বর যেই অর্থে সনাতন সংসার সেই অর্থে সনাতন নয়। সনাতনকে দুই ভাবে দেখা হয়, বহু পুরনো, যেটা অনেক দিন ধরে চলে আসছে সেটাকেও যেমন সনাতন বলা হয় আবার সনাতন যাঁর কোন আদি, মধ্য ও অন্ত নেই। আচার্য শঙ্করও এক জায়গায় উপমা দিয়ে বলছেন, এই পৃথিবীকেও সনাতন বলা হয়, কিন্তু এই সনাতন মানে অনেক দিন ধরে চলে আসছে। কিন্ত ঈশ্বর সনাতন মানে, তিনিই আছেন। এই সংসার মহৎ থেকে বেরিয়েছে, যখন ব্যষ্টি মন থেকে এই জগতকে দেখবো তখন জীব দেখাবে, যখন সমষ্টি মন থেকে দেখবো তখন দেখাবে ঈশ্বর। সমষ্টি মন আছে বলে এই সনাতন সংসার দেখা যাচ্ছে, সমষ্টি মন আছে বলে আবার সনাতন আদি ঈশ্বরকেও দেখাচ্ছে। আবার সমষ্টি মন আছে বলে ব্যষ্টি মন হয়ে যায়, ব্যষ্টি মন আছে বলে জীব দেখাবে। মন আছে বলে এত খেলা দেখাচ্ছে। সেইজন্য বেদান্তের উদ্দেশ্য হল মনোনাশ, এই মনকে নাশ করে দেওয়া। ঠাকুর বলছেন মনেতেই বদ্ধ মনেতেই মুক্ত।

এই মনই বদ্ধ করে এই মনই আবার মুক্ত করে। মন আছে বলে এই সংসার দেখাচ্ছে, মন আছে বলে জীব দেখাচ্ছে আর এই মনই আবার ঈশ্বরকেও দেখাচ্ছে।

এই বৃক্ষের কি বৈশিষ্ট্য? এই বৃক্ষের আশ্রয় এক, এই এক মানে প্রকৃতি – বৃক্ষের মূলটাই প্রকৃতি। সংসার কোথা থেকে এসেছে? প্রকৃতি থেকে। এই বৃক্ষের ফল দুটি – সুখ আর দুঃখ। শেকড় তিনটি – সত্ত্ব, রজ ও তম। রস চারটি – ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। এই সংসার বৃক্ষকে পাঁচটি জিনিষ দিয়ে জানা যায় – এই পাঁচটি হল পঞ্চ ইন্দ্রিয়। এর স্বভাব ছয় রকম – জায়তে (জন্ম হওয়া), অস্তিতে (আমি আছি এই বোধ), বর্ধতে (বৃদ্ধি পেতে থাকা), বিপরিণামতে (যেমন দুধ থেকে দইয়ে পরিবর্তন হওয়া), অপক্ষয়িতে (ধীরে ধীরে ক্ষয় প্রাপ্ত হওয়া) এবং বিনশ্যতে (বিনাশ হয়ে যাওয়া)। যার মধ্যে এই ষড়বিকার থাকবে সেটাই অসৎ। যে কোন জিনিষের মধ্যে যদি একটি বিকার থাকে তাহলে তার মধ্যে বাকি পাঁচটি বিকারও থাকবে, থাকতে বাধ্য। রস, রুধির, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা এবং শুক্র এই সাতটি ধাতু বৃক্ষের বল্কল। পঞ্চ মহাভূত এবং মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার বৃক্ষের আটটি শাখা, বৃক্ষের নয়টি কোটর মুখ, কান, নাক, চোখ ইত্যাদি যেগুলিকে নবদ্বার বলা হয়। প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান, সমান, নাগ, কূর্ম, কৃকর, দেবদত্ত এবং ধনঞ্জয় এই দশটি প্রাণ বৃক্ষের দশটি পাতা। এই সংসাররূপ সনাতন বৃক্ষে দুটি পাখি বাস করে – জীব আর পরমাত্মা। ব্রহ্মাদি দেবতারা এই ভাবে স্তুতি করছেন – হে প্রভু! এই সংসাররূপ বৃক্ষের উৎপত্তির একমাত্র কারণ আপনিই, আর আপনারই অনুগ্রহে এর স্থিতি বা রক্ষা হয়। এইভাবে ব্রহ্মা, শিব ও সমস্ত দেবতারা সাক্ষাৎ ভগবানের স্তুতি করে যাচ্ছেন। এগুলো আর কিছুই না, ঈশ্বরের স্বরূপ কত ভাবে বর্ণনা করা যেতে পারে তারই একটু ঝলক।

তারপরে বলছেন ***ত্বমেক এবাস্য সতঃ প্রসূতিস্ত্বং সন্নিধানং ত্বমনুগ্রহশ্চ। ত্বন্মায়য়া সংবৃতচেতসস্ত্বাং পশ্যন্তি নানা ন বিপশ্চিতো যে।।১০/২/২৮।*** হে প্রভু! এই সংসার বৃক্ষের উৎপত্তির একমাত্র কারণ আপনি। আপনারই অনুগ্রহে এই সংসারের পরিপালন হয়। গীতায় ভগবান নিজের স্বরূপের কথা বলতে গিয়ে বলছেন *পিতাহহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ*, এই জগতের পিতা আমি, মাতাও আমি, পিতামহও আমি, আমিই এই জগতের পোষণ করে থাকি। এই জগতে দুই রকমের লোক আছে, এক হল *সংবৃতচেতসঃ* আর দ্বিতীয় ধরণের হল *ন বিপশ্চিতো যে*, জ্ঞানী আর অজ্ঞানী। অজ্ঞানী সংসারের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় দেখে আর জ্ঞানী দেখেন তিনিই আছেন। কথামৃতে ঠাকুর বর্ণনা করছেন – বলি দেওয়ার যে ছাগ সেও সচ্চিদানন্দ, যেটা দিয়ে বলি দেওয়া হবে সেই খড়্গও সচ্চিদানন্দ, যে যূপে বলি হবে সেটাও সচ্চিদানন্দ, যে বলি দেবে সেও সচ্চিদানন্দ। যিনি এইভাবে সব কিছু দেখছেন যে ছাগকে বলি দিতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সেও ঈশ্বর আর যে বলি দিতে যাচ্ছে সেও ঈশ্বর, যে দড়ি দিয়ে বাঁধা হয়েছে সেটাও ঈশ্বর, যে যূপে বলি দেওয়া হবে সেটাও ঈশ্বর আর খড়্গটাও ঈশ্বর, তার আর কোথা থেকে শোক মোহ আসবে! যিনি দেখেন তিনি বাস্তবিক এভাবেই দেখেন। আমরা অনেক সময় ভাবি এগুলো আমাদের মধ্যে বিচার করেই শুধু আসে। কিন্তু না, বিচার করে আসে না, যাঁরা জ্ঞানী পুরুষ তাঁরা এই রকমটিই দেখেন। কিন্তু যারা *ত্বন্মায়য়া সংবৃতচেতসঃ* যাদের মন ঈশ্বরের মায়াতে ঢেকে আছে তারা সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় এই তিনটে অবস্থাকে আলাদা আলাদা দেখে। গীতাতেও ভগবান একই কথা বলছেন – *বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ*, যাঁদের জ্ঞান চক্ষু অর্থাৎ যাঁরা আত্মাক জানেন, তাঁরা এক রকম দেখেন, যাদের জ্ঞানচক্ষু মায়ার দ্বারা আবৃত তারা অন্য রকম দেখে। তাই না, দেবতারাও দেখেন ব্রহ্মা সৃষ্টি করছেন শিব সংহার করছেন।

ঈশ্বরের স্বরূপ বর্ণন এবং ঈশ্বরের ইতি করা যায় না

স্তুতি করে ভগবানকে বলছেন ***বিভর্ষি রূপাণ্যববোধ আত্মা ক্ষেমায় লোকস্য চরাচরস্য। সত্ত্বোপপন্নানি সুখাবহানি সতামভদ্রাণি মুহুঃ খলানাম্।।১০/২/২৯।*** এখানে ভগবানের অবতারত্ব নিয়ে বলা হচ্ছে। আপনি হলেন জ্ঞানস্বরূপ পূর্ণ আত্মা, সচ্চিদানন্দ। কিন্তু *ক্ষেমায় লোকস্য চরাচরস্য*, এই চর অচর, তার মধ্যে মাটির ঢেলা, ইট, পাথর, জল সবই ঈশ্বর, সবেরই মধ্যে সেই আত্মারই প্রকাশ। কিন্তু এই সব জড় বস্তুতে আত্মাকে দেখা যায় না। সূর্যের প্রতিবিম্ব সব জিনিষে দেখা যায় না। কাঁচে সূর্যের প্রতিবিম্ব ভালো দেখা

যায়। আবার মাটির ঢেলাতে দেখা যায় না, কিন্তু তাই বলে সূর্য নেই বলা যাবে না, শুধু প্রকাশের তারতম্য হচ্ছে। *বিভর্ষি রূপাণী*, আপনি অনেক রূপ ধারণ করেন। ঠাকুরও বলছেন তিনি নরলীলা করেন, তিনি দেবলীলা করেন এবং তিনি আবার ঈশ্বর লীলা করেন আর সৃষ্টিলীলাও করেন। কেন তিনি বিভিন্ন রূপে লীলা করেন? *ক্ষেমায় লোকস্য চরাচরস্য*, ক্ষেম মানে যেটা আছে সেটাকে ধরে রাখা। সৃষ্টি হয়েছে এবার একে ধরে রাখতে হবে তা না হলে সৃষ্টিটা বিচ্ছিন্ন হয়ে নষ্ট হয়ে যাবে। সৃষ্টিকে ভগবানই ধরে রাখেন। শ্রীশ্রীমা এক জায়গায় বলছেন – সৃষ্টি করা যে কত কঠিন কাজ, যিনি করেন তিনিই একমাত্র জানেন কত কঠিন। আমরা যদি মনে করি ভগবান ইচ্ছামাত্র সৃষ্টি করে দিয়েছেন, এ আর এমন কি ব্যাপার! কিন্তু একমাত্র শ্রীশ্রীমায়ের এই একটি কথায় পাওয়া যায় – যিনি সৃষ্টি করেন তিনি জানেন সৃষ্টি করা কত কঠিন কাজ। শ্রীশ্রীমাকে যদি আমরা জগজ্জননী রূপে দেখি, তিনিই এই সৃষ্টিকে জন্ম দিয়েছে, তিনিই লয় করছেন, তিনিই ধরে আছেন, তাহলে শ্রীশ্রীমায়ের এই কথাকেও মেনে নিতে হবে, যিনি সৃষ্টি করেন তিনিই জানেন সৃষ্টির কাজ কত কঠিন। যাকে সৃষ্টি করেছেন তাকে আবার পালন করতে হয়। মা শিশুকে জন্ম দিচ্ছে, একেই শিশুকে গর্ভে ধারণ করে রাখা কত কঠিন, ধারণ করার পর সন্তান প্রসব করা আরও কত কঠিন কাজ, প্রসব করার পর সেই নবজাত শিশুকে আবার কত কষ্টপাত করে, কত সখ-আহ্লাদ ত্যাগ করে লালন-পালন করে বড় করতে হয়।

সত্ত্বোপপন্নানি সুখাবহানি, আপনার ঠিক ঠিক বিশুদ্ধ সত্ত্বময় কল্যাণময় রূপের আবির্ভাব সাধুপুরুষদের কাছে সুখাবহ, কিন্তু অধার্মিক ও দুরাত্মাদের পক্ষে অকল্যাণকর। যেমন ভগবানের নৃসিংহ অবতার, বরাহ অবতার রূপ ভগবানের কল্যাণময় রূপ নয়। কিন্তু সাধু সন্ন্যাসীরা ভগবানের কল্যাণময় রূপ দেখতে চান। যেমন ঠাকুরের জীবন কল্যাণময় রূপ, কপিলমুনির কল্যাণময় রূপ। অন্য দিকে শ্রীরামচন্দ্রের রুদ্রমূর্তি আছে, শ্রীকৃষ্ণেরও রুদ্রমূর্তি আছে। ঠাকুরের কোথাও সেই রকম রুদ্রমূর্তি নেই। বলছেন এই যে আপনার কল্যাণময় বিশুদ্ধ সত্ত্বময় রূপ, এই রূপ কি করে? *সতামভদ্রাণি মুহুঃ খলানাম্*, যাঁরা সাধুপুরুষ তাঁরা এই রূপে খুব আনন্দ পান আর যারা দুরাত্মা তারা ভয় পায়। কারণ তাদের পাপের আপনি দণ্ডদাতা। এই ভাবটাই গীতায় এই ভাবে ফুটে উঠেছে *পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্*। ঠাকুরের অবতারত্ব একেবারে শুদ্ধ সত্ত্বগুণের আধারের, শুদ্ধ সত্ত্ব আধার দিয়ে দুষ্ট দমন হয় না। দুষ্ট দমন করতে গেলে রজোগুণ থাকতে হবে। মায়ার রাজ্যে ঠাকুরের সাথে নৃসিংহ অবতার বা শ্রীকৃষ্ণ অবতারের মিল খুঁজতে যাওয়াটা বোকামি। সেইজন্য এই বর্ণনার সাথে ঠাকুরের অনেক কিছু মিলবে না, কিন্তু কপিল মুনির সাথে মিলবে। কারণ কপিল মুনি শুধু বিশুদ্ধ জ্ঞানের প্রতিমূর্তি ছিলেন। কোন অবতারেই ভগবান একাধারে রুদ্রমূর্তি, কল্যাণমূর্তি, সংহারমূর্তি ধারণ করে আসেন না। যে কার্যোদ্ধারের জন্য যে গুণের বেশী প্রয়োজন অবতারকে তখন সেই গুণকে অবলম্বন করে আসতে হয়। কখন তিনি রজোগুণকে অবলম্বন করে আসেন, কখন তমোগুণ, কখন সত্ত্বগুণ আবার কখন সত্ত্ব-রজোগুণ মিলিয়ে আসেন। ঠাকুরের ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ সত্ত্ব। কিন্তু মনে রাখতে হবে যিনি ভগবান তিনি ভগবানই, তাঁর আবার রজো, তমোর কি আছে! তিনি একটি বিশেষ কার্যোদ্ধারের জন্য একটা বিশেষ গুণকে অবলম্বন করে এসেছেন।

এতক্ষণ ভগবানের বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হল। এবারে বলছেন ***স্বয়ং সমুত্তীর্য সুদুস্তরং দ্যুমন্ ভবার্ণবং ভীমমদভ্রসৌহৃদাঃ। ভবৎ পদাম্ভোরুহনাবমত্র তে নিধায় যাতাঃ সদনুগ্রহো ভবান্।।১০/২/৩১।*** সাধুপুরুষ কারা? যাঁরা সাধুপুরুষ তাঁরা সমস্ত প্রাণীর হিতৈষী। আপনার ভক্তবৃন্দরা নিজেরাও এই ভয়ংকর দুস্তর সংসার-সমুদ্র সমুত্তীর্ণ হয়ে যান। যাঁরা আপনার শ্রীচরণকে আশ্রয় করে আছেন, আপনার চরণ-কমল-তরী দ্বারাই তাঁরা এই দুস্তর সংসার-সমুদ্রকে অতিক্রম করেন। এই ধরণের সাধুপুরুষরা শুধু নিজেকেই জন্ম-মৃত্যু রূপ সংসার-সাগরের পার করে নিয়ে যান না, নিজেদের সাথে আরও পাঁচজনকেও তাঁরা পারে নিয়ে যান। শুধু তাই নয়, ***সত্ত্বং বিশুদ্ধং শ্রয়তে ভবান্ স্থিতৌ শরীরিণাং শ্রেয় উপায়নং বপুঃ। বেদক্রিয়াযোগতপঃসমাধিভিস্তবার্হণং যেন জনঃ সমীহতে।।১০/২/৩৪।*** হে ভগবান! আপনি যখন জগতের কল্যাণের জন্য সকল জীবের পক্ষে আপনার এই পরম মঙ্গলময় বিশুদ্ধ সত্ত্বময় শরীর প্রকট করেন, তখন বেদ, কর্মকাণ্ড, অষ্টাঙ্গযোগ, তপস্যা, সমাধি দিয়ে আপনার ভক্তরা আপনার সাধনা করেন। এই শ্লোকটি ঠাকুরের ক্ষেত্রে পুরোপুরি প্রযোজ্য। যদিও চৈতন্য মহাপ্রভুকে ঠাকুরও অবতার বলছে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের পর ঠাকুরের আগে পর্যন্ত মাঝের সময়টুকুতে বেদ

কর্মকাণ্ড সৃষ্টি হয়নি। বেদ সৃষ্টি, কিংবা কর্মকাণ্ড দিয়ে পূজা অর্চনা, অষ্টাঙ্গযোগ দিয়ে সাধনা শ্রীকৃষ্ণের পরে আনার শ্রীরামকৃষ্ণ অবতারে আবার শুরু হয়েছে। ভাগবতই এই কথা বলে দিচ্ছে, যখন আপনি বিশুদ্ধ সত্ত্ব শরীরের প্রকট হন, তখন নানা মার্গ দিয়ে আপনারই সাধনা করা হয়। কারণ আপনি যদি নাই থাকেন, একটা আধার যদি নাই থাকে তাহলে ভক্ত কার পূজা করবে! নির্গুণ নিরাকার থাকলে ভক্ত আধার কোথায় পাবে! আর অন্যথায় কোন অবলম্বন না থাকলে আপনার ভক্ত কীভাবে আর কীসের আরাধনা করবে!

এর পরের শ্লোকে আবার বলছেন ***সত্ত্বং ন চেদ্ধাতরিদং নিজং ভবেদ্ বিজ্ঞানমজ্ঞানভিদাপমার্জনম্। গুণপ্রকাশৈরনুমীয়তে ভবান্ প্রকাশতে যস্য চ যেন বা গুণঃ।।১০/২/৩৫।*** জগতে দৃশ্যমান যে তিনটে গুণ তা আপনার মধ্যেই প্রকাশিত দেখায় আর আপনার দ্বারাই প্রকাশিত হয়। কিন্তু যত রকম বৃত্তি দিয়ে এই গুণগুলিকে বোঝা যায়, তাই দিয়ে আপনার স্বরূপের শুধু মাত্র অনুমান হয়। আপনার প্রকৃত স্বরূপ আকার ইঙ্গিত ছাড়া বাস্তবিক বোঝা যায় না। কারণ আপনি মন, ইন্দ্রিয় ও বাণীর পারে, সেইজন্য আপনাকে কখন বোঝা যায় না। কীভাবে বোঝা যায়? ঠাকুর বলছেন শুদ্ধ মন, শুদ্ধ বুদ্ধি আর শুদ্ধ আত্মা এক। শাস্ত্রের সব কথা জানা হয়ে গেছে, মন প্রখর যুক্তিবাদী, বিরাট বক্তা, শাস্ত্রের কথা অনর্গল বলে যাচ্ছে, ভালো লেখক কবি, এই গুণ সমুদয়ের দ্বারা কখনই ভগবানকে অভিব্যক্ত করা যাবে না। কিন্তু যাঁরা আপনার নাম ও রূপের কীর্তন করেন, শ্রবণ করেন তাঁদের কখনই আর জন্ম-মৃত্যুর চক্রে ঘুরতে হয় না। ***ন তেহভবস্যেশ ভবস্য কারণং বিনা বিনোদং বত তর্কয়ামহে। ভবো নিরোধঃ স্থিতিরপ্যবিদ্যয়া কৃতা যতস্ত্বয্যভয়াশ্রয়াত্মনি।।১০/২/৩৯।*** হে প্রভু! আপনি জন্মরহিত, সব কিছু আপনার থেকেই জন্ম নিয়েছে। যদি বলা হয় এর জন্ম কোথা থেকে হয়েছে, তার জন্ম কোথা থেকে হয়েছে, এইভাবে হতে হতে এক জায়গায় গিয়ে বলতে হবে সব কিছু ভগবান থেকে জন্ম নিয়েছে। এরপর যদি বলে ভগবানকে কে জন্ম দিয়েছেন, এই প্রশ্ন আর করা যায় না। এটাকে বলে অনবস্থা দোষ। তাই বলছেন আপনি আছেন, কিন্তু আপনার কোন জন্ম হয়নি। *ভবস্য কারণং*, একদিকে আপনার জন্য হয়নি আবার অন্য দিকে আপনি এই জগতের কারণ।

বত তর্কয়ামহে, যদি তর্কের খাতিরে বলতে হয় তাহলে বলা যায় আপনার এই জন্ম পরিগ্রহ লীলা বিনোদ। বেদান্ত আর ভক্তিশাস্ত্রের মধ্যে এখানে এসে একটা বিবাদ লেগে যায়। ভক্তের কাছে এই সৃষ্টি পুরো সত্য। কারণ এর আগেই বলা হয়েছে এই সংসার বৃক্ষে দুটি পাখি বাস করে, যিনি এই কথা বলছেন তাঁর কাছে এই জগতও সত্য। কিন্তু যিনি শুদ্ধ-বুদ্ধ-নিত্য-মুক্ত ভগবান তিনি কেন এত ঝামেলা করতে যাবেন! এর কোন ব্যাখ্যা নেই, সেইজন্য বলা হয় এই সংসার তাঁর লীলা বিনোদ। স্তুতিতে যখন ভগবানের গুণচিন্তন হয় তখন সেই চিন্তন পুরোপুরি ভাবরাজ্যে ঢুকে যাবে, এখানে আর এই সংসার সাম্রাজ্যের কিছু নেই। এটাকে এই জাগতিক সাম্রাজ্যে নামিয়ে আনলে আমাদের তখন নানা রকমের যুক্তি তর্ক লাগাতে হবে। আচার্য শঙ্কর আবার ভাবরাজ্যে কখনই ঢুকতে দেবেন না, তিনি সরাসরি যুক্তি তর্কে নামিয়ে আনবেন। উনি একটি কথাই মানেন, তা হল বেদ কি বলছে। বেদ যদি এই কথা বলে থাকে তাহলে এটা ঠিক। কারণ বেদ হল শ্রুতি প্রমাণ। আমাদের ঋষিরা সমাধির গভীরে যা কিছু দেখেছেন সেগুলোকেই বেদে সংরক্ষণ করা হয়েছে। তারপরে আচার্য দেখবেন তুমি যে কথা বলছ সেটা যুক্তি সঙ্গত কিনা। তাঁর কাছে ভাবরাজ্যের কোন স্থানই নেই। যদি কেউ বলে ভগবান সৃষ্টি করেছেন, তখন তিনি বলবেন – ঠিক আছে তর্কে নামো, ভগবান সৃষ্টি করতে পারেন কি, পারেন না! মজার ব্যাপার হল, গীতার ভাষ্যে তিনি বলছেন ভগবান সৃষ্টি করেছেন। এই কথা না বললে গীতা দাঁড়াবেই না। আচার্যই আবার যখন মাণ্ডুক্যকারিকার ভাষ্য লিখছেন তখন বলছেন সৃষ্টি বলে আদপেই কিছু নেই। এই যে স্তুতিতে বলছেন *বিনোদং*, এটা আপনার লীলা খেলা মাত্র, সেখানে তিনি বলবেন *আপ্তকামস্য কা স্পৃহা*, যিনি আপ্তকাম তাঁর আবার কিসের স্পৃহা, খেলা করার ইচ্ছাই কেন করবেন! ভগবান তো আপ্তকাম, তিনি তো পূর্ণকাম, তাঁর তো কোন কামনা নেই, তিনি খেলা করতে যাবেন কেন! কাজ কে করবে? যে অপূর্ণ সেই কাজ করবে। কিন্তু ভগবান পূর্ণকাম, তিনি কেন সৃষ্টি করতে যাবেন! তাহলে এই যে সংসার দেখছি, সংসারের এত কিছু যে দেখছি এগুলো কি? আচার্য বলবেন, এটা সৃষ্টিই এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু ভগবান যেভাবে সত্য এই জগৎ সেই ভাবে সত্য নয়। এই জগতের ব্যবহারিক সত্তা আছে, আজ আছে কাল থাকবে

না। তাহলে যেটা আজ আছে কাল থাকবে না, এটা আবার কিসের সত্তা হতে পারে। তখন আচার্য বলবেন – এই জগৎ হল নাম রূপের খেলা। এই সৃষ্টিটা নাম রূপের খেলা। এগুলো অত্যন্ত উচ্চ ভাব, সাধারণ মানুষ এই জিনিষগুলো ধারণা করতে পারে না। আমাদের কাছে জগতও সত্য ঈশ্বরও সত্য। যাদের কাছে জগতও সত্য আবার ঈশ্বরও সত্য তাদের জন্য ঈশ্বর হলেন কৃপাময়। আমরা বিশ্বাস করি তাঁর কাছে প্রার্থনা করলে তিনি আমাদের প্রার্থনা পূরণ করেন। যে ঈশ্বর সম্বন্ধে এই রকম ধারণা, সেই ঈশ্বর তো অনায়াসে সৃষ্টি করতেই পারেন। কিন্তু তখন তো মনের মধ্যে প্রশ্ন আসে, তিনি এত ঝামেলার সৃষ্টি কেন করলেন, যার জন্য আমাদের দুঃখের শেষ নেই। তখন বলছেন *কারণং বিনা বিনোদং*, এই সৃষ্টিটা বিনোদ মাত্র, এমনি খেলার ছলেই তিনি সৃষ্টি করেন। কথামৃতে ঠাকুরও বলছেন সব তাঁর লীলা খেলা। একজন শুনে বলছেন – তাঁর তো লীলা খেলা! কিন্তু আমাদের তো প্রাণ যায়। ঠাকুর তখন বলছেন – আগে তুমি বিচার করে দেখো তুমি কে? তুমিই সেই রাম। যখন বিচার করে দেখবে তুমি ঈশ্বর থেকে আলাদা কিছু নও তখন কে কষ্ট পাচ্ছে, কে সুখ পাচ্ছে ভাবলে হাসি পাবে।

আমরা এই ক্ষুদ্র বুদ্ধি নিয়ে কি করে বুঝবো ঈশ্বর কেন সৃষ্টি করেছেন! এই প্রশ্ন হয়ই না। নামকরা একজন গণিতজ্ঞ ছিলেন, তিনি গণিতের সাহায্যে প্রমাণ করে দেখালেন যুক্তি-তর্কের একটা সীমা আছে। যুক্তি-তর্কের কথা কোন ব্যাপারে বলছেন? গণিতের ব্যাপারে, যুক্তি-তর্কের সীমানা গণিতে একেবারে নির্দিষ্ট করা আছে। হাইজেনবার্গও তাঁর uncertainty principle এ দেখালেন, একটা জিনিষকে দেখার পর যিনি verify করছেন তারও একটা সীমা আছে। ওই সীমাকে পেরিয়ে গেলে, যেখান থেকে quantum physicsএর জন্ম, সেখানে বলছেন, সীমাকে পেরিয়ে যাওয়ার পর এটাকে observe করে নিয়ম-কানুন তৈরী করতে পারা যাবে না। পদার্থ বিজ্ঞান হল observation scienceএর মধ্যে perfect, সেখানে বলছেন observationএরও একটা সীমা আছে। আর আমাদের পূর্বজরা হাজার হাজার বছর আগে বলে দিয়েছেন ভগবানের ব্যাপারে একটা সীমা আছে। আমাদের মন বুদ্ধির একটা সীমা আছে। অদ্বৈতের কাছে ভগবানের লীলা বলে কিছু নেই। যে সাধক এখন জগতে বহু দেখছে সেই সাধক যখন সমাধিতে চলে যাবে তখন সে যদি ভক্তিমার্গের সাধক হয় তাহলে দেখবে শ্রীকৃষ্ণই সব কিছু হয়েছেন, আর জ্ঞানমার্গের সাধক হলে দেখবে আত্মাই সব কিছু হয়েছেন, আত্মা ছাড়া কিছু নেই। তাহলে বাকি যা কিছু আছে এগুলো কি? এগুলো সব নাম আর রূপের খেলা। যে কৃষ্ণ ভক্ত সে দেখবে শ্রীকৃষ্ণই নানান রূপ ধারণ করে আছেন। তিনিই কংস হয়েছেন, তিনিই পূতনা হয়েছেন, তিনিই আবার শ্রীকৃষ্ণ হয়েছেন। একটি বাচ্চা ছেলে একটা ফড়িং এর পেছনে কাঠি ঢুকিয়ে মজা পাচ্ছে। তাই দেখে একজন সাধুবাবা হাসছেন আর বলছেন – নারায়ণ নারায়ণের কি দুরবস্থা করেছেন। এই ভাব সব সময় যার মধ্যে জাগ্রত হয়ে থাকে তার দ্বারা আর সংসার কার্য চলবে না। এই ভাব সব সময় ধরে রাখা যায় না। সেইজন্য এনারা বলেন লীলাখেলা।

শুকদেব এই শ্লোক দিয়ে অধ্যায়কে শেষ করছেন ***ইত্যভিষ্টূয় পুরুষং যদ্রূপমনিদং যথা। ব্রহ্মেশানৌ পুরোধায় দেবাঃ প্রতিযযুর্দিবম্।।১০/২/৪২।*** শুকদেব পরীক্ষিৎকে বলছেন 'হে পরীক্ষিৎ! এই যে ব্রহ্মাদি দেবতারা পরমপুরুষ ভগবানের স্তুতি করলেন তাহলে কি তিনি এই রকমই। আসলে মানুষ যখন ভগবানের স্বরূপ নিরুপণ করে তখন তারা তাদের নিজেদের বুদ্ধি অনুসারেই করে। ঈশ্বর ঠিক 'এই রকমই' এই কথা নিশ্চিত করে কখনই বলা যায় না'। এই সব শ্লোক পড়লে মনে হয় আমরা কত উচ্চ বংশের ধারক। আজ থেকে কত হাজার হাজার বছর আগে আমাদের পূর্বজরা এই ধরণের উচ্চ উচ্চ তত্ত্বগুলোকে ধ্যানের গভীরে প্রত্যক্ষ করে ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য লিপিবদ্ধ করে গেছেন। আজকে আমরা ঠাকুরের নামে বলছি বটে যে, তিনি ধর্ম সমন্বয় করে গেছেন। কিন্তু তা নয়, ধর্ম সমন্বয় ভারতে চিরদিন ছিল। প্রথম থেকেই ধর্ম সমন্বয়ই ছিল আমাদের মূল ভাব। এখানে বলছেন *ইত্যভিষ্টূয় পুরুষং যদ্রূপমনিদং যথা*, যিনি ঈশ্বর তাঁকে ইতি করা যায় না। মজার ব্যাপার হল, এই কথা ইসলাম ও খ্রীশ্চানেও বলছে। খ্রীশ্চান ধর্মে বলছে A God explained is no God, যে ভগবানকে ব্যাখ্যা করে দেওয়া যায় তাহলে সেই ভগবান কিসের ভগবান। কথামৃতেও এই ধরণের

উচ্চ তত্ত্বগুলিকে অত্যন্ত সহজ সরল গ্রাম্য ভাষায় ঠাকুর সবাইকে বলছেন, কিন্তু শাস্ত্র না পড়া থাকলে এগুলো বোঝা যায় না। কথামৃত বুঝতে গেলে শাস্ত্র অধ্যয়ন খুব দরকার।

ভাগবতে প্রথম দিকে আমরা কপিল মুনির কথা পেয়েছিলাম, তিনি তাঁর মাকে সাংখ্য দর্শন বোঝাচ্ছেন। এই কপিল মুনিকে স্বামীজী বলছেন Father of Indian philosophy। এই কপিলকে ভগবান গীতায় বলছেন *সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ*, অথচ ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে আচার্য শঙ্কর এই কপিল মুনির সাংখ্য দর্শনকে তুলোধূনো করে রেখে দিয়েছেন। আচার্য যুক্তি দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন যে সাংখ্য দর্শন আদপে কোন দর্শন হতে পারে না। শুধু সাংখ্যই নয়, যখন যোগদর্শনকে নিয়ে আসছেন তখনও তিনি যুক্তি তর্ক দিয়ে প্রমাণ করে পুরো কুচি কুচি করে কেটে রেখে দিয়ে বলে দিলেন যোগদর্শন বলে কোন দর্শন হতেই পারে না। আচার্য প্রমাণ করে দেখালেন সাংখ্য দর্শন পুরোপুরি বেদ বিরোধী, শুধু বেদ বিরোধীই নয় স্মৃতিরও বিরোধী। তাহলে কি কপিল মুনি সব ভুলভাল কথা বলে গেছেন? স্বামীজী কপিল মুনিকে ভারতীয় দর্শনের জনক আখ্যা দিয়ে কি কোন ভুল কাজ করছেন? না, কেউ একটুও ভুল করেননি। স্বামীজী এখানে সমন্বয় করছেন, তিনি যোগদর্শনের উপর রাজযোগ লিখলেন, সাংখ্য দর্শনের উপর কিছু ভাষণ দিলেন। রচনা আর ভাষণের মধ্য দিয়ে স্বামীজী সাংখ্য বেদান্তকে মেলাচ্ছেন, যোগ আর বেদান্তের সমন্বয় করিয়ে দিলেন। অথচ আচার্য শঙ্কর, যিনি হিন্দু ধর্মের মূল ভিত্তিকে দাঁড় করিয়ে গেছেন তিনি একেবারে যুক্তি দিয়ে সাংখ্য দর্শনকে উড়িয়ে দিয়ে বলছেন, সাংখ্য দর্শন বলে কোন দর্শন হতেই পারে না। এর ব্যাখ্যা কীভাবে দেওয়া যেতে পারে?

আমরা এই বোতলকে দেখছি জড় আবার আমরা আমাদের পরস্পরকে চেতন রূপে দেখছি। আর আমরা জানি জড় জড়কে জন্ম দেয় আর চেতন চেতনকে জন্ম দেয়। আমরা জানি, আমি আলাদা, আপনি আলাদা, এই জগৎ আলাদা, এটাই আমাদের স্বাভাবিক বুদ্ধি। এই সাধারণ বোধ-বুদ্ধি নিয়ে যখন বিচার করব তখন সাংখ্য দর্শনকেই ঠিক ঠিক দর্শন বলে মনে হবে। সেইজন্য সাংখ্য দর্শন সবার কাছে খুব সহজেই গ্রহণযোগ্য। সাংখ্য দর্শন মানে, চৈতন্য আছে প্রকৃতি আছে, আমি আছি তুমি আছ। আমরা যদি এখন মেনে নিই শ্রীরামকৃষ্ণ যখন সাধনা শুরু করেছেন তখন তাঁরও জগতের ব্যাপারে এই রকম জ্ঞানই ছিল। তিনিও প্রথমে দেখছেন মা কালী আছেন। তারপর মা কালী চৈতন্য, না কি জড়, এই নিয়ে তাঁর মধ্যেও প্রশ্ন আসছে। তিনিও পরিষ্কার দেখছেন তিনি আলাদা আর হৃদয়রাম আলাদা। ওই স্তর থেকে সাধনা করতে করতে দেখছেন মা কালীই সব কিছু হয়েছেন। তারপরের ধাপে দেখছেন মা কালীও নেই। ওই অবস্থায় গিয়ে আবার বলছেন, কী আছে মুখে বলা যায় না। শুকদেব ঠিক এই কথাই পরীক্ষিৎকে বলছেন, ঈশ্বরের ব্যাপারে নিশ্চিত করে কখনই বলা যায় না যে তিনি এই রকম। কেন বলা যায় না? সমস্যা হল, ঈশ্বরের কোন ইতি করা যায় না, এই ব্যাপাটাকেই বোঝা অত্যন্ত কঠিন। প্রথমে তাই শুধু শুনে যেতে হয়, শুনতে শুনতে একদিন নিজেরই ধারণা হয়ে যাবে। ঠাকুর খুব সহজ উপমা দিচ্ছেন – এক সের ঘটিতে কি পাঁচ সের দুধ ধরে!

আমার কাছে একটা এক লিটারের খালি বোতল আছে। এবার আমি জলের পাইপ থেকে সেই বোতলে জল ঢালছি। ঢালতে ঢালতে জল উপচে পড়ে গেল। এবারে যদি আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করেন কত জল ছিল, এর কি উত্তর আমি দেব? এখন কেউ বলবে তিন লিটার, কেউ বলবে দশ লিটার, কেউ বলবে একশ লিটার। আমি তো বোতল জলের পাইপে দিয়েই রেখেছি, আর জল উপচে পড়েই যাচ্ছে। আমার বোতলে এক লিটার জল যেটা আছে সেটা আমি বুঝতে পারছি, কিন্তু কত জল উপচে পড়ল, কত জল আসছে, কত জল জমা আছে আমি কি করে বলব? ভগবানের ক্ষেত্রে ঠিক এই ব্যাপারটা হয়, আমার আপনার মন বুদ্ধি দিয়ে যখন ঈশ্বরকে দেখছি, ওই মন বুদ্ধি যতটুকু ঈশ্বরকে ততটুকুই দেখতে পারছি। যিনি কালী ভক্ত তিনি ঈশ্বরকে কালী দেখবেন, যিনি কৃষ্ণভক্ত তিনি ঈশ্বরকে কৃষ্ণই দেখবেন। কিন্তু তার বাইরে ঈশ্বরকে কি করে জানবে! জানার কথা নয়। মুসলমানরা বলছে আল্লাই আছেন, খ্রীশ্চানরা বলছে গডই আছেন, আমি আপনি বলছি ঠাকুরই আছেন। কেউ ভুল কিছু বলছে না, সবাই ঠিক কথাই বলছে। কারণ আমি, আপনি, সারা জগৎ সব কিছুকে নিজের বুদ্ধিটুকু দিয়েই বিচার করছে, এই বুদ্ধির বাইরে কি আছে জানি না। এই কথাই এখানে বলছেন, যিনি অনন্ত তাঁকে আমরা কীভাবে বর্ণনা করব! তাঁকে বর্ণনা করা যায় না, তাঁর ইতি করা যায় না,

তিনি ‘এই রকমই’ নিশ্চিত করে এই কথা কখনই বলা যায় না। ‘বুদ্ধি দিয়ে তাঁকে ধরা যায় না’ এই একটি কথাই আমাদের ধারণা করতে বহু জন্ম লেগে যাবে। শাস্ত্রের কথা শুনতে শুনতে, পুরনো সংস্কারগুলো পরিষ্কার হতে হতে একদিন দপ্ করে আপনা থেকেই আমারই মনে হবে ‘আরে! তাই তো! তাঁকে তো এই বুদ্ধি দিয়ে ধরা যায় না’। এর জন্য আগে থেকে ভেতর থেকে একটা আধ্যাত্মিক সংস্কার তৈরী হওয়ার খুব দরকার।

হিন্দু ধর্মের অবতার তত্ত্ব

যাই হোক আমরা এবার তৃতীয় অধ্যায়ের শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের কথায় প্রবেশ করছি। তৃতীয় অধ্যায় শুরু করার আগে আমাদের কয়েকটি কথা শুনে রাখা ভালো। বল্লভাচার্য ভক্তিশাস্ত্রে একজন খুব নামকরা দ্বৈতবাদী সাধু ছিলেন। মাধ্বাচার্যরা হলেন এই বল্লভাচার্যেরই পরম্পরা। বল্লাভাচার্য থেকে শুরু করে মাধ্বাচার্যের মত ভাগবত পণ্ডিতরা বলেন ভাগবত পুরাণের প্রত্যেকটি শ্লোকের চব্বিশটি আলাদা অর্থ করা যায়। এমনিতেই ভাগবতের শ্লোক এত দুর্বোধ্য যে ভাষ্য ছাড়া সংস্কৃতের বড় বড় পণ্ডিতরাও শ্লোকের অর্থ বুঝতে পারেন না। সেইজন্য পণ্ডিত বলতে ভাগবত পণ্ডিতকেই বোঝায়। ভাগবতের সব থেকে বড় ভাষ্যকার হলেন বল্লভাচার্য। এই অধ্যায়কে পণ্ডিতরা শ্রীকৃষ্ণের জন্ম না বলে বলেন প্রাকট্য। গীতা বা মহাভারতেও বলা হয় ভগবান কখনই জন্ম গ্রহণ করেন না, তিনি প্রকট হন। হিন্দুদের অবতারতত্ত্বকে যাঁরা সমালোচনা করেন তাঁরা কিছুতেই এই জায়গাটা বুঝতে পারেন না যে, ভগবানের কখন জন্ম হয় না। মজার ব্যাপার হল অন্য ধর্মে ভগবান কখন জন্মই নেন না। যেমন ইসলামে কেউ যদি বলে আল্লা জন্ম নিলেন তাহলে সে খুব বিপদ পড়ে যাবে। ইসলামে এই জিনিষ হতেই পারে না। সেইজন্য মহম্মদকে বলতে হল আমি হলাম পয়গম্বর, আমি আল্লার কথা বলছি। খ্রীশ্চান ধর্মে যিশুকেও বলতে হচ্ছে (Son of God) আমি ঈশ্বরের পুত্র। অনেকে বলেন পিতা পুত্রের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না। ঠিকই বলছেন, কিন্তু তিনি ভগবান নন। হিন্দুরাও বলছে যিশু ভগবান, কিন্তু হিন্দুধর্ম মনে করে ভগবানের জন্ম হতে পারে না। আমরা শ্রীরামকৃষ্ণকে ভগবান বলছি, বলার সময় ঠিকই বলা হচ্ছে, এতে কোন ভুল নেই। কিন্তু তার সাথে এটাও বলতে হবে – যিনি ভগবান তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ রূপ দেহকে আশ্রয় করে আমাদের সামনে বিরাজ করছেন। আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে খুব সহজ কথা, কিন্তু তত্ত্বতঃ ধারণা করা অত্যন্ত কঠিন। শ্রীরামকৃষ্ণ ভগবান নন, যিনি ভগবান তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ, এই ব্যাপারটা একবার যদি আমাদের পরিষ্কার হয়ে যায় তখন অবতারতত্ত্ব, দ্বৈত, অদ্বৈত তত্ত্ব এগুলো পুরোপুরি স্পষ্ট হয়ে যাবে।

আমি কে? আমি অমুক নামধারি একজন ব্যক্তি, আমার অমুক দিনে জন্ম। যিনি মানব দেহধারী শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর জন্ম হয়েছে, কিন্তু এই জন্মটা ভগবানের জন্ম নয়। কারণ জন্ম তারই হবে যে দেশ, কাল ও বস্তুর মধ্যে সীমাবদ্ধ। যে কোন পদার্থের ছয় রকমের বিকার হবে, যাকে বলা হয় ষড়বিকার। ষড়বিকারের প্রথমটা শুরুই হয় জায়তে দিয়ে। তার মানে, যার জন্ম হবে তার মধ্যে বাকি পাঁচটি বিকার থাকবে। যার জন্ম হবে তারই বৃদ্ধি হবে, তারই ক্ষয় হবে আর তারই একদিন বিনাশ হবে। ভগবান যদি জন্ম নিয়ে থাকেন তাহলে ভগবান বড় হবেন, ভগবানের ক্ষয়ও হবে আর একদিন ভগবানেরও নাশ হবে। যে ভগবানের নাশ হয় সেই ভগবান কিসের ভগবান! সেইজন্য বলছেন ভগবানের কখন জন্ম হয় না। গীতাও একই কথা বলছে – *জন্ম কর্ম চ মে দিব্যং এবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ*, এখানে *তত্ত্বতঃ* শব্দটাই প্রধান। এনারা জানতেন ভগবানের জন্ম হয় না, কিন্তু যে জন্মটা আমরা দেখছি, জন্মাবার পর তাঁর যে কর্মগুলো দেখছি, সবই দিব্য। তাঁর জন্ম দিব্য, তাঁর কর্মও দিব্য – এটাকে যিনি তত্ত্বতঃ জানেন তাঁর আর পুনর্জন্ম হবে না। দিব্য জন্ম মানে তিনি আবির্ভূত হন। আমার আপনার ক্ষেত্রে বলা হবে না যে আমি আবির্ভূত হয়েছি। কারণ তিনি সর্বকালে, সর্বব্যাপী, সর্বস্থানে, সর্বদা বিরাজমান, তাঁর আবার জন্ম কি করে হবে! শ্রীরামকৃষ্ণ জন্ম নিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ মারা গেলেন বললে বলতে হয় ভগবান জন্ম নিলেন আবার ভগবান মারা গেলেন, এর থেকে হাসির কথা কি হতে পারে! এই জিনিষ দ্বৈতেও দাঁড়াবে না, অদ্বৈতে তো দাঁড়াবেই না। আচার্য শঙ্কর তাই বলছে *দেহবানিব জাত ইত চ লোকনুগ্রহং কুর্বন্ লক্ষ্যতে*। আচার্য শঙ্কর, যিনি অদ্বৈত বেদান্তের শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা ও ভাষ্যকার, তিনি বলছেন ভগবান জন্ম নিয়েছেন, কিন্তু *দেহবানিব জাত*, যেন দেহবান হলেন।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ভগবান অর্জুনের রথ চালনা করছেন। রথের বাইরে কে আছেন? রথের বাইরেও যদি ভগবানই থাকেন তাহলে ভগবান কি করে অর্জুনের রথ চালাবেন? ঠিক এই কারণেই বলা হয় *দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া*। আমার মায়া অত্যন্ত গুণময়ী, এই মায়া সবার মাথা একেবারে গুলিয়ে রেখে দেয়। যতই আমরা গীতা, ভাগবত পড়ি, কিছুতেই এই ব্যাপারটাকে তর্ক দিয়ে, যুক্তি দিয়ে দাঁড় করান যাবে না, এখানেই সবাইকে উল্টে ফেলে দেবে। আচার্য নিজে একজন অদ্বৈতী হয়েও বলছেন ভগবান দেবকীর গর্ভে জন্ম নিচ্ছেন। ভগবানের কি কখন জন্ম হয়? কখনই হয় না, সেইজন্য আচার্য বলছেন *দেহবানিব জাত*, যেন তিনি জন্ম নিচ্ছেন। সেইজন্য ভগবানের জন্মকে কখনই জন্ম বলা যাবে না। জন্ম নিচ্ছেন না বলে বলা হয় আবির্ভূত হচ্ছেন।

ভগবান আবির্ভূত হচ্ছেন এটা হল প্রথম দিক, দ্বিতীয় দিক হল ভগবানের আবির্ভাবের আগে জগতের পারিপার্শ্বিক যা কিছু আছে সমস্ত পবিত্র, শুদ্ধ ও শুভ হয়ে যায়। ঠাকুর খুব সুন্দর বলছেন রাজা যদি কোন কর্মচারীর উপর প্রসন্ন হয়ে বলেন আমি তোর বাড়ি যাব। রাজা ভালো করেই জানে রাজাকে রাজকীয় ভাবে আপ্যায়ন করার ক্ষমতা তার কর্মচারীর সাধ্যের বাইরে। সেইজন্য রাজা নিজের লোকদের আগে থাকতে পাঠিয়ে দেন ঘরদোর সব পরিষ্কার করতে, ভালো কার্পেট বিছিয়ে দেবে, ভালো আসবাব, রূপোর গড়গড়া আগে থাকতে পাঠিয়ে দেবে, রাস্তাঘাট সব সাফসুতরো করার জন্য লোক পাঠিয়ে দেবে। সব কিছু রাজার বাড়ি থেকেই যাচ্ছে। আমার আপনার কি ক্ষমতা আছে আমাদের কাম, ক্রোধ রিপুগুলো জয় করার? আমাদের সাধ্যই নেই। তিনি যখন কারুকে কৃপা করবেন তখন তার আগে তিনি তাঁর ঐশ্বর্য পাঠিয়ে দেন। অর্থাৎ ঈশ্বর দর্শনের আগে তার মধ্যে ভগবানের দৈবী সম্পদ আসতে শুরু করে।

ভগবানের আবির্ভাবের পূর্বে এগুলোই হল প্রস্তুতি। ভগবান যখন কোন ব্যক্তির হৃদয়ে আবির্ভূত হন তখন সেই ব্যক্তির মধ্যে তিনি সত্ত্বগুণের প্রকাশ করিয়ে দেন, ঠিক তেমনি ভগবান যখন সশরীরে এই জগতে আবির্ভূত হবেন তখন তিনি কি করেন? আমাদের বিভিন্ন শাস্ত্রে জগতের উপাদান রূপে নয়টি দ্রব্যের কথা বলা হয়, প্রথমে পাঁচটি তত্ত্ব, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবী তার আগে কাল ও দিশা এবং শেষে মন ও আত্মা এই নয়টি দ্রব্য। যে কোন জীব এই নটি দ্রব্যের মধ্যে বাঁধা। এই নিয়ে অবশ্য আমাদের বিভিন্ন শাস্ত্রকারদের মধ্যে তুমুল বিতর্ক তৈরী হয়। তাঁরা বলবেন আত্মা কি কখন দ্রব্য হতে পারেন? ইত্যাদি। এখানে দ্রব্য মানে বাংলার দ্রব্য নয়, এই নটি উপাদান দিয়ে জগতের সব কিছু তৈরী হয়। নৈয়ায়িক ও বৈশাষিকরা মনে করেন এই নটি দ্রব্য দিয়ে সৃষ্টি রচিত হয়। বেদান্ত আত্মাকে যেভাবে ব্যাখ্যা করেন নৈয়ায়িকরা সেই ভাবে ব্যাখ্যা দেন না। যাই হোক এখাবে ভাগবত বলছেন ভগবানের আবির্ভাবের পূর্বে এই নয়টি তত্ত্ব শুদ্ধ পবিত্র রূপ ধারণ করে। তন্ত্রশাস্ত্রে বলছে ব্রক্ষ্ম ও শক্তি অভেদ, সেই অভেদত্ব ভেদ করে শক্তি কালী রূপে দেখা দেন, কালী থেকে মহাকালের জন্ম, মহাকাল থেকে কালের আবির্ভাব। কালের আবির্ভাব হয়ে যাওয়া মানে এবার সৃষ্টি পুরোদমে শুরু হয়ে গেল। কাল হল measure of events। Measure of events হওয়া মানেই সৃষ্টি শুরু। সাধারণ মানুষ ঈশ্বরের এই গূঢ় তত্ত্বের কথাগুলো ধরতেই পারে না। সেইজন্য জন্মাষ্টমী, শ্রীকৃষ্ণের জন্ম এই শব্দগুলোই সবাই ব্যবহার করে। কিন্তু যাঁরা সত্যিকারের ভাগবত পণ্ডিত তাঁরা কখনই ভাগবতগ্রন্থ পাঠ করার সময় বলবেন না শ্রীকৃষ্ণের জন্ম, বলবেন শ্রীকৃষ্ণের প্রাকট্য, তিনি প্রকট হয়েছেন। ভগবান সব সময় সর্বত্র বিরাজমান, তাঁর জন্ম কি করে হবে! কিন্তু তিনি হঠাৎ করে এই রূপে প্রকট হয়ে গেলেন। এই রূপে প্রকট হতে গেলে তাঁর দরকার একটা মায়ের গর্ভ। কিন্তু এর আগে যে তাঁর অস্তিত্ব ছিল না, তা নয়। অন্যান্য ধর্মে যিনি অনন্ত তিনি আবার সান্ত হতে পারেন এই ব্যাপারটা ধারণাই করতে পারে না। ইসলাম ধর্মে অবতারতত্ত্ব নেই, ধারণাও নেই, স্বাভাবিক ভাবে তাই অন্য ধর্মের এই জিনিষগুলো ইসলামের পক্ষে মানা সম্ভব নয়। খ্রীশ্চান ধর্মে ঈশ্বরের অবতারত্বকে সন্তান রূপে নেবে কিন্তু সরাসরি ঈশ্বর আবির্ভূত হবেন কখনই মানবে না। কিন্তু হিন্দুদের কাছে ভগবান হলেন অসীম ক্ষমতাবান তিনি যেখানে খুশী যখন খুশী প্রকট হয়ে যেতে পারেন। ভাগবতের তিনটে শ্লোকে ভগবানের যখন খুশী যেখানে খুশী প্রকট হওয়ার মুহূর্তে যে রমণীয় কাল উপস্থিত হয় তারই বর্ণনা খুব সহজ সরল ভাবে দেওয়া হয়েছে। এই তিনটে শ্লোক থেকেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলা শুরু হয়ে যায়।

ভগবানের আবির্ভাবের পূর্বে নয়টি তত্ত্ব শুভগুণ সম্পন্ন হয়ে যাওয়া

শ্রীকৃষ্ণের জন্মের মুহূর্ত এসে গেছে। পরীক্ষিৎকে শুকদেব বলছেন ***অথ সর্বগুণোপেতঃ কালঃ পরমশোভনঃ। যর্হ্যেবাজনজন্মর্ক্ষং শান্তর্ক্ষগ্রহতারকম্।। দিশঃ প্রসেদুর্গগনং নির্মলোড়ুগণোদয়ম্। মহী মঙ্গলভূয়িষ্ঠপুরগ্রামব্রজাকরা।। নদ্যঃ প্রসন্নসলিলা হ্রদা জলরুহশ্রিয়ঃ। দ্বিজালিকুলসংনাদস্তবকা বনরাজয়ঃ।। ১০/৩/১-৩।*** হে পরীক্ষিৎ! এরপর সর্বগুণযুক্ত পরম রমণীয় কাল আবির্ভূত হল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে মুহুর্তে জন্ম নিতে যাচ্ছেন, সেই মুহুর্তের সময়টা অতি শুভক্ষণ। কি শুভ? যত রকমের শুভ গুণ, ভালো গুণ হতে পারে সব গুণ এক সঙ্গে সমবেত ভাবে হাজির হয়ে গেছে। সেই সময়ের নক্ষত্র রোহিণী, আর আকাশে যত গ্রহ, নক্ষত্র, তারা সব শান্ত ও সৌম্য রূপ ধারণ করল, কোথাও কোন ধরণের উচ্ছৃঙ্খলতার ভাব নেই। দিশাগুলি সব স্বচ্ছ ও প্রসন্ন, আকাশ নির্মল, পরিষ্কার, তারাগুলো ঝকমক করছে। পৃথিবীর সব কিছু, যত ছোট বড় গ্রাম, গঞ্জ, ব্রজভূমি, খনি আদি আকরস্থান সব যেন শান্ত ও শুভ ভাবে পরিপূর্ণ হয়ে মঙ্গলময় রূপ ধারণ করেছে। সমস্ত নদী নির্মল ও পবিত্র জলে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে, যদিও তখন রাত্রি কিন্তু নদীতে, জলাশয়গুলিতে পদ্ম প্রস্ফুটিত হয়ে উঠল। জঙ্গলে যত বৃক্ষাদি ছিল তাতে তক্ষুনি কুসুমসকল প্রস্ফুটিত হয়ে বনভূমিকে শোভিত করে দিল। যদিও রাত্রি তবুও পাখিদের কুজনে আর ভ্রমরের গুঞ্জনে রাত্রির পরিমণ্ডল গুঞ্জরিত হয়ে উঠল।

এই যে তিনটে শ্লোক, এর মূল ভাব হল, ভগবানের আবির্ভাবের মুহুর্তে পৃথিবী, আকাশ, দিশা, প্রকৃতির সব কিছু নির্মল হয়ে গেছে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে এই তিনটে শ্লোক খুবই সাধারণ শ্লোক, কিন্তু ভাষ্যকারদের ভাষ্য সহকারে পাঠ করলে মন যে কখন কীভাবে কত গভীরে ভেতরে টেনে নিয়ে চলে যাবে, বোঝাই যাবে না। ভাগবতের ভাষ্যকাররা কেউ কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজের সংস্কৃতের ডিগ্রীধারী অধ্যাপক ছিলেন না, এনারা সবাই ঋষি, ধ্যানের গভীরে যাঁরা সব সময় ডুবে থাকতেন, তাঁরা এই তিন-চারটে শ্লোককে কীভাবে ব্যাখ্যা করছেন আমরা দেখব। যেমন এক জায়গায় বলছেন – যখন অন্তঃকরণ শুদ্ধ পবিত্র হয়ে যায় তখন সেই অন্তঃকরণে ঈশ্বরের আবির্ভাব হয়। অন্তঃকরণ মানে – চিত্ত, মন, বুদ্ধি আর অহঙ্কার। এই চারটেকে অনেক সময় অন্তরাত্মা বলা হয়, কখন হৃদয় বলা হয়। ধ্যান করতে করতে সমস্ত বৃত্তির নাশ হতে হতে যোগীর অন্তঃকরণ যখন শুদ্ধ হয়ে যায় তখন সেই শুদ্ধ মনের দ্বারা যোগীর ঈশ্বর দর্শন হয়। যোগশাস্ত্রে বলে *তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেহবস্থানম্*। যোগী তখন স্বরূপে অবস্থান করেন। কখন নিজের স্বরূপকে জানতে পারেন? যখন *যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ* হবে, চিত্তের সমস্ত বৃত্তি যখন নিরোধ হয়ে যাবে। মন হল একটা জলাশয়ের মত, স্বচ্ছ জল কিন্তু ক্রমাগত জলাশয়ের জলে ঢেউ উঠছে, যার ফলে জলের তলদেশে কি আছে আমরা জানতে পারছি না। ঢেউ কেন উঠছে? হয় বাতাস প্রবাহিত হচ্ছে আর তা নাহলে জলে অনবরত পাথর ছুঁড়ে যাচ্ছে। পাথর ছোঁড়াটা হল *প্রমাণ-বিপর্যয়-বিকল্প-নিদ্রা-স্মৃতয়ঃ*, প্রমাণ, বিপর্যয়, বিকল্প, নিদ্রা আর স্মৃতি এই পাঁচ রকম বৃত্তি আমাদের মনকে সব সময় বিক্ষুব্ধ করে রাখে। এগুলো নিয়ে আমরা এর আগেও আলোচনা করেছি। অন্তঃকরণ শুদ্ধি মানে চিত্তের সমস্ত বৃত্তি নিরোধ হয়ে যাওয়া। এই যে পাঁচটি শক্তি আমাদের চিত্তকে সব সময় বিক্ষুব্ধ করছে, এই পাঁচটা শক্তিকে আগে বন্ধ করতে হবে। এই পাঁচ ধরণের বৃত্তির সাথে যোগীর যখন পাঁচ ধরনের ক্লেশও চলে যায়, পাঁচ ধরণের ক্লেশ মানে অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ, এই দশটা যখন চলে যাবে তখনই যোগীর অন্তঃকরণ পুরোপুরি শুদ্ধ হয়ে যাবে, ওই শুদ্ধ অন্তঃকরণেই যোগী নিজের স্বরূপে অবস্থান করেন। ভক্তের ওই শুদ্ধ অন্তঃকরণেই ঈশ্বরের আবির্ভাব হয়। যোগীদের হৃদয়ে যেভাবে ঈশ্বরের আবির্ভাবের কথা বলা হল এটা হল ব্যষ্টি। সমষ্টিতেও ঠিক সেই একই শুদ্ধিকরণ দরকার। ভগবানের দুটি রূপ – একটা আমাদের হৃদয়ের মধ্যে যিনি আছেন, যাঁকে আমরা শুদ্ধ হৃদয়ে দর্শন করি। আরেকটি রূপ হল যিনি স্বয়ং ভগবান তিনি এবার প্রাকট্য হবেন। ভগবান এবার শ্রীকৃষ্ণ রূপে এই পৃথিবীতে আবির্ভুত হতে যাচ্ছেন, ভগবানকে এবার মানুষ রূপে দেখা যাবে। কিন্তু ভগবান যখন তখন যেখানে সেখানে যেভাবে সেভাবে আসবেন না। তিনি যেখানে আসবেন সেখানকার সমষ্টি মণ্ডলকেও শুদ্ধ, পবিত্র, নির্মল হতে হবে। তাই যোগীদের মনের মত পৃথিবী ও তার সমষ্টি প্রকৃতির শুদ্ধির অবস্থার বর্ণনা করা হচ্ছে। অন্তঃকরণ, মন যেমন শুদ্ধ পবিত্র হয়ে যায় ঠিক তেমনি ভগবানের আবির্ভাবের জন্য বহিঃপ্রকৃতিও শুদ্ধ রূপ ধারণ করল। প্রকৃতির মধ্যে কি কি আছে –

কাল, দিশা, পঞ্চ মহাভূত, মন, আত্মা, এই নয়টি হচ্ছে দ্রব্য। এই নয়টি দ্রব্যের এক একটির নাম করে বলা হয়েছে এরা সবাই খুব শুদ্ধ ও পবিত্র হল।

কাল শুভগুণ সম্পন্ন হল। কাল নিজেকে মনে করে আমি সবার উপরে, কারণ কাল ব্রহ্মাকেও খেয়ে নেয়। কিন্তু কাল কোথাও শুনেছে ভগবান নাকি তারও উপরে, ভগবান নাকি কালাতীত। অন্যান্য ধর্মও ঠিক একই কথা বলছে। ভগবান সব সময় স্থান, কাল ও কার্যের বাইরে। তবে হিন্দুধর্মে ভগবান যে কালেরও পারে এটাকে খুব নাটকীয়ভাবে বলা হয়। কাল সব কিছুকে গ্রাস করে নেয়। কাল অর্থাৎ সময়ের ব্যাপারে আগেকার দিনের বিজ্ঞানীরা এত কিছু জানতো না। কিন্তু ইদানিং বিজ্ঞানীরা টাইমকে নিয়ে অনেক কিছু বলছেন, বিজ্ঞানীরাও এখন বলতে শুরু করেছেন time has a begining, কালেরও জন্ম হয়। আমাদের ঋষিরা এগুলো চিরদিনই জানতেন। ভগবান হলেন মহাকাল, মহাকাল মানে তিনি কালের মালিক। কাল সবাইকে নিয়মন করে। রাবণ শিবের তপস্যা করে প্রচুর ক্ষমতা পেয়ে গেছে। ক্ষমতা পেয়ে সবার সাথে যুদ্ধ করতে নেমে গেছে। যমরাজ, যিনি আবার কাল, সব কিছুকে নিয়মন করেন, সেই যমরাজকেই রাবণ আক্রমণ করে বসেছে। যমরাজ বাধ্য হয়ে রাবণের উপর কালপাশ চালিয়ে দিয়েছেন। কালের হাত থেকে কেউ বাঁচতে পারবে না। ভগবানও যখন অবতার হয়ে এসে যাবেন, তাঁকেও কালের অধীনে চলে আসতে হবে। কাল যখন জানতে পারল শাস্ত্রে বলে ভগবান নাকি কালেরও পারে এই কথা শোনার পর কাল নাকি প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। আমি সব কিছুকে নাশ করি আর এরা বলছে আমার উপরেও নাকি একজন আছে! সেই থেকে কাল ক্রুদ্ধ হয়ে রুদ্র রূপ ধারণ করে সংহার করে বেড়ায়। এগুলি আর কিছুই নয়, কবির কল্পনা। এখন যখন কাল জানতে পারল ভগবান দেবকীর গর্ভে শ্রীকৃষ্ণ রূপ মানব দেহ ধারণ করে আমারই অধীনে আসছেন, তখন তার আনন্দ আর কে দেখে! এগুলো ভাগবতের কথা নয়, ভাগবতের ভাষ্যকাররা এইভাবে কালের খুশী হওয়ার ব্যাখ্যা করছেন। কথায় আছে পঞ্চভূতের ফাঁদে ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে। একবার যখন মায়ার জগতে ঢুকে যাবেন তখন সবাইকেই মায়ার অধীনে চলে আসতে হবে, মায়ার অধীনে আসা মানেই কালের আণ্ডারে তাকে থাকতে হবে। ঠাকুরও বলছেন অবতারও শক্তির আণ্ডারে। এবার ভগবান যা কিছুই করবেন তাঁকে কালের মধ্যেই করতে হবে। সবাই বলবে ভগবান পাঁচ বছর বয়সে এই করেছিলেন, দশ বছরে এই করেছিলেন, এখন ভগবানের সব কিছুকে কাল দিয়ে মাপা হবে। এই খবর জানার পর থেকে তাই কাল বিরাট খুশী হয়ে গেছে, আনন্দে ভরপুর। আবার যখন কাল ভাবলো সেই ভগবান তিনিও আমাকে স্বীকার করতে যাচ্ছেন, সঙ্গে সঙ্গে বাৎসল্য রস এসে কালের মনকে যেন নরম করে দিল।

দিশা মানে দিক, যত দিশা আছে তারাও ভগবানের আবির্ভাব হতে যাচ্ছে শুনে খুশীতে উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে। দিশারা কেন আনন্দে উৎফুল্ল হয়েছে? বলে নাকি, কংসের অত্যাচারে দিশাদের সব স্বামীরা বন্দী হয়েছিল। হিন্দুদের একটা সমস্যা হল এনারা যত অমূর্ত আছে সেটাকে মূর্ত রূপ দিয়ে দেন, যেটা মূর্ত সেটাকে অমূর্ত বানিয়ে দেন। আমাদের যে দশটি দিশা, প্রত্যেকটি দিশার একটি করে নাম আছে আর প্রত্যেকটি দিশার একজন করে দেবী আছেন। দেবী হলে তার আবার একজন স্বামী থাকতে হবে। কংস এখন এদের সব স্বামীদের বন্দী করে রেখেছে। এখন দিশারা সবাই স্বামী ছাড়া দিশাহারা। দিশারা ভাবছে, ভগবানের যখন আবির্ভাব হতে যাচ্ছে, তার মানে এবার তিনি কংসকে বধ করবেন, আর আমাদের স্বামীরা সবাই মুক্ত হয়ে যাবে। আমাদের স্বামীদের সাথে মিলন হবে – এই ভেবে দিশাদের খুব আনন্দ। দ্বিতীয় কথা, সংস্কৃতে দিশার আরেকটি অর্থ আশা। যত সৎ পুরুষ আছেন, তাঁদের অভিলাষা এবার পূর্ণ হতে চলেছে, তাঁদের তো একটিই আশা, সর্বগুণসম্পন্ন সর্বাধার সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের সাকার রূপ দর্শন। বেদের পুরুষসুক্তমে যে বিরাট পুরুষের বর্ণনা করা হয়েছে, সেখানে দিশাকে সেই বিরাটের কর্ণ বলা হচ্ছে। তার মানে, দিক হল ভগবানের কান। এই জিনিষগুলিকে খুব আক্ষরিক ভাবে নিতে নেই, এগুলো সব ভাবরাজ্যের বর্ণনা, ধ্যানের বিষয় করার জন্য বলা। দিশারা তাই এখন খুব আনন্দিত, কারণ তারা ভগবানের কান। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে এবার অনেক দুঃখী, নিপীড়িত মানুষ এসে নানান ধরণের অভিযোগ অনুযোগ করবে, আমাকে অমুক রাজা খুব অত্যাচার করেছিল, আমাকে অমুক অসুর খুব অপমান করেছিল ইত্যাদি বলে। ভগবান এবার সব দুষ্ট লোকদের শেষ করবেন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে দুখীদের যে কথাগুলো আসবে, সব কথা প্রথমে কান দিয়েই আসবে। ভগবানের লীলা শুরু হওয়ার আগে প্রথম যে তথ্য যাবে তা কান দিয়েই যাবে। এই ভেবে দিশারা তাই সবাই খুব আনন্দিত।

পৃথিবীর আনন্দের ব্যাখ্যা

তারপরে বলছেন পৃথিবী শান্ত হয়ে গেছে আর আনন্দে পৃথিবীর বুক ভরে উঠেছে এই ভেবে যে আমার কত সৌভাগ্য হবে ভগবানের চরণকমল আমার বুকের উপরে এসে পড়বে। মানুষের মন সত্যিই এক আশ্চর্য বস্তু, মানুষ যাকে হেয় মনে করে তার বুকে লাথি মারতে চায়, আর যাকে প্রচণ্ড ভালোবাসে তার পা নিজের বুকে রাখে। নিজের সন্তান, নাতিকে মানুষ কত ভালোবাসে, তাকে বুকে রেখে খেলা করতে তারা কত ভালোবাসে। মাথায় অবশ্য রাখা হয় না, কারণ মাথা গুরুর স্থান। কিন্তু বুকটা আশ্চর্য! যে যাকে ভালোবাসে তার পা বুকে রেখে দেয় আবার যখন লড়াই হয় তখন শত্রুর বুকে পা রেখে নিজের আক্রোশ মেটায়। সাধকরাও আকাঙ্খা করেন প্রভুর শ্রীচরণ যেন আমি আমার বুকে ধারণ করতে পারি। পৃথিবীরও তাই খুব আনন্দ, ভগবান এখন পৃথিবীর বুকে হেঁটে বেড়াবেন। পৃথিবীর আশ্রয় ভগবান নিজে কিন্তু এবার পৃথিবী ভগবানের আশ্রয়, কারণ যোগীজনকাঙ্ক্ষিত ভগবানের সেই দুর্লভ চরণকমল আমার বুকে পড়বে। আরেকটা ভাষ্যে বলছেন – বামন অবতারে তিনি ছিলেন ব্রহ্মচারী, কোন কিছুর সঙ্গে ওনার সম্পর্ক ছিল না। পরশুরামের অবতারে তাঁর যা কিছু ছিল সব ব্রাহ্মণদের দান করে দিয়েছেন। শ্রীরামচন্দ্রের অবতারে ভগবান পৃথিবীর যে মেয়ে তাকে বিয়ে করে নিলেন, তার মানে পৃথিবী হয়ে গেল ভগবানের শাশুড়ী। এই সব কারণে পৃথিবী কোন অবতারেই ঈশ্বর সান্নিধ্যের নির্মল আনন্দটুকু ঠিক ভাবে উপভোগ করতে পারেনি। এবারে শ্রীকৃষ্ণ অবতারে পৃথিবী আনন্দ পাবে, কেননা এই অবতারে শ্রীকৃষ্ণের সাথে লীলা খেলা করার এক দুর্লভ সুযোগ পৃথিবীর কাছে আসছে। এগুলো সবই ভাষ্য। সহজ কথা হল, ভগবান যখন আসেন তখন সব কিছু শুভ হয়ে যায়। মানুষের ভেতরে যে ভক্তিরসের আবেগ, ঈশ্বরের প্রতি যে অনাবিল ভালোবাসা, সেগুলো যাবে কোথায়, সেই ভালোবাসাকে এইভাবে প্রকাশ করা হচ্ছে।

নদী আর হ্রদের আনন্দের ব্যাখ্যা

যাঁরা নির্মল হৃদয়ের তাঁরাই ভগবানকে পান, এই ভেবে নদীগুলো নির্মল হয়ে গেল। নদীগুলোর কেন আনন্দ হয়েছে? ভগবান যখন শ্রীরামচন্দ্র হয়ে এসেছিলেন তখন তিনি পাহাড়কে তুলে সেতু বন্ধ করেছিলেন। পাহাড় হল নদীদের বাপের বাড়ি। আর সমুদ্র নদীদের শ্বশুড় বাড়ি। গঙ্গার জন্ম পাহাড়ে কিন্তু তাকে যেতে হয় সমুদ্রে, সমুদ্র হয়ে গেল তার শ্বশুড় বাড়ি। নদী ভাবছে শ্রীরামচন্দ্র আমার বাবাকে তুলে আমার শ্বশুড় বাড়িতে পৌঁছে দিয়েছে, কি আনন্দের কথা, শ্রীরামচন্দ্র কত কি করেছেন। যিনি আমাদের বাপের বাড়িকে শ্বশুড় বাড়িতে এনে রেখেছেন তাঁর আগমনে আমাদের আনন্দ হবারই কথা। এগুলো ভারতীয় মানসিকতার একটা বিচিত্র রূপ। গ্রামে গঞ্জে যেখানে ভাগবত কথা হয় সেখানে বেশীর ভাগ মেয়েরাই শ্রোতা হয়ে গিয়ে বসে। যখন ভাগবত কথাকার তত্ত্ব আলোচনা করবেন, সত্ত্ব, রজ ও তম বা পঞ্চ তন্মাত্রের কথা বলবেন তখন এরা ফিসফিস করে বলবে 'কি বলছেরে বাবা'! কিন্তু যখন, নদীর শ্বশুড় বাড়ি, পৃথিবীর লীলা করবার বাসনা আলোচনা হবে তখন বলবে, এটাই ঠিক ঠিক ধর্ম আলোচনা। ভগবানের কি কাজ? শ্বশুড় বাড়ি আর বাপের বাড়ি এক করে দেওয়া। এবার মনে হবে ভগবান সত্যিকারের একজন ক্ষমতাবান।

হ্রদ, মানে বড় বড় যত জলাশয় আছে সবাই খুশীতে একেবারে ডগমগ হয়ে গেছে। কেন খুশীতে ভরপুর হয়ে গেছে? বলছেন শ্রীকৃষ্ণ যখন কালীয়দমন করতে জলাশয় নামবেন তখন ভগবানের চরণ তাঁদের উপর স্থাপন করবেন। শ্রীকৃষ্ণের চরণ স্পর্শে আমরা ধন্য হয়ে যাব। শ্রীকৃষ্ণকে তারা সবাই কি ভাবে পূজা করবে? তাদের হৃদয়ের পদ্মফুলকে জলে প্রস্ফুটিত করে জলাশয়গুলিকে পদ্মফুলে আচ্ছাদিত করে দেবে।

অগ্নি কি ভেবে খুশী হয়েছে? কংসের অত্যাচারে ব্রাহ্মণরা সব যজ্ঞ বন্ধ করতে বাধ্য হয়ে গিয়েছিল। পৌরাণিক কাহিনীর এটি একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য যে, যখনই আসুরিক শক্তির প্রাদুর্ভাব হয় তখনই সমস্ত রকমের যজ্ঞ ক্রিয়া বন্ধ করে দেওয়া হত। আসুরিক শক্তির এটাই প্রথম পরিচয় – কোন পূজা অর্চনা করা যাবে

না। এবার স্বয়ং ভগবানের আবির্ভাব হতে যাচ্ছে তাই অগ্নি খুব খুশী হয়ে প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠল, আবার যজ্ঞাদি ক্রিয়া শুরু হবে।

মনের আনন্দ হওয়ার ব্যাখ্যা

এইভাবে মনের খুশী হওয়ার ব্যাপারেও খুব সুন্দর ব্যাখ্যা দিচ্ছেন। যাঁরা মুমুক্ষু তাঁরা মনকে নির্বিষয় করেন, মানে বাসনা শূন্য করেন। যোগীরা যখন সাধনা করেন তখন তাঁরা মনকে নিয়ন্ত্রণ করেন। মনের ঠিক ঠিক সঙ্গী হল ইন্দ্রিয় সমুদয়। কঠোপনিষদে মন আর ইন্দ্রিয়কে ঘোড়া আর লাগামের সাথে তুলনা করা হয়েছে, ইন্দ্রিয়গুলো হল রথের ঘোড়া আর মন হল তার লাগাম। যেখানেই মন সেখানেই ইন্দ্রিয় থাকবে। আমাদের সব কিছুর দুরবস্থার মূলে ইন্দ্রিয়ের সাথে মন সব সময় যুক্ত হয়ে থাকা। যোগীরা মনকে ইন্দ্রিয় থেকে সরিয়ে বুদ্ধির সঙ্গে লাগিয়ে রাখেন। ইন্দ্রিয় আর বুদ্ধি এই দুটোর সাথে সংযোগ স্থাপিত হয় মনের দ্বারা। মনের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হল ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে যুক্ত থাকা। যাঁরা যোগী, যাঁরা আধ্যাত্মিক জগতে এগোতে চাইছেন তাঁরা সব সময় মনকে তাঁদের নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করে যাচ্ছেন। আমাদের ভালো করে মনে রাখতে হবে যে, কোন উচ্চতম যোগী আর নিকৃষ্টতম ভোগীর মধ্যে কোন তফাৎ নেই। শুধু তফাৎটা হয় মনের ব্যাপারে। যিনি উচ্চতম যোগী তাঁরও মন আছে, ইন্দ্রিয় আছে আর বুদ্ধিও আছে, যে নিকৃষ্টতম ভোগী তারও ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি আছে কিন্তু যোগী তাঁর মনকে ঘুরিয়ে দিয়ে সব সময় বুদ্ধির সাথে যুক্ত করে রেখেছেন আর চরমতম ভোগীর মন ইন্দ্রিয়ের সাথে যুক্ত হয়ে আছে, ইন্দ্রিয়গুলি আবার সব সময় ভোগের দিকে ছুটে যাচ্ছে।

মন এখন ভাবছে এই যোগীদের পাল্লায় পড়ে আমার জীবনটা অতীষ্ট হয়ে উঠেছে। যোগীদের শম, দম, নিয়মের অত্যাচারে আমার যারা ঠিক ঠিক সাথী সেই ইন্দ্রিয়গুলির সাথে আমি কোন খেলাই করতে পারছি না। যোগীরা সব সময় আমাকে ঘুরিয়ে বুদ্ধির সাথে লাগিয়ে রেখেছে। কিন্তু এবার ভগবান আসছেন, ভগবান আসার ফলে আমরা যত গোপাল বালকদের সাথে দুষ্টুমির খেলা করতে পারবো। মন এখন পূর্ণ স্বাধীনতা পেয়ে যাবে, যত গোয়ালিনী আছে তাদের হাড়ি ভাঙবে, মাখন চুরি করবে এই রকম যত বদমাইশি হতে পারে সব করার স্বাধীনতা পেয়ে যাবে। মনের যত রকমের বদমাইশি, দুষ্টুমি এই শ্রীকৃষ্ণ লীলাতে হতে যাচ্ছে, সেইজন্য মনের কি আনন্দ! এতদিনে আমি একটা পূর্ণ স্বাধীনতা পেতে যাচ্ছি। ভোগীদের যে ইন্দ্রিয়কে নিয়ে বাঁদরামো, বদমাইশি সেগুলো নিয়ে কোন শাস্ত্র লেখা হয় না, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের লীলাতে মনের সব বদমাইশি গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ হয়ে ভক্তদের অনুধ্যানের বিষয় হবে। মনের বাঁদরামো, বদমাইশিকে এখন মানুষ পূজা করবে। মনের তাই কি আনন্দ! এখন আমি ইন্দ্রিয়ের সাথে যত খুশী বদমাইশি করতে পারবো, ইন্দ্রিয়গুলো হল গোপাল বালকরা। এদের সাথে দুষ্টুমি, বাঁদরামো করা সত্ত্বেও আমার পূজা করা হবে। এর চাইতে আর কি আনন্দ হতে পারে! সেইজন্য মনের খুব আনন্দ। এতদিন যোগীরা আমাকে নিরোধ করে এসেছে, *যোগশ্চিত্তবৃত্তি নিরোধঃ*, নিরোধ করতে করতে আমি ক্লান্ত ও বিরক্ত হয়ে গেছি। এবার আমি স্বাধীন, শুধু আনন্দ আর আনন্দই করব। এই যে আনন্দ, আর মনের পূর্ণ স্বাধীনতা আর তার সাথে মনের এই আনন্দ আর স্বাধীনতাকে নিয়ে ভক্তের অনুধ্যান ও পূজা এটাই তো সমস্ত শাস্ত্রের একটি ব্যতিক্রমি দৃষ্টান্ত।

আমরা এখানে নয়টি তত্ত্বের কয়েকটির ব্যাখ্যা করলাম, এইভাবে বাকি তত্ত্বগুলিও কেন খুশী হল তার বিরাট ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। আমরা সাধারণতঃ পঞ্চ তত্ত্বই শুনে এসেছি, কিন্তু অনেক সময় এই নয়টি দ্রব্যের কথাও বলা হয়। পঞ্চ তত্ত্বের আগে কাল, দিশা এবং শেষে মন আর আত্মা। ভগবান আবির্ভাব নিতে যাচ্ছেন শুনে এই নয়টি দ্রব্য শুভ হয়ে গেছে। কেন শুভ হয়ে গেলে তার ব্যাখ্যা এই ভাবে দেওয়া হল। এই ব্যাখ্যার সাথে আমরা একমত কিনা সেটা কোন গুরুত্ব নয়, কিন্তু যিনি এর ভাষ্য দিচ্ছেন তাঁর কাছে এগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বলছেন ভগবান এবার মানবদেহে প্রকট হতে যাচ্ছেন শুনে কাল শুভ হয়ে গেল। কেন কাল শুভ হয়ে গেল? তার ব্যাখ্যা দিয়ে বলছেন এই এই কারণে কাল শুভ হয়ে গেল। সেটা আবার এনারা কোথা থেকে নিচ্ছেন? আমাদের পরম্পরা থেকেই নিচ্ছেন। ভাগবতের আরও আগে আগে যে পরম্পরা আছে, সেই পরম্পরার মতে কাল আর ভগবানের মধ্যে যে সম্পর্কের কথা বলা হয়েছে, সেই সম্পর্কের সূত্র ধরে এই ব্যাখ্যা করা

হয়েছে। ভাগবতের পণ্ডিতরা যখন কোথাও ভাগবত গ্রন্থ পাঠ করেন তখন এই ধরণের একটা দুটো শ্লোকের উপরেই বেশ কিছু দিন ধরে প্রবচন চালিয়ে যাবেন, তখন কাল কে, কালের বাবা কে, সব কিছু নাটকীয় ভাবে উপস্থাপন করতে থাকবেন। এভাবে ব্যাখ্যা করারও একটা মূল্য আছে। আমরা যখনই যুক্তি দিয়ে এগুলোকে বিচার করতে যাব তখনই আমাদের মনে নানান ধরণের প্রশ্ন আসতে শুরু হবে। যেমন, কাল কেন পরম শোভন হল, এটাকে ব্যাখ্যা করার দুটো দিক আছে। একটা হল এই যে মনে প্রশ্ন উঠল কাল কেন পরম শোভন হল, এই প্রশ্নই মনকে পরোক্ষ ভাবে ভগবানের ব্যাপারে জানার আগ্রহ বাড়িয়ে দেবে। দ্বিতীয় হল ভাব, যাঁরা কৃষ্ণভক্ত তাঁরা কালের পরম শোভন হওয়ার ব্যাখ্যাগুলোকে মনন চিন্তন করতে করতে এতো গভীরে চলে যাবেন যে, একটা সময় ঈশ্বর চিন্তনে তিনি নিজেকে হারিয়ে ফেলবেন। ভাগবতের প্রত্যেকটি ভাষ্যই পাণ্ডিত্য আর কাব্যিক সৌন্দর্য্যের যুগল সমাবেশ, যা কিনা ভক্তের মনকে টেনে ভাবরাজ্যের চরমে নিয়ে চলে যায়। আসলে এগুলোকে খুব যুক্তি তর্ক দিয়ে বিচার করার জন্য নয়, ধ্যানের বিষয় করার জন্যই ভাষ্যকাররা এই ভাবে বর্ণনা করেছেন। ভাগবত প্রীতি আর ধ্যানের মানসিকতা যদি না থাকে তাহলে এই ভাষ্যগুলির কোন মূল্যই থাকবে না। একেবারেই নৈর্ব্যক্তিক জিনিষগুলিকে মানব শরীর দিয়ে একটা মূর্ত রূপ দিয়ে দেওয়া হয়েছে, তার সাথে একটা মনও দিয়ে দেওয়া হয়েছে, সেই মনের মধ্যে যে বিচিত্র অনুভূতি হচ্ছে সেটাকেই ভাষ্যকাররা তাঁদের পাণ্ডিত্য আর কবির কাল্পনিক মানসিকতা দিয়ে তুলে ধরেছেন।

ভগবানের ভাদ্রমাসে আগমনের ব্যাখ্যা

ভগবান আসছেন কৃষ্ণ পক্ষে, শ্রীকৃষ্ণ এবার কৃষ্ণ পক্ষে মিলে যাবেন এও এক অভিনব আনন্দ। এবারে ভাদ্র মাসে ভগবান কেন এসেছেন তার ব্যাখ্যা করে ভাষ্যকার বলছেন – ভদ্র মানে কল্যাণকারী, ভাদ্র মাসের সব কিছুই শুভ, ভালো, সেইজন্য ভগবান ভাদ্র মাসে আসছেন। কিন্তু আমাদের কাছে এখন ভাদ্র মাস হয়ে গেছে মল মাস, মানে অপয়া মাস, এই মাসে কোন রকম শুভ কাজ করা হয় না। আসলে ভাদ্র মাসে কেন কোন শুভ কাজ করা হয় না, এর পেছনেও এক বলিষ্ঠ যুক্তি আছে। এর কারণ হল, এই মাসে ভগবানের আবির্ভাব হয়েছে তাই এই পুরো মাস অন্য কোন রকম কাজে কর্মে না জড়িয়ে একমাত্র ভগবানের চিন্তন করে যাও। আমাদের অপয়া মাস দুটি, ভাদ্র আর চৈত্র – ভাদ্র মাসে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব আর চৈত্র মাসে শ্রীরামচন্দ্রের আবির্ভাব। যাতে মানুষ মনটা ভগবানের দিকে দেয়, কোন জাগতিক কাজ হাতে নিয়ে মনের যাতে বাজে খরচ না হয়ে যায়, তাই বলে দিলেন এই দুটো অপয়া মাস। ভাদ্র মাসে এমনিতেই চাষবাশ বিশেষ কিছু হয় না, হাতে কোন কাজ থাকে না, অন্য দিকে আমোদ ফূর্তি না করে ভগবানে মন দাও, তাই বলে দিলেন ভাদ্র মাসে ভালো কিছু করতে নেই। বৃন্দাবনে অবশ্য ভাদ্র মাসে শুভ কাজ করা হয়। কিন্তু ভারতের পূর্বাঞ্চলে ভাদ্র আর চৈত্র মাসে কোন শুভ কাজ করা হয় না। শ্রীশ্রীমা বলছেন চৈত্র মাসে ঘরের বেড়ালকেও বাইরে পার করে দেওয়া হয় না। তার মানে, কেউ কোথাও শুভ যাত্রাও এই দুটি মাসে করে না। অথচ এই দুটি মাস ভারতের দুজন অবতারের মাস। ঠাকুর হয়তো ব্যাপারটা আগে থেকেই জানতেন, যে মাসেই আমি জন্ম নিই সেই মাসটাকেই এরা মল মাস করে দেয়, সেজন্য তিনি বেছে বেছে ফাল্গুন মাসে এলেন। ফাল্গুন মাসকে নিয়ে এরা কিছু করতে পারবে না। আর অষ্টমী তিথিতে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব, মানে পক্ষের ঠিক মাঝখানে গিয়ে পড়ছে, এদিকেও আছে ওদিকেও আছে, তাই আরও শুভ হয়ে গেল। এদিকে আবার নিশিথ রাত্রে জন্ম। নিশিথ রাত্রি হল যোগীকুলের যোগ সাধনার প্রিয় মুহুর্ত মহানিশা।

এখানে ভাদ্র মাস, কৃষ্ণ পক্ষ, অষ্টমী তিথি, নিশীথ কাল এগুলো গুরুত্ব নয়, গুরুত্ব হল ভাবের। ঠাকুর বলছেন – একজন বাবলা গাছে দেখে ভাবে অভিভূত হয়ে পড়েছে। বাবলা গাছ দেখে তার মনে পড়ে গেছে এই বাবলা গাছের ডালে কোদালের বাঁট হবে, সেই কোদাল দিয়ে শ্যামসুন্দরের বাগানে মাটি কোপান হবে, সেই মাটিতে সব্জী চাষ হবে, সেই সব্জী প্রভুর সেবায় লাগবে – এই ভাবতে ভাবতে সে ঈশ্বরীয় ভাবে হারিয়ে গেছে। একটা বাবলা গাছ দেখে যখন তাঁর ভাব এসে যাচ্ছে, সেখানে আধ্যাত্মিকতা কি উচ্চতায় যেতে পারে আমরা কল্পনাও করতে পারিনা। ঠাকুরের ভক্ত যাঁরা উত্তরপাড়া, কোন্নগরে থাকে তাঁরা যখন দেখেন ৫৪/২ বাস যাচ্ছে তখন তাঁর মনে পড়ে যায় এই বাস বেলুড় মঠের পাশ দিয়ে যাবে, সেখানে ঠাকুর আছেন।

ঠাকুরের কথা মনে হতেই তাঁর মনে ঠাকুর ছাড়া আর কিছুই আসবে না। যাঁরা ঠিক ঠিক ভক্ত তাঁরা তাঁদের ইষ্ট সম্পর্কিত কোন কিছু সামান্য বিষয়ের কথা মনে পড়লেই ইষ্টের প্রতি ভক্তির আবেশে ঠিক এইভাবেই সম্পূর্ণ হারিয়ে যান। এগুলো কিন্তু একটুও অতিরঞ্জিত করে বলা হচ্ছে না, ঠিক এই জিনিষই হয়। যাঁরা খুব উচ্চমানের ভক্ত, যাঁরা বৈধী ভক্তিকে অতিক্রম করে গেছেন তাঁদের ঠিক এই অবস্থাই হয়। এখানে ভাদ্র মাস, কৃষ্ণ পক্ষের কোন গুরুত্ব নেই, এগুলোর ব্যাখ্যা দিয়ে মানুষের মনে ভগবানের প্রতি ভক্তি, প্রেমের ভাব জাগ্রত করে দেওয়া হচ্ছে। ঠাকুরের কোন ভক্তের যদি খুব ভাব থাকে তখন সেও এই ভাবে বলতে পারে – যাকে আমরা খুব ভালোবাসি তাকে আমরা বলি তুমি হলে দ্বিতীয়ার চাঁদ, দিনে দিনে বড় হতে থাকবে। ঠাকুরও শুক্ল পক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে জন্ম নিয়েছেন, ঠাকুরের ভাবও দিনে দিনে প্রকাশ হতে থাকবে। অন্য দিকে গীতায় ভগবান বলছেন ঋতুর মধ্যে আমি বসন্তকাল, *ঋতুনাং কুসুমাকরঃ*, ঠাকুরেরও আবির্ভাব বসন্ত ঋতুতে। এগুলো হল ভাবের ব্যাপার। এগুলোকে বেশী গুরুত্ব দিয়ে এর মধ্যেই ডুবে থাকতে নেই। তবে এগুলোকে নিয়ে যখন কেউ আলাপ আলোচনা করছে, এই ভাব নিয়ে যখন থাকছে সেই সময় মন জাগতিক চিন্তন থেকে সরে এসে অন্তত কিছুক্ষণের জন্যও ঈশ্বরের ভাবে একটা উচ্চ চিন্তনে থাকে।

এই রকম বলছেন মধ্য রাত্রে যেখানে ঘন অজ্ঞান অন্ধকার সেখানেই ভগবান দিব্য প্রকাশ রূপ নিয়ে অবতীর্ণ হচ্ছেন। কাল, নদী, বৃক্ষ, জলাশয়, মধ্য রাত, ভাদ্র মাস, তিথি সব কিছুকেই আধ্যাত্মিকতার ভাষা দিয়ে বর্ণনা করা হচ্ছে। গীতার ভাষ্যতে যেমন আচার্য বলছেন গীতার অর্থকে সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করার জন্য আমি এই ভাষ্য রচনা করলাম। এখানে কিন্তু অর্থকে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে না, ব্যাখ্যা না করে এখানে একটা ভাবরাজ্যের সৃষ্টি করা হচ্ছে। কাদের জন্য সৃষ্টি করা হচ্ছে? অতি সাধারণ লোক যারা, যাদের মন সব সময় কামিনী-কাঞ্চনের ভোগে লিপ্ত হয়ে আছে, তাদের মনে একটা ভাব তৈরী করার জন্য এই ধরণের ভাবকে সৃষ্টি করা হচ্ছে। একেবারে প্রথম থেকে শুরু করছেন, ভগবানের জন্ম হয় না, তিনি প্রকট হন, তাই তাঁর জন্মকে বলছেন প্রাকট্য, তিনি আবির্ভূত হন। একেবারে প্রাথমিক স্তর থেকে শুরু হচ্ছে। তারপরে বলছেন ভগবানের আবির্ভাবের আগে সব কিছু শুভ ছিল, সব মঙ্গলময় হয়ে গিয়েছিল। কি কি মঙ্গলময় হচ্ছে তার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলছেন, যখন সৃষ্টি হয় তখন তাতে নয়টি দ্রব্য থাকে। সাংখ্য মতে সৃষ্টির চব্বিশটি তত্ত্বের কথা বলা হয়, প্রথমে প্রকৃতি কিন্তু মূল ব্যাপারটা পঞ্চ তত্ত্বে এসে থেকে যায়। কিন্তু মূল হল প্রকৃতি যেটা সত্ত্ব, রজ ও তম। প্রকৃতির পরেই আসে মহৎ, মহতের পরেই আসে অহঙ্কার আর অহঙ্কার থেকে পাঁচটি তত্ত্বের জন্ম হয়। প্রকৃতি, মহৎ, অহঙ্কার আর পঞ্চ তত্ত্ব এই আটটিই মূল। পঞ্চ তত্ত্ব এসে গেলেই সৃষ্টি শুরু হতে থাকে। এই আটটির পর যেগুলো আসে সেগুলো এরই সংমিশ্রণ, এই আটটিই হল স্বতন্ত্র সত্তা। অন্যান্য কিছু কিছু মতে নয়টিকে স্বতন্ত্র তত্ত্ব বলা হয়। প্রথমটাকে বলা হয় কাল, তারপর দিশা, পাঁচটি তত্ত্ব, মন ও আত্মা। ভগবান আবির্ভূত হতে যাচ্ছেন শুনে সবাই খুব আনন্দিত। সবারই আনন্দিত হবার কারণ আলাদা আলাদা। আমাদের মনে রাখতে হবে এই ব্যাখ্যাগুলো ভাগবতে কোথাও নেই, এর ব্যাখ্যা করছেন ঋষিতুল্য পণ্ডিতরা। ভাগবত শুধু বলছে এই নয়টি দ্রব্য আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে।

বায়ু ও আকাশের আনন্দের ব্যাখ্যা

এর সাথে শুকদেব বলছেন ***ববৌ বায়ুঃ সুখস্পর্শঃ পুণ্যগন্ধবহঃ শুচিঃ। অগ্নয়শ্চ দ্বিজাতীনাং শান্তাস্তত্র সমিন্ধত।।১০/৩/৪।*** শ্রীকৃষ্ণের জন্মের সময় খুব পবিত্র শীতল বায়ু মিষ্টি মিষ্টি সুগন্ধ নিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে, বায়ু এখন আনন্দে পরিপূর্ণ। কারণ কিছু দিন পরেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর লীলা শুরু করতে যাচ্ছেন। লীলা করতে করতে শ্রীকৃষ্ণ পরিশ্রান্ত হবেন, পরিশ্রান্ত হলে তাঁর কপালে স্বেদবিন্দু আসবে, এই স্বেদবিন্দুকে কে শুষ্ক করবে? আমি বায়ু, আমিই শীতল বাতাস দিয়ে শুষ্ক করে দেবো। এই ভেবেই বায়ু আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে এখনই সে শীতল মিষ্টি মিষ্টি গন্ধে প্রবাহিত হতে শুরু করে দিয়েছে। বল্লভাচার্যের ভাষ্যে বলা হচ্ছে যাঁরাই ভগবানের শ্রীচরণ দর্শন করতে অভিলাষী, তাঁদের জন্য সব থেকে উৎকৃষ্ট সাধনা হল সেবাযোগ। কর্মযোগ মানেই সেবাযোগ। যাঁরাই ভগবানের দর্শন পেতে চান তাঁদের জন্য সেবাযোগ অত্যন্ত উপযোগী। জগৎসেবার উপর স্বামীজীও খুব জোর দিয়ে গেছেন। জগৎসেবার দ্বারা আমাদের চিত্তশুদ্ধি হবে, চিত্তশুদ্ধি হলে ভগবানের দিকে

এগোন সহজ হয়ে যাবে। মানবজাতির সামনে দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য বায়ু সবারই সেবার দায়ীত্ব নিয়ে নিল। আমাদের মনে রাখতে হবে এগুলো সবই ভাষ্যকারদের ব্যাখ্যা। শ্রীরাম অবতারে বায়ুর ঔরস পুত্র ছিল শ্রীহনুমান। বায়ু বলছেন শ্রীরাম অবতারে আমার সন্তান ভগবানের খুব সেবা করেছিল, আমি কিন্তু ভগবানকে সেবা করা থেকে বঞ্চিত ছিলাম, কিন্তু এবার আমার কাছে ভগবানকে সেবা করার উত্তম সুযোগ এসেছে। আমি নিজেই ভগবানকে সেবা করতে পারবো। এই ভেবে বায়ু আনন্দে এখন থেকেই মিষ্টি মিষ্টি ভাবে প্রবাহিত হত শুরু করে দিয়েছে। কিন্তু এই কাজ তো বায়ু শ্রীরামচন্দ্রের সময়েও করতে পারতেন। শ্রীরামচন্দ্রকেও তো অনেক লড়াই করতে হয়েছে, তাঁরও তো তখন ঘাম হতো, তখনই তো বায়ু মিষ্টি মিষ্টি বইতে পারতো। এগুলো যুক্তিতে দাঁড়ায় না। এইজন্য এগুলোকে বেশী ঘাটাঘাটি করতে নেই। যেখানে ভাগবত কথা পাঠ হয় সেখানে কথাকাররা শ্রীকৃষ্ণের জন্মকথাই বেশী বলেন। হাজার হাজার লোক শুনতে আসছে, তাদেরকে একটু আনন্দ দিতে হবে। তখন এই ধরণের মিষ্টি মিষ্টি কথাকে খুব নাটকীয় ভাবে পরিবেশন করেন।

আকাশ কেন স্বচ্ছ পবিত্র হয়ে গেল তার ব্যাখ্যাতে ভাষ্যকাররা খুব সুন্দর একটা ভাবের জিনিষকে তুলে ধরেছেন। বলছেন, আকাশের এমন কিছু কিছু গুণ আছে যেগুলো ভগবানের উপমা দিতে ব্যবহার করা হয়। যেমন আকাশের ঐক্য ভাব, একই আকাশ সর্বত্র পরিব্যপ্ত হয়ে আছে। আমরা বলি ভগবানের এক রূপ, তিনি আকাশের মত সর্বত্র পরিব্যপ্ত হয়ে আছেন। আকাশ সব কিছুর আধার, ভগবানও হলেন সব কিছুর আধার। যদি ভগবান বা ব্রহ্মকে আকার ইঙ্গিতে বোঝাতে হয় তখন তার সব থেকে ভালো উপমা হল আকাশ। যেমন বলা হয় আকাশের আদি নেই অন্ত নেই, ভগবানও ঠিক সেই রকম তাঁরও আদি নেই অন্ত নেই। কিন্তু এই আকাশও ভগবানে অবস্থিত। ভাষ্যকাররা বলছেন, আকাশ ভাবছে আমার যত গুণ তার সবই ভগবানের সাথে উপমা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমার যে নীলবর্ণ, ভগবান এবার সেই নীলবর্ণ ধারণ করবেন। আমার এই একটা গুণ বাকি ছিল ভগবান এবার সেটাও নিয়ে নিলেন। আমার যা কিছু আছে ভগবানকে বর্ণনা করার জন্য সবটাই নিতে হবে। যেমন আকাশকে কেটে আলাদা করতে পারা যাবে না, আকাশকে আগুনে দগ্ধ করা যায় না, আকাশকে জল ভেজাতে পারে না, এই গুণগুলো সবই ভগবানের মধ্যেও আছে। আমি আকাশ, আমার আদি নেই, অন্ত নেই, আমি সীমাহীন, ভগবানও তাই। আমার একটি গুণ যেটা ভগবানের মধ্যে নেই, সেটা হল আমার নীলবর্ণ। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ অবতারের তিনি নীল রঙ ধারণ করবেন, তাই আকাশ খুব খুশী হয়ে গেছে।

অন্য দিকে আবার ***মুমুচুর্মুনয়ো দেবাঃ সুমানংসি মুদান্বিতাঃ। মন্দং মন্দং জলধরা জগর্জুরনুসাগরম্।।১০/৩/৭।*** ভগবানের আবির্ভাব হতে যাচ্ছে শুনে কিঙ্কর আর গন্ধর্বরা মধুর স্বরে গান করতে শুরু করে দিয়েছেন, সিদ্ধ এবং চারণগণ ভগবানের স্তুতি করতে লাগলেন, বিদ্যাধরীরা অপ্সরাদের সাথে নৃত্যগীত দিয়ে ভগবানের আবির্ভাবকে স্মরণীয় করে তুললেন এবং মুনি ঋষিরা পরিপূর্ণ হৃদয়ে পুষ্পবৃষ্টি করতে থাকলেন। জলভারবাহী মেঘমণ্ডলী সমুদ্রের সমীপে উপস্থিত হয় মন্দ মন্দ গর্জন করতে শুরু করল। বাদল মেঘ বলছে ভগবান সব সময় সমুদ্রেই থাকেন, আমরা সমুদ্রের ধারে কাছে যেতে পারি না, কিন্তু এবার তিনি আমাদের এলাকাতেই আসছেন, তাই এই সুযোগে এবার আমরা তাঁকে দর্শন করতে পারবো আর যখন প্রখর রৌদ্র কিরণ তাঁর উপর তাপ বিকিরণ করবে আমরা তাঁর মাথার উপর আচ্ছাদন তৈরী করে শীতল ছায়া দিয়ে তাঁকে শীতলতা প্রদান করতে পারবো। এই ভেবে মেঘেদের মনে খুব আনন্দ হচ্ছে আর তারাও মৃদু মৃদু গর্জন করে চলেছে।

ভগবানের রোহিনী নক্ষত্রে জন্ম নেওয়ার ব্যাখ্যা

ভগবান রোহিনী নক্ষত্রে জন্ম নেওয়ার ব্যাখ্যা করছেন – ভগবান দেবকীর গর্ভে জন্মে নিতে যাচ্ছেন তাই রোহিনী অসন্তুষ্ট হতে পারেন। কিন্তু ভগবান কারুকেই অসন্তুষ্ট রাখতে চান না, ভগবানের আবির্ভাবে সবারই মন যেন আনন্দে পরিপূর্ণ থাকে, কারুর মনে যাতে কোন প্রকার ক্ষোভ না হয় তাই তিনি রোহিনীর নামে যে নক্ষত্র আছে সেই রোহিনী নক্ষত্রে জন্ম নেবেন বলে মন স্থির করে নিলেন। তাছাড়া এর আগে তিনি সূর্যবংশে জন্ম নিয়েছিলেন, এবার তিনি চন্দ্র বংশে আবির্ভূত হতে যাচ্ছেন। চন্দ্রমার অনেক স্ত্রীর মধ্যে প্রিয় স্ত্রী

ছিল রোহিনী, ভগবান চন্দ্র বংশে জন্ম নিতে যাচ্ছেন তাই চন্দ্রমার প্রিয় স্ত্রীর নামে যে নক্ষত্র সেই রোহিনী নক্ষত্রে তিনি জন্ম নেবেন।

এই হল ভগবানের আবির্ভাবের পূর্বাবস্থা। ভগবান যখন আসেন তখন তিনি নিজেই সব ব্যবস্থা করে নেন এবং জগতের সব কিছুকে শুভ ও মঙ্গলময় করে তোলেন, জগতের সব কিছু সৌম্য ও শান্ত রূপ ধারণ করে। আমরা এখানে মেনেই চলেছি যে, ভাগবত ব্যাসদেবের রচনা। ব্যাসদেবের এই মূল রচনার উপর বিদ্বজ্জনরা, ঋষিরা যাঁরা এর উপর ভাষ্যাদি রচনা করেছেন তাঁরা কীভাবে একদিকে সৌন্দর্যকে ব্যাখ্যা করেছেন অন্য দিকে এর অন্তর্নিহিত ভাবকে সযত্নে তুলে এনে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি ভাবকে প্রস্ফুটিতে করে কীভাবে ভক্তের মনকে ভাবরাজ্যে নিয়ে যাচ্ছেন তারই সামান্য আমরা আলোকপাত করলাম।

ভাগবত গ্রন্থ হল ভাগবত তত্ত্বের সমাহার। ঋষিরা যাঁরা ভাগবত রচনা করেছেন তাঁরা সেই ভাগবত তত্ত্বকে কখন এইভাবে দেখেছেন, কখন ওই ভাবে দেখেছে, বিভিন্ন ভাবে দেখেছেন। জগতের ভৌতিক বস্তুকে একবার দেখে নিলে বোঝা যায় এই বস্তুতে কি আছে, কিন্তু ঈশ্বর তত্ত্বকে সেই ভাবে ইতি করা যায় না। ঠাকুরও এক সময় ঈশ্বরীয় তত্ত্বের যে ভাবকে দৃঢ় করে ধরেছেন, কিছু দিন পরেই বলছেন এখন এই ভাবটা আলুনি লাগছে। ঈশ্বর তত্ত্ব যত রকমের হতে পারে, ঈশ্বরের রূপ ও প্রকাশ যত রকমের হতে পারে, ঈশ্বরকে ভালোবাসার যত রকমের ভাব থাকতে পারে তার সবটাই ভাগবত আমাদের সামনে তুলে দিয়েছে। ভক্তিশাস্ত্র বলতে যা বোঝায়, সেই দিক থেকে ভাগবতই হল ঠিক ঠিক ভক্তিশাস্ত্র। ভাগবতের বাইরে আর কোন ভক্তিশাস্ত্র পাওয়া যাবে না। যেমন ইসলাম ধর্ম, ভাগবতের একটা ছোট্ট অংশে গিয়ে এই ধর্ম শেষ হয়ে যায়, খ্রীশ্চান ধর্মও ভাগবতের ছোট্ট একটা অংশে বলে দেওয়া হয়েছে। যে কোন ধর্মের চারটি স্তম্ভ থাকতে হবে, চারটি স্তম্ভ হল দর্শন, স্মৃতি, উপাচার এবং কথা-কাহিনী। এই চারটি স্তম্ভের মধ্যে একটি স্তম্ভ হল মিথক্। সেই একটি স্তম্ভের মধ্যে আছে ইতিহাস পুরাণ। তাহলে দাঁড়াল এই স্তম্ভের একটি ছোট্ট অঙ্গ পুরাণ। পুরাণ আবার পূর্ণাঙ্গ রূপ পায় আঠারোটি পুরাণ আর আঠারোটি উপ-পুরাণে। এই ছত্রিশটি পুরাণের মধ্যে একটি হল এই ভাগবত-পুরাণ। এই ভাগবত-পুরাণের একটা ছোট্ট অংশকে নিয়ে পুরো ইসলাম ধর্মকে দাঁড় করিয়ে দেওয়া যায়। আমরা কি একবারও ভাববো না যে, কোন্ ধর্মে আমাদের জন্ম হয়েছে! হিন্দু ধর্ম কত মহৎ উদার ধর্ম আমরা কল্পনাও করতে পারবো না।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব

ভগবানের আবির্ভাবের পূর্বে সব কিছু শুভ ও মঙ্গলময় রূপ ধারণ করেছে। ভগবানের আবির্ভাবের মুহূর্ত ঘনিয়ে এসেছে। শুকদেব পরীক্ষিৎকে বলছেন ***নিশীথে তম উদ্ভূতে জায়মানে জনার্দনে। দেবক্যাং দেবরূপিণ্যাং বিষ্ণুঃ সর্বগুহাশয়ঃ। আবিরাসীদ্ যথা প্রাচ্যাং দিশীন্দুরিব পুষ্কলঃ।।১০/৩/৮।*** জনার্দন, যিনি মানুষকে জন্ম-মৃত্যু চক্র থেকে উদ্ধার করে মুক্তি দেন, সেই জনার্দনের আবির্ভাবের সময়টি ছিল নিশীথকাল। চতুর্দিক যখন ঘনান্ধকারে আবৃত তখন ষোল কলা পূর্ণ চন্দ্রের উদয়ে যেমন চারিদিক আলোকিত হয়ে অন্ধকারকে দূরীভূত করে ঠিক তেমনি দেবকীর গর্ভ থেকে শ্রীকৃষ্ণ জন্ম নিতেই আকাশের পূর্ব দিগন্তে যেন ষোল কলায় পরিপূর্ণ পূর্ণিমার চন্দ্র উদিত হল। বসুদেব সেই প্রহরী বেষ্টিত কারাগৃহে অবস্থান করে দেখছেন এক অত্যাশ্চর্যীয় অদ্ভুত বালকের জন্ম হল। শুকদেব বর্ণনা করছেন – ***তমদ্ভুতং বালকমম্বুজেক্ষণং চতুর্ভুজং শঙ্খগদার্যুদায়ুধম্। শ্রীবৎসলক্ষ্মং গলশোভিকৌস্তভং পীতাম্বরং সান্দ্রপয়োদসৌভগম্।।১০/৩/৯।*** বসুদেব দেখছেন তাঁর সম্মুখে এক অদ্ভুত বালক আবির্ভূত। তাঁর নেত্রদ্বয় পদ্মফুলের মত রক্তাভ, তার সাথে তিনি *চতুর্ভুজম্*। সাধারণ শিশুর মত দুই বাহু বিশিষ্ট নন, তিনি চতুর্ভুজ। চারি হস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম শোভিত। ভগবান বিষ্ণুর সাকার রূপ ছোট্ট আকারে যে রকমটি দেখাবে এখানে এই নবজাতক বালককেও ঠিক সেই রূপে দেখাচ্ছে। বালকের বক্ষে শ্রীবৎস চিহ্ন, গলদেশে কৌস্তভমণি। মেঘের মত শ্যাম বর্ণ। শ্রীরামচন্দ্রেরও শ্যামবর্ণ ছিল, এখানে শ্রীকৃষ্ণেরও শ্যামবর্ণ এবং পীতাম্বর বস্ত্র পরিহিত, বহুমূল্য বৈদূর্য্যমণিখচিত মুকুট শিরে শোভিত এবং কুণ্ডলের দীপ্তিতে উদ্ভাসিত কুটিল কেশরাশি, কটিদেশে কাঞ্চী, বাহুদ্বয়ে অঙ্গদ ও কঙ্কনাদি

অলঙ্কারের দ্যুতি ইত্যাদি। ভক্তিশাস্ত্রের এটাই বৈশিষ্ট্য, যখনই কোন ভক্তিশাস্ত্র রচনা করা হয় তখন কখনই মানবীয় কিছু বর্ণনা করা হয় না। ইদানিং কালের যত উপন্যাসাদি রচনা করা হয় সেখানে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে গলার নীচের বর্ণনাই করা হয়, গলার উপরে বর্ণনা যাবে না। আগেকার সাহিত্যিকরা তাও মুখের বর্ণনা করতেন কিন্তু এখন সব ভাষার সাহিত্যে গলার নীচেরই বর্ণনা করা হয়। এই ভাবে কি কখন সাহিত্য হয়!

আমরা যখন কাউকে বলি এর সংস্কার ভালো, তার মানে তার ভেতরকার ময়লাগুলোকে সংস্কার করা হয়েছে। সংস্কার করা আর সংস্কৃতি একই জিনিষ। সংস্কৃতি এসেছে কৃষ্টি থেকে, agriculture, culture এগুলো সব একই রকম, যেখানে একটা জিনিষকে ঘষে ঘষে একটা patternএ নিয়ে আসা হয়েছে। সংস্কৃতি সব সময় মানুষকে স্বাধীন করে। সাধারণ মানুষ যারা অতি নীচ অবস্থার মধ্যে পড়ে আছে সংস্কৃতি সেই অবস্থা থেকে তাদের টেনে উপরে তুলে নিয়ে আসে। সংস্কৃতি মানেই সবাইকে টেনে উপরে তুলে নিয়ে আসা। শ্রীশ্রীমায়ের জীবনীতে আমরা দেখতে পাই অতি সাধারণ কাজেও মায়ের কি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। খাওয়ার জন্য আসন পাতা হয়েছে, কিন্তু আসনগুলো এক লাইনে সমান ভাবে পাতা হয়নি। শ্রীশ্রীমা খুব অসন্তুষ্ট হয়ে বলছেন 'এ কি! আসনগুলো সমান ভাবে পাতা হয়নি কেন, সোজা করে পাত'। আসন ঠিক ভাবে পাতাটাও একটা সংস্কার। উঠোন ঝাড়ু দিয়ে ঝাঁটাটা ছুড়ে রাখছে, ওই দেখে শ্রীশ্রীমা নিষেধ করে বলছেন 'ঝাঁটাটিরও একটা সম্মান প্রাপ্য, সে তোমার কাজ করে দিয়েছে তার যে স্থানে থাকার কথা তাকে সম্মানের সাথে সেখানেই রাখতে হবে'। শ্রীশ্রীমা যখন বললেন ঝাঁটাটিরও একটা সম্মান আছে, তখন এটাই হয়ে গেল সংস্কার। ঝাঁটাকে ছুড়ে রাখতে সবাই পারে, আর এভাবে রাখাটাই সবার কুঅভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। কিন্তু এই অভ্যাসকেই যখন ঘষে মেজে শিক্ষা দিয়ে সহজাত করে নেওয়া হয় তখনই সেটাই একটা সুসংস্কৃতিতে দাঁড়িয়ে যাবে, আর এখান থেকেই সে প্রকৃত স্বাধীনতা আস্বাদ করতে পারবে। ভাগবতাদি গ্রন্থ আমাদের খুব উচ্চ একটা সংস্কৃতির দিকে টেনে নিয়ে গিয়ে আমাদের মনের আবর্জনা আর সঙ্কীর্ণতার মনোভাব থেকে মুক্ত করে দেয়। ডিসিপ্লিনটাও একটা কালচার, ডিসিপ্লিনটাই মিলিটারি কালচার। মিলিটারি কালচারে মিলিটারিদের এমন ভাবে তৈরী করে দিচ্ছে যে যখন মরতে বলবে তখন সবাই মৃত্যুকে বরণ করবার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়বে। এই যে সংস্কৃতি, একটা জিনিষকে দিনের পর দিন করে যাচ্ছে, করতে করতে এমন একটা জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে যেখানে জীবনের প্রতি যে আসক্তি, মৃত্যু জনিত যে ভয়, সেখান থেকে তাকে মুক্ত করে দিচ্ছে।

ভাগবতের যা কিছু বর্ণনা এটাই আমাদের সংস্কৃতি। ভগবান এই রূপেই ঠিক এসেছিলেন কিনা আমাদের জানা নেই, আসতেও পারেন আবার নাও আসতে পারেন। তাতে কিছু আসে যায় না, কিন্তু যখন আমরা ধ্যান করতে যাব, যখন ভাবের গভীরে যাব তখন এই ধরণের বর্ণনা গুলিকেই অবলম্বন করতে হবে। বাচ্চার জন্ম কীভাবে হয় তার বর্ণনা করা ভাগবতের উদ্দেশ্য নয়, বাচ্চার জন্ম কীভাবে হয় জানতে হলে গাইনোকলজিস্টদের কাছে গিয়ে জানতে হবে। ভাগবত হল ভাবরাজ্যের গ্রন্থ। ভাবরাজ্যের গ্রন্থে ভগবান শিশু হয়ে এভাবেই জন্ম নেবেন, যেখানে তাঁকে দেখাবে ভগবানের তিনি ছোট্ট রূপ। যারা বলে এগুলো সব গাঁজাখুড়ি গল্প, আসলে তারা জানে না যে এগুলো কোন গল্পই নয়, এগুলোই ভাবরাজ্যের সৃষ্টি। ভাবরাজ্যে ভগবানকে এভাবেই জন্ম নিতে হবে। ভগবান প্রথমেই বড়দের মত কথা বলতে শুরু করবেন। ঠাকুরের ভাবরাজ্যের যে রচনাগুলো জনসাধারণের জন্য রচিত হওয়ার কথা সেই ভাবোপযোগী রচনা এখনও শুরুই হয়নি, তার জন্য আমাদের আরও একশ, দুশো বছর অপেক্ষা করতে হবে। এখনই কিছু কিছু যে শুরু হয়নি তা নয়, যেমন ঠাকুরের জন্মের কথা বলতে গিয়ে বলা হয় ঠাকুর জন্মেই উনুনের ভেতরে সিঁধিয়ে গিয়েছিলেন। ঠাকুরকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না, তখন উনুনের ভেতর থেকে একটু কান্নার আওয়াজ আসতেই ধনী কামরানী ঠাকুরকে ছাই মাখা অবস্থায় উনুন থেকে বার করে নিয়ে আসছেন। সবাই বলছে সাক্ষাৎ শিব তাঁর সর্বাঙ্গে ভস্ম মেখে আবির্ভূত হলেন। এটাই ভাবরাজ্যের রচনা। শ্রীশ্রীমা বলছেন ঠাকুর ছিলেন ত্যাগের বাদশা। ত্যাগের বাদশা কোথায় শুরু হয়েছে? জন্মের সময় সর্বাঙ্গে ভস্ম মেখে নিয়ে জন্ম নিয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণ যখন জন্ম নিচ্ছেন তখন তিনি চতুর্ভুজ নারায়ণ রূপে জন্ম নিচ্ছেন। শ্রীরামচন্দ্রও যখন জন্ম নিচ্ছেন তিনিও চতুর্ভুজ নারায়ণ রূপে আবির্ভূত হচ্ছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ যখন জন্ম নিচ্ছেন তিনি সর্বাঙ্গে ভস্ম মেখে স্বয়ং শিব রূপে আবির্ভূত হচ্ছেন।

এগুলোই আমাদের ভাবরাজ্যে টেনে নিয়ে যায়। যাঁরা অতীন্দ্রিয় রাজ্যের সাধক তাঁরা যখন সাধনা আর ধ্যান করেন তখন এগুলোই তাঁদের ধ্যানের বিষয় হয়ে যায়।

বসুদেবকৃত ভগবানের স্তুতি

যাই হোক, এই রকম এক অদ্ভূত শিশুর জন্ম হতে দেখে বসুদেব যুগপৎ খুব বিস্মিত হয়ে গেছেন আবার অন্য দিকে এই ভেবে মনে মনে খুব আনন্দিতও হয়েছেন যে ভগবান আমার পুত্র রূপে আবির্ভূত হয়েছেন। শিশুর জন্ম নেওয়ার পর বসুদেব হর্ষোল্লাসিত হয়ে সেই মুহুর্তেই মনে মনে ব্রাহ্মণদের দশ সহস্র গাভী দান করার সঙ্কল্প করলেন। তখনকার দিনে এই প্রথা ছিল, যখনই কোন পরিবারে কোন শুভ বা মঙ্গলজনক কিছু হত তখন ব্রাহ্মণকে তারা কিছু দান করতেন বা দান করার সঙ্কল্প করতেন। বসুদেব তো আগে থেকেই জানতেন যে আমার আর দেবকীর মাঝে ভগবানের আবির্ভাব হবে। তখনও শ্রীকৃষ্ণ নামকরণ হয়নি। যাই হোক এবারে ভগবানের জন্ম হয়েছে। বসুদেবের খুব আনন্দ, তিনি বুদ্ধিকে সংযত করে অবনত মস্তকে কৃতাঞ্জলিপুট হয় শ্রীভগবানের স্তব করছে – ***বিদিতোঽসি ভবান্ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতে পরঃ। কেবলানুভবানন্দস্বরূপঃ সর্ববুদ্ধিদৃক।।১০/৩/১৩।*** হিন্দু শাস্ত্রে, শুধু হিন্দু শাস্ত্রেই নয় সব শাস্ত্রেই এই একটি ভাব বারংবার আসবে, শুধু ভাষাটা পাল্টে যায়। বসুদেব বলছেন 'হে ভগবন্! আমি বুঝে গেছি আপনি কে, আপনি প্রকৃতির পারে যিনি অবস্থিত সেই সাক্ষাৎ পরমপুরুষ'। ঠাকুর বলছেন অবতারও শক্তির আণ্ডারে। ভগবান, যিনি সেই পরমপুরুষ তিনি প্রকৃতির পারে, শক্তিরও পারে। কিন্তু তিনি যখন অবতার রূপে লীলা করেন তখন তিনি এই প্রকৃতি বা শক্তির ভেতরে প্রবেশ করে যান। এটিই এক পরমাশ্চর্যের বিষয়।

আসলে আমরা যা কিছু জানি সব মন দিয়েই জানি। আমাদের মন বাচ্চা বয়স থেকে একটা বিশেষ ভাবে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হয়ে আছে, সেই প্রশিক্ষণ দিয়ে আমরা সব কিছুকে বোঝার বা জানবার চেষ্টা করি। সেইজন্য ওনারা ঈশ্বরের সর্বব্যাপিত্বকে আকাশের উপমা দিয়ে বোঝান। আকাশ সর্বব্যাপী, কিন্তু এই গ্লাশের ভেতরেও আকাশ ঢুকে আছে। গ্লাশের বাইরে আকাশ, গ্লাশের ভেতরেও আকাশ, গ্লাশ নিজেও আকাশের মধ্যে অবস্থিত। এই প্রকৃতিও সীমিত, একটা গ্লাশের মত। যতই আমরা চেষ্টা করি না কেন গ্লাশের ভেতরে সর্বব্যাপী আকাশকে ঢোকাতে পারবো না। কিন্তু গ্লাশ যেমনি তৈরী হয়ে গেল আকাশ তার মধ্যে ঢুকে গেল। কিংবা গঙ্গার জলের মধ্যে গ্লাশ রাখলে গ্লাশের ভেতরেও জল বাইরেও জল আর জলের মধ্যেই গ্লাশ। তেমনি ভগবান এবার প্রকৃতির মধ্যে ঢুকে গেছেন। বসুদেব এই কথাই বলতে চাইছেন, আমি বুঝতে পেরেছি আপনি শিশু হয়ে জন্ম নিয়েছেন, কিন্তু আপনি প্রকৃতির অতীত সেই পরমপুরুষ। প্রকৃতির পারে বলতে আমরা বুঝি, এই চারতলা বিল্ডিং আছে, বিল্ডিং এর উপর ছাদ আছে, ছাদের উপর আকাশ। আমরা বলবো আকাশ এই বিল্ডিং এর পারে। কিন্তু পুরুষ এই অর্থে প্রকৃতির পারে নয়। মন দিয়ে এই ব্যপারটা ধারণা করা একেবারেই অসম্ভব। আমাদের নড় চড়া, চলাফেরা কেবল জড় পদার্থের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ঈশ্বর যিনি, আত্মা যিনি তিনি হলেন শুদ্ধ চৈতন্য, এঁর ধরণটাই আলাদা। যতক্ষণ আত্মার এই ব্যাপারটা কেউ অনুভব না করে থাকে ততক্ষণ তাকে কোন ভাবেই ঈশ্বরের ব্যাপারে, আত্মার ব্যাপারে বা পুরুষের ব্যাপারে কোন ভাবেই বোঝানো যাবে না, বোঝানো তো দূরের কথা ধারণাই করানো যাবে না। সেইজন্য ঠাকুর বলছেন, শুনে রাখা ভালো। এগুলো শুনে যেতে হয়, অনেক দিন ধরে শুনতে শুনতে ভেতরে একটা সংস্কার তৈরী হয়।

এখানে বসুদেব হাতজোড় করে বলছেন 'আপনি সেই পুরুষ'। হিন্দু মতে ঈশ্বর ছাড়া কিছু নেই। এই ঈশ্বরের আরেকটি নাম পুরুষ বা পরমপুরুষ। কেউ কেউ তাঁকে আদিপুরুষ বলেন আবার কেউ কেউ অধিপুরুষ বলেন। তাঁকেই আবার পরে নারায়ণ নামে সম্বোধন করা হয়েছে। তিনি নিজের শক্তিতে সৃষ্টি করেন। ঈশ্বরের এই শক্তিকে সাধকরা বিভিন্ন নামে ডাকেন, কেউ বলেন মায়া, কেউ বলেন প্রকৃতি, কেউ বলেন শক্তি, কেউ বলেন কাল। মূল কথা হল যিনি চৈতন্য তিনিই সৃষ্টির মধ্যে নিজেকে জড় রূপে দেখান। কিন্তু হঠাৎ দুম্ করে চৈতন্য তো কখন জড় হয়ে যাবেন না। জল যখন বরফ হয় তখন তারও কয়েকটি ধাপ আছে। আর এখানে তো তাঁর পুরো ধরণটাই পাল্টে যাচ্ছে। এই জায়গাতে এসে কখন মনে হবে শুদ্ধ চৈতন্য জ্যোতির্ময় আবার

কখন মনে হবে তিনটে গুণের সমাহার। শুদ্ধ চৈতন্য জ্যোতি নাকি তিনটে গুণের সমাহার এই ব্যাপারটা স্পষ্ট বোঝা যায় না। এই তিনটে গুণকে আবার বুদ্ধি রূপে দেখায়। কারণ আমাদের চৈতন্যের প্রকাশ বেশী হয় বুদ্ধিতে। সেইজন্য চৈতন্য যখন আকার ধারণ করে তখন তার প্রথমে আসে বুদ্ধি। সেখান থেকে ধাপে ধাপে নামতে নামতে এই জগতের রূপ নেয়।

বসুদেব বলছেন 'আপনার ঠিক ঠিক স্বরূপ হল *'কেবলানুভবানন্দস্বরূপঃ'*। আমরা অনেকবার বলেছি যে ভাগবত হল অত্যন্ত কঠিন গ্রন্থ। বড় বড় পণ্ডিতরাও ভাগবতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে পিছিয়ে আসেন। ভাগবতের আরেকটি বড় সমস্যা হল, ভাগবতের যে কোন শ্লোকের অর্থকে ভেঙ্গে যে কোন একটা নতুন দর্শনকে দাঁড় করিয়ে দেওয়া যায়। শুধু শব্দকে আমি কীভাবে ভাঙছি, কোন জায়গাতে ভাঙছি তার উপর নির্ভর করবে আমি কোন দর্শনকে দাঁড় করাব। অদ্বৈতীরা এখান থেকে অদ্বৈত তত্ত্ব দাঁড় করিয়ে দেবেন। আমরা জানি ভাগবত হল বৈষ্ণব শাস্ত্র, আর বৈষ্ণব মানে ঘোর দ্বৈতবাদী। এই যে এখানে বলছেন *কেবলানুভব*, সংস্কৃতে 'কেবল' শব্দের অর্থ একমাত্র, শুধুমাত্র তিনিই আছেন, তিনিই একমাত্র আছেন বললে অদ্বৈত হয়ে যাবে। কিন্তু ব্যাখ্যাকাররা এখানে অর্থ করছেন এই পরমপুরুষকে পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জানা যাবে না, একমাত্র বোধে বোধ করা যায়। অর্থাৎ শুধুমাত্র অনুভব এবং আনন্দ দিয়েই তাঁকে জানা যায়। বোধে বোধ করেন, এর কি অর্থ হয়? ঠাকুরও এই কথা বলছেন। আবার ঠাকুর বলছেন – কাকেই বা বলি কেই বা বুঝবে। স্বামীজীও ঠাকুরের কথা প্রসঙ্গে বলছেন – শেষমেশ আমি তো সেই বাচ্চা ছেলে, দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কথা শুধু অবাক হয়ে শুনতাম। আমরা এখানে শাস্ত্র অধ্যয়ন করছি, তাতেই একটা করে শ্লোক বুঝতে গিয়ে মাথা ঝিম্‌ঝিম্ করছে। এবার কোন ঋষি, যাঁর এসব সত্যের প্রত্যক্ষ অনুভূতি হয়ে গেছে, তিনি আমাদের মত অবুঝদের বোঝানোর চেষ্টা করছেন। এখন তিনি আমাদের কি করে বোঝাবেন! বিজ্ঞানে subjective আর objectiveকে নিয়ে অনেক পুরনো ঝগড়া। যেমন একটা বোতল, কোন বোতল লম্বা, কোন বোতল চ্যাপ্টা, এটা পুরোপুরি subjective। আবার একটা খাবার খেতে কেমন, সেটাও পুরোপুরি subjective। ঈশ্বর দর্শন বা ঈশ্বরকে অনুভবের ব্যাপার যখন আসে তখন তার তার পুরোটাই subjective হয়ে যায়। সেইজন্য যাঁর ঈশ্বরের জ্ঞান হয় তখন বলা হয় স্বসংবেদ্য, যিনি জানেন শুধু তিনিই জানেন। কিন্তু কি রকম জানেন? একেবারে আনন্দস্বরূপ, সেখানে দুঃখের ছায়া পর্যন্ত নেই। সুষুপ্তিতে যে ধরণের একটা আনন্দের আভাস থেকে যায়, ঠিক সেই রকম আনন্দ। এই আনন্দই আপনার স্বরূপ। যাঁরা আপনাকে জানতে চান তাঁরা আপনার শুধু এতটুকুই জানবেন।

'আর আপনি হলেন *সর্ববুদ্ধিদৃক্*, সমস্ত বুদ্ধির সাক্ষি'। আমি যেমন আমার বুদ্ধি দিয়ে সবাইকে জানতে পারছি, আপনি আপনার বুদ্ধি দিয়ে বাকি সবাইকে জানতে পারছেন। কিন্তু ভগবান হলেন *সর্ববুদ্ধিদৃক্* যত বুদ্ধি আছে সবাইকে তিনি দেখতে পারছেন। তিনিই একমাত্র সাক্ষী। বুদ্ধিকে আমরা যে অর্থে মনে করি সেই অর্থে তাঁর বুদ্ধি নয়, তিনি সব কটি বুদ্ধির সাক্ষী, তাঁকে আমার আপনার বুদ্ধি দিয়ে জানা যাবে না, সেইজন্য আপনার স্বরূপ কি? অনুভব আর আনন্দ। কি অনুভব আর কি আনন্দ? যে ঘি খেয়েছে তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঘি কেমন? যে ঘি খেয়েছে সে কি উত্তর দেবে? মুখে একটা আনন্দ সূচক আওয়াজ করে বলবে ঘি যেমন। যে লোকটি কখন ঘি খায়নি তাকে কি করে বোঝাবে যে ঘি কেমন খেতে। যে ঘি খেয়েছে সে তার ঘি খাওয়ার অনুভব আর আনন্দকে প্রকাশ করবে। অনুভব দু রকমের হয়, তিক্ত ও আনন্দ। ভগবানের স্বরূপ কি? এটাই – অনুভব আর আনন্দ। গভীর নিদ্রা থেকে ওঠার পর কেউ যদি জিজ্ঞেস করে – কি, কেমন ঘুম হল? বলবে দারুন ঘুম। ভগবানের ক্ষেত্রেও অন্য কিছু বলা যায় না, একমাত্র অনুভব আর আনন্দ দ্বারাই ভগবানের স্বরূপকে বোঝা যায়। ভগবান হলেন তাই অনুভব আর আনন্দের বিষয়।

বসুদেব বলছেন – ***স এব স্বপ্রকৃত্যেদং সৃষ্টাগ্রে ত্রিগুণাত্মকম্। তদনু ত্বং হ্যপ্রবিষ্টঃ প্রবিষ্ট ইব ভাব্যসে।।১০/৩/১৪।*** এই শ্লোকের যা বক্তব্য, বেদ থেকে শুরু করে প্রত্যেকটি শাস্ত্রে এই একই বক্তব্যকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বিভিন্ন ভাবে বলা হয়। বলছেন সৃষ্টি যখন শুরু হয় তখন আপনি আপনার নিজের প্রকৃতি দিয়েই এই ত্রিগুণাত্মিকা জগৎ রচনা করেন। এই ব্যাপারটা আমাদের একেবারে মাথার মধ্যে খুব দৃঢ় ভাবে

বসিয়ে রাখতে হবে যে, জগৎ যখনই সৃষ্টি হয় তখন প্রথমেই থাকে প্রকৃতি। এই প্রকৃতি হল ত্রিগুণাত্মিকা, সত্ত্ব, রজ আর তম দিয়ে তৈরী। এই তিনটে গুণ হল Pure qualities। Pure qualities মানে, যেমন আমার এই জামার রঙ লাল, এই লালের যে লালত্ব, এই লালত্বটাই হল গুণ। জামাটাও নয়, জামার রঙ লাল সেটাও নয়, লালের যে লালত্ব সেটাই হল গুণ, সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিনটে হল সেই রকম গুণ। লালত্বের প্রতিক্রিয়া কি হবে? লাল রঙ। লাল রঙের কি প্রতিক্রিয়া? লাল জামা। ঠিক তেমনি রজ গুণ, রজ গুণ থেকে যখন এক ধাপ নীচে আসবে তখন দেখা যাবে activity। আরেক ধাপ যখন নীচে নামবে তখন দেখাবে গাড়ি দৌড়াচ্ছে। গাড়ি দৌড়াচ্ছে এটা দৌড়াচ্ছে রজ গুণের জন্য। আমরা মনে করছি শক্তির জন্য দৌড়াচ্ছে, কিন্তু তা নয়, শক্তিরও এক ধাপ উপরে আছে রজ গুণ। রজগুণ মানেই ক্রিয়াশক্তি। লালত্ব থেকে লাল আর লাল থেকে লাল জামা এইভাবে রজগুণও ধাপে ধাপে নামে। সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিনটে গুণের মিশ্রণ এটাই প্রকৃতি। এই গুণগুলো জগতে যখন প্রকাশিত হয় তখন প্রথম বুদ্ধি রূপে প্রকাশিত হয়। এই বুদ্ধি আমার আপনার বুদ্ধি নয়, এই বুদ্ধি হল সমষ্টি বুদ্ধি (Cosmic Inteligence/mind)। এই সমষ্টি বুদ্ধি বা মন থেকে তাঁর মধ্যে বোধ আসে আমি আছি, *অহম্ অস্মি* এটাকেই বলছেন সমষ্টি অহঙ্কার (cosmic ego)। এই অহঙ্কার থেকে পাঁচটি তত্ত্বের জন্ম নেয় – আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবী, এবার সব কিছু পুরোদমে সৃষ্টি হতে থাকেব, এটাই সৃষ্টির ক্রম। ভগবান যিনি, যিনি শুদ্ধাত্মা তিনি এই প্রকৃতির পারে।

বিভিন্ন দর্শনের মধ্যে যে বিবাদ সেটা এই প্রকৃতি আর ভগবানের মধ্যেকার সম্পর্ককে নিয়ে। এই বিবাদটা নিয়ে আমরা এখানে আলোচনা করতে যাচ্ছি না। বেদান্ত মতে, যেটা ভাগবতেরও মত, ভগবানই আছেন। এখন এই জগতপ্রপঞ্চকে আমরা ভগবানের মায়াই বলি, ভগবানের শক্তিই বলি, ভগবানের প্রকৃতিই বলি বা লীলাই বলি যাই বলি না কেন সত্ত্ব, রজ ও তম প্রকট হল, সেখানে থেকে এই দৃশ্যমান জগতের সৃষ্টি হল। সৃষ্টি করে দিলেই তো হবে না, সৃষ্টিকে জীবনের প্রাণস্পন্দনে ভরপুর করে দিতে হবে। সৃষ্টির মধ্যে প্রাণ না থাকলে সেই সৃষ্টির কোন মূল্যই থাকবে না, যেমন পাহাড়ের মধ্যেও কোন পাহাড়কে জীবন্ত পাহাড় আবার কোন পাহাড়কে মৃত পাহাড় বলে, হিমালয়কে জীবন্ত পাহাড় বলে আবার বিহারের দেওঘরের দিকের পাহাড়গুলোকে মরা পাহাড় বলে, সেই সব পাহাড় কিছু হয় না। প্রকৃতির মধ্যে জীবন কীভাবে আসে?

সেটাই বসুদেব বলছেন আপনি ব্রহ্মাণ্ডের রচনা করেন, রচনা করে আপনি এই প্রকৃতির মধ্যে প্রবেশ করে যান। এই প্রবেশ করাটা আবার খুব মজার, বলছেন *তৃদনু তৃং হ্যপ্রবিষ্টঃ* , তিনি সত্যি সত্যি ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে ঢোকেন না, মনে হয় যেন তিনি ঢুকেছেন। এখানে মূল কথা হল 'মনে হয়'। যেমন আমরা বলি আমাদের ভেতরে অন্তর্যামী আছেন। তাহলে কি তিনি আমাদের ভেতরে প্রবেশ করেছেন? এর সহজ উপমা হল, উত্তরমেরুর সমুদ্রের জল জমে বরফ হয়ে গেছে। ওই বরফ কোথাও একটা পাত্রের আকার ধারণ করেছে, তার মধ্যে আবার জল জমে আছে। জলের মধ্যে বরফটা ভাসছে। যে বরফটা ভাসছে সেটাও জল থেকে আকার নিয়েছে, বরফের ভেতরে যেটা আছে সেটাও জল, ওই বরফের যে পাত্র তৈরী হয়েছে তাতে জল ঢুকেছে। কিন্তু জল ঢুকবে কোথায়, ওই জল তো জলের মধ্যেই ছিল। ঈশ্বর আর তাঁর সৃষ্টির সাথে ঠিক এই একই সম্পর্ক। গীতার নবম অধ্যায়ে প্রথমের দিকে এই তত্ত্বটাকে অন্য দৃষ্টিকোণ দিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আমি আছি অথচ আমি নেই, যেমন মরুভূমিতে জল দেখা যায়, জল দেখাচ্ছে কিন্তু জল নেই। ভগবান যদি ভেতরে ঢুকে যান তাহলে ভগবানকে সীমিত করে দেওয়া হল। আসলে তিনি কখনই সীমিত হন না, মনে হয় যেন তিনি সীমিতি হয়ে প্রকৃতির মধ্যে প্রবেশ করে গেলেন। আসলে এই দুটো প্রকৃতিই তাঁর। কোন দর্শন শাস্ত্র দিয়ে এই জিনিষটাকে ব্যাখ্যা করে বোঝান যায় না। সেইজন্য বলা হয় তিনিই আছে, তিনি না থাকলে চেতনা আসবে না। প্রকৃতি জড়, কিন্তু প্রকৃতির মধ্যে চেতনা আসছে কারণ প্রকৃতির মধ্যে তিনি আছেন বলে, তিনি আবার প্রকৃতির মধ্যে প্রবেশ করতে পারেন না বলে বলা হয় মনে হয় যেন তিনি প্রবেশ করলেন।

এই তত্ত্বকেই আবার উপনিষদে খুব সুন্দর ব্যাখ্যা করে বলছেন ভগবান রচনা করে তার মধ্যে প্রবেশ করলেন। কি রকম প্রবেশ করলেন? যেমন আমরা একটা বাড়ি তৈরী করে বাড়িটার মধ্যে ঢুকে যাই। পাখী যেমন বাসা বানিয়ে তার মধ্যে ঢুকে যায়। বলছেন – যদিও বলা হয় আপনি এই ব্রহ্মাণ্ডকে সৃষ্টি করে তার

মধ্যে ঢুকে যান, তাও কিন্তু ঠিক বলা হচ্ছে না, কেননা আপনি তার মধ্যে আগে থেকেই রয়েছেন। বসুদেব যেটা বলছেন এর মূল অর্থ হল ভগবান ছাড়াতো আর কিছুই নেই।

এই জিনিষটাকেই ভাগবত খুব সুন্দর ভাবে বিশ্লেষণ করছে ***সন্নিপত্য সমুৎপাদ্য দৃশ্যন্তেঽনুগতা ইব। প্রাগেব বিদ্যমানত্বান্ন তেষামিহ সম্ভবঃ।। ১০/৩/১৬।*** এই শ্লোকটি খুব উচ্চ সারগর্ভ পূর্ণ একটি শ্লোক। দ্বৈতবাদীরা এই শ্লোককেই তাঁদের পাণ্ডিত্য দিয়ে তাঁদের নিজস্ব দর্শন অনুযায়ী ব্যাখ্যা করেন। ভাগবত নিজেই বলছে, ভগবান বিরাট হয়ে ছোটর মধ্যে প্রবেশ করবেন কীভাবে! কখনই তিনি প্রবেশ করেন না, তিনি আগে থেকেই তার মধ্যে বিদ্যমান আছেন। কারণ সৃষ্টি আর সৃষ্টিকর্তা আলাদা নন। ভগবান ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে সৃষ্টির আগে থেকেই আছেন। কুমোররা যখন মাটির ঘট তৈরী করছে তখন কুমোর আলাদা আর ঘট আলাদা। ভগবানের ক্ষেত্রে কুমোর আর ঘটের মত আলাদা হবে না। কারণ ভগবান ছাড়া কিছু নেই। প্রকৃতিটাও তাঁরই, আবার প্রকৃতির মধ্যে তিনি আগে থেকেই আছেন। সেইজন্য মনে হয় তিনি আগে থেকে ঢুকে আছেন। আসলে তিনি কোথাও ঢোকেন না, প্রথম থেকেই তিনি সর্বত্র বিদ্যমান হয়ে আছেন, তাঁর বাইরে কোন জিনিষই নেই।

যেমন ধরুন এই বোতলটা রয়েছে, এই বোতলটা যখন তৈরী করা হল তখন বলা হল যে এই বোতলের মধ্যে আকাশ বা স্পেস ঢুকে গেল, তা কি রকম এই আকাশ? বোতলের আকারে। একদিকে আকাশ ঢুকলো ঠিকই। কিন্তু আকাশতো আগে থেকেই ওখানে ছিল। আকাশ আগে থাকতেই বিদ্যমান কিন্তু আবার মনে হচ্ছে আকাশ বোতলের ভেতরে ঢুকেও গেল। আকাশ ছাড়া কিছু নেই। বোতলের মধ্যে যদি জল ঢেলে দেন তাহলে জলটা যেমন বোতলের মত আকার নিয়ে নেবে, ঠিক তেমনি বোতলের ভেতরের আকাশও বোতলের মত আকার নিয়ে নিয়েছে। ভাগবতে বসুদেব যে ভগবানের স্তুতি করছেন এটি অত্যন্ত উচ্চ বেদান্ত।

এরপর ঈশ্বরের আরও একটি খুব গভীর তত্ত্বকে নিয়ে বলছেন ***ত্বত্তোঽস্য জন্মস্থিতিসংযমান্ বিভো বদন্ত্যনীহাদগুণাদবিক্রিয়াৎ। ত্বয়ীশ্বরে ব্রহ্মণি নো বিরুধ্যতে ত্বদাশ্রয়ত্বাদুপচর্যতে গুণৈঃ।।১০/৩/১৯।*** সৃষ্টিতে যত রকম ক্রিয়া হয় ভগবান সমস্ত রকমের ক্রিয়ার পারে। একটা উপমা দিয়ে জিনিষটাকে বোঝা যাক। এই যে মাথার উপর পাখা ঘুরছে, গরমে ঠাণ্ডা হাওয়া গায়ে এসে লাগছে, আমাদের কত আরাম বোধ হচ্ছে। এখন যদি দুম্ করে ঘরটা খুব ঠাণ্ডা হয়ে যায় তখন এই পাখার হাওয়াটা আর ভালো লাগবে না। বিদ্যুৎ শক্তিতে এই পাখাটা ঘুরছে, এখানে বিদ্যুৎ নির্বিকার। বিদ্যুতের ভারি বয়ে গেছে গরমের সময় আমাদের ঠাণ্ডা বাতাস দেবে, শীতের সময় গরম দেবে। বিদ্যুৎ নির্বিকার, কিন্তু তারই জন্য গরমে পাখা চলছে, শীতকালে রুমহিটার চলছে। ঠিক তেমনি আমাদের ভেতরে যিনি চৈতন্য আছেন তিনি সব সময় নির্বিকার, আমরা কি করছি, কি করছি না, তাতে তার বয়ে গেছে, তিনি নির্বিকার। কিন্তু আমরা বলি সবই ঠাকুরের ইচ্ছা। আমরা যতই ঠাকুরের ইচ্ছা বলি, তিনি কিন্তু নির্বিকার। কিন্তু চৈতন্য আছে বলেই জগৎ চলছে, ইলেক্ট্রিসিটি আছে বলেই পাখা বাতাস দিচ্ছে, টিউব লাইট জ্বলছে, এসি মেশিন ঠাণ্ডা দিচ্ছে, ইলেক্ট্রিসিটি এগুলোর কোনটাই করে না, সে নির্বিকার। ভগবান হৃদয়ে আছেন বলে সব কিছু চলছে, কিন্তু তিনি নির্বিকার।

শুধু তিনি নির্বিকারই নন, এখানে বসুদেব বলছেন *ত্বয়ীশ্বরে ব্রহ্মণি নো বিরুধ্যতে ত্বদাশ্রয়ত্বাদুপচর্যতে গুণৈঃ,* দিল্লীতে একজন প্রধানমন্ত্রী আছেন। প্রধানমন্ত্রীর অধীনে আরও অনেক মন্ত্রী আছেন। এখন যদি কোন মন্ত্রী চুরির দায়ে ধরা পড়ে তখন দোষটা প্রধানমন্ত্রীর ঘাড়ে এসে পড়ে। চুরি কি প্রধানমন্ত্রী করেছেন? না, তিনি তো চুরি করেননি। কিন্তু তার উপর সব দোষ চেপে যাচ্ছে। কারণ মন্ত্রী, আইএএস সবাই প্রধানমন্ত্রীর আশ্রিত। প্রধানমন্ত্রীর এখানে কোন ভূমিকাই নেই। প্রধানমন্ত্রীর উপরেও একজন আছেন। তিনি হলে রাষ্ট্রপতি, তিনি সই না করলে কোন আইন পাশ হবে না। তিনি অনুমোদন করছেন কিন্তু কোন কিছুতে জড়িয়ে নেই। চৈতন্যের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই হয়। এই তিনটে গুণ, সত্ত্ব, রজ ও তম সব সময় আশ্রয় করে আছে ঈশ্বরকে। সেইজন্য সবাই মনে করে ঈশ্বর করছেন, আসলে ঈশ্বর কিছু করেন না।

বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের যা কিছু আছে সবই এই তিনটে গুণের খেলা। যে কোন জিনিষকে বিশ্লেষণ করতে করতে শেষে এই তিনটে গুণে এসে দাঁড়াবে। এই তিনটে গুণের স্বভাবই হল বাচ্চাদের মত। বাচ্চারা যেমন

নিজেদের মধ্যে খেলা করতে ভালোবাসে, এই তিনটে গুণও সব সময় নিজেদের মধ্যে খেলা করে যাচ্ছে আর একজন আরেকজনকে সব সময় দাবিয়ে রাখতে চাইছে। এই তিনটে গুণের sum total সব সময় one। যার ফলে কারুর মধ্যে যদি সত্ত্বগুণের আধিক্য বেশী হয়ে যায় তখন তার মধ্যে রজ ও তম গুণ কমে যাবে, যদি তমগুণ বেড়ে যায় তাহলে সত্ত্ব ও রজ কমে যাবে। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু হচ্ছে, এই যে পাখা ঘুরছে, সূর্য চন্দ্র চলছে, দিন রাত হয়ে চলেছে, আমাদের জীবনে কখন হাসি, কখন কান্না, যা কিছু হচ্ছে সব এই তিনটে গুণের খেলা। এই তিনটে গুণ আশ্রয় করে আছে ভগবানকে, সেইজন্য সবাই ভগবানের উপর সব কিছু চাপিয়ে দেয়। গ্রীষ্মকালের দুপুরে কি প্রচণ্ড গরম, কেউ বলবেন এই গরম হওয়াটা একটা chance, কেউ মনে করবেন এটা একটা accident, কেউ বলবেন গরমকালে গরম হবে এতো স্বাভাবিক, ঋতুর পরিবর্তনে ঠাণ্ডা গরম হচ্ছে, কেউ বলবেন তাঁর ইচ্ছাতেই গরম লাগছে, ইদানিং আবার Global warning to environment নামে অনেক নতুন নতুন কথা উঠেছে, তারা বলবে এত গাছ কাটা হচ্ছে তাই এই গরম লাগছে। এর মধ্যে কোনটা ঠিক? কোনটাই ঠিক না, আমি কোন মতকে ধরেছি, কোন দর্শনকে বিশ্বাস করছি, তার উপর নির্ভর করবে কোনটা ঠিক।

মনুষ্য জীবনের চারটি আদর্শ – বিদ্যা, সম্পদ, সেবা ও ত্যাগ

তবে কি, সব কিছুর দায় ভগবানের উপর চাপিয়ে না দিয়ে, অপরের উপর দোষারোপ করার কুঅভ্যাস বন্ধ করে আমরা আমাদের সামর্থ অনুযায়ী নিজেদের জীবনকে যে কোন একটা আদর্শকে সামনে রেখে যদি সংগঠিত করতে পারি তাহলে আমাদের সমাজ ও দেশের চেহারাটা সম্পূর্ণ পাল্টে যাবে। একটা কথা সব সময় আমাদের মাথায় রাখা দরকার, প্রত্যেকেরই জীবনের একটা উদ্দেশ্য থাকা দরকার। আজকের ভারতবর্ষে কত রকমের সমস্যা। এই সমস্যাকে কাটিয়ে ওঠার একটাই পথ। কিছু কিছু মহৎ মানুষের জীবনকে অনুধাবন করে একটা আদর্শকে সামনে রেখে আমাদের জীবনে এগিয়ে যেতে হবে। স্বামীজীর জীবন, মনুস্মৃতি আরও অনেক শাস্ত্র পড়ে তিনটে আদর্শ পাওয়া যায় যেটা সবার পক্ষে পালন করা এমন কিছু কষ্টসাধ্য নয়। প্রথম আদর্শ হল **‘বিদ্যা’**। বিদ্যা মানে তা যে কোন বিদ্যা, কেউ ফিজিক্স পড়ছে, কেউ নাচ করছে, কেউ ছবি আঁকছে, যে কোন বিদ্যাই হোক, যে কোন একটা বিদ্যাকে নিয়ে সেই বিদ্যাতেই সারা জীবন লেগে থেকে বিশ্বে সেই বিশেষ একটি বিদ্যাতে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করা। আমি এমন পরিশ্রম করবো, বিদ্যার জন্য এমন জান কবুল করবো যাতে আমি ওই বিদ্যাতে বিশ্বের সেরাদের মধ্যে একজন হতে পারি। দ্বিতীয় আদর্শ **‘সম্পদ’**, দেশের জন্য আমি সম্পদ তৈরী করবো। আমি নিজের জন্য সম্পদ তৈরী না করে দেশের যাতে সম্পদ বৃদ্ধি হয় সেই চেষ্টা করে যাবো। দুটো পয়সা বাঁচানোও দেশের সম্পদ তৈরী করা। যেখানে হেঁটে যেতে পারি সেখানে রিক্সা করবো না, যেখানে বাসে যেতে পারি সেখান ট্যাক্সি করলাম না, যেখানে স্লীপারে যেতে পারি সেখানে এসিতে যাচ্ছি না, এগুলোতেও অনেক পয়সার সাশ্রয় হয়। অপ্রয়োজনে বেশী আলো জ্বালালাম না, সব সময় লক্ষ্য রাখা অযথা আলো পাখা চলছে কিনা, পাখাতেই যদি কাজ হয়ে যায় তাহলে আর এসি চালালাম না, এই ভাবেও আমরা সবাই দেশের বিদ্যুৎ সম্পদ তৈরী করতে পারি। কিন্তু তার থেকেও বড় হল এমন কোন কাজ করা যাতে দেশের সম্পদ বাইরে থেকে না আনতে হয়, এমন কোন মেশিন তৈরী করলাম, এমন বিদ্যা তৈরী করলাম যাতে দেশের মানুষের উপকার হয়। এই দুটো আদর্শকে যদি কেউ পালন করতে না পারে তাহলে তাদের জন্য তৃতীয় আদর্শ হল **‘সেবা’**। সেবা মানে – আগে তাকে প্রত্যেক ভারতবাসীকে আমার নিজের ভাই নিজের বোন বলে গ্রহণ করতে হবে। নিজের ভাই-বোনকে, নিজের আপনজনকে মানুষ যেভাবে সেবা করে, আমিও প্রত্যেক ভারতবাসীকে সেইভাবে সেবা করব। ট্রেনে বাসে যাচ্ছি কত লোক আমার সাথে যাচ্ছে, সবাই আমার ভাই। আপনি বলতে পারেন – সে তো আমাকে ভাই মনে করছে না। কিন্তু আমাকে এটা মনে রাখতে হবে অপরকে মহৎ করা আমার দায়ীত্ব নয়, আমাকে নিজে আগে মহৎ হতে হবে। আপনি মনে করুন ভারতের সবাই অপদার্থ আর তাদের ভালো করার দায়ীত্ব একা আপনার। কীভাবে আমরা এই দায়ীত্ব পালন করবো? আমাদের তপস্যা দিয়ে। চতুর্থ আদর্শ হল **‘ত্যাগ’**, কিছু লোক আছেন যাঁরা ঈশ্বরের প্রতি পূর্ণ সমর্পিত, তাঁরা জগতের দিকে তাকাবেন না, এই ত্যাগই ভারতের শ্রেষ্ঠ আদর্শ।

আমাদের সবার জীবনেই দুঃখ-কষ্ট আসে। দুঃখ-কষ্ট এলে আমরা বলি ‘হায় ভগবান! বেছে বেছে তুমি আমাকেই এত কষ্ট দিলে’! ভগবানও বলেন ‘হ্যাঁ, তোমার জন্যই বেছে রেখেছিলাম’। প্রকৃতপক্ষে আমাদের দৈনন্দিন সুখ-দুঃখের সাথে ভগবানের আদৌ কোন সম্পর্ক নেই। ভগবানের কি এমন দায় পড়েছে যে তিনি বেছে বেছে আমাকে আপনাকে কষ্ট দেবেন! যিনি আনন্দস্বরূপ তিনি কেন অপরকে কষ্ট দিতে যাবেন! জীবনে ভালো-মন্দ যাই হোক না কেন, সবটাই আসলে গুণ গুণের উপর খেলা করছে। তিনটে গুণের এই ব্যাপারটা ভালো করে বুঝে নিয়ে নিজের লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। যিনি বিদ্যাকে ধরে নিয়েছেন, তিনি মনে করবেন আমি হলাম বিদ্যার সাধক। এবার গরম পড়ছে, ঠাণ্ডা পড়ছে, কষ্ট হচ্ছে, কোন দিকে ভ্রুক্ষেপ নেই, আমার তো উদ্দেশ্য হল বিদ্যাকে নিয়ে এগিয়ে যাওয়া। আমার শরীরের সামান্য প্রয়োজন মিটে গেলেই হল। বাকিটা গুণ গুণের উপর খেলা করে যাচ্ছে। সমস্যা হল এই তিনটে গুণ ভগবানের উপর আশ্রিত বলে মানুষ মনে করে ভগবানই সুখ দিচ্ছেন, ভগবানই দুঃখ দিচ্ছেন। এই ভ্রান্ত ধারণা থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে, বেরিয়ে এসে নিজের সামর্থ অনুযায়ী এই চারটে আদর্শের যে কোন একটি আদর্শকে ধরে এগিয়ে যেতে হবে। তিনি আছেন বলে গুণ গুণের উপর কাজ করছে।

বসুদেব বলছেন, ***স ত্বং ত্রিলোকস্থিতয়ে স্বমায়য়া। বিভর্ষি শুক্লং খলু বর্ণমাত্মনঃ। সর্গায় রক্তং রজসোপবৃংহিতং কৃষ্ণং চ বর্ণং তমসা জনাত্যয়ে।।১০/৩/২০।*** যদিও সত্ত্ব, রজ ও তম ভগবানকে আশ্রয় করে আছে, কিন্তু ভগবান যখন সত্ত্বময় গুণকে আশ্রয় করেন তখন তিনি বিষ্ণু রূপে জগতের পোষণ করেন, যখন তিনি রজোগুণকে আশ্রয় করেন তখন তিনি সৃষ্টি করেন আর যখন তিনি তমোগুণকে আশ্রয় করেন তখন তিনি সব কিছু সংহার করেন। কারণ এই সৃষ্টি, স্থিতি আর সংহার কার্য ভগবান ছাড়া আর কারুর পক্ষে সম্ভব নয়। ভাগবতেই অন্য এক জায়গায় বলছেন, যখন পঞ্চতত্ত্ব সৃষ্টি হয়ে গেল, এই পঞ্চতত্ত্ব এবার সৃষ্টি কার্যে নেমে গেল। কিন্তু তারা কিছুই করতে পারছে না। তখন ভগবানকে পঞ্চতত্ত্বের মধ্যে ঢুকতে হল। যেমনি ভগবান ঢুকে গেলেন সৃষ্টিকার্য শুরু হয়ে গেল। এটাই বলতে চাইছেন যে, সৃষ্টিতে ভগবান ছাড়া কিছু নেই।

এই ক্ষুদ্র পরিসরে সব কিছু আলোচনা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয় বলে মূল কয়েকটি তত্ত্ব কথার উপর আলোকপাত করা হল। বসুদেবের মূল বক্তব্য হল আপনি সেই ভগবান, কিন্তু যখন সৃষ্টি হয় তখন এই সৃষ্টিতে আপনি প্রতীত হন। ভগবান ছাড়া সংসার কি করে হবে! ভগবান না থাকলে চৈতন্যের অভিব্যক্তি হবে না। যে কোন ধর্মে চৈতন্যের একই পরিভাষা, ভগবান ছাড়া চৈতন্য হতে পারে না। একটা মতে বলা হয় তিনি জড় সৃষ্টি করে তার মধ্যে চৈতন্য রূপে প্রবেশ করেন। কিন্তু এখানে বসুদেবের স্তুতিতে যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এই একই সিদ্ধান্ত গীতাও নিয়েছে আর এটাই সার্বজনীন সিদ্ধান্ত। যিনি চৈতন্য তিনিই জড় রূপে প্রতীত হন। জড় বিজ্ঞানীদের মত হল জড়কেই চৈতন্যের মত দেখায়। কিন্তু অধ্যাত্ম বিজ্ঞানীদের মত হল চৈতন্যকেই জড়ের মত দেখাচ্ছে। বিজ্ঞান আর অধ্যাত্মে এটাই তফাৎ। ঘোর বেদান্তীরা আবার বলবে এই ব্রহ্মাণ্ডে জড় বলে কিছু নেই, তুমি যেটাকে জড় বলে মনে করছে আসলে সেটা চৈতন্যই কিন্তু জড়ের মত দেখাচ্ছে। স্বামীজী আমেরিকাতে খ্রীশ্চান ধর্মকে এই জায়গাতেই আঘাত করলেন, খ্রীশ্চানরা বলে তোমরা জন্ম থেকেই পাপী আর হিন্দুরা বলে তোমরা অমৃতের সন্তান।

দেবকীকৃত ভগবানের স্তুতি

এর আগে ব্রহ্মা, শিব সহ দেবতারা ভগবানের স্তুতি করেছিলেন, এরপর বসুদেব স্তুতি করলেন, এবারে দেবকীও যখন দেখলেন তাঁর সন্তান শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম ধারণ করে ভগবান বিষ্ণুর চতুর্ভুজ রূপে আবির্ভূত হয়েছেন, তিনিও তখন ভগবানের স্তুতি করছেন – ***রূপং যৎ তৎ প্রাহুরব্যক্তমাদ্যং ব্রহ্ম জ্যোতির্নির্গুণং নির্বিকারম্। সত্তামাত্রং নির্বিশেষং নিরীহং স ত্বং সাক্ষাদ্ বিষ্ণুরধ্যাত্মদীপঃ।।১০/৩/২৪।*** এই শ্লোকেই ঈশ্বরের ঠিক ঠিক বর্ণনা করা হচ্ছে। দেবকী স্তুতি করে বলছেন ‘বেদসমূহ আপনার স্বরূপের বর্ণনা করতে গিয়ে বলছেন আপনি অব্যক্ত আবার আপনিই সব কিছুর কারণ। আপনি সেই জ্যোতিঃস্বরূপ ও নির্গুণ নির্বিকার’। কিন্তু তার আগে বলছেন *রূপং যৎ তৎ প্রাহুঃ*, বেদসমূহে আপনার যে রূপের বর্ণনা করা হয়েছে। উপনিষদে

ব্রহ্মের বর্ণনা করে বলা হয় তিনি *অব্যক্তম্*, তাঁকে ইন্দ্রিয়, মন ও বাণী দিয়ে ব্যক্ত করা যায় না। অব্যক্ত শব্দের অর্থ বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ভাবে করা হয়। সাধারণতঃ আমরা অব্যক্ত বলতে বুঝি যিনি ব্যক্ত হননি। কিন্তু এখানে অব্যক্তের অর্থ হয় ভগবানকে ইন্দ্রিয় ও মন দিয়ে গ্রহণ করে ব্যক্ত করা যায় না। যেমন এই গ্লাশ, আমি বলতে পারছি এটা গ্লাশ, তার মানে আমি গ্লাশকে ব্যক্ত করে দিলাম। আমাকে কেউ জিজ্ঞেস করল, আপনার হাতে কি আছে? আমি বললাম গ্লাশ। সেও বুঝে গেল এটা গ্লাশ। এইভাবে সমস্ত কিছুকে আমরা ব্যক্ত করে দিতে পারি। কিন্তু ঈশ্বরকে কখন এইভাবে ব্যক্ত করা যায় না, তাই তিনি *অব্যক্তম্*। ঈশ্বরকে ব্যক্ত করা যায় না, তাই বলে তিনি অদৃশ্য নন। প্রকৃতিকেও অব্যক্ত বলা হয়, কারণ প্রকৃতি কখন সামনে এসে প্রকাশ হয় না। প্রকৃতিকে যে অর্থে অব্যক্ত বলায় হয়, ঈশ্বরকে সেই অর্থে অব্যক্ত বলা হয় না।

আদ্যম্, সব কিছুর তিনি আদি। তিনি *জ্যোতিঃস্বরূপম্*, *নির্গুণম্* ও *নির্বিকারম্* ইত্যাদি। উপনিষদে ব্রহ্মকে যে যে ভাব অবলম্বন করে বর্ণনা করা হয়েছে তার সব কটি ভাবই এই শ্লোকে বলে দেওয়া হয়েছে। যদি ব্রহ্মকে জ্যোতিঃস্বরূপ বলা হয় তাহলে তো তিনি বিশেষ হয়ে গেলেন। আসলে তা নয়, উপনিষদেও ব্রহ্মকে জ্যোতি রূপেই বর্ণনা করা হয়েছে। গীতাতেও বলছেন *জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিঃ*, তিনি জ্যোতিরও জ্যোতি। স্বামীজীও ঠাকুরের আরাত্রিক ভজনে ঠাকুরকে বলছেন জ্যোতির জ্যোতি। ধ্যানের গভীরে যখন চৈতন্যের অনুভব হয়, যখন মনের জগৎকে অতিক্রম করে যাচ্ছে তখন যে অনুভূতি হয় সেটা এই জ্যোতি রূপেই অনুভব করেন। ঠাকুরও বলছেন কত রকমের জ্যোতি দর্শন হয়। খ্রীশ্চান ধর্মের মরমিয়া সাধকার যখন ঈশ্বরের বর্ণনা করেন তখন তাঁরা জ্যোতি রূপেই বর্ণনা করেন। ইসলামের সুফি সাধকরা যখন ধ্যানের গভীরে গিয়ে আল্লার বর্ণনা করেন তাঁরাও জ্যোতি রূপেই বর্ণনা করেন। ঈশ্বরকে সব থেকে নিকটতম যে বর্ণনা করা যায় তা এই জ্যোতি রূপেই। কিন্তু এই জ্যোতির আলো কোন জাগতিক আলো নয়, চৈতন্যের জ্যোতি।

নির্গুণং নির্বিকারম্, তাঁর কোন গুণ নেই, গুণ নেই মানে তাঁকে ব্যক্ত করা যায় না, সব গুণই তাঁর মধ্যে আছে। কোন জিনিষকে যদি বলা হয় এই জিনিষটা এই রকম তার মানে কিছু জিনিষ তার মধ্যে নেই। আমি বললাম এই শরবৎটা মিষ্টি, তাহলে বুঝতে হবে শরবৎটা টক নয়, নোনতা নয়, তেতো নয়। ঠিক তেমনি ব্রহ্মকে যখন নির্গুণ বলছেন তখন তার অর্থ হবে সব গুণই তাঁর মধ্যে আছে অথবা তাঁর মধ্যে কোন গুণ নেই। শরবৎকে মিষ্টি বলে বিশেষ করে দিলাম। ভগবানকে সেইভাবে বিশেষ করা যায় না। *নির্বিকারম্*, জগতে যা কিছু আছে সব কিছুর মধ্যে ছয় রকমের বিকার হবে। যে জিনিষ সক্রিয়, যার ক্রিয়া হয় তার মধ্যেই এই ষড়বিকার থাকবে। ১০/২/২৭ নং শ্লোকে এই ছয়টি বিকার নিয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি। ভগবান এই ছয়টি বিকারের পারে। সেইজন্য তিনি নিষ্ক্রিয়, তাঁর উপর কোন ক্রিয়া করা যায় না। তিনি *সত্তামাত্রম্*, ধ্যানের গভীরে ঈশ্বরকে এই রকমটি দেখাবে তা নয়, *সত্তামাত্রম্*, তিনিই আছেন, এইটুকুই বোধ হবে, এর বেশী আর কিছু হবে না। *নির্বিশেষম্*, ঈশ্বরকে বিশেষ ভাবে নির্দিষ্ট করে কিছু বলা যাবে না। যেমন এখানে আচার্য ভাগবত আলোচনা করছেন, তার মানে আচার্য বিশেষ হয়ে গেলেন। বাকি শ্রোতারা আলোচনা শ্রবণ করছেন, তাঁরাও সবাই বিশেষ হয়ে গেলন। বিশেষ যখন হয়ে যায় তখন তাকে নির্দেশ করে বলা যায়। আমরা সবাই বিশেষ, কেউ মহিলা রূপে, মহিলাদের কেউ শাড়ী পড়েছেন, কেউ শালোয়াড় পড়েছেন, কেউ পুরুষ রূপে, কেউ বাঙালী রূপে, আবার বাঙালীদের মধ্যে কেউ লম্বা, কেউ বেঁটে। এইভাবে সবারই কিছু না কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। ওই বিশেষ দিয়ে আমরা সবাইকে জানতে পারছি। এই বিশেষের ঝামেলা থেকে বাঁচার জন্য একটা নাম দিয়ে দেওয়া হয়। ভগবানকে এই ভাবে বিশেষ করা যায় না, তাই তাঁকে দেবকী বলছেন *নির্বিশেষম্*। *নিরীহম্*, তিনিই আছেন, তিনি ছাড়া আর কিছু নেই।

সব শেষে বলছেন *স ত্বং সাক্ষাদ্ বিষ্ণুরধ্যাত্মদীপঃ*, দীপের আলো যেমন সব কিছুকে আলোকিত করেন তেমনি অধ্যাত্মদীপের অর্থ তিনি হলেন জ্ঞানের আলো। কিন্তু প্রথমেই বলে দিচ্ছেন *রূপং যৎ* তৎ। *রূপং যৎ তৎ প্রাহুঃ*, শ্লোকের এই জায়গাটাই খুবই জটিল। কারণ বৈষ্ণবরা এই একটি শব্দকে আধার করে বেদান্তের পুরো দর্শনকে পাল্টে দেয়। কীভাবে পাল্টে দেয়? এর ব্যাখ্যা করে বলবে, আপনি ভগবান কিন্তু ব্রহ্ম আপনারই একটা রূপ। বেদান্ত মতে বলে যিনি ব্রহ্ম তিনিই মায়ার দরুণ ঈশ্বর রূপে দেখান। ভাগবতের এই শ্লোকে

দেবকীর মুখ দিয়ে বেদান্ত মতকে পুরোপুরি পাল্টে দিয়ে বলা হচ্ছে, ভগবান যিনি তিনি তাঁর মায়ার শক্তিতে ব্রহ্ম রূপে দেখান। ভাগবত ব্রহ্মকে কখনই উড়িয়ে দিচ্ছে না, মিথ্যাও বলছে না। ব্রহ্মকে মিথ্যা বলে দিলে হিন্দু ধর্মের অস্তিত্বই উড়ে যাবে। ব্রহ্মকে কীভাবে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে? যিনি ভগবান তিনিই মায়ার দরুণ ব্রহ্ম রূপে দেখান, ব্রহ্ম আপনারই একটি রূপ। বেদান্ত এই তত্ত্ব মানবেই না, তাঁরা বলবেন যিনি ব্রহ্ম তিনিই কোন কারণে মায়ার জন্য ঈশ্বর বা ভগবান রূপে দেখান। সেইজন্য ভাগবতের কিছু কিছু মতের সাথে ইসলাম ও খ্রীশ্চান ধর্মের অনেক মিল পাওয়া যায়। অবশ্য অবতার তত্ত্বে গিয়ে এদের সাথে আর মিলবে না। ভাগবতের মতে ভগবান যেমন মানবলীলা করেন তেমনি ব্রহ্মও তাঁরই একটা লীলা। কোন বেদান্তীর কাছে যদি বলা হয় ভগবান ব্রহ্মলীলা করেন তখন তিনি আমাদের মাথাটা ফাটিয়ে রেখে দেবেন, ব্রহ্মলীলা বলে কিছু হয় নাকি! বৈষ্ণবদের কাছে ভগবানই আছেন, অব্যক্ত, নিরাকার, নির্গুণ ব্রহ্মও সেই ভগবানেরই অনেক রকম লীলার মধ্যে একটি লীলা।

এই সব বলে দেবকী বলছেন 'আপনি সাক্ষাৎ বিষ্ণু। আপনি বুদ্ধিকে প্রকাশিত করেন আর বেদে আপনারই সেই রূপকে ব্রহ্ম রূপে বর্ণনা করা হয়েছে'। এখানেই জ্ঞান আর ভক্তির তফাৎ হয়ে যায়। এই শ্লোকটি ভাগবতের কোন বিচ্ছিন্ন একটি মাত্র শ্লোক নয়, ভাগবতে পদে পদে এই ধরণের শ্লোক পাওয়া যাবে যেখানে বলবে যিনি ভগবান তাঁকেই মায়ার জন্য ব্রহ্ম রূপে দেখায়। ভাগবতের এটাই নিজস্ব মত। দ্বৈতবাদীরা বিশেষ করে মাধ্বাচার্যরা এই সব শ্লোককে আধার করেই অদ্বৈত বেদান্তীদের আক্রমণ করেন। এই কারণেই ভাগবতকে পঞ্চম বেদ বলা হয়। যিনি শ্রীরামকৃষ্ণ তিনিই মায়ার দরুণ ব্রহ্ম রূপে প্রতিভাসিত। এটাই ভাগবতের মত। অথচ ভাগবত শুরুই হচ্ছে *জন্মাদস্য যতঃ* এই শ্লোক দিয়ে, আবার ব্রহ্মসূত্রের প্রথম সূত্রই হল *জন্মাদস্য যতঃ*। ব্রহ্ম থেকে তো জন্ম হয় না, জন্ম যখন হবে তখন তা তো ভগবান থেকেই হতে হবে। সব বেদান্তীরাও বলবে ভগবান থেকেই জন্ম হয়। তখন দ্বৈতবাদী বৈষ্ণবরা বলবে তোমার ব্রহ্মসূত্র শুরুই হচ্ছে *জন্মাদস্য যতঃ* থেকে, তার মানে ভগবানই সত্য ব্রহ্ম সত্য নয়, ব্রহ্ম ভগবানেরই একটা লীলা। ভগবানের যেমন ব্রহ্মলীলা আছে তেমনি তাঁর জগৎলীলা, মানবলীলাও আছে, দেবলীলাও আছে। ভাগবতের কাছে একজনই আছেন তিনি হলেন ভগবান বিষ্ণু। বৈষ্ণবরা এই সব শ্লোককে আধার করেই বেদান্তকে ফুঁ মেরে উড়িয়ে দেয়। বৈষ্ণবদের যদি বলা হয় উপনিষদে তো একমাত্র ব্রহ্মের কথা বলা হয়েছে, তখন তারা বলবে সেটা এনারই রূপ। তাহলে তখন কেন উপনিষদে তোমাদের এই মতকে কেন উল্লেখ করা হয়নি? তার উত্তরে বলবে, তখন তো কোন আধার ছিল না, তোমাদের ঋষিরা শুষ্ক ছিলেন। একজন ব্যক্তি তখনই তার রস উদ্গীরন করবে যখন সেই রকম আধার পাবে। সেইজন্য উপনিষদের সময়কার ঋষিরা ভগবানের ভক্তিরস পান করতে পারেননি বলে সবাই পরে গোপী হয়ে ব্রজধামে জন্ম নিলেন ভগবানের ভক্তিরস আস্বাদন করার জন্য। বৈষ্ণবদের কাছে এগুলো কোন তর্কের ব্যাপার নয়, এটাই তাদের তত্ত্ব। কি তত্ত্ব? *রূপং যৎ তৎ প্রাহুরব্যক্তমাদ্যং*, বেদে যে রূপের কথা বলা হয়েছে, তিনি অব্যক্ত, তিনি আদ্য, নির্গুণ, নির্বিকার ইত্যাদি আর *সত্তামাত্রং*, সৎ রূপে শুধু তাঁকে দেখাচ্ছে। কাকে দেখাচ্ছে? ব্রহ্মকে। ব্রহ্ম কে? *স ত্বং সাক্ষাদ্*, তুমিই সেই। যিনি ব্রহ্ম তিনি তুমি নও। *ত্বং সাক্ষাদ্*, তুমিই সাক্ষাৎ ব্রহ্ম। বৈষ্ণবরা তাই বলে, যিনি ব্রহ্ম তিনি শ্রীকৃষ্ণ নন, যিনি শ্রীকৃষ্ণ তিনিই নিজেকে ব্রহ্ম রূপে দেখান। এই ধরণের শ্লোকগুলো স্বাভাবিক ভাবেই সাধারণ মানুষের মনে প্রচণ্ড সংশয় উৎপন্ন করবে। সেইজন্য প্রথম থেকেই বলা হয় যে কোন একটা ভাব ও তার সাথে যে কোন একটা শাস্ত্রকে জীবনে অবলম্বন করে সেইভাবে জীবনকে সংগঠিত করতে হয় আর তার সাথে বাকী শাস্ত্রে কি আছে জেনে নিয়ে নিজের ভাব অনুসারে সাধনায় ডুব দিতে হয়। ঠাকুরও বলছেন, ব্যাকুলতা থাকলেই হল, ভুল পথে চলে গেলেও কেউ না কেউ এসে ঠিক রাস্তায় তুলে দেবেন।

দেবকী স্তুতি করে আরও বলছেন, ***নষ্টে লোকে দ্বিপরার্ধাবসানে মহাভূতেষ্বাদিভূতং গতেষু। ব্যক্তেঽব্যক্তং কালবেগেন যাতে ভবানেকঃ শিষ্যতে শেষসংজ্ঞঃ।।১০/৩/২৫।*** কালশক্তির প্রভাবে ব্রহ্মার যখন আয়ু শেষ হয়ে যায় তখন পঞ্চ মহাভূত অহঙ্কারে, অহঙ্কার মহৎ তত্ত্বে, আর মহৎ তত্ত্ব প্রকৃতিতে লীন হয়ে যায়। আসলে দেবকীর স্তুতির সারমর্ম হল – ভগবান যখন সৃষ্টি করবার ইচ্ছে করেন সবার আগে তিনি

প্রকৃতিকে যোগমায়া রূপে সৃষ্টি করেন। প্রকৃতির পরে সৃষ্টি হয় মহৎ তত্ত্ব (cosmic intelligence), তারপরে অহঙ্কার, অহঙ্কার মানে আমি বোধটা আসে। একটা বাচ্চা জন্ম নিয়ে যখন কাঁদে তখন তার বুদ্ধিটা দেহবোধের সঙ্গে থাকে বলে কাঁদতে শুরু করে। বুদ্ধিটা প্রথমে আসে আর অহং বোধটা পরে আসে। অহঙ্কার থেকে পঞ্চ মহাতত্ত্ব আসে, ব্রহ্মার জন্ম তারপরে হয়। সেখান থেকে সৃষ্টি শুরু হয়। আসলে ব্রহ্মা অনেক নীচে। ব্রহ্মার যখন আয়ু শেষ হয়ে গিয়ে সব কিছুর প্রলয় হয়ে যাবে তখন উল্টো দিক থেকে একটা আরেকটার মধ্যে মিশে যাবে। এখানে প্রতিসর্গের কথা বলা হচ্ছে। সৃষ্টির সব কিছু প্রথমে পঞ্চ মহাতত্ত্বে লীন হয়ে যাবে। পঞ্চ মহাতত্ত্ব অহঙ্কারে, অহঙ্কার মহতে লীন হয়ে যাবে। মহৎ তত্ত্ব প্রকৃতির মধ্যে লীন হয়ে যাবে। প্রকৃতির মধ্যে লীন হয়ে যাওয়া মানে শুধু মাত্র শুদ্ধ তিনটে গুণ সত্ত্ব, রজ ও তম থাকবে। প্রকৃতিও এবার থাকবে না, প্রকৃতি থাকা মানে সৃষ্টিও থেকে যাবে। এবার প্রকৃতিও চলে যাবে। কোথায় যাবে? যেখান থেকে এসেছিল সেখানে চলে যাবে। দেবকী বলছেন একমাত্র তখন আপনিই থেকে যান। যোগমায়া, প্রকৃতি বা শক্তি যাই বলি না কেন, তিনি হচ্ছেন ঈশ্বরের সবচেয়ে কাছে। তাই দেবকী বলছেন ব্রহ্মার যখন আয়ু শেষ হয়ে যায় তখন ব্রহ্মা পঞ্চ মহাভূতে লীন হয়ে হয়ে শেষে প্রকৃতিতে লীন হয়ে যান, আসলে এটাই এখানে দেখার যে ব্রহ্মা অনেক নীচে।

যখন সব কিছু লীন হয়ে যায় তখন কি হয়, একমাত্র – *‘ব্যক্তেহব্যক্তং কালবেগেন যাতে ভবানেকঃ শিষ্যতে শেষসংজ্ঞঃ’*। *একঃ শিষ্যতে*, আপনিই তখন একমাত্র থেকে যান। তাহলে কটা থাকল? বলা যাবে না। কারণ এক বলা মানেই দুই। যদি দ্রষ্টা না থাকে তাহলে দৃশ্য কি করে থাকবে! একমাত্র আপনিই থাকেন বলা হয় ভক্তদের বোঝাবার জন্য। আসলে এটাই অদ্বৈত। অদ্বৈত মানে একও নেই দুইও নেই। একও নেই দুইও নেই বললে কি শূন্য হবে? শূন্যও বলা যাবে না। বৌদ্ধরা যে শূন্য বলছে সেটা যে শূন্য নয় বোঝাবার জন্য বলা হয় অদ্বৈত। অদ্বৈত মানে দুই নেই, একও নেই, তাহলে কি আছে? মুখে বলা যাবে না। সাধারণ মানুষকে যদি বলা হয় ভগবান এক আর দুই এর পার, তারা কিছুই বুঝতে পারবে না। তাই বলা হয় একমাত্র ভগবানই আছেন, ভগবান ছাড়া আর কিছু নেই। এটাই অদ্বৈত তত্ত্বের সার। এক মানেই দুই। আমি যদি বলি এই টেবিলে একটি বোতল আছে। কিন্তু একটি বোতল কি করে থাকবে? এখানে একটি বোতল আছে আর আমার একটি মন আছে, এক বলে কিছু হয় না। বোতল আছে আমিও আছি, এক কখনই হবে না। আমি আছি বলেই একটি বোতল দেখছি। পাশ্চাত্য দর্শনে এই নিয়ে অনেক বিতর্ক হামেশা লেগেই থাকে। তারা বলবে একটা বোতল আছে কিন্তু যদি কোন দ্রষ্টা না থাকে তাহলে কি বোতলটা থাকবে কি থাকবে না? এই নিয়ে পাশ্চাত্য দর্শনের দুটো আলাদা শাখাই তৈরী হয়ে গেছে (School of Philosophy), Idealism আর Realism। Idealismরা বলবে, দ্রষ্টা না থাকলে দৃশ্য থাকবে না কিন্তু Realisticরা বলবে দ্রষ্টার সঙ্গে দৃশ্যের কোন সম্পর্ক নেই। এই নিয়ে আবার একটা Reconciliatory Theoryও তৈরী হয়ে গেল, যেখানে বলবে আপনি না দেখতে পারেন, কোন মানুষ না দেখতে পারে কিন্তু দৃশ্য দেখার জন্য ভগবান আছেন। ভগবান হলেন eternal দ্রষ্টা, তাই দৃশ্য আছে, সেইজন্য Realism সত্য। যখনই বলা হবে একমাত্র ভগবানই আছেন তখন তা অদ্বৈত ছাড়া কিছু হতে পারে না। উপনিষদ, বেদান্ত প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এই একটি কথাই বলে যাচ্ছে। কিন্তু যখন বলব এক ভগবান আছেন তখন পুরো দর্শনটা পাল্টে গিয়ে ইসলাম ধর্মের সাথে এক হয়ে যাবে। এক ভগবান আছেন বললে তাঁর জন্য একটা সিংহাসন চাই, তাঁর একটা সাম্রাজ্য চাই, স্বর্গ চাই, অপ্সরা চাই সবই চাই। কিন্তু যখন বলবে একমাত্র ভগবানই আছেন তখন সেটাই অদ্বৈত হয়ে যাবে। যাই হোক প্রকৃতি এবার লীন হয়ে গেল, আর কিছু নেই। কিছু নেই বলতে শূন্য হয়ে যাবে না। দৃশ্য বলে আর কিছু নেই। সেটাই হচ্ছে শেষ। তিনিই আছে, তিনি আছেন বলেই পরে আবার সৃষ্টি হবে, তিনি না থাকলে পরে সৃষ্টি হবে না, এই তিনিই ভগবান, তাঁকেই আমরা নারায়ণ, বিষ্ণু নামে সম্বোধন করি। তাঁর এক নাম শেষ। অনেক জায়গায় এই শেষকই বলা হয় অশেষ, যার কোন শেষ হয় না।

দেবিকী আরও বলছেন ***যোহয়ং কালস্তস্য তেহব্যক্তবন্ধো চেষ্টামাহুশ্চেষ্টতে যেন বিশ্বম্। নিমেষাদির্বৎসরান্তো মহীয়াংস্তং ত্বেশানং ক্ষেমধাম প্রপদ্যে।।১০/৩/২৬।*** একটি নিমেষ থেকে শুরু করে বৎসর পর্যন্ত নানা বিভাগে বিভক্ত এই অসীম মহাকাল। আমাদের পুরো জীবন চলে এই কালের প্রভাবে।

কালই সর্বশক্তিমান, কিন্তু এই কালও আপনারই অধীনে, কালও আপনার এক লীলা মাত্র। আমাদের ন্যায়শাস্ত্রের একটা বিধান আছে যার নাম প্রধান মল্লন্যায়। একজন বড় কুস্তিগীর কুস্তি লড়তে গেছেন। তিনি সব পালোয়ানদের বলে দিলেন 'আপনারা সবাই নিজেদের মধ্যে আগে লড়াই করে নিন। আপনাদের মধ্যে যিনি জয়ী হয়ে প্রধান মল্ল হবেন আমি তাঁর সঙ্গে কুস্তি লড়ব'। প্রধান মল্লকে যদি হারিয়ে দেয় তাহলে সবাইকে হারিয়ে দেওয়া হল। এর নাম প্রধান মল্লন্যায়। কাল হল সর্বশক্তিমান, আমরা সবাই কালকে ভয় পাই। তাই দেবকী বলছেন, এই যে কাল, আপনি লীলা মাত্রেই এই কালের জন্ম দিয়ে দেন। ভগবান কত শক্তিমান হতে পারেন এই ধারণা দেওয়ার জন্য বলছেন, যে কাল সর্বশক্তিমান তাকেই আপনি খেলার ছলে সৃষ্টি করেন।

আরও অনেক কিছু বলার পর দেবকী বলছেন ***বিশ্বং যদেতৎ স্বতনৌ নিশান্তে যথাবকাশং পুরুষঃ পরো ভবান্। বিভর্তি সোঽয়ং মম গর্ভগোঽভূদহো নৃলোকস্য বিড়ম্বনং হি তৎ।।১০/৩/৩১।*** আপনি ভগবান, আপনি সমগ্র বিশ্বপ্রপঞ্চকে আপনার নিজের শরীরে ধারণ করে আছেন, সেই পরমপুরুষ পরমাত্মা আপনি আমার গর্ভে এসেছেন, এই যে আপনার মনুষ্যলীলা এর থেকে আশ্চর্যের আর কি হতে পারে। বসুদেব আর দেবকীর স্তুতির মূল বক্তব্য হল আমরা বুঝতে পেরেছি আপনি সেই ভগবান নারায়ণ জগতে ধর্ম সংস্থাপন করার জন্য কৃপা করে আমাদের পুত্র রূপে জন্ম নিয়েছেন। স্তুতি করে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে বলছেন কংসের অত্যাচারে সবাই উৎপীড়িত, আপনি আমাদের রক্ষা করুন। শেষ কথা বলছেন, হে ভগবন্! আপনাকে দেখে আমাদের মনে এই ভেবে ভয়ও হচ্ছে যে, অত্যাচারী নৃশংস কংস আপনার কোন ক্ষতি না করে।

দেবকী ও বসুদেবের প্রতি ভগবানের উপদেশ

ভগবান দেবকীর পুত্র রূপে জন্ম নিলেও তিনি তাঁর চতুর্ভুজ শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্মধারী নারায়ণ রূপেই দেবকীকে দর্শন দিলেন। ভগবান তখন খুব সুন্দর বলছেন ***ত্বমেব পূর্বসর্গেঽভূঃ পৃশ্নিঃ স্বায়ম্ভুবে সতি। তদায়ং সুতপা নাম প্রজাপতিরকল্মষঃ।।১০/৩/৩২।*** 'এর আগের আগের কল্পে বসুদেব সুতপা নামে প্রজাপতি ও দেবকী পৃশ্নী নামে তাঁর পত্নী রূপে জন্ম নিয়েছিলে। তোমরা উভয়েই একান্তরূপে পবিত্র চরিত্র ও বিশুদ্ধহৃদয় সম্পন্ন ছিলে। তোমাদের দুজনের খুব অভিলাষ ছিল ভগবানকে সন্তান রূপে পাওয়া। আমাকে পুত্র রূপে পাওয়ার জন্য তোমরা অত্যন্ত কঠোর তপস্যা ও সাধনা করেছিলে বলে তোমাদের গর্ভে আমি জন্ম নিয়েছি'। এইভাবে এখানে কিছু পৌরাণিক কথার অবতারণা করা হয়েছে। শেষের দিকে গিয়ে বলছেন ***তয়োর্বাং পুনরেবাহমদিত্যামাস কশ্যপাৎ। উপেন্দ্র ইতি বিখ্যাতো বামনত্বাচ্চ বামনঃ।।১০/৩/৪২।*** এর পরবর্তি জন্মে বসুদেব কশ্যপ আর দেবকী অদিতি নামে আবির্ভূত হয়েছিলেন। সেবারেও ভগবান তাঁদের পুত্র রূপে জন্ম নিয়েছিলেন, তখন তাঁর নাম ছিল উপেন্দ্র। কিন্তু খর্বাকৃতি হওয়ার জন্য তাঁর নামান্তর হয়েছিল বামন। এই বামন অবতারের পর এবার তিনি বসুদেব আর দেবকীর সন্তান হয়ে আবার এসেছেন।

সন্তান রূপে জন্ম নিয়ে ভগবান তাঁর জন্মদাতা মা-বাবাকে কৃপা করছেন। ভগবানের কৃপা মানে, তিনি যখন কারুর উপর কৃপা করেন তখন তিনি তাঁর বাস্তবিক স্বরূপটা দেখিয়ে দেন। এখানেও তিনি তাঁর বাস্তবিক স্বরূপ বসুদেব ও দেবকীকে দেখিয়ে দিলেন। আমরা সচরাচর আমাদের মা-বাবার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকি। কিন্তু এখানে ঠিক সেই রকম হচ্ছে না। বসুদেব আর দেবকী আগের আগের জন্মে বিভিন্ন মুনি ছিলেন। তাঁদের আকাঙ্খা ছিল ভগবানকে তাঁরা যেন তাঁদের পুত্র রূপে পান। ভগবান বসুদেব ও দেবকীকে বলছেন 'তোমরা দুজন আগের আগের জন্মে কোন রকম বিষয়সুখ ভোগ না করে তপস্যা, শ্রদ্ধা ও প্রেমপূর্ণ ভক্তিতে নিত্য নিরন্তর আমাকে হৃদয়ে ধ্যান করে গেছ। আমিও তোমাদের অভিলষ্পিত বর প্রদান করতে চাইলে তোমরা মোক্ষ বর প্রার্থনা না করে আমাকেই পুত্র রূপে পেতে চেয়েছিলে'। সেইজন্য ভগবানও তাঁদের আকাঙ্খা পূরণ করতে কয়েক বার তাঁদের সন্তান রূপে এসেছিলেন। এর আগে দুবার ভগবান তাঁদের সন্তান রূপে এসেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ অবতারে ভগবান তৃতীয়বার বসুদেব ও দেবকীর পুত্র রূপে আবির্ভূত হয়েছেন। বসুদেব ও দেবকী স্বচক্ষে দেখলেন সেই সর্বব্যাপী সর্বপ্রাণীর হৃদয়গুহাশায়ী শ্রীভগবান শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্মধারী চতুর্ভুজ রূপে তাঁদের সন্তান হয়ে আবির্ভূত হয়েছেন। এইভাবে ভগবান তাঁদের কৃপা করলেন। তারপর বসুদেব ও দেবকী ভগবানের

খুব সুন্দর স্তুতি করে তাঁকে প্রসন্ন করার পর ভগবান বসুদেব ও দেবকীকে দুটি শ্লোকে খুব মূল্যবান উপদেশ দিলেন। শুধু বসুদেব ও দেবকীর জন্যই নয়, যাঁরাই আধ্যাত্মিক পথে এগোতে চাইছেন তাঁদের সবারই জন্য এই উপদেশ অবশ্যই পালনীয়। এই দুটো শ্লোককে নিয়ে আমরা বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করছি।

দশম স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ের ৪৪ আর ৪৫ নম্বর শ্লোক দুটি, বিশেষ করে ৪৫শ শ্লোকটি সবার জন্য অত্যন্ত মূল্যবান আধ্যাত্মিক নির্দেশিকা। ভগবান বসুদেব আর দেবকীকে বলছেন ***এতদ্ বাং দর্শিতং রূপং প্রাগ্ জন্মস্মরণায় মে। নান্যথা মদ্ভবং জ্ঞানং মর্ত্যলিঙ্গেন জায়তে।।১০/৩/৪৪।*** আমি তোমাদের সামনে এই রূপে আবির্ভূত হলাম আর আমার এবং তোমাদের পূর্বজন্মের কথা বললাম যাতে তোমাদের সব অবতারের কথা মনে পড়ে যায়। আমি যদি মানব শরীর ধারণ করে তোমাদের সামনে আবির্ভূত হতাম তাহলে তোমরা কিন্তু আমাকে অবতার রূপে চিনতে পারতে না, আমিই যে সেই নিরঞ্জন পরম পুরুষ এই জ্ঞান তোমরা পেতে না। আমার এই ঈশ্বরীয় দিব্য রূপটুকু না দেখালে তোমাদের প্রার্থনাও ঠিক ঠিক পূর্ণ হতো না। এই রূপটা তোমাদের দেখিয়ে দিলাম যাতে বুঝতে পারো আমি সেই ভগবানেরই অবতার তোমাদের পুত্র রূপে আবির্ভূত হয়েছি।

ভগবানের এই শ্লোকটি খুব সুন্দর এবং অত্যন্ত গভীর তাৎপর্যপূর্ণ – ***যুবাং মাং পুত্রভাবেন ব্রহ্মভাবেন চাসকৃৎ। চিন্তয়ন্তৌ কৃতস্নেহৌ যাস্যেথে মদ্‌গতিং পরাম্।।১০/৩/৪৫।*** ভক্তিশাস্ত্রের ভাবের সাথে এটি একটি খুব সামঞ্জস্যপূর্ণ শ্লোক। ভগবান বলছেন, এই জন্মে তোমরা যদি আমার পরমপদ পেতে চাও তাহলে আমার প্রতি *পুত্রভাবেন ব্রহ্মভাবেন*, পুত্রভাব আর ব্রহ্মভাব এই দুটি যুগপৎ ভাব ধরে রাখার ব্যাপারে সর্বদা তোমাদের সজাগ থাকতে হবে। তোমরা দুজনে সর্বদা *পুত্রভাবেন*, অর্থাৎ সন্তানের ভাব রেখে আমার প্রতিপালন করবে। কিন্তু শুধু পুত্রভাব নিয়ে পালন করলে তো তোমাদের পারমার্থিক কোন কল্যাণ হবে না, তাই পরে বলছেন *ব্রহ্মভাবেন*, তার সাথে মনে রাখবে আমি সেই পূর্ণ ব্রহ্ম। এখানে এসে আবার তত্ত্বটা পাল্টে গেল। একটু আগে দেবকী স্তুতি করে বলছিলেন, যিনি ভগবান তিনিই ব্রহ্ম রূপে লীলা করেন। কিন্তু ভগবান যখন নিজে বলছেন তখন শব্দটাকে পাল্টে ঠিক করে দিচ্ছেন। ভগবান দেবকী আর বসুদেবকে বলে দিচ্ছেন তোমাদের এই দুটো ভাব সব সময় একসাথে রাখতে হবে। পুত্র ভাব আর ব্রহ্ম ভাব যুগপৎ এই দুটো ভাব সব সময় আমার প্রতি জাগ্রত রাখবে। একদিকে সন্তানের প্রতি বাবা-মার যে বাৎসল্য স্নেহ থাকে সেটা থাকবে এবং তার সাথে নিত্য অনুচিন্তনের দ্বারা আমার প্রতি তোমাদের ব্রহ্ম ভাবকেও জাগ্রত রাখতে হবে। সব সময় এই দুটো ভাব রেখে আমার সেবার দ্বারাই *যাস্যেথে মদ্‌গতিং পরাম্*, আমার যে পরমপদ, যাকে বিষ্ণুলোক বলা হয় বা মুক্তি বলা হয়, সেই পরমপদ তোমাদের প্রাপ্ত হবেই হবে। তোমরা যদি শুধু ব্রহ্মভাব রাখ তাহলে সন্তান ভাব নিয়ে স্নেহ-মমতা দিয়ে আমাকে পালন করতে পারবে না, আর যদি শুধু পুত্রভাব রাখ তাহলে পুত্র মোহে আচ্ছন্ন হয়ে তোমাদের ভগবানের জ্ঞানটা হারিয়ে পারমার্থিক হানি ঘটবে।

গীতায় ভগবান বলছেন যখন আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় তখন কে কাকে হত্যা করবে! যাঁর দেহাত্মবুদ্ধি বিলুপ্ত হয়ে গেছে, যাঁর বুদ্ধি আর কোন কিছুতে লিপ্ত হয় না, *হত্বাপি স ইমাঁল্লোকান্ন হন্তি ন নিবধ্যতে*, পুরো বিশ্বের সবাইকেও যদি তিনি বধ করে দেন তখনও তিনি হত্যাকারী হন না বা তাঁকেও যদি কেউ বধ করে দেয় তখনও তিনি নিজেকে হত মনে করেন না। এই ভাব যাঁর মধ্যে এসে গেছে তাঁকে দিয়ে আর জগতের কাজ চলে না। ঠাকুরের ব্যবহারিক জীবনেও এই ধরণের প্রচুর ঘটনা আমরা দেখতে পাই। ঠাকুর লেবু কাটতে পারছেন না, লেবুকেও তিনি ঈশ্বর দেখছেন। তখন মা কালীর সামনে যেভাবে ছাগকে বলি দেওয়া হয় সেইভাবে তিনি লেবুকে 'জয় মা কালী' বলে বলি দেওয়ার মত লেবুর উপর ছুড়ি চালাচ্ছেন। এখন প্রত্যেকটি সব্জী কাটার সময় আমাদের 'জয় মা কালী' বলে যদি সব্জী কাটতে হয় তাহলে রান্না আর হবে না। দৈনন্দিন জীবন এভাবে কখনই চলবে না। তার মানে শুধু ব্রহ্মভাব যদি থাকে তাহলে কক্ষণ আমাদের প্রাত্যহিক জীবন চলবে না। সেইজন্য যারা সব কিছুতে ঠাকুরের ইচ্ছা, তাঁর ইচ্ছা, তাঁর কৃপা বলে যাচ্ছে, এইসব শ্লোকে এসে পরিষ্কার বোঝা যায় এরা সব তোতাপাখির মত বলে যাচ্ছে। কারণ যিনি ঠিক ঠিক বুঝে গেছেন সব ঠাকুরের ইচ্ছাতে হচ্ছে তিনি তো জীবনমুক্ত হয়ে গেছেন, তাঁর দ্বারা জগতের আর কোন কাজ হবে

না। তাই এগুলো সব মুখের কথা, নিজের যখন যতটুকু দরকার ওইটুকু ছাড়া সব কিছুতে ঠাকুরের ইচ্ছাকে লাগিয়ে দেবে। রাজা মহারাজকে তাঁর শিষ্যরা বলছেন ‘মহারাজ! আপনি তো আমাদের কোন উপদেশ দেন না’! রাজা মহারাজ বলছেন ‘আমি তোমাদের কি করে উপদেশ দেব! আমি তো দেখছি তোমরা সাক্ষাৎ নারায়ণ’। কোন মা যদি নিজের সন্তানকে সাক্ষাৎ শ্রীরামকৃষ্ণ দেখে, তখন সেই মায়ের দ্বারা কি আর সন্তানের লালন-পালন করা সম্ভব হবে! মা এখন শ্রীরামকৃষ্ণে বিভোর হয়ে অন্য জগতে হারিয়ে যাবে।

বাইবেলেও যিশুর জীবনের উপর খুব সুন্দর একটি ঘটনার বর্ণনা আছে। মেরী ও মার্থা দুই বোন ছিল। যিশু একবার এই দুই বোনের বাড়ি গেছেন। ঠাকুরের মত যিশুও কোথাও গেলে শুধু সুন্দর সুন্দর ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ করে যেতেন। মেরী যিশুকে খুব ভালোবাসত, এত ভালোবাসত যে যিশুর কথাতে সে বিভোর হয়ে থাকত। সেদিনও মেরী বসে বসে যিশুর কথা শুনেই যাচ্ছে। অন্য দিকে তার বোন মার্থা যিশু আর তার সাঙ্গোপাঙ্গোদের খাবারের ব্যবস্থা করার কাজে সকাল থেকে রান্নাঘরে রান্নাই করে যাচ্ছে। মার্থা একা আর সামলে উঠতে পারছিল না। মার্থা গিয়ে যিশুকে বলছে ‘মেরীকে বলুন ও যেন রান্নার কাজে আমাকে একটু সাহায্য করে’। যিশু তখন মার্থাকে বলছেন ‘মেরী যা করছে সেটাই ঠিক’। যিনি ঈশ্বরে *তন্নিষ্ঠাস্তৎপরায়ণাঃ*, জীবনে যিনি তাঁর পরম আশ্রয়, পরম গতি, সেই পরম আশ্রয়কে যখন সামনে পেয়ে যাবেন তখন তিনি আর কোথায় দৌড়াদৌড়ি করবেন আর কাকেই বা সেবা করবেন আর কিই বা সেবা করবেন! তাঁকে কাছে পেলে তো তিনি তাঁকে নিয়েই বিভোর হয়ে যাবেন। দক্ষিণেশ্বরে একদিন ঠাকুর রাখালকে কি একটা কাজের কথা বলেছেন। রাজা মহারাজ সেখান থেকে নড়লেনই না, বলেই দিলেন ‘ও আমার দ্বারা হবে না’। লাটু মহারাজ কাছেই ছিলেন। রাজা মহারাজের কাণ্ড দেখে খুব রেগে গিয়ে বলছেন ‘এ কি ধরণের আচরণ! আপনারাই আবার নিজেদের ভদ্রবাড়ির ছেলে মনে করেন’! রাজা মহারাজ আবার উল্টে লাটু মহারাজকে বলছেন ‘তোর এত সখ থাকলে তুই গিয়ে কর না’।

আসলে মানুষ যাকে সত্যিকারের প্রচণ্ড ভালোবাসে তাকে দিয়ে আর তার সেবাকার্য চলে না, ভালোবাসায় সে বিভোর হয়ে যায়। যখন ওই ঘোরটা একটু কাটে তখন মনে হবে একটু সেবা করতে হবে, একটু এই সেই করতে হবে। মনটা ঈশ্বরীয় ভাবের বিভোরতা থেকে এক ধাপ নীচে না নামলে সেবাকার্য করা যায় না। সেইজন্য ভগবান বসুদেব ও দেবকীকে খুব সজাগ করে দিয়ে বলছেন *যুবাং মাং পুত্রভাবেন ব্রহ্মভাবেন চাসকৃৎ*। জগতের কার্য সম্পাদন করার জন্য ঈশ্বরের প্রতি একটা ভাব যদি অবলম্বন না করা হয় তাহলে ওই কার্য তাকে দিয়ে আর করান যাবে না। মাতা, ধাতা, পিতা, পিতামহ, যে কোন একটা ভাব অবলম্বন করতে হবে। ঠাকুরও খুব সহজ করে বলে দিলেন – অদ্বৈত জ্ঞান আঁচলে বেঁধে এই সংসারের সব কর্ম কর। ঠাকুরের এই কথাই ৪৫ নং শ্লোকের ভাবার্থ – একদিকে ব্রহ্মভাব রাখবে অন্য দিকে সন্তান ভাব। এখানে শুধু যে দেবকী আর বসুদেবের কথা হচ্ছে তা নয়, এই কথাগুলোর একটা সার্বজনীন গ্রহণীয়তা এবং ব্যবহারিক প্রয়োগের বিপুল সম্ভবনা রয়েছে। অদ্বৈত জ্ঞান আঁচলে বেঁধে সংসারের সব কাজ করা মানে, সব কাজ করবে কিন্তু নিজের আধ্যাত্মিক আদর্শ থেকে কখন নড়চড় হবে না। শ্রীকৃষ্ণই সংসারের সব কিছু হয়েছেন এই বোধটা যেন সব সময় থাকে, তার সাথে জগৎ যেমন আছে সেই বোধটাও রাখতে হবে। পরম তত্ত্বে জগৎটাও শ্রীকৃষ্ণ। এই বোধ যদি না রাখা যায় তাহলে কাজ করতে গিয়ে কিন্তু আবদ্ধ হয়ে পড়তে হবে। যারা এই ভাবটাও রাখে না, তারাই ঠগবাজ হয়ে যায়। গুরু শিষ্যকে বলছেন ‘ওগো! এবার ভাত-টাত যা হোক একটা কিছু রান্না কর, খেতে তো হবে’। শিষ্য বলছে ‘গুরুদেব! আমি এখন জপে বসেছি’। যাই হোক গুরু নিজেই ভাত ডাল চাপিয়েছেন। রান্না হয়ে যাওয়ার পর গুরু আবার শিষ্যকে বলছেন ‘রান্না তো হয়ে গেছে, এবার একটু আসন পেতে খাবার গুলো থালাতে বেড়ে দাও’। শিষ্য বলছে ‘গুরুদেব আমি জপে আছি’। ব্যাটা কিছুই করছে না, জপের নাম করে ঘুমোচ্ছে। তখন গুরু নিজেই আসন পেতে থালাতে খাবার বেড়ে শিষ্যকে বলছেন ‘ভাত বেড়ে দেওয়া হয়েছে এবার এসে খেতে বস’। শিষ্য তখন জপ থেকে উঠে আসতে আসতে বলছে ‘গুরুদেব! দু দুবার আপনার আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করেছি, গুরুর তৃতীয় আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করে আর পাপ বাড়াবো না’। এই বলে খেতে বসে গেল।

বসুদেব আর দেবকী কি ব্রহ্মভাবে শ্রীকৃষ্ণকে দেখতেন? বিচার বিশ্লেষণ করে হয়তো দেখতেন কিন্তু সাধারণ অবস্থায় তাঁরা শ্রীকৃষ্ণকে সন্তান রূপেই দেখতেন। আমাদের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই হবে, ঠাকুর বলছেন অদ্বৈত জ্ঞান আঁচলে বেঁধে, অর্থাৎ ঈশ্বরই বস্তু বাকি সব অবস্তু, এই বোধ রেখে সংসারের সব কাজ করে যেতে হবে। এই বোধকে দিবারাত্র প্রদীপের শিখার মত অন্তঃকরণে জ্বালিয়ে রাখতে হবে। এর অন্যথা হলে সংসার-চক্রের মধ্যে ঘুরপাক করতেই থাকবে। সিদ্ধির অবস্থায় জগতের সব কিছু উড়ে যাবে, তখন সব কাজ বন্ধ হয়ে যাবে। ঠাকুর খুব সুন্দর উপমা দিচ্ছেন – বাড়ির গিন্নী সব কাজ করে, কিন্তু সব কাজ করে, সবাইকে খাইয়ে দাইয়ে শেষে যখন স্নান করতে চলে যাবে তখন যতই ডাকো সে আর ফিরবে না। সিদ্ধির অবস্থা মানেই কর্মবোধ, কর্তব্যবোধ সব খসে যাবে। কর্তব্যবোধ ততক্ষণই থাকবে যতক্ষণ আমি তুমি বোধ আছে। জগত চালানোর সময় আমি তুমি বোধ রাখতেই হবে, কিন্তু তখন এটাও মাথায় রাখতে হবে শেষ অবস্থায় আমি তুমি বোধ চলে গিয়ে ঈশ্বরই বস্তু বাকি সব অবস্তু এই বোধ চলে আসবে। যেমন যেমন সাধনাতে অগ্রসর হতে থাকবে তেমন তেমন কিন্তু সিদ্ধির দিকে এগোতে থাকছে। যেমন যেমন সিদ্ধির দিকে এগোতে থাকবে তেমন তেমন আমি তুমি এই ভেদটা খসে যেতে থাকে। আমি তুমি বোধ চলে যাওয়া মানে কর্তব্যবোধ খসে যাবে। অষ্টাব্রক্র-সংহিতাতে একটা মন্ত্র আছে তাতে বলছেন যতক্ষণ কর্তব্যবোধ থাকবে ততক্ষণ বুঝতে হবে সে আধ্যত্মিক জীবন-যাপনের জন্য এখনও প্রস্তুত নয়।

ভগবান এই কথা শুধু দেবকী আর বসুদেবকে উদ্দেশ্য করেই বলছেন না, আমাদের সবার উদ্দেশ্যে ভগবান এই উপদেশ দিয়ে সাবধান করে দিলেন। সেইজন্য ভক্তদের খুব সতর্ক করে দেওয়া হয় – আপনি যতই সাধু, সন্ন্যাসী বা মহারাজদের সঙ্গে বন্ধুর মত মেলামেশা করুন না কেন কিন্তু সব সময় মনে রাখতে হবে উনি একজন সাধু। বন্ধু রূপেই যদি দেখেন তাহলে আপনি সাধুর ভালোবাসা ঠিকই পাবেন কিন্তু আপনার পারমার্থিক কোন উন্নতি হবে না। কারণ শুধু বন্ধুত্ব ভাব নিয়ে মেলামেশা করলে মনে করবেন উনি আমারই মত একজন। ভগবান এই ধরণের মনোভাব নিয়ে যাতে কেউ না চলে তাই সাবধান করে বলছেন, যদি তোমরা আধ্যাত্মিক উন্নতি চাও তাহলে *পুত্রভাবেন* এবং *ব্রহ্মভাবেন* এই দুটো ভাব তোমাদের একসঙ্গে নিয়ে চলতে হবে। শ্রীশ্রীমাও ঠাকুরের প্রতি দুটো ভাব এক সঙ্গে নিয়ে চলতেন – তিনি আমার স্বামী, এই ভাবটাও রেখেছেন আবার তিনি যে ভগবান এই ব্যাপারেও তিনি সব সময় সজাগ থাকতেন। গোপীদের কথা বা শ্রীরাধার কথাই ভাবুন, এনারা সবাই শ্রীকৃষ্ণকে প্রেমিক রূপে ভালোবাসতেন, কিন্তু এতেতো গোলমাল লেগে যাওয়ার কথা, সেইজন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মাঝে মাঝে নানান লীলা খেলার ছলে তাঁদের সঠিক পথে নিয়ে এসে সজাগ করে দিতেন। সাধু সন্ন্যাসীদের যতক্ষণ আপন না করে নিতে পারবেন ততক্ষণ কিন্তু আপনার সাধুর প্রতি ভালোবাসা পূর্ণ হবে না, সাধুসঙ্গে যে আনন্দ পাওয়ার কথা সেটাও পাওয়া যাবে না। কিন্তু মাঝখান থেকে যদি ভুলে যান যে তিনি সন্ন্যাসী, ভগবানেরই বিশেষ রূপ, তাহলে আপনার আধ্যাত্মিক উন্নতি স্তব্দ হয়ে যাবে। অবতারের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই হয়। সেইজন্য দেখা যায় যাঁরা শ্রীরামকৃষ্ণকে মানুষ রূপে দেখেছিলেন তাঁদের পারমার্থিক কোন উন্নতি হয়নি। ভাগ্নে হৃদয়ের এই দুরবস্থা কেন হল? তিনি তাঁর মামাকে ভগবান রূপে কোন দিন ভাবতেই পারলেন না। অথচ ঠাকুরের জন্য হৃদয়রাম কি না করেছেন! ঠাকুরের যত্ন আত্তি সবই করেছেন। কিন্তু আজকে যত্ন করছেন পরের দিন ঠাকুরের সাথে লাঠালাঠি করছেন। কিন্তু নরেন সহ ঠাকুরের সব ছোকড়া ত্যাগী সন্তানরা ঠাকুরকে দুই রূপেই দেখতেন। যখন মানব রূপে দেখছেন তখন তাঁর অসুখের সময় প্রাণপাত করে সমস্ত রকমের সেবাদি করছেন, হাসি ঠাট্টা মজা সবই করছেন কিন্তু সর্বদা ঠাকুরকে দেখছেন তিনিই সেই পরমব্রহ্ম জগতের পরমকল্যাণের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ রূপ শরীরে আবির্ভূত হয়েছেন।

প্রত্যেক মানুষ কাউকে না কাউকে ভালোবাসে, মা সন্তানকে ভালোবাসে, সন্তান মাকে ভালোবাসে, স্বামী স্ত্রীকে ভালোবাসে, স্ত্রী স্বামীকে ভালোবাসছে – যে কোন ভালোবাসায় যদি কেউ এই দুটো ভাবকে সমান ভাবে আরোপ করতে পারে তাহলে এক দিনেই তার ব্যক্তিত্বে আমূল পরিবর্তন এসে যাবে। ঠাকুর যখন দক্ষিণেশ্বরে সাধনা করছিলেন সেই সময় একদিন তিনি এক হাতে একটি টাকা এবং অন্য হাতে একটা মাটির ঢেলা নিয়ে বলছেন 'টাকা মাটি মাটি টাকা'। টাকা মাটি মাটি টাকা বলতে বলতে তিনি টাকা মাটি দুটোই

গঙ্গার জলে ফেলে দিলেন। ঠাকুর এখানে টাকাকে বস্তু রূপে ত্যাগ করলেন। তারপর ঠাকুরের মনে হল মা লক্ষ্মী যদি খ্যাঁট বন্ধ করে দেন! তখন তিনি বলছেন – মা লক্ষ্মী! তুমি হৃদয়ে বাস কর। একই টাকা, কিন্তু তার একটা বস্তু রূপ আছে আর তার একটা ব্রহ্ম রূপও আছে। বস্তু রূপে তিনি ত্যাগ করে দিলেন আর ব্রহ্ম রূপে তাকে হৃদয়ে রাখছেন। সেই টাকাকে আবার শ্রীশ্রীমাও গ্রহণ করছেন। পিওন যখন জয়রামবাটীতে মানি অর্ডার নিয়ে আসতো, মা সেই টাকা হাতে নিয়ে কপালে ঠেকিয়ে প্রণাম করে খুব সন্তর্পনে তুলে রাখতেন। শ্রীশ্রীমা টাকাকে ব্রহ্ম রূপে গ্রহণ করছেন। টাকা দিয়ে কত কিছু হয়, সাধুসেবা হয়, গরীব-দুখীদের দান হয়, টাকার একটা আলাদা মূল্য আছে।

এই শ্লোকের যে ভাব এই ভাবই হিন্দু ধর্মের বিশেষত্ব, অন্য কোন ধর্মে এই ভাব পাওয়া যাবে না – আমাকে তুমি সন্তান ভাবেও মনে রাখবে আবার ব্রহ্ম ভাবেও মনে রেখে আমাকে বাৎসল্য স্নেহে প্রতিপালন করে যাবে। পুরাণের অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য হল, খুব সামান্য স্তর থেকে একেবারে উচ্চস্তরে টেনে নিয়ে যাওয়া। একজন মহিলা, তার বিয়ে হয়ে গেছে, এখন তার সন্তান হতে পারে নাও হতে পারে। যদি তার সন্তান হয় তাহলে সন্তানকে পুত্রভাব আর ব্রহ্মভাব এই দুটো ভাব যুগপৎ নিয়ে এসে সেই মহিলা তার সন্তানকে যদি পালন করে তাহলে সেও ভগবানের পরমপদ লাভ করতে পারবে। যদি সন্তান না হয়ে থাকে, তাহলে স্বামীকে স্বামীভাব আর ব্রহ্মভাব নিয়ে সেবা করে গেলে, যোগীরা যোগ তপস্যা করে যে পরমপদ লাভ করেন, সেই সামান্য মহিলাও সেই পরমপদ লাভ করতে পারবে। মহাভারতে এগুলোকে তত্ত্ব রূপেই নিয়ে থেমে যায়নি, সেখানে অনেক কাহিনী দিয়েই এই তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছে, কৌশিকী ব্রাহ্মণ ও সামান্য একজন গৃহবধূর কাহিনী আর তার সাথে ব্যাধের কাহিনীই এর প্রমাণ।

আমাদের সমস্যা হল জগতের প্রতি, সংসারের প্রতি, ঈশ্বরীয় ভাবের প্রতি, শাস্ত্রের প্রতি আমরা আমাদের বিশ্বাসকে ধরে রাখতে পারিনা। আমাদের মধ্যে সেই ধরণের মানুষের খুব অভাব, যে মানুষ দৃঢ়তার সাথে বলতে পারবে জীবনে একটা কিছু করার জন্য আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। কেউ যদি একটা কিছু করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে দৃঢ়তার সাথে বলে যত প্রতিকূলতাই আসুক না কেন জীবনে আমি এটাই পালন করে যাব, তাহলে সেই মানুষ একজন মহাত্মা হয়ে যেতে বাধ্য। গান্ধীজী শুধু একটি জিনিষের প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, শুধু অহিংসা দিয়ে আমি ইংরেজকে ভারত ছাড়া করাব। তাই হল, গান্ধীজীর অহিংস আন্দোলনের সামনে ইংরেজ দাঁড়াতেই পারলো না। গান্ধীজী বললেন আমি শুধু সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবো তাতেই সারা ভারত আমাকে মানবে। গান্ধীজীকে ইংরেজ পুলিশ জেলে ঢোকাচ্ছে, মাথা ফাটিয়ে চৌচির করে দিচ্ছে, গান্ধীজীর কোন ভ্রুক্ষেপ নেই, কোন প্রতিবাদ নেই। ঈশ্বর দর্শন, আধ্যাত্মিক পুরুষ হওয়া তো মুঠোর মধ্যে, জীবনে একটা প্রতিজ্ঞা ঠিক করে নিয়ে যদি দিবারাত্র চব্বিশ ঘন্টা সেটাকে পূর্ণ করার জন্য লেগে থাকে, কয়েক দিনের মধ্যে সে মহাপুরুষ হয়ে যাবে। গান্ধীজী অনেকবার বলছেন – আমি দেখতে চাই রাজনীতি দিয়ে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা যায় কিনা। উনি বারংবার বলছেন রাজনীতি, ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতা কখনই আলাদা হতে পারে না। গান্ধীজী একটা নতুন পথ দেখিয়ে দিলেন যে রাজনীতি কখনই ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতা থেকে আলাদা হতে পারে না। কিন্তু এখনকার নেতারা গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে যাচ্ছে রাজনীতি আর ধর্মকে একসাথে করা যাবে না। তাহলে কি তাঁরা রাজনীতিকে অধর্মের সাথে মেলাতে চাইছেন!

এই শ্লোকে অতি সাধারণ দুটি কথা বলছেন *যুবাং মাং পুত্রভাবেন ব্রহ্মভাবেন চাসকৃৎ*। তুমি শুধু এই দুটি ভাবকে গ্রহণ করে জীবনের আদর্শ বানিয়ে নাও, তারপর দেখ তুমি জীবনে কাকে বেশী ভালোবাসছ। খুঁজে দেখা যাবে আমরা সত্যিই নিজেকে ছাড়া অন্য কাউকে ভালোবাসি না বা ভালোবাসতে পারিনা। ঠিক আছে, নিজেকে ভালোবাসছ তাতেই হবে। কীভাবে হবে? তুমি নিজেকে ব্রহ্ম রূপে চিন্তা কর, সোহহম্ বা অহং ব্রহ্মাস্মি। মানুষ সেটাও পারবে না। মানুষ নিজেকে কামী, ক্রোধী, লোভী রূপেই চিন্তা করছে। আমি অমুককে ভালোবাসি, আর সে যেন আমারই হয়, এই মনোভাব থাকলে কি কখন ব্রহ্মভাব আসবে! কোথাও যদি কারুর একটু ভালোবাসা থাকে, কাউকে যদি সামান্যতমও একটু ভালোবেসে থাকে, সেখান থেকেই শুরু করা যেতে পারে। যাকে ভালোবাসছে তার দুটি রূপ – একটা তার বাহ্যিক রূপ আরেকটি তার অন্তর্নিহিত রূপ। এখানে

বলছেন বাহ্যিক রূপকে ভালোবাসলে জগৎ মসৃন ভাবে চলবে আর অন্তর্নিহিত রূপকে যদি ভালোবাসে তাহলে মৃত্যুর পর ব্রহ্মালোক তার নিশ্চিত। দেবকীকে ভগবান তাই বলছেন, আমি তোমার সন্তান আমার বহিঃরূপকে যদি ভালোবেসে বাৎসল্য স্নেহ দিয়ে পালন কর তাতে তোমার সংসার সুন্দর ভাবে চলবে আর তার সাথে আমার ব্রহ্ম রূপকে ভালোবাসলে তোমার মুক্তি নিশ্চিন্ত। এগুলো কোন কথা কাহিনী নয়, সময় কাটাবার জন্য উপন্যাস নাটক নয়, এগুলো আমাদের জীবনে নামানোর জন্যই বলা। পুরাণের কথা ছেড়ে দিন, কথামৃতেই আছে, ঠাকুরের কাছে এক বিধবা এসেছে। বিধবা ঠাকুরের কাছে জানতে চাইছেন 'শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তো মন কিছুতেই যায় না, কি করা যায়'? ঠাকুর দেখছেন বিধবা সংসারের মায়া মোহে একেবারে ডুবে আছে। জিজ্ঞেস করছেন 'তুমি কাকে বেশী ভালোবাস'? বিধবা বলছে 'আমার এক ভাইপোকে খুব ভালোবাসি'। ঠাকুর বলছেন 'ওই ভাইপোকেই গোপাল ভেবে ভালোবাসো তাতেই সব ঝামেলা চুকে যাবে'। এখানে সবার বাচ্চাকে গোপাল রূপে দেখতে বলছেন না, শুধু নিজের নাতি বা সন্তান বা স্বামী বা ভাইপোকেই শ্রীকৃষ্ণ বা গোপাল রূপে দেখতে বলা হচ্ছে। স্বামীরা যদি শুধু নিজের স্ত্রীকে দেবী রূপে দেখে তাতেই তার মুক্তি গ্যারান্টি।

স্বামীজীর মা, দিদিমাদের কজন চেনে! ওনারা স্বামীজীকে তাঁদের বাড়ির লোক বলেই দেখে এলেন, সেই সচ্চিদানন্দের লীলা পার্ষদ রূপে কোন দিন দেখলেনই না। অথচ সবাই নিবেদিতা, যোশেফ ম্যাকলাউড, ক্রিস্টিনের নামই করে। ম্যাকলাউড গর্ব করে বলতেন Vivekananda is my friend. কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ যে ব্রহ্মস্বরূপ সেটাকে এক মুহুর্তের জন্য ছাড়লেন না। অবতারকে যতক্ষণ অবতার রূপে না দেখা হয় ততক্ষণ তার কিছুই হবে না, সব গোলমাল হয়ে যাবে।

যোগমায়ার আবির্ভাব *(ঈশ্বর আর মায়ার সম্পর্ক, মায়া শব্দের দার্শনিক ব্যাখ্যা, যমুনার আনন্দের ব্যাখ্যা, গোকুলের অর্থ)*

ভগবান তো বসুদেব আর দেবকীকে তাঁর দিব্যরূপ দেখিয়ে দিলেন, কিন্তু এই রূপ নিয়ে তো অবতারের উদ্দেশ্য সাধিত হবে না, যার জন্য দরকার একটি মানব শরীর। এসব কথা বলার পর ভগবান তাই নিজের যোগমায়াকে আশ্রয় করে পিতামাতার চোখের সামনেই সঙ্গে সঙ্গে নিজের দিব্যরূপকে সরিয়ে একটি সাধারণ মানব-শিশুর রূপ ধারণ করে নিলেন। অন্য দিকে আগে থেকেই সব ঠিক করা ছিল। সেই অনুসারে গোকুলে যশোদার গর্ভে একটি কন্যা রূপে যোগমায়া জন্ম নিয়েছেন। এর দার্শনিক ব্যাখ্যা হল, ভগবান যখন সগুণ সাকার রূপে আসেন তখন তাঁর শক্তি তাঁর সঙ্গেই আসেন। যতক্ষণ যোগমায়া না আসেন ততক্ষণ যিনি নির্গুণ নিরাকার, তিনি সগুণ সাকার হবেন না। একটু আগেই আমরা আলোচনা করেছিলাম ঈশ্বরই বস্তু বাকি সব অবস্তু। ঈশ্বর আর ব্রহ্ম আলাদা কিছু নন। যখন মায়ার আবরণে বা প্রকৃতির ভেতর দিয়ে দেখা হয় তখন সেই ব্রহ্মকে ঈশ্বর রূপে দেখায়। এই ঈশ্বরের নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, যেমন গীতাতে বলছেন *পিতাহহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ* বা আচার্য শঙ্কর তাঁর গীতার ভাষ্যে প্রথমেই বলছেন *স চ ভগবান জ্ঞানৈশ্বর্যশক্তিবলবীর্য-তেজোভিঃ সদা সম্পন্ন* জ্ঞান, ঐশ্বর্য, শক্তি, বল, বীর্য ও তেজ এই ছয়টি ঐশ্বর্য ভগবানের সঙ্গে সব সময় থাকবে। আবার বিষ্ণুপুরাণে বলছেন জগতের উৎপত্তি ও বিনাশকে তিনি জানেন, জীবের গতি ও অগতিকে তিনি জানেন আর তিনি বিদ্যা ও অবিদ্যাকে জানেন। এগুলো সব সগুণ সাকার ঈশ্বরের বর্ণনা।

একটা খুব সহজ উপমা দেওয়া যেতে পারে, উপমার সব কিছুকে আক্ষরিক ভাবে নিতে হবে না। এই টিউব লাইট জ্বলছে। কেন জ্বলছে? তারের মাধ্যমে টিউবে বিদ্যুৎ সরবরাহ হচ্ছে। টিউবটা একটা কাঁচ, সেই কাঁচের মধ্যে পাউডারের কোটিং করা আছে, তার ভেতরে আবার হাল্কা গ্যাস ভরা আছে, ওর মধ্যে ইলেক্ট্রিক্যাল কারেন্ট যাচ্ছে বলে আমরা টিউবকে আলোকিত দেখছি। তার মানে ইলেক্ট্রিসিটিকে যদি ঠিক মত কেউ দেখতে চায় তাহলে তাকে রীতিমত এই রকম কতকগুলো আবরণ দিতে হয়। ভগবানের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই, ভগবানের উপর যতক্ষণ আবরণ না আসে ততক্ষণ তিনি প্রকট হন না। আবরণ না থাকলে তিনি সব সময় নির্গুণ নিরাকার থাকবেন। যখন অদ্বৈত জ্ঞান হয় তখন বোধে বোধ হয়। আমরা সবাই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ, নির্গুণ নিরাকার, অদ্বৈত এই শব্দগুলো শুনেছি। এগুলো সব শাস্ত্রের শব্দ, আমাদের কাছেও এগুলো শব্দ মাত্র। বুদ্ধি দিয়ে একটু ধারণা করা গেলেও এগুলোর ব্যাপারে কিছু বলা বা বোঝা যায় না। কিন্তু যখন আবরণ এসে

যায় তখন বোঝা যায়। অখণ্ড সচ্চিদানন্দের উপর যখন আবরণ পড়ে গেল তখন সেই সচ্চিদানন্দকে ঠাকুর মাকালী রূপে দেখছেন। তাহলে কালী আর কৃষ্ণ কি আলাদা? কালী আর ব্রহ্ম কি আলাদা? কিন্তু না, সেই কালী সেই ব্রহ্ম। ঠাকুরও বলছেন কালীই ব্রহ্ম ব্রহ্মই কালী। এত কথা বলা হল শুধু এটুকু বোঝার জন্য যে ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ। কিন্তু তার থেকেও বেশী গুরুত্ব হল, ব্রহ্মের উপর যতক্ষণ প্রকৃতির আবরণ না আসছে ততক্ষণ কিন্তু সগুণ সাকার ভগবানকে দেখা যাবে না। যখনই সগুণ সাকার ভগবানকে দেখা যাবে তখনই বুঝতে হবে সেখানে মায়াও আছে। ঈশ্বরের প্রাকট্য আর মায়া, এই দুটো এক সঙ্গে চলে। ব্রহ্মের সঙ্গে মায়া সব সময়ই আছে, ঠাকুর বলছেন সাপের মুখে বিষ আছে, সাপের বিষ সাপের কোন ক্ষতি করতে পারে না, কিন্তু অন্যকে পারে। তেমনি মায়া কখন ব্রহ্মকে স্পর্শ করতে পারে না। মায়া যেমনি প্রকট হল তেমনি যিনি নির্গুণ নিরাকার তিনি সগুণ সাকার হয়ে যাচ্ছেন।

তাহলে এখানে যোগমায়ার জন্ম নেওয়ার তাৎপর্যটা কোথায়? তাহলে তো বলতে হয় ঠাকুর যখন জন্ম নিয়েছিলেন তখন তো মায়ারও জন্ম নেওয়া উচিৎ ছিল। আসলে ভাগবত কাব্যিকতার মাধ্যমে একটা খুব গভীর উচ্চ আধ্যাত্মিক তত্ত্বকে বোঝাবার চেষ্টা করছেন। ব্যাসদেব ভাগবতের মাধ্যমে কোন ইতিহাস লিখছেন না, তিনি একটা ধর্মগ্রন্থ সৃষ্টি করছেন। ধর্মগ্রন্থ সৃষ্টি করা মানেই অত্যন্ত কঠিন দুরূহ একটি কাজ। যত আধ্যাত্মিক দর্শনের তত্ত্ব আছে সব তত্ত্বকে একটা কাহিনীর মাধ্যমে পরিবেশন করে মানুষের মধ্যে সেই তত্ত্ব সম্বন্ধে একটা ধারণা তৈরী করে দেওয়াই ধর্মগ্রন্থের বিশেষ উদ্দেশ্য। অখণ্ড সচ্চিদানন্দকে যখন মায়া আবৃত করে তখন তাঁকে ভগবান রূপে দেখা যায়, এই তত্ত্বটা বোঝাবার জন্য বলছেন গোকুলে নন্দবাবার গৃহে মা যশোদার গর্ভ থেকে যোগমায়ার জন্ম হল। সাধনা করে করে যখন সাধকের শেষ অবস্থায় ঈশ্বর দর্শন হচ্ছে সেখানেও তখন মায়া আছে। যতক্ষণ আমি বোধ আছে ততক্ষণ তিনি বোধও থাকবে, যখন আমি বোধ চলে যায় তখন এই তিনি বোধও চলে যায়। তিনি আর তাঁর মায়া এই দুটো সব সময় একই সঙ্গে থাকে। মায়া চলে গেলে অখণ্ড সচ্চিদানন্দকে বোধ বোধ করবে। এই দুরূহ কঠিন তত্ত্বকে সাধারণ মানুষকে বোঝাবার জন্য এই কাহিনী। আর ভগবান এবং যোগমায়া এক সঙ্গে জন্ম নিলেন, এটা বলছেন না যে এক সেকেণ্ড আগে পরে জন্মেছেন। হাত দিয়ে আমার মুখ ঢেকে দিলাম, আমার হাত ঢাকা দেওয়াটা যা, মুখ ঢাকাটাও তাই। মুখ ঢাকা কখন হল? যখন আমার হাত মুখের সামনে এলো। হাত সামনে আসা আর মুখ ঢাকা একই জিনিষ। ঠিক তেমনি মায়া আসা আর ঈশ্বরের প্রাকট্য দুটো একই জিনিষ।

শাস্ত্রে মায়া শব্দটা বার বার আসবে। হিন্দুদের ধর্মীয় আলোচনাতে 'মায়া' শব্দের উপর অনেক আলোচনা শুনতে পাওয়া যায়। এই মায়া শব্দের সাথে আমরা সবাই অল্প বিস্তর পরিচিত। কিন্তু যদি জিজ্ঞেস করা হয় মায়া মানে কি? মায়া বলতে ঠিক কি বোঝায়? এর উত্তর দিতে গিয়েই সবাই হিমশিম খেয়ে যায়। অনেকে বলেন মায়া মানে মোহ, কেউ বলবেন মায়া মানে মরীচিকা, আবার কেউ বলবেন মায়া মানে ম্যাজিক। এখানে মায়ার ব্যাপারে কেউ ভুল কিছু বলছেন না। তাহলে ঈশ্বর দর্শনে ঈশ্বরের যে রূপ দেখছেন, মা কালীকে দর্শন করছেন তখন সেটাও তো মায়া কিংবা একটা ম্যাজিক। কিন্তু তা নয়। আসলে মায়া একটি পারিভাষীক শব্দ। আর যেদিন মায়া সম্বন্ধে কেউ বুঝে নেবেন, তিনি ঈশ্বর লাভের পথে অর্দ্ধেক রাস্থা পার করে দেবেন, বাকি অর্দ্ধেক পথটাই কঠিন। এখানে এই গ্লাশটা বাস্তবিক দৃষ্টিতে স্টীল। কিন্তু আমরা বলছি গ্লাশ। তাহলে গ্লাশ আর স্টীলের মধ্যে কী তফাৎ? স্টীলকে একটা আকার দিয়ে একটা নাম দেওয়া হয়েছে। যদি ঘটির আকার দেওয়া হতো তখন গ্লাশ নাম না দিয়ে ঘটি নাম দেওয়া হত। বাস্তবে ঘটিও যা গ্লাশও তাই, দুটোই স্টীল। সচ্চিদানন্দ শুদ্ধ ব্রহ্মের সাথে যদি এইভাবে নাম ও রূপ যোগ করে দেওয়া হয় তখনই তিনিই এই জগৎ রূপে প্রতিভাসিত হয়ে যান। এই নাম আর রূপই মায়া। মায়া শব্দ দুটো অর্থে আসে, একটা জাগতিক অর্থে এবং আরেকটি বেদান্ত অর্থে। মায়ার জাগতিক অর্থ এক রকম আর বেদান্তে মায়ার অর্থ সম্পূর্ণ আলাদা। এখানে এসেই সবাই ভুল করে বসেন। মায়া কিন্তু মিথ্যা নয়, মায়াতে জিনিষটা অন্য রকম দেখাচ্ছে। এর সহজ উপমা হল, ধরুন সোনার গয়না আছে। দশ গ্রাম ওজনের সোনার একটা বালা আর দশ গ্রাম ওজনের সোনার একটা নেকলেসে কি তফাৎ? যখন চোর সোনা চুরি করতে যাবে তখন কি সে বলবে আমি বালা চুরি করবো,

নেকলেস চুরি করবো না? চোরের কাছে বালাও যা নেকলেসও তাই। সে চাইছে সোনা চুরি করতে। কিন্তু মেয়েরা গয়না পড়ার সময় নেকলেস গলায় ঝোলাচ্ছে আর বালা হাতে পড়ছে। তফাৎ শুধু নাম আর রূপে। সোনা যখন নেকলেস হয়ে যাচ্ছে, তখন বেদান্তের দৃষ্টিতে এটাকেই বলছেন মায়া। পিসি সরকার যখন একটা ঘড়িকে নিয়ে লাগ ভেলকি লাগ ভেলকি করতে করতে বলছেন এই দেখো ঘড়িটা সোনার নেকলেস হয়ে গেল। এটা হল ম্যাজিক, এটাই মিথ্যা। বেদান্তে যখন মায়াকে মিথ্যা বলা হচ্ছে তখন বলতে চাইছে আসল বস্তু হলেন সচ্চিদানন্দ। তুমি যেটাকে ভালোবাসছ সেটা মিথ্যা, কারণ সচ্চিদানন্দই আছেন, সচ্চিদানন্দ ছাড়া কিছু নেই। সচ্চিদানন্দই আছেন, এই ব্যাপারটা ধারণা করা অত্যন্ত কঠিন। স্বামীজী বলছেন Maya is a statement of fact, জিনিষটা যেমনটি আছে সেই রকমটি বলে দিচ্ছে। এই ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করা যায় না। আচার্য শঙ্করও এই ব্যাখ্যা দিয়েছেন, যদিও স্বামীজী আমাদের খুব সহজ ভাষায় বলে দিয়েছেন। বস্তুকে যখন যেমন দেখাচ্ছে তখন তার দুটো রূপ এসে যায়। একটা হল বস্তুর সার এই, কিন্তু জিনিষটাকে দেখাচ্ছে এই রকম। একে কোন ভাবেই ম্যাজিক বলা যাবে না, ম্যাজিকে একটা গুণগত পার্থক্য এসে যাচ্ছে। যখন মোহ ভঙ্গ হয়ে যাবে তখন দেখাবে এটা একটা ঘড়ি, জগতের ক্ষেত্রে জগতকে দেখাবে নিকৃষ্ট। কিন্তু আসলে সচ্চিদানন্দ ছাড়া তো কিছু নেই। যখন সমাধিতে গিয়ে জ্ঞান হচ্ছে তখন মোহ ভঙ্গ হয়ে গিয়ে দেখছেন সচ্চিদানন্দ ছাড়া কিছু নেই, যা কিছু দেখছি এগুলো শুধু নাম আর রূপের খেলা মাত্র, এটাই মায়া।

দোলের সময় চিনি দিয়ে এক ধরণের মিষ্টি তৈরী হয়, যার নাম মঠ। হাতি, ঘোড়া, বাঘ, গরুর রূপ দিয়ে মঠের নানান রকম আকৃতি তৈরী করা হয়। বাচ্চারা এই নিয়ে ঝগড়া করবে, আমি হাতি খাবো, আমি গরু খাবো না, আমি সিংহ খাবো। মঠে চিনি ছাড়া কিছু নেই, শুধু তার নাম আর রূপ দিয়ে আকারটা পাল্টে দেওয়া হয়েছে। এই নাম আর রূপটাকেই মায়া বলছেন। আমি যে ভাবছি এগুলো নেই, এগুলো মিথ্যা, কিন্তু একেবারেই তা নয়। ভেতরে প্রজ্ঞা না থাকলে যতই যুক্তি দিয়ে বোঝানো হোক না কেন, এগুলো ধারণা করা যায় না। যেদিন বুঝবে, সেদিনই বুঝে নেবে। জল বরফ হয়ে গেছে, ওই বরফের অনেক রকম আকৃতি হয়ে গেছে। বরফের আকৃতি আর জলে কোন মিল নেই। কিন্তু যিনি বিজ্ঞানী তিনি জানেন বরফের আকৃতিটাও H_2O জলটাও H_2O। বেদান্ত বলছেন যিনি সচ্চিদানন্দ তাঁকেই এই জগৎ রূপে দেখাচ্ছে, এটাই মায়া। তাহলে এটা কি মিথ্যা, যে ভাবে আমরা জগতকে মিথ্যা ভাবি? একেবারেই না। সেইজন্য সচ্চিদানন্দ যা, শ্রীকৃষ্ণও তাই, শ্রীকৃষ্ণ যা কালীও তাই, কোন তফাৎ নেই। ভূত যেভাবে মিথ্যা কালী সেই ভাবে মিথ্যা নয়। কাল্পনিক বলতে যা কিছু আছে, ফ্যান্টাসি বলতে যা বোঝায়, কালী কখন সেই রকম নয়। মায়া সম্বন্ধে আমরা যতই আলোচনা করি না কেন, কিছুতেই মায়াকে ধারণা করা যায় না, যেদিন ধারণা হবে সেদিনই হবে। তবে মায়াকে একবার ধারণা করে নিলে বেদান্ত দর্শন বুঝতে অনেক সহজ হয়ে যাবে।

এখানে আমাদের কয়েকটি কথা ভালো করে বুঝে নিতে হবে। ভাগবতে ভক্তির উপর বেশী জোর দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তার মানে এই নয় যে ভক্তির উপর জোর দিতে গেলে বেদান্ত ছিটকে যাবে। আসলে সমস্যা হল, যে কোন উচ্চ তত্ত্ব মুর্খদের হাতে পড়ে কয়েকটা বাক্যের মধ্যে সীমিত হয়ে পড়ে। যেমন, ঠাকুরের জীবন থেকে আমরা কি শিক্ষা পাই এই নিয়ে বলতে গেলে কয়েকটি বাক্যে বলে দেওয়া যেতে পারে – ঈশ্বর দর্শনই মানব জীবনের উদ্দেশ্য, দ্বিতীয় বলা যেতে পারে কামিনী-কাঞ্চনই মায়া, তৃতীয় ঈশ্বরই সত্য বাকি সব অসত্য এই তিনটে চারটে কথাতে বলে দেওয়া যায়। কিন্তু ঠাকুরের জীবনের পূর্ণাঙ্গ চিত্র বা সমগ্র কথামৃত এই তিন চারটে কথাতেই শেষ হয়ে যায় না। যে কোন ধর্মেই এই সমস্যা আছে। বেদান্তেও এই সমস্যা আছে। লোকে মনে করে ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা এইটুকুর মধ্যেই বেদান্ত শেষ হয়ে যায়। বেদান্ত এভাবে কখন শেষ হবে না। বেদান্ত যত অধ্যয়ন করতে থাকবে তত বোঝা যায় বেদান্তের পরিধি এর থেকে অনেক বেশী। শুধু অনেক বেশীই নয়, যত ধর্ম আজ পর্যন্ত জন্ম নিয়েছে বা আগামীকাল জন্ম নেবে সেটাই বেদান্ত। সেইজন্য স্বামীজী বলছেন By religion is meant Vedanta। ধর্ম যা বেদান্তও তাই। বেদান্তের মুক্তির প্রসঙ্গকে যখন আরবিক কিছু কিছু চিন্তা-ভাবনার সাথে সামঞ্জস্য করে রাখা হবে তখন সেটাই ইসলাম ধর্ম হয়ে যাবে। বেদান্তের যে যোগের প্রসঙ্গ আছে, সেটাকে যখন বিশেষ ভাবে রাখা হবে তখন সেটাই বৌদ্ধ ধর্ম হয়ে যাবে।

ওটাকেই যখন ভারতীয় ভূখণ্ডের লোকাচারের মধ্যে রেখে দেওয়া হয় তখন সেটাই হিন্দু ধর্ম হয়ে যাবে। আচার্য বেদান্তের শিক্ষা দিয়েছেন, উপনিষদ বেদান্তের শিক্ষা দেয়।

সেইজন্য যতক্ষণ বেদান্ত না বুঝতে পারা যাবে ততক্ষণ যে কোন ধর্মকে বোঝা অসম্ভব। আমাদের মনে বিচিত্র একটা ধারণা ঢুকে আছে যে, মায়া মানে মিথ্যা। দুটি জগৎ, মনের জগৎ আর চৈতন্যের জগৎ। মনের জগৎ আবার পুরোপুরি চৈতন্যের উপর নির্ভর করে আছে। চৈতন্যের জগৎ যদি না থাকে মনের জগৎ থাকবে না। চৈতন্যকে যখন চেতনা দিয়ে দেখা হয় তখন তাকেই আত্মজ্ঞান বলা হয়। চৈতন্যকে যখন বুদ্ধি দিয়ে দেখা হয় তখন তাকেই বলছেন মায়ার রাজ্য। আমার চোখে যদি একটা রঙিন চশমা থাকে তখন এই টিউব লাইটের আলোকে ওই রঙের দেখাবে। চশমা খুলে ফেললে আলোটা অন্য রকম দেখাবে। বেদান্ত হল আলোকে বিনা চশমাতে দেখা। আমরা যে জগৎকে দেখছি আমরা সবাই সেই সচ্চিদানন্দকেই দেখছি, কিন্তু রঙিন চশমা লাগিয়ে দেখছি। চশমা দিয়ে দেখাটাই মায়া। চশমা দিয়ে যেটা দেখছি সেটা কি আমি ভুল কিছু দেখছি? কখনই ভুল দেখছি না। চলচ্চিত্রের ব্যাপারটা পুরোপুরি আলোর খেলা। আলো যখন ছবির মাঝখান দিয়ে যাচ্ছে তখন নানা রকমের দৃশ্য পর্দায় ভেসে উঠছে। প্রজেক্টর থেকে ছবির রিলটা সরিয়ে নিলে পর্দার মধ্যে শুধু শুদ্ধ আলোই পড়বে। শুধু আলো দেখতে সিনেমা হলে কেউ যাবে না। এই জগৎ হল সচ্চিদানন্দের আলোর উপরে মায়ার ছবি এসে পড়েছে। এই ছবিও কিন্তু সচ্চিদানন্দই, কারণ সচ্চিদানন্দের বাইরে কিছু নেই। আমরা ভাবছি সচ্চিদানন্দ একটি বস্তু, মায়া আরেকটি বস্তু, কিন্তু আসলে তা নয়। এর সব থেকে সহজ উপমা হল জল আর বরফ, জলও যা বরফও তাই। কিন্তু বরফের এখন নানা রকমের আকৃতি হয়ে গেছে।

কিন্তু আমাদের ব্যবহারিক স্তরে মনের উপর আমরা বেশী নির্ভর করি বলে মনের উপরই পুরো জোরটা দিই। মন হল রঙিন কাঁচ, এই রঙিন কাঁচের উপর আবার অনেক রকম লেন্স বসান আছে। রঙিন কাঁচের ভেতর দিয়ে যখন সচ্চিদানন্দকে দেখছি তখন ওখানে একটা distortion হয়। ওই distortion হওয়ার জন্য আমাদের নানা রকমের সুখ দুঃখের অনুভূতি হচ্ছে। আমাদের আচার্যরা বলেন তুমি ওই রঙিন কাঁচটা সরাবার চেষ্টা কর। রঙিন কাঁচকে সরিয়ে ফেলার প্রচেষ্টা যখন শুরু হয় তখন আবার অনেক রকম জিনিষ দেখা শুরু হয়ে যায়। কারণ ওই চশমার উপর অনেক রকমের লেন্স বসানো আছে। যখন পরিষ্কার করার প্রক্রিয়া শুরু হবে তখন আবার দু রকমের জিনিষ হবে। একটাতে সত্যি সত্যি কাঁচ পরিষ্কার হয়ে গেছে, দ্বিতীয়টাতে সম্পূর্ণ পরিষ্কার হয়নি। দ্বিতীয় অবস্থায় যদি ভাবা হয় সচ্চিদানন্দ এই রকম, সেটাকে আমরা বলি কল্পনা বা imagination, এটাকেই বলছেন মিথ্যা। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ যখন দেখছেন তিনি তখন সচ্চিদানন্দ যেমনটি তেমনটিই দেখছেন। যেমনটি সচ্চিদানন্দ তেমনটিই যখন তখন আবার দু রকম দেখেন – একটা দেখেন সচ্চিদানন্দ নির্গুণ নিরাকার, আরেকটা দেখেন সচ্চিদানন্দ সগুণ সাকার। সগুণ সাকার সচ্চিদানন্দকে দেখতে গেলে চোখে একটা চশমা লাগাতেই হবে। চোখের ওই চশমাকেই মায়া বলা হয়। ওই মায়া আর সচ্চিদানন্দ এই দুটো আলাদা নয়, দুটোই এক। এনারা উপমা দিয়ে বলেন, জলের হিমশক্তিতে জল যেমন বরফ হয়ে যায়, নিজেরই শক্তিতে জল বরফের রূপ নিচ্ছে। ঠিক তেমনি সচ্চিদানন্দ নিজের শক্তিতে সগুণ সাকার দেখান।

মানুষ যখন এইভাবে ঈশ্বরকে দর্শন করেন তখন তাঁর ব্যক্তিত্বে কিছু কিছু পরিবর্তন লক্ষ্যিত হয়। এই পরিবর্তন গুলি যদি ব্যক্তিত্বে পরিলক্ষিত না হয় তখন তার ঈশ্বর দর্শন হওয়াকে ঠিক ঠিক ঈশ্বর দর্শন বলা হয় না। মায়া ঈশ্বরেরই শক্তি, সেই ঈশ্বরের শক্তিতে যখন ঈশ্বরকে দর্শন করে তখন হাত-পা-ওয়ালা ঠাকুরকে দেখাচ্ছে। সেই ঈশ্বরকে সম্ভাষণ করা যাবে, সেই ঈশ্বরের সাথে খেলা করা যাবে। কথামৃতে আমরা এই ধরণের অনেক বর্ণনা পাই, ঠাকুর কীভাবে সেই সচ্চিদানন্দের সাথে খেলা করছেন। ঠাকুরের কত রকমের ভাব, কত রকম দিব্য দর্শন হচ্ছে। মহাপুরুষ বা অবতাররা যখন তাঁদের শুদ্ধ পবিত্র মন দিয়ে সচ্চিদানন্দকে দেখছেন তখন তাঁরা কত ভাবে যে দেখেন ভাবাই যায় না। সচ্চিদানন্দ হলেন সৎ চিৎ আনন্দ, অসীম ক্ষমতা তাঁর। নিজেকে তিনি কীভাবে কত ভাবে দেখাবেন তার কোন শেষ নেই। কারণ তিনি অনন্ত, তাঁর অনন্ত রূপ, তিনি তাঁর যে কোন রূপকে যে কোন ভাবে দেখাতে পারেন। আমাদের সবাইকে তিনি প্রতি মুহূর্তে তাঁর রূপ দেখিয়ে যাচ্ছেন, কিন্তু আমরা বুঝতে পারছি না। আমি আপনি যদি বুঝতে পারতাম তাহলে আমাদের শোক

আর মোহ চিরদিনের মত মিটে যেত, রাগ আর দ্বেষ থাকতো না। যতক্ষণ আমাদের মধ্যে শোক মোহ থাকবে, রাগ আর দ্বেষ থাকবে ততক্ষণ যত রূপ দেখছি তার সবটাই মিথ্যা। শ্রীরামকৃষ্ণের কারুর প্রতি রাগ, দ্বেষ, মোহ ছিল না। তিনি যা কিছু দর্শন করেছেন সবটাই সত্য। আমাদের কাছে ঈশ্বরীয় রূপ দেখাটা মিথ্যা। এখন মিথ্যাকেও মায়া বলা হয় আবার শক্তিকেও মায়া বলে। সেইজন্যই মায়াকে নিয়ে এত সংশয় হয়।

যাই হোক এবার যোগমায়ার জন্ম হয়ে গেছে। এখানে শ্লোকে বলছেন যোগমায়াও ঈশ্বরের মত জন্মরহিত। ঈশ্বরের যিনি অবতার হন তিনি এই মায়াকে আশ্রয় করে অবতীর্ণ হন। আর বলছেন, মায়া সব সময়ই আছে, কখন সুপ্ত ভাবে কখন জাগ্রত ভাবে। সেইজন্য জন্ম হওয়া যেই অর্থে বোঝায় সেই অর্থে যোগমায়ার জন্ম হয় না। আমরা যখন বলছি ঠাকুরের জন্ম হয়নি, তিনি অবতার, শ্রীশ্রীমায়েরও ক্ষেত্রেও একই জিনিষ হবে। শ্রীশ্রীমা শক্তি কিনা, তিনি কখন জন্ম গ্রহণ করতে পারেন না। তিনি যদি জন্মই নেন তাহলে তিনি কিসের জগজ্জননী! যিনি জগজ্জননী তিনি কীভাবে জগতে জন্ম নেবেন! এবার শ্রীকৃষ্ণ জন্ম নেওয়াতে বসুদেবের মনে আগে থেকেই ভয় আছে কংস এসে বধ করে দেবে, এই সন্তানটিকে বাঁচাতে হবে। তিনি এবার সদ্যোজাত শিশুকে কোলে নিয়ে কারাগার থেকে পালাবেন। বসুদেব এবার মথুরা থেকে পালিয়ে গোকুলে আসবেন। আসলে এখন মথুরা বলে আমরা যে জায়গাটা জানি সেটি মথুরা ছিল ঠিকই কিন্তু গোকুল নন্দগাঁও ব্রজভূমি বলতে যে জায়গাগুলো তীর্থযাত্রীদের দেখানো হচ্ছে এই জায়গাগুলো নিয়ে কিছুটা সংশয় থেকে যায়। কারণ সেই সময় এনাদের জীবনযাত্রাটা যাযাবরদের মত ছিল। যেখানে জলের সুবিধা আর গবাদি পশুর জন্য তৃণলতা, গাছপালা পাওয়া যেত সেখানেই তাঁরা কিছু দিন স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকতেন। সেখানেও যখন এগুলোর অভাব হত তখন সেই জায়গা ছেড়ে ওনারা আবার অন্য কোন অনুকূল জায়গায় চলে যেতেন। মথুরা থেকে গোকুল যেতে গাড়িতে প্রায় ঘন্টাখানেক সময় লাগে। সেইজন্য অনেকের মনে সন্দেহ হয় রাত বারোটায় শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হওয়ার পর বসুদেবের পক্ষে অতটা রাস্থা পায়ে হেঁটে যাওয়াটা সম্ভব কিনা। তাও আবার সেখানে বাচ্চা রেখে আবার ফিরে আসাটা অনেকের কাছে অবাস্তব মনে হতে পারে। এখানে একটাই সম্ভবনা থাকতে পারে সেই সময় তাঁদের বসবাস মথুরার কাছেই ছিল। কিন্তু ভক্তির দৃষ্টিতে দেখলে বলা যেতে পারে ভগবান লীলা করতে এসেছেন, তাঁর পক্ষে এখন সবই সম্ভব।

সে যাই হোক, এখন যোগমায়া জন্ম নিয়েই তিনি সবার ইন্দ্রিয় শক্তিকে হরণ করে নিয়েছেন। ইন্দ্রিয় শক্তি হরণ হয়ে যাওয়াতে মথুরার কারাগারে যত দ্বারপালরা ছিল তাদের সবারই চেতনা লুপ্ত হয়ে গেছে। বসুদেব আর দেবকীর কারাগারের ফটকের বড় বড় তালাগুলো সব আপনা থেকেই খুলে গেল। অন্য দিকে প্রথমে বলা হয়েছিল আকাশের তারাগুলো ঝকঝক করছে, মানে নির্মল আকাশ। কিন্তু এখন বলছেন বাইরে মেঘের গুরু গম্ভীর গর্জন হতে শুরু হয়েছে, আর মিষ্টি মিষ্টি বাতাস বইতে আরম্ভ করেছে। শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হওয়ার পর বসুদেব যখন তাঁকে কোলে নিয়েছেন দেখা গেলে বসুদেবের সব হাতকড়া খুলে গেল। ভাষ্যকাররা এর খুব সুন্দর ব্যাখ্যা করে বলছেন – যাঁর নাম শ্রবণ করলেই কোটি কোটি জন্মের প্রারব্ধ কেটে যায়, সেই ভগবানকে কোলে নিলে তাঁর বাবার যে হাতকড়ি খুলে যাবে এতে আশ্চর্যের আর কি আছে। ভাষ্যকাররা বলছেন ভগবানের সামনে অজ্ঞান দাঁড়াতে পারে না। অজ্ঞানটাও মায়া, কারণ আমরা সবাই সেই শুদ্ধ সচ্চিদানন্দ কিন্তু আমাদের কখনই সেই হুঁশ থাকে না। আমরা সব সময় মনে করি আমি অমুক লোক, আমি অমুক কাজ করি। কিন্তু কখনই মনে করতে পারছি না যে, আমি সেই পূর্ণ ব্রহ্ম। এটাই অজ্ঞান। বলছেন ঈশ্বর দর্শনে অজ্ঞান আর সব মোহ মায়া উড়ে যায়। ঠাকুর বলছেন গঙ্গা স্নান করলে সব পাপ চলে যায় কিন্তু চোখের কানাত্বটা ঘোচে না। আবার বলছেন একজন ভক্তকে ভগবতী দর্শন দিলেন, কথা বললেন কিন্তু ভক্তের কারাগারত্বটা ঘুচলো না। এখানেও বসুদেবের চতুর্ভুজ রূপ দর্শন হল, শ্রীকৃষ্ণকে কোলে নিয়ে গোকুলে রেখে এলেন, কিন্তু তাঁর কারাগার বাস ঘুচলো না। ভাষ্যকাররা বলছেন ভগবানের সামনে অজ্ঞান চলে যায়, সেখানে কারাগারের দরজা খুলে গেল এতে আশ্চর্যের কি! এসব ঘটনাকে খুব আক্ষরিক নিতে নেই। এগুলো ভক্তদের ভাবরাজ্যের বর্ণনা।

যাই হোক, এরপর সমস্ত পাহারাদাররা অচেতন হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল, কারাগারের সব কপাট খুলে গেল – বলছেন, যিনি সর্বগুণাধার, ভগবানকে খুব প্রেমের সাথে হৃদয়ে ধারণ করেন, তাঁর সব বন্ধন খুলে যায়। এখানে সব বন্ধন খুলে যাওয়ার অর্থ হল কারাগারের সব বড় বড় দরজা খুলে গেল। এর উপমা দিচ্ছেন, সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে যেমন সব অন্ধকার বিদূরিত হয়, ঠিক তেমনি কারাগারের সব দরজা খুলে গেল। আর যারা পাহারা দিচ্ছিল তারা অচেতন হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। একেই বলে ভাবরাজ্য। বসুদেব সদ্যোজাত শিশুকে একটা টুকরির মধ্যে রেখে গোকুলের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েছেন। মধ্য রাত, একেই ভাদ্র মাস, তার উপর টিপ্‌টিপ্ করে বৃষ্টি পড়তে শুরু হয়েছে। এখানে একটি খুব সুন্দর কাব্যিক বর্ণনা দিচ্ছেন, শ্রীকৃষ্ণ বৃষ্টির জলে সিক্ত হয়ে যাবেন, সেইজন্য ***তাঃ কৃষ্ণবাহে বসুদেব আগতে স্বয়ং ব্যবর্যন্ত যথা তমো রবেঃ। ববর্ষ পর্জন্য উপাংশুগর্জিতঃ শেষোহন্বগাদ্ বারি নিবারয়ন্ ফণৈঃ।।১০/৩/৪৯।।*** এদিকে যিনি শেষনাগ, যাঁর উপর ভগবান শয়ন করেন, তিনি জন্ম নিয়েছেন ভগবানের দাদা বলরাম হয়ে। শেষনাগের একটাই কাজ, ভগবানের সেবা করা। শ্রীরাম অবতারে তিনি লক্ষ্মণ হয়ে দাদার সেবা করেছিলেন। কিন্তু এবার তিনি ভগবানের দাদা হয়ে জন্ম নিয়েছেন। দাদা ভাইকে কি করে সেবা করবে? তখন শেষনাগ ভাবছেন এখনই যতটুকু সুযোগ পাওয়া যায় ভগবানের সেবা করে নেওয়া যাক। তাই শেষনাগ আবার তাঁর পূর্ব রূপ ধারণ করে বিশাল ফণা বিস্তার করে বসুদেবের মাথার উপর নিজের ফণাকে ছাতার মত মেলে দিয়েছেন যাতে বৃষ্টির জল সদ্যোজাত শিশুর শরীরে বর্ষিত না হতে পারে। আমরা এখানে কোন ইতিহাস অধ্যয়ন করছি না, কোন নভেল পড়ছি না, এখানে আমরা ভক্তিশাস্ত্রের আলোচনা করছি, আর ভক্তিশাস্ত্রে ভাবরাজ্যের বর্ণনা এভাবেই হয়ে থাকে।

ভাদ্র মাসে ভারতের বেশীর ভাগ নদীই জলে পরিপূর্ণ থাকে। যমুনা নদীতেও বর্ষার জলোচ্ছাস। হিন্দুরা কোন নদীকেই শুধুমাত্র জলপ্রবাহ রূপে কখনই দেখে না, ভারতের প্রত্যেকটি নদীকে দেবী রূপে দেখা হয়। ভাবরাজ্যের পণ্ডিত ব্যাখ্যাকাররা খুব সুন্দর বর্ণনা করে বলছেন যাঁর চরণকমল রেণুর স্পর্শ পাওয়ার জন্য যোগীরা সর্বস্ব ত্যাগ করে জন্ম জন্ম ধরে শুধু ধ্যান আর তপস্যা করে যান, কঠোপনিষদে এর খুব সুন্দর বর্ণনা আছে *যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্যং চরন্তঃ*, যে জিনিষকে পাওয়ার জন্য মানুষ বলে আমি জগতের কোন সুখ ভোগ করতে চাইনা, যে জিনিষকে জানার জন্য মানুষ বলে আমি ঘর, বাড়ি, বাবা, মা, ভাই, বোন সব ত্যাগ করলাম। কি সেই জিনিষ যার জন্য মানুষ সর্বস্ব ত্যাগ করে পথে বেরিয়ে পড়ছে? কঠোপনিষদে বলছে 'ওঁ', কিন্তু এখানে যমুনা বলছে ভগবানের চরণকমল পাওয়ার জন্য মানুষ সব কিছু ত্যাগ করে। আর সেই তিনি এখন আমার খুব সন্নিকটে আসছেন, আমার বুকের উপর দিয়ে তিনি যাবেন। বসুদেবকে এখন যমুনা পার করতে হবে বলে যমুনা আনন্দে ডগমগ হয়ে গেছে। কথামৃতে এক শোকাতুরা ব্রাহ্মণীর খুব সুন্দর বর্ণনা আছে। বিধবার একমাত্র মেয়ের বিয়ে হয়েছিল রাজ ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ এক পরিবারের ছেলের সাথে। সেই মেয়ে হঠাৎ মারা যাওয়ার পর তার শোকের আর অন্ত হচ্ছিল না। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন সেই বিধবার কুটিরে যাবেন। সেই শোকাতুরা বিধবা এখন চেঁচিয়ে বলছে 'ওগো! আমার আজ কি আনন্দ! আমার মেয়ের বিয়েতেও আমার এত আনন্দ হয়নি! তিনি আমার বাড়ি আসছেন, এই আনন্দ আমি কোথায় রাখি'! আনন্দেও মানুষ তার চোখের জলকে সামলাতে পারে না। যমুনাও আনন্দে উদ্বেলিত, তার নয়ন থেকে এত অশ্রু নির্গত হতে শুরু করল যে নদীতে বন্যা হয়ে গেছে। এটাই কাব্যিক বর্ণনা, এটাই ঠিক ঠিক ভক্তির অভিব্যক্তি, এই ভাব নিয়ে দেখা না হলে ভক্তিশাস্ত্র কখন ভক্তিশাস্ত্র হতে পারবে না। ভগবানের প্রতি এত গভীর ভালোবাসা যে, ভগবানের চরণকমলের একটু স্পর্শ পাওয়ার জন্য যমুনার মন প্রাণ উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে, তারই বহিঃপ্রকাশ হল যমুনার ঢেউ উত্তাল ফেনিল রূপ ধারণ করেছে। লৌকিক দৃষ্টিতে দেখলে বন্যা কিন্তু ভক্তির দৃষ্টিতে দেখলে যমুনা ঈশ্বরীয় প্রেমে বিগলিত হয়ে উঠেছে।

ভাষ্যকাররা নানান ভাবে ব্যাখ্যা দিয়ে যাচ্ছেন। একটি ব্যাখ্যাতে বলছেন যমুনার জল কখনই বসুদেবের কোমরের উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছিল না। আরেকটি ব্যাখ্যাতে বলছেন যমুনা দুটো ভাগে বিভক্ত হয় পথ দিয়েছে মানে ভগবানকে হৃদয়ে ধারণ করলে ভবনদীর জল বাষ্প হয়ে উবে যায়। যমুনার মনের মধ্যে একদিকে যেমন আনন্দের উত্তাল ঢেউ উঠছে অন্য দিকে এই ভেবে তার আশঙ্কাও হতে শুরু করেছে,

শ্রীরামচন্দ্র যখন সীতার উদ্ধারে লঙ্কায় যাবেন তখন সমুদ্র তাঁকে পথ দেয়নি, শ্রীরামচন্দ্র তখন রেগে সমুদ্রকেই বেঁধে দিলেন। এখন সেই শ্রীরামচন্দ্রই আবার অবতার হয়ে আসছেন, এবার আমি যদি পথ না দিই তখন আমাকেও তিনি হয়তো বেঁধে দেবেন। তার থেকে বাবা আমি পথটা আগেই দিয়ে দিই। আবার এক জায়গায় ব্যাখ্যাকাররা বলছেন – যমুনার একবার খুব ইচ্ছে হল ভগবানের শ্রীচরণকমলের একটু স্পর্শ লাভ করে নিজের জীবনকে ধন্য করে নিতে, সেইজন্য যমুনা তার ঢেউ গুলোকে খুব উঁচু করে তুলে ধরছে, আবার মনে মনে ভয়ও আছে, তাঁর কোমল শরীর যমুনার জলে সিক্ত হয়ে গিয়ে তিনি যদি রেগে যান, তখন তিনি আবার কি করে বসবেন কে জানে! আবার আরেক জায়গায় বলছেন – এই নদীতে কালিয়ানাগের মত ক্রুর প্রাণীরা আগে থাকতেই বাস করে তাই আমি কত কষ্টে আছি আর এখন আবার অনন্তনাগ এসে গেছেন, আমার কি দুর্গতিই না হবে, এই রকম বিচার করে যেন ভগবানকে বিশাল রূপ ধারণ করে তার দুর্গতির কথা নিবেদন করছে, ভগবান এবার নিশ্চয়ই আমাকে কালিয়নাগ থেকে ত্রাণ করবেন। গঙ্গার জল যেমন শ্বেতবর্ণ কিন্তু যমুনার জল শ্যামবর্ণ। সেইজন্য যমুনার আরেকটি নাম কৃষ্ণা। যমুনা ভাবছে – আমার নাম কৃষ্ণা, আমার জল কৃষ্ণবর্ণ, আমার বাইরেও এখন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ উপস্থিত। এই ভেবে খুব খুশী হয়ে যমুনা বসুদেবকে পথ করে দিলেন, ভগবান এখন আমার হৃদয়ের পথ দিয়ে যাবেন। এখানে আবার একটা গ্রন্থস্তুতি নিয়ে আসা হয়েছে – এই যে প্রসঙ্গ করা হল, বসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে কোল তুলে নিলেন, কারাগারের সব ফটক খুলে গেল, বসুদেবের লৌহশৃঙ্খল খুলে গেল, শেষনাগ ফণা বিস্তার করে শ্রীকৃষ্ণকে বৃষ্টির জল থেকে রক্ষা করছেন, যমুনা পথ দিয়ে দিল, যিনি এই ভাবকে হৃদয়ে ঠিক ঠিক চিন্তন করে ধারণা করবেন তাঁর সব রকমের অজ্ঞান বন্ধন খুলে যাবে।

যাই হোক বসুদেব যমুনা পার হয়ে নন্দগৃহে উপস্থিত হয়েছেন। গোকুলে পৌঁছে যাচ্ছেন, ভাষ্যকাররা এর অর্থ করছেন গোকুল মানে যেখানে ইন্দ্রিয়গুলি চরে বেড়ায়, গোচরও বলা হয়। ভগবান গোকুলে পৌঁছে গেলেন এর মানে ইন্দ্রিয়গুলি সব সংযত হয়ে নিয়ন্ত্রণে এসে গেল। ইন্দ্রিয় যার পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে এসে যায় তখন মায়াও তার হাতের মুঠোয় এসে যায়। ভাষ্যকাররা কাহিনীটাকে এইভাবে ব্যাখ্যা করছেন। সাধককে যে বারবার লীলা চিন্তন করতে বলা হয়, প্রকৃত লীলা চিন্তন এটাই। বসুদেব যখন পৌঁছেছেন যশোদা তখনই এক কন্যার জন্ম দিয়েছেন। বসুদেব দুটো বাচ্চাকে পাল্টাপাল্টি করে দিলেন। এই ব্যাপারটা নন্দবাবা জানতেন। যশোদা কোন কিছুই জানতে পারেননি, পরে অবশ্য জেনেছিলেন। শেষে খুব সুন্দর বলছেন ***যশোদা নন্দপত্নীং চ জাতং পরমবুধ্যত। ন তল্লিঙ্গং পরিশ্রান্তা নিদ্রয়াপগতস্মৃতিঃ।।১০/৩/৫৩।*** যোগমায়া যেন যশোদার স্মৃতিশক্তি অপহরণ করে নিয়েছেন, এটাই *গতস্মৃতিঃ* বলছেন, যশোদার কোন হুঁশ নেই। এটাকেই আবার ভাষ্যকারদের ব্যাখ্যায় শ্রীকৃষ্ণের জন্মের সাথে যোগমায়ার জন্মের তফাৎ কোথায় দেখানো হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণের জন্মের সাথে সাথে বসুদেব ও দেবকী জেনে গেছেন যে ভগবান তাঁদের সন্তান রূপ ধারণ করে অবতীর্ণ হয়েছেন। কিন্তু মায়ার যেখানে জন্ম হয়েছে সেখানে কারুর কোন বোধই হলো না। মায়াকে যখন আশ্রয় করবে তখন সব কিছু ভ্রান্ত দেখাবে, যখন ব্রহ্মভাব থাকবে তখন সব বন্ধন খুলে যাবে।

এবার বসুদেব যোগমায়াকে কোলে করে মথুরায় কংসের কারাগারে ফিরে আসছেন। এবারে ভাষ্যকাররা কিন্তু আর বর্ণনা করছেন না যমুনার জল কেন কম হল। শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে আসার সময় যমুনার জল কম হওয়ার নানা রকমের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। কন্যা শিশুটিকে নিয়ে বসুদেব আবার কারাগারে ফিরে আসতেই কারাগারের সব ফটক নিজে থেকেই বন্ধ হয়ে তালা পড়ে গেল। বসুদেব আর দেবকীরও হাতে পায়ে কড়া পড়ে গেল। সব কিছু হয়ে যাওয়ার পর বাচ্চার কান্না শুনতেই সবাই সজাগ হয়ে তটস্থ হয়ে গেল। মাঝ রাত্রেই কংসকে খবর দেওয়া হল যে অষ্টম গর্ভের সন্তান জন্ম নিয়েছে। কংস ছুটে এসে অবাক হয়ে দেখছে, দৈববাণীতে বলা হয়েছিল অষ্টম গর্ভে পুত্র সন্তান হবে কিন্তু এতো দেখছি মেয়ে সন্তান হয়েছে। প্রথমে দেবকী কংসকে বলছেন 'ভাই! এই কন্যা তোমার পুত্রবধূতুল্যা, তদুপরি স্ত্রীজাতীয়া, স্ত্রী হত্যা মহাপাপ। এর আগে তুমি আমার অনেকগুলি সন্তানকে বধ করেছ, এখন এই একটি মাত্র জীবিত সন্তান তাও আবার কন্যা, একে তুমি বধ করো না, আমি তোমার কাছে এই কন্যা দান রূপে চাইছি। দয়া করে একে ছেড়ে দাও'। কিন্তু কংস তখন মনে মনে ভাবছে দেবতারাও তাহলে ধাপ্পা মারে। কংসের মাথায় তো অষ্টম সন্তান ঘুরছে। কংস দেখল

কোন রকম ফাঁক রাখা উচিৎ কাজ হবে না, সে তখন কন্যাশিশুকে হাতে নিয়ে আছাড় মারতে যাবে ঠিক তখনি যোগমায়া কংসের হাত থেকে ছিটকে বেরিয়ে আকাশে শূন্যে দাঁড়িয়ে গেলেন।

শুকদেব বলছেন ***সা তদ্ধস্তাৎ সমুৎপত্য সদ্যো দেব্যম্বরং গতা। অদৃশ্যতানুজা বিষ্ণোঃ সায়ুধাষ্টমহাভুজা।।১০/৪/৯।*** যে কন্যা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ছোট বোন রূপে জন্ম নিয়েছেন, তিনি তো আর সাধারণ কেউ হবেন না। তিনি ছিলেন স্বয়ং দেবী যোগমায়া। সেই যোগমায়া তিনি তাঁর মহীয়সী ভুবনমোহিনী অষ্টাভুজা দেবীরূপে কংসের কারাগারে আবির্ভূতা হলেন। নানা দিব্যালঙ্কারে আভূষিতা সেই দেবী যোগমায়ার অষ্টভুজে অষ্ট প্রকার অস্ত্র। ***দিব্যস্রগম্বরালেপরত্নাভরণভূষিতা। ধনুঃশূলেষুচর্মাসিশঙ্খচক্রগদাধরা।। সিদ্ধচারণগন্ধর্বৈরপ্সরঃকিন্নরোরগৈঃ। উপাহৃতোরুবলিভিঃ স্তূয়মানেদমব্রবীৎ।।১০/৪/১০-১১।*** সেই যোগমায়া দেবীর গলায় দিব্য মালা, দিব্য বস্ত্র, চন্দন লেপিত ও অলঙ্কারে ভূষিতা আর তাঁর আট হাতে ধনুষ, শূল, বাণ, ঢাল, তরবারি, শঙ্খ, চক্র এবং গদা। সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব, অপ্সরা, কিন্নর ও নাগেরা দেবীর জন্য নানা পূজা উপাচার সহ তাঁর উদ্দেশ্যে স্তবগান করছিলেন। যোগমায়া দেবী তখন কংসকে উদ্দেশ্য করে বলছেন ***কিং ময়া হতয়া মন্দ জাতঃ খলু তবান্তকৃৎ। যত্র ক্ব বা পূর্বশত্রুর্মা হিংসীঃ কৃপণান্ বৃথা।।১০/৪/১২।*** আরে মুর্খ! আমাকে মেরে তোর কি লাভ হবে? তোর পূর্বজন্মের শত্রু তোকে বধ করবার জন্য কোথাও না কোথাও জন্ম নিয়েছেন, তুই আর বৃথা নিরাপরাধ শিশুর হত্যা করিস না। কিন্তু কংস এর পরেও বাচ্চা গুলোকে একই ভাবে বধ করে গেছে। এখানে পরিষ্কার করে যদিও বলা নেই কংসকে যিনি বধ করবেন তিনি কোথায় জন্ম নিয়েছেন, কিন্তু অন্যান্য জায়গায় বলা হয় যে দেবী নাকি বলে দিয়েছিলেন তোমাকে যিনি বধ করবেন তিনি গোকুলে জন্ম নিয়েছেন। এই বলে ভগবতী যোগমায়া অন্তর্হিত হয়ে গেলেন। ***ইতি প্রভাষ্য তং দেবী মায়া ভগবতী ভুবি। বহুনামনিকেতেষু বহুনামা বভুব হ।।১০/৪/১৩।*** ভগবানের লীলা সঙ্গিনী রূপে ভগবানের এই কাজটা করে দিলেন বলে পৃথিবীর নানা জায়গায় তিনি নিজেকে ছড়িয়ে দিলেন আর শক্তির বিভিন্ন নামে নানান রূপে পূজিতা হতে থাকলেন। ভারতের পূর্ব প্রান্ত কামাক্ষ্যা থেকে শুরু করে পশ্চিমে জ্বালামুখী বিভিন্ন জায়গায় যত দেবীর আরাধনা করা হচ্ছে সব যোগমায়ারই বিভিন্ন রূপ, ভগবানও তাঁকে এই কথাই বলেছিলেন। এখনো তিনি একই ভাবে পূজিতা হয়ে আসছেন।

ভাগবত হল পুরাণধর্মী গ্রন্থ। যারা বেদান্তের গভীর তত্ত্বকে বুঝতে পারবে না, পুরাণ তাদের জন্য রচিত হয়েছে। পুরাণধর্মী গ্রন্থে যতক্ষণ কিছু অলৌকিক কাণ্ড না নিয়ে আসা হবে ততক্ষণ সেটা পুরাণ হবে না। যোগমায়াকে এই ভাবে বর্ণনা না করা হলে দেবীর প্রতি মানুষের সেই শ্রদ্ধাটা আসবে না। এই ধরণের কাহিনীতে একটাই মূল সমস্যা, তা হল ঈশ্বরীয় তত্ত্বের দিকে যতটা মন আকৃষ্ট হবে তার থেকে কাহিনীর চমৎকারীত্ব আর অলৌকিক কাণ্ডের দিকে মনটা বেশী করে চলে যায়। তার থেকেও বড় সমস্যা হল ভগবান যখন অবতার হয়ে আসেন, মানুষ সেই অবতারের মধ্যেও চমৎকারিতা দেখতে চায়। ওই চমৎকারিতা না দেখালে তখনই মানুষের সন্দেহ হতে শুরু করে। এই ধরণের কাহিনী না বলা হলে মানুষ আবার ঈশ্বরীয় ব্যাপার সম্বন্ধে ধারণা করতেও পারবে না, আবার এই ধরণের কাহিনীর গণ্ডীর মধ্যেই মানুষের মন আবদ্ধ হয়ে থাকে, এটাই পুরাণধর্মী সাহিত্যের এক বিরাট সমস্যা।

যে কোন ধর্মের একটা নিজস্ব শক্তি থাকে, ওই শক্তিই কিছু দিন পরে সেই ধর্মের বন্ধন হয়ে ধর্মটাকে শেষ করে দেয়। এই সমস্যা যেমন ইসলাম, খ্রীশ্চান ধর্মে আছে তেমনি হিন্দু ধর্মেও আছে। ইসলাম ধর্মের মূল শক্তি ছিল তার ভ্রাতৃত্ব বোধ, কিন্তু পরে গিয়ে এই শক্তিই ইসলাম ধর্মের সর্বনাশের কারণ হয়ে দাঁড়াল। সাধারণ মানুষের মধ্যে ধর্মকে নিয়ে যেতে যেতে ধর্মটা এমন পর্যায়ে চলে গেছে যে, সর্বসাধারণের ধর্ম আর উচ্চ মণীষীদের ধর্ম এক হয়ে গেছে, এভাবে উচ্চ আধার আর নিম্ন আধার মানুষের ধর্ম কখন এক হয় না। যাঁরা গুহায় গিয়ে একমাত্র ঈশ্বর চিন্তনে ডুবে আছেন তাঁদের ধর্ম সব সময় অন্য রকম হবে, সাধারণের ধর্মও ওই ধর্ম থেকে আলাদা হবে। ইসলাম ধর্মে যাঁরা সুফি ছিলেন, খ্রীশ্চান ধর্মে যাঁরা ডেজার্ট ফাদার ছিলেন, এনাদের ধর্ম প্রচলিত ধর্ম থেকে আলাদা ছিল। আমাদের ঋষি মুনিদের যে ধর্ম, সেই ধর্ম থেকে সাধারণ

মানুষের ধর্মের মধ্যে বিরাট পার্থক্য। ওই পার্থক্য আজও আছে। শুধু তাই না, আমাদের ঋষি মুনিরা সাধারণ মানুষের জন্য শাস্ত্রটাই আলাদা করে দিলেন। কিন্তু হিন্দু ধর্মের যেটা শক্তি, সাধারণ মানুষের জন্য আলাদা ধর্ম পরিষ্কার করে বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই শক্তিটাই হিন্দু ধর্মের কাল হয়ে গেল। ঠাকুরের কাছেও আমরা ম্যাজিক দেখতে চাইছি। ঠাকুর একসাথে কত জায়গায় ছিলেন? তিনি দক্ষিণেশ্বরেও ছিলেন আবার ঢাকাতে একই সঙ্গে বিজয়কৃষ্ণকেও দেখা দিয়েছেন। হৃদয়রাম দেশের বাড়িতে দূর্গাপূজা করবে বলে ঠিক করেছেন। মামা বলেছিলেন আমি তোর পূজাতে যাব। হৃদয়রাম দেখছেন মামা দূর্গা প্রতিমার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। তৃতীয় ঘটনা খুঁজতে গিয়ে আর কোন ঘটনা খুঁজে পাওয়া যায় না। এই দুটো ঘটনাকে নিয়ে আমরা কি সিদ্ধান্ত নিতে পারি, ঠাকুর একই সঙ্গে অনেক জায়গায় আবির্ভূত হতে পারতেন? সিদ্ধান্ত না নিয়ে কোন উপায় নেই। কারণ এগুলো না হলে আমরা ঠাকুরের অবতারত্বকে সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করে দেব। ঈশ্বরের অবতারত্ব গ্রহণের তাৎপর্য, ঈশ্বরীয় তত্ত্ব, জীবনের উদ্দেশ্য এগুলো থেকে সরে গিয়ে এই সব অলৌকিকতার দিকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে দেওয়াতেই এখন বেশী জোর দেওয়া হচ্ছে। এভাবেই যে কোন ধর্ম অধঃপতনের দিকে এগিয়ে যায়। ব্যাসদেব এখানে শুধু তাঁর কল্পনাকে একটা কাব্যিক রূপ দিচ্ছেন না, এখানে কাব্যিক বর্ণনাকে ছাড়িয়ে গিয়ে ভক্ত যাঁরা তাঁদের জন্য একটা ভাবরাজ্য তৈরী করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এগুলোকে যদি কেউ আক্ষরিক অর্থে নিয়ে ঠাকুরের ক্ষেত্রে, মহম্মদের ক্ষেত্রে, যিশুর ক্ষেত্রেও লাগাতে যায় তাহলে বুঝে নিন তার দ্বারা আর আধ্যাত্মিক পথে এগোন সম্ভব হবে না।

শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা

কংসের অনুশোচনা ও বন্দীদশা থেকে দেবকী ও বসুদেবকে মুক্তি

কংসের মনে হঠাৎ করে যেন চেতনা এসেছে। দেবকী আর বসুদেবকে তাঁদের বন্দীদশা থেকে মুক্তি দিয়ে ক্ষমা চেয়ে বলছে ***অহো ভগিন্যহো ভাম ময়া বাং বত পাপ্মনা। পুরুষাদ ইবাপত্যং বহবো হিংসিতাঃ সুতাঃ।।১০/৪/১৫।*** 'আমি কি পাপী! রাক্ষসরা যেমন নিজেদের সন্তানকেই বধ করে আমিও এমনই পাপাত্মা যে তোমাদের এতগুলো পুত্রকে হত্যা করেছি, আমাকে ধিক্'। কংস যে একেবারে খুব খারাপ লোক ছিল তা নয়। যার বোন দেবকী একজন দেবী, যিনি ভগবানকে গর্ভে ধারণ করছেন, সেই বংশে এতটা খারাপ লোক আসবে না, যে রকম খারাপ আমরা কল্পনা করছি। আসলে কংসের মধ্যে মৃত্যু ভয় এসে গিয়েছিল। একমাত্র ঋষি-মুনিরা ছাড়া নিজের প্রাণকে সবাই ভালোবাসে। মহভারতে মুদ্গল ঋষির কাহিনী আছে। তিনি কপোতবৃত্তি করে জীবন রক্ষা করতেন। কপোতবৃত্তি মানে, চাষ-বাস হয়ে ফসল উঠে যাওয়ার পর ক্ষেতে কিছু শস্য দানা পড়ে থাকে। পাখিরা ঐ পড়ে থাকা শস্যগুলিকে খুঁটে খুঁটে তুলে খায়। মুদ্গল ঋষি মাঠে ঘাটে বাজারে ঘুরে বেড়াতেন। বাজারে বড় বড় আড়তে বস্তা বস্তা খাদ্য শস্য মজুত করার সময় আর বাইরে বের করার সময় কিছু কিছু শস্য দানা এদিক সেদিক পড়ে থাকত। অত বড় ঋষি ছিলেন, কিন্তু কোন দিন কারুর দান গ্রহণ করতেন না, কারুর কাছে ভিক্ষা করতেন না। এইভাবে পনের দিন ধরে ক্ষেত থেকে, বাজার থেকে পড়ে থাকা শস্য দানা শুধু তুলতেই থাকতেন। পনের দিনে তাঁর এক কৌটা চাল ডাল বা গম যাই হত, পনের দিন পর সেটুকু রান্না করে অন্ন গ্রহণ করতেন। পনের দিনে যেটুকু হতো তিনি সেটা রান্না করতেন। অতিথি যিনি থাকতেন তাঁকে আগে খাওয়াবেন, তারপর তার বউ ছেলেকে খাইয়ে সবার শেষে নিজে আহার করতেন। আবার পনের দিন ধরে উপবাস করে থাকতেন আর ঐভাবে চাল বা গম সংগ্রহ করতে থাকতেন। ঋষির সাথে সাথে তাঁর ছেলে বউও পনের দিন উপোস করে থাকত। মুদ্গল ঋষিকে সবাই তখনকার দিনের একজন খুব বড় ঋষি বলেই জানত। দুর্বাস মুনির ইচ্ছে হল মুদ্গল ঋষিকে পরীক্ষা করবেন, তিনি কত বড় ঋষি দেখা যাক। একবার পনের দিন পর মুদ্গল ঋষি রান্না করেছেন, সেই সময় দুর্বাসা মুনি গিয়ে হাজির হয়ে বলছেন 'আমি খুব ক্ষুধার্ত আমাকে কিছু খেতে দাও'। অতিথি, তার উপর দুর্বাসার মত মুনি। মুদ্গল ঋষি তাঁকে খেতে দিয়েছেন, দুর্বাসা সব খেয়ে পাত্রের গায়ে যা লেগে ছিল সেটাকে গায়ে মেখে বেরিয়ে গেলেন। পনেরো দিন পর মুদ্গল ঋষি রান্না করেছেন, ঠিক সেই সময় আবার দুর্বাসা মুনি এসে উপস্থিত হয়েছেন, এবারও ওই একই জিনিষ করলেন। তারপর তৃতীয় বার, মানে পঁয়তাল্লিশ দিন মুদ্গল ঋষি না খেয়ে আছেন, দুর্বাসা মুনি আবার যখন একই জিনিষ করলেন। তখন দুর্বাসা মুনি মুদ্গল ঋষিকে বলছেন 'সত্যিই আপনি মহাপুরুষ! মানুষ সব কিছু সহ্য করে নেয় কিন্তু পেটের ক্ষুধাকে সহ্য করতে পারে না। আপনি এটাও সহ্য করে নিয়েছেন'। পেটের ক্ষুধাই মানুষের শেষ ক্ষুধা। আর কোন মানুষই মরতে চায় না। পেটের ক্ষুধার সাথে মৃত্যুর ব্যাপারটাও যুক্ত হয়ে আছে। মৃত্যু ভয় থেকেই মানুষ হিংসাতে নেমে পড়ে।

দেবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তান থেকে মৃত্যু হবে শোনার পর থেকে কংসকে মৃত্যুভয় আচ্ছন্ন করে রেখেছে। রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ এই তিনটে ক্লেশ খুব শক্তিশালী। এই তিনটের মধ্যে অভিনিবেশের শক্তি আরও বেশী। কোন প্রাণীই মরতে চায় না। শুধু তাই নয়, জ্ঞানী পুরুষদের মধ্যেও অভিনিবেশের ভাব প্রচণ্ড ভাবে থাকে। এখন কংসের মৃত্যু ভয়টা হঠাৎ করে চলে গেছে। দৈববাণীতে বলা হয়েছিল অষ্টম গর্ভের পুত্র সন্তানের হাতে তার মৃত্যু হবে। কিন্তু পুত্রের জায়গায় কন্যা সন্তানের জন্ম হয়েছে। কংসের মধ্যে করুণার ভাব জেগে উঠেছে। কংস বলছে ***দৈবমপ্যনৃতং বক্তি ন মর্ত্যা এব কেবলম্। যদ্বিশ্রম্ভাদহং পাপঃ স্বসুর্নিহতবাঞ্ছিশূন্।।১০/৪/১৭।*** মানুষই শুধু মিথ্যা কথা বলে না, বিধাতাও তাহলে মিথ্যা কথা বলেন। এই বিধাতার কথার উপর বিশ্বাস করে আমি নিজের বোনের শিশু সন্তানদের হত্যা করেছি। হায়! আমি কি জঘন্য পাপ কাজই না করেছি। কংস এত দিন যে শিক্ষা দীক্ষা পেয়েছিল তার প্রভাবে এখন অন্য রকম কথা বলতে শুরু করেছে। দেবকীকে বলছে 'তুমি মন খারাপ করো না, তোমরা দুজনেই মহাপ্রাণ। জগতের সমস্ত প্রাণীই

প্রারব্ধের অধীন’। তার মানে সবারই জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ সব কিছু প্রারব্ধের অধীন। প্রারব্ধ হিন্দুদের খুব শক্তিশালী একটি তত্ত্ব। আমরা যে রকমটি কর্ম করেছি সেই কর্মফল অনুসারে আমাদের সব কিছু হবে। মহাভারতে কর্মফল, প্রারব্ধের উপর খুব জোর দেওয়া হয়েছে। মহাভারতের পর থেকে অন্যান্য শাস্ত্রও প্রারব্ধ, কর্মফলের তত্ত্বকে অনেক এগিয়ে নিয়ে গেছে। বেদ উপনিষদ এমন কি বাল্মীকি রামায়ণেও কর্মবাদের উপর বেশী জোর দেওয়া হয়নি। কঠোপনিষদে যমরাজ বলছেন *যোনিমন্যে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ। স্থাণুমন্যেহনুসংযন্তি যথাকর্ম যথাশ্রুতম্।।(২/২৭)*, যেমনটি কর্ম করেছে, যেমনটি তার জ্ঞান ও চিন্তা সেই অনুসারেই তার জন্ম হয়।

কিন্তু আজকে আমরা বানিয়ে নিয়েছি, আমি যদি তোমাকে কষ্ট দিই তাহলে তুমিও আমাকে কষ্ট দেবে, এই চিন্তা-ভাবনাগুলো পরের দিকে মহাভারত থেকে হিন্দুদের মাথায় বসে গেছে। এগুলো এক একটা মডেল। আপনি একটা জিনিষকে ব্যাখ্যা করতে চাইছেন, কিন্তু তার কোন ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছে না, তখন আপনি একটা মডেল দিয়ে জিনিষটার ব্যাখ্যা করে দিলেন। ওই মডেলের মাধ্যমে যখন জিনিষটার একটা যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া হল তখন জিনিষটা স্পষ্ট হয়ে যাবে। তাই বলে ওই মডেলটাই সব কিছুকে পরিষ্কার করে দেবে তা নয়, বিশ্লেষণ করলে এরও অনেক ফাঁক ফোকর বেরিয়ে আসবে। এই জগতে ঈশ্বরই সত্য বাকি সব মিথ্যা। কবিতায় যতই বলা হোক না কেন সবার উপর মানুষ সত্য, মানুষ কখন সত্য হতে পারে না। মানুষ যদি সত্য হত তাহলে বিবর্তনে মানুষ সবার শেষে আসত না। মানুষ যদি সত্য হত তাহলে মানুষের অস্তিত্ব নিয়ে এত ভয় থাকত না। প্রকৃতিও মানুষকে সব কিছু ছেড়ে দেয় না। সেইজন্য সবার উপরে মানুষ সত্য হতে পারে না। আমাদের কাছে সবার উপর মানুষ সত্য হতে পারে। কারণ আমরা যখন ভালোবাসব তখন মানুষকেই ভালোবাসব, মারামারি যখন করব তখন মানুষের সাথেই করব, ক্ষতি যখন করব তখন মানুষেরই ক্ষতি করব। সত্য একমাত্র ঈশ্বর বা সচ্চিদানন্দ। ঠাকুর বলছেন, মায়ার জগতে এটা থেকে সেটা হয় আর সেটা থেকে এটা হয় বলা যায় না। যদি না বলা যায় তাহলে প্রারব্ধকেও শেষ কথা বলা যাবে না।

কর্মবাদের ইতিবাচক দিক হল কর্মবাদ সব দোষ নিজের উপর নিয়ে নেয় – তাই কর্মবাদে বলে আমার আজকের দুরবস্থার জন্য আমিই দায়ী। কিন্তু কর্মবাদই যে পুরোপুরি সত্য তা বলা যাবে না। ঠাকুর যেভাবে বলছেন ঈশ্বরই সত্য, ওই অর্থে নয়। প্রারব্ধ থিয়োরি আবার সুবিধাবাদীদের স্বার্থসিদ্ধি করার জন্য অনেক সুযোগ খুলে দেয়। দুর্বল যখন খারাপ কাজ করে তখন তাকে বলবে তুমি একটা অপদার্থ, আর বলবান ক্ষমতাবান যখন খারাপ কাজ করে তখন বলবে ঠাকুরের ইচ্ছা। দুর্বল যখন মার খায় তখন বলবে তোমার প্রারব্ধে ছিল, আর ক্ষমতাবান যদি মার খায় তখন সবাইকে উল্টে মার দিতে শুরু করবে। এগুলোই শঠতা। কংসও এখন প্রারব্ধের কথা বলে দেবকী আর বসুদেবকে সান্ত্বনা দিচ্ছে। এর ঠিক উল্টো ব্যাপার দ্রোণাচার্যের জীবনে পাওয়া যায়। রাজা দ্রুপদ তাঁর পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্নকে অস্ত্র শিক্ষা নেওয়ার জন্য দ্রোণাচার্যের কাছে পাঠিয়েছেন। সবাই দ্রোণাচার্যকে বলছে – আচার্য! আপনি একে অস্ত্র শিক্ষা দিতে যাবেন না, ধৃষ্টদ্যুম্ন তো আপনাকে মারার জন্যই জন্ম নিয়েছে। দ্রোণাচার্য তখন বলছেন ‘ও যদি আমাকে মারার জন্যই জন্ম নিয়ে থাকে, এখন আমি ওকে শিক্ষা দিই আর নাই দিই ওতো আমাকে মারবেই, তাহলে আমি আমার স্বধর্মকে কেন পরিত্যাগ করব! আমার কাজ হল শিক্ষা দেওয়া, আমি শিক্ষা দিলেও ওর হাতে আমার মৃত্যু হবে, আমি শিক্ষা না দিলেও আমি ওর হাতেই মারা যাবো’। এই হচ্ছে মহাভারতের শিক্ষা। মহাভারত দৈবকে কখন উপরেও নিয়ে যাবে না, নীচেও নিয়ে যাবে না। দু দিকটাই বলবে, বলার পর স্বধর্মকে সিংহাসনে বসিয়ে দিয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে আসবে। মহাভারতের মূল শিক্ষাই হল, তুমি যেটাই করো বাপু, তোমার স্বধর্মকে কখন ছেড়ো না। যদি দেখো স্বধর্ম করতে গিয়ে তুমি বিপদে পড়ে যাচ্ছ, তাও তুমি স্বধর্ম পালন করে যাবে। স্বধর্ম করতে গিয়ে যদি দেখ তোমার বিরাট লাভ হচ্ছে, তাও স্বধর্ম করবে।

কংস এখানে নিজের স্বধর্মকে বিসর্জন দিয়ে অধর্ম করে গেল। তোমার যদি প্রারব্ধে এতই বিশ্বাস থাকে তাহলে যখন দৈববাণী হল তখন তুমি বল – ঠিক আছে আমার মৃত্যু যখন অষ্টম পুত্রের হাতে ঠিক হয়ে আছে আমি আমার স্বধর্মে থাকব। কি স্বধর্ম? আমার বোনকে আমি রক্ষা করব, রাজার ধর্ম হল প্রজা রক্ষা,

আর এরা আমার শুধু প্রজাই নয়, দেবকী আর বসুদেব আমার বোন ও ভগ্নীপতি, এদের সন্তানরা আমার ভাগ্নে, একদিকে আমার প্রজা অন্য দিকে আমার নিকটতম আত্মীয়, এদের রক্ষা করাটাই তো আমার স্বাভাবিক স্বধর্ম। কংস সেদিকে গেলই না, প্রাণপন চেষ্টা চালিয়ে গেল কীভাবে সদ্যোজাত শিশু গুলোকে বধ করতে পারি। এই করে সে আরও বিপদের দিকে এগিয়ে গেল। অন্য দিকে পরীক্ষিৎ যখন শুনলেন সাত দিনের মধ্যে তাঁর তক্ষকের দংশনে মৃত্যু হবে তখন পরীক্ষিৎ কি করলেন? ঠিক আছে, প্রারব্ধের সামনে আমি নত, আমি এই সাত দিন শুধু ভাগবত কথা শুনে যাব। প্রারব্ধের এই মডেলকে যাঁরা সৎ পুরুষ, ভালো মানুষ তাঁরাই নিজের আত্মোন্নতির জন্য ব্যবহার করেন। আর বদমাইশরা এটাকেই নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ব্যবহার করে।

আসলে কর্মবাদ সাধারণ লোকেদের জন্য নয়, কর্মবাদের সিদ্ধান্ত সাধুপুরুষদের জন্য। সাধুপুরুষ কারা? যাঁরা সব সময় সৎসঙ্গ নিয়েই থাকেন, শাস্ত্র কথা শুনছেন, শাস্ত্রের কথা মনন চিন্তন করছেন, জপ-ধ্যান করছেন, সৎ ভাবে জীবন-যাপন করছেন তাঁরাই সাধুপুরুষ। তাঁদের প্রারব্ধকে মেনে নিতে হয়। কিসের জন্য? নিজের আত্মোন্নতির জন্য, আমার সাংসারিক উন্নতি অবনতি সব প্রারব্ধেই আসবে যাবে কিন্তু ঈশ্বর লাভের চেষ্টা, নিজের আত্মোন্নতির চেষ্টার জন্য আমাকে খাটতে হবে। হিন্দু ধর্মের শাস্ত্র বলে আধ্যাত্মিক জীবনে তোমাকে সাধনা করে যেতে হবে। সাধনা মানে, নিজের আত্মোন্নতির জন্য, ঈশ্বর লাভের জন্য চেষ্টা করতে হবে আর জাগতিক ব্যাপারটা প্রারব্ধের উপর ছেড়ে দিতে হবে। কিন্তু আমরা কি করছি? আত্মোন্নতি ও ঈশ্বর লাভের চেষ্টাটা প্রারব্ধের উপর ছেড়ে দিই আর জাগতিক উন্নতির জন্য পুরোদমে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাই। বেশীর ভাগ ভক্তরাই বলে, ঠাকুরের ইচ্ছা হলে তিনিই আমাকে দিয়ে শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়ে নেবেন, তাঁর ইচ্ছা হলেই আমার মনে জপ-ধ্যান করার ইচ্ছা জাগবে। কিন্তু খাওয়া-দাওয়া, আমোদ-আহ্লাদের করার সময় একবারও তাদের মনে হয় না ঠাকুরের ইচ্ছা হলে সব হয়ে যাবে। আমোদ-আহ্লাদ করার সুযোগ না পেলে, করতে গিয়ে একটু কোথাও বাধা পেলে ফোঁস করে উঠবে। কংস ঠিক এই কাজটাই করছে, নিজের জীবন সংশয়ের দৈববাণী শুনে সবাইকে অতিষ্ঠ করে তুলছে, সদ্যোজাত ভাগ্নেদের পাথরের দেওয়ালে আছাড় মেরে বধ করছে আর দেবকী ও বসুদেবের কষ্টের সময় তাঁদের প্রারব্ধের জ্ঞান দিচ্ছে। কিন্তু শাস্ত্র বলছে জাগতিক ভোগে নিজের প্রারব্ধের উপর ছেড়ে দেবে আর যোগের ক্ষেত্রে চেষ্টা করতে হবে।

কংস তার শঠতার মুখোসকে আড়াল করার জন্য আরও বলছে 'দেখো দেবকী! মাটি দিয়ে কত জিনিষ তৈরী হচ্ছে আবার সেগুলো ভেঙেও যাচ্ছে, কিন্তু তাতে মাটির কোন বিকার হয় না। ঠিক তেমনি এই শরীর তৈরী হচ্ছে আবার বিনাশ হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু আত্মাতে কোন বিকার হয় না। তুমিও সেই আত্মা, তোমার মৃত সন্তানরাও সেই আত্মা, সেইজন্য তুমি এদের জন্য শোক কোরো না'। এগুলোই হল শঠতার চরম অবস্থা। কংস শাস্ত্রের কথা ভালো করেই জানতো, কিন্তু নিজের উপর যখন আঘাত আসে তখন আত্মাকে না দেখে নিজের শরীরকেই বেশী বোঝে, আর অপরের উপর যখন আঘাত আসে তখন তাকে আত্মার কথা শোনায়। কংস আরও বলছে – যাদের এই তত্ত্বজ্ঞান জন্মায়নি, আর যত দিন এই অজ্ঞান দূর না হয় ততদিন এই সংসারের নিবৃত্তি আসবে না, জন্ম-মৃত্যু চলতেই থাকবে। যারা মনে করে আমি মারছি, আমাকে মারছে, আমি মারা যাচ্ছি, তারা আত্মাকে না জেনে শরীরের জন্ম-মৃত্যুকে নিজের ওপর আরোপ করে সে অপরকে দুঃখ দেয় এবং নিজেও দুঃখ পায়। এগুলোকেই বলে ভূতের মুখে রামনাম।

দেবকী যখন দেখলেন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কংস তার কাজের জন্য নিতান্ত অনুতপ্ত ও দুঃখিত তখন তিনিও কংসকে ক্ষমা করে দিলেন। বসুদেবও কংসের সব অপরাধ মন থেকে মুছে ফেল কংসকে বলছেন ***শোকহর্ষভয়দ্বেষলোভমোহমদান্বিতাঃ। মিথো ঘ্নন্তং ন পশ্যন্তি ভাবৈর্ভাবং পৃথগ্‌দৃশঃ।।১০/৪/২৭।*** দেবকী একজন ঋষিকা, এর আগের আগের জন্মে কত তপস্যা করেছিলেন, বসুদেব তাঁর স্বামী, সেই বসুদেব খুব সুন্দর কথা বলছেন। মানুষের মনে যে শোক, হর্ষ, ভয়, দ্বেষ, লোভ, মোহ এবং মদ দেখা যায়, এগুলো আসে ভেদ দৃষ্টির জন্য। অভেদ দৃষ্টি, মানে যাঁর একত্ব বোধ হয়ে গেছে তাঁর মধ্যে এই ধরণের মনের আবেগ কিছুই থাকবে না। ঈশাবাস্যোপনিষদেও ঠিক একই কথা বলছেন *তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ*, যাঁর একত্ব বোধ হয়ে গেছে তিনি আর কি নিয়ে শোক করবেন আর কিসের জন্যই বা মোহ করবেন। আমাদের যত

দুঃখ-কষ্টের মূলে শোক আর মোহ। মানুষের জীবন একটু বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, এই দুটি শোক আর মোহ ছাড়া আর কোন কিছুই মানুষে জীবনে কাজ করে না। অভেদ দৃষ্টি না আসা পর্যন্ত শোক আর মোহ কিছুতেই যাবে না। অভেদ দৃষ্টি কখন আসে? ঈশাবাস্যোপনিষদের প্রথম মন্ত্রেই বলছেন – *ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ*, এই জগতে ঈশ্বর ছাড়া কিছু নেই, ঈশ্বরই সব কিছুতে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছেন, সেই ঈশ্বরকে দেখার চেষ্টা কর।

শ্লোকের শেষাংশটাও খুব সুন্দর, প্রথম অবস্থায় ভগবান ঢেলা দিয়ে ঢেলা ভাঙেন। গোবরের পোকাকে ভাতের হাড়িতে রাখলে গোবরের পোকা মরে যাবে। গৃহস্থকে যদি সন্ন্যাসী বানিয়ে দেওয়া হয় কেঁদে ভাসাবে। কিন্তু এটাই আশ্চর্যে যে, সবাই সেই সচ্চিদানন্দের সাথে এক হওয়ার জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছে। সেইজন্য দিনকাল কখন বদলায় না আর সমাজও কখন পালটায় না। সৃষ্টি যেখান থেকে বেরিয়েছে, সমগ্র সৃষ্টিটা জেনেই হোক আর না জেনেই হোক, সেই সচ্চিদানন্দের কাছে ফিরে যাবার আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছে। ঘড়ির যে পেণ্ডুলাম অনবরত দোল খেয়ে যাচ্ছে, সেই পেণ্ডুলামের মূল কেন্দ্রটা তার স্থিতির জায়গা। অথচ ওই জায়গাতে তার দোলার গতি সব থেকে বেশী হয়। আর যে কোণটাই সে স্থির হয় সেটাই তার সব থেকে বেশী চঞ্চলতার অবস্থান। আমাদের সবারই এই একই অবস্থা। যেটা আমাদের সব থেকে unstabled postion সেখানেই মনে হয় আমরা স্থিত আছি। সেই positionটা কোথায়? এই জগৎ। আর যে জায়গাটা বাস্তবিক stability, মানে ভগবান, সেখানেই maximum instability। সেইজন্য জপ-ধ্যান করার সময় মনের ছটফটানি সব থেকে বেশী হতে থাকে। যাদের জীবনে পেণ্ডুলামের সুইং যত কমতে শুরু হয় তত জগৎ আর ঈশ্বরের মাঝখানের ব্যবধানটা কমতে শুরু করে। যারা মারামারি করে বেড়াচ্ছে, যাদের জগতের প্রতি প্রচুর কামনা-বাসনা, তাদের যদি সচ্চিদানন্দের দিকে নিয়ে যাওয়া হয় তাহলে ভগবানকে অনেক কাঠ-খড় পোড়াতে হবে। তখন ভগবান এক বস্তু দিয়ে আরেক বস্তুকে নাশ করেন। যতক্ষণ অশ্রুপাত না হবে ততক্ষণ আধ্যাত্মিক পথে কেউ উন্নতি করতে পারবে না। যাদের জীবন হাসি আনন্দে ভরপুর তারা আর যাই হোক আধ্যাত্মিক পথে এগোতে পারবে না। সুখ আর ভগবান দুটো বিপরীত, সুখ থাকলে ভগবানকে পাওয়া যাবে না।

আসলে তিনি এক বস্তু দিয়ে আরেক বস্তু ভাঙেন। আমাকে দিয়ে আপনাকে কষ্ট দেবেন, আপনাকে দিয়ে আমাকে কষ্ট দেবেন। এই পদ্ধতিতে চলতে থাকলে আমার প্রতি আপনার যে মোহ, আপনার প্রতি আমার যে মোহ, এই মোহটা চলে যাবে। মোহ চলে গেলে আমি আপনি কোন দিকে যাবো? তখন আরেকজন কাউকে ধরবো। এখানেও কিন্তু সে ঈশ্বরের দিকেই এগোচ্ছে। আরেক ধাপ বাড়লো মানে তার পাত্রতাটা একটু বাড়লো। ঈশ্বরের দিকে কারা যাবে? নরেনের মত মানুষ যাবে। ঈশ্বরের দিকে যাওয়ার আগে নরেনকে তিনি এমন এক ধাক্কা মারলেন যে দুটো ডাল-ভাতও জুটছে না। এটাই বসুদেব কংসকে বলছেন, ভগবান এক বস্তু দিয়ে আরেক বস্তুকে নাশ করেন, এক ভাব দিয়ে আরেকটি ভাবকে নাশ করেন। এগুলো তিনি করেন যাতে পুরো সৃষ্টিটা সেই সচ্চিদানন্দের দিকে ফেরত যেতে পারে। যারা মনে করবে আমার এই দুঃখ-কষ্ট এসেছে ঈশ্বরের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য, তারা একটু তাড়াতাড়ি ফেরত যাবে। যাদের এই ভাব আসবে না, তাদেরকে আরও বেশী দুঃখ-কষ্টের মধ্যে মার খেতে হবে, খেতে খেতে যখন চেতনা আসবে তখন সচ্চিদানন্দের দিকে ফেরত যাওয়ার যাত্রা শুরু হবে।

পার্ষদদের বাক্যে কংসের বুদ্ধিবিভ্রম

যাই হোক কংস মনে মনে ঠিক করে ফেলেছে দেবকী আর বসুদেবকে কারাগারের বন্দীদশা থেকে মুক্ত করে দেবে। সে তখন তাঁদের দুজনের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে নিজের গৃহে ফিরে এসেছে। পরের দিন কংস নিজের মন্ত্রীদের ডেকে যোগমায়ার কথা, যোগমায়া যা যা বলেছে সব বলল। কংসের মন্ত্রীরা নীতিশাস্ত্রে খুব নিপুণ ছিল না। ভাগবত কংসের মন্ত্রীদের বলছেন *ন অতি কোবিদাঃ*, কবি মানে হয় যারা নীতি নিপুণ। আবার কবি মানে এও হয়, যাঁরা ক্রান্তদর্শি। যাঁরা নীতি নিপুণ হন তাঁরা জানেন কোন কোন নীতি অবলম্বন করলে জীবনে মঙ্গল হতে পারে, এবং সেই দিকে তাঁদের দৃষ্টি থাকে। যদি সেই নীতিকে অবলম্বন করতে গিয়ে প্রাথমিক কোন বিপর্যয় হয়, সেই ক্ষতিটাও মেনে নিতে হয়। নীতি মানে এটাই। ছোট জিনিষ পাওয়ার জন্য

বড় জিনিষকে কখন ত্যাগ করতে নেই, এটাই নীতি। গীতাতেও বলছেন, কিছু জিনিষ আছে যা প্রথমে সুখ দেয়, কিন্তু পরে শুধু দুঃখ আর দুঃখই দেয়। আবার কিছু জিনিষ আছে প্রথমে দুঃখ দেবে কিন্তু পরে গিয়ে সেটাই শুধু সুখ দিতে থাকবে। আবার কিছু জিনিষ প্রথমেও দুঃখ দেয়, পরেও দুঃখ দেয়। যাঁরা নীতি নিপুণ তাঁরা দীর্ঘকালীন সুখের জন্য প্রাথমিক দুঃখটা গ্রহণ করে নেন। আমাদের সমস্যা হল, আমরা যতই শাস্ত্র অধ্যয়ন করি না কেন, মুখে যত কথাই বলি না কেন, অন্তিমে কোথাও আমাদের মনে একটা ভাব সব সময় ধাক্কা মারতে থাকবে যে, চোখ বুজলে সব শেষ। রাত্রিবেলা যখন নিদ্রাতে চলে যাচ্ছি তখন একটা দিনের অবসান হয়ে যায়, আর শেষ যাত্রার জন্য চোখ বুজছি তখন একটা জীবনের অবসান হয়ে যাচ্ছে। এই জীবনের মত তখন সব শেষ হয়ে গেল। আমরা যতই মুখে বলি, স্বর্গে যাবো, পুনর্জন্ম আছে এই দুটো ভাবে যুগপৎ আমাদের মনের মধ্যে খেলা করে যাচ্ছে – একদিকে অনন্তের ভাব, মৃত্যুর পরেও আমি শেষ হয়ে যাচ্ছি না আর অন্য দিকে একটা ভাব চোখ বুজলেই সব শেষ। আমাদের সব আচরণ এই দুটো ভাবের উপর খেলা করতে থাকে। মৃত্যুর পরেও আমার এই জীবন চলতে থাকবে, এই বোধ যদি দৃঢ় বিশ্বাসে মনের মধ্যে গেঁথে যায় তাহলে আমাদের সমগ্র জীবনযাত্রা ও জীবনের আচরণটাই আমূল ভাবে পাল্টে যাবে। নীতি মানে, এই বোধ মাথায় রেখে সব কাজ করে যাওয়া।

ইংরেজীতে একটা প্রবাদ আছে IWNBT and UWNBT। IWNBT মানে I will not be there আর UWNBT মানে You will not be there। এর সরল অর্থ হল লুটেপুটে খাওয়া, এখন যত পারো লুটে পুটে খেয়ে যাও, পরে আমিও থাকবো না, তুমিও থাকবে না। বর্তমান রাজনীতি মানে এটাই, এখন যারা ক্ষমতায় আছে তারা যা কিছু করে যাচ্ছে, যা কিছু নীতি নির্ধারণ করছে এর পরিণাম কি হবে কেউ ভাবছে না। কিছু বছর পরে যখন ঝামেলা আসবে তখন এখন যারা ক্ষমতায় আছে তারাও থাকবে না, বিরোধী যারা আছে তারাও থাকবে না। তাই ভাই এসো, আমরা সবাই মিলেমিশে লুটে পুটে নিই। যা ঝামেলা আসার সব পরে আসবে, তখন আমাদের সন্তানরা, নাতিরা সামলাবে। এগুলোকে নীতি বলে না। নীতি মানে, আমি চিরদিনই থাকবো, হয় স্বর্গে থাকবো নয় অন্য কোথায় থাকবো, কিন্তু পরে তো আমাক স্বর্গ থেকে মর্ত্যভূমিতেই নেমে আসতে হবে। এই বোধটা আসে ধর্মের দিক দিয়ে। কিন্তু যখন এটাকেই আধাত্মিকতার দৃষ্টিতে দেখা হবে তখন কোন ভাবেই নিজের লোভের জন্য, নিজের স্বার্থের জন্য কখনই এভাবে এগোবে না। প্রাণরক্ষার জন্য যদি কিছু করতে হয় তখন না হয় দেখা যাবে কিন্তু আধ্যাত্মিক পুরুষরা কখনই নিজের লোভ বা লাভের জন্য কোন কিছুর সঙ্গে আপোষ করবেন না। যারা সংসারে আছে তাদের পক্ষে আধ্যাত্মিক আদর্শকে ধরে রাখা সম্ভব নয়। ঠাকুর বলছেন সত্যই কলির তপস্যা। কিন্তু যারা সংসার করছে তাদের তপস্যা করতে গেলে সংসার ছেড়ে জঙ্গলে চলে যেতে হবে। যাঁরা পুরোপুরি আধ্যাত্মিক পথ বেছে নিয়েছেন তাঁদের আর নিজের লোভ আর লাভের জন্য কিছু করা চলে না। তাহলে সংসারীরা কীভাবে চলবে? তাদের জন্য নীতিশাস্ত্র। সন্ন্যাসীদের পথ পরিষ্কার, সন্ন্যাসীদের নিজের স্বার্থ বলে কিছু থাকে না, ব্যক্তিগত কোন চাহিদাও থাকে না, নিজের কোন স্বার্থ ও ব্যক্তিগত চাহিদা থাকে না বলে তাঁকে চুরি করতেও হয় না, মিথ্যে কথা বলারও প্রয়োজন হয় না। সংসারী কীভাবে নীতি অবলম্বন করে চলবে? কোন পরিস্থিতিতে তাকে চুপ করে থাকতে হবে, একটা অবস্থায় কথা বলতে হবে কিনা, একটা অবস্থায় মিথ্যা কথা বলা যাবে কিনা, কোন অবস্থায় মিথ্যা কথা বলতে হবে, এগুলো সব নীতি। যাঁরা এই ধরণের নীতি নিপুণ তাঁদের বলে কোবিদ। কবি আর কোবিদ এই দুটো শব্দ আমাদের শাস্ত্রে অনেকবার আসে। কবি মানে যাঁরা পুরো জিনিষটা দেখতে পান, সেই জিনিষের ভূত, ভবিষ্যত ও বর্তমান পরিষ্কার দেখতে পান। জিনিষটা যেমনটি আছে তেমনটি দেখেন, শাস্ত্রের দর্শন তাঁরা ঠিক ঠিক বোঝেন এবং তাঁর ব্যাখ্যাও ঠিক ঠিক দেন।

এখানে বলছেন কংসের মন্ত্রীরা কেউ কোবিদ ছিল না। কংসের মুখে সব শুনে কংসের পার্ষদরা তখন কংসকে বোঝাচ্ছে যে, একবার যখন দৈববাণী হয়ে গেছে তখন আমাদের অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে। পুত্রের জায়গায় কন্যা হয়ে এখন অন্য রকম হয়েছে, তার মানে কিছু গোলমাল আছে। আপনি এখনই একেবারে নিশ্চিন্ত হবেন না। তার চেয়ে বরং আজই নগর, গ্রাম, ব্রজভূমি এবং অন্যান্য স্থানে দশদিনের বেশী বা কম

বয়সের যত শিশু আছে, সবাইকে আমরা হত্যা করব। যিশু খ্রীষ্টের জীবনেও আমরা ঠিক এই ধরণের ঘটনা দেখতে পাই। যিশুর জন্মের আগেই সেখানকার রাজার কাছেও এই ধরণের একটা খারাপ খবর ছিল। উনিও তখন এই রকমই করেছিলেন, সব শিশুগুলোকে শেষ করে দাও। তার আগেই যিশুকে নিয়ে বাবা-মা পালিয়ে গিয়েছিলেন। কংসের মন্ত্রী আমলারা সবাই মিলে কংসকে বোঝাচ্ছে দেবতাদের উপেক্ষা করা ঠিক হবে না।

আমাদের মনে রাখতে হবে আমরা পুরাণধর্মী শাস্ত্র আলোচনা করছি। পুরাণে নানা রকমের কাহিনী থাকে, আর ওই কাহিনীগুলো খুব বড় আকারে বলা হয়, যাতে মানুষের মনে ভাবটা ঠিক ঠিক ভাবে দানা বাঁধতে পারে। মানুষের বুদ্ধি অতি সাধারণ, আমাদের পক্ষে উচ্চ তত্ত্বকে ধারণা করা খুব কঠিন। আমাদের মস্তিষ্ক পাথরের দেওয়ালের মত নিরেট শক্ত। ঠাকুর পাথরের দেওয়ালের উপমা দিয়ে বলছেন, পাথরের দেওয়ালে পেড়েক মারতে গেলে পেরেকই বেঁকে যাবে। পুরাণ রচয়িতারা তাই যেখানে পেরেক মারা যাবে না, পিন যাবে না, সেখানে খুব বড় একটা বোমা ফাটান। এইসব কাহিনীগুলো হল বোমা ফাটানো। আধ্যাত্মিক তত্ত্ব ধারণা করার বুদ্ধি পুরো আলাদা জিনিষ। কিন্তু আমাদের বুদ্ধি এতই ভোঁতা যে এই ভোঁতা বুদ্ধি দিয়ে জাগতিক কাজও সুষ্ঠু ভাবে সম্পাদন করা যায় না, সেখানে আমরা চাইছি উচ্চ আধ্যাত্মিক তত্ত্ব ধারণা করতে। সেইজন্য আমাদের শাস্ত্রকাররা বুম্ বুম্ করে বোমা ফাটিয়ে চলে গেছেন। আচার্য শঙ্কর তিন ধরণের শিষ্যের কথা বলেছেন – প্রথম শিষ্যকে গুরু একবার একটা দুটো তত্ত্ব কথা বলা মাত্রই শিষ্যের জ্ঞান হয়ে যায়। মধ্যম শিষ্যকে গুরু কখন এইভাবে কখন ওইভাবে বোঝাতে থাকেন, সাধনা করিয়ে নেন। অধম শিষ্যদের মন্দ বুদ্ধি, এদেরকে গুরু কিছু বোঝাতে গেলে তারা বিপরীত বোঝে।

পুরাণ রচয়িতারা জানেন ভারতের বেশীর ভাগ লোকের মধ্যম আর মন্দ বুদ্ধি। উত্তম বুদ্ধির অধিকারীরা তো উপনিষদের ঋষিদের দিকে চলে গেছে। এখন বাকি দুই ধরণের শিষ্যদের জন্য পুরাণের ঋষিরা বোমা ব্যবহার করছেন। ঠাকুর বলছেন শাস্ত্রে চিনিতে বালিতে মিশেল আছে, শাস্ত্রে কিছু তত্ত্ব কথা আছে কিন্তু তার থেকে বেশী কাহিনী তৈরী করা হয়েছে। কাহিনীর মধ্যে যদি বেশী ডুবে যায় তাহলে কিন্তু তত্ত্ব কথাগুলো হারিয়ে যাবে। কাহিনীকে আধার করে আমাদের তত্ত্বের দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। এতক্ষণ আমরা কিছু তত্ত্বের দিকগুলোকে আলোচনা করলাম। এরপর প্রচুর কাহিনী আসবে, কাহিনীর আড়াল থেকে আসল তত্ত্বটা উদ্ধার করার জন্য আমাদের অনেক কিছু আলোচনা করতে হবে। ভাগবত এখানে কংসের মন্ত্রী আমলাদের সব দৈত্য রূপে বর্ণনা করছে। কংস নিজে ছিল তখনকার দিনের খুব নামকরা বংশ ভোজবংশের রাজা, অথচ তার মন্ত্রীরা সবাই রাক্ষস দৈত্য হবে এটা ঠিক যুক্তিতে দাঁড়ায় না। খুব দুষ্ট ও বদমাইশ লোক হতে পারে, বদমাইশ, ক্রূঢ়, হিংস্র লোক তো সব কালেই আছে। তবুও ভারতের মত জায়গায় সব শিশুদের গলা কেটে দেওয়া হবে, এই ঘটনা খুবই অস্বাভাবিক। কিন্তু এই ধরণের দৃশ্য যতক্ষণ না দেখানো হবে ততক্ষণ আসুরিক বৃত্তি কাকে বলে আমরা ধারণা করতে পারবো না। সেইজন্য আজও আমরা কংস, রাবণ এই নামগুলো ক্রূঢ় ভাবের লোকদের বিশেষণ রূপে ব্যবহার করি। কারণ কংস, রাবণ এই ধরণের চরিত্র চিত্রণের মাধ্যমে পুরাণ রচয়িতারা ক্রূঢ়তা, নিষ্ঠুরতার ভাবকে একটা চরমে নিয়ে গেছেন। এই চরমে যদি না নিয়ে যাওয়া হয় তাহলে এই চরিত্রগুলো আমাদের মনে ছাপ ফেলতে পারবে না। গণ্ডারের চামড়াতে তলোয়ার চালালে কিছুই হবে না, পাথরের দেওয়ালে যতই পেরেক ঠুকুন কিছুই হবে না, যতক্ষণ না বোমা মারা হচ্ছে ততক্ষণ কিছু হবে না। এগুলো হল বোমা মারা।

মন্ত্রীরা কংসকে বোঝাচ্ছে ***যথাহাহহময়োহঙ্গে সমুপেক্ষিতো নৃভির্ন শক্যতে রূঢ়পদশ্চিকিৎসিতুম্। যথেন্দ্রিয়গ্রাম উপেক্ষিতস্তথা রিপুর্মহান্ বদ্ধবলো ন চাল্যতে।।১০/৪/৩৮।*** 'আপনার শরীরের যদি রোগ হয় আর সেই রোগের চিকিৎসা না করে রোগকে শেকড় বিস্তারের সুযোগ করে দেন তাহলে কিন্তু পরে এই রোগ চিকিৎসার অসাধ্য হয়ে যাবে'। শুধু রোগ নয়, যে কোন জিনিষকে, তা ভালো হোক মন্দ হোক, যদি শেকড় বিস্তারের সুযোগ করে দেওয়া হয়, একটা সময় সেই জিনিষটাই আপনাকে বিনাশের দিকে নিয়ে যাবে। যাঁরাই এখানে শাস্ত্র কথা শুনতে এসেছেন তাঁরা সবাই সত্ত্বগুণী লোক, সত্ত্বগুণী না হলে এত ধৈর্য ধরে শাস্ত্র কথা শুনতেই পারবে না। সত্ত্বগুণী মানুষের মধ্যে একটা দুটো গুণ থাকে যা সচারচর মানুষের মধ্যে দেখা যায় না।

বিচার করলে দেখা যাবে, ওই গুণকে অর্জন করতে তাকে অনেক দিন ধরে অনুশীলন করতে হয়েছে। এইভাবেই মানুষের মধ্যে শুভ সংস্কার তৈরী হয়। যেমন শৌচ, আমাকে পরিষ্কার থাকতে হবে, নিয়মিত সকালে স্নান করতে হবে, এগুলো অনেক দিন ধরে অনুশীলন করতে করতে শৌচের একটা শেকড় ভেতরে ঢুকে গেছে। এই শৌচের অভ্যাসকে আর সহজে পালটানো যাবে না। যাঁরা শীত-গ্রীষ্ম রোজ ভোরবেলা স্নান করে যাচ্ছেন, কোন কারণে যদি একদিন স্নান না করতে পারেন সেদিন তাঁর শরীরে একটা অস্থিরতা বোধ আসবে, আসতে বাধ্য। অশুভ সংস্কারের ক্ষেত্রেও একই জিনিষ হয়। শরীরের ব্যাধির ক্ষেত্রেও তাই হবে। প্রথমেই চিকিৎসা করে ব্যাধিকে সারিয়ে নিতে হবে। যদি ছেড়ে দেওয়া হয় তাহলে সেই ব্যাধির শেকড় এমন ভাবে সারা শরীরের ছড়িয়ে পড়বে তখন আর তাকে সারানো যাবে না। মন্ত্রীরা কংসকে ঠিক এই উপদেশ দিচ্ছে – প্রথম অবস্থাতেই আপনার শত্রুকে নাশ করে দিন। এই শিশু একবার বড় হয়ে গেলে তখন একে সামলানো আপনার পক্ষে খুব বিপজ্জনক হয়ে যেতে পারে।

এর পরের শ্লোকেও খুব দামী কথা বলা হচ্ছে ***মূলং হি বিষ্ণুর্দেবানাং যত্র ধর্মঃ সনাতনঃ। তস্য চ ব্রহ্ম গোবিপ্রাস্তপো যজ্ঞাঃ সদক্ষিণাঃ।।১০/৪/৩৯।*** এখানে যদিও মন্ত্রীরা কংসকে বলছেন, কিন্তু এই কথাগুলো তত্ত্বের দিক থেকে একেবারে শেষ কথা। কেন শেষ কথা? এখানে হিন্দু ধর্মের চরিত্রকে নিয়ে বলছে। *মূলং হি বিষ্ণুর্দেবানাং*, যেখানেই বিষ্ণু সেটাই সনাতন ধর্মের মূল, সেটাই দেবতাদের প্রতিষ্ঠান। এখানে সনাতন ধর্ম বলতে বলছেন, ঋষিদের ধর্মই সনাতন ধর্ম, বাকি সব ধর্ম আসবে যাবে, ঋষিদের ধর্মই থাকবে। সনাতন ধর্মের শেকড় আর কোথায়? *তস্য চ ব্রহ্ম গোবিপ্রাস্তপো যজ্ঞাঃ*, এখানে ব্রহ্ম মানে বেদকে বোঝাচ্ছে, হিন্দু ধর্মের সনাতন হল বেদ, গো, ব্রাহ্মণ, তপস্যা আর দক্ষিণাযুক্ত যজ্ঞ। *যজ্ঞা সদক্ষিণাঃ*, শ্লোকের এই কথাটা খুব মজার। এই ধরণের শ্লোককে আধার করেই হিন্দু ধর্মের নিন্দুকরা বলে – ব্রাহ্মণরা খুব লোভী আর বদমাইশ ছিল, যাতে দক্ষিণা পেতে পারে সেই উদ্দেশ্য এই সব কথা শ্লোকের মাধ্যমে বলা হয়েছে। কিন্তু ব্যাপারটা তা নয়। যাঁরা ইতিহাস লেখেন বা ইতিহাসের ঘটনা বিশ্লেষণ করেন, তাঁরা যদি আচার্যের মুখে পরম্পরাগত শাস্ত্র অধ্যয়ন না করে থাকেন তখন ইতিহাস লিখতে গিয়ে অনেক ভ্রান্ত ধারণার জন্ম দিয়ে দেন।

গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে আমাদের সব কর্মকেই যজ্ঞ রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। আমরা যে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নিচ্ছি এটাও যজ্ঞ, আমরা গীতা পাঠ করছি এটাও একটা যজ্ঞ, স্বাধ্যায়কেও যজ্ঞ রূপে বলা হয়েছে। আমরা যখন জপ করছি এটাও যজ্ঞ, খাওয়া-দাওয়া করছি সেটাও যজ্ঞ। কিন্তু সব কর্মকে যজ্ঞ রূপে গ্রহণ করার এই দৃষ্টিভঙ্গী খুব উচ্চ আধ্যাত্মিক পুরুষের জন্য। যাঁরা এখনও ধর্মের পথ অনুসরণ করে চলেছেন, বেশীর ভাগ মানুষ ধর্মের পথেই আছে, এদের জন্যই *সদক্ষিণাঃ যজ্ঞ*। ঠাকুর বলছেন সাধুর কাছে খালি হাতে যেতে নেই। ঠাকুর নরেন, রাখালকে এই কথা বলছেন না, কারণ এনারা হলেন উচ্চ আধ্যাত্মিক আধার। যাঁরা সাধু সন্ন্যাসী তাঁদের জন্যও সদক্ষিণা যজ্ঞ নয়। কিন্তু যাঁরা গৃহস্থ, সংসারী মানুষ তাঁদের জন্য সদক্ষিণা যজ্ঞ। তা নাহলে সংসারীরা বলবে, আমি তো জপ করছি, আমিও খাওয়া-দাওয়া করছি, আমিও শাস্ত্র অধ্যয়ণ করছি, আমারও তো যজ্ঞ করা হয়ে গেল। সংসারী লোক সব কর্মকে যজ্ঞ রূপে নেওয়ার জন্য এখনও প্রস্তুত নয়, কারণ তাঁদের কর্মের মধ্যে এখনও অনেক কামনা-বাসনা লেগে আছে। তাহলে কারা প্রস্তুত? যাঁরা আধ্যাত্মিক পথে অনেক দূর এগিয়ে গেছেন। সংসারীদের জন্য বিধিবদ্ যজ্ঞ, কালীপূজা, দূর্গাপূজা করা বা পালাপার্বণে বাড়িতে পূজা করা এই ধরণের বিধিবদ্ কর্ম গুলোই সংসারীদের জন্য যজ্ঞ। সন্ন্যাসীদের এসবের প্রয়োজন হয় না, সকালে ঘুম ভাঙার পর থেকেই সন্ন্যাসীর যজ্ঞ শুরু হয়ে যায়। সন্ন্যাসী যা কিছু করছেন সবটাই তাঁর কাছে যজ্ঞ, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়াও যজ্ঞ। গীতায় যেমন বলছেন *অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেহপানং তথাহপরে*, খাওয়া-দাওয়া করাটাও যজ্ঞ, যখন খাচ্ছেন তখন এই যে ব্রহ্মার্পণং করে খাচ্ছেন তখন সেটাও যজ্ঞ হয়ে গেল। গৃহস্থরা এভাবে করতে পারবেন না, এর জন্য তাঁরা প্রস্তুত নন। সেইজন্য যজ্ঞ না বলে বলেছেন সদক্ষিণা যজ্ঞ। এই জিনিষটা আমাদের ঋষিরা, শাস্ত্রকাররা জানতেন, তাই এই সদক্ষিণা যজ্ঞের ব্যবস্থা করে দিলেন। কিন্তু নিন্দুকরা এটাকেই ব্রাহ্মণদের সুকৌশলে অর্থ আদায়ের একটা ব্যবস্থা বলবে।

সনাতন ধর্মের মূল ভিত্তি হল বেদ, গো, ব্রাহ্মণ, তপস্যা এবং দক্ষিণাযুক্ত যজ্ঞ। কংসের মন্ত্রীরা বলছে ***তস্মাৎ সর্বাত্মনা রাজন্ ব্রাহ্মণান্ ব্রহ্মবাদিনঃ। তপস্বিনো যজ্ঞশীলান্ গাশ্চ হন্মো হবির্দুঘাঃ।।১০/৪/৪০।*** 'সেইজন্য আমরা যত ব্রহ্মবাদী ব্রাহ্মণ আছেন, যত তপস্বী আছেন, যাজ্ঞিক এবং ঘৃতাদি যজ্ঞীয় হবিঃ পদার্থের উৎপত্তির উৎস যত গরু আছে এর সব কটাকে নাশ করে দেব'। কিন্তু এখানে এই ব্যাপারটা আমাদের কাছে অকল্পনীয়, কারণ এরা বলছে যত ব্রাহ্মণদের কেটে ফেলা হবে, তপস্বীদের কেটে ফেলা হবে, গরুগুলোকে কেটে ফেলা হবে, এই ব্যাপারটা হিন্দুরা কখনই মেনে নিতে পারবে না। মানুষকে কেটে ফেললে হিন্দুদের কাছে ঝামেলার কিছু হবে না, কিন্তু গরু কেটে ফেলা হচ্ছে শুনলে আঁৎকে উঠবে। এইভাবে বর্ণনা করার উদ্দেশ্য হল কংসের পার্শ্বচররা কত বিভৎস নৃশংস ছিল, এই ভাবটা আমাদের মনে বসিয়ে দেওয়া।

বিপ্রা গাবশ্চ বেদাশ্চ তপঃ সত্যং দমঃ শমঃ। শ্রদ্ধা দয়া তিতিক্ষা চ ক্রতবশ্চ হরেস্তনূঃ।। ১০/৪/৪১। এই শ্লোকটিও খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি শ্লোক। ভগবান হলেন নির্গুণ নিরাকার, কিন্তু হিন্দুরা সেই নির্গুণ নিরাকার ভগবানকে সগুণ সাকার রূপে কীভাবে দেখেন এখানে তার খুব সুন্দর বর্ণনা করা হয়েছে। সগুণ সাকার মানে ভগবানের একটি শরীর আছে। সেই শরীরটা কি রকম? ব্রাহ্মণ, গাভী, বেদ, তপস্যা, সত্য, শম, দম – শম মানে আমাদের দশটি ইন্দ্রিয়কে বাইরে নিগ্রহ করা, আর দম মানে ইন্দ্রিয়গুলোকে নিয়ন্ত্রণ করা – শ্রদ্ধা, দয়া, তিতিক্ষা ও ক্রতবো – ক্রতবো মানে যজ্ঞ, এগুলোই শ্রীহরির শরীর। তার মানে, যেখানেই ব্রাহ্মণ, গাভী, বেদ, তপস্যা, সত্য, শম, দম, শ্রদ্ধা, দয়া, তিতিক্ষা ও যজ্ঞ আছে সেখানেই ভগবান আছেন।

শ্রদ্ধা মানে কোন কিছুর প্রতি ভক্তি ও বিশ্বাস আছে, সেই ভক্তি ও বিশ্বাসের জোরে ওই রকমটি করতে চাওয়াকে বলে শ্রদ্ধা। যেমন এখানে আমরা শাস্ত্র আলোচনা করতে আসছি, আমাদের মধ্যে যদি শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা না থাকতো তাহলে আমরা এখানে আসতাম না। এখানে শ্রদ্ধা বলতে বোঝাচ্ছে গুরু উপদিষ্ট বেদান্ত বাক্যে বিশ্বাস। গুরু যে বেদান্ত বাক্যের উপদেশ দিয়েছেন, সেই বেদান্ত বাক্যের প্রতি বিশ্বাসকে বলা হয় শ্রদ্ধা। গুরু অনেক রকম কথা বলছেন, কিছু কিছু আদেশ দিচ্ছেন সেগুলোর প্রতি শ্রদ্ধাকে শ্রদ্ধা বলা হচ্ছে না, এখানে বেদান্ত বাক্যের উপর গুরু যে কথাগুলো বলছেন সেই বেদান্ত বাক্যগুলিকে বিশ্বাস করার উপর বেশী গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। গুরু দীক্ষার সময় আমাকে বলে দিলেন 'ঠাকুরই সত্য', এই বাক্যের উপর বিশ্বাস, এই বিশ্বাসের জোরে নিজের শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধিকে তৈরী করাকেই বলে শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধা আবার তিন রকমের – সাত্ত্বিক শ্রদ্ধা, রাজসিক শ্রদ্ধা এবং তামসিক শ্রদ্ধা। গীতার সপ্তোদশ অধ্যায়ে শ্রদ্ধার উপর বিস্তারিত আলোচনা আছে। দয়া মানে, সব জীবের প্রতি করুণার ভাব, আমার যেমন প্রাণ আছে তারও তেমন প্রাণ আছে, আমি কেন তাকে অযথা কষ্ট দেব! তিতিক্ষা মানে সমস্ত ধরণের কষ্টকে নির্বিবাদে সহ্য করা। প্রত্যেকরই শরীরের গঠন আলাদা, কারুর ঠাণ্ডাতে কষ্ট হয়, আবার কারুর গরমে বেশী কষ্ট হয়। ঠাণ্ডা গরম সহ্য করাকে তিতিক্ষা বলা হচ্ছে না।

মানুষ যত ভগবানের দিকে এগোয় ততই তার শরীর ও মন সংবেদনশীল হতে থাকে। যদি দেখা যায় কোন সাধু বা সন্ন্যাসীর মন সংবেদনশীল নয়, অপরের দুঃখ বা কষ্টকে বোঝার ক্ষমতা তাঁর মধ্যে নেই, তাহলে বুঝতে হবে সেই সাধু বা সন্ন্যাসীর মধ্যে কিছু গোলমাল আছে। স্বামীজী ছাত্রাবস্থায় মহা ডানপিটে ছিলেন, ঠাকুরও বলছেন নরেনের মধ্যে কত তেজ। কিন্তু পরবর্তিকালে যখন তিনি যেমন যেমন অন্তর্জগতে প্রবেশ করছেন ততই তাঁর মন নরম হতে আরম্ভ করেছে আর দেশের প্রত্যেকটি প্রাণীর জন্য তাঁর প্রাণ ছটফট করত। মানুষ আধ্যাত্মিক জগতে যত প্রবেশ করবে তার মন তত সংবেদনশীল হয়ে যাবে। সংবেদনশীলতা ভেতরে এসেছে কিনা বোঝা যাবে যখন মানুষ তাঁর কাছে নিজের দুঃখের কথা বলতে ছুটে আসবে। কারুর সন্তান মারা গেছে, সন্তানহারা পিতা বা মাতা এখন কোন সাধুর কাছে এসে দুঃখের কথা বলছে। সাধু তাদের এই বলে সান্ত্বনা দিচ্ছেন – আত্মা অজর অমর, এতে দুঃখ পাওয়ার কি আছে! তার মানে সাধু সংবেদনশীল নয়। এই ধরণের সাধুর কাছে কখন কেউ দুঃখ নিয়ে যাবে না। সাধুর কাছে দুঃখ নিয়ে কেউ না যাওয়া মানে সেই সাধুর এখনও আধ্যাত্মিক বিকাশ হয়নি। আধ্যাত্মিক বিকাশের সাথে সাথে সংবেদনশীলতারও বৃদ্ধি হবে। সংবেদনশীল

হলে তাঁর তিতিক্ষাটা কমে যাবে। কারণ শরীরের সহ্য করার ক্ষমতাটা কমে যায়। সেইজন্য তিতিক্ষা বিভিন্ন মানুষের ক্ষেত্রে তারতম্য হবে। তবে একটু সহ্য করতে হয়, সামান্য একটু মাথা ব্যাথা হল সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারের কাছে ছুটছে, একটু গা ম্যাজ্ ম্যাজ্ করছে আজকে আমি আর কাজকর্ম করতে পারবো না, জপ-ধ্যান করতে পারবো না। এইসব ক্ষেত্রে সবাইকে একটু সহ্য করতে হয়। শারীরিক একটু কষ্টের জন্য বেশী অস্থির হতে নেই আর অন্যকেও উদ্বিগ্ন করতে নেই। ঠাকুরেরও শরীর খারাপ হতো, ঠাণ্ডা লাগতো, পেটের গণ্ডগোল হত কিন্তু তিনি এই নিয়ে চেঁচামেচি করতেন না, আর সবাইকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলতেন না। তবে যাঁরা দিনরাত উপনিষদের ভাব নিয়ে পড়ে আছেন তাঁদের কাছে ব্রাহ্মণ, গাভী, তপস্যা, শম, দম, তিতিক্ষা, যজ্ঞ এগুলোর অতটা আর গুরুত্ব থাকে না। তবে গীতায় যেমন ভগবান বলছেন *ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্মসঙ্গিনাম্*, সাধারণ মানুষের আস্থা যাতে বিচলিত না হয় সেই দিকে খুব সতর্ক দৃষ্টি রেখে জ্ঞানীরা সেই রকম আচরণ করেন। সাধারণ মানুষের মধ্যে যাতে কোন ভ্রান্ত ধারণা না উৎপন্ন হয় সেইজন্য জ্ঞানীরাও এই কটিকে খুব শ্রদ্ধা করেন এবং প্রয়োজন হলে লোকশিক্ষার জন্য সেই রকম আচরণও করেন। শ্রীশ্রীমাও বলছেন – ঠাকুর ভাঙতে আসেননি তিনি গড়তে এসেছেন। টিকটিকি, হাঁচি সবই ঠাকুর মানতেন, সকালে কার মুখ দেখে উঠেছেন বলে রাখালের জ্বর হয়েছে সেটাও তিনি মানছেন।

শেষে বলছে ***স হি সর্বসুরাধ্যক্ষ্যো হ্যসুরদ্বিড় গুহাশয়ঃ। তন্মূলা দেবতাঃ সর্বাঃ সেশ্বরাঃ সচতুর্মুখাঃ। অয়ং বৈ তদ্বধোপায়ো যদৃষীণাং বিহিংসনম্।।*** *১০/৪/৪২।* এই বিষ্ণু হল সমস্ত অসুরদের শত্রু। এর আগে আমরা অনেক বার বলেছি যে দেবতা আর অসুর দুজনই কশ্যপ মুনির সন্তান, এদের মায়েরা আবার দুই সহোদরা। কিন্তু প্রথম থেকে এদের মায়েদের মধ্যে যেমন বিবাদ লেগে থাকত তেমনি সন্তানদের মধ্যেও অনবরত লড়াই লেগে থাকত। আসলে বিষ্ণু ঋষিদের হৃদয়গুহায় বাস করেন। সাধক সাধনা করে যখন ধ্যানের গভীরে যান তখন তিনি তাঁর হৃদয়ে ব্রহ্মজ্যোতি দর্শন করেন, ওই চৈতন্যজ্যোতি আর বিষ্ণু এক। সেই চৈতন্যজ্যোতি আর ব্রহ্মা এক, সেই চৈতন্যজ্যোতি আর শ্রীরামকৃষ্ণ এক। সেইজন্য বলা হয় তিনি যোগীদের হৃদয়গুহায় বাস করেন। তাই কংসের মন্ত্রীরা বলছে যত দেবতা আছে, ব্রহ্মা, শিব আছে সবার শেকড় হল এই বিষ্ণু। আর এই বিষ্ণু বাস করে ঋষিদের হৃদয়গুহায়। সেইজন্য আমরা সব ঋষিদের কেটে শেষ করে দেব। কথামৃতেও আছে, কে সব থেকে বড়? পৃথিবী, পৃথিবী থেকে বড় সূর্য্যলোক, চন্দ্রলোক, এদের সবার থেকে বড় ভগবান। ভগবান কেন বড়? বামন অবতারে তিনি তিনটে পায়ে সব কিছু মেপে নিয়েছিলেন। সেই ভগবানের পা থাকে ভক্তের হৃদয়, সেইজন্য ভক্তের হৃদয় সব থেকে বড়। সেইজন্য ভক্তগুলোকে কেটে দিলে ভগবান আর কোথাও থাকতে পারবেন না। মন্ত্রীরা কংসকে এইসব বুদ্ধি দিয়ে যাচ্ছে।

এরপর শুকদেব বলছেন, এমনিতে কংস নিজেই বুদ্ধিভ্রষ্ট ছিল, তার উপর কংসের সব সাগরেদরা এই সব কথা বলে কংসের বুদ্ধিকে পুরোপুরি ভ্রমিত করে দিয়েছে। এরপর সবাই ঠিক করে নিল আমাদের নরসংহারে নেমে পড়তে হবে। তবে আমরা কোথাও পাই না যে কংস সব ব্রাহ্মণদের মেরে শেষ করে দিয়েছিল। এখানে শুকদেব শেষের দিকে বলছেন – মৃত্যু যখন মানুষের খুব সন্নিকটে চলে আসে তখন সে বিবেকরহিত হয়ে যায়। এটাও খুব নামকরা কথা, যদিও এখানে মৃত্যুর কথা বলা হচ্ছে, কিন্তু আসলে বলতে চাইছেন মানুষ যখন বিনাশের দিকে এগোয়। মৃত্যু কখনই বিনাশ নয়। এই বিনাশ যখন মানুষের জীবনে ঘনিয়ে আসে তখন তার বিবেক নষ্ট হয়ে যায়। গীতায় ভগবান বলছেন *বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি*, যার বুদ্ধি নাশ হয়ে গেছে তার সব কিছু বিনাশ হয়ে গেছে। বুদ্ধি নাশ মানে, কোনটা কর্তব্য কোনটা অকর্তব্য এই জ্ঞান আর থাকে না, কর্তব্যাকর্তব্য জ্ঞানই বিবেক। বিবেক নাশ মানে এবার সে বিনাশের দিকে এগিয়ে গেছে।

চতুর্থ অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে শুকদেব এই কথাই বলছেন। ***আয়ুঃ শ্রিয়ং যশো ধর্মং লোকানাশিষ এব চ। হন্তি শ্রেয়াংসি সর্বাণি পুংসো মহদতিক্রমঃ।।*** *১০/৪/৪৬। মহদতিক্রমঃ*, আমাদের পরম্পরাতে মহাপুরুষদের অতিক্রম করাকে, অতিক্রম করা মানে অসম্মান করা, মহাপুরুষদের অসম্মান করা, অনাদর করাকে অত্যন্ত কুকর্ম রূপে দেখা হয়। ঠাকুর এই কুকর্মকে বলছেন বৈষ্ণব অপরাধ। বৈষ্ণব সম্প্রদায়েও বলা

হয় সাধুদের কখন অনাদর করতে নেই। সাধুদের অনাদর করলে কি কি নাশ হবে বলছেন – আয়ু, শ্রী মানে লক্ষ্মী অর্থাৎ সব রকম ঐশ্বর্য সম্পদ, যশ, ধর্ম, ইহলোক-পরলোক, বৈষয়িক সুখ ভোগ, সমস্ত রকম কল্যাণ এগুলো সব বিনষ্ট হয়ে যাবে। এখানে বলছেন মহৎ, মহৎ মানে সাধু, সাধু মানে সন্ন্যাসীও, এঁদের অসম্মান ও অনাদর করাকেই ঠাকুর বলছেন বৈষ্ণব অপরাধ। এই অপরাধের কোন ক্ষমা নেই। কারণ গুরুজনের প্রতি আক্রোশ করা মানে বুঝতে হবে সে ক্রুদ্ধ হয়ে গেছে, গুরুজনদের গুরু, সাধুকে সাধু বলে মানে না। এরা কিছুটা ক্রোধে আর কিছুটা মোহে একেবারে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। যার ভেতরে ক্রোধের উৎপত্তি হয়েছে সেও বিনাশের দিকে এগিয়ে যায় আর যে মোহগ্রস্থ সেও মরে। এখানে আপনি কোন সাধুকে অপমান করেছেন বলে যে নাশ হবেন তা নয়। যখন কোন সাধুকে নিন্দা করা হয় তার মানে, হয় সে ক্রোধগ্রস্থ আর তা নাহলে মোহগ্রস্থ। কম্যুনিস্টরা সারা বিশ্ব থেকে যে ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে তার প্রধান কারণ এটাই। কম্যুনিস্টরা সাধু বা মহৎ পুরুষদের সম্মান দেওয়ার শিক্ষাটাই গ্রহণ করতে পারলো না। আমাদের ঋষিদের এরা দিনরাত গালাগাল দিয়ে যাচ্ছে, আমাদের বেদ উপনিষদের ভূত ভাগিয়ে দিচ্ছে আর শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরামচন্দ্রের নামে কত আজেবাজে কথা বলে যাচ্ছে, আজ ভারতে কম্যুনিস্টরা তাই দাঁড়াতেই পারছে না। এটা যে শুধু ভারতে তাই নয়, সারা বিশ্বে আজ এদের একই অবস্থায়। তার মানে যার মনে একবার ক্রোধ আর মোহ এসে গেছে সে কোথাও বেশী দিন টিকতে পারবে না।

সাধারণ মানুষ আবার ক্রোধকে মনে করে তেজ। ক্রোধের বশবর্তি হয়ে আমি কাউকে খুব করে গালাগাল দিয়ে ভাবছি আমার তেজ প্রকাশ করলাম। কিন্তু ক্রোধ প্রকাশ করাকে কখনই তেজ বলা হয় না, ক্রোধকে হজম করে নেওয়াটাই তেজ। লণ্ঠনের আলো যখন কাঁচের ভেতরে প্রজ্বলিত থাকে তখন আলোটা প্রদীপ্ত হয়, কিন্তু সেই আলোকে লণ্ঠনের কাঁচের বাইরে নিয়ে এলে আলো প্রদীপ্ত হবে না। ক্রোধের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই হয়, ক্রোধটাও একটা শক্তি। এই শক্তি যদি ভেতরে থাকে তবে সে প্রদীপ্ত হবে, কিন্তু অপরের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করে সেই শক্তিকে বার করে দেওয়া হচ্ছে। শক্তি বেরিয়ে গেলে তেজ আসবে কোত্থেকে! এগুলোই ভাগবতের শিক্ষা, এখানে এই শিক্ষাটাই আমাদের নিতে হবে। একটা রিক্সাওয়ালা বদমাইশি করল, চোর ছ্যাঁচড় এদের একটু বকে দেওয়াটা আলাদা ব্যাপার। কিন্তু সন্তপুরুষ, শ্রেষ্ঠ পুরুষদের যখন অনাদর করা হচ্ছে তখন কিন্তু বিপদে পড়ে যাবে। ক্রোধ মোহাদির পরিণতি আমরা অত সহজে বুঝতে পারবো না বলে শুকদেব অন্য দিক দিয়ে বিস্তারিত করে বলছেন, ভাই! তুমি যদি শ্রেষ্ঠ পুরুষদের অনাদর কর তাহলে তোমার আয়ু, সম্পদ, কীর্তি, ধর্ম, ইহকাল-পরকাল, ভোগ সব নষ্ট হয়ে যাবে। কঠোপনিষদে যমরাজকে তাঁর মন্ত্রীরা সাবধান করে বলছেন *আশাপ্রতীক্ষে সঙ্গতং সূনৃতাং চেষ্টাপূর্তে পুত্রপশূংশ্চ সর্বান্*, ব্রাহ্মণ যদি বাড়িতে অনাদৃত হন তাহলে সেই বাড়ির মালিকের যা কিছু আছে আশা, প্রতীক্ষা, সাধুসঙ্গের ফল, ভালো কথা বলার ফল, যজ্ঞের ফল, ইষ্টাপুর্ত কর্মের ফল, পুত্র, পশু সবই বিনষ্ট হয়ে যাবে। ভাগবতও এখানে একই কথা বলছেন, শাস্ত্র কখনই দু-রকমের কথা বলবে না।

শুদ্ধির বিভিন্ন প্রক্রিয়া

এরপর শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা শুরু হচ্ছে। যা হওয়ার ছিল সব চুকে গেছে। প্রথম হল অষ্টম সন্তানের জন্ম হয়ে গেছে, দ্বিতীয় যোগমায়া হাত থেকে ছিটকে গেছেন আর তৃতীয় কংসকে যে মারবে সে অন্য জায়গায় জন্ম নিয়েছে। এদিকে শ্রীকৃষ্ণ গোকুলে বড় হচ্ছেন আর বসুদেব এবং দেবকী মথুরাতেই নজরবন্দী হয়ে আছেন। নন্দবাবাও এবার শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত রকমের জাতকর্ম করা শুরু করেছেন। এখানে খুব সংক্ষেপে শুদ্ধি কীভাবে হয় বলছেন, কীভাবে শুদ্ধি হবে এই নিয়ে মনুস্মৃতিতে আরও বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হয়েছে।
কালেন স্নানশৌচাভ্যাং সংস্কারৈস্তপসেজ্যয়া। শুধ্যন্তি দানৈঃ সন্তুষ্ট্যা দ্রব্যাণ্যাত্মাহহত্মবিদ্যয়া।। *১০/৫/৪।*
কালেন, কিছু কিছু জিনিষ আছে যেগুলো সময় দিয়েই শুদ্ধি হয়ে যায়, এখানে ভাষ্যকাররা দৃষ্টান্ত রূপে অশুদ্ধি ভূমি আদির কথা বলছেন, কিন্তু আমাদের মনেরও এমন এমন কিছু অশুদ্ধ ভাব আছে যা কিনা সময়েই শুদ্ধ হয়, তাছাড়া হয় না। *স্নানশৌচাভ্যাং*, স্নানের দ্বারা শরীরাদি শুদ্ধ হয় আর শৌচ হল হাত-পা ধৌত করা, দাঁত ব্রাশ করা, জামা-কাপড় পরিষ্কার রাখা ইত্যাদি। *সংস্কার*, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আমাদের সবাইকে কিছু কিছু

সংস্কার পালন করতে হয়। বেদের সময় আমাদের চৌষট্টি রকম সংস্কার পালন করতে হত। স্মৃতিতে চৌষট্টি থেকে ষোলটি সংস্কারে কমিয়ে দেওয়া হয়েছে আর তন্ত্র প্রসার লাভ করার পর আমাদের দশটি সংস্কারে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। জন্ম থেকেই আমরা সারা জীবন ধরে অশুদ্ধি ছড়িয়ে যাচ্ছি। যেমন মায়ের গর্ভ থেকে যখন শিশু জন্ম নিল তখন সেই শিশু অশুদ্ধ, জাতকর্ম দ্বারা শিশুর এই অশুদ্ধি দূর করা হয়। এই অশুদ্ধি দূর করার জন্য জন্ম লগ্ন থেকেই সংস্কার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। তাই না, সেই গর্ভাধান থেকেই এই সংস্কার শশ্মানে চিতায় ওঠার আগে পর্যন্ত চলতে থাকবে। যেমন বিবাহ, এটাও একটা সংস্কার, চূড়াকরণ, অন্নপ্রাশন, নামকরণ, উপনয়ন, দীক্ষা এগুলোও সংস্কারের মধ্যে পড়ছে। *তপস্যা*, তপস্যা করলে ইন্দ্রিয়াদি শুদ্ধ হয়, আমাদের জীবন এই তপস্যার দ্বারা শুদ্ধিকরণ করা থেকেই ঠিক ঠিক শুরু হয়। *যজ্ঞ*, যজ্ঞের দ্বারাও শুদ্ধি হয়, বলা হয় আমাদের এর আগের আগের জন্মে যে নানান রকম কর্ম করা হয়েছে বা এই জন্মে যত অশুদ্ধ কর্ম করা হয়েছে, যজ্ঞ করলে এই সব কর্মের শুদ্ধি হয়ে যায়। *দান ও সন্তোষ*, দানাদি কর্ম করলে ধন সম্পদ বৃদ্ধি হয় আর মনের শুদ্ধি সব সময় সন্তোষ থেকে হয়। এর আগে তিতিক্ষার কথা বলেছিলেন, তিতিক্ষা হল একটা ছোট্ট দিক আর সন্তোষ হল আরও বৃহত্তর একটা দিক, যা কিছু আসছে তাতেই সন্তুষ্ট হয়ে যাওয়া। সব কিছুতে, সব পরিস্থিতিতে, সব অবস্থায় যদি সন্তোষ এসে যায় তাহলে বুঝতে হবে মন শুদ্ধ হয়ে গেছে। ইদানিং কালে সমাজে যে এত অশান্তি, দেশের মধ্যে যে এত দুর্নীতি এর প্রধান কারণ কারুর মনে সন্তোষ নেই, চাকরীতে সন্তুষ্টি নেই, সংসারে সন্তুষ্টি নেই, আর দিনে দিনে ভোগের চাহিদা বেড়েই চলেছে। কারুরই সন্তোষ নেই, তার মানে সবার মন অশুদ্ধ। অশুদ্ধ মন মানেই কাম ক্রোধ জন্ম হবে, কাম ক্রোধের জন্ম নেওয়া মানে এবার গুরুজনদের অনাদর করতে শুরু করবে, গুরুজনের অনাদর মানে বিনাশ সুনিশ্চিত হয়ে গেল। কিন্তু আমার আপনার যে মূল স্বরূপ, এই স্বরূপকে জানার যে আত্মবিদ্যা, এই *আত্মবিদ্যাতে* আত্মার সব কিছু শুদ্ধ হয়ে যায়। আমাদের বাকি সব শুদ্ধি, শরীরের শুদ্ধি, ইন্দ্রিয়ের শুদ্ধি, সংস্কারের দ্বারা শুদ্ধি এগুলো সবই শুদ্ধ করা যাবে, তার জন্য বিভিন্ন উপায় বলে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু আত্মার শুদ্ধি আত্মজ্ঞান ছাড়া হবে না। কোন বাহ্যিক ক্রিয়ার দ্বারা আত্মার শুদ্ধি হয় না একমাত্র আত্মজ্ঞান দ্বারাই আত্মার শুদ্ধি হয়।

এখানে শ্রীকৃষ্ণের জাতকর্ম হয়ে গেছে, তিনিও শুদ্ধ হয়ে গেছেন। শ্রীকৃষ্ণের জাতকর্মের কথা উল্লেখ করে বিভিন্ন প্রক্রিয়ার কথা শুদ্ধিকরণের বলা হল। কিন্তু পুরাণ তো আর কোন কাব্যগ্রন্থ নয় আর উপন্যাসও নয়। ভাগবতের উদ্দেশ্য হল আমাদের আধ্যাত্মিক চেতনার বিকাশ করা। সেইজন্য এখানে জাতকর্মাদির কথা বলার পর বলে দিলেন এগুলো হল কর্মের শুদ্ধির জন্য, কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য হল আত্মার শুদ্ধি, যেটা আত্মজ্ঞান ছাড়া হয় না।

গোকুলে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-মহোৎসব

গোকুলের সর্বত্র খবর ছড়িয়ে গেছে যশোদার পুত্র সন্তান হয়েছে। খবর পেয়ে গোকুলের সব গোপ গোপীরা নন্দবাবার গৃহে এসে জড়ো হয়ে তাঁরা সেই সময়কার প্রথানুযায়ী কিছু স্ত্রী আচার করছেন। ***আশিষঃ প্রযুঞ্জানাশ্চিরং পাহীতি বালকে। হরদ্রাচূর্ণতৈলাদ্ভিঃ সিঞ্চন্ত্যো জনমুজ্জগুঃ।।১০/৫/১২।।*** তাঁরা সবাই একসাথে নবজাত শিশুকে 'চিরজীবি হও' 'ভগবান একে রক্ষা করুন' ইত্যাদি বলে হলুদ ও তেল মিশ্রিত জলের ছিটা দিতে দিতে মঙ্গলগান করতে লাগলেন আর আনন্দে পরস্পর পরস্পরকে দই, দুধ, ঘি এবং জলের দ্বারা সিক্ত করতে লাগলেন। শুকদেব বলছেন ***অবাদ্যন্ত বিচিত্রাণি বাদিত্রাণি মহোৎসবে। কৃষ্ণে বিশ্বেশ্বরেহনন্তে নন্দস্য ব্রজমাগতে।।১০/৫/১৩।।*** শ্রীকৃষ্ণ হলেন সমস্ত জগতের স্বামী আর তাঁর যে ঐশ্বর্য, মাধুর্য, বাৎসল্য সবই অনন্ত। সেইজন্য তাঁর জন্ম উপলক্ষ্যে যে মহোৎসবের আয়োজন করা হয়েছে সেই আয়োজনও বিরাট ভাবে করা হয়েছে। নন্দবাবা সমস্ত গোপদের অধিনায়কের মত ছিলেন। এই যে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজভূমিতে আবির্ভূত হলেন তাঁর আবির্ভাবের পর থেকে ব্রজভূমির কি কি পরিবর্তন হল? ***তত আরভ্য নন্দস্য ব্রজঃ সর্বসমৃদ্ধিমান্। হরের্নিবাসাত্মগুণৈ রমাক্রীড়মভূন্নৃপ।।১০/৫/১৮।*** শুকদেব পরীক্ষিৎকে বলছেন, ভগবান এসেছেন তাই সেইদিন থেকে ব্রজভূমি ঋদ্ধি-সিদ্ধির ক্রীড়াভূমিতে পরিণত হয়েছে। আর লক্ষ্মীদেবী হলেন

ভগবানের চিরসঙ্গীনি, তাই এখন ব্রজভূমিও তাঁর ক্রীড়াস্থল হয়ে গেল। যার ফলে গোপদের সব দিক থেকে প্রাচুর্যের ভাব এসে গেল।

প্রিয়জনের সংযোগ ও বিয়োগই জীবনের মৌলিক নিয়ম

কংসকে রাজার কর দেওয়ার জন্য নন্দবাবা মথুরায় এসেছেন। বসুদেবের সাথে নন্দবাবার দেখা হয়েছে। বসুদেবের দ্বিতীয় পত্নী রোহিনী আগে থেকেই নন্দবাবার কাছে আছেন, তাঁরই পুত্র বলরাম। বসুদেব নন্দবাবাকে বলছেন 'তোমার তো কোন সন্তান হওয়ার আশা ছিল না, আর এই বয়সে তুমিও সন্তানের আশা ছেড়ে দিয়েছিলে। যাই হোক এই বয়সে তোমার সন্তান হওয়াতে আমরা সবাই খুব খুশী হয়েছি'। বসুদেব জানতেন নন্দবাবার সন্তান শ্রীকৃষ্ণ তাঁরই সন্তান আর একটি কন্যা তো হয়েই ছিল। বসুদেব কথায় কথায় নন্দরাজকে বলছেন 'প্রিয়জনদের সাথে সাক্ষাৎ হওয়াটা খুবই আনন্দের ব্যাপার কিন্তু সংসারের সব কিছু তো আমাদের ইচ্ছাধীন নয় তাই প্রিয়জনের দর্শনলাভ খুবই দুর্লভ'। প্রিয়জনের সাথে মিলন আর তাদের থেকে বিচ্ছেদের ব্যাপারে এনারা খুব সুন্দর উপমার ব্যবহার করেন, বসুদেবও সেই উপমা দিয়ে বলছেন ***নৈকত্র প্রিয়সংবাসঃ সুহৃদাং চিত্রকর্মণাম্। ওঘেন ব্যূহ্যমানানাং প্লবানাং স্রোতসো যথা।।১০/৫/২৫।*** নদীর প্রবল স্রোতে ভেসে যাওয়া পদার্থ যেমন দীর্ঘক্ষণ একসঙ্গে থাকতে পারে না, ঠিক তেমনি আমাদের খুব ইচ্ছে থাকলেও আমাদের বন্ধু-বান্ধব প্রিয়জনদের সাথে একসাথে বেশী দিন বসবাস করতে পারি না। নদীর স্রোতে দুটি কাঠের টুকরো একসাথে ভেসে যাচ্ছে, স্রোতের টানে কাঠের দুটো টুকরোই একটা সময় আলাদা হয়ে যাবে। এরপর এই দুটি টুকরোর আবার মিলন হবে কি হবে না, কেউ বলতে পারে না। যাকে আমরা ভালোবাসছি, সে যখন আলাদা হয়ে যায় তার সঙ্গে পুনর্মিলন কবে হবে, আদৌ হবে কিনা বলা খুব মুস্কিল। তাই বসুদেব বলছেন প্রিয়জনের এই পুনর্মিলন অত্যন্ত দুর্লভ।

একটা বয়স না হয়ে যাওয়া পর্যন্ত মানুষের মধ্যে দার্শনিকতার ভাব উদয় হয় না। ভারত, গ্রীস, চীন এই দেশগুলিতে বিশেষ ধরণের জ্ঞান সম্পদ আছে যা অন্য কোন দেশে পাওয়া যায় না। আমার যে খিদে পাবে, আমার যে জলতৃষ্ণা লাগবে সেটাও আমার মুঠোতে নেই। শীতের সময় জল খাওয়ার চাহিদা এক রকম আবার গরমের সময় জলের চাহিদা অন্য রকম। জল খাওয়ার উপরেও আমাদের নিয়ন্ত্রণ নেই। সেখানে আমরা বলছি 'করলো দুনিয়া মুঠ্‌ঠি মে'। এর থেকে আশ্চর্যের কি আর হতে পারে। আমার পেট ভরে গেলে আমি চাইলেও একটু বেশী খেতে পারবো না, গ্রীষ্মের সময় আমি যে চেষ্টা করে জল একটু কম খাবো তারও উপায় নেই। এটাই আমাদের মানব জীবনের বাস্তব চিত্র। মিলন-বিচ্ছেদ-পুনর্মিলনের যে ব্যাপার আমাদের প্রিয়জনের সাথে হচ্ছে, আত্মার ব্যাপারে তো এগুলো আরও বেশী হবে। আমি যাকে ভালোবাসতাম সে মরেই গেল। এবার কোথায় মিলন হবে, স্বর্গে হবে, না কি পরের জন্মে হবে, আদৌ আমাদের মিলন হবে কিনা কে জানে! এই জীবনে যাকে আমি জানি ও চিনি, পরের জীবনে আদৌ তাকে চিনতে পারবো কিনা জানি না। কিন্তু এই জীবনেই অনেক বছর পর পরিচিতের সাথে, ভালোবাসার লোকের সাথে দেখা হলে কতই না আনন্দ হয়। এই কথাই বসুদেব বলছেন, প্রিয়জনের সাথে দেখা হওয়া, পুনর্মিলন খুবই আনন্দের কিন্তু অত্যন্ত দুর্লভ। কি রকম দুর্লভ – *প্লবানাং স্রোতসো যথা*। আগেকার ঋষিদের খুব প্রিয়া উপমা – নদীর স্রোতে ভেসে যাওয়া কাঠের টুকরো এই মিলন হচ্ছে, আবার আলাদা হয়ে দুজনে ছিটকে কোথায় চলে যাচ্ছে। এই বাস্তবতাকে মানুষ যদি একবার কখন হৃদয়ঙ্গম করে নেয় তাহলে তার জীবনের অনেক কষ্ট লাঘব হয়ে যাবে।

জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে যাঁরা শান্তিকে আস্বাদ করতে পেরেছেন তাঁদের নিজস্ব কিছু কিছু জীবন-দর্শন থাকে। কিন্তু মজার ব্যাপার হল, কেউ কিন্তু কখন অপরের আদর্শকে নিতে পারে না। স্বামীজী এক জায়গায় বলছেন – তোমাদের ঠাকুর মৌলিক ছিলেন, তোমরাও সবাই মৌলিক হও। এটা সত্যিই ঘটনা, যতক্ষণ আমাদের জীবন মৌলিক না হচ্ছে, বুঝে নিন ততক্ষণ আমাদের জীবন শুরু হয়নি। কিছু সাধারণ ব্যাপার সবারই জীবনে রাখতেই হবে, যেমন যাঁরাই আধ্যাত্মিক জীবনে এগোচ্ছেন তাঁরা কখনই কামিনী-কাঞ্চন, নাম-যশের দিকে মন দেবেন না। কিন্তু জীবন চালানোর ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি লোকের, আমার, আপনার,

শ্রীরামকৃষ্ণ বলুন, যিশু বলুন, বুদ্ধ বলুন সবারই জীবন-দর্শন আলাদা, আর এটাই বাস্তব। দর্শন মানে যেখান থেকে জিনিষটা পরিষ্কার দেখা যায়। আমাদের সমস্যা হল আমরা জীবনকে পরিষ্কার ভাবে দেখতে পাই না।

আমরা সবাই জানি প্রিয়জনকে কাছে পেলে ভালো লাগে, আবার এও জানি প্রিয়জনের বিয়োগ হয় আর এই বিয়োগ আবার সংযোগে ফিরে আসবে কিনা বলা খুব কঠিন। এই বাস্তব সত্যকে মানিয়ে নেওয়ার জন্য আমাদের বলা হয় জীবনের এটাই বাস্তব নিয়ম, আর উপমা দিয়ে যখন বলা হবে তখন বলা হয় – নদীর স্রোতে অনেক কাঠের টুকরো ভেসে যাচ্ছে, কখন তারা একসাথে চলছে, কখন স্রোতের টানে তাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে যাচ্ছে, এরপর তারা আবার কখন একসাথে হবে কিনা কেউ জানে না। এই উপমাকে যদি মাথায় বসিয়ে রাখি তাহলে আমাদের জীবন থেকে যেমনি কোন প্রিয়জন আলাদা হয়ে গেল তখন আর কোন কষ্ট হবে না। একদিন দুদিন যে হবে না তা নয়, কষ্ট নিশ্চয়ই হবে, কিন্তু দুদিন বাদে মিটে যাবে। কিন্তু আমরা পেরে উঠি না। সাধনার জীবনে প্রত্যেকটি মানুষের সাধনার পদ্ধতি আলাদা। আপনি বলতে পারেন, তা কেন হবে গুরুদেব তো সবাইকে একই মন্ত্র দিয়ে দিয়েছেন, তিনি একটা নির্দিষ্ট পদ্ধতি আর সেই একই পদ্ধতিতে আমরা সবাই সাধনা করে যাচ্ছি। আপনি ঠিকই বলছেন, তবে এই সাধনা প্রাথমিক স্তরের সাধনা, এখানে সবাইকে একই পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে, কিন্তু এই প্রাথমিক সাধনার স্তরকে অতিক্রম করার পর যে সাধনা শুরু হবে সেখানে প্রত্যেকটি মানুষের একটা নিজস্ব দর্শন থাকতে হবে। কিন্তু আমাদের এমনই দুর্ভাগ্য বা দুর্ভোগও বলা যায়, আমাদের কোন দর্শন নেই। দর্শন কেন নেই? কারণ আমাদের নিজস্ব কোন মৌলিক চিন্তন নেই। আমাদের চিন্তা ভাবনা হল 'সব শেয়ালের এক রা'এর মত। ওরা যা করছে আমাকেও সেটা করতে হবে। সবাই তীর্থে যায় আমাকেও যেতে হবে, আমার ভাই দীক্ষা নিয়েছে আমাকেও দীক্ষা নিতে হবে। আমাদের মন মুর্খের মত অন্যকে অনুকরণ করে যাচ্ছে, আমাদের নিজস্ব কোন চিন্তন নেই, মনন নেই। চিন্তন মনন না করলে জীবন দর্শন কোথা থেকে দাঁড়াবে! জীবন-দর্শন যদি না দাঁড়ায় তাহলে জীবন কোথা থেকে চলবে! গতানুগতিক ভাবে জীবনটা চলে গেলেই হল। আজ পর্যন্ত গতানুগতিক জীবন দিয়ে কেউ আধ্যাত্মিক হননি। আমাকে নিজেই দেখতে হবে আমার জীবন-দর্শনে কি কি আছে।

এই যেমন এখানে জীবন-দর্শন বলছেন প্রিয় বিয়োগ আর অপ্রিয় সংযোগ জীবনের মৌলিক নিয়ম। এভাবেই প্রকৃতি চলছে, প্রকৃতি নিজের মত প্রবাহিত হয়ে চলেছে। তুমি যদি না বুঝতে পারো তাহলে একটা উপমা নাও, নদীর স্রোতে অনেক কাঠ ভেসে যাচ্ছে, এই একসঙ্গে যাচ্ছে, এই আবার আলাদা হয়ে যাচ্ছে। জীবনও এভাবেই চলে, তোমারও প্রিয়জনের সংযোগ হবে আবার বিয়োগও হবে। আমরা যাকে ভালোবাসি তার কাছে নিজেকে আমরা স্বাধীন বলে বোধ করি, প্রিয়জন মানে যার কাছে থাকলে আমার মন ডানা বিস্তার করে উড়তে পারে। প্রিয়জন যখন কাছে থাকে না তখন মনের ডানা মেলে ওড়ার জায়গাটাও সঙ্কুচিত হয়ে যায়, তখন এমন একজনের কাছে এসে পড়ি যেখানে আমি ডানা বিস্তার করতে পারছি না, কষ্টতো তখন হবেই। কিন্তু এটাই জগতের নিয়ম। যেটা জগতের নিয়ম সেটাকে নিয়ে আক্ষেপ করে কি আর হবে! গীতায় ভগবান বলছেন *তস্মাদপরিহার্যেহর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি*, যেটা অপরিহার্য সেটাকে নিয়ে কষ্ট পেয়ে মাথা খারাপ করার কি আছে! গ্রীষ্মকালে গরম পড়বে, এটা অপরিহার্য আমাদের কিছু করার নেই। সেইজন্য বসুদেব নন্দবাবাকে বলছেন আমরা যে যাই বলি ভাই আমরা কেউ কাউকে চিরদিনের মত কাছে ধরে রাখতে পারবো না, সবারই প্রারব্ধ আলাদা। মা আর সন্তানের মধ্যে যতই নিবিড় ভালোবাসা থাকুক, কিন্তু দুজন দু রকমের প্রারব্ধ নিয়ে এসেছে। ছেলেকে মা যে সব সময় তার কাছে ধরে রাখবে তা কখনই পারবে না। মা ছেলেকে এত ভালোবাসে যে মনে করে ছেলে মায়ের শরীরেরই অঙ্গ। কিন্তু কিছু দিন পরে শরীরের সেই অঙ্গ আলাদা হয়ে যাবে। আমার শরীরের অঙ্গ কি করে আলাদা হয়ে যাবে? সিনেমায় নায়ক নায়িকাকে বলে আমাদের এই সম্পর্ক জন্ম-জন্মান্তরের সম্পর্ক। এই জন্মেই সম্পর্ক থাকে না, তাতে আবার জন্ম-জন্মান্তরের সম্পর্ক! প্রারব্ধ আছে, প্রারব্ধ বশতঃ আমার তোমার সম্পর্ক জুড়ে আছে, যতক্ষণ প্রারব্ধ আছে এভাবে চলতে থাকবে, প্রারব্ধ যেদিন কেটে যাবে সেদিন আপনা থেকেই সম্পর্ক ছিঁড়ে যাবে। এটাই সত্য, যাঁরা এই সত্যকে বুঝে নিয়ে মানসিক ভাবে প্রস্তুতি নিয়ে বসে গেছেন, তাঁরা অনেকটা পথ এগিয়ে গেলেন। আর যাঁরা এই সত্যকে মনে

বসিয়ে নিয়ে জীবনে কার্যকরী করে নিতে পেরেছেন তাঁরাই সত্যিকারের মহাপুরুষ হয়ে যান। এই কারণেই শাস্ত্রের এত মূল্য। এনারা শাস্ত্রে এই তত্ত্ব কথাগুলো বলে দিয়েছেন, এগুলোকে বুঝে নিয়ে ধারণা করতে হয়। ধারণা করতে করতে তত্ত্বগুলো আত্মস্থ হয়ে নিজের হয়ে যায়। নিজের যখন হয়ে গেল তখন তাকে জীবনে অনুশীলন করতে হয়। খুব কঠিন, পারা যায় না। আমাদের এই জীবন বাস্তবে অনিত্য, কিন্তু সমস্যা হল আমরা এই অনিত্য জীবনকে নিত্য বলে মনে করছি বলে এত কষ্ট পাচ্ছি। যাঁরা জ্ঞানী, বিবেক বিচার করে করে অনেক উপরে উঠে গেছেন তাঁরাই এই জীবনকে অনিত্য দেখেন।

এই সব কথা বলার পর বসুদেব নন্দবাবাকে সাবধান করে দিয়ে বলছেন – যাই হোক ভাই, তুমি এখন বন্ধুবান্ধব-পরিজনদের নিয়ে যেখানে আছে সেখানে চারিদিকে বন্য পশুরা আছে, তার উপর আবার মাঝে মাঝে খরা হয়ে যায়, তাই তোমরা সবাই সেখানে ঠিক ঠাক আছ তো? এখন যেখানে আছো সেখানে জল, তৃণ, লতাদি যথেষ্ট পরিমাণে আছে তো? আসলে নন্দবাবারা ছিলেন তখনকার দিনের গোয়ালা। তখনকার দিনের গোয়ালারা যেখানে ভালো জল, ঘাস পাওয়া যেত সেখানে তারা পুরো গরু মোষ নিয়ে গিয়ে ক্যাম্প করে থাকতো। অনুকূল পরিবেশ পেয়ে গেলে সেখানেই তারা বেশ কিছু বছর থেকে যেত। অন্য দিকে গঙ্গা যমুনার প্রবাহ তখন খুব ঘন ঘন পাল্টাতে থাকতো। হঠাৎ একদিন দেখা গেল যমুনার জল বাড়তে শুরু করেছে। তখন আবার তারা তাড়াতাড়ি করে অন্য নিরাপদ জায়গায় চলে যেত। সেইজন্য শ্রীকৃষ্ণ ঠিক কোথায় কোথায় ছিলেন এখন বলা মুশকিল।

বসুদেব বলছেন 'আমার এক ছেলে বলরাম তার মায়ের সাথে তোমার কাছেই ব্রজভূমিতে আছে'। যদিও বলরাম নামটা বলছেন না। 'তুমি আর যশোদা তাকে লালন-পালন করছো তো'? শেষে বসুদেব বলছেন
পুংসস্ত্রিবর্গো বিহিতঃ সুহৃদো হ্যনুভাবিতঃ। ন তেষু ক্লিশ্যমানেষু ত্রিবর্গোঽর্থায় কল্পতে।।১০/৫/২৮।
এখানে বসুদেব চতুর্বর্গ না বলে বলছেন ত্রিবর্গ। চতুর্বর্গ মানে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। কিন্তু গৃহস্থদের জন্য মোক্ষ নয়, তাদের জন্য ত্রিবর্গ – ধর্ম, অর্থ ও কাম। অর্থ হল, সদুপায়ে যে অর্থ উপার্জন করা হয়। কাম মানে, শাস্ত্রে যে জিনিষকে যেমন ভাবে ভোগ করতে বলা হয়েছে সেই অনুসারে ভোগ করা। অশাস্ত্র বিহিত উপার্জিত অর্থ আর অশাস্ত্র বিহিত ভোগে অর্থ আর কাম থাকে না, সেটাই তখন কামিনী-কাঞ্চন হয়ে যায়। কামিনী-কাঞ্চন মানে অর্থ আর ভোগে আসক্তি এসে যাওয়া। আর ধর্ম হল, মৃত্যুর পর আমরা কোথায় যাবো, স্বর্গে যাবো না নরকে যাবো জানা নেই, নরক থেকে বাঁচার জন্য মানুষ ধর্ম করে। আমরা যে প্রায়শ্চিত্ত কর্মাদি করছি, উপাসাদি করছি, যজ্ঞাদি করছি এগুলো করা হয় আমাদের মৃত্যুর পরবর্তি জীবনকে ঠিক করার জন্য। গৃহস্থের দুই রকমের কাজ করতে হয়, একটা ইহকালকে ঠিক ভাবে চলার জন্য আর দ্বিতীয় হল পরকালটা ঠিক করার জন্য। ইহকাল ঠিক করার জন্য অর্থ আর কাম পালন করা আর পরকালের জন্য ধর্ম পালন করা। বসুদেব বলছেন, অর্থ আর কাম করা হয় যাতে স্বজন পরিজনরা সুখ পায়। তার মানে যে শুধু নিজের সুখের জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে তখন সেই চেষ্টার মধ্যে অর্থ আর কাম থাকবে না। সহজ উপমা হল, কারুর ছেলে প্রচুর টাকা উপার্জন করছে, সেই টাকা নিয়ে সে ফুর্তি করে বেড়াচ্ছে, দামী দামী পোষাক, মোবাইল কিনছে আর কিছু টাকা তার বাবার হাতে দিচ্ছে। এই কাজ শাস্ত্র বর্জিত। এই যে টাকা উপার্জন করছে এই টাকা যত স্বজন আছে সবারই জন্য। উপার্জিত টাকা দিয়ে কখন শুধুমাত্র নিজের জন্য সুখ ভোগ করতে নেই, এই টাকাতে যখন স্বজনরাও সুখ ভোগ করতে পারে তখনই সেটা শাস্ত্র সম্মত অর্থ হবে। সেইজন্য ঋষিরা আমাদের জন্য পঞ্চ মহাযজ্ঞের বিধান দিয়ে গেছেন। স্বজনদের বঞ্চিত করে আত্মসুখের চেষ্টাকে কখনই পুরুষার্থ বলা যায় না।

এইসব বলে বসুদেব বলছেন – 'যাই হোক ভাই! ইদানিং চারিদিকে নানা রকম উৎপাত শুরু হয়েছে। তোমার তো কংসকে বার্ষিক কর দেওয়া হয়ে গেছে আর আমাদেরও দুজনের দেখা-সাক্ষাৎ হল। তুমি আর বেশী দিন মথুরায় থেকো না, তোমার নিরাপত্তার জন্য, সবার নিরাপত্তার কথা ভেবে বলছি তুমি যত তাড়াতাড়ি পারো ব্রজধামে ফিরে যাও। তোমারও সন্তান আছে আর আমারও সন্তান তোমার কাছে আছে সবার কথা ভেবে তুমি সাবধানে থাকবে'। এই বলে এই অধ্যায় শেষ হয়ে যাচ্ছে।

এদিকে মথুরা গোকুলে কানাঘুষো শুরু হয়ে গেছে যে বসুদেব আর নন্দবাবার মধ্যে সন্তান পাল্টাপাল্টি হয়েছে। যাঁরা ভক্তিমার্গের সাধক, ঈশ্বরের প্রতি যাঁরা তাঁদের ভালোবাসাকে ভাবরাজ্যে তুলে নিয়ে যাবেন তাঁদের জন্য আদর্শ হলেন শ্রীকৃষ্ণ, গোপী, শ্রীরাধা, গোপবালকদের চরিত্র, বিশেষ করে শ্রীকৃষ্ণকে কেন্দ্র করে যে চরিত্রগুলো ভাগবতের দশম অধ্যায়ে এসেছে। এক ধাপে সেই ভাবরাজ্যে তো পৌঁছানো যাবে না, তার জন্য চাই শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার পঠন-পাঠন, স্মরণ ও অনুধ্যান। সেই কারণে ভাগবত এখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁর শৈশবকাল থেকে যা যা লীলা করেছেন তার বর্ণনা করতে যাচ্ছেন। ভাগবতে যেভাবে কংসকে শক্তিমান ও ভয়ংকর রূপে দেখান হয়েছে, মহাভারতে কিন্তু সেইভাবে কোথাও কংসকে দেখানো হয়নি। মহাভারতে কংসের ভূমিকা অতি নগণ্য, নামই খুঁজে পাওয়া যাবে না। ঠিক সেই রকম জরাসন্ধের ভূমিকাও খুব সামান্য। এই চরিত্রগুলোই ভাগবতে বিশাল ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। খল চরিত্রকে যত খারাপ করে দেখানো যেতে পারে ততটাই খারাপ দেখানো হয়েছে। এগুলো না থাকলে ভাগবত ভক্তিশাস্ত্র হবে না। কেননা খারাপটা যতক্ষণ না মনের মধ্যে গভীর রেখাপাত করতে পারছে ততক্ষণ ভালোকে ধারণা করা যাবে না। শুভ বা ভালো জিনিষের প্রতি আকর্ষণে মন উন্মুক্ত হয়ে যায়। কোন বিরাট ভাবকে যদি আশ্রয় না করা হয় মন বিস্তার লাভ করতে পারবে না। মন তার সঙ্কীর্ণতা থেকে ছাড়া না পেলে সেই আনন্দটাও আসবে না। ভাগবত রচনার মূলে যে সারবত্তা তার কাজই হল আমাদের মনকে সব সময় বৃহৎএর দিকে নিয়ে যাওয়া।

পূতনা উদ্ধার

শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা শুরু হয় পূতনা বধ দিয়ে। শ্রীকৃষ্ণলীলায় ভগবান যত রাক্ষস, দানব, দৈত্য, অসুর বধ করেছেন বলা হয়েছে, সেখানে ভাগবত কিন্তু কোথাও শ্রীকৃষ্ণ বধ করেছেন বলছে না, বলছে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধার করলেন। যেমন এখানে বলছেন পূতনা উদ্ধার। তেমনি আসবে তৃণাবর্ত উদ্ধার, বকাসুর উদ্ধার ইত্যাদি। আসলে এরা সবাই আগের আগের জন্মে কেউ হয়তো দেবতা, গন্ধর্ব, যক্ষ ছিল, কিন্তু কারুর অভিশাপে একটা অশুভ যোনিতে এসে পড়েছে। ভগবান এইভাবে তাদের সবাইকে সেই অশুভ যোনি থেকে উদ্ধার করে দিলেন। শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা থেকেই ভাগবত আমাদের পুরোপুরি ভাবরাজ্যের দিকে নিয়ে যেতে শুরু করে। এখন যুক্তি তর্ক সব আমাদের মাথা থেকে নামিয়ে রাখতে হবে।

এদিকে কংস ভেতরে ভেতরে খুব ভয়ে দিন কাটাচ্ছে আর নানা উপায় খুঁজছে কীভাবে আমার কালরূপী এই শিশুর সন্ধান পাওয়া যায়। কংস এখন মোটামুটি নিশ্চিত যে শ্রীকৃষ্ণ গোকুলেই আছেন। গোকুলে তো অনেক শিশুই আছে, তার মধ্যে কে সেই শিশু যে কংসের মৃত্যুর কারণ হবে, এত শিশুর মধ্যে তাঁকে খুঁজে বার করা খুবই মুশকিল। তাই ঠিক হল গোকুলে যত শিশু এখনও মাতৃস্তন্য পান করছে তাদের সবাইকে কায়দা করে মারার জন্য পূতনা নামে এক ভয়ঙ্করী রাক্ষুসীকে ডেকে আনা হল। এখন পূতনা কি ছিল বলা মুশকিল, হয়তো হিংস্র স্বভাবের হাড্ডাগোড্ডা কোন মহিলা ছিল যার স্তনে বিষ লাগিয়ে গোকুলে পাঠান হয়েছিল। এই মহিলাকেই পরে রাক্ষুসী বানিয়ে দেওয়া হতে পারে। এখানে ভাগবত পূতনার ব্যাপারে বলছে ***কংসেন প্রহিতা ঘোরা পূতনা বালঘাতিনী। শিশূংশ্চচার নিঘ্নন্তী পুরগ্রামব্রজাদিষু।।*** *১০/৬/২।* পূতনা নামে এক নারী ছিল তাকে কংস গোকুলে যেখানে গোপরা বাস করত সেখানে পাঠিয়েছে। পূতনাকে বলে দেওয়া হয়েছে খবর পাওয়া গেছে কৃষ্ণ গোকুলে আছে, তাকে বধ করতে হবে। পূতনার কাজই ছিল ছোট ছোট শিশুদের বধ করা। পুরাণের বৈশিষ্ট্যই হল যাকে খারাপ করার তাকে যত খারাপ জিনিষ আছে সব তার উপরে ঢেলে দেবে। পুরাণে যখন কোন কাহিনী রচনা করা হয় তখন এই ধরণের চরিত্র দাঁড় করাতে হয়, তা নাহলে কাহিনী জমবে না। এগুলোকে খুব বেশী আক্ষরিক ভাবে না নেওয়াই ভালো। কারুর মহিমাকে প্রকাশ করার জন্য অন্য কোন চরিত্রকে একটু অন্য রকম করতে হয়। পূতনা শিশুঘাতিনী ছিল কিন্তু এখানে ভাগবত এক ধাপ এগিয়ে দিচ্ছেন, কারণ ভাগবত হল ধর্মগ্রন্থ, তাই বলছেন ***ন যত্র শ্রবণাদীনি রক্ষোঘ্নানি স্বকর্মসু। কুর্বন্তি সাত্বতাং ভর্তুর্যাতুধান্যশ্চ তত্র হি।।*** *১০/৬/৩।* সংস্কৃত ভাষার বৈশিষ্ট্যই হল, একটি শব্দে অনেক কথা বলে দেওয়া যায়। যাঁরা দৈনন্দিন কাজের ফাঁকে *ন যত্র শ্রবণাদীনি*, ভক্তবৎসল ভগবানের নাম, গুণ, লীলা প্রভৃতি শ্রবণ, কীর্তন বা স্মরণ করেন না তাঁদেরই বিপদ আসে, যাঁরা করেন তাঁদের উপর পূতনার মত মায়াবী

রাক্ষসীদের ক্ষমতা চলে না। সন্তানের প্রতি মায়ের গভীর মমতা থাকবেই, না থাকাটাই অস্বাভাবিক। সন্তানের যদি ক্রমাগত রোগ-ব্যাধি হতে থাকে তখন মায়েরা ডাক্তারের কাছে তো অবশ্যই যাবে, কিন্তু ডাক্তারের বাইরেও মায়েরা দুর্বল মনের বশবর্তি হয়ে এই বাবাজী, সেই বাবাজীদের কাছে দৌড়ে যাবে, কারুর কাছ থেকে তাবিজ, মাদুলি নিচ্ছে, কারুর কাছ থেকে জলপড়া নিচ্ছে, টোটকা নিচ্ছে। এই টোটকা তাবিজ কাজ করতেও পারে, আবার কাজ নাও করতে পারে। আমার এখন দরকার আমার সন্তানের প্রাণ যেভাবেই হোক রক্ষা করা। কিন্তু আগেকার দিনে বিভিন্ন কারণে সন্তান হওয়া খুব কঠিন ছিল। তাই আশীর্বাদ দেওয়া হত 'তোমার সন্তান হোক'। সেইজন্য ভাগবত পূতনার কথা বলেই নিজের কাজের কথা ঢুকিয়ে দিয়ে বলে দিলেন – যেখানে মানুষ নিজের কাজের ফাঁকে ঈশ্বরের নামগুণ গান করে সেখানে কিন্তু এই অশুভ শক্তি প্রভাব ফেলতে পারে না। যাতে মানুষ ঘুম থেকে উঠে সকাল থেকেই ভগবানের নাম শ্রবণ কীর্তন করতে থাকে, স্নান করছে ভগবানের নাম করে যাচ্ছে, খাচ্ছে ভগবানের নাম স্মরণ করে যাচ্ছে। সব কাজের মধ্যে যাঁরা শ্রীহরিকে স্মরণ করেন তাঁদের বাড়িতে পূতনার মত অশুভ শক্তি প্রবেশ করতে পারে না। কিন্তু তাও তো ভক্তদের বাড়িতে কত রকমের ঝামেলা লেগেই থাকে। আসলে এগুলো হল আমাদের মনে যাতে আধ্যাত্মিক ভাব ঢোকান যায় তারই চেষ্টা করছেন। বিশ্বের যত শাস্ত্র আছে সব শাস্ত্রের একটাই কথা ঈশ্বরই সত্য। আর দ্বিতীয় কথা হল, জো সো করে, ভয় দেখিয়ে, মিষ্টি কথা বলে, বন্ধু ভাবে আপনাকে টেনে ওই ভাবে প্রতিষ্ঠিত করা। ঠাকুর বলছেন ঈশ্বর দর্শনই মানব জীবনের উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্য যদি তাই হয় তাহলে ডান দিক বাম দিক করে যেভাবেই হোক উদ্দেশ্য পূর্তি করতে হবে। পুরাণাদি শাস্ত্র কীভাবে উদ্দেশ্য পূর্তি করেন? কোথাও ভয় দেখাবে, কোথাও লোভ দেখাবে, কোথাও দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনা করবে, সব কিছুর একটাই উদ্দেশ্য – ঈশ্বরই বস্তু আর বাকি সব অবস্তু, এই ভাবে আমাদের প্রতিষ্ঠিত করা। সেইজন্য এই জিনিষগুলো গ্রন্থের মধ্যে ঢোকান হয়েছে। যারা যুক্তিবাদী তারা বলবে আমেরিকা ইংল্যাণ্ডের বাচ্চার কীভাবে বেঁচে থাকে? তখন আমরা উত্তর দিতে পারবো না। কিন্তু তা নয়, এনাদের উদ্দেশ্য হল আমাদের মনকে কীভাবে ঈশ্বরের দিকে নিয়ে যাওয়া যায়। কারণ ঈশ্বরই সত্য, শ্রীহরি ছাড়া কিছু নেই। এই ধরণের শ্লোকের উদ্দেশ্য হল আমাদের আধ্যাত্মিক ভাবের দিকে টেনে নিয়ে আসার জন্য। ঈশ্বর হলেন চৈতন্য স্বরূপ আর আমরাও সেই চৈতন্য স্বরূপ। ঈশ্বরের স্মরণ মনন করা মানে নিজের চৈতন্য স্বরূপের উন্মোচন করা। চৈতন্য স্বরূপের উন্মোচন হওয়া মানেই জাগতিক যা কিছু আছে তার সব কিছু থেকে বেরিয়ে আসা। জাগতিক ভাব থেকে মুক্ত হয়ে গেলেই জীবন শান্তিতে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। যাই হোক এক রূপসী নারীর রূপ ধরে পূতনা রাক্ষুসী গোকুলে এসেছে। গোকুলের ঘরে ঘরে সে বাচ্চাদের বিষ মাখানো স্তনে দুধ পান করিয়ে শিশুহত্যা করে বেড়াতে থাকল। গোকুলের আকাশে বাতাসে এখন শুধু ক্রন্দন আর হাহাকার।

এরপরে বলছেন ***বালগ্রহস্তত্র বিচিন্বতী শিশূন্ যদৃচ্ছয়া নন্দগৃহেহসদন্তকম্। বালং প্রতিচ্ছন্ননিজোরুতেজসং দদর্শ তল্পেহগ্নিমিবাহিতম্ভসি।।১০/৬/৭।*** বাচ্চাদের কাছে পূতনা ছিল দুষ্টগ্রহের মত। পূতনা এখানে সেখানে চারিদিকে শ্রীকৃষ্ণকে অন্বেষণ করে চলেছে। ঘুরতে ঘুরতে পূতনা হঠাৎ এবার নন্দবাবার গৃহে পৌঁছে গেছে। সেখানে দেখছে ভগবান বিছানায় শয়ন করে আছেন। কীভাবে শয়ন করে আছেন? *প্রতিচ্ছন্ননিজোরুতেজসং*, ছাই চাপা আগুন আছে, সেই ছাইয়ের মধ্যে যদি কেউ একবার হাত দিয়ে দেয় তাতেই তার হাত পুড়ে যাবে। ভগবানের যে প্রচণ্ড তেজ সেই তেজকে তিনি প্রচ্ছন্ন অগ্নির মত সামান্য মানব শিশু রূপের মধ্যে গোপন করে রেখেছেন। শ্রীকৃষ্ণ তখন ছয় দিনের শিশু, এখনও সে ভালো করে চোখ খুলে তাকাতেও পারে না, কিন্তু এই ছয় দিনের শিশুই কিছুক্ষণ পরেই এক রাক্ষুসীকে বধ করতে যাচ্ছেন। এটাই হল আসল পুরাণ। শ্রীরামচন্দ্র বড় হয়ে রাবণবধ করলেন এতে আশ্চর্যের কিছু নেই, কিন্তু ছয় দিনের যে শিশু এখনও চোখ খুলে ভালো করে তাকাতে পারে না, সেই কিনা একটা ভয়ঙ্করী ক্রুর রাক্ষুসীর ভবলীলা সাঙ্গ করে দিতে যাচ্ছেন, তাও আবার শুধু বুকের দুধ পান করতে করতে। তা নাহলে এটা পুরাণ হবে কি করে! শুধু কাহিনী বলেই ইতি হবে না, এবার ভক্তি, অধ্যাত্মকে কীভাবে কাহিনীর মধ্যে নিয়ে আসতে হয় সেটাও দেখান

হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ হলেন ভগবান, তিনি দুষ্টের কাল এবং শিষ্টের রক্ষক। কিন্তু এই শিশুর মধ্যেই তিনি তাঁর প্রচণ্ড তেজকে ছাই চাপা আগুনের মত লুকিয়ে রেখেছিলেন।

বিবুধ্য তাং বালকমারিকাগ্রহং চরাচরাত্মাহহস নিমীলিতেক্ষণঃ। অনন্তমারোপয়দঙ্কমন্তকং যথোরগং সুপ্তমবুদ্ধিরজ্জুধীঃ।।১০/৬/৮। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হলেন সমস্ত চরাচরের আত্মস্বরূপ, তিনি আগে থাকতেই জানতেন এই রূপসী নারীরূপী শিশুঘাতিনী পূতনা-গ্রহ। কারণ চৈতন্য স্বরূপ যদি কিছু জানতে চান তাঁকে বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের সাহায্য নিয়ে জানতে হয় না। ঠাকুর বলছেন – আমার ঘরে যখনই কেউ আসত আমি এক নজর দেখেই স্পষ্ট বুঝতে পারতাম লোকটি কি ধরনের। কাঁচের আলমারিতে সব জিনিষ যেমন স্পষ্ট দেখা যায়, ঠাকুর সেই রকম মানুষের ভেতরটা স্পষ্ট দেখতে পারতেন। আমরা কেন দেখতে পাই না? কারণ আমরা যখন দেখছি তখন আমরা চক্ষু ইন্দ্রিয় দিয়ে দেখছি। আর সেটা আবার মন ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে আত্মার কাছে যাচ্ছে। তিন চারটে স্তর পেরিয়ে আত্মার কাছে যাচ্ছে বলে বস্তুর জ্ঞানটা বিবর্ণ হয়ে যায়। কিন্তু এই স্তর গুলোকে সরিয়ে দেওয়া হলে বস্তু যেমনটি আছে তেমনটিই দেখাবে। তখন আর চোখ খুলে দেখতে হবে না। আসলে হয় কি, কোন মেশিন শপে যেখানে বড় বড় মেশিনে অনবরত প্রচণ্ড আওয়াজ হয়ে চলেছে, সেখানে আমরা যদি কথা বলি কেউ সেই কথা শুনতে পাই না, মেশিনের আওয়াজে সব শব্দ চাপা পড়ে যায়। অনেক স্তর পেরিয়ে আমাদের মন যখন আত্মার কাছে কোন কিছুকে জানার জন্য নিয়ে যাচ্ছে তখন আমাদের ইন্দ্রিয়গুলো অনবরত ঢাক-ঢোল পিটিয়ে যাচ্ছে, ওই ঢাক-ঢোলের আওয়াজের জন্য আত্মা কিছু বুঝতেই পারে না মন কি নিয়ে এসেছে। ওই ঢাক-ঢোলের আওয়াজের মধ্যেও ইন্দ্রিয় একটা দুটো খবর চৈতন্যকে পৌঁছে দিচ্ছে। ওই অল্পটুকুতেই আমাদের জীবন চলছে। যত ইন্দ্রিয়কে শান্ত করা হবে, মনকে যত শান্ত করা হবে আত্মা নিজেই তখন সব ঠিক বুঝে নেন। ভগবান শুদ্ধ আত্মা, তাই তাঁকে চোখ দিয়ে কিছু দেখতে হয় না।

এখানে শ্রীকৃষ্ণকে সমস্ত চরাচরের আত্মা বলা হচ্ছে, এই আত্মা মানে কোন জিনিষের সত্তাকে বোঝাচ্ছে। যেমন লবণের সত্তা হল লবণত্ব। কোন জিনিষের থেকে তার সত্তাটাকে সরিয়ে দিলে সেই জিনিষটাই আর থাকবে না। লবণের সত্তা লবণত্বকে সরিয়ে দিলে লবণ একটা পাথর হয়ে যাবে। লবণের এই লবণত্বটাই ভগবান, লবণ কিন্তু ভগবান নন। চিনির মিষ্টত্বটা চিনির ভগবান। গীতার দশম অধ্যায়ে ভগবান এক এক করে দেখাচ্ছেন কোন জিনিষের মধ্যে আমি কোনটা শ্রেষ্ঠ আর কোনটা সার। ওই সার যদি চলে যায় তখন সেটা মৃত, তখন অন্য জিনিষে পরিণত হয়ে তার ব্যবহারটা পাল্টে যাবে। লবণের লবণত্ব চলে গেলে তার আর লবণ নাম থাকবে না। লবণটা পাথর হয়ে যাবে, পাথরের সার আবার কাঠিণত্ব, কারণ ভগবান ছাড়া তো কিছু হতে পারে না। সেটাই এখানে বলা হচ্ছে *চরাচরাত্মাহহস* , সব কিছুর আত্মা তিনি, মানুষের আত্মাও তিনি। মানুষের আত্মাটা কি? শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, যার মানে হুঁশ আছে সেই মানুষ। যখন কোন মানুষের থেকে তার মানটাকে সরিয়ে দেওয়া হয়, মান মানে আমি বোধ, আত্মসম্মান বোধ, তখন সেই মানুষটির মনুষ্যত্ব বলে কিছু থাকবে না। কোন মানুষের আত্মসম্মানকে নিয়ে তাই কখন বিদ্রুপ বা তাচ্ছিল্য করতে নেই। সেইজন্য প্রথমে ভালো করে দেখে নিতে হয় একজন ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের মূল চেতনা কোন জায়গাতে কেন্দ্রিভূত হয়ে আছে। ওই কেন্দ্রেই ভগবানের সত্তা। যেমন একজন ঘোর বিষয়ী লোকের কাছে সোনা খুব প্রিয়। সোনাই তখন লোকটির আত্মা, সেইখানে যদি কেউ হাত দিয়ে দেয়, সে কিন্তু তাকে কিছুতেই আর ছাড়বে না। স্বামীজী বলছেন ধর্মই ভারতের প্রাণ, আধ্যাত্মিকতাই ভারতের আত্মা। ভারতের আত্মা বলতে তো সেই ভগবানই হবেন। কিন্তু রূপকথার কাহিনীতে যেমন বলা হয় এক রাক্ষস আছে। সেই রাক্ষসের প্রাণ কোথায় আছে? একটা কৌটার মধ্যে ভ্রমর আছে, সেই ভ্রমরের মধ্যে রাক্ষসের প্রাণ সুরক্ষিত আছে। ঠিক সেই রকম ভারতের প্রাণ কোথায় আছে যে ধরতে পারবে সেই ঠিক ঠিক ভারতে রাজ করতে পারবে। স্বামীজী বলছেন ভারতের প্রাণ হল ধর্ম, আধ্যাত্মিকতা। সেই কারণে ভারতে সাধু, সন্ন্যাসীদের বেশী সম্মান। গান্ধীজীকে সারা ভারত মানল এই একটি কারণেই। ভারতবাসী জানেন গান্ধীজী একজন আধ্যাত্মিক পুরুষ। আত্মা মানেই ভগবান। ভগবান কখন ব্যক্তি বিশেষ বা প্রাণী বিশেষের আত্মা হন না, সব কিছুরই তিনি আত্মা।

সেইজন্য বলছেন *চরাচরাত্মাহহস*, চর অচর যা কিছু আছে সবারই আত্মা ভগবান। পূতনার আত্মাও সেই ভগবানই। শ্রীকৃষ্ণ হলেন সেই ভগবান, তাই তিনি বুঝে গেছেন এই রূপসী নারী পূতনা নামধারী এক দুষ্টগ্রহকে শিশুদের হত্যা করার উদ্দেশ্যে কংস এখানে পাঠিয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ পূতনাকে দেখলেন, দেখে নিজের চোখটা বন্ধ করে দিলেন, *নিমীলিতেক্ষণঃ*। ভাগবতের উপরে বিখ্যাত ভক্তি বেদান্তী বল্লভাচার্যের একটা টীকা আছে যার নাম সুবোধিনী টীকা। তাতে তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কেন পূতনাকে দেখে চোখ বন্ধ করলেন এর উপর প্রায় একুশটার মত ব্যাখ্যা দিয়েছেন। একেই বলে সত্যিকারের পাণ্ডিত্য। অন্য দিকে ভাগবত ভক্তিশাস্ত্র, ভক্তিশাস্ত্রের কোন ঘটনাকে যদি বিশেষ ভাবে ব্যাখ্যা করে না দেখানো হয় তাহলে সেই ভক্তিশাস্ত্রের কোন দাম থাকবে না। কত সাধারণ একটি ঘটনা, পূতনাকে দেখে ভগবান চোখ বন্ধ করলেন, কেন ভগবান চোখ বন্ধ করলেন তার উপরেই কত রকম ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। বাচ্চাকে কোন অপরিচিত লোক কোলে নিলে এমনিতেই চোখ বন্ধ করে দেয়। আর পূতনা নামে কোন রাক্ষুসি আদৌ কেউ ছিল কিনা আমাদের জানা নেই। এখনও গ্রাম দেশে এক মাসের বাচ্চাকে এক মুহুর্তের জন্যও বাড়ির লোকরা চোখের আড়াল করে না, সব সময়ই কেউ না কেউ চোখে চোখে রাখে। সেখানে একটা অজানা অচেনা মেয়ে বাড়ির ভেতর ঢুকে যাবে, এক মাসের বাচ্চাকে কোলে নিয়ে দুধ খাওয়াবে, কারুর নজরে আসবে না, এ জিনিষ আমরা কল্পনাও করতে পারিনা। কিন্তু এখানে ভগবানের লীলা পোষ্টাই করার জন্য কল্পনা করে নেওয়া যেতে পারে। লীলা পোষ্টাই করবার জন্য পূতনা ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে কোলে তুলেছেন আর শ্রীকৃষ্ণ চোখ দুটো বন্ধ করে দিয়েছেন। কেন চোখ বন্ধ করলেন তার আবার আলাদা আলাদা একুশ খানা ব্যাখ্যা আছে। সব কটির ব্যাখ্যা নিয়ে আলোচনা করা সম্ভবপর নয়, এখানে কয়েকটি ব্যাখ্যাকে নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে যাতে আমরা ধারণা করতে পারি ভক্তিশাস্ত্র কীভাবে চলে, আর এটা দেখানো ভাগবত পণ্ডিতরা কি বিশাল পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন।

পূতনাকে দেখে ভগবানের চোখ বন্ধ করার ব্যাখ্যা

পূতনার এই কাহিনী যদি একটা সাধারণ কাহিনী রূপে দেখা হয় তখন এর অন্য রকম একটা অর্থ হয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু ভাগবত ভক্তি শাস্ত্র, তাই কাহিনীর মধ্যে ভক্তির ব্যাপার আসবে, ভাবরাজ্যের ব্যাপার আসবে। ভাবরাজ্যের ব্যাপার এসে গেলে কাহিনীর প্রত্যেকটি কথা, বর্ণনা অন্য রকম অর্থে দাঁড়িয়ে যাবে। যিনি শ্লোক রচনা করেছেন তিনি ভক্তি, দর্শন, কাব্যের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে এক রকম লিখে গেছেন, কিন্তু যখন ভাষ্যকাররা এই শ্লোকের ব্যাখ্যা করেন তখন সেই শ্লোককে বিভিন্ন দিক দিয়ে অর্থ করে শ্লোকের গভীরতাকে অনেক ভেতরে নিয়ে যান। এভাবে ব্যাখ্যা না করলে ভাগবতের কাহিনীগুলি আর দশটা সাধারণ কাহিনীর মত হয়ে যাবে। ভাষ্যকাররা এক একটি শ্লোকের এত রকম ভাবে ব্যাখ্যা করছেন যে এক একটি শ্লোকই যেন এক একটা কাহিনীর রূপ নিয়ে নিয়েছে।

যেমন বলছেন – পূতনা হল অবিদ্যা, ভগবান যদি চোখ খুলে পূতনার দিকে দৃষ্টিপাত করেন তাহলে অবিদ্যা আর দাঁড়াতে পারবে না। বিদ্যার সামনে অবিদ্যার কোন অস্তিত্ব থাকে না, আলোর সামনে যেমন অন্ধকার থাকতে পারে না। ভগবান হলেন জ্ঞানস্বরূপ, ঈশ্বরের জ্ঞানের সামনে অবিদ্যার অস্তিত্বই থাকবে না। তিনি যদি চোখ খুলে পূতনার দিকে তাকান তাহলে পূতনার সেখানেই নাশ হয়ে যাবে। আর অবিদ্যা যদি না থাকে তাহলে লীলা হবে না, লীলা পোষ্টাইও হবে না, সেইজন্য ভগবান চোখটা বন্ধ করে নিয়েছেন। সংসারের অনেক কিছুই আমরা জানি না এটা এই রকম হলো কেন, ভগবান কেন এরকম করলেন। আমরা তাই 'তাঁর লীলা খেলা' বলে সব সংশয়কে মাথা থেকে নামিয়ে দিই। যদি কেউ ব্যাখ্যা করতে চান তখন অনেক রকম ব্যাখ্যা দেওয়া যেতে পারে। যেমন, ব্যাখ্যাকার শ্রীকৃষ্ণের চোখ বন্ধ করে দেওয়াকে বোঝাতে চাইছেন ভগবানের সামনে অবিদ্যা টিকতে পারে না, তাই তিনি চোখ বন্ধ করে নিলেন। তাহলে আমি বলতে পারি শ্রীকৃষ্ণকে তো কংসের লোকরাও দেখেছিল, কংসও দেখেছিল এরাও তো অবিদ্যা, এদের সঙ্গে লড়াইও করেছিলেন, তখন কেন শ্রীকৃষ্ণ চোখ বন্ধ করে নেননি? এগুলোকে এভাবে চুলচেরা বিশ্লেষণ করা যায় না, কারণ এটাই ভাবরাজ্য, ভাবরাজ্যের কোন কিছুকে যুক্তি-তর্ক দিয়ে বিচার করা যায় না। যখন ভাগবতের প্রবচনাদি হয় তখন কথাকারদের এভাবেই ব্যাখ্যা করতে হয়, তা নাহলে লোকের মনে বিদ্যা অবিদ্যার ব্যাপারে ধারণা হবে না।

আবার এর উল্টোটা বলছেন পূতনা শব্দের যদি সংস্কৃতে শব্দবিন্যাস করা হয় তখন তার মানে হয় '*পূতানপি নয়তি*' পূত মানে পবিত্র – অর্থাৎ পূতনা এত অপবিত্র আর নৃশংস যে, যে শিশুরা এত পবিত্র তাদেরকেও এই পূতনা হত্যা করে। এই রকম জঘন্য নারীর মুখ দেখতে নেই, সেইজন্য ভগবানে চোখ বন্ধ করে দিয়েছেন। এখানে আগের ব্যাখ্যা থেকে ঠিক উল্টো হয়ে গেল। আরেকটি ব্যাখ্যায় বলছেন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভাবছেন এই জন্মে এই মেয়েটি তো এমন কোন সাধন-ভজন করেনি যে যার পূণ্যফলে আমার দর্শন লাভ করবে। হয়তো আগের জন্মে কিছু করা থাকতে পারে বলে এই জন্মে আমার হাতেই বধ হওয়ার জন্য এসে পড়েছে। ভগবান চোখ বন্ধ করে বিচার করছেন। ভগবানকে চোখ বন্ধ করে বিচার করতে হবে এটা আবার যুক্তিতেই দাঁড়ায় না। কারণ যিনি চর অচরের আত্মা তাঁকে চোখ বন্ধ করে কেন ভাবতে হবে? কিছু ভাবতে গেলে আমাকে আপনাকেই চোখ বন্ধ করতে হয়।

ভগবান আবার বিচার করছেন – ইস্! এই পাপিনীর দুধ আমাকে খেতে হবে! চিরতার মত মারাত্মক তেতো জল খাওয়ার সময় যেমন লোকেরা কোন রকমে চোখ বন্ধ করে ঢক্ করে খেয়ে নেয়, ভগবানও ঠিক তেমনি লীলা করতে হবে বলে এই ভেবে কোন রকমে পাপিনীর দুধটা খাওয়ার জন্য চোখ বন্ধ করে নিয়েছেন। এরপর বলছেন – শ্রীকৃষ্ণ ভাবছেন এই গোকুলে এলাম মাখন মিছরি খাব বলে, আর ষষ্টির দিনেই আমাকে বিষ পান করতে হচ্ছে, সেইজন তিনি চোখ বন্ধ করে ভগবান শিবের ধ্যান করলেন 'হে ভগবান শিব! আপনার বিষ হজম করার শক্তি আছে, সমুদ্র মন্থনের সময় যে হলাহল বেরিয়ে এসেছিল সেটাকে আপনি নিজের কণ্ঠে ধারণ করে এই জগৎকে ভস্ম হয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করেছিলেন, বিষকে সামলানো আপনার কাজ তাই এখন আপনি আসুন আর এই বিষ পান করে যান আর নির্বিঘ্নে আমাকে দুধটুকু পান করতে দিন'। ভাগবত কথার ব্যাখ্যা এই ভাবেই করা হয়। কিন্তু প্রত্যেকটি ব্যাখ্যারই একটা যৌক্তিকতার জোর আছে। কেননা ভগবান যখন জন্ম নিয়েছেন, তখন তিনি একদিনের, কি ছয় দিনের, কি কয়েক মাসের, সে যে কদিনেরই হোন না কেন তিনি ভগবান তাঁর বিবেক বুদ্ধি এক ভাবে সমান থাকবে।

একটা কাব্যিক ব্যাখ্যা করে বলছেন — অন্য দিকে ভগবানের যে চোখ, সেই চোখেরা বলছে – এই যে পূতনার চোখ দুটো এরা আমাদেরই স্বজাতী, কিন্তু পূতনা এত ক্রূর, এই চোখ যদি না থাকে তার সৌন্দর্য চলে যায়, পূতনার মুখে যে একটু সৌন্দর্য রয়েছে এটা আমাদের জ্ঞাতি ভাইদের জন্যই হয়েছে। কিন্তু একটা হিংস্র জঘন্য পাপিনীর মুখের উপর এই চোখ শোভা দিচ্ছে, যতই আমাদের জ্ঞাতী ভাই হোক এদের দিকে আমরা তাকাব না। এর মানে হল, আমি আপনি ভাই ভাই, এখন আপনি একটা দুষমনের দলে যোগ দিলেন, পরে আপনি আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন তখন আপনার প্রতি একটা ঘৃণা বোধ হওয়াতে আমি আপনার দিকে তাকাবই না। এইজন্য শ্রীকৃষ্ণের চোখটা নিজেই বন্ধ হয়ে গেল। শ্রীকৃষ্ণ যেন নিজে থেকে বন্ধ করেননি, চোখগুলো নিজে থেকেই বন্ধ হয়ে গেছে এই ভেবে যে আমাদের জ্ঞাতি ভাইদের দিকে আমরা তাকাবই না। আবার আরেকটা ব্যাখ্যাতে বলছেন — ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভাবছেন আমি যদি এর দিকে দৃষ্টিপাত করি তাহলে এই পাপিনীর সব পাপ মুহুর্তে ক্ষয় হয়ে উদ্ধার পেয়ে যাবে, কারণ ভগবানের কৃপাদৃষ্টি যার উপর পড়ে সে উদ্ধার হয়ে যায়। পূতনার দিকে ভগবান যদি চোখ মেলে তাকান তাহলে পূতনার আর বধ হবে না, উল্টে তার উদ্ধার হয়ে যাবে, সেইজন্য ভগবান চোখ দুটো বন্ধ করে দিলেন। আরেকটি খুব মজার ব্যাখ্যাতে বলছেন — মানবলীলা করার জন্য আমি এই দেহধারণ করে এসেছি আর প্রথমেই কিনা আমাকে একটা স্ত্রীলোকের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হতে হচ্ছে, এই বিরক্তিতে ভগবান চোখ বন্ধ করে দিলেন।

কিন্তু এর মধ্যে এই ব্যাখ্যাটি খুব উচ্চ চিন্তন থেকে করা হয়েছে। গীতায় ভগবান বলছেন *উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্যাং কর্ম চেদহম্*, হে অর্জুন! আমি যদি কাজ না করি তাহলে এই জগৎ উৎসন্নে চলে যাবে। স্বামীজীর একটা বিখ্যাত উক্তি আছে 'গীতা পড়ার থেকে ফুটবল খেলা ভালো, ফুটবল খেললে গীতা ভালো বুঝতে পারবে'। স্বামীজীর এই উক্তির তাৎপর্য আর এর গুরুত্ব খুব ভালো করে বোঝা দরকার। কর্মের দুটি রূপ, একটাতে আমাদের জীবন তৈরী হয়, আর দ্বিতীয়তঃ যে জিনিষটা চলছে তাকে স্থিতিতে

রাখতে সাহায্য করে। ভারতের দুর্ভাগ্য যে, ভারত হল একটি অত্যন্ত তামসিক প্রধান দেশ। গীতার বক্তব্য বোঝার জন্য দরকার সত্ত্বগুণ, সত্ত্বগুণ অর্জন করার আগে রজোগুণকে জাগাতে হবে। রজোগুণের প্রভাবে মানুষ বলবে 'আমি চাইলে জগৎ জয় করে নিতে পারি, জগতে এমন কোন কিছু নেই যেটাকে আমি জয় করতে পারবো না, জগতে এমন কোন কাজ নেই যে আমি সেই কাজকে উদ্ধার করতে পারবো না'। শুধু মুখে বলা আর বোধ করা নয়, রজোগুণের প্রভাবে সত্যিকারের এই ক্ষমতা তার মধ্যে আসবে। এই ক্ষমতাকেও যদি সে উপেক্ষা করে এগিয়ে যায়, তারপরে তার মধ্যে সত্ত্বগুণ আসবে। সেইজন্য গীতায় ভগবান অর্জুনকে বারবার বলছেন কাজ কর, কাজ করে যাও। কাজের দ্বিতীয় দিকটাও খুব গুরুত্বপূর্ণ, কাজ একটা জিনিষকে তার স্থিতিতে ধরে রাখে। যেমন বেলুড় মঠ, প্রথমের দিকে যাঁরা সাধনা করেছিলেন তাঁরা এক ধরণের কাজ করেছিলেন। কিন্তু এখন যাঁরা বেলুড় মঠের সঙ্গে যুক্ত আছেন তাঁদের কাজ হল যে কাজ ঠাকুর, মা ও স্বামীজী শুরু করে গিয়েছিলেন সেটাকে ধরে রাখা। ভগবানও যখন সৃষ্টি কার্য করেন তখন এক রকম আর পরে সেটাকে ধরে রাখাটা আরেক রকম। ভগবান যদি ধরে না রাখেন এই সৃষ্টিটাই তখন ধ্বংস হয়ে যাবে। পদার্থ বিজ্ঞানে বলে এ্যনট্রপি নিয়মের জন্য যে কোন জিনিষ ধীরে ধীরে ক্ষয় হতে হতে একদিন নষ্ট হয়ে যাবে। আচার্য শঙ্কর তাঁর একটি ভাষ্যে বলছেন, যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি কখনই চাইবেন না সেই সৃষ্টিটা নাশ হয়ে যাক। শ্রীমাও বলছেন – যিনি সৃষ্টি করেন তিনিই জানে সৃষ্টি কার্য কত কঠিন। যদিও আমরা মনে করি ভগবান নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের মত সৃষ্টি করেন, তাঁর ইচ্ছা মাত্র সৃষ্টি হয়ে যায়, কিন্তু আচার্য শঙ্করও অন্য ভাবে বলছেন তিনিও চান না সৃষ্টিটা নাশ হয়ে যাক। দুটো খুব authoritative source থেকে দুই রকমের কথা পাওয়া যাচ্ছে, একটা শ্রীমা বলছেন, যিনি সৃষ্টি করেন তিনি জানেন সৃষ্টি কার্য কত কঠিন, দ্বিতীয় আচার্য বলছেন সৃষ্টিকর্তা সৃষ্টির নাশ হোক কখনই চান না। শ্রীমা ছবি আঁকা, সাহিত্য রচনা, বাড়ি করা নিয়ে বলছেন না, তিনি জগৎ সৃষ্টিকে নিয়ে বলছেন।

এই জগৎকে সামলে রাখার কাজও খুব দুরূহ। সামলে রাখার কাজে গোলমালটা সব থেকে বেশী তৈরী হয় দুষ্ট প্রাণীদের থেকে। আর এটাই মৌলিক নিয়ম যে, জগতে দুষ্ট লোকের সংখ্যা সব সময় বেশী হবে। অসুরদের সংখ্যাও বেশী ছিল, আর অসুরদের কাজ হল দেবতাদের মারধোর করে স্বর্গ থেকে বিতাড়িত করা, মানে ওদের কাজই হল ভালো লোকদের কষ্ট দেওয়া। অসুরদের সামলানোর ক্ষমতা দেবতাদেরও নেই, ঋষিদেরও ছিল না, মানুষের তো নেইই। এর ফলে কি হবে? সৃষ্টিটা উচ্ছন্নে যাবে। এবার তাহলে ভগবানকে নামতে হবে। কিন্তু অসুর হোক, রাক্ষস হোক, দেবতা হন, ঋষিরাই হন সবাই তো ভগবানরই সৃষ্টি। তিনি মানুষ যখন করেছেন তখন বাঘ, সিংহের মত হিংস্র প্রাণী, সাপ বিছের মত বিষাক্ত সরিসৃপ তিনিই সৃষ্টি করেছেন। আবার সবারই নিজস্ব ধর্ম আছে। কিন্তু তিনি যদি দেখেন দুষ্ট প্রাণী একটা অবস্থায় নিজের ধর্মকে অতিক্রম করে জগতের ভারসাম্যকে নষ্ট করতে যাচ্ছে তখন তিনি তাকে ঐ জায়গাটাতে মারতে থাকেন। কারণ সৃষ্টিকে একটা ভারসাম্য বজায় রেখে চলতে হয়, আমরা যেমন আজকাল ecological balanceএর কথা বলছি। দুষ্ট প্রাণীরা অজান্তায় হোক আর জান্তায় হোক নিজেদের ক্রুর স্বভাব বশতঃ সব সময় সৃষ্টির ভারসাম্যটাকে ভেঙে দিচ্ছে। সাপ ইঁদুর খাবে, ইঁদুর আমাদের শস্য খাবে, বেড়াল ইঁদুরকে খাবে, বেড়ালকে মানুষ বাড়িতে পুষবে, সব কিছুর একটা ভারসাম্য আছে। মাঝখান থেকে একটা প্রজাতিকে যদি মেরে শেষ করে দেওয়া হয় তখন ভারসাম্যটা নষ্ট হয়ে প্রকৃতির রাজ্যে অনেক রকম বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে। আসুরিক প্রবৃত্তির লোকেরা প্রকৃতির ভারসাম্যকে পুরো বিগড়ে দেয়। এদের বিনাশ করার জন্যই ভগবানকে আসতে হয়। ভগবান আবার সবারই স্রষ্টা, তিনি অসুরেরও স্রষ্টা, দেবতাদেরও স্রষ্টা আবার মানুষেরও স্রষ্টা, সবারই স্রষ্টা তিনি। এই পূতনার স্রষ্টাও তো ভগবানই, কিন্তু পূতনাকে বধ করতে হচ্ছে। ভগবান যেন পছন্দ করছেন না, তাই তিনি নিজের চোখ দুটো বন্ধ করে দিলেন। এখানে যতগুলো ব্যাখ্যা আছে তার মধ্যে এই ব্যাখ্যাটাই সব থেকে ভালো ব্যাখ্যা। গীতায় ভগবানের কথার আচার্য শঙ্কর যে ভাষ্য দিয়েছেন সেই ভাষ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এই ব্যাখ্যাটাই সব থেকে প্রাঞ্জল। কেউ যদি এখানে বলে, শ্রীকৃষ্ণ তো আরও অনেককে বধ করেছিলেন তখন তো তার কষ্ট হয়নি। ঠিকই বলছে, কিন্তু দর্শনের দিক থেকে এখানে যে কথাটা ব্যাখ্যাকার বলতে চাইছেন,

সেটা সত্যিই খুব সুন্দর। যিনি স্রষ্টা তিনি সৃষ্টির নাশ করতে চান না। কিন্তু আর কোন উপায় নেই, জগতের স্থিতিশীলতাকে রক্ষা করতে ভগবানকে দুষ্টের নাশ করতেই হব।

আজকাল অনেকেই সাহিত্য রচনা করছেন। কিন্তু সবারই জন্মগত সাহিত্যিক প্রতিভা থাকে না, অনেকে আবার সখের সাহিত্যিক হন। যেমন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিভা, সৃজনশীলতা একেবারে মৌলিক, ভেতর থেকে সব বেরিয়েছে, তিনি যদি চারটে শব্দ লেখেন তাতেই একটা ছন্দ এসে যাবে। সবারই এই ধরণের প্রতিভা থাকে না। এই ধরণের সাহিত্যিকরা একটা কিছু লিখতে লিখতে যদি কোন কারণে তাঁর মনে হয়, এই প্যারাগ্রাফটা বা লাইনটাকে রাখা যাবে না, তিনিও মনে করছেন এই কথাগুলোর মধ্যে একটা বিশেষত্ব আছে কিন্তু প্রাসঙ্গিকতার সাথে ঠিক যেন খাপ খাচ্ছে না, তখন ওই লেখাটা কেটে ফেলার সময় লেখকের প্রাণ বেরিয়ে যায়। মা নিজের ছ-মাসের শিশুকে গলা টিপে মেরে ফেলতে গেলে যে কষ্ট পাবে, কোন রচনাকে কেটে বাদ দিতে গিয়ে লেখকেরও ওই রকম প্রাণ বেরিয়ে যায়। কিন্তু কোন পথ থাকে না, কেটে বাদ দিতেই হবে। বেশীর ভাগই যে নিকৃষ্ট মানের রচনা হয় তার কারণ এটাই, detachmentএর জন্য একটা ক্ষমতা থাকা দরকার, এদের এই ক্ষমতাটাই নেই। ছোটবেলা থেকে আমরা শুনে এসেছি মন দিয়ে পড়াশোনা করে যাও, মন লাগিয়ে কাজ করে যাও। কিন্তু মন লাগানো অত্যন্ত সহজ কাজ, মনকে একাগ্র করা, মনঃসংযোগ করা কিছুই নয়, এগুলো অত্যন্ত সোজা। তার থেকে বেশী কঠিন কোন কিছু থেকে মনকে সরিয়ে আনা। যে জায়গাতে মন লেগে আছে, সেখান থেকে মনকে সরিয়ে আনা সত্যিই খুব কঠিন কাজ। শুধু মানুষের জন্যই কঠিন নয়, ভগবানের পক্ষেও কঠিন। আচার্য ঠিক এই কথাই বলছেন, ভগবানের পক্ষে নিজের সৃষ্টির নাশ করাটা একেবারেই পছন্দের কাজ নয়, কল্যাণকর তো নয়ই। Detachmentএর মানেই হল যে জিনিষ থেকে মন তুলে নেওয়া হল সেটাকে নাশ করে দেওয়া। আপনি একজনকে ভালোবেসেছেন, এখন কোন কারণে তাকে মন থেকে সরিয়ে দিতে হবে, তার মানে হল সম্পর্কের মৃত্যু হয়ে গেল। খুব কঠিন, ঈশ্বরই পারেন না। ভাষ্যকাররা এখানে এই দর্শনকেই নিয়ে এসেছেন। যখন দুষ্টের দমনের জন্য অসুরদের বধ করতে হয় তখন ভগবানেরও কষ্ট হয়। মা যখন সন্তানকে মারে তখন মায়ের যে কষ্ট হয়, ভগবানেরও ঠিক ততটাই কষ্ট হয়।

এই ভাবে অনেক রকম ব্যাখ্যা দেওয়ার পর শেষে আসল ব্যাখ্যাটা করা হচ্ছে – সব বাচ্চাদের এটাই স্বভাব, যখন মায়ের কোলে থাকে তখন খুব লাফায়, আর অপরিচিতদের কাছে গেলে ভয় পেয়ে চোখমুখ বন্ধ করে ফেলে। তাই অপরিচিত পূতনাকে দেখে শ্রীকৃষ্ণ চোখটা বন্ধ করে নিলেন। ব্যাসদেব শুধু এতটুকু বললেন *নিমীলিতেক্ষণঃ*, বালক শ্রীকৃষ্ণ চোখ বন্ধ করে দিলেন। এতটুকু একটা ঘটনাকে ব্যাখ্যাকাররা যে এত ভাবে ব্যাখ্যা দিলেন এর ফলে মানুষের মন যে কোন একটা ছোট্ট ভাব নিয়ে খুব সহজে ভগবানের চিন্তন-মনন করতে পারবে। এখন যার যে ব্যাখ্যাটা পছন্দ সেই ব্যাখ্যাকেই সম্বল করে শ্রীকৃষ্ণের চিন্তনে মনকে গভীরে নিয়ে যেতে পারবে।

ভগবান রুদ্ররূপ ধারণ করে পূতনার প্রাণশক্তি শুষে নেওয়া এবং পূতনার পতন

ব্যাসদেব পূতনার খুব সুন্দর বর্ণনা দিচ্ছেন, কারুকার্য করা খাপের মধ্যে যেমন তীক্ষ্ণ ধারালো তরোয়ালকে লুকিয়ে রাখা হয় ঠিক তেমন পূতনার অন্তরটা কুটিলতায় ভরা কিন্তু বাইরে সুমধুর ব্যবহার আর তার হাবভাবে সবার বিশ্বাস অর্জন করে নিয়েছে। সবাই পূতনাকে অন্দরমহলে যেতে দেখে কেউ আর বাধা দেয়নি। পূতনা গিয়ে বাচ্চাকে নিজের স্তন পান করাবে বলে কোলে তুলে নিয়েছে। এখানে বলছেন অজান্তে দড়ি ভেবে যেমন কেউ বিষধর সাপকে তুলে নেয় ঠিক সেই রকম পূতনা অজ্ঞতাবশতঃ শ্রীকৃষ্ণকে কোলে তুলে নিয়েছে। যাই হোক শ্রীকৃষ্ণ এবার পূতনার দুধ পান করতে শুরু করতে যাচ্ছেন। পূতনার স্তনে বিষ মাখানো, এতো তীব্র বিষ যে কেউ হজম করে নিতে পারবে না। এখানে যত রকমের বর্ণনা আছে সবেতেই আমরা পৌরাণিক কাহিনী বানিয়ে দিতে পারি। যেমন আমরা বলতে পারি, শিব গিয়ে বিষ্ণুকে বললেন 'হে ভগবান্! সমুদ্র-মন্থনের সময় আপনি বেছে বেছে লক্ষ্মীকে নিজের কাছে টেনে নিলেন, তার সাথে অমৃতও পান করে নিলেন, আর হলাহলের বেলায় আমার দিকে ঠেলে দিলেন। সব থেকে ভালো দুটো জিনিষই আপনি নিজের কাছে রেখে দিলেন আর যত বিষ আমাকে পান করতে হল। আমি জানি এগুলো সব আপনারই চক্রান্ত। ঠিক

আছে আমিও আপনাকে অভিশাপ দিচ্ছি – আপনি যখন গোকুলে অবতার হয়ে যাবেন তখন শৈশবে আপনাকেও দুধের বদলে বিষ পান করতে হবে’। এভাবে একটা কাহিনী বানিয়ে দিলেই হল, আর পৌরাণিক কাহিনী এভাবেই তৈরী হয়। এখানে দেখানো হচ্ছে ভগবান অবিদ্যার নাশ করছেন। ভক্তিশাস্ত্রে ভগবানের ক্ষমতা দেখাতে হবে। ভগবান বড় হয়ে অনেক অসুর বধ করেছিলেন, সেটা এমন কিছু নয়। কিন্তু ভগবানের বিশেষ ক্ষমতা, জন্ম থেকেই তিনি অসুরদের বধ করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। তার জন্য পূতনাকে একটা চরিত্র বানিয়ে সেখানে নিয়ে আসতে হয়েছে।

বলছেন ***তস্মিন্ স্তনং দুর্জরবীর্যমুল্বণং ঘোরাঙ্কমাদায় শিশোর্দদাবথ। গাঢ়ং করাভ্যাং ভগবান্ প্রপীড্য তৎ প্রাণৈঃ সমং রোষসমন্বিতোঽপিবৎ।।১০/৬/১০।*** পূতনার স্তনে প্রচণ্ড ভয়ংকর বিষ লাগানো ছিল। কেউ কোন ভাবে ওই বিষ হজম করে নিতে পারবে না। বিষ আর ক্রোধ হল দুই সহোদর। ক্রোধ, আগুন, বিষ এই জিনিষগুলো সব ভাই ভাই। ভগবান বিষ পান করতে যাবেন তাই তিনি বিষের ভাই ক্রোধকে নিজের সঙ্গী রূপে নিলেন, কারণ ক্রোধ দিয়ে এই বিষকে কাটতে হবে। শ্রীকৃষ্ণ অবতারে ভগবান কোথাও বেশী ক্রোধ প্রকাশ করেননি, সব সময়ই তাঁর মধুর স্বভাব ছিল। গোপীদের সাথে, গোপবালকদের সাথে, সুদামার সাথে সুমধুর স্বভাব, এমনকি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধেও তিনি তাঁর মিষ্ট ও শান্ত ভাবকেই বেশীর ভাগ সময় অবলম্বন করে থাকতেন। নৃসিংহ বা অন্যান্য অবতারে ভগবানের যে ক্রোধের মূর্তি দেখা গেছে, শ্রীকৃষ্ণ অবতারে ভগবান সেই রকম ক্রোধের রূপ ধারণ করেননি। কিন্তু ক্রোধ ভগবানেরই একটা রূপ। ভগবান এখানে শিশু রূপে পূতনাকে বধ করছেন না, ক্রোধ অর্থাৎ যেটা রুদ্রের রূপ, সেই রুদ্রের শক্তিকে দিয়ে ভগবান তখন দুহাতে সজোরে চেপে সেই স্তন থেকে পূতনার প্রাণশক্তিকে শুষে নিতে শুরু করলেন।

সা মুঞ্চ মুঞ্চালমিতি প্রভাষিণী নিষ্পীড্যমানাখিলজীবমর্মণি। বিবৃত্য নেত্রে চরণৌ ভুজৌ মহুঃ প্রস্বিন্নগাত্রা ক্ষিপতী রুরোদ হ।।১০/৬/১১। শ্রীকৃষ্ণ যখন প্রাণ শুষে নিতে শুরু করেছেন তখন পূতনা বুঝতে পারছে যে আমার সমস্ত প্রাণ নিংড়ে বেরিয়ে আসছে, সে তখন ‘ওরে ছাড়! ছাড়!’ বলে প্রচণ্ড চিৎকার করতে শুরু করছে। আর সমস্ত শক্তি দিয়ে বাচ্চাকে বুক থেকে ছাড়িয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিতে চাইছে। একটা সামান্য জোঁকে ধরলে মানুষ ছাড়াতে পারে না, নুন দিতে হয়, কত কিছু করতে হয়। আরে সেখানে ভগবান বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের পুরো রোষ নিয়ে আঠার মত পূতনার বুকের মধ্যে লেপ্টে আছেন। প্রাণ নিংড়ে নেওয়ার যে কী ভয়ংকর যন্ত্রণা হতে পারে কল্পনা করা যায় না। পূতনা হাত-পা ছুড়ছে, মাটিতে পড়ে চিৎকার করে যাচ্ছে, শ্রীকৃষ্ণ ওই মাটিতেই পূতনার বুকের উপরে চিপ্টে লেগে আছে। পূতনা চিৎকার করতে করতে শ্রীকৃষ্ণকে শুদ্ধু নিয়ে আকাশে উড়ে গেল। সেখানেও শ্রীকৃষ্ণ তাকে ছাড়ছে না। শ্রীকৃষ্ণের প্রাণ নিংড়ে নেওয়ার দাপটে তখন পূতনার নিজের আসল সেই বিকট চেহারা বেরিয়ে এসেছে। রাক্ষসীরা যদিও সুন্দরী নারীর রূপ ধারণ করে আসে কিন্তু যখন প্রাণ বেরিয়ে যায় তখন তার আসল রাক্ষসীর রূপটা বেরিয়ে আসে।

এই ভাবটাই নামকরা ইংরাজী লেখক অস্কার ওয়াইল্ড তাঁর বিখ্যাত The Picture of Dorian Gray বইতে খুব সুন্দর ফুটিয়ে তুলেছেন। একজন লোক প্রচুর বদমাইশি, কুকর্ম, দুষ্কর্ম করে বেড়াত কিন্তু তার চেহারের উপর তার কোন ছাপ পড়ত না, কিন্তু ছাপটা তার একটা ছবির উপর গিয়ে পড়ত। ছবিটাকে সে আবার লুকিয়ে রাখে যাতে কেউ জানতে না পারে। কুড়ি-বাইশ বছর বয়সে তার চেহার যেমনটি ছিল চিরদিন তার সেই হ্যাণ্ডসাম চেহারাটা থেকে গিয়েছিল। চল্লিশ পয়তাল্লিশ বয়সের হয়ে গেছে, কিন্তু এই বয়সেও সে ছোকড়া যুবকের মত লম্পটগিরি করে বেড়ায়। প্রচুর মদ খায়, যত মেয়ে আছে সবাইকে নষ্ট করে বেড়ায়, কিন্তু চেহারাটা তার বাইশ বছরের যুবকের মত মিষ্টি। আর পুরো শহর, শহরের আশেপাশে যত মেয়ে ছিল সবাই এই লোকটিকে পাওয়ার জন্য উন্মাদিনী হয়ে গেছে। এদিকে তার ছবিটা দিনে দিনে ভয়ংকর ক্রুঢ় দেখতে হয়ে যাচ্ছে। যত বাজে কাজ করছে তার ছাপটা ওই ছবির উপর গিয়ে পড়ছে। তারপর এমন অবস্থা হল যে লোকটি মানুষ খুন করতে নেমে পড়েছে। কিন্তু ওর চেহারাটা সেই রকম মিষ্টি, নিষ্পাপ। তারপর একটা সময় আর কোন দিক থেকে সে বাঁচার পথ পেল না। শেষমেশ দেখছে তাকে ধরা পড়ে যেতেই হচ্ছে। তখন সে

আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে। আত্মহত্যা করার আগে লোকটি সেই ছবিটার কাছে গিয়ে ছবিটার উপর ছুরি চালাতে লাগল। ছুরি চালাচ্ছে আর বলছে 'তোমার জন্যই আজ আমার এই দুরবস্থা'। এই বলে সেই ছুরিটা নিজের বুকে বসিয়ে দিয়েছে। সব লোকজন খুঁজতে খুঁজতে এসে দেখে এই কাণ্ড। সবাই তখন দেখছে ছবিতে লোকটিকে কি মিষ্টি দেখাচ্ছে আর লোকটার মৃত শরীরটাকে প্রচণ্ড ভয়ংকর দেখাচ্ছে। এতদিন ধরে যত পাপকর্ম, দুষ্কর্ম করেছে সব তার চেহারায় ফুটে উঠেছে। লোকটির নিজের ভৃত্যও তাকে চিনতে পারছে না। ওর একটা প্ল্যাটিনামের দাঁত ছিল, সেই দাঁত দেখে লোকটিকে সবাই চিনতে পেরেছে। এই একটা ধারণা আছে যে, কেউ ভালো একটা রূপ ধারণ করে রাখতে পারে, কিন্তু একদিন তার ওই মুখোশটা খসে পড়ে যাবে। সেই ভাবটাই ভাগবত পূতনার কাহিনীর মাধ্যমে খুব সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তুলেছে।

নিশাচরীত্থং ব্যথিতস্তনা ব্যসুর্ব্যাদায় কেশাংশ্চরণৌ ভুজাবপি। প্রসার্য গোষ্ঠে নিজরূপমাস্থিতা বজ্রাহতো বৃত্র ইবাপতন্নৃপ।।১০/৬/১৩। প্রাণ নিংড়ে নেওয়ার প্রাণান্তকর যন্ত্রণায় নিতান্ত কাতর হয়ে সেই নিশাচরী পূতনা নিজের প্রকৃত রূপকে আর গোপন করে রাখতে পারল না, তার রাক্ষসী রূপ বেরিয়ে পড়ল। সাথে সাথে তার শরীর থেকে প্রাণও নির্গত হয়ে গেল। পূতনা তখন মুখব্যাদান করে হাত-পা ছড়িয়ে ভূপাতিত হয়ে গেল। বলছেন, ইন্দ্রের বজ্রের আঘাতে বৃত্রাসুর যেমন ছিটকে পড়েছিল, ঠিক সেই রকম পূতনাও বৃত্রাসুরের মত গোষ্ঠভূমিতে এসে পতিত হল। এখানে একটা কাব্যিক বর্ণনা দিয়ে বলছেন, পূতনা যখন মাটিতে পড়েছে তখন ছয় ক্রোশ ব্যাপি যত গাছপালা ছিল সব পূতনার ওই বিশাল শরীরের চাপে ভেঙে ধুলিসাৎ হয়ে গেল। তার মানে কত বড় শরীর ছিল পূতনার! এগুলো সবই কাব্যিক বর্ণনা, খুব আক্ষরিক অর্থে নিলে সব গোলমাল হয়ে যাবে।

শুধু এটুকু নয়, আবার বলছেন ***অন্ধকূপগভীরাক্ষং পুলিনারোহভীষণম্। বদ্ধসেতুভুজোর্বঙ্ঘ্রি শূন্যতোয়হ্রদোদরম্।।১০/৬/১৬।*** পূতনার চোখদুটো অন্ধকূপের মত, তার জঘন দেশ নদীর কিনারার মত বিস্তৃত, হাত, পা, জঙ্ঘা বড় বড় নদীর উপর সেতুর মত আর পেটটা মনে হচ্ছে যেন জলশূন্য একটা সরোবর। কূপ, নদী, সেতু আর সরোবর এই চারটের তুলনা করে পূতনার শরীরের বর্ণনা করছেন। প্রচণ্ড চিৎকার চেঁচামেচি শুনে যশোদা ও বাড়ির অন্য মহিলারা ছুটে এসে দেখছে এই কাণ্ড। এই ভয়ংকর কাণ্ড দেখে প্রচণ্ড ঘাবড়ে গিয়ে সবাই কান্নাকাটি শুরু করে দিয়েছেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ নির্বিকার। সবাই দেখছেন পূতনার বুকের উপর শ্রীকৃষ্ণ খেলা করে যাচ্ছেন। যশোদা সহ ব্রজের সব গোপীরা খুব ভয় পেয়ে গেছেন।

শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গলার্থে বিভিন্ন উপাচারাদির অনুষ্ঠান

তখনকার দিনে সন্তানের মঙ্গলের জন্য অনেক রকম টোটকার প্রচলন ছিল। যেমন যশোদা ও রোহিণী কৃষ্ণের শরীরে গোপুচ্ছ ঘুরিয়ে দিলেন, তারপর তাঁকে গোমুত্র দিয়ে স্নান করান হল। তার সঙ্গে গো-রজ লেপন করছেন। গো-রজ মানে, যেখানে গরু চড়ে সেখানকার ধুলি। আর শ্রীকৃষ্ণের শরীরের বারোটি অঙ্গে গোবরের তিলক অঙ্কিত করে দেওয়া হল। এগুলো তখনকার দিনে রক্ষাকবচের জন্য টোটকা হিসাবে ব্যবহার করা হত। শুধু গরুকে কেন্দ্র করে কত রকমের টোটকা করা হচ্ছে ***গোমূত্রেণ স্নাপয়িত্বা পুনর্গোরজসার্ভকম্। রক্ষাং চক্রুশ্চ শকৃতা দ্বাদশাঙ্গেষু নামভিঃ।।১০/৬/২০।*** আমাদের অনেক ইতিহাসবিদরা মনে করেন যে বেদের সময় ভারতে গোমাংস খাওয়ার প্রচলন ছিল। কিন্তু ঐতিহাসিক আল বেরুনি বলছেন, বেদের সময় গোমাংস খাওয়ার এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। কারণ বেদ বা কোন ভারতীয় শাস্ত্রে কোথাও পাওয়া যায় না যে বেদের সময় গোমাংস খাওয়া হত। এই নিয়ে অনেক বিতর্ক অনেক দিন ধরে চলে আসছে। কিন্তু পুরাণ হিন্দু ধর্মে গরুকে প্রচণ্ড মাহাত্ম্য দিয়ে একটা বিশেষ জায়গা করে দিয়েছে। পুরাণে এসে গরুকে নিয়ে সব রকম সংশয় আর বিতর্কের অবসান হয়ে গেছে। হিন্দু ধর্মে গরু মা, গরু দেবী গরুর মধ্যে সব দেবতার বাস। বৈদিক যুগ থেকে পুরাণে এসে হিন্দু ধর্মের এটা একটা বিরাট উত্তরণ। কারণ বেদে সেভাবে আমরা গরুর পূজা পাই না।

গোপ্যঃ সংস্পৃষ্টসলিলা অঙ্গেষু করয়োঃ পৃথক্। ন্যস্যাত্মন্যথ বালস্য বীজন্যাসমকুর্বত।। ১০/৬/২১। এরপর গোপীরা শিশুর মঙ্গলার্থে একাদশ বীজমন্ত্রের দ্বারা পৃথক পৃথক ভাবে নিজেদের অঙ্গন্যাস

এবং করন্যাস করলেন আর শ্রীকৃষ্ণের সর্বাঙ্গেও বীজন্যাস করে দিলেন। পূজোর আগে অঙ্গন্যাসাদি করাটা পূজোর অঙ্গ। বলা হয় কোন শুভ কাজ করার সময় অশুভ শক্তি সেই কাজে বিঘ্ন উৎপন্ন করতে চেষ্টা করে। পূজোও একটা শুভ কাজ। বিবাহ, উপনয়ন এগুলোও শুভ কর্ম। শুভ কর্মে বিঘ্ন হওয়ার একটা আশঙ্কা সব সময় থাকে। সেইজন্য কিছু বিশেষ মন্ত্র আছে সেই মন্ত্র দিয়ে রক্ষাকবচ তৈরী করা হয়। রক্ষাকবচের সাথে এর মধ্যে একটা শুদ্ধিকরণের ব্যাপারও থাকে। এখানেও পর পর কয়েকটি শ্লোকে ন্যাসের বর্ণনা করা হয়েছে।

এখানে একটা জিনিষ জানার আছে, যে কোন ধর্মের সাহিত্য চার প্রকারের হয় – এই চার রকম সাহিত্যের মধ্যে প্রথমে হল দর্শন, দ্বিতীয় পূজা অর্চনা বিধি, তৃতীয় সামাজিক ও ধর্মীয় আচার আচরণের বিধি আর চতুর্থ কাহিনী। হিন্দু ধর্মের চার ধরণের সাহিত্যের পরিষ্কার চারটি আলাদা আলাদা উৎস। হিন্দু ধর্মের দর্শন বেদ উপনিষদ থেকে আসে, পূজা অর্চনা মূলতঃ তন্ত্র থেকে আসে, আচার-সংহিতা স্মৃতি গ্রন্থ থেকে আসে আর কাহিনীর মাধ্যমে আধ্যাত্মিক তত্ত্বগুলো আসে পুরাণ থেকে। কিন্তু পুরাণের একটা আলাদা বৈশিষ্ট্য হল, পুরাণের মধ্যে এই চার ধরণের সাহিত্যই অল্প-বিস্তর পাওয়া যাবে। ভাগবত পুরাণকে যে পঞ্চম বেদ বলা হয়, তার প্রধাণ একটা কারণ হল এর মধ্যে হিন্দু ধর্মের পুরো দর্শনকে পাওয়া যাবে, হিন্দুদের আচার-সংহিতা পাওয়া যাবে, অর্চনা বিধি আর আখ্যায়িকা তো আছেই। এখানে যেমন ন্যাসের বর্ণনা করা হচ্ছে এটাই পূজা অর্চনা বিধি। যখন পৌরাণিক মতে পূজা করা হবে তখন আর তন্ত্র মতকে নিতে হয় না। আমাদের পূজা সাধারণতঃ তিন রকম মতে চলে – বৈদিক মত, পৌরাণিক মত আর তন্ত্র মত। কিন্তু ঠিক ঠিক পূজা অর্চনা বিধিতে তন্ত্রেরই বেশী প্রাধাণ্য। এখানে পৌরাণিক মতে একটা পূজা বিধি বলা হল। যেমন অঙ্গন্যাস ও করন্যাসে ভগবানের নাম করে বলছেন হৃষিকেশ শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয়ের রক্ষা করুন, নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের প্রাণের রক্ষা করুন, খেলার সময় তোমাকে গোবিন্দ রক্ষা করুন, তোমার শয়নের সময় মাধব তোমাকে রক্ষা করুন ইত্যাদি। মজার ব্যাপার হল অঙ্গন্যাসে ভগবানের যত গুলো নাম বলা হচ্ছে সবই শ্রীকৃষ্ণেরই নাম।

কিন্তু মূল কথা এখানে বলছেন ***স্বপ্নদৃষ্টা মহোৎপাতা বৃদ্ধবালগ্রহাশ্চ যে। সর্বে নশ্যন্তু তে বিষ্ণোর্নামগ্রহণভীরবঃ।।১০/৬/২৯।*** ভগবান বিষ্ণুর বিভিন্ন যে নাম আছে, বিভিন্ন অশুভ শক্তির প্রভাব যাতে শ্রীকৃষ্ণের কোন ক্ষতি না করতে পারে, সেই উদ্দেশ্য বিষ্ণুর এক একটা নাম নিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে স্পর্শ করে বলছেন ভগবান বিষ্ণুর নাম গ্রহণে শ্রীকৃষ্ণের এই এই জিনিষ শুভ হোক, এই এই অশুভ শক্তি বিনাশপ্রাপ্ত হোক ইত্যাদি। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে দেবীকবচে দেবীর বিভিন্ন নাম করে করে এইভাবে বলা হয়েছে এই দেবী আমার পূর্বদিক রক্ষা করুন, এই দেবী আমার এই অঙ্গ রক্ষা করুন ইত্যাদি।

মানুষ মরে গেলে তার শরীর থেকে জীবাত্মা বেরিয়ে আসে। জীবাত্মার তখনও চেতনাটা থাকে। আমাদের শরীর তো নিজে কিছু করে না, করে সব চৈতন্য শক্তি। মৃত্যুর পর এই চৈতন্য তো নিজের শরীরকে পরিষ্কার দেখতে পারছে। আমাদের আমি বোধটা শরীরের ভেতরে আছে। এখন কোন কারণে চৈতন্য শক্তি যদি শরীরের বাইরে চলে আসে তখন সে শরীরটাকে পরিষ্কার দেখতে পারছে, যেমন আমার হাতটা বাইরে আমি দেখতে পারছি। মৃত্যুর পর চেতনাটা আমাদের রয়ে গেছে শরীরের মধ্যে, এরপর যখন শরীরটাকে পুড়িয়ে দিচ্ছে, তখন তার মনে হবে – আমি তো বেঁচে আছি, কেন আমাকে পুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে! সেইজন্য কেউ মারা গেলে মৃত শরীরকে বেশী সময় রেখে দেওয়া হয় না, কারণ ওই সময় জীবাত্মা শরীরের কাছেই ঘোরাফেরা করে। জীবাত্মা ব্যাপারটা বুঝতেই পারে না। বাচ্চারা নিজেকে আর নিজের জামাকে এক মনে করে। অথচ মজার ব্যাপার হল বাচ্চারা নিজেকে আর নিজের শরীরকে আলাদা মনে করে। শরীরের সাথে সম্পর্ক হতে বাচ্চাদের কিছুটা সময় লাগে। তারপর শরীরের সাথে তার এমন সম্পর্ক হয়ে যায় যে, যখন তার মৃত শরীরটা পুড়িয়ে দেওয়া হয় তখন সে মনে করে – আমি তো বেঁচে আছি, আমাকে পুড়িয়ে দিচ্ছে কেন! তখন তার একটা দুঃখ হওয়ার সম্ভবনা থাকে। সাধারণ মানুষের কাছে জীবনের একটা সাঙ্ঘাতিক মূল্য, তাদের কাছে জীবনের সব কিছুর দাম আছে। তারা চায় নিজেকে আর নিজের প্রিয়জনকে কীভাবে দীর্ঘ দিন বাঁচিয়ে রাখা যায়। দীর্ঘ জীবনের আশায় তারা এই সব অঙ্গন্যাস, করন্যাস, বীজন্যাস ইত্যাদি করতে থাকে। এরপর শুকদেব বলছেন যখন পূতনাকে দাহ করা শুরু হয়েছে তখন তার শরীর থেকে ধূপের খুব সুগন্ধ নির্গত হতে

থাকল। বলছেন, এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই, কারণ ভগবান স্বয়ং তার দুগ্ধ পান করার সাথে সাথেই পূতনার সব পাপ, আবর্জনা পরিষ্কার হয়ে দেহটা পবিত্র হয়ে গিয়েছিল।

ভগবানকে সন্তান রূপে ভালোবেসে পূজাই উচ্চতম পূজা

বলছেন ***পয়াংসি যাসামপিবৎ পুত্রস্নেহস্নুতান্যলম্। ভগবান্ দেবকীপুত্রঃ কৈবল্যাদ্যখিলপ্রদঃ।। ১০/৬/৩৯।*** ভগবানই কৈবল্য প্রদান করতে পারেন। যিনি অখণ্ড সচ্চিদানন্দ, তাঁকে আত্মা দিয়ে যখন বোধ করা হয় তখন নির্গুণ নিরাকার সচ্চিদানন্দকেই দেখে। আমরাই যখন বুদ্ধি দিয়ে সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দকে দেখছি তখন তাঁকে দেখি ভগবান। মনের এলাকাতে যা কিছু হয় সব তাঁর ইচ্ছাতেই হয়। যতক্ষণ আমি বোধটা আছে ততক্ষণ ঈশ্বরের ইচ্ছা ছাড়া কিছু হবে না। আমি বোধটা যখন চলে যায়, যখন বুদ্ধির এলাকার বাইরে চলে যায়, তখন ঈশ্বরের ইচ্ছা বা আমার ইচ্ছা বা আদৌ কিছু হচ্ছে কিনা বলা যাবে না। বলছেন, ভগবান তো এই কৈবল্য পর্যন্ত দিয়ে দেন, সেই ভগবানকে ব্রজভূমির গাভীরা দুধ খাওয়াচ্ছে, মায়েরা দুধ পান করাচ্ছেন। ব্রজাঙ্গনাদের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি এমনই বাৎসল্য প্রেম উৎসারিত হত যে ব্রজমাতা, গোমাতাগণের স্তন থেকে আপনা হতেই দুগ্ধ স্বরিত হত। ***তাসামবিরতং কৃষ্ণে কুর্বতীনাং সুতেক্ষণম্। ন পুনঃ কল্পতে রাজন্ সংসারোহজ্ঞানসম্ভবঃ।। ১০/৬/৪০।*** শুকদেব পরীক্ষিৎকে বলছে, হে পরীক্ষিৎ! যে গোমাতাগণ, যে ব্রজগোপীরা ভগবানকে নিত্যনিরন্তর নিজের সন্তান রূপে দেখেছেন তাঁরা এই জন্ম-মৃত্যু রূপ সংসার চক্রে আর কোন দিন আবর্তিত হবেন না। কারণ এই সংসার হল অজ্ঞান, অজ্ঞানের জন্যই এই সংসার হয়েছে। এখন সেই শুদ্ধ সচ্চিদানন্দ ভগবানকে তাঁরা সন্তান রূপে ভালোবেসেছেন, সেখানে তাদের কোন চাহিদা নেই।

ঠাকুর যে রামলালাকে নিয়ে সেবা করতেন, খেলা করতেন, যাঁরা বালগোপালকে পূজা করেন, এই ভাবে ভগবানকে নিজের শিশু সন্তান রূপে ভালোবাসাটা হল আধ্যাত্মিক যাত্রার সব থেকে দ্রুতগতি সম্পন্ন যাত্রা পথ। কারণ এখানে কোন চাহিদা নেই। কিন্তু যখন মা কালীর কাছে যাচ্ছে তখন চাহিদার একটা বিরাট তালিকা নিয়ে মা কালীর সামনে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে। ঠাকুরও মা কালীর কাছে প্রার্থনা করছেন – মা ওকে একটু বেশী শক্তি আর ওকে কেন কম শক্তি দিলি, মা বাচ্চা ছেলেরও তো একটা মা চাই, ইত্যাদি। কিন্তু যখন রামলালার সঙ্গে আছেন তখন কোথাও ঠাকুরের কোন কিছু চাওয়া, কোন প্রার্থনা নেই। আধ্যাত্মিক জীবন মানেই নিজের স্বার্থপরতার ত্যাগ। যাঁরা বালগোপালের পূজা করেন, তাঁকে তাঁরা সেবা করে যাচ্ছেন। আপনাকে যাঁর সেবা করতে হয় তাঁর কাছে আপনি চাইবেন কি করে! সম্ভবই না। ওখানেই তো স্বার্থপরতা ইতি হয়ে গেল। ভগবানকে যখন শিশু রূপে, বালগোপাল রূপে পূজা করা হয় সেটাই সব থেকে উচ্চতম পূজা হয়ে যায়। এরপর যেটা উচ্চতম হতে পারে সেটা হল মধুরভাব। যশোদার বাৎসল্য প্রেম আর রাধার মধুর ভাবে প্রেম আধ্যাত্মিক রাজ্যে এই দুটো প্রেম অতি উচ্চমানের প্রেম।

এই সব বলার পর একটা গ্রন্থস্তুতি করে এই অধ্যায়ের সমাপ্তি করছেন। ***য এতৎ পূতনামোক্ষং কৃষ্ণস্যার্ভকমদ্ভুতম্। শৃণুয়াচ্ছ্রদ্ধয়া মর্ত্যো গোবিন্দে লভতে রতিম্।।১০/৬/৪৪।*** যে ব্যক্তি শ্রদ্ধার সঙ্গে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই অদ্ভুত বাল্যলীলার পূতনামোক্ষের বৃত্তান্ত শ্রবণ করবে তার ভগবানের প্রতি প্রেম-ভক্তি হবে। ভাগবতে এই ধরণের গ্রন্থস্তুতি কম আছে কিন্তু অধ্যাত্ম রামায়াণে প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষ একটা করে গ্রন্থস্তুতি দেওয়া হয়েছে। এইভাবে পূতনাকে বধ করে শ্রীকৃষ্ণের বাললীলা শুরু হল।

মহাভারতে বর্ণনা আছে, যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে শ্রীকৃষ্ণকে প্রধাণ অর্ঘ্য দেওয়াতে শিশুপাল খুব রেগে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে অনেক গালমন্দ করতে শুরু করে। শিশুপাল শ্রীকৃষ্ণকে সব সময় বিদ্বেষ করত, আর যখন শ্রীকৃষ্ণকে গালাগাল দিতো তখন এই পূতনা উদ্ধারের ঘটনার কথা উল্লেখ করে বলত – এই কিনা একটা অবলা নারীকে বধ করেছে! দুটো পচা মরা গাছকে উপড়ে দিয়েছিল (যমলার্জুন উদ্ধার) আর একটা বাছুর (বৎসাসুর উদ্ধার) আর পাখি মেরে দিয়েছিল (বকাসুর উদ্ধার) সেটাকে নিয়ে এত লাফালাফি কিসের! আর একেই তোমার কিনা বলছ ভগবান!

এখন কেউ যদি খুব যুক্তি দিয়ে এই ঘটনাগুলোকে দেখে, পূতনা নামে কোন মহিলা হয়তো কোন খারাপ উদ্দেশ্য নিয়েই এসেছিল, কিন্তু দুধ খাওয়াতে গিয়ে সে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেল, বাছুরটা বদমাইসি করেছিল তাকে বেকায়দায় একটা ডাণ্ডা মারতেই হয়তো বাছুরটা মরে গেছে। অনেক কিছুই হতে পারে। আসল ঘটনা কি ঘটেছিল আমরা কেউই জানিনা। শিশুপাল শ্রীকৃষ্ণের জীবনের প্রত্যেকটি ঘটনাকে এক ভাবে দেখছে, ভাগবত আবার অন্য ভাবে দেখছে। এখন আমাদের নিজেদের দেখতে হবে আমি কৃষ্ণভক্ত না কৃষ্ণদ্বেষী। কৃষ্ণদ্বেষী হলে শিশুপালের মত দেখবো, কৃষ্ণভক্ত হলে ভাগবতের মত দেখবো।

ভগবানের লীলাচিন্তনই যোগের চিত্তবৃত্তি নিরোধ

ভাগবত মূলতঃ ভক্তিশাস্ত্র, আর যে ভক্তিশাস্ত্র ভগবানের লীলা যত বাড়াতে পারবে, প্রত্যেকটি লীলার ব্যাখ্যা যত বেশী ভাবে দেওয়া হবে, সেই ভক্তিশাস্ত্রের তত কদর হবে। ঠাকুরের শৈশব কালের কাহিনীগুলোকে নিয়েও আমরা ধ্যান করে করে চিন্তা করতে পারি তিনি এটা কেন করেছিলেন, ওটা কেন করলেন। আর কোন ভক্তের মধ্যে যদি কাব্যিক রসবোধ আর সাহিত্য প্রতিভা থাকে তাহলে সে ঠাকুরের জীবনের ঘটনাগুলোরও বিভিন্ন রকম ব্যাখ্যা তৈরী করে ভাগবতের মত ভক্তিশাস্ত্র রচনা করতে পারবে। যেখানে কোন ব্যাখ্যা হয় না, সেখানেও ব্যাখ্যা বার করে দেবে। ঠাকুরের কথাতে বলতে হয় – এক জমিদার তার মোসায়েবদের সঙ্গে মাঠের মাঝখান দিয়ে যেতে যেতে পা পিছলে পড়ে গেছে, মোসায়েবদের সামনে এইভাবে পড়ে গিয়ে জমিদার সাহেবের লজ্জা হতে পারে, জমিদার উঠে বলছে 'উয়ার একটা মানে আছে'। যেখানে কোন ব্যাখ্যা নেই সেখানেও ব্যাখ্যা বার করে দেবে। যে কোন ধর্ম এভাবেই এগিয়ে চলে।

যিনি এই ব্যাখ্যাগুলো লিখেছেন তাঁকে কীভাবে মন প্রাণ নিবিষ্ট করে একাগ্র মনে শুধু চিন্তন করে যেতে হয়েছে কেন পূতনাকে দেখে শ্রীকৃষ্ণ চোখ বন্ধ করেছেন, তাতে আর কিছু না হোক তিনি তো শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানেই ডুবে আছেন। এটাই তাঁর সাধনা। এই ব্যাখ্যাগুলো পড়লে আমার আপনার কোন মঙ্গল হবে কিনা আমাদের জানা নেই, কিন্তু যিনি এই ব্যাখ্যাগুলোর রচনা করেছেন তিনি কিন্তু পারমার্থিক, আধ্যাত্মিক স্তরে অনেক উচ্চাবস্থায় চলে গেছেন। একটা ছোট্ট ঘটনাকে নিয়ে কত গভীর ভাবে চিন্তা করে লিখে যাচ্ছেন, এটাই ঠিক ঠিক ধ্যানের বিষয়ে একাত্ম হয়ে যাওয়া। আমি আপনি বলতে পারি এগুলোর কি দাম আছে, হয়তো কোন দাম নেই, কিন্তু যিনি লিখেছেন তিনি মহৎ হয়ে গেছেন। আমরা অনেকেই গুরুর কাছে মন্ত্র পেয়েছি। গুরুপ্রদত্ত মন্ত্রের যিনি ইষ্টদেবতা আছেন তাঁর জীবনের কোন ছোট্ট একটা ঘটনাকে নিয়ে এইভাবে চিন্তন-মনন করতে থাকলে, দেখা যাবে আমাদের মনেও কত রকমের ব্যাখ্যা ভেসে উঠবে। এগুলোকে নিয়ে এবার যদি লেখালেখি শুরু করি তখন দেখা যাবে লিখতে লিখতে এত লেখা হয়ে যাবে তখন মনে হবে সত্যি আমার ভেতর থেকে এত কিছু বেরোচ্ছে! বল্লভাচার্যের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হল এত বড় ভাগবত গ্রন্থ, তার উপর তিনি পুরো ভাগবতের টীকা, ভাষ্যাদি রচনা করে গেছেন। আপনার আমার হয়তো অনেক সময় লেগে যাবে, কিন্তু দুজনেরই meditating value সমান হবে। এত কম সময়ে এই বিশাল ভাগবত গ্রন্থের উপর ভাষ্য রচনা করার পেছনে আছে তাঁর বিশাল পাণ্ডিত্য আর তাঁর ঈশ্বরভক্তির সাধনায় অনুশীলিত অনন্যচিত্ত তীব্র একাগ্র একটি মন।

স্বামীজী এক জায়গায় বলছেন – প্রতিভা বলতে কি বোঝায়? স্বামীজী বলছেন কিছুই না, একটা জিনিষকে খুব কম সময়ে আয়ত্ত করে নেওয়া। যেমন ধরুন এখন যদি কোন গ্রাজুয়েটকে ক্লাশ টেনের পরীক্ষায় বসতে দেওয়া হয় তাহলে সে হয়তো সব বিষয়ে শতকরা নব্বুই নম্বর পেয়ে যাবে। অথচ সে নিজের সময় ক্লাশ টেনের পরীক্ষাতে এই নম্বর পেত না। তার মানে ক্লাশ টেনের সব সাবজেক্টকে সে এই বয়সে মানে চল্লিশ বছর বয়সে এসে আয়ত্ত করে নিয়েছে। কিন্তু যখন সে পনের বছরের ছিল তখন পারেনি। কিন্তু ক্লাশ টেনের এখন যে ছাত্র শতকরা নব্বুই পাচ্ছে, তার মানে সে এই বয়সেই আয়ত্ত করে নিয়েছে। বিজ্ঞানীরা যে একুশ বাইশ বছরে যে সব থিসিস লিখে দিচ্ছেন সেটা আমরা সারা জীবনে পারবো না। শ্রীরামকৃষ্ণ দশ বছরে যে সাধনাটা করেছিলেন সেই সাধনা যে কেউই করতে পারবে কিন্তু আমার আপনার করতে কয়েক হাজার বছর

লেগে যাবে। শুধু সময়ের হিসাবে পার্থক্য, আর কোন পার্থক্য নেই। প্রতিভা মানে তাই। ধারণা করার শক্তি, জ্ঞানের স্তরে নিজেকে উদ্ভাসিত করার শক্তি এদের এত বেশী যে, যে কোন জিনিষকে তারা খুব সহজে আয়ত্ত করে নেন।

এই কাহিনীগুলিতেই ভগবানের ঠিক ঠিক লীলার বর্ণনা করা হয়েছে। ভগবানের লীলা মানেই সাধকের ধ্যানের বিষয়। যারা সাধনা করেন তারা বেশী শাস্ত্র পড়তে যাবেন না। সাধনা মানেই একটি মাত্র গ্রন্থ। সাধক যিনি, তিনি আর দ্বিতীয় কোন বইয়ের দিকে তাকাবেনই না। এমন এমন অনেক মহারাজ আছেন, যাঁরা সত্যিকারের সাধক, তাঁরা কথামৃতের একই পাতা সাত দিন আট দিন সামনে নিয়ে চুপচাপ বসে আছেন। তাঁরা কোথাও বক্তৃতাও দেবেন না, আর পঁচিশটা বিষয়ে জানতেও চাইবেন না। সাধক অবস্থায় কখনো লেকচার দেবেন না, হয় সিদ্ধ অবস্থায় দেবেন আর তা নাহলে কাঁচা অবস্থায় দেবেন। দশ জায়গায় বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছে, শ্রোতারা খুব হাততালি দিচ্ছে, লেকচারের পর এসে বলছে – ওঃ কি দারুণ বলেন আপনি। সাধকের পক্ষে এগুলো বিষতুল্য বিঘ্ন, এমনকি পতন হয়ে যাওয়ার কারণও হতে পারে। সেইজন্য সাধক কখন লেকচার দিতে যাবে না। ঠাকুর বলছেন – কাঁচা ঘিয়ে লুচি দিলে আওয়াজ হয়, কিন্তু ঘি গরম হয়ে গেলে তখন আর আওয়াজ হয় না, সাধক অবস্থাতে কোন আওয়াজ হবে না। গরম তেলে আবার যখন লুচি ফেলা হয় তখন আবার আওয়াজ হয়। সাধক অবস্থায় যখন সে পূর্ণতার দিকে এগোয় তখন একটা ছোট্ট জিনিষের উপর এমন একাগ্র হয়ে ডুবে থাকবে যে অন্য আর কোন কিছুর দিকে মন যাবে না। এমনকি যাঁরা বিজ্ঞানী তাঁরাও এই একই ভাবে একটা আবিষ্কারের লক্ষ্যে, একটা ছোট সমস্যাকে নিয়ে খাওয়া নেই, ঘুম নেই, বছরের পর বছর পড়ে আছেন। পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত যত কিছু আবিষ্কার হয়েছে, সব আবিষ্কারের পেছনে ঠিক এই ধরণের সাধনার ইতিহাস লুকিয়ে আছে।

শুকদেবের মুখ থেকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই লীলাকথা শ্রবণ করার পর পরীক্ষিৎ বলছেন ***যেন যেনাবতারেণ ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ। করোতি কর্ণরম্যাণি মনোজ্ঞানি চ নঃ প্রভো।।১০/৭/১।*** ‘ভগবান শ্রীহরি বিভিন্ন অবতার রূপ ধারণ করে অনেক রকম মধুর লীলা করেছিলেন, আর *কর্ণরম্যাণি মনোজ্ঞানি*, আপনার মুখ থেকে সেই লীলা কথা শুনতে শুনতে আমি আনন্দে বিভোর হয়ে যাচ্ছি’। সত্যিকার ভক্ত নিজের ইষ্টের কথাই বারবার শুনতে চান। গীতায় ভগবান বলছেন *কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ*, আমার ভক্তরা সর্বদা পরস্পর আমার কথা বলতে চায়, শুনতে চায়, নিত্য আমার স্বরূপে রমণ করতে চায়। জ্ঞানমার্গের সাধক এই জিনিষগুলো বোঝার চেষ্টা করে, কিন্তু যারা ভক্ত, ভাবরাজ্যের সাধক, তারা এসবের বোঝাবুঝির দিকে যায় না। যদি কারুর শাস্ত্রের পাণ্ডিত্য না থাকে, শাস্ত্রের গূঢ় তত্ত্বের বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা না থাকে, যোগক্রিয়া করার শক্তি যদি না থাকে তাতে কিছু এসে যায় না, শুধু মাত্র কৃষ্ণকথা শুনে শুনেই তার মুক্তি হয়ে যেতে পারে। এর অনেক দৃষ্টান্ত ভাগবতেই দেওয়া হয়েছে, প্রথম দৃষ্টান্ত যশোদা, তারপরে আসে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যসখারা কিন্তু সব থেকে বড় দৃষ্টান্ত হল গোপী ললনারা। আর শ্রীকৃষ্ণের লীলাসংবরণের কয়েক বছরের মধ্যে পরীক্ষিৎ শুকদেবের মুখ থেকে শুধু কৃষ্ণকথা শুনেই মুক্তি পেয়ে গেলেন। পরীক্ষিৎই প্রথম যিনি ব্যাসদেব রচিত কৃষ্ণকথা শুনেছেন। তিনিও বলছেন আমার শুনতে খুব আনন্দ অনুভব হচ্ছে। তাহলে সত্যিই কি শুধু কৃষ্ণকথা শুনলেই মুক্তি হয়ে যাবে? কখনই হবে না। তাহলে ভাগবত যে এতগুলো দৃষ্টান্ত দিচ্ছে এই ব্যাপারে কি বলা হবে? আসলে এখানে একটা ব্যাপারকে আমরা ভুলে যাচ্ছি। যোগশাস্ত্র বলছে, *যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ*, যোগ মানে চিত্তবৃত্তি নিরোধ। আমাদের চিত্তে অনবরত যে হাজার রকমের বৃত্তি ওঠানামা করছে এর নিরোধ না হওয়া পর্যন্ত কোন মুক্তি হবে না। চিত্তবৃত্তি নিরোধ করার হাজার রকমের পন্থা আছে। এখানে বলছেন শুধু কৃষ্ণকথা শুনতে শুনতে তাদের মনের সমস্ত বৃত্তি নিরোধ হয়ে গিয়ে একমাত্র একটাই বৃত্তি শ্রীকৃষ্ণ বৃত্তি থেকে যাচ্ছে। ভাগবতে পরে বলবে, গোপীরা যাঁরা একেবারে মুর্খ, গেঁয়ো ছিল তাঁরাও শুধু কৃষ্ণকে ভালোবেসে উচ্চ আধ্যাত্মিক ফল পেয়ে গেল। তাঁদের শরীর, মন, প্রাণ সবটাই কৃষ্ণময় হয়ে গেছে, কৃষ্ণ ছাড়া আর কিছু নেই। এখানেই তো তাঁদের চিত্তবৃত্তি নিরোধ হয়ে গেল।

স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজ যখন রামকৃষ্ণ মঠ মিশনের অধ্যক্ষ ছিলেন সেই সময় স্বামীজীর উপর একটা সিনেমা ধরণের স্লাইড পিকচার বানানো হয়েছিল। ঠিক করা হল মঠে বিশেষ প্রজেক্টর লাগিয়ে স্বামীজীর উপর ওই সিনেমাটা দেখানো হবে। অধ্যক্ষ মহারাজকে আনা হয়েছে। উনি চেয়ারে বসেছেন, সাধু ব্রহ্মচারীরাও বসে আছেন। স্বামীজীকে সিনেমাতে দেখা যাবে, স্বামীজীর কথা ভাবতে ভাবতে মহারাজ অর্দ্ধ মুর্ছিত অবস্থায় চলে গেছেন, আর সেবককে থেকে থেকে জিজ্ঞেস করছেন 'আচ্ছা স্বামীজী কি এলেন'? স্লাইডে উনি আর কিছু দেখতে পাচ্ছেন না। সেবক বলছেন 'না মহারাজ'। ইতিমধ্যে প্রজেক্টর মেশিনটা খারাপ হয়ে গেছে। কি আর করা যাবে, শেষ পর্যন্ত সিনেমাটা আর দেখানোই গেল না। মহারাজ কিন্তু তখনও বারবার জিজ্ঞেস করে যাচ্ছেন 'স্বামীজী কি এলেন'? সেবক বলছেন 'মহারাজ! এবার ঘরে চলুন'। উনি তখনও জিজ্ঞেস করে যাচ্ছেন 'স্বামীজী কি এলেন'? মহারাজের মন স্বামীজীর মধ্যে এমন গভীর ভাবে ডুবে গেছে যে তাঁর তখন জগৎ ভুল হয়ে গেছে। এটা যে একটা সিনেমা চলছে, প্রথমের দিকে যে ভূমিকা চলছিল, পরে প্রজেক্টর যে খারাপ হয়ে গেছে, এসব কোন কিছুই তাঁর মাথায় নেই একমাত্র স্বামীজীই আছেন, স্বামীজী ছাড়া তিনি আর কিছু দেখতে পাচ্ছেন না। ঠাকুরও বলছেন, যখন গান হচ্ছে 'নিতাই আমার মাতা হাতি', বলতে বলতে শেষে শুধু 'হা' 'হা' থেকে যাচ্ছে। গীতায় ভগবান বলছে, আমার ভক্তরা আমার কাহিনী, আমার কথা এক অপরের সাথে আলোচনা করে, কথা বলে, রমণ করে। এও খুব উচ্চ অবস্থা। ঠাকুর বলছেন ওই অবস্থায় কুণ্ডলীনি কণ্ঠ দেশে চলে আসে। কণ্ঠদেশে একবার পৌঁছে গেলে আর পতনের ভয় থাকে না, খুব জোর হলে মন নেমে হৃদয়ে এসে থাকবে। চেতনার স্তর কণ্ঠদেশে চলে গেলে ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ ছাড়া আর কোন কথা বলতে পারবে না, বিষয় কথা শুনলে মনে হবে যেন গায়ে আগুন লেগে গেছে। পরীক্ষিৎও এখন আর ঈশ্বরীয় ছাড়া কোন কথা শুনতে চাইছেন না, গোপীরা যখন শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে আছেন তখন কৃষ্ণকথা ছাড়া আর কিছু বলছেন না। যতক্ষণ চেতনার স্তর পুরোপুরি ঈশ্বরে নিমগ্ন না হচ্ছে ততক্ষণ কিন্তু মুক্তি হবে না। ভক্তিমার্গে এই অবস্থাকেই বলা হয় পরা ভক্তি। চারিদিকে এত ভক্ত সম্মেলন হচ্ছে, এত আধ্যাত্মিক আলোচনা শুনছে, এত ভাগবত সপ্তাহ হচ্ছে, সেখান কত ভক্তরা কত আগ্রহ নিয়ে যাচ্ছে, তাহলে সবার মুক্তি হচ্ছে না কেন। কারণ এদের এখনও পরা ভক্তি আসেনি, এখন যে শাস্ত্র কথা শুনছে এগুলো সব বৈধী ভক্তির মধ্যে পড়ে। পরীক্ষিতের এখন যে অবস্থা এটাই পরা ভক্তির লক্ষণ।

স্বামীজী এক জায়গায় লাটু মহারাজের সম্বন্ধে বলছেন – এত শাস্ত্র অধ্যয়ন করে আমরা যে জায়গায় পৌঁছেছি কোন শাস্ত্র অধ্যয়ন না করে ঠাকুরের কৃপায় লাটু ওই জায়গাতেই পৌঁছে গেছে। লাটু মহারাজের জীবনী যাঁরা জানেন তাঁরা খুব ভালো করেই জানেন যে তিনি সম্পূর্ণ নিরক্ষর ছিলেন, একটা বাক্যও, তা হিন্দীই হোক আর বাংলা হোক, ঠিক মত গুছিয়ে বলতে পারতেন না। ইংরাজী তো জানতেনই না। বিহারের অত্যন্ত নীচু পরিবারে জন্ম নিয়ে মাঠে মেষ চড়াতেন। সেখান থেকে এসে কলকাতায় একজনের বাড়িতে চাকরের কাজ করতেন। সেখান থেকে তিনি ভক্তির পথ দিয়ে সেই স্তরে চলে গেলেন, যে স্তরে বেদান্তের জ্ঞান বিচার দিয়ে জ্ঞানীরা যান।

পরা ভক্তিকে আবার প্রেমা ভক্তিও বলা হয়। ঈশ্বরের প্রতি প্রেমাভক্তি কি রকম হতে পারে বোঝানর জন্য ব্যাসদেব দুই ধরনের ভাব নিয়ে এনে দেখালেন – একটা বাৎসল্য রস আর অন্যটা শৃঙ্গার রস। বাৎসল্য রস দেখালেন যশোদার মাধ্যমে আর শৃঙ্গার রস তৈরী করলেন গোপীদের নিয়ে। মানুষের মনের মধ্যে ধারণা করাবার জন্য যশোদা আর গোপীদের কাহিনী এনে দেখালেন যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা প্রেম এই পর্যায়ে না পৌঁছাচ্ছে ততক্ষণ ভক্তি মুক্তি কোনটাই হবে না। তাহলে তার আগে কি হবে? অপরা ভক্তি বা বৈধী ভক্তি হবে। আমরা যে শাস্ত্র কথা শুনে যাচ্ছি এগুলো সব বৈধী ভক্তির মধ্যে পড়ছে। বৈধী ভক্তিই আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির দিকে নিয়ে যাবে, কিন্তু প্রেমাভক্তিই মুক্তি দেবে। এখানে কৃষ্ণকথা শুনতে শুনতে পরীক্ষিৎ পুরোপুরি শ্রীকৃষ্ণে হারিয়ে গেছেন। ভগবৎ সম্বন্ধীয় কথার মাহাত্ম্য হল ভগবানের কথা শ্রবণ করতে করতে ভগবানের নামের প্রতি অরুচী আর বিষয়তৃষ্ণা চলে যায়। আমাদের মস্তিষ্ক কখনই নিজেকে ফাঁকা অবস্থায় রাখতে পারে না, কিছু না কিছু জিনিষ সব সময় ধরে রাখতে চায়। সেইজন্য মানুষের মনও

কখন ফাঁকা থাকে না, মনের সর্বদা একটা অবলম্বন দরকার। মন যদি কোন অবলম্বন না পায় তাহলে সে পাগল হয়ে যাবে। জগতের বেশীর ভাগ মানুষ বিষয়তৃষ্ণাকে অবলম্বন করে নিজের জীবন চালায়। ফলে ভগবানের প্রতি, ভগবানের নামের প্রতি অরুচী এসে যায়। আবার ভগবানকে অবলম্বন করলে বিষয়ের প্রতি অরুচী হয়ে যায়। ঠাকুর বলছেন অনেকের যোগ আর ভোগ দুটোই থাকে। কিন্তু যাদের যোগ আর ভোগ দুটোই থাকে তার নিম্ন থাকের সাধক। শ্রেষ্ঠ মানের কখনই হবে না। কারণ যিশু বলছেন এক খাপে দুটো তলোয়ার থাকে না। যার ঈশ্বরের দিকে মনে নেই, ঈশ্বরে ভক্তি হোক চায় না, তাদের কি করে ঈশ্বরের দিকে মন আসবে? তারা ভাগবত কথা শুনুক। ভাগবত কথা শুনতে শুনতে মনটা আস্তে আস্তে ঈশ্বরের দিকে যেতে শুরু করবে। একটা খুব মজার ঘটনা আছে।

আইনস্টাইন ভালো বেহালা বাজাতেন। আইনস্টাইনের মা কোন দিন বুঝতেই পারেলন না যে, তাঁর ছেলে কত বড় বিজ্ঞানী। মা স্কুল থেকে সরিয়ে ছেলেকে বেহালা বাজানো শেখার স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিলেন। ভেবেছেন বেহালাটা বাজাতে পারলে ছেলে জীবনে কিছু করে খেতে পারবে। কিন্তু এই ছেলে পরে পুরো বিশ্বে বিজ্ঞান জগতের ইতিহাসটাই পাল্টে দেবে কল্পনাই করতে পারেননি। পরে আইনস্টাইন বিখ্যাত হয়ে যাওয়ার পর একদিন এক পরিচিতের বাড়িতে একটা পার্টিতে নিমন্ত্রিত হয়ে গেছেন। আইনস্টাইনের জীবনের এটি খুব নামকরা ঘটনা। ওখানে খুব সুন্দর উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের একটা অনুষ্ঠান চলছিল। একটি যুবক ঘরের এক কোণে নিজেকে সবার থেকে আলাদা এক মনে সব দেখে যাচ্ছে, তার কিছুই যেন ভালো লাগছে না। আইনস্টাইন যুবকটির কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করছেন 'তোমার কি এই বাজনা শুনতে ভালো লাগছে না'? ছেলেটি উত্তর দিল 'না, আমার একদম ভালো লাগছে না'। আইনস্টাইন মনে মনে ভাবছেন 'আহা! এত উচ্চ মানের ক্লাসিকাল বাজনা ছেলেটির ভালো লাগছে না! নিশ্চয়ই ওর মন কোন কারণে বিষন্ন হয়ে আছে'! ছেলেটিকে বললেন 'ঠিক আছে, তুমি আমার সঙ্গে এসো'। ওর বাবা আইনস্টাইনের খুব ভালো বন্ধু ছিলেন। ছেলেটিকে অন্য ঘরে নিয়ে এলেন। 'আচ্ছা! তোমার কি কোন গানই ভালো লাগে না'? 'না, গান আমার ভালো লাগে না'। 'আচ্ছা! এমন কোন গান তোমার জানা আছে কি যেটা শুনে তোমার কখন ভালো লেগেছিল'? এই ভাবে অনেকক্ষণ খোঁচা দিতে দিতে ছেলেটি একটা গানের কথা বলল। সেই গান আবার একেবারে হিন্দী সিনেমার সব থেকে জঘন্য লারেলাপ্পা গানের থেকেও খারাপ। আইনস্টাইন তখন মিউজিকের এ্যলবাম থেকে খুঁজে খুঁজে ওই গানের একটা রেকর্ড পেলেন। উনি গানের রেকর্ডটা চালিয়ে দিলেন। 'এবার তোমার গানটা কেমন লাগছে'? 'হ্যাঁ, এই গান আমার জন্য ঠিক আছে'। এরপর আইনস্টাইন অন্য আরেকটা রেকর্ড বার করে বাজিয়েছেন 'এবার দেখো, এই গানটি কেমন'। উনি ওখান থেকে ছেলেটিকে আরেকটু সূক্ষ্ম স্তরে নিয়ে গেছেন। 'না, ভালোই লাগছে'। ওই রেকর্ডটা সরিয়ে দিয়ে তৃতীয় একটা রেকর্ড বাজিয়ে দিলেন, ওখান থেকে আবার আরেকটু সূক্ষ্ম স্তরে। এইভাবে দেড় ঘন্টা ধরে একটা করে মিউজিকের রেকর্ড বার করছেন, একটু করে শোনাচ্ছেন আর একটু একটু করে সূক্ষ্ম স্তরের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন। ঘন্টা দুয়েকের পর ছেলেটিকে আবার সেই ঘরে নিয়ে এসেছেন, ততক্ষণে দেখছেন ওই ক্লাসিকাল মিউজিক শুনতে ছেলেটির খুব ভালো লাগছে। যখন রেডিও বা টেলিভিশনে ক্লাসিকাল মিউজিক হয় তখন বেশীর ভাগ লোকই বলবে 'কি এ্যা এ্যা করছে রে বাবা'! বলেই রেডিও বা টিভির সুইচ বন্ধ করে দেবে। কিন্তু একবার যদি কেউ দেখিয়ে দেয় যে ক্লাসিকাল মিউজিক এমন উচ্চমানের যে তাকে নামাতে নামাতে অনেক নীচে নামিয়ে সিনেমার গানে নিয়ে আসতে হয়। এবার যদি সিনেমার এই গানকে ধরে ধরে ওই পদ্ধতিতে ক্লাসিকালে নিয়ে যাওয়া হয়, তখন ক্লাসিকাল মিউজিকের গভীরতাকে যদি একবার ধরে নেয় আর কিন্তু তার সিনেমার গান সহ্য হবে না। ভাগবত কথা ঠিক তাই। যাদের ভগবানের নামে, ঈশ্বরীয় কথায় কোন রুচি নেই তাদের ভাগবত ভগবানের কথা শোনাচ্ছে। কি শোনাচ্ছে? এই দেখো মা কীভাবে তার ছেলেকে ভালোবাসছে, এই দেখো একটা মেয়ে একটা ছেলেকে কীভাবে ভালোবাসছে। এখান থেকে তাকে তুলতে শুরু করছে, এই ভাবে টানতে টানতে তাকে উপরে দিকে নিয়ে যাবে। এই কথাই পরীক্ষিৎ বলছেন – ভাগবত কথা শুনতে শুনতে ভগবানের প্রতি অনীহা ভাব আর বিষয়তৃষ্ণা পালিয়ে যায়। বিষয়তৃষ্ণা চলে গেলে চিত্তের বৃত্তিগুলিও আস্তে আস্তে থেমে যাবে।

অবতারকে চেনা যায় না

পরীক্ষিৎ বলছেন 'হে শুকদেব! আপনি যদি আমাকে অধিকারী মনে করেন তাহলে শ্রীকৃষ্ণের সেই মনোহর লীলাপ্রসঙ্গ আরও বিস্তার করে বলুন'। আর বলছেন ***অথান্যদপি কৃষ্ণস্য তোকাচরিতমদ্ভুতম্। মানুষং লোকমাসাদ্য তজ্জাতিমনুরুন্ধতঃ।।১০/৭/৩।*** তিনি ভগবান, কিন্তু মানবদেহ যখন ধারণ করেছেন তখন সেই মানুষের স্বভাব অনুসারে অর্থাৎ মনুষ্যজাতি-সুলভ আচরণের দ্বারা তিনি কি কি করেছেন এই ব্যাপারে আপনি আমাকে আরও বলুন। কথামৃতে ঠাকুর অনেকবার বলছেন – অবতারকে চেনা যায় না। গীতাতেও ভগবান বলছেন *অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্*। ভগবান মানুষের শরীর ধারণ করার পর তাঁর সব কাজকর্ম, নিয়ম, আচার সব মানুষের মতই হয়। আমরা যে ঠাকুরকে অবতার বলছি, ভগবান বলছি এগুলো সব আমাদের মুখের কথা। কারণ যেদিন কেউ বুঝে নেবে ঠাকুর অবতার, ঠাকুর ভগবান, সেদিনই কিন্তু সে মুক্ত পুরুষ হয়ে যাবে। যিনি অনন্ত তিনি এই সাড়ে তিন হাতে শরীরের মধ্যে ঢুকে মানুষ হয়েছেন ভাবা বা ধারণা করা আমাদের পক্ষে সত্যিই সম্ভবই নয়। ঠাকুরের কথা না হয় ছেড়ে দিচ্ছি, কিন্তু শ্রীরামচন্দ্র ভগবান, শ্রীকৃষ্ণ ভগবান সবাই মানছে, কিন্তু তাও তো কারুরই মুক্তি হচ্ছে না। কারণ অবতারকে মানুষের স্বভাব গ্রহণ করতেই হবে, মানুষের মত যদি আচরণ না করেন তাহলে তিনি একজন ম্যাজিসিয়ান, সুপারম্যান জাতীয় কিছু হয়ে যাবেন। ভগবানকে তাই মানুষের আকৃতিতে ঢুকে মানুষের মত আচরণ করতে হয়। এর আবার অন্য রকম প্রতিক্রিয়া হয়ে যায়। তখন সবাই মনে করবে – 'তাই তো! এতো দেখছি আমাদেরই মত, একে ভগবান বলি কি করে! ভগবান রূপে মানবো কী করে'! সবাই তাই বলবে। কিন্তু এদের মধ্যেও মুষ্টিমেয় দুই-একজন বুদ্ধিমান আছেন যাঁরা ঠিক বুঝে যান। তাঁরাই হলেন উন্নতমানের। ভাবলেও অবাক লাগে, নরেন্দ্রনাথ দত্তের মত কলকাতা কলেজের এক ছাত্র ঠাকুরকে হাতেনাতে ধরে ফেলল কিন্তু কেশবচন্দ্র সেনের মত লোক এত সঙ্গ করেও ধরতে পারলেন না, প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের মত লোক বুঝতে পারলেন না। তখনই তো মনের মধ্যে প্রশ্ন ওঠে কেশবচন্দ্র সেন, বিদ্যাসাগরের মত এত উন্নতমানের লোক ঠাকুরকে অবতার রূপে চিনতে পারলেন না, অথচ লাটুর মত নিরক্ষর গেঁয়ো লোক ঠাকুরকে অবতার দেখছেন, এটা কি করে সম্ভব হচ্ছে? বাংলার বাইরে গেলে কেশবচন্দ্র সেনকে কেউ জানে না। কিন্তু ধীরে ধীরে ঠাকুরের ভাব চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ার জন্য নিরক্ষর লাটু মহারাজের কথাও সবাই জেনে যাচ্ছে। আফ্রিকার কোন দেশে যদি চলে যাই আর সেখানে ঠাকুরের কোন আফ্রিকান ভক্তকে বিদ্যাসাগরের কথা জিজ্ঞেস করলে বলবে 'আমি তো তাঁর নাম কখন শুনিনি', কিন্তু লাটুর কথা সবাই জানে।

তখনই প্রশ্ন ওঠে এমন কোন একটা ব্যাপার আছে যেটা দিয়ে বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র সেন, প্রতাপচন্দ্র মত বিদ্বানদের থেকে লাটু মহারাজকে আলাদা করে দেওয়া যায়। আবার ঠাকুরের সন্তানদের চেতনার স্তর অবতারের অনেক নীচে। তার ফলে আমাদের মত লোকের পক্ষে তাঁদের অনুসরণ করা সহজ। স্বামীজী দেশে বিদেশে তোলপাড় করে দিলেন, স্বামীজীর কার্যকলাপ দেখে অনেকে তাঁর অনুগামী হয়ে গেলেন। স্বামীজীকে দেখে যাঁরা তাঁর অনুগামী হয়েছিলেন তাঁদের আরেক ধাপ নীচে যাঁরা আছেন তাঁদের দেখে এখনকার প্রজন্ম প্রভাবিত হচ্ছে। আমরা এখনকার ভাইস-প্রেসিডেন্ট, প্রেসিডেন্ট মহারাজদের দেখে অনুপ্রাণিত হচ্ছি, ওনারা স্বামীজীর শিষ্যদের দেখে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। স্বামীজী আমাদের কাছে কত বিরাট, আবার স্বামীজীর থেকে ঠাকুর কত বিশাল। আমাদের এখন হয়েছে, মা বলে দিয়েছে ও তোর দাদা হয়, তখন ওকে আমার দাদাই মানতে হবে, এর থেকে বেশী জানার আমাদের কোন উপায় নেই। ঠাকুর অবতার, ঠাকুর ভগবান আমাদের মুখে এই কথা বলাটা হল মা শিখিয়ে দিয়েছে ও তোর দাদা, এর থেকে বেশী আর কিছু না। কিন্তু মুখের কথাকে ধরে ধরে যখন জ্ঞানের স্তরে চলে যাবে তখন বুঝতে পারবে ঠাকুরকে কেন অবতার বলা হয়।

পরীক্ষিৎএর কথাই ধরা যেতে পারে। তিনি সারা জীবন রাজ্য চালিয়ে গেলেন, তিনি জানতেন আমি শ্রীকৃষ্ণের নাতি, তিনি জানতেন শ্রীকৃষ্ণ আমার জন্মের সময় মায়ের গর্ভে আমাকে রক্ষা করেছিলেন। কিন্তু কই এর আগে তো একবারও তাঁর ইচ্ছে হয়নি শ্রীকৃষ্ণের মনোমুগ্ধকারী লীলা কাহিনী শুনি। আসন্ন মৃত্যুকে দেখে শ্রীকৃষ্ণের কথা শোনার ইচ্ছে হয়েছে। এবার পরীক্ষিৎএর দ্রুত পরিবর্তন হতে শুরু হয়ে গেছে। আমাদেরও এক

এক সময় মনে হয় ঠাকুর যেন আমার হয়ে গেছেন, পরীক্ষিৎও তাই মনে করতেন, কিন্তু তাতে কিছুই তো হয়নি। তিনি মানুষের মত আচরণ করেন বলে মানুষ বুঝতে পারে না, আবার ভগবানের মত এলেও লোকে মনে করবে কোন যাদু বা ভেলকি দেখাচ্ছে, কেউ আবার ভয় পেয়েও যাবে।

শকট ভঞ্জন

এবার শুকদেব পরপর শ্রীকৃষ্ণের বাললীলা বলে যাচ্ছেন। বাচ্চা শিশুর প্রথম পাশ ফেরা, উপুড় হওয়া এগুলোকে উপলক্ষ্য করেও তখনকার দিনে ধর্মীয় উৎসব করা হত। মানুষ যাতে সারাটা জীবন ঈশ্বর-কেন্দ্রিক জীবন চালায় তার জন্য সব কিছুর মধ্যে একটা করে উৎসবের বিধান দিয়ে দেওয়া হয়েছে। গাছে প্রথম ফল হয়েছে, ঈশ্বরকে অর্পণ কর, গরু প্রথম দুধ দিল ওই দুধ ঈশ্বরের নামে অর্পণ করে দাও। শ্রীকৃষ্ণ এবার নিজে থেকে পাশ ফিরেছে, তার জন্য একটা উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। তন্ত্র মতে আমাদের দশ রকমের সংস্কার পালন করতে হয় কিন্তু স্মৃতি শাস্ত্রে ষোলটি সংস্কারের কথা বলা হয়েছে। বেদের সময় চৌষট্টিটি সংস্কার ছিল – তার মধ্যে বাচ্চার পাশ ফেরাটাও তখন একটা সংস্কারের মধ্যে ছিল। শ্রীকৃষ্ণ নিজে থেকে পাশ ফিরেছেন সেই উপলক্ষে নন্দবাবা ব্রজের সব্বাইকে নিয়ে বিরাট উৎসবের আয়োজন করেছেন। ব্যাসদেব যখন ভাগবত লিখছেন তখন দুটো জিনিষকে পাশাপাশি রেখেছেন, একদিকে নন্দবাবার শরীর, ব্যবহার, পারিবারিক স্বচ্ছলতার খুব সুন্দর একটা ছবি আঁকছেন, অন্য দিকে নন্দবাবার বাস্তব দিককেও বর্ণনা করছেন। বাস্তব হল নন্দবাবারা গোয়ালা ছিলেন। তাঁদের প্রধান জীবিকা ছিল গরু চড়ানো, দুধ, দই, মাখন তৈরী করা আর গরুর গাড়িতে চাপিয়ে মথুরার দিকে বিক্রী করা। নন্দবাবারা তাই খুব বিরাট ধনীলোক ছিলেন না, হবার কথাও নয়।

এখানে বর্ণনা করছেন, উৎসবের দিন শ্রীকৃষ্ণকে একটা ছোট্ট শকটের নীচে শুইয়ে রাখা হয়েছে। ইতিমধ্যে শ্রীকৃষ্ণের ঘুম ভেঙে গেছে। ঘুম ভাঙতেই মায়ের দুধ খাওয়ার জন্য কাঁদতে শুরু করেছে। যখন মাকে কাছে পেলো না তখন হাত-পা ছুঁড়তে শুরু করেছে। হাত-পা ছুঁড়তে গিয়ে ছোট ছোট পা গিয়ে এমন ভাবে গাড়ীতে লেগেছে যে পুরো দই, মাখন সমেত গাড়ীটা ছিটকে উল্টে পড়েছে। তিন মাসের বাচ্চা এক লাথি মারতেই গাড়ীটা উল্টে গেল। ওই আওয়াজ শুনে সবাই ছুটে এসেছেন, এসে দেখছেন গাড়ীটা উল্টে পড়ে আছে। সবাই সবাইকে জিজ্ঞেস করছে এটা কি করে হল! ওখানে গোপ বালকরা খেলা করছিল, তারা ওই দৃশ্যটা দেখেছিল। গোপ বালকরা বলল, শ্রীকৃষ্ণ পা ছুড়ছিল তাতে এই অদ্ভুত কাণ্ড হয়েছে। বাচ্চাদের কথা কেউ বিশ্বাস করতে চাইছেন না। তখন বলছেন ***ন তে শ্রদ্দধিরে গোপা বালভাষিতমিত্যুত। অপ্রমেয়ং বলং তস্য বালকস্য ন তে বিদুঃ।।১০/৭/১০।*** গোপেরা বালকদের এই কথা বিশ্বাস করলেন না, বাচ্চারা নিজেদের কল্পনা থেকে বলছে মনে করে তাদের কথাকে উপেক্ষা করলেন। কিন্তু এটাই তো স্বাভাবিক, কারণ ওই শিশুটির শক্তি *অপ্রমেয়ং বলং তস্য*, তাঁর শক্তি, বলকে মাপা যায় না। তিনি ভগবান কিনা। বালকের এই শক্তি তাঁদের জানার কথা নয়। যশোদা আবার এদিকে ভাবছে, কোন গ্রহের উৎপাতে আমার ছেলের কোন বিপদ হতে যাচ্ছিল। তখন আবার ব্রাহ্মণদের ডাকিয়ে তাঁদের দিয়ে বাচ্চাকে স্বস্ত্যয়ন করালেন।

এরপর ব্রাহ্মণরা হোম করে দই, আতপ চাল আর জল দ্বারা সেই শকটেরেও পূজা করলেন। আর বলছেন ***যেহসূয়ানৃতদম্ভের্ষ্যাহিংসামানবিবর্জিতাঃ। ন তেষাং সত্যশীলানামাশিষো বিফলাঃ কৃতাঃ।। ১০/৭/১৩।*** অসূয়া, মানে কারুর দোষ না দেখা, অনৃত, মিথ্যা কথা বলে না আর দম্ভ, ঈর্ষা, হিংসা ও অভিমান বর্জিত, এই ধরণের গুণ যে ব্রাহ্মণের মধ্যে আছে সেই ব্রাহ্মণের আশীর্বাদ কখন বিফল হয় না। নন্দবাবা শ্রীকৃষ্ণকে কোলে তুলে নিয়েছেন, ব্রাহ্মণরা আশীর্বাদ করছেন আর তার সঙ্গে সামবেদ, ঋকবেদের মন্ত্রোচ্চারণের দ্বারা স্বস্ত্যয়ন করে জল সিঞ্চন করে শ্রীকৃষ্ণকে শান্ত করেছেন। এইভাবে এক এক করে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার বিভিন্ন ঘটনা বর্ণনা করে যাচ্ছেন। প্রথমে পূতনা উদ্ধার হল আর তারপরেই শকট ভঞ্জন লীলা।

তৃণাবর্ত-উদ্ধার

তৃণাবর্ত নামে এক দৈত্য ছিল। এই দৈত্য এক বিরাট ধুলি-ঝড়ের আকার ধারণ করে শ্রীকৃষ্ণকে বধ করতে এসেছে। পুরাণ যাঁরা রচনা করেন তাঁরা তখনকার স্থানীয় কাহিনী ও কিছু ঘটনাবলী আর তার সাথে

নিজের কল্পনাকে মিশিয়ে ঈশ্বরের যে এক বিরাট শক্তি আছে সেটাকে সাধারণ মানুষের কাছে উপস্থাপন করে দেন। তৃণাবর্ত ঘন ধুলিজালে সমগ্র গোকুলকে আচ্ছন্ন করে দিয়েছে। সবার যে যার নিজের চোখ, জীবন নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে আর সেই ফাঁকে মাটিতে বসে থাকা বালক শ্রীকৃষ্ণকে তুলে নিয়ে চলে গেছে। ভগবান তখন তৃণাবর্তের গলা দুহাতে এমন ভাবে জড়িয়ে ধরেছে যে, সে তাঁকে আর ছাড়াতে পারছে না। ইতিমধ্যে ধুলিঝড় সরে যেতে যশোদা দেখছে যেখানে কৃষ্ণকে রেখে গিয়েছিলেন সেখান কৃষ্ণ নেই। যথারীতি কান্নাকাটি পড়ে গেছে। অন্য দিকে ভগবান তাঁর অষ্টসিদ্ধির গরিমা দিয়ে নিজেকে পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যে ভার তার সাথে এক করে দিয়ে নিজের ওজন ক্রমশ বাড়িয়ে চলেছেন। তৃণাবর্ত শ্রীকৃষ্ণকে টেনে মথুরার দিকে নিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু ক্রমশ এমন ওজন বেড়ে গেছে যে তৃণাবর্ত আর শ্রীকৃষ্ণকে টানতে পারছিল না। বলছেন, তৃণাবর্তের মনে হচ্ছে এই শিশুটা যেন একটা পাহাড়ের বিশাল প্রস্তরখণ্ড। এখন ভাবছে এই অদ্ভুত শিশুকে ছেড়ে দিলেই ভালো। কিন্তু তারও উপায় ছিল না, কারণ শ্রীকৃষ্ণ তো তার গলাটা দুহাত দিয়ে সজোরে জড়িয়ে রেখেছে। এমন জোর গলাটা চেপে ধরেছে যে তৃণাবর্ত কিছুতেই ছাড়াতে পারছে না। একেই পাহাড়ের মত ভার তার উপর গলায় ফাঁসের মত আটকে থাকা। আর কতক্ষণ টিকতে পারবে! ধীরে ধীরে তৃণাবর্তের প্রাণ বেরিয়ে গেল। শ্রীকৃষ্ণকে না পেয়ে সবাই একত্রিত হয়েছে, সেই সময় দেখছে এক বিশাল দেহ নিয়ে ভীষণ দর্শন এক অসুর পাথরের উপর পড়ে তার অঙ্গগুলো চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল। আরও আশ্চর্য হয়ে দেখে শ্রীকৃষ্ণ সেই অসুরের গলা জড়িয়ে তার বুকের উপর আরামসে শুয়ে আছে, যেন কিছুই হয়নি।

জাদুকরদের ক্ষেত্রে বলা হয় যতক্ষণ জাদুকর থাকবে ততক্ষণই তো জাদুর খেলা। ইংরাজীতে zombie বলে একটা শব্দ আছে। Zombie মানে মানুষ, কিন্তু রোবটের মত। রোবট আমাদের সব কাজ করবে কিন্তু তার নিজের মস্তিষ্ক কোন কাজ করে না। Zombieদের নিয়ে প্রচুর সিনেমাও হয়েছে। মজার ব্যাপার হল বাস্তবেই zombieরা ছিল। জানা গেছে কোন একটা দ্বীপপুঞ্জে আগেকার দিনের কিছু আদিবাসী ছিল তাদের মধ্যে কিছু মেডিসিন ম্যান ছিল। কোন দুষমনকে ওদের কোন পুরোহিত মন্ত্র দিয়ে মেরে ফেলত, তারপর তাকে কবর দিয়ে দেওয়া হত। কবর দেওয়ার পর তারা বলত 'আমরা ওকে মৃত্যু থেকে ফেরত নিয়ে আসব'। তারপর দেখা যেতে সত্যিই সেই লোকটি আবার কবর থেকে ফিরে এসেছে কিন্তু তার মস্তিষ্ক কোন কাজ করছে না। কিন্তু মেডিসিন ম্যানদের এই রহস্যজনক কার্যকলাপ জানার কোন উপায় ছিল না। এই আদিবাসীরা আখের ক্ষেতে কাজকর্ম করত। একবার একজন লোক সম্পত্তির লোভে নিজের ভাইয়ের উপর এই zobieর ব্যাপারটা প্রয়োগ করিয়ে দিয়েছে। ভাইটা ভ্যানিশ হয়ে গেছে। এরপর ভাইটা মারা গেল, কবর দেওয়াও হয়ে গেল, তারপর আবার মৃত্যু থেকে ফেরতও আনা হয়েছে। মৃত্যু থেকে ফিরে আসার পর সে zombie হয়ে গেছে। Zombie হওয়ার পর ওর একজন ম্যাজিসিয়ানও হয়ে গেছে। ইতিমধ্যে কীভাবে সেই ম্যাজিসিয়ানটা মারা গেছে। ম্যাজিসিয়ান মারা যাওয়াতে এই লোকটিও zombieর অবস্থা থেকে মুক্ত হয়ে গেছে। মুক্ত হওয়ার পর লোকটি হাঁটতে হাঁটতে কীভাবে কোথায় পৌঁছে গেছে। আর সেখানে হঠাৎ ওর নিজের বোনের সাথে দেখা হয়ে গেছে। বোন নিজের ভাইকে চিনতে পারছে না। তারপর সে বোনকে নিজের কাহিনীটা বলাতে ওরা অনুসন্ধান করতে নেমে গেল। তখনই এই zombieর রহস্যটা বেরিয়ে এল। জানা গেল অস্ট্রেলিয়াতে এক ধরণের ব্যাঙ আছে যার চামড়া খুব বিষাক্ত আর জাপানে এক রকম মাছ আছে সেই মাছও খুব বিষাক্ত। এতই বিষাক্ত যে শুধু এদের চামড়া যদি কোন মানুষের শরীরে ঘষে দেওয়া হয় তাতেই সেই মানুষটি মরে যাবে। এই ম্যাজিক ম্যানরা বংশ পরম্পরা ধরে এইসব করে করে এমন একটা মাত্রাতে বিষটাকে প্রয়োগ করার কৌশল আয়ত্ত করে নিয়েছিল যে যার উপর প্রয়োগ করা হবে মনে হবে সে ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে এগোচ্ছে, কিন্তু মরবে না। এরপর সঙ্গে সঙ্গে তাকে কবর দিয়ে দেবে। কফিনে কবর দিলে অক্সিজেন না পেলে এমনিতেই জ্যান্ত লোক মরে যাবে। কিন্তু ওরা রাত্রিবেলা কবর খুঁড়ে ওই লোকটাকে বার করে নিয়ে আসত। আসলে লোকটা তো মরেনি, এ্যানাস্থেসিয়ার মত করে রাখা হয়েছে। এরপর ম্যাজিসিয়ানরা তাকে ধুতড়োর রস খাইয়ে দিত। ওই রস খাওয়ালে মস্তিষ্ক কোন কাজ করবে না। তখন ওকে যা বলত সেটাই করত। কোন স্মৃতিই তো নেই। লোকেরা মনে করত এই ম্যাজিসিয়ান এই মৃত ব্যক্তিকে মৃত্যু থেকে ফিরিয়ে

এনেছে। কারণ সবার চোখের সামনেই তাকে কবর দেওয়া হয়েছিল। এইভাবে অনেক দিন অনুসন্ধান করে করে অনেক দিন পর সব ধরা পড়ল। মাঝখান থেকে ওই ম্যাজিকম্যানটা মারা যাওয়াতে ওই লোকটা ম্যাজিসিয়ানের প্রভাব থেকে কীভাবে মুক্ত হয়ে গিয়েছিল, তারপর ধুতড়োর রস আর খাওয়ান হচ্ছিল না বলে আস্তে আস্তে তার মস্তিষ্কটাও স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছিল বলে জিনিষটা ধরা পড়ল। ঠিক তেমনি তৃণাবর্ত মরে যাওয়াতে তারও আর ঝড়ের প্রভাব থাকলো না। তৃণাবর্ত ভূতলে পতিত হতেই দেখে তার বুকের উপর শ্রীকৃষ্ণ দিব্যি শুয়ে আছে।

সবাই ভাবছে আবার কি উৎপাৎ শুরু হল ***অহো বতাত্যদ্ভুতমেষ রক্ষসা বালো নিবৃত্তিং গমিতোঽভ্যগাৎ পুনঃ। হিংস্রঃ স্বপাপেন বিহিংসিতঃ খলঃ সাধু সমত্বেন ভয়াদ্ বিমুচ্যতে।।১০/৭/৩১।*** কী আশ্চর্য! রাক্ষস তো আমাদের কৃষ্ণকে মেরেই ফেলেছিল, কিন্তু কোন অনিষ্ট ছাড়াই কোন রকমে সে বেঁচে ফিরে এসেছে। তারপরে বলছেন পাপী শঠ লোকেরা নিজেদের পাপেই মারা যায় কিন্তু সাধুপুরুষ যাঁরা তাঁরা ঠিক বেঁচে যান। কীভাবে বেঁচে যান? *সমত্বেন ভয়াদ্ বিমুচ্যতে*, সমত্ববুদ্ধির দ্বারা। সাধু মানেই তার মধ্যে সমত্ববুদ্ধি থাকবে। গীতায় ভগবান বলছেন *সমত্বং যোগ উচ্যতে*। সবারই প্রতি সমান ভাব থাকলে মানুষ মৃত্যু থেকেও বেরিয়ে আসে। এখানে শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করা হচ্ছে, অথবা বলা যায় নন্দবাবার মত লোক এনারা সবাই সাধুপুরুষ ছিলেন। সবাই বলছেন ***কিং নস্তপশ্চীর্ণমধোক্ষজার্চনং পূর্তেষ্টদত্তমুত ভূতসৌহৃদম্। যৎসংপরেতঃ পুনরেব বালকো দিষ্ট্যা স্ববন্ধূন্ প্রণয়ন্নুপস্থিতঃ।।১০/৭/৩২।*** আমরা কীই বা এমন তপস্যা করেছি, আমরা কী এমন ভগবানের আরাধনা করেছি, কী এমন ইষ্টাপুর্ত কাজ করেছি, কী এমন যজ্ঞ, দান ও কল্যাণকর কর্ম করেছি যে আমাদের সন্তানটি মৃত্যুর মুখ থেকে আবার তার আত্মীয়স্বজনদের সুখী করবার জন্য ফিরে এল। কিন্তু তাঁরা বুঝতে পারছেন না যে, এটা ঈশ্বরেরই লীলা।

যশোদার শ্রীকৃষ্ণের প্রথম স্বরূপ দর্শন

একদিন যশোদা শিশু শ্রীকৃষ্ণকে স্তন্য পান করিয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণের ঐ সুন্দর কোমল গালে একটু দুধ লেগে আছে। ওই দেখে যশোদার মনে বাৎসল্য রস এত উথলে উঠেছে যে, শ্রীকৃষ্ণের গালে একটু চুম্বন করতে গেছেন। ভক্তিশাস্ত্র কিনা, খুব মিষ্টি করে বর্ণনা করছেন। যশোদা যখন চুম্বন করতে গেছেন তখন শ্রীকৃষ্ণের আবার হাই উঠেছে। চুম্বন করতে গিয়ে দেখেন শ্রীকৃষ্ণের মুখটা হা হয়ে গেছে আর সেই মুখের মধ্যে মা যশোদা দেখছেন ***খং রোদসী জ্যোতিরনীকমাশাঃ সূর্যেন্দুবহ্নিশ্বসনাম্বুধীংশ্চ। দ্বীপান্ নগাংস্তদ্দুহিতৃর্বনানি ভূতানি যানি স্থিরজঙ্গমানি।।১০/৭/৩৬।*** শ্রীকৃষ্ণের মুখের মধ্যে মা যশোদা দেখছেন শিশুর মুখে মহাকাশ, দ্যুলোক-ভূলোক, অন্তরীক্ষ, জ্যোতির্মণ্ডল, দিশা, সূর্য, চন্দ্রমা, অগ্নি, বায়ু, সমুদ্র, দ্বীপ, পর্বত, নদী, বন এবং চরাচর সমগ্র প্রাণীজগৎ সব কিছু তাঁর মধ্যে অবস্থান করছে। যশোদা বুঝতে পারলেন না, শ্রীকৃষ্ণই ভগবান আর তাঁর মধ্যেই সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বিরাজ করছে। ঐ দৃশ্য দেখেই যশোদার সমস্ত শরীরে কম্পন শুরু হয়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি চোখটা বন্ধ করে নিলেন, কিন্তু তখনও মাথাটা ঘুরছে। ততক্ষণে আবার ঐ দৃশ্যটাও চলে গেছে। এতক্ষণ ভগবান পূতনা উদ্ধার, শকট-ভঞ্জন, তৃণাবর্ত উদ্ধারের মাধ্যমে পরোক্ষে তাঁর লীলা দেখালেন। কিন্তু এখানে প্রত্যক্ষ তাঁর স্বরূপটা মা যশোদাকে দেখিয়ে দিলেন।

আমাদের শাস্ত্রে এই ধরণের অনেক ঘটনার বর্ণনা পাওয়া যায়, শ্রীকৃষ্ণের মুখের মধ্যে ব্রহ্মাণ্ড। শাক্ত মতেও এই ভাব নিয়ে গান আছে – মাকালীর উদরে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড। আবার মাঝে মাঝে ভগবান কোন কোন খুব প্রিয় ভক্তকে তাঁর এই ঐশ্বর্যের ঝলক একটু দেখিয়ে দেন, এই দেখো! আমি শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু আমার বাস্তবিক রূপ এই। ভাগবতের এই দশম স্কন্ধেই আবার আসবে, শ্রীকৃষ্ণ মুখে মাটি দিয়েছে, যশোদার কাছে খবর এসেছে, যশোদা ছুটে এসে কৃষ্ণের মুখ থেকে মাটি বার করতে গিয়ে দেখেন কৃষ্ণের মুখে সেই ব্রহ্মাণ্ড। শ্রীরামচন্দ্রের জীবনেও এই একই লীলা দেখা যায়। একবার কাকভূষণ্ডীর শ্রীরামচন্দ্রকে পরীক্ষা করার ইচ্ছে হয়েছিল, শ্রীরামচন্দ্র কি সত্যিই ভগবান কিনা। শ্রীরামচন্দ্র যাতে তাঁকে ধরতে পারেন তার জন্য তিনি শ্রীরামের একটু কাছে এসেছেন, দেখছেন তাঁকে ধরতে শ্রীরামচন্দ্রের হাতটা এগিয়ে আসছে। তারপর কাকভূষণ্ডী সেখান

থেকে উড়ে গিয়ে একটু দূরে বসলেন। তখন দেখছেন শ্রীরামচন্দ্রের সেই ছোট্ট হাত সেখানেও পৌঁছে গেছে। এরপর যেখানেই উড়ে গিয়ে বসেছেন সেখানেই তাঁকে শ্রীরামচন্দ্রের হাত ধরার নাগালে চলে আসছে। এই করে কাকভূষণ্ডীর যখন তিন ভুবন ঘোরা হয়ে গেলে তখন শ্রীরামচন্দ্র তাঁকে ধরেছেন। কাকভূষুণ্ডী ছিলেন একজন ঋষি কিন্তু তিনি কাকের শরীর ধারণ করে সাধনা করছিলেন। শ্রীরামচন্দ্র তাঁকে ধরে মুখের মধ্যে পুরে দিয়েছেন। কাক ভূষণ্ডী শ্রীরামচন্দ্রের মুখের ভেতরে ঢুকে দেখেন তিনি কোথাও যাননি, যে গাছে বসে ছিলেন সেই গাছের ডালেই বসে আছেন। এর মানে ভগবানের যেটাই বাহির সেটাই আবার তাঁর ভেতর। এগুলো কিন্তু কোন কল্পনা নয়, এটাই বাস্তব। গীতাতেও ভগবান ঠিক এই কথাই বলছেন – *বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ। সূক্ষ্মাত্বাৎ তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ।।১৩/১৭।* এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বাইরেও তিনি আবার ভেতরেও তিনি। আবার এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে যখন অতিক্রম করে যাব তখন দেখতে পাব যে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তাঁর ভেতরেই আছে। এই কথাগুলো শুনলে মনে হবে স্ববিরোধী। কিন্তু ঋষিরা ঠিক এভাবেই দেখেন।

ভগবানের নামকরণ-সংস্কার

ভাগবত গ্রন্থ অত্যন্ত ভাবের বিষয়। শ্রীকৃষ্ণের ছোট ছোট কথা ও ঘটনাকে নিয়ে যাঁরা ধ্যানে লীন হয়ে থাকতে চান ভাগবত তাঁদেরই জন্য। সেইজন্য আগেকার দিনের ভাষ্যকাররা, যাঁরা ভাগবতের উপর ভাষ্য ও টীকা লিখেছেন তাঁরা ঠিই সেই ভাবেই লিখেছেন। শ্রীকৃষ্ণ এবার একটু বড় হয়েছেন। এবার তাঁর নামকরণ সংস্কার করা হবে। বেদের সময় আমাদের ৬৪টি সংস্কার ছিল, পরের দিকে তন্ত্রে এসে দশটি সংস্কারে দাঁড়িয়েছে। বলা হয়, মানুষ যখন জন্মায় তখন সে অশুদ্ধ হয়েই জন্ম নেয়। এই অশুদ্ধতাকে শুদ্ধ করতে হয়। শুদ্ধ করার জন্য সংস্কার করা হয়। সংস্কার মানে তাই, সম্যক রূপে যখন ক্রিয়া করা হয়, যেমন বাড়ির সংস্কার করা হয়। জন্মের আগে থেকে শুরু করে একেবারে অন্ত্যেষ্টি পর্যন্ত মানুষের সংস্কার প্রক্রিয়া চলতে থাকে। এমনকি সন্ন্যাসীদের সন্ন্যাস হয়ে যাওয়ার পর যদিও আর কোন কিছু সংস্কার করতে হয় না, শুধু অন্ত্যেষ্টি বাকী থাকে। সন্ন্যাসীদের অন্ত্যেষ্টি হয় না। সংস্কারের যে তালিকা আছে তাতেও সন্ন্যাসের পরেই অন্ত্যেষ্টি সংস্কারের উল্লেখ আছে। যাদের সন্ন্যাস হয় না তারা সরাসরি অন্ত্যেষ্টি সংস্কারে চলে আসে। সন্ন্যাসও যাঁরা নেন তাঁদেরও একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান পালন করতে হয়, সেটা হল বিরজাহোম। বিরজাহোম না হওয়া পর্যন্ত সন্ন্যাস হবে না। প্রত্যেক সন্ন্যাসীকে বিরজাহোমের ছোট্ট একটা অংশ রোজ নিয়মিত পাঠ করে যেতে হয়। কারণ রোজই কোন না কোন ভাবে সন্ন্যাসীরও শরীরে, মনে, অন্তরে ময়লা জমছে। হিন্দু শাস্ত্রে মানুষ হল শুদ্ধ পবিত্র, তাকে শুদ্ধির দিকে যেতে হয় না। তাহলে কি করতে হয়? আমাদের মধ্যে বাইরে থেকে ময়লা এসে জমেছে, সেই ময়লাকে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে দিলে যেমনটি ছিল তেমনটি থাকবে। এই উচ্চ ভাব একমাত্র হিন্দু ধর্মেই পাওয়া যাবে। অন্যান্য ধর্মে বলবে তুমি অপবিত্র, অপবিত্রতা থেকে তুমি এবার পবিত্রতার দিকে এগোচ্ছ। খ্রীশ্চান ধর্মে বলছে, তুমি জন্ম নিয়েছ মানেই তুমি পাপী। এই পাপকে এবার ধুয়ে মুছে তুমি নিজেকে পাপ থেকে মুক্ত করে পবিত্র হওয়ার চেষ্টা কর যাতে Kingdom of Heaven বা Kingdom of God সেখানে যাতে প্রবেশ করতে পারো। হিন্দুরা কখনই তা বলবে না, হিন্দুরা বলবে তুমি স্বভাবেই শুদ্ধ পবিত্র, কিন্তু এই জগতের আবর্জনা তোমার ভেতরে ঢুকছে। সেইজন্য বাইরের এই ধুলোটা তুমি পরিষ্কার করতে থাক। কীভাবে পরিষ্কার করবে? সংস্কারের দ্বারা। সংস্কার মানেই তাই, জিনিষটা আগে থেকেই ভালো ছিল কিন্তু পরে এর মধ্যে অনেক আবর্জন ঢুকে গোলমাল হয়ে গেছে সেইজন্য সংস্কার করে আগের মত করে নেওয়া।

ষোড়শ সংস্কারের মধ্যে নামকরণ একটি অন্যতম সংস্কার। জ্যোতিষাচার্যরা এসে জাতকের বিভিন্ন লক্ষণাদি দেখেন, তারপর জাতকের সহজাত প্রবৃত্তি কি রকম, এগুলোকে বিচার করে তিনি কতকগুলো নামের তালিকা দিয়ে বলে দেন জাতকের এই ধরণের নাম রাখা যেতে পারে। শিখদের মধ্যে নাম রাখার একটা ভালো পদ্ধতি আছে, সেখানে ওরা নামকরণের সব সংস্কার করার পর গুরু গ্রন্থসাহেব রাখা হবে। একজন শিখ গুরু হঠাৎ করে গ্রন্থসাহেবের যে কোন একটা পাতা খুলে দেবেন। খুলে দেওয়ার পর তাতে প্রথম যে শব্দ থাকবে, সে শব্দের অক্ষর দিয়ে জাতকের নাম রাখা হবে। তেমনি যারা রামভক্ত তারা রামচরিতমানস গ্রন্থকে

ওইভাবে খুলে নামকরণ করে। কিন্তু আমাদের পরম্পরাতে জ্যোতিষরা জাতকের স্বভাব ও লক্ষণ দেখে বলতেন জাতকের সংস্কার এই রকম। সংস্কার যেই রকম জাতকের নামটাও সেই অনুসারে রাখা হত।

যদুবংশীয়দের কুলপুরোহিত ছিলেন গর্গাচার্য। গর্গ ছিলেন বিরাট তপস্বী। সেই গর্গাচার্য একদিন গোকুলে নন্দবাবার কাছে এসেছেন। বসুদেব আর নন্দবাবা দুজনের বংশ আলাদা হলেও এই দুটি মানুষ ছিলেন অভিন্নহৃদয় বন্ধু। বসুদেবের আরেক স্ত্রী রোহিণীকে কারাগারে থাকার সময় নন্দবাবার কাছে রেখে দিয়েছিলেন। সেই বসুদেবেরই প্রেরণায় গর্গাচার্য গোকুলে নন্দগৃহে এসেছেন। ***তং দৃষ্ট্বা পরমপ্রীতঃ প্রত্যুত্থায় কৃতাঞ্জলিঃ। আনর্চাধোক্ষজধিয়া প্রণিপাতপুরঃসরম্।।*** *১০/৮/২।* গর্গাচার্যকে দেখে নন্দবাবা অত্যন্ত প্রীত হয়ে ভগবদ্ বুদ্ধিতে তাঁর সেবা পূজা করে সুখাসনে উপবিষ্ট করালেন। খুব মধুর ভাবে নন্দবাবা গর্গাচার্যকে বলছেন 'আপনি হলেন পূর্ণকাম! আমি আপনার কোন্ সেবায় লাগতে পারি বলুন'। বড় বড় ঋষি মুনিদের নিজস্ব কোন ইচ্ছা থাকে না, তাই নন্দবাবা তাঁকে পূর্ণকাম বলে সম্বোধন করছেন। অপূর্ণতার ভাব যেখানে সেখানেই বাসনা। আমি অপূর্ণ আর আমি পূর্ণতা পেতে চাইছি। একজন মনে করছে আমার টাকা-পয়সা নেই আমার টাকা পয়সা চাই। এবার অর্থোপার্জনের তাকে কাজ করতে হবে, এটাই হল বাসনা। আমার বিদ্যা নেই, আমি বিদ্যা অর্জন করতে চাইছি। এখানেও অপূর্ণতা থেকে পূর্ণতার দিকে যাচ্ছে, তাই এটাও বাসনা। কিন্তু ঈশ্বর লাভের ইচ্ছা, মোক্ষ লাভের ইচ্ছা, ঈশ্বরের জ্ঞান লাভের ইচ্ছা এগুলো বাসনার মধ্যে পড়ে না। তার কারণ, এটাই আমার স্বভাব। আমরা স্বভাবতই পূর্ণ কিন্তু সেখানে মনে করছি আমার মধ্যে অপূর্ণতা এসে জুটেছে, তখন এই ভাবে আমরা অপূর্ণতাকে সরাচ্ছি। মোক্ষ লাভ, ঈশ্বর লাভ, এখানে লাভ শব্দটা বোঝানর জন্য বলা হচ্ছে, কিন্তু যে অর্থে জাগতিক লাভকে বাসনা বলা হয়ে সেই অর্থে মোক্ষ লাভ হয় না, কারণ এটাই আমাদের স্বভাব। পূর্ণতাই আমাদের প্রকৃত স্বভাব, অপূর্ণতা কখনই আমাদের স্বভাব নয়। কিন্তু কোন খ্রীশ্চান বা মুসলমান যখন ঈশ্বর দর্শনের কথা বলছে তখন তারা অপূর্ণতার থেকে বলছে, কারণ তারা নিজেকে জন্ম থেকে পাপী মনে করে আসছে। পূর্ণতা কি করছে? তার পাপটাকে সরাচ্ছে। হিন্দুদের কাছে এই তত্ত্ব গ্রহণযোগ্য হবে না, কারণ হিন্দুরা স্বভাবেই পূর্ণ কিন্তু অপূর্ণতার ভাব তাকে যেন ঘিরে নিয়েছে, সে সেই অপূর্ণতাকে ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছে। হিন্দুরা অপূর্ণতা থেকে পূর্ণতার দিকে যায় না, পূর্ণ সব সময়ই আছে কিন্তু অপূর্ণতাকে সরিয়ে দিচ্ছে। আমরা যখন ঠাকুরের কথা শুনতে চাইছি, ভগবানের তত্ত্বের কথা জানতে চাইছি, এটাকে যখন বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে দেখা হবে তখন দেখা যাবে, আমাদের যে ঠিক ঠিক স্বভাব, সেই স্বভাবে আমরা প্রতিষ্ঠিত হতে চাইছি। এখানে কোন জাগতিক চাওয়া-পাওয়ার ব্যাপার থাকছে না। ভগবান গীতায় বলছেন *কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ*, ঠাকুরের যাঁরা ভক্ত তাঁরা সারাদিন ঠাকুরের কথা শুনতে চান, পরস্পর আলোচনা করতে চান, ঠাকুরের চিন্তাতে ডুবে থাকতে চান। কারণ ওইটাই তাঁর স্বভাব। কিন্তু যখন টাকা-পয়সা চাইছি তখন অপূর্ণতা থেকে চাইছি, কারণ আমার কাছে টাকা-পয়সা নেই বলে নিজেকে অপূর্ণ ভাবছি, আমার বিয়ে হচ্ছে না বলে আমি অপূর্ণ তাই বিয়ে করে পূর্ণ হতে চাইছি। জগতের সবটাই অপূর্ণতা থেকে পূর্ণতার দিকে এগোন। কিন্তু যখন আমার ঝামেলা মনে হচ্ছে মনে করছি, যেমন আমার মাথায় একটা দশ মণ বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, আমি বোঝাটা মাথা থেকে ফেলতে চাইছি। এখানে কিছু পাওয়ার জন্য ইচ্ছা হচ্ছে না, ফেলে দেওয়ার ইচ্ছা হচ্ছে। আমাদের স্বভাব হল মুক্ত, আমি এই বোঝাটা বহন করতে চাইছি না।

গর্গাচার্য একজন পূর্ণকাম পুরুষ, তিনি কেন অপরের বাড়িতে যাবেন! সেইজন্য বসুদেব বলছেন 'আপনি তো পূর্ণকাম, আপনাকে আমি কি সেবা করতে পারি'! কারণ তিনি তো বসুদেবের বাড়িতে কিছু প্রাপ্তির জন্য আসেননি। এখন পূর্ণকাম যদি গৃহস্থের বাড়িতে গিয়ে হাজির হন তাহলে বুঝতে হবে অন্য কারুর কিছু দরকার আছে, বা অন্য কোন কারণ থাকতে পারে বা সেই গৃহস্থের মঙ্গলের জন্য তিনি এসেছেন। আচার্য শঙ্কর এক জায়গায় বলছেন – ভগবানের নিজের কোন প্রয়োজন থাকে না, শুধু জীবের কল্যাণের জন্য, জীবের মঙ্গলের জন্য তিনি শরীর ধারণ করেন। সাধু সন্ন্যাসীদের ক্ষেত্রেও একই জিনিষ, তাঁরাও পূর্ণকাম, তাঁরা যা কিছু করেন সবটাই অপরের মঙ্গলের জন্যই করেন।

এই কথাই নন্দবাবা পরের শ্লোকে বলছেন, ***মদ্বিচলনং নৃণাং গৃহিণাং দীনচেতসাম্। নিঃশ্রেয়সায় ভগবন্ কল্পতে নান্যথা ক্বচিৎ।।১০/৮/৪।*** ‘আমরা সব সময় সাংসারিক নানা রকম ঝামেলায়, বিভিন্ন কাজে এত ব্যস্ত থাকি যে ভগবানে যে একটু মন দেব, শুভ কাজে মন দেব, তার কোন ফুরসতই হয় না। সেইজন্য আমরা নিজেরা একটু ভালো কিছু যে করবো তারও সম্ভবনা নেই। এমনকি আপনারা যে আশ্রমাদিতে আছেন সেখানেও যাওয়ার সময় হয় না। তাই আমাদের কল্যাণের জন্য আপনাদেরকেই আমাদের গৃহে আসতে হয়’। সংসাররী ইচ্ছা থাকলেও পারে না। একটা ঝামেলা মিটে গেলে অন্য আরেক ঝামেলা এসে পড়ে। একদিন হয়তো ইচ্ছা হল, যাই একটু বেলুড় মঠে ঠাকুর প্রণাম করে আসি, আর তখনই দেখা যাবে এমন একটা বিঘ্ন এসে গেল যে আর যাওয়াই হলো না। ঠাকুর সেইজন্য বলছেন, সন্ন্যাসী তো ভগবানের নাম করবেই, কিন্তু সংসারী বিশ মণ বোঝা কাঁধে নিয়ে ভগবানের নাম করে। গর্গাচার্যকে তাই নন্দবাবা বলছেন আপনারা তো কোন স্বার্থ নিয়ে কোথাও যান না, একটাই স্বার্থ জীবের কল্যাণ। স্বার্থ ছাড়া মানুষ কখনই কারুর কাছে যাবে না, অপূর্ণকাম বলেই যায়। সন্ন্যাসী যদি কোন গৃহস্থের বাড়ি যান তাহলে বুঝতে হবে গৃহস্থের মঙ্গলের জন্যই তিনি এসেছেন।

আর তাই না, বলছেন ***জ্যোতিষাময়নং সাক্ষাদ্ যত্তজ্জ্ঞানমতীন্দ্রিয়ম্। প্রণীতং ভবতা যেন পুমান্ বেদ পরাবরম্।।১০/৮/৫।*** গর্গাচার্য জ্যোতিষশাস্ত্রের উপর গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। নন্দরাজ তাই বলছেন আপনি যে জ্যোতিষশাস্ত্র রচনা করেছেন তাই দিয়ে অতীন্দ্রিয় তত্ত্ব তথা ভূত, ভবিষ্যত সব জানা যায়। ***ত্বং হি ব্রহ্মবিদাং শ্রেষ্ঠঃ সংস্কারান্ কর্তুমর্হসি। বালয়োরনয়োর্নৃণাং জন্মনা ব্রাহ্মণো গুরুঃ।।১০/৮/৬।*** আর আপনি ব্রহ্মবিদদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। তাই কৃপা করে আপনি এই বালক দুটির নামকরণ সংস্কার সম্পাদন করুন।

জ্যোতিষশাস্ত্র হল বেদাঙ্গের একটি অঙ্গ। বেদের ছয়টি অঙ্গ হল – শিক্ষা, কল্প, ব্যকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ, এই ছটিকে একসাথে বেদাঙ্গ বলা হয়। বেদাঙ্গের প্রধান প্রধান কাজ হল – বেদের মূল কর্ম যজ্ঞ-যাগ যেন ঠিক ভাবে করা হয়, মন্ত্রের উচ্চারণ যেন ঠিক ঠিক হয়, মন্ত্রের অর্থ যেন পরিষ্কার বোধগম্য থাকে, যজ্ঞের পদ্ধতিটা যেন জানা থাকে। তার মধ্যে একটা হল জ্যোতিষশাস্ত্র। জ্যোতিষশাস্ত্রের কাজ হল, গ্রহ-নক্ষত্র, তিথি দেখে ঠিক ঠিক সময় নির্ধারণ করে বলে দেওয়া এই যজ্ঞ কখন শুরু করতে হবে আর কখন শেষ করতে হবে। এখনও দূর্গাপূজা, কালীপূজা, বিয়ের লগ্ন, সমস্ত রকম পূজাপার্বণের দিন-ক্ষণ, তিথি, সময় জ্যোতিষশাস্ত্র দিয়েই ঠিক করা হয়। জ্যোতিষশাস্ত্র পুরোপুরি একটি বিজ্ঞান, যে বিজ্ঞানকে বলা হয় জ্যোতির্বিজ্ঞান। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা সব হিসাব করে বলে দেন অমুক দিন অমুক সময় সূর্যগ্রহণ বা চন্দ্রগ্রহণ হবে। এর পুরো একটা বিজ্ঞান সম্মত হিসাব আছে, এই হিসাব করার পদ্ধতিটা শিখে নিলে যে কেউ বলে দিতে পারবে কবে সূর্যগ্রহণ, কবে চন্দ্রগ্রহণ, কবে পূর্ণিমা অমাবস্যা হবে। আর্যভট্টাদি জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা আগে থাকতেই হিসাব করে সব বলে দিতেন। সেই থেকে সাধারণ মানুষ অবাক হয়ে গিয়ে ভাবতে শুরু করল এনারা ভূত ভবিষ্যত সব বলে দিতে পারেন। সেখান থেকে কিছু লোভী জ্যোতিষীও বলতে শুরু করে দিল আমরা সব ভূত ভবিষ্যত বলে দিতে পারি। কোন গণিতজ্ঞ এই ধরণের কথা বলবেন না, বেদে কোথাও বলা নেই যে জ্যোতিষশাস্ত্র দিয়ে গ্রহ-নক্ষত্রের গতিবিধি, অবস্থান ছাড়া তুমি সব কিছুর ভূত ভবিষ্যতও জেনে যাবে। তাই এখনকার জ্যোতিষীরা যে কত লোক ঠকানো কারবার করছে সাধারণ মানুষ বুঝতেও পারছে না। আমাদের পরম্পরার জ্যোতিষশাস্ত্রের কাজ হল সময়টাকে নির্দিষ্ট করে বলা।

সময় বলে দেওয়া ছাড়াও জ্যোতিষশাস্ত্রবিদদের আরেকটি কাজ ছিল, কিছু কিছু লক্ষণ দেখে বলে দিতেন তোমার কি হতে যাচ্ছে, এই হলে এই হবে। যেমন রাস্থা দিয়ে যেতে গিয়ে একটা বেড়াল রাস্থা কেটে দিল, শেয়াল যদি হঠাৎ কাঁদতে থাকে। এই জিনিষগুলোকে ওনারা পর্যবেক্ষণ করে করে একটা তালিকা তৈরী করে বলে দিলেন – এই রকম হলে এই হয়, ওই রকম হলে এই রকম হবে ইত্যাদি। তারপরে দেখা গেল মানুষের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে কিছু কিছু চিহ্ন দেখা যায়। সেগুলোকেও ওনারা পর্যবেক্ষণ করে দেখলেন এই রকম চিহ্ন যাদের আছে তারা রাজা হয়েছে, এই চিহ্ন থাকলে সন্ন্যাসী হবে, এই চিহ্ন থাকলে অমুক কিছু হবে

ইত্যাদি। শরীরের এই চিহ্নকে ওনারা খুব মানতেন। পরের দিকে এই ধরণের সব কিছু মিলিয়ে কিছু লোক ব্যবসা শুরু করে দিল। এনারা আবার বলতে শুরু করলেন জন্মের সময় গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান যদি এই রকম হয় তাহলে জাতকের এই রকম হবে। তবে এটাও আমাদের বেদ মতের বাইরে, গ্রহ-নক্ষত্র দেখে জন্মকুণ্ডলীর ব্যাপার আরও অনেক পরের দিকে শুরু হয়েছে। গর্গাচার্যের যে নাম আসছে ইনিও অনেক পরের দিকের। তারও অনেক পরে এসেছে হস্তরেখা বিচার। হস্তরেখা বিচার ভারতে কোন দিন ছিলই না, বিদেশ থেকে পরে ভারতে এসেছে। ভারতে শরীরের বিভিন্ন চিহ্নের বিচার ছিল। এখন এই হস্তরেখা, গ্রহ-নক্ষত্র, শরীরের চিহ্ন সব মিলিয়ে এক অদ্ভুত অবৈজ্ঞানিক জ্যোতিষশাস্ত্র তৈরী হল, আর এই শাস্ত্রকে সামনে রেখে কিছু জ্যোতিষীও তৈরী হয়ে গেল। এরাই ইদানিং কালে জ্যোতিষ বিদ্যাকে নিয়ে রমরমা কারবার চালাচ্ছে।

বেদের সময়ের জ্যোতিষীদের প্রধান কাজ ছিল যজ্ঞের সময় নির্ধারণ করা আর লক্ষণ দেখা। কিন্তু ভাগবত বলে দিচ্ছে জ্যোতিষীরা অতীতের খবর জানেন, ভবিষ্যতের সব খবর জানেন। নন্দরাজ বলছেন, 'ভবিষ্যত, যেটা কালের গর্ভে রয়েছে, সেটাকেও আপনি জানেন'। এই জিনিষ কি কখন হতে পারে? তাই যদি হয় তাহলে মানুষ মাত্রেই হয়ে যাবে যন্ত্র। পাখা একটা স্পীডে ঘুরছে, স্পীডের হিসাব কষে আমি বলে দিতে পারি পাঁচ মিনিট পর পাখার ব্লেড কোন পজিশানে থাকবে। এইভাবে মানুষের ব্যাপারে সব কিছু বলে দিলে তো মানুষ মেশিন হয়ে যাবে। কিন্তু মানুষ তো কখন মেশিন হতে পারে না। তাহলে ঠাকুরের আগমনও বাঁধা। স্বামীজীর মুক্তি আর ওনার সময়ে যাঁরা ছিলেন তাঁদের মুক্তিটাও হয়ে গেল prediction। মুক্তি যদি prediction হয় তাহলে সেটা কিসের মুক্তি। কারণ যখন predictionএর মধ্যে এসে গেল তখন সেটা দেশ, কাল ও পাত্রে আবদ্ধ হয়ে গেল। যে জিনিষটা দেশ কালে আবদ্ধ হয়ে গেল সেটা মায়ার রাজ্যে বদ্ধ হয়ে গেল। তাই জ্যোতিষশাস্ত্রের দ্বারা হিসাব করে predict করে যদি বলে দেওয়া হয় অমুক দিন আপনার মুক্তি হবে, তাহলে সেই মুক্তিটা তো বন্ধন। এই লজিকটা বেশীর ভাব মানুষ বুঝতেই পারে না। কর্ম করে কখনই মুক্তি হতে পারে না, তার কারণ কর্ম হল সব সময় অপূর্ণতার লক্ষণ। সেইজন্য কর্ম, কার্য-কারণ সম্পর্ক কখনই মুক্তির দিকে নিয়ে যেতে পারে না। তাই মুক্তিকে কখন predict করা যায় না। মুক্তি যদি predict না করা যায় তাহলে ওই সম্পর্কিত যাবতীয় যা কিছু আছে তার কোন কিছুকেই predict করা যায় না। ঠাকুরের আগমনে তাঁর আশপাশের অনেকের আধ্যাত্মিক উন্নতি হল, এখানে ঠাকুরের প্রভাবেই তাঁদের উন্নতি হয়েছে। তাহলে হয় আমাকে বলতে হবে ঠাকুর predicted ছিলেন, তা না হলে বলতে হবে ঠাকুর predicted ছিলেন না। ঠাকুর যদি predicted হন তাহলে ভগবানকেও আমরা জ্যোতিষশাস্ত্রের মধ্যে, অর্থাৎ দেশ-কালের সীমার মধ্যে আবদ্ধ করে দিচ্ছি, তার মানে ভগবানের সংজ্ঞাকেই ভুল বলতে হবে। আর যদি বলি ভগবান predicted ছিলেন না, তাহলে বলতে হবে বর্তমান কালের জ্যোতিষীরা পুরো ভাঁওতা দিয়ে যাচ্ছে। জ্যোতিষীদের এই লজিকটা বললে তারা বুঝতেই পারবে না, বোঝার কথাও নয়। ঠাকুর, মা, স্বামীজী এনারা সবাই চৈতন্যস্বরূপ, এনারা কখনই কার্য-কারণ সম্পর্কে আবদ্ধ থাকতে পারেন না। তার মানে, ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর আগমন কখনই কার্য-কারণ সম্পর্কে হতে পারে না। যদি হয় তাহলে অবতার তত্ত্বটাও বন্ধনে পড়ে যাবে। ভগবান যখন অবতার হয়ে আসছেন, অবতার হয়ে আসার পর তিনি যখন আরও দশ জনকে উপরে টেনে তুলছেন, কিছু লোকের উপর প্রভাব বিস্তার করলেন এগুলোকে তো জ্যোতিষশাস্ত্র দিয়ে predict করা যাবে না। যদি করা যেত তাহলে সমগ্র জগতের সব কিছুর হিসাবটাই পাল্টে যাবে। কারণ একটা স্বতন্ত্র শক্তি এসে তখন কাজ করতে শুরু করছে। এখন কেউ বলতে পারে ঠাকুরের তো নিজের কুষ্টি আছে। নিশ্চয়ই থাকবে, কারণ তিনি যখন জন্ম গ্রহণ করেছিলেন সেই সময় গ্রহের অবস্থান, সময় বিচার করে কিছু কিছু জিনিষ predict করে দেওয়া যায়। কিন্তু তাই বলে জ্যোতিষীরা যে দাবী করেন ভূত ভবিষ্যত সব বলে দেওয়া যাবে, এই জিনিষ কখনই সম্ভব নয়। যদি হয় তাহলে আধ্যাত্মিক শাস্ত্রই মিথ্যা হয়ে যাবে। বেদ উপনিষদ কখনই মিথ্যা হবে না, জ্যোতিষশাস্ত্র মিথ্যা হতে পারে, বেদ উপনিষদ মিথ্যা হবে না। সন্ন্যাসীরা যখন কোন ভালো জ্যোতিষীদের কাছে যান তখন তাঁরা সন্ন্যাসীদের হস্তরেখা বিচার করতে পিছিয়ে যাবেন। তাঁরা বলেই দেন, সন্ন্যাসীদের হাত দেখা যায় না।

যাই হোক, নন্দবাবা এইভাবে স্তুতি আদির দ্বারা আপ্যায়ন করার পর গর্গাচার্য বলছেন 'তুমি যে আমাকে বলছ নামকরণ-সংস্কার করে দিতে, কিন্তু আমি যদি এই সংস্কার কার্য করি তাতে অনেক সমস্যা হতে পারে। কারণ সবাই জানে আমি যদুবংশের আচার্য'। আগেকার দিনে কুলগুরুর প্রথা ছিল, প্রত্যেক বংশের আলাদা আলাদা গুরু থাকতেন, সেই গুরুর বাইরে গিয়ে অন্য কোন আচার্যকে দিয়ে কোন সংস্কার কার্য করাতেন না। শ্রীমাও অনেক দীক্ষাপ্রার্থিকে বলতেন 'তোমার কুলগুরুর কাছে দীক্ষা নাও'। আবার অনেককে দীক্ষা দিয়ে বলতেন 'তোমাদের কুলগুরুকে দক্ষিণা অবশ্যই দেবে'। গর্গাচার্য বলছেন 'যদি আমি এদের নামকরণ সংস্কার করি তাহলে চারিদিকে জানাজানি হয়ে যাবে, সবাই এদের দেবকীর পুত্র বলেই মনে করবে। কংস যে শিশুকে মারার জন্য সর্বদা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, সেও মনে করবে এ হল সেই অষ্টম পুত্র যে আমাকে বধ করবে। আর কংসেরও দৃঢ় ধারণা যে দেবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তান কোন মতেই কন্যা হতে পারে না। তোমার পুত্রের নামকরণ সংস্কার করলে বসুদেবের পুত্র মনে করে একে বধ করে দিতে পারে'। নন্দবাবা তখন বললেন 'আপনার মত উপযুক্ত আচার্য তো আর পাওয়া যাবে না, আপনি দৈববশাৎ যখন এসেই পড়েছেন তখন আপনার হাত দিয়ে এই শুভ সংস্কার করাবার সুযোগ তো হাতছাড়া করা যায় না। তাই এক কাজ করা যেতে পারে, আমাদের গোশালায় গোপনে সবার অগোচরে শুধু স্বস্তিবাচন করে এদের দ্বিজাতি-সমুচিত নামকরণ করে দিন। অন্যদের কথা দূরে থাক, আমার আত্মীয়-স্বজনরাও এই ঘটনার কথা জানতে পারবে না'।

বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণের নামের ব্যাখ্যা

তখন গর্গাচার্য বলছেন ***অয়ং হি রোহিণীপুত্রো রময়ন্ সুহৃদো গুণৈঃ। আখ্যাস্যতে রাম ইতি বলাধিক্যাদ্ বলং বিদুঃ। যদূনামপৃথগ্‌ভাবাৎ সঙ্কর্ষণমুশন্ত্যুতে।।১০/৮/১২।*** বসুদেবের পুত্র বলে বাসুদেব বলা হয়, রোহিণীর গর্ভে যে সন্তান হয়েছে সেও বসুদেবের পুত্র, কিন্তু তার নাম আলাদা করে দেওয়া হল। রোহিণীর পুত্র বলে ব্যকরণের নিয়মে হয়ে যাবে 'রৌহিণেয়'। আগেকার দিনে আমাদের প্রথা ছিল মায়ের নামে ছেলেকে সম্বোধন করা, যেমন গীতাতে পদে পদে আমার দেখি অর্জুনকে ভগবান কৌন্তেয় বলে সম্বোধন করছেন। গর্গাচার্য বলছেন, এই জাতক আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সবাইকে নিজ গুণে আনন্দ দেবে তাই এর নাম হবে 'রাম'। 'রাম' শব্দের অর্থ রমণ করা বা আনন্দ করা। এর শরীরে প্রচণ্ড বল হবে তাই এর অপর একটি নাম 'বল'। 'বল' আর 'রাম' মিলে পরে হয়ে গেলেন বলরাম। মানুষের মধ্যে বিবাদ-বিভেদ সৃষ্টি হলে এই বালক সকলকে আকর্ষণ করে তাদের মিলন ঘটাবে, তাই একে সবাই 'সংকর্ষণ' নামেও সম্বোধন করবে। 'সংকর্ষণ' শব্দের অর্থ আকর্ষিত করা। অনেকে আবার বলেন, দেবকীর গর্ভ থেকে কর্ষণ করে রোহিণীর গর্ভে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল বলে এর নাম 'সংকর্ষণ'।

আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্ণতোহনুযুগং তনূঃ। শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ।।১০/৮/১৩। আর এই যে শ্যামলবর্ণের বালক, ইনি বিভিন্ন যুগে শরীর ধারণ করে থাকেন। তিনি ভগবান কিনা, তাই তাঁকে প্রত্যেক যুগেই শরীর ধারণ করতে হয়। আগের আগের যুগে তিনি শুক্ল, রক্ত ও পীত এই তিনটে বর্ণ গ্রহণ করেছিলেন। এই যুগে তিনি কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করেছেন বলে এর নাম 'কৃষ্ণ'। এখনও গায়ের রঙ অনুসারে নাম রাখা হয়, যেমন কালো মেয়ের নাম শ্যামলী বা শাঁওলী, ফর্সা ছেলের নাম গোরাচাঁদ। দ্রৌপদীর গায়ের রঙও ছিল উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, তাই তাঁর একটা নাম ছিল কৃষ্ণা। ***প্রাগয়ং বসুদেবস্য ক্বচিজ্জাতস্তবাত্মজঃ। বাসুদেব ইতি শ্রীমানভিজ্ঞাঃ সম্প্রচক্ষতে।।১০/৮/১৪।*** তোমার এই পুত্র পূর্বে কোন এক সময়ে বসুদেবের পুত্র রূপে জন্ম নিয়েছিল। গর্গাচার্যকে বলে দেওয়া হয়েছে তিনি ভূত ভবিষ্যত সব জানেন। গর্গাচার্যও জেনে গেছেন এর আগের জন্মে এর বাবা কে ছিলেন। এইভাবেই পৌরাণিক কাহিনী তৈরী হয় আর সাধুদের মাহাত্ম্য ছড়ায়। আর এইসব দেখেই সবাই মনে করে জ্যোতিষারা সব জানতে পারে। স্বামী ভূতেশানন্দজীকে একবার এক শিষ্যা বলছে – মহারাজ! আমি সেদিন বিহার থেকে ট্রেনে করে আসছিলাম, রাত্রিবেলা হঠাৎ ট্রেনে লাইট চলে যেতে ভয়ে আমরা খুব অস্থির হয়ে পড়েছিলাম। ওই অন্ধকারে লোকজন ট্রেনের মধ্যে ওঠা-নামা করছে, আমরা ভাবলাম ডাকাত এসে পড়েছে। তখন আমি জোর গলায় আপনাকে

ডাকতে শুরু করলাম – বাবা! আমাদের বাঁচাও, আমাদের রক্ষা কর – এইভাবে আপনার নাম করতে করতে দেখলাম লাইট এসে গেছে। বাবা! আপনি কি আমার ডাক শুনতে পেয়েছিলেন'? স্বামী ভূতেশানন্দজী বলছেন 'আমার পাশ থেকে সেবক আমাকে ডাকে সেটাই শুনতে পাই না, আর বিহার থেকে তুমি ডাকলে আমি কি আর না শুনে থাকতে পারি'! এই করেই মাহাত্ম্য ছড়ায়। এখন যাঁরা লিখে যাচ্ছেন তাঁরাও বলে যাচ্ছেন গর্গাচার্য ভূত ভবিষ্যত সব জানেন। প্রমাণ কি? কৃষ্ণকে দেখেই বুঝলেন – এ তোমার পুত্র নয় এতো বসুদেবের পুত্র। সেইজন্য এর নাম হবে বাসুদেব। বসুদেবের পুত্র বলে বাসুদেব।

আর বলছেন ***বহূনি সন্তি নামানি রূপাণি চ সুতস্য তে। গুণকর্মানুরূপাণি তান্যহং বেদ নো জনাঃ।।১০/৮/১৫।*** এই শ্লোকটি খুব সুন্দর, এখানে ঈশ্বরের বর্ণনা করছেন। 'তোমার এই পুত্রের অনেক নাম ও রূপ আছে। আর এর যত গুণ এবং কর্ম আছে, সেই গুণ ও কর্ম অনুযায়ী এর ভিন্ন ভিন্ন নাম শাস্ত্রাদিতে বর্ণনা করা হয়েছে। আমি এগুলো সব জানি, তোমরা সেগুলো জানো না, আর জানার দরকারও নেই'। তারপর বলছেন 'এই জাতক তোমাদের অনেক ভালো করবে, তোমাদের অনেক বিপদ থেকে রক্ষা করবে' ইত্যাদি।

এইসব বলার পর গর্গাচার্য অন্য প্রসঙ্গ নিয়ে বলছেন। অনেকের মত যে ভাগবত অনেক পরের দিকে রচিত হয়েছে। এখন আমরা ভাগবতকে যে অবস্থায় পাচ্ছি, কেউ বলে অষ্টম শতাব্দীতে এসে ভাগবত এই রূপ পেয়েছে। আমাদের শরীরে আর্যদের রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে। ভারতে যে আর্যরা এসেছিল তাদের গায়ের রঙ ফর্সা ছিল। পরে বিভিন্ন জাতি উপজাতিদের সাথে আর্যদের সম্পর্ক হওয়ার পর আমাদের মধ্যে নানা রকম বর্ণ আসতে শুরু হয়েছে। এই ধারণাটাই ভাগবতের এই শ্লোকে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। ***য এতস্মিন্ মহাভাগাঃ প্রীতিং কুর্বন্তি মানবাঃ। নারয়োঽভিভবন্ত্যেতান্ বিষ্ণুপক্ষানিবাসুরাঃ।।১০/৮/১৮।*** যারা তোমার এই শ্যামলা বর্ণের পুত্রটিকে ভালোবাসবে তারা খুব ভাগ্যবান হবে। যেমন ভগবান বিষ্ণুর ছত্রছায়ায় থেকে দেবতারা অসুরদের থেকে নিরাপদ থাকে, তেমনি একে যারা ভালোবাসবে তারা সব দিক থেকে সুরক্ষিত থাকবে। প্রথমের দিকে যখন গায়ের রঙ ফর্সা থেকে শ্যামল বর্ণের দিকে যাওয়া শুরু করল তখন লোকেদের মনে একটা দুশ্চিন্তা হল – আহা রে! আমার সন্তানের গায়ের রঙে এই রকম হয়ে গেল! কিন্তু এখানে ভাগবত একটা পাল্টা ভাব নিয়ে বলছে শ্যামলা রঙের সন্তানকে যদি তুমি খুব ভালোবাস তাহলে তুমি সব দিক থেকে সুরক্ষিত থাকবে। কীভাবে? শ্রীকৃষ্ণ তোমাকে যেমন রক্ষা করছেন। ভগবানকে রক্ষা করলে যেমন রক্ষিত হয় ঠিক তেমনি শ্যামলা বর্ণের মানুষকে রক্ষা করলে তুমি নিজেও রক্ষিত থাকবে। এখানে ভাগবত নিজের তরফ থেকে এটা যোগ করে দিল। শুধু ভগবানের কাহিনী বলেই ছেড়ে দেওয়াটা উদ্দেশ্য নয়, এদের উদ্দেশ্য হল মানুষকে ভালো করা। পরের শ্লোকে আবার সেই ভগবানের কথাই বর্ণনা করছেন। ***তস্মান্নন্দাত্মজোঽয়ং তে নারায়ণসমো গুণৈঃ। শ্রিয়া কীর্ত্যানুভাবেন গোপয়স্ব সমাহিতঃ।।১০/৮/১৯।*** ওহে নন্দমহারাজ! তোমার এই পুত্রটি গুণ, শ্রী, সম্পদ, কীর্তি, প্রভাব যে দিক থেকেই বিচার করা হোক না কেন সব দিক দিয়ে সাক্ষাৎ ভগবান নারায়ণেরই সমান। সেইজন্য তুমি খুব সতর্কতার সাথে এবং তৎপর হয়ে দক্ষতার সাথে একে রক্ষা করে যাও।

জন্ম কর্ম চ মে দিব্যম্

এরপর এখান থেকে শুরু করে রাসলীলা পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন বাল্যলীলার বর্ণনা চলবে। শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা খুবই উচ্চ ভাবের ব্যাপার। অত্যন্ত উচ্চমানের সাধক ছাড়া শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা আর রাসলীলার ভাবকে গ্রহণ করা কারুর পক্ষে সম্ভব নয়। যিনি এইসব লীলার বর্ণনা করবেন তাঁকে যেমন উচ্চমানের সাধক হতে হবে তেমনি যিনি শুনছেন তাঁকেও খুব উচ্চমানের হতে হবে। গীতায় ভগবান বলছেন *জন্ম কর্ম চ মে দিব্যম্*, ভগবানের জন্ম দিব্য আর ভগবানের সমস্ত কর্মই দিব্য। ভগবানের কোন কর্মকে যদি কেউ জাগতিক দৃষ্টিতে দেখে তাহলে তার আধ্যাত্মিক জীবনের সর্বনাশ হতে আর কিছু অবশিষ্ট থাকবে না। ভগবান গীতায় বলছেন *অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতাম্*, যারা মূঢ় তারা মনে করে আমি সাধারণ মানুষ হয়ে জন্মেছি, আমি আগে ছিলাম না এখন জন্ম নিয়েছি এবং আমার সমস্ত রকম কর্মকেও এরা সেই দৃষ্টিতেই দেখে। ভগবান

এদের বলছেন মূঢ়। কেউ যদি প্রশ্ন করে শ্রীরামচন্দ্র সীতাকে কেন বনবাসে পাঠালেন? এই প্রশ্ন দিয়েই বোঝা যাচ্ছে যে প্রশ্নকর্তা শ্রীরামচন্দ্রকে লৌকিক দৃষ্টি দিয়ে বিচার করছে। শ্রীরামচন্দ্র ভগবান, তাঁর সব কর্ম দিব্য, তাই শ্রীরামচন্দ্রকে নিয়ে এবং তাঁর কর্মকে নিয়ে কোন প্রশ্নই করা যায় না। তেমনি শ্রীরামচন্দ্র বালিকে কেন লুকিয়ে বধ করলেন? এই প্রশ্নও হয় না। কারণ অবতারের কোন কাজের উপর কোন প্রশ্ন করা যায় না। তাঁর প্রত্যেকটি কাজের পেছনে হাজার রকমের কারণ থাকতে পারে, সেই কারণ বিশ্লেষণ করার পাত্রতাই আমাদের নেই। এই বাল্যলীলার প্রথম দিন থেকেই শ্রীকৃষ্ণের নানা রকমের দুষ্টুমি শুরু হচ্ছে, শুধুই দুষ্টুমি আর দুষ্টুমি। যেমনি আমরা এগুলোকে বাচ্চা ছেলের দুষ্টুমি রূপে দেখতে যাব তক্ষুণি আমাদের সর্বনাশটি হয়ে যাবে। এগুলো সব দিব্য দিব্যাতীত ভাগবতলীলা। কোন কোন জায়গায় ব্যাখ্যাকাররা শ্রীকৃষ্ণের দুষ্টুমিকে আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে একটা ব্যাখ্যা দিয়েছেন। সব শ্লোকের ব্যাখ্যা দেওয়া না থাকলেও, প্রত্যেকটি শ্লোকের প্রত্যেকটি ঘটনার পেছনে একটা আধ্যাত্মিক ভাব লুকিয়ে আছে। যেখানে ব্যাখ্যা নেই সেখানে নিজের মত একটা ব্যাখ্যা করে নিতে হয়। গোপীরা কারা ছিলেন, গোপরা কারা ছিলেন, এগুলোর একটা অবধারণা যদি না তৈরী করা যায় তাহলে কিন্তু ভাগবত গ্রন্থ ভক্তিশাস্ত্র রূপে চলবে না। আমাদের সব সময় এই মৌলিক ধারণাটা মনের মধ্যে বদ্ধমূল হয়ে থাকতে হবে যে, শ্রীকৃষ্ণ অবতার। অবতারের কোন কাজ জাগতিক দৃষ্টি দিয়ে বিচার করা যায় না। আরেকটি জিনিষ আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে, অনেকে মনে করেন ভক্তি ব্যাপার মানেই সেখানে কোন যুক্তিতর্ক চলে না। কিন্তু না, আধ্যাত্মিকতা, ভক্তি, ভাব এগুলো পুরোপুরি যুক্তিতে চলে। ভাবরাজ্যে আপনি নিজের মত কল্পনা করে যাচ্ছেন সেটা আপনি করতে পারেন, কিন্তু যখন পরস্পর ভাবের আদান-প্রদান হবে সেখানে নিজের মত কল্পনা চলে না। অথচ শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার প্রসঙ্গ নিয়ে ভাগবতের যত কথা আছে, সবই ঈশ্বরীয় কথা।

ভাবরাজ্য আর কল্পনার রাজ্য

রামকৃষ্ণ ভক্তমণ্ডলীতে গোপালের মা খুবই পরিচিত। গোপালের মার ইষ্ট দেবতা ছিলেন বালগোপাল। বালগোপালে এমন গভীর ভাবে তন্ময় হয়ে হারিয়ে যেতেন যে জগতের কোন হুঁশ তাঁর থাকত না। গোপালের মা ঠাকুরকেও ঠিক ওই গোপাল রূপেই দেখতেন। প্রথম অবস্থায় নরেন্দ্রনাথ দত্ত ঠাকুরের মা কালীকে নিয়ে অনেক ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করতেন। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হল, গোপালের মা যখন নরেন্দ্রনাথ দত্তকে তাঁর ইষ্ট গোপালকে কেন্দ্র করে নিজের নানা রকম দিব্য দর্শনের কথা বলতে বলতে শেষে জিজ্ঞেস করছেন 'বাবা নরেন! আমার কি এগুলো মনের ভুল'? স্বামীজী গোপালের মার প্রশ্নের কি উত্তর দেবেন! তাঁর বাক রুদ্ধ, গোপালের মা দেখছেন নরেনের চোখ দিয়ে অঝোরে অশ্রুধারা গাল বেয়ে নেমে আসছে। ঠাকুর নরেনের ওই অবস্থা দেখে খুব আনন্দ অনুভব করলেন। ঠাকুরের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বলে আজকে আমরা গোপালের মার নাম জানছি, তা নাহলে আর পাঁচজন মহিলার মত গোপালের মা ইতিহাসের গর্ভে হারিয়ে যেতেন। কিন্তু যে নরেন ঠাকুরের কিছু কিছু দিব্য দর্শনকে ব্যঙ্গ করতেন, গোপালের মায়ের মত একজন অশিক্ষিতা অতি সাধারণ মহিলার ঈশ্বরীয় দিব্য দর্শনের কথা নরেনের মত যুক্তিবাদীর বিশ্বাসকেও নাড়িয়ে দিচ্ছে। অন্য দিকে ঠাকুরের সাধনার ইতিহাসে, বিশেষ করে মা কালীকে নিয়ে তিনি যখন ভাবরাজ্যের চরমে বিচরণ করছেন সেখানেও অনেক ঘটনা পাই যা ঈশ্বরীয় দিব্যলীলা রসে পরিপূর্ণ।

কিন্তু অতিন্দ্রীয় রাজ্যের দিব্যলীলা কত উচ্চপর্যায়ে যেতে পারে, আর ভক্তির মাধুর্য রস কত গভীরে যেতে পারে সেটা বোঝা যায় অষ্টধাতু নির্মিত রামলালাকে নিয়ে ঠাকুর যখন দিব্য খেলায় মেতে আছেন। স্বামী সারদানন্দ রচিত লীলাপ্রসঙ্গে এর খুব সুন্দর বর্ণনা করা হয়েছে। ভারতের আধ্যাত্মিক ইতিহাসে লীলাপ্রসঙ্গ গ্রন্থকে অত্যন্ত উচ্চস্থানে রাখা হয়। ঠাকুরের জীবনের যেটা বাস্তব দিক শরৎ মহারাজ সেটাক লীলাপ্রসঙ্গে নিয়ে এসেছেন, আবার পুরো যুক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করে আগেকার আধ্যাত্মিক সাহিত্যের সঙ্গে ঠাকুরের সব কিছুকে সামঞ্জস্য করছেন, সাথে সাথে আধ্যাত্মিক ভাবগুলোকেও নিয়ে আসছেন। ঠাকুরের যাঁরা ভক্ত তাঁদের লীলাপ্রসঙ্গ নিত্য একটু একটু করে অধ্যয়ন করা অতি অবশ্যই দরকার। একবার লীলাপ্রসঙ্গ ঠিক ঠিক পড়া হয়ে গেলে আমাদের হাজার হাজার আধ্যাত্মিক প্রশ্ন পরিষ্কার হয়ে যাবে।

ঠাকুর যখন দক্ষিণেশ্বরে সাধনা করছিলেন তখন ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিভিন্ন মতের সাধুদের আগমন হত। তার মধ্যে জটাধারী নামে এক পশ্চিমের সাধু এসেছিলেন। তিনি যেখানেই যেতেন অষ্টধাতুর রামলালার একটি ছোট্ট মুর্তি তাঁর সঙ্গে সব সময় থাকত। শ্রীকৃষ্ণের যেমন বালগোপাল মুর্তি হয় তেমনি শ্রীরামচন্দ্রের বাল্যাবস্থার মুর্তির নাম ছিল রামলালা। জটাধারী ছিলেন খুব উচ্চমানের সাধু। জটাধারী রামলালার সেবা করতেন। তিনি অষ্টধাতুর বিগ্রহে সাক্ষাৎ শ্রীরামের শিশু রূপকে প্রত্যক্ষ করতেন। দক্ষিণেশ্বরে যখন জটাধারী রামলালাকে নিয়ে এসেছেন তখন ঠাকুরও দেখছেন সাক্ষাৎ রামলালা। এবার ঠাকুরও রামলালাকে ভালোবাসতে শুরু করেছেন, অন্য দিকে রামলালাও ঠাকুরকে ভালোবাসতে শুরু করেছেন। ঠাকুর এবার রামলালাকে সেবা করতে শুরু করলেন। ঠাকুর কিন্তু জীবনে কোন দিন কারুকে সেবা করেননি, একমাত্র এই রামলালার সেবাই করেছেন। রামলালাকে নাওয়াচ্ছেন, খাওয়াচ্ছেন, ঘুম পাড়াচ্ছেন, ঘুম থেকে ওঠাচ্ছেন। আবার মুরি খেতে দিয়েছেন, মুরি খেতে গিয়ে রামলালার জিভটা ছড়ে গেল। তখন ঠাকুর আবার অঝোরে কাঁদছেন আর বলছেন – রাজা দশরথের ব্যাটা, মা কৌশল্যা যাঁকে নিজের হাতে কত ননী মাখন খাইয়েছিলেন আর তাঁকে আমি সামান্য এই মুরি খেতে দিয়েছি! যাই হোক, এখন রামলালা ঠাকুরের সঙ্গে এতে বেশী সময় ধরে থাকতে শুরু করলেন যে, জটাধারীর মনে কষ্ট হতে শুরু হয়ে গেছে। একদিকে জটাধারী অন্যদিকে শ্রীরামকৃষ্ণ আর মাঝখানে রামলালা, এই নিয়ে খুব সুন্দর এক দিব্য নাটক জমে উঠেছে। এখানে আমাদের একটা জিনিষ খুব ভালো করে বুঝতে হবে। ভক্তিমার্গে যখন ভাবরাজ্যের কথা বলা হয় তখন এই ভাবরাজ্যকে কখনই কল্পনার জগৎ বলে মনে করা ঠিক হবে না। মনে রাখতে হবে, ভাবরাজ্যের জগৎ হল পুরোপুরি বাস্তব জগৎ। ঠাকুর যখন রামলালাকে স্নান করাচ্ছেন, খাওয়াচ্ছেন সেই সময় আমরা যদি সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতাম আমরা কি দেখতাম? এগুলো আমাদের খুব ভাবা দরকার। আমরা দেখছি শ্রীরামকৃষ্ণ একটা ছোট্ট অষ্টধাতুর মুর্তিকে গঙ্গায় স্নান করাতে নিয়ে এসেছেন, তিনি সেই মুর্তি নিয়ে জলে নামছেন, মুর্তিকে জলে স্পর্শ করাচ্ছেন, এগুলোই দেখব। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ কি দেখছেন? একটা বাচ্চা ছেলেকে কোলে করে বা হাত ধরে গঙ্গায় নিয়ে এসে তিনি স্নান করাচ্ছেন।

এখানে আমরা ঠিক দেখছি নাকি ঠাকুর ঠিক দেখছেন? দুজনেই ঠিক দেখছেন, আমরাও ঠিক দেখছি, ঠাকুরও ঠিক দেখছেন। কিন্তু দুজনেরই দেখার পদ্ধতিটা আলাদা। আমি যখন কাউকে দেখি তখন তার চেহারাটি যেরকম সেইরকম চেহারাই আমি দেখব। দেখার পরেই চোখ বন্ধ করে মনে মনে তার কথা ভাবলে মনের মধ্যে তার চেহারাটা পাল্টে যাবে। লোকটির ছবি যদি দেখি তখন ছবির চেহারাটা আবার অন্য রকম দেখাবে। কিন্তু সেই লোককে স্বপ্নে যদি দেখি তখন কি রকম দেখবো সেটা বলা অসম্ভব। স্বপ্নে যাকে দেখা হয় তখন সে আমার স্বপ্নে কি রূপ নেবে বলা অসম্ভব। এমনও হতে পারে তাকে আমি একটা গরু রূপে দেখছি। কিন্তু এই জ্ঞানটা দৃঢ় আছে যে এই লোকটি সেই লোক। এই জিনিষ কি করে সম্ভব হচ্ছে? আমি দেখছি একটা গরু কিন্তু কোথাও আমাকে কেউ বলে দিচ্ছে এই গরুটা আসলে সেই লোকটি। এই বোধটা করিয়ে দিচ্ছে আমার মন। সেইজন্য বলে মনই হল শেষ গুরু। স্বপ্নে যে জিনিষ দেখা হয় সেটা কোন সময় খুব আবছা দেখায় আবার কখন কখন অনেক বেশী স্পষ্ট দেখায়, দুটোই হয়। কারণ আমাদের মস্তিষ্কে যে পথ দিয়ে ইমেজ প্রসেসিং হয়, এগুলো সব আলাদা আলদা পথে হয়। ফলে আমি আপনাকে এখন সামনে যে রকম দেখছি, স্বপ্নে আপনাকে অন্য রকম দেখব, চোখ বন্ধ করে যখন আপনাকে ভাববো তখন আরেক রকম দেখব আবার চোখ বন্ধ করে যখন গভীর ভাবে চিন্তা করে দেখবো তখন আরেক রকম দেখব। কিন্তু এটাই যখন আধ্যাত্মিক জগতে গিয়ে দেখা হবে সেটা আবার পুরোপুরি অন্য রকম দেখা হবে। ঠাকুর যেমন বলছেন তোমাকে আমি যিশু খ্রীষ্টের দলে দেখলাম। শরৎ মহারাজকে ঠাকুর অনেক ভাবে দেখছেন, কখন শরৎ মহারাজ হিসাবে দেখছেন, শরৎ মহারাজকে কল্পনা করে দেখছেন, শরৎ মহারাজকে হয়তো স্বপ্নেও দেখে থাকতে পারেন, যদিও কোথাও উল্লেখ পাওয়া যায় না, কিন্তু সব থেকে গুরুত্ব হল শরৎ মহারাজকে তিনি আধ্যাত্মিক জগতেও দেখছেন। আধ্যাত্মিক জগতে যে শরৎ মহারাজকে দেখছেন আর অন্য যত ভাবে দেখছেন তার মধ্যে একটা গুণগত তফাৎ থাকবেই। ঠাকুর নরেনকে বলছেন – হ্যাঁ, আমি ঈশ্বর দেখেছি, তোকে সামনে যেমন দেখছি

তার থেকেও স্পষ্ট দেখেছি। আধ্যাত্মিক অনুভূতিতে যে দৃশ্যগুলি আসে সেগুলো পুরো আলাদা হয়। ধরুন এই ঘরের লাইটকে আস্তে আস্তে কমিয়ে দেওয়া হল, সেই আলোতেও আমরা ঘরের সব কিছুই দেখতে পারছি। কিন্তু এরপর যদি এই ব্ল্যাকবোর্ডের উপর একটা প্রজেক্টর দিয়ে আলো ফেলা হয় তখন ব্ল্যাকবোর্ডটা সব কিছুর থেকে বেশী আলোময় দেখাবে। আধ্যাত্মিক অনুভূতিতে ঠিক তেমনি দৃশ্যগুলো অনেক বেশী আলোময় হয়। আমরা বলতে পারি যে, আমরাও সবাই আধ্যাত্মিক জগতকে দেখছি, কিন্তু অন্ধকার। আধ্যাত্মিক অনুভূতি সম্পন্ন ব্যক্তির কাছে সেটাই আলোময় হয়ে ভেসে ওঠে, এটাকে বোঝানোর জন্য এই উপমার সাহায্যে বলা হল।

এবার মনে করুন জটাধারী একদিকে আর ঠাকুর অন্য দিকে বসে আছেন আর রামলালার অষ্টধাতুর মুর্তি জটাধারীর কাছে আছে। এরপর রামলালা জটাধারীর কাছ থেকে ঠাকুরের কাছে চলে এলেন, তাই বলে কি মুর্তিটা ঠাকুরের কাছে চলে আসবে? তার কোন মানে নেই। অনেক সময় মুর্তিটাও আনা হচ্ছে, কিন্তু সব সময়ই যে আনতে হবে তা নয়। ওখানে ওনাদের দুজনের মাঝখানে বাস্তবিক একটি ছেলে আছে। সেই ছেলেটিকে ঠাকুর খাওয়াচ্ছেন, নাওয়াচ্ছেন, কাপড় পড়াচ্ছেন। এভাবে ঠাকুর একমাত্র রামলালারই সেবা করেছেন, আর কারও তিনি সেবা করেননি। এইভাবে চলতে চলতে জটাধারী দেখলেন রামলালার মন পুরোপুরি ঠাকুরের দিকে চলে গেছে। তখন একদিন বিশেষ ভোগ তৈরী করে রামলালাকে নিবেদন করার পর জটাধারী রামলালাকে ঠাকুরের হাতে অর্পণ করে দক্ষিণেশ্বর থেকে চিরদিনে মত চলে গেলেন। পরে ওই রামলালা শ্রীরামকৃষ্ণের শরীরে বিলীন হয়ে গেল। সেই অষ্টধাতুর মুর্তিটি তখন থেকে ঠাকুরের ঘরেই রাখা থাকত।

শরৎ মহারাজ যখন রামলালার কথা লীলাপ্রসঙ্গে লিখছেন তখন তিনি খুব সুন্দর বর্ণনা করে বলছেন – ঠাকুরের মুখে আমরা রামলালার এই ঘটনার কত বর্ণনা শুনেছি, কিন্তু পরে যখন তাকের উপর রাখা অষ্টধাতুর মুর্তির দিকে তাকাতাম তখন সেই মুর্তির দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে ভাবতাম, এই অষ্টধাতুর মুর্তিকে নিয়ে কত সব আশ্চর্য ঘটনাই না হয়েছিল! শরৎ মহারাজ যখন লীলাপ্রসঙ্গ লিখছেন তখনও দক্ষিণেশ্বরে রামলালার অষ্টমুর্তি রাখা ছিল, কিন্তু সেই মুর্তির যে আধ্যাত্মিক ভাব সেটা সেই মুর্তি থেকে বেরিয়ে ঠাকুরের মধ্যে প্রবেশ করে বিলীন হয়ে গেছে। এখন কারুর যদি ইষ্ট রামলালা হন তাহলে তার কিন্তু ইষ্ট হবেন শ্রীরামকৃষ্ণ। কারণ রামলালা ঠাকুরের মধ্যে বিলীন হয়ে গিয়ে ঠাকুরের সঙ্গে এক হয়ে গেছেন। ঠিক তেমনি কারুর ইষ্ট যদি বালগোপাল হয় তারও ইষ্ট কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ, কারণ শ্রীকৃষ্ণের বালগোপাল রূপও শ্রীরামকৃষ্ণে লয় হয়ে গেছেন, সেইজন্য ঠাকুর হলেন সর্বদেবদেবী স্বরূপায়। আমরা যখন বলছি ভগবান বিষ্ণু থেকে বা ভগবান নারায়ণ থেকে সব কিছু উৎপত্তি হয়েছে, তাতে কোন আপত্তি কারুর হবে না, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে বাস্তবিকই এনাদের সবার লয় হয়েছে। ঠাকুর ছিলেন সত্যস্বরূপ, তাঁর কোন কারণই নেই মিথ্যা কথা বলার। তিনি যেমনটি দেখেছিলেন, যেমনটি করেছিলেন হুবহু সেটাই শরৎ, নরেন, লাটুদের কাছে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু শরৎ মহারাজের মত আধ্যাত্মিক পুরুষও সুন্দর বর্ণনা করে বলছেন – আমরা হতবাক হয়ে অষ্টধাতুর রামলালার দিকে তাকাতাম আর অবাক হয়ে ভাবতাম এঁকে কেন্দ্র করেই ভক্তির এত দিব্য কাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

এবার আমরা ঠাকুরের এই কথা কীভাবে ব্যাখ্যা করব? ঠাকুর বলছেন – এই রামলালাকে মা কৌশল্যা কত ননী মাখন খাইয়েছে আর আমি তাকে মুরি খাওয়াচ্ছি, কিংবা গোপালের মা নরেনকে যখন গোপালের সাথে গোপালের মার নানা রকম কীর্তিকলাপের কাহিনী বর্ণনা করছেন আর সেটা শোনার পর নরেনের চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে আসছে। এই দুটি ঘটনা শোনার পর আমাদের মনের কোথাও যদি সামান্য আধ্যাত্মিক চাঞ্চল্যের উদয় হয়, তবেই আমরা এখন যে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার কাহিনী বর্ণনা করতে যাচ্ছি, সেগুলোর একটু ধারণা করতে সক্ষম হব। যদি কোন চাঞ্চল্যের ভাব না উদয় হয়, বা এগুলোকে আজগুবি মনে হয় তাহলে শ্রীকৃষ্ণের কোন লীলাই আপনার জন্য নয়, বা আপনি যদিও শ্রীকৃষ্ণকে মানেন কিন্তু যুক্তি বিচারের দিকে আপনার প্রবণতা বেশী তাহলেও এগুলো আপনার জন্য নয়। বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন রকম ভাব থাকতেই পারে। তবে ভাগবতে যা কিছু আছে সেগুলো কোন কাব্যিক বর্ণনা দিয়ে কাহিনী তৈরী করার উদ্দেশ্য নিয়ে রচিত হয়নি। আর এগুলোকে ঐতিহাসিক ভাবে বিচার করতে যাওয়াও অত্যন্ত মুর্খামির পরিচয় হবে, কারণ কোন মতেই এগুলো ঐতিহাসিক নয়। আমাদের সবারই একটা ছোটবেলা ছিল, ছোটবেলাতে আমরা অনেক

কিছুই করেছি যার কোনটাই আমাদের মনে নেই, কিন্তু আমাদের বাবা-মা, দাদু-ঠাকুরমারা এগুলো মনে রেখেছেন। তাঁরা যখন আমাদের ছোটবেলার কথা বর্ণনা করেন তখন তার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের বাললীলার অনেক মিল পাওয়া যাবে। শ্রীকৃষ্ণ এমন অনেক কিছু ছোটবেলায় করেছেন যেগুলো সবাই ছোটবেলা অনেকেই করে থাকে। তাই বলে কি শ্রীকৃষ্ণের যে বাল্যলীলা ভাগবতে বর্ণনা করা হয়েছে সেগুলো কি বাবা-মায়েরা যেমন তাদের সন্তানদের ছোটবেলার কথা বর্ণনা করেন তার মত? একেবারেই নয়, এখানে পুরোপুরি আধ্যাত্মিক বর্ণনা করা হচ্ছে। আধ্যাত্মিক বর্ণনার জন্য একটা মজার ব্যাপার হয়, ভাগবতের এই লীলাকাহিনীর শুধু যে কোন দুটি শ্লোককে যদি আমাদের চিন্তন মননের রাজ্যে নিয়ে যাই তখন কিন্তু আমরা এই দুটি শ্লোক থেকেই হাজার হাজার কাহিনী দাঁড় করিয়ে দিতে পারব। এখনও বৃন্দাবনের ব্রজবাসীরা বালকৃষ্ণকে নিয়ে কাহিনীর পর কাহিনী বানিয়েই চলেছে আর ওদের ব্রজ ভাষায় সেই কাহিনীর উপর কথা ও সুরের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে শত শত ভক্তিগীতি রচনা করে গান করে চলেছে। এগুলো খুব গভীর সাধনা।

দ্বিতীয় কথা হল, ভারতের যাঁরা দিগ্‌গজ পণ্ডিত, তাঁদের পক্ষেও ভাগবতের শ্লোকের অর্থ ও ভাবকে উদ্ধার করা সম্ভব নয়। আমরা অনেকবার বলেছি যে ভাগবতে এসে সব পণ্ডিতদের পাণ্ডিত্যের পরীক্ষা হয়ে যায়। ভাগবতের শ্লোকের কোন শব্দকে ব্যকরণের নিয়মে একটু এদিক সেদিক করে দিলে শ্লোকের পুরো অর্থ পাল্টে যাবে। যার জন্য ভাগবতের প্রত্যেকটি শ্লোকের অনেক রকম অর্থ বার করে দেওয়া যেতে পারে। ভাগবতের সব থেকে নামকরা টীকা হল সুবোধিনী টীকা, এই টীকাকে আধার করে বাকী পণ্ডিতরা অর্থ বার করেন। কিন্তু সুবোধিনী টীকাকে আবার অনেক পণ্ডিত মানতে চান না। সেই কারণে ভাগবতের বিভিন্ন শ্লোকের অর্থকে অনেকে অনেক ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। সেইজন্য ভাগবত অর্থের দিক থেকে যেমন কঠিন ভাবের দিক থেকে সেই রকম গভীর। টীকাকাররা যখন ভাষ্য রচনা করছেন সেখানে তাঁরা আবার নিজের তরফ থেকে অনেক কিছু যোগ করে দিচ্ছেন। যে ব্যাখ্যা গুলো তাঁরা দিচ্ছেন সেগুলোও আবার অত্যন্ত উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাবের ব্যাপারে চলে যায়।

কল্পনা আর ভাব জগতের মধ্যে তফাৎ আছে। কল্পনা হয়, যে কোন কবি লেখক কল্পনা করে অনেক কিছু রচনা করে দিতে পারেন। কিন্তু কোন ঋষি যখন একটা আধ্যাত্মিক জগৎ সৃষ্টি করছেন তখন সেই জগৎ তাঁর কাছে পুরোপুরি বাস্তবিক, যার উপর ধ্যান করলে সত্যিকারের আধ্যাত্মিক উত্থান হয়। কবির কবিতাকে ধ্যান করলে, চিন্তা করলে কিন্তু কারুরই আধ্যাত্মিক উত্থান হবে না। মেঘদূতম্ কালিদাসের খুব নামকরা রচনা। কালিদাসেরই আবার নামকরা রচনা রঘুবংশম্, যেখানে শ্রীরামচন্দ্রের কথা বলছেন, কুমারসম্ভবম্, শিবের কথা, কিন্তু এগুলো কেউ আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভের জন্য বা ধ্যান করবার জন্য পড়েন না। পণ্ডিত ও সাহিত্য রসিক ছাড়া এই বই কেউ পড়েন না, কারণ এগুলো কাব্যিক রচনা, এখানে কোন ভাব জগৎ নেই। কিন্তু ভাগবত, অধ্যাত্ম রামায়ণ, রামচরিতমানস এগুলো ভাব রাজ্যের রচনা। তুলসীদাস ছিলেন একজন সাধক, ভাগবত, অধ্যাত্ম রামায়ণের রচয়িতারা ছিলেন ঋষি। একজন সাধক বা ঋষি মহাত্মা যখন ভগবানের লীলাকে কেন্দ্র করে কিছু সৃষ্টি করেন তখন সেখানেই ভাবরাজ্য সৃষ্টি হয়। ওই রচনার কোন কিছুকে নিয়ে যদি কেউ চিন্তন মনন করে তাহলে তার আধ্যাত্মিক উন্নতি হবে। ভাগবতাদি পুরাণ অধ্যয়নের ক্ষেত্রে এগুলো খুব পরিষ্কার থাকা দরকার। আর ভাবরাজ্যে কোথাও কল্পনা নেই, মিথ্যাও না, পুরোপুরি বাস্তবিক। স্বপ্ন জগতে স্বপ্ন যেমন সত্য, চিন্তা জগতে যেমন চিন্তা বাস্তবিক ঠিক তেমনি আধ্যাত্মিক চিন্তা জগতে ভাবরাজ্য একেবারে বাস্তবিক। এই ভাবরাজ্যই আমাদের নিয়ে যাবে সাকার সাধনাতে, ওখান থেকেই আমরা ঈশ্বরের রূপের সাথে পরিচিত হতে পারবো। তবে যেমন যেমন আধ্যাত্মিক উত্থান হতে থাকে তেমন তেমন এই ভাবরাজ্যও খসে পড়ে যেতে থাকে। ঠাকুরকে যখন অনেকে অবতার বলে জেনে গেছেন, তারও অনেক আগে ঠাকুরের সাধনা সিদ্ধি সব হয়ে গেছে, ঠাকুরের শেষের দিকে তখনও শ্রীকৃষ্ণের উপর কোন গান শুনছেন, শুনেই ঠাকুর সমাধিস্থ হয়ে যাচ্ছেন। সমাধি থেকে নেমে এসে 'হা! কৃষ্ণ!' 'হা! কৃষ্ণ!' করছেন। একদিন নরেন এসে গান করেছেন। গান করে বেরিয়ে গিয়ে উত্তরের বারান্দায় হাজরার সাথে গল্প করতে বসে গেছেন। ঠাকুর বলছেন – আগুন জ্বেলে দিয়ে গেছে, এখন ও থাকলেই কি আর না থাকলেই বা কি! এর দ্বারা কি প্রমাণিত হচ্ছে? যাঁরা সিদ্ধ পুরুষ তাঁদের

কথা ছেড়ে দিন, সাধকের কথা বাদ দিন, যিনি অবতার, যিনি সাক্ষাৎ ভগবান, তাঁর সামনে গানে, আলোচনায় শ্রীকৃষ্ণের সামান্য কোন কিছুর লীলা প্রসঙ্গ হতেই তিনি সমাধিতে হারিয়ে যাচ্ছেন।

অবতার আর তিনটে গুণের সম্পর্ক

এই বাল্যলীলা থেকে শ্রীকৃষ্ণের মিথ্যা কথা বলা শুরু হবে, চুরি করা শুরু হবে, পরনারীর সাথে অনেক কিছু হবে আর তার সাথে নানা রকমের ছল-চাতুরির আশ্রয় নেওয়া হবে। এই ধরণের কার্যকলাপে নিন্দুকরা ভেতরের ভাবটাকে ধরতে পারে না বলে শ্রীকৃষ্ণের নামে অনেক রকম কুৎসা করে। এখানে এসে আমাদের কিছু জিনিষ ধারণা করতে হবে, এই বিষয় পরেও আমাদের আলোচনায় অনেকবার আসবে। পুরো জগৎ সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিনটে গুণে আবদ্ধ। কিন্তু ভগবান হলেন ত্রিগুণাতীত। কিন্তু সেই ত্রিগুণাতীত ভগবানকে যখন অবতারত্ব গ্রহণ করে মানব শরীর ধারণ করতে হয় তখন তাঁকেও এই তিনটে গুণকে অবলম্বন করেই আসতে হয়। আমরা সবাই এই তিনটে গুণে সব সময় বাঁধা। এর ভালো উপমা হল, এখানে যদি রাষ্ট্রপতি আসেন তখন তাঁর সামনে পেছনে পুলিশ, সেনাবাহিনী, কমাণ্ডোরা তাঁকে ঘিরে রাখবে। রাষ্ট্রপতি যেদিকে যাবেন সুরক্ষা বাহিনীও সেই দিকে যাবে। কিন্তু একটা চোর বা গুণ্ডাকে যদি পুলিশ ধরে ফেলে তখন পুলিশ যেদিকে যাবে চোরকেও সেদিকে যেতে হবে। তিনটে গুণের খেলাও এইভাবে চলে। আমরা সবাই গুণে আবদ্ধ, তিনটে গুণ আমাদের যেদিকে টেনে নিয়ে যাবে আমরা সেই দিকে যেতে বাধ্য। আমার মনে যখন সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হয় তখন মনে হবে একটু শাস্ত্র অধ্যয়ন করি, একটু ঠাকুরের নাম করি। যখন রজোগুণের প্রাদুর্ভাব হয় তখন এই কাজ করতে হবে, সেই কাজ করতে হবে বলে চারিদিকে দৌড়ে বেড়াই। অবতারকেও গুণের এলাকায়, শক্তির এলাকায় কাজ করতে হচ্ছে। কিন্তু তিনি নিজের স্বেচ্ছায় এই তিনটে গুণকে ধারণ করে নেন। আসল তত্ত্ব অবতার ত্রিগুণাতীত। এর ফলে কি হয়, আমি আপনি যদি মিথ্যা কথা বলি, যদি চুরি করি, চরিত্রের বাইরে যদি কিছু করি তখন আমাদের পাপ লাগবে। কারণ আমরা গুণের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে আছি। পুলিশ হয়তো আমাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে, সেই সময় আমি একটু ডান দিক বাম দিক করলাম, তখন পুলিশ আমাকে কয়েকটা গালাগাল শুনিয়ে দেবে, নয়তো দু ডাণ্ডার বাড়ি বসিয়ে দেবে। কিন্তু রাষ্ট্রপতি যদি পুলিশকে বলেন – দাঁড়াও! আমি অমুকের সাথে একটু ফোনে কথা বলব। পুলিশ কি করবে? 'হ্যাঁ স্যার', 'হ্যাঁ স্যার' করবে।

এই যে চুরি করা, বদমাইশি করা, চালবাজী করা, অন্যের স্ত্রীদের নিয়ে খেলা করা এগুলোর কোনটাই ঈশ্বরের চরিত্রের উপর কোন প্রভাব ফেলে না। এই ব্যাপারটা ধারণা করতে আমাদের অনেক সময় লাগবে। অনেক সময় আমাদের মনে হতে পারে – কই! ঠাকুর তো কখন মিথ্যে কথা বলতেন না, ঠাকুর চুরি করতেন না, এই ধরণের অনেক কিছুই তো করতেন না। কিন্তু জিনিষটা ঠিক তা নয়। হালদার পুকুরে কামারপুকুরের মেয়েরা যখন স্নান করত তখন অনেকে বারণ করার পরেও ঠাকুর লুকিয়ে লুকিয়ে দেখতেন। আসলে ঘটনাটা হল, ঠাকুর যখন একটু বড় হয়েছেন তখন মেয়েরা যখন স্নান করত তখন ঠাকুরও ওখানে ঝপাৎ ঝপাৎ করে স্নান করত আর তাতে জল ছিটকে মেয়েদের গায়ে লাগতো। সেই সময় একজন বয়স্কা মহিলা ঠাকুরকে বকেছেন – তুমি এখন বড় হয়েছে, মেয়েরা এখানে স্নান করছে তুমি এখান থেকে যাও। তখন ঠাকুর লুকিয়ে লুকিয়ে দেখে বোঝার চেষ্টা করছেন ছেলে আর মেয়েতে তফাৎ কোথায়। কিন্তু তফাৎটা ধরতে পারছেন না। তখন তিনি মা চন্দ্রমণিদেবীকে গিয়ে বলেছেন 'আমি তো লুকিয়ে লুকিয়ে দেখলাম তাতে তো কিছু হয়নি'। তখন মা তাঁকে বোঝাচ্ছেন 'এতে মেয়েদের অপমান হয়, নারীজাতির অপমান করতে নেই'। তারপর থেকে ঠাকুর ওই ভাবে দেখা বন্ধ করে দিয়েছেন। পরের দিকে কামারপুকুরের মেয়েরা যখন ঠাকুরকে দেখতে আসতেন তখন তাদের বাড়ির মেয়েরা আপত্তি করতেন। তখন ঠাকুর তাদের বলছেন 'মেলায় যাবার নাম করে দুটো পয়সা দিয়ে একটা হাড়ি কিনে এখানে চলে আসবে'। এটাও তো এক ধরনের চালাকি। এই ধরণের অনেক ঘটনা ঠাকুরের জীবনেও আছে। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ অবতারে ভগবান বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণকে অবলম্বন করেছেন। সেইজন্য এতটুকু যেটা হচ্ছে এটাই অনেক বেশী হয়ে যায়। শ্রীকৃষ্ণ অবতারে এবার ভগবান রজোগুণকে অবলম্বন করে এসেছেন। রজোগুণ যেখানে অবলম্বন করা হবে সেখানে এমন অনেক কিছু হবে যেগুলো আমরা জাগতিক দৃষ্টি দিয়ে কখনই মেলাতে পারবো না। ভাগবত তাই এই জায়গা থেকে অনেক কঠিন হতে শুরু

করে। কারণ এমন অনেক কিছু আছে যেগুলো আমরা মানতে চাই না, অনেক কিছু আমাদের প্রচলিত ধারণার সাথে বেমানান লাগে, সেই জিনিষগুলোই এখান থেকে শ্রীকৃষ্ণের জীবনে শুরু হয়। সেইজন্য আমাদের সব কিছুকে ভালো করে অনুধাবন করে করে এগোতে হবে।

জ্ঞানমার্গ ও ভক্তিমার্গ

সাধনা মোটামুটি তিন প্রকার। তার মধ্যে একটি হল জ্ঞানমার্গের সাধনা, যেখানে সাধক দেখেন আত্মাই সব কিছু হয়েছেন আর আত্মা ছাড়া কিছু নেই। দ্বিতীয় সাধনা ভক্তিমার্গের সাধনা, যেখানে সাধক দেখেন ঈশ্বর ছাড়া কিছু নেই। জ্ঞানমার্গের সাধনাকে বলে নেতি নেতি সাধনা বা নিরাকার সাধনা আর যেখানে ঈশ্বরই সব কিছু হয়েছেন সেই সাধনাকে বলে ইতি ইতি সাধনা বা সাকার সাধনা বলে। দুটো সাধনার ফল এক। নিরাকার সাধনা আর সাকার সাধনার ফল এক হলেও একটা বড় পার্থক্য থেকে যায়। শাস্ত্র ছাড়া কোন জিনিষ বোঝা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। শাস্ত্রেই বলছে – এমন কিছু কিছু জিনিষ আছে যেটা এই স্থূল শরীর দিয়ে বোধ হয়, সেটা অন্য শরীর দিয়ে বোধ করা যায় না। যেমন যিনি জ্ঞানী, যিনি আত্মাকে জেনে গেছেন তিনি সচ্চিদানন্দকে বোধে বোধ করে নিয়েছেন। সচ্চিদানন্দকে বোধে বোধ করে নেওয়া মানে আনন্দ বোধ করা, সেই আনন্দ অনন্ত। যিনি অনন্ত আনন্দের আস্বাদ করে নিয়েছেন তাঁর আর কোন কিছুরই দরকার নেই। কিন্তু জ্ঞানী এখানে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ জিনিষ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। এই শরীরের মাধ্যমে ওই অনন্ত আনন্দকে অনুভব করা, মানে চোখ দিয়ে তাঁকে দেখা, কান দিয়ে তাঁর বাক্য শ্রবণ করা, হাত দিয়ে তাঁকে স্পর্শ করা আর হৃদয়ে তাঁকে বোধ করা, এই জিনিষটা থেকে জ্ঞানী বঞ্চিত হয়েছেন। ভক্তিমার্গী সাধু আর জ্ঞানমার্গী সাধুদের মধ্যে এই নিয়ে অনেক লড়াই হয়। ভক্তিমার্গী সাধু জ্ঞানমার্গী সাধুদের বলে শুকনো সাধু। জ্ঞানমার্গীরা আবার ভক্তিমার্গীদের বলে তোমাদের এগুলো সব মনের খেয়াল। দুজন দুজনকে যে জিনিষকে নিয়ে সমালোচনা করছে, সেটা ঠিকই সমালোচনা করছে। আর দুজনেই নিজের নিজের পথে ঠিক আছে। কিন্তু অনেক জ্ঞানমার্গী সাধুরাও ঈশ্বরীয় ভাবকে এই স্থূল শরীর দিয়ে আস্বাদ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। আবার কিছু সাধু শ্রীরাম অবতারে শ্রীরামচন্দ্রকে দেখছেন, তখন তাঁদেরও ইচ্ছে হচ্ছে আমরা তো জ্ঞানমার্গে এই ভাবে সাধনা করে এসেছি কিন্তু এখন যদি তাঁকে কাছ থেকে নিজের মত করে পাই। কিন্তু শ্রীরামচন্দ্রকে তো নিজের মত করে পাওয়া যাবে না, কারণ তিনি দশরথের পুত্র হয়ে এসেছেন, তাঁর নিজের বলতে রাজা দশরথ আর নিজের বলতে তিনি সীতার, আমার তো আর হলো না।

শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে আবার বলছেন – যাদের শেষ জন্ম তাদের এখানে আসতেই হবে। অবতার যখন আসেন তখন তিনি এমন একটা ব্যবস্থা করে নিয়ে আসেন, যাদের যেখানে যতটুকু বাকি থেকে গেছে, সবাইকে একত্র করে এক জায়গায় নিয়ে এসে ফেলেন তারপর এক সঙ্গে এদের সবাইকে পার করে দেন। শ্রীকৃষ্ণ অবতারেও এই জিনিষ হয়েছে। কিছু কিছু ঋষি মুনিরা ছিলেন, যাঁরা নির্গুণ সাধনা করে করে সিদ্ধি লাভ করে নিয়েছেন বা সিদ্ধির পথে অনেক এগিয়ে গেছেন, তাঁদেরও ইচ্ছে হল দেখি ঈশ্বরে ভক্তি জিনিষটা কি রকম। আবার শ্রীরামচন্দ্রের অবতারে যে ঋষি মুনিরা শ্রীরামকে দেখেছিলেন, এদের সবাইকে ভগবান গোপী বা গোপ বালক করে ব্রজভূমিতে নিয়ে এলেন। এবার শ্রীকৃষ্ণ অবতারে এনারা সবাই স্থূল শরীরে শ্রীকৃষ্ণের সাথে এক হয়ে গেলেন। এতদিন যে নির্গুণ নিরাকারকে ভাবের ঘরে পেয়েছিলেন এবার এনারা সগুণ সাকার ভগবানকে ভৌতিক ভাবে পেয়েছেন। কিন্তু ভৌতিক ভাবে কি সগুণ সাকারকে পাওয়া যেতে পারে? দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর একবার গঙ্গার পারে প্রভুর দর্শন পেয়ে তাঁকে মধুর ভাবে আলিঙ্গন করতে গেছেন। তখন তিনি ঠাকুরকে বলছেন – তুমি এখন ভৌতিক শরীরে আছ, এখন এভাবে হবে না। ঠাকুর তখনও ওই ভাবে ছিলেন, উনি মাটিতে পড়ে গেলেন, তাতেই ওনার দাঁত ভেঙে গিয়েছিল। ভৌতিক ভাবে এই জিনিষ হয় না। মধুর ভাবের সাধন, যেখানে ঈশ্বরের প্রতি গভীর প্রেমে তাঁকে ভৌতিক রূপে পেতে চাইছেন। ভৌতিক রূপে মানে যে শুধু স্বামী-স্ত্রী, প্রেমিক-প্রেমিকা রূপেই হতে হবে তা নয়, যে কোন ভাবেই হতে পারে, সখা ভাবে হতে পারে, সন্তান ভাবেও হতে পারে। আমরা যাকে ভালোবাসি তাকে আমরা স্থূল ভাবে কাছে পেতে চাই। বাল্মীকি রামায়ণ ছাড়া অন্যান্য রামায়ণে পাই প্রজাপতির একবার ইচ্ছে হল ভগবানকে যেন সন্তান রূপে পাই। জাগতিক যত সম্পর্ক

আছে সেখানে একজন প্রতিযোগী এসে যাবে। কিন্তু মা ও ছেলের সম্পর্কে কোন প্রতিযোগী হয় না। এই যে এত ঋষি, মুনিরা ছিলেন, সাধ্বী যাঁরা ছিলেন তাঁদের খুব তীব্র বাসনা হয়েছে আমরা যেন তাঁকে ভৌতিক রূপে পাই। এখন তাঁরা সবাই গোপী, গোপীকা, গোপ, গোপ বালক হয়ে ব্রজভূমিতে জন্ম গ্রহণ করেছেন। শ্রীকৃষ্ণ অবতারে এবার শ্রীকৃষ্ণের যত লীলাখেলা হতে যাচ্ছে সব লীলা ওই উচ্চমানের যাঁরা ঋষি ছিলেন, তাঁদের সঙ্গেই হচ্ছে। গোপী ও গোপদের জন্ম নেওয়ার একটাই উদ্দেশ্য আমার যে মন, আমার যে প্রাণ আর আমার যে স্থূল শরীর, আমার যাবতীয় যা কিছু আছে সমস্ত শ্রীকৃষ্ণের জন্য।

শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন লীলার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য

আমাদের সমস্যা হল আমরা হলাম চূড়ান্ত স্বার্থপর। নিঃস্বার্থ হওয়া খুব কঠিন। মায়েরা কিছু দিনের জন্য ছেলের প্রতি নিঃস্বার্থ হয়। আর কিছুক্ষণের জন্য নিঃস্বার্থ হয় যখন প্রেমে পড়ে। প্রেমের যখন প্রচণ্ড তোড় আসে তখন সে কিছুক্ষণের জন্য নিঃস্বার্থ হয়ে যায়। ঠাকুর যেমন বলছেন যখন ঝড় থেমে যায় তখন বোঝা যায় কোনটা তেঁতুল গাছ, কোনটা আমড়া গাছ, সেই রকম যখন তোড়টা কমে যায়, তখন পরিষ্কার বুঝতে পারে আমি আর তুমি আলাদা। সেইজন্য গোপ, গোপীদের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সেই চূড়ান্ত ভালোবাসাকে আমাদের মত স্বার্থপর লোকের পক্ষে বোঝা তো দূরের কথা মেনে নেওয়াও অসম্ভব। যাঁদের মধ্যে কোন কামগন্ধ, স্বার্থপরতা নেই তাঁরাই শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলাকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন, বাকি যারা আছে তাদের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। তখনকার দিনের একটা ছোট্ট গ্রাম, এমনিতেই সেই সময় লোকসংখ্যা কম ছিল, সেখানে কয়েকজন গোপ-গোপী, তার মধ্যে নন্দবাবাও আছেন শ্রীকৃষ্ণও আছেন, আর মনে মনে তাঁরা সবাই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সম্পূর্ণ সমর্পিত। সেখানে শ্রীকৃষ্ণ কিসের চুরি করবেন, কিসের বদমাইশি করছেন! আমাদের সমাজটা যাতে কোন কদাচার ব্যভিচারে উচ্ছন্নে না চলে যায় সেইজন্য বলে দেওয়া হয় তুমি এর স্বামী, তুমি এর স্ত্রী। কিন্তু এখানে যদি ধরুন একশটি মেয়ে শ্রীকৃষ্ণকে বলে তুমিই আমার চিরদিনের স্বামী, সেখানে আর কিসের চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন আসতে পারে। আপনার বাড়ির বাচ্চা ছেলে ফ্রিজ থেকে মিষ্টি খেয়ে নিলে আপনি কি এটাকে চুরি বলবেন? শ্রীকৃষ্ণ হলেন ব্রজের সব গৃহস্থের বাড়ির রাজা বা মালিক, প্রত্যেকটি গোপীর হৃদয়ের দেবতা, প্রত্যেকটি গোপ-গোপীদের শরীরের তিনিই রাজা। সেখানে কিসের চুরি, কিসের মিথ্যা কথা বলা আর কিসেরই বা দুশ্চরিত্রের কলঙ্ক! তাই না, ভগবান রূপে তিনি সব কিছুর মালিক, সবটাই তাঁর। সেখানে কিসেরই বা চুরি আর কি নিয়েই বা চালবাজী করবেন! সমস্যা হয় আমাদের। সেইজন্য ঠাকুর বলছেন – তোমাদের সবার বেনে বুদ্ধি, বলে কিনা ঈশ্বরের বৈষম্য দোষ! শ্রীকৃষ্ণের যে বাল্যলীলা আমরা এখন আলোচনা করতে যাচ্ছি এগুলোকে বুদ্ধি দিয়ে বিচার করতে গেলে ঈশ্বরের উপর বৈষম্য দোষের ব্যাপারটা চলে আসবে। শ্রীকৃষ্ণের সব লীলা কাহিনী ভাবের ব্যাপার, আর এগুলো শুনতে শুনতে মনে কোথাও যদি আধ্যাত্মিক স্ফুরণ না হয় তাহলে ভাগবতের কথা ধারণা করা খুব কঠিন হয়ে যাবে।

ঈশ্বর আর জগতকে দু ভাবে দেখা যায়। একটা হল উপর থেকে ঈশ্বরের দৃষ্টিতে দেখা, আর দ্বিতীয়টি হল নীচ থেকে। নীচ থেকে যখন দেখা হয় তখন নিজের অবস্থান পাল্টে আর উপর থেকে দেখা সম্ভব হবে না। উপর থেকে দেখলে তখন অবস্থান পাল্টে নীচের থেকে উপরেও দেখা যাবে। কোয়ান্টাম ফিজিক্সেও ঠিক এই কথা বলা হয়। যখন কেউ ইলেক্ট্রনের ব্যাপারে কিছু জানতে চায় তখন তাকে বলা হবে – আগে তুমি ঠিক কর ইলেক্ট্রনের ওজন ও অবস্থান জানতে চাইছ নাকি ইলেক্ট্রনের গতি জানতে চাইছ, দুটো জিনিষ এক সঙ্গে হবে না, একটা ঠিক কর। আর তুমি যেটা জানতে চাইছ ঠিক করবে তার কাছাকাছি উত্তর আমরা দিয়ে দিতে পারব। যত কাছাকাছি উত্তর দেব তত অন্যটা ছিটকে যাবে। যেমন এই বোতলটা টেবিলের উপর আছে, আর বোতলের এই রকম আকার, এই দুটো আমরা পরিষ্কার দেখতে পারছি। কিন্তু ইলেক্ট্রনের ব্যাপারে এভাবে দুটো জিনিষকে একসাথে সঠিক করে কিছু বলা যাবে না। এ্যটমের মধ্যে ইলেক্ট্রন আছে, যদি কেউ জিজ্ঞেস করে ইলেক্ট্রনের ওজন কত? তখন বলবে, দাঁড়ান আমরা মেশিন লাগাচ্ছি, লাগানোর পর বলব, তাও সেটা exact কিছু বলা যাবে না, তবে কাছকাছি যাবে। তারপর বললেন 'এর ওজন প্লাস মাইনাস করে এতটা'। আমাদের ভাষায় দশ কিলো বললে সেটা আট কিলোও হতে পারে আবার বারো কিলোও হতে পারে। আপনি যদি বলেন

– কি ব্যাপার! ঠিক ঠিক ওজন কত বলতে পারছেন না? এতো কিছুই নয়, তার সঙ্গে আপনি যদি জানতে চান ইলেক্ট্রন কি গতিতে অবস্থান পরিবর্তন করছে তখন এর ওজন যত কাছাকাছি বলবে তত ওর গতি পরিবর্তনের হিসাব ছিটকে যাবে। ধরুন একটা গাড়ী আছে, গাড়ীটার ওজন মনে করুন একশ কিলো আর তার গতিবেগ পঞ্চাশ কিলোমিটার। গাড়িটা মনে করুন বেলুড়ে আছে। এবার গাড়ীটাকে যদি ইলেক্ট্রন মনে করি আর একই প্রশ্ন যদি করা হয় তখন বলবে গাড়িটার ওজন নব্বুই থেকে একশ দশ কিলোগ্রাম। এবার যদি গাড়ীর গতিবেগ কত জানতে চান তখন আর পঞ্চাশ কিলোমিটার থাকবে না, তখন বলবে পাঁচ থেকে পাঁচ হাজার কিলোমিটার বেগে চলছে। আর গাড়ীটা এখন কোন জায়গায় আছে? পশ্চিমবঙ্গের কোন এক জায়গায় আছে। এটা কি কোন উত্তর হল? না, এটাই কোয়ান্টাম ফিজিক্স। সাধারণ পদার্থ বিজ্ঞান, যে বিজ্ঞানকে আমরা ছোটবেলা থেকে নাড়াচাড়া করে আসছি, যে বিজ্ঞানকে আবার বলা হয় perfect science, তার এই দুর্গতি। সেই perfect science একটা ইলেক্ট্রনের ওজন কত, কত গতি আর কোন জায়গায় আছে এই তিনটের মধ্যে একটা যত কাছাকাছি বলবে তত বাকি দুটো ছিটকে যাবে। শুধু এই তিনটেই নয়, এর আরও অনেক প্যারামিটার আছে, বোঝার সুবিধার জন্য তিনটেকে নিয়ে বলা হল। যদি বলে এর ওজন নব্বুই থেকে দশ কিলোগ্রাম, তখন এর অবস্থান সম্বন্ধে বলবে পশ্চিমবঙ্গের কোথাও আছে। এটা কি কোন উত্তর হল? আপনি তখন বললেন এর ওজনটা আরেকটু হাল্কা করুন। এবার বললেন এর ওজন তিরিশ কিলোগ্রাম থেকে একশ সত্তর কিলোগ্রাম। এবার কোথায় আছে? বেলুড় থেকে হাওড়ার মধ্যে আছে। একটা প্যারামিটারকে যত কাছাকাছি নিয়ে আসা হবে অন্যটা তত ছিটকে যাবে। কেনোপনিষদে বলছেন, যে বলছে আমি বুঝেছি আসলে সে বোঝেনি, যে বলে আমি বুঝিনি আসলে সেই বুঝেছে। কোয়ান্টাম ফিজিক্সও তাই, কোন কোয়ান্টাম ফিজিক্সের বিজ্ঞানী যদি বলেন আমি বুঝেছি তার মানে সে কিছুই বোঝেনি। এরা ফিজিক্সের সাধারণ জিনিষের ব্যাখ্যা দিতে পারছে না আর ভগবানকে প্রশ্ন করে যে ভগবানের বৈষম্য দোষ আছে কিনা, তিনি সৃষ্টি কেন করলেন ইত্যাদি।

এখন ভগবানের দৃষ্টিতে যদি শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলাকে দেখা হয়, তখন প্রথমেই তো সে দেখবে তিনি ছাড়া কিছু নেই। তাহলে এই লীলা কার সাথে করছেন? নিজের সঙ্গেই নিজে লীলা করছেন। আমি কেন আঙুল মটকালাম, আমার আঙুল আমি মটকেছি, আমার খুশী তাতে তোমার কি এসে যায়। মানুষ রূপে নীচের দিক থেকে দেখলে এই প্রশ্নই হয় না। কারণ আপনি যা কিছু প্রশ্ন করছেন তিনটে গুণের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে প্রশ্ন করছেন। কিন্তু তিনি তিনটে গুণের পারে, তাই ত্রিগুণাতীতকে নিয়ে এই প্রশ্ন হয় না। যেমন কোন কোয়ান্টাম ফিজিক্সের বিজ্ঞানীকে প্রশ্ন করা যায় না – মশাই! হেঁয়ালি না করে ঠিক করে বলুন তো কত ওজন, কোন জায়গায় আছে আর এর গতি কত। এই প্রশ্নও হয় না। তাহলে ফিজিক্সকে কেন perfect science বলছে? ফিজিক্স যদি perfect science না হয় তা হলে তোমার কম্প্যুটার বন্ধ হয়ে যাবে, কোন কম্প্যুটারই চলবে না। কারণ কম্প্যুটার পুরোপুরি কোয়ান্টাম ফিজিক্সের উপরেই চলে। আর দুনিয়ায় যত মেশিন চলছে সব কোয়ান্টাম ফিজিক্সের নিয়মানুসারেই চলে। সেইজন্য কোয়ান্টাম ফিজিক্সকে বলা হয় perfect science। কম্প্যুটার, ইলেক্ট্রনিক ঘড়ি থেকে শুরু করে এ্যারোপ্লেন, রকেট টেকনোলজি সব কোয়ান্টাম ফিজিক্সের উপরে চলছে। কিন্তু কোয়ান্টাম ফিজিক্সকে কেউ ব্যাখ্যা করতে পারে না, এর কোন কিছুই সঠিক ভাবে নিরুপণ করা যায় না। ভগবান ঠিক তাই, তিনি আছেন বলে জগৎটা চলছে, কিন্তু তাঁকে কোন ভাবে ব্যাখ্যা করে বলা যায় না। তাঁকে যদি কেউ জানতে চায় শাস্ত্র তাকে বলে দেবে আমি যেটুকু বলার বলে দিয়েছি এর বেশী তুমি কোন দিন জানতে পারবে না। আমাদের বুদ্ধির যে দৌড় ভগবান তার বাইরে। কোয়ান্টাম ফিজিক্স ছাড়া আর কোথাও কিছু নেই যেটা বুদ্ধির সীমাকে ছাড়িয়ে যায়। ভগবান আবার বুদ্ধির এলাকাকেই ছাড়িয়ে যান, তাই আমি আপনি কীভাবে প্রশ্ন করবো এগুলো কিসের লীলা, কেন লীলা!

কিন্তু আজ থেকে এক হাজার কি দু হাজার বছর আগে যাঁরা গ্রামের অশিক্ষিত মানুষের কাছে ভাগবত কথা শোনাতে যেতেন তাঁদের চাই দক্ষিণা, বাড়িতে মেয়ের বিয়ে দিতে হবে, ছেলের উপনয়ন করাতে হবে। এখন প্রথমেই যদি তাঁরা গিয়ে বলেন, ভাই! ভগবানের লীলা তোমরা কিছু বুঝবে না, তখন কে তাঁর কথা শুনতে আসবে! শ্রোতা না থাকলে দক্ষিণা পাবেন না, দক্ষিণা না পেলে সংসার চলবে না। সেইজন্য তাঁকে

বলতে হত এগুলো ভগবানের লীলা, তিনি বিরাট ক্ষমতাবান, তিনি অমুক করেন, তমুক করেন। আসলে এই প্রশ্নগুলো একেবারেই হয় না। কিন্তু কেউ যখন সাধনা করতে শুরু করবেন, সাধনা করতে করতে একটা জায়গায় এসে দেখছেন – আরে এটাই তো ঠিক, তাঁকে তো জানা যায় না। কিন্তু সেটাকেও বোঝার আগে বুদ্ধির এলাকাকে ছাড়িয়ে যেতে হচ্ছে। কিন্তু প্রথমেই যদি বলে দেওয়া হয় – ভগবানের লীলা বুঝতে গেলে বুদ্ধির এলাকাকে ছাড়িয়ে যেতে হবে, তখন কে ভাগবত কথা শুনতে যাবে! এই জন্য ধাপে ধাপে শ্রোতার মনকে উপরের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়। আর এটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে, ভাগবত হল পুরাণ, পুরাণাদিতে যেটুকু বলার তার থেকে অনেক বাড়িয়ে বলা হয়। কিন্তু আধ্যাত্মিক সত্যের ব্যাপারে সেখানে কোন এদিক সেদিক করবেন না। আবার শুধু লীলা বর্ণনা করা, কথা কাহিনীর বর্ণনা করাও পুরাণের উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য হল সাধারণ মানুষকে কীভাবে উপরের দিকে নিয়ে আসা যায়। উপরের দিকে নিয়ে আসার একটাই অর্থ, তার স্বার্থপরতা কীভাবে কমানো যায়। স্বার্থপরতা দূর করার জন্য সব কিছুতে ঈশ্বরকে নিয়ে আসা হয়, ঈশ্বরকে ভালোবাসা স্বার্থপরতা নয়। কারণ ওটাই আমাদের স্বভাব, ঈশ্বর লাভ মানে নিজের প্রকৃত স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া।

শ্রীকৃষ্ণের মাখন চুরির বাললীলা

এবার শ্রীকৃষ্ণ বলরাম একটু বড় হয়েছেন, তাঁদের নামকরণ-সংস্কার হয়ে গেছে। ছোট্ট শিশু কিন্তু এখনই নানা রকম দুষ্টুপনা শুরু করে দিয়েছেন। এখানে যেমন বর্ণনা করছেন, বাছুরের লেজ ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, সেগুলো দেখে গোপীরা খুব আনন্দ উপভোগ করছেন। কখন হরিণ দেখে ছুটে যাচ্ছেন, আগুনের দিকে চলে যাচ্ছেন, মায়েরা এই সব দেখে ওদের বকাবকি করছেন, কিন্তু তাতেও সামলে রাখতে পারছেন না। সব সময় দুশ্চিন্তা এই চঞ্চল শিশু দুটোকে কি করে সামলে রাখা যাবে! কোথাও কোন অঘটন না ঘটে যায়। তারপর দুজনের চলা ফেরা হাঁটাচলা সাবলীল হয়ে যাওয়ার পর গোপীরা প্রত্যেক দিন এসে এদের দুজনের নামে মা যশোদার কাছে নানান রকমের অভিযোগ জানাতে আরম্ভ করেছে। যেমন একদিন এসে বলছেন – দেখো যশোদা! যখন গরুর দুধ দোহনের সময় হয় তার আগেই তোমার কৃষ্ণ গিয়ে বাছুরের দড়ি খুলে দেয়। এটা গেল এক রকমের বদমাইশি। যদি বকাবকি করতে যাই তখন আমাদের আবার ঠাট্টা করে। তাই না, চুরি করে আমাদের দুধ, দই, মাখন সব খেয়ে নেয়। শুধু খেয়েই নেয় না, যেটুকু বেশী থাকে সেটুকুকে আবার বানরদের খাইয়ে দেয়। যদি বানর না থাকে তখন সব হাঁড়িগুলোকে ভেঙে চলে যায়। একজন একজনের ঘাড়ে উঠে উঠে শিকেয় তুলে রাখা মাখনগুলো নামিয়ে খেয়ে নেয়। আমরা যখন কিছু বলতে যাই তখন এমন ভাব দেখায় যেন আমরাই কোন দোষ করেছি। এইভাবে গোপীরা এদের বদমাইশির ফিরিস্তি বিরাট লম্বা করে মা যশোদা রানীকে বলে যেতেন।

বাললীলার মধ্যে দুটো জিনিষই বেশী পাওয়া যায়। একটা শ্রীকৃষ্ণের মাখন চুরি করা। শ্রীকৃষ্ণ মাখন খেতে খুব ভালো বাসতেন। সেইজন্য শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার বেশীর ভাগটাই মাখন চুরিকে কেন্দ্র করে, অপরের বাড়ির মাখন আর নিজের বাড়ির মাখন চুরি। মাখন চুরি করার জন্য যত রকমের ফন্দি করা যেতে পারে। বলরাম আর শ্রীকৃষ্ণ মিলে গোপবালকদের সঙ্গে শুধু ফন্দিই করতে থাকতেন, কীভাবে এর ওর বাড়ি থেকে মাখন চুরি করা যেতে পারে তার ফন্দি বানাতে থাকতেন। শ্রীকৃষ্ণের যত রকমের লীলা হতে পারে তার বেশীর ভাগই হল এই মাখন চুরি করা নিয়ে। মাখন চুরির মধ্য দিয়ে ভগবানের বাৎসল্য রসকে খুব সুন্দর ভাবে আস্বাদন করা যায়।

সাধক কবি সুরদাস শ্রীকৃষ্ণের মাখন চুরি লীলাকে সব থেকে বেশী সামনে নিয়ে এসেছেন। সুরদাস জন্মান্ধ ছিলেন, আর ছোটবেলা থেকেই খুব সুন্দর সুন্দর পদ রচনা করে নিজেই গান করতেন। তাঁর খুব ইচ্ছে ছিল শ্রীকৃষ্ণের সমগ্র জীবনচরিত রচনা করবেন। কিন্ত মাত্র দুটো খণ্ড রচনা করে যেতে পেরেছিলেন, প্রথমটা 'বালকাণ্ড' আর দ্বিতীয়টা 'শৃঙ্গারকাণ্ড'। সারা ভারতে হিন্দুদের মধ্যে যে পুরো আলাদা একটা ধর্মীয় পরম্পরা দাঁড়িয়ে গেছে তা শুধু শ্রীকৃষ্ণের বাললীলাকে আধার করে দাঁড়িয়ে আছে। মা যশোদা শ্রীকৃষ্ণকে দোলনাতে

দোল দিচ্ছেন শুধু এইটুকুকে নিয়ে তিনি একটা পদ রচনা করলেন। এই রকম প্রত্যেকটি বাললীলার ঘটনাকে নিয়ে তিনি আলাদা আলাদ পদ রচনা করলেন। আর প্রত্যেকটি পদ এত সুমধুর আর এমন মনোগ্রাহী যে, সারা জীবন এর মধ্যেই ডুবে থাকা যায়। এই কারণে সুরদাসের পদ সারা ভারতে জনপ্রিয়তার কাছে ভাগবত কিছুই নয়। কিন্তু তার প্রত্যেকটি পদের উৎস ভাগবত থেকেই নেওয়া। এই ধরণের বই সারা ভারতে ছেয়ে আছে, আর এই সব অমর সাহিত্য, গীতিকাব্য কীভাবে হিন্দু মনকে এখনও টেনে রেখেছে ভাবলে অবাক হয়ে যেতে হয়। কেননা সাধকের জীবনে তাঁর সাধনা যেমন দৈবী ভাবে পরিপূর্ণ থাকে ঠিক তেমনি তাঁদের যে সৃষ্টি, রচনা সেটাও দৈবী ভাবে সমৃদ্ধ। কতটা দৈবী ভাবে ভাবময় থাকত সুরদাসের জীবনের একটা ঘটনা শুনলে খুব সহজে বুঝতে পারা যায়। একবার অন্ধ সুরদাসকে এক মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহের সামনে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই সুরদাস ভাবে বিভোর হয়ে শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে একটা গীত রচনা করে ফেললেন। আর ঐ গানে শ্রীকৃষ্ণের যে সাজের বর্ণনা করছেন সুরদাস, আশ্চর্যের ব্যাপার হল ঠিক ঐ সাজেই ঐদিন মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহকে শৃঙ্গার করান হয়েছিল।

জিম করবেটের রচনা যাঁদের পড়া আছে তাঁরা দেখতে পাবেন, জিম করবেট অনেক জায়গায় বর্ণনা করছেন – এক জায়গায় তিনি বাঘ মারতে যাচ্ছেন। ছয় ঘন্টা ধরে জঙ্গলে ঘুরছেন। কোন বাঘের চিহ্নই নেই। হঠাৎ তাঁর মনে হল একটা বাঘ যেন তাঁকে অনুসরণ করছে। জিম করবেট চারিদিকে তাকাচ্ছেন, কিন্তু কোথাও বাঘের দেখা নেই। অনেকবার তাঁর এই ধরণের ঘটনা হয়েছে। কোথাও কিছু নেই কিন্তু হঠাৎ তাঁর অবচেতন মন যেন তাঁকে বলে দিচ্ছে একটা মানুষ খেকো হিংস্র বাঘ আশেপাশেই তাঁকে অনুসরণ করে যাচ্ছে। কিন্তু কোথাও খুঁজে পাচ্ছেন না। একটা ঘাশ পর্যন্ত নড়ছে না, একটা পাখির আওয়াজও হয়নি, কিন্তু তবুও একটা বিপদ সম্বন্ধে কে যেন আমাকে সজাগ করে দিচ্ছে, মনে হচ্ছে বাঘ আমার আশেপাশেই কোথাও আছে। যখন তিনি সবাইকে সজাগ করে দিয়ে একটু এগোতেই কাদার মধ্যে বাঘের পায়ের ছাপ দেখতে পাচ্ছেন। জিম করবেট বলছেন, ডাক্তারি বিজ্ঞান বা মনস্তাত্ত্বিক বিজ্ঞান দিয়ে এই জিনিষগুলোকে ব্যাখ্যা করা যাবে না। কিন্তু কি করে জানতে পারছেন যে বাঘ তার আশপাশেই ঘুরছে। কোথাও কোন ভাবে তাঁর জানার উপায় নেই, কোন গন্ধ নেই, শব্দ নেই, কোন চিহ্নই নেই যে বুঝবে বাঘ তাকে অনুসরণ করছে, অথচ তাঁর অবচেতন মন তাঁকে যেন একটা বিপদের সঙ্কেত দিচ্ছে। আর তিনি রীতিমত ভয়ে কাঁপছেন, মানুষখেকো বাঘ আমার ধারে কাছেই ঘুরঘুর করছে। এই জিনিষ আমাদের জীবনেও হয়, কোন সময় মনে হবে যেন কোন একটা বিপদ হতে চলেছে। তাই সুরদাস যদি জন্মান্ধ হয়েও ঐ কাব্য তৈরী করতে পারেন, এতে আর আশ্চর্যের কি আছে।

এর একটাই কারণ। সন্ত তুলসীদাসের রামচরিত মানস, সুরদাসের পদ আর মীরাবাঈয়ের ভজন এই ধরণের কাব্য কোন কবি কখনই নিজে থেকে কল্পনা করে রচনা করতে পারবেন না। রবীন্দ্র গীতি বা নজরুল গীতির মত কাব্য অনেকেই হয়ত রচনা করে দিতে পারবেন, কিন্তু রামচরিত মানস আপনি আমি কেন, কোন কবিই লিখতে পারবেন না। মৌলিক পার্থক্যটা হচ্ছে রামচরিত মানস বা সুরদাসের পদ তখনই লেখা যাবে ভগবান যখন নিজে হাত ধরে লেখাবেন তখনই সম্ভব হবে ঐ ধরণের কাব্য রচনা। একজন কবি কখনই এই ধরণের কাব্য নিজে থেকে রচনা করতে পারবে না, ভগবান যখন যাঁকে নির্বাচিত করবেন রচনা করার জন্য তখনই তাঁর পক্ষে রচনা করা সম্ভব হবে। খুব উচ্চকোটির সাধক না হলে এই ধরণের পদ, দোঁহা, চৌপায়া বা ভজন রচনা করা যায় না। যে যত উচ্চ সাধক হবে তাঁর কবিতা তত উচ্চমানের হবে।

কয়েক বছর আগে তুর্কী সাহিত্যিক ওরহান পামুর তাঁর রচনা 'My Name is Red' উপন্যাসের জন্য নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন। উনি নোবেল প্রাইজ নেওয়ার সময় বক্তৃতায় বলছেন 'এই বইটিতে কোথাও কোথাও মনে হয়েছে যেন অন্য এক উচ্চ দৈবী শক্তি আমার হাত দিয়ে এই লেখা লিখিয়ে নিয়েছেন'। নোবেল প্রাইজ বিতরণ অনুষ্ঠানের আগেই এক মহারাজ ওনার এই বইটা পড়েছিলেন। মজার ব্যাপার হল বইয়ের কিছু কিছু জায়গায় মহারাজ কলম দিয়ে দাগ দিয়ে রেখেছিলেন, পরে তিনি মিলিয়ে দেখছেন 'এই কথাগুলো তিনি লিখলেন কি করে'! আর নোবেল পুরস্কার নেওয়ার সময় ওরহান পামুর বইয়ের ঠিক ঐ জায়গাগুলোই উল্লেখ

করে বলছেন যেন কোন দৈবী শক্তি আমার হাত ধরে এই কথাগুলো লিখিয়ে নিয়েছেন, এই কথাগুলো আমার নিজের লেখা বলে মনেই হচ্ছে না। উনি বলছেন এটা আমার ক্ষমতার বাইরে। কোন সাহিত্য রচনার পেছনে যখন আধ্যাত্মিক শক্তি কাজ করে তখন সেই সাহিত্যই কালজয়ী হয়, পাঠক পাঠিকারা এই ধরণের সাহিত্য পাঠ করে এক গভীর আনন্দে অভিভূত হয়ে অন্য জগতে বিচরণ করেন। স্বামীজী বলছেন 'From purity and silence comes the power of word'. শব্দের শক্তি কোথা থেকে আসে? পবিত্রতা ও নৈঃশব্দতা থেকে। কেউ যদি পবিত্রতা অর্জন করতে পারেন আর যখন মনকে প্রশান্ত রাখতে অভ্যস্ত হবেন, তখনই তাঁর মধ্যে শব্দের শক্তির জাগরণ হবে। তখন তিনি যেটাই বলবেন, সারা জগৎ মাথা নত করে তাঁর কথা শুনতে বাধ্য থাকবে।

যাই হোক শ্রীকৃষ্ণ এখন নানান রকমের দুষ্টুমির লীলা করে চলেছেন, গোপীদের ঘরে গিয়ে মাখন চুরি করছেন, তাঁদের জিনিষপত্র ভেঙ্গে রাখছেন। গোপীরা যশোদার কাছে শ্রীকৃষ্ণের নামে নালিশ করতে এসেছেন। এসে দেখছেন শ্রীকৃষ্ণ যেন কিছুই জানেন না, গোবেচারার মত মুখের ভাণ করে যশোদার আঁচলের তলায় মুখ লুকিয়ে আছেন। গোপীরা বলছেন 'তোমার আদরের কান্‌হাইয়া যার বাড়িতে যাবে মনে করবে ঐ বাড়ির মালিক যেন সেই, আমরা এত খেটেখুটে ঘরদোর পরিষ্কার করি আর তোমার কান্‌হাইয়া গিয়ে ঘরের মধ্যে থুতু ফেলবে আবার প্রস্বাব করে দেবে, আর হাজার রকমের ফন্দি-ফিকির করে চুরি করাতে এমন সিদ্ধহস্ত হয়েছে যে কল্পনাই করা যায় না। যখনই ধরা পড়ে তখনই এমন ভাব করবে যে ওর মত সাধুপুরুষ আর কেউ নেই। এখন দেখুন দাঁড়িয়ে আছে যেন কিছুই জানে না'। শ্রীকৃষ্ণ সব শুনে মুখের এমন ভঙ্গিমা করছেন যেন খুব ভয় পেয়ে গেছেন, আর অবাক ও বিস্মিত চোখে সব দেখছেন, তাঁর মত ভীতু জীব এই দুনিয়াতে যেন আর নেই। তাঁর ওই বিস্ময় ভরা চাহনি দেখে আবার গোপীদের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বাৎসল্য আরও বেড়ে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে বকাঝকা করার ইচ্ছাটুকুও চলে যায়।

যেমন একদিন মা যশোদা শ্রীকৃষ্ণকে হাতেনাতে ধরে ফেলেছেন। শ্রীকৃষ্ণ সবে মাখনের হাঁড়িতে হাত ডুবিয়েছেন আর তখনই হাতে মাখন সমেত যশোদা ধরে ফেলেছেন। যশোদ বলছেন 'এবার কি বলবে তুমি'! শ্রীকৃষ্ণ তখন বলছেন 'মা! তুমি আমার হাতে যে বালা, বাইজু অলঙ্কার পড়িয়েছো, এগুলোর তাপে আমার হাত পুড়ে যাচ্ছিল, তাই আমি হাতটা ঠাণ্ডা করবার জন্য মাখনের হাড়িতে হাতটা ডুবিয়েছিলাম, আমি তো আর কিছুই করিনি'! আবার কখন কখন যখনই ধরা পড়ে যায় তখনই শ্রীকৃষ্ণ ভয়ে এমন কান্না শুরু করে দেবে যে মা যশোদা শাসন করার বদলে বাৎসল্য রসে আপ্লুত হয়ে পড়েন।

আবার এক জায়গায় বলছেন, একজন গোপীর খুব ইচ্ছে তাঁর ঘর থেকে যেন একদিন শ্রীকৃষ্ণ মাখন চুরি করেন। তিনি মনে মনে ভাবছেন 'আহা! কবে আমি কৃষ্ণকে আমার ঘরে মাখন খেতে দেখব? ইনি এসে মন্থন পাত্রের পাশে বসবেন, আমি তখন আড়াল থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে কৃষ্ণের মাখন চুরি করা দেখব'। ভগবান অন্তর্যামী, শ্রীকৃষ্ণ গোপীর মনের এই ভাবের কথা টের পেয়েছেন। তিনি ঠিক একদিন সেই গোপীর ঘরে গিয়ে চুরি করে মাখন খেয়ে তাঁকে সুখ দিয়েছেন। গোপীর হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হয়ে গেছে। আনন্দে মত্ত হয়ে সেই গোপী ঘুরে বেড়াতে লেগেছেন, তাঁর দেহ-মনে আনন্দ যেন আর ধরছিল না। সখীরা সবাই তাঁকে জিজ্ঞেস করছেন 'তোমার মুখের উপর এই আনন্দ কোথা থেকে এসেছে? তুমি কি কোন অমূল্য ধন কুড়িয়ে পেয়েছো'? সেই গোপীর মুখ দিয়ে কোন কথাই বেরোচ্ছে না। সখীরা বলছেন 'দেখো সখী! আমাদের শরীরটাই আলাদা কিন্তু আমাদের প্রাণ তো এক, আমাদের সবার রূপ তো এক। তাহলে বলো এমন কি হয়েছে তোমার, যে আনন্দে তোমার মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে, আমাদের কাছে লুকোবার তো কিছু নেই'? তখন কোন রকমে গদগদ কণ্ঠে বলল 'আমি আজ অনুপম রূপ দর্শন করেছি', এই বলতেই তাঁর বাকরুদ্ধ হয়ে গেল, প্রেমাশ্রুতে তাঁর দুটি কমল নয়ন প্লাবিত হয়ে গেল। সব গোপীদেরই অবস্থা এই রকমই ছিল। আমার বাড়িতে শ্রীকৃষ্ণ মাখন চুরি করেছে, এই আনন্দ গোপীকে কোথায় নিয়ে গেছে ভাবা যায় না।

এর আগে বলা হয়েছিল, চুরির ব্যাপারটা তখনই হয় যখন আমি আলাদা আপনি আলাদা, আপনাকে না বলে আপনার জিনিষ, যে জিনিষে আমার অধিকার নেই, সেই জিনিষ আমি নিয়েছি। কিন্তু যেটা আমারই জিনিষ সেখানে না বলে নিলে চুরি কি করে হবে, আমারই জিনিষ নেওয়ার সময় কাকেই বা বলতে যাবো যে আমার জিনিষ আমি নিচ্ছি। গোপীরা শ্রীকৃষ্ণের, শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের, সেখানে চুরির ব্যাপার আসবে কি করে! তাহলে গোপীরা কেন অভিযোগ জানাতে যশোদার কাছে দৌড়ে যাচ্ছেন? ছেলে যখন ছোট থাকে তখন তার বাবা অফিস থেকে ফেরার পর তার মা শুরু করবে 'জানো তো তোমার ছেলে আজ কি কি দুষ্টুমি করেছে'! তারপরই মা শুরু করবেন তোমার ছেলে এই করেছে সেই করেছে। ছেলের দুষ্টুমির কথা বলছে এতেও মায়ের কত আনন্দ, আর বাবার শুনেও বুকের ভেতরটা আনন্দে ভরে যাচ্ছে। ছেলে যদি কোন দুষ্টুমি না করে থাকে তাহলে মায়েরও মন খারাপ হয়ে যাবে। বলে, বাচ্চা যখন কাছে থাকে তখন ঘাড়ে যন্ত্রণা, বাচ্চা কাঁধে উঠে এমন লাফালাফি করবে যে ঘাড়ে যন্ত্রণা ধরে যাবে। আর বাচ্চা যখন কাছে থাকে না, তখন বুকে যন্ত্রণা। এখানে আনন্দ মানে, তাঁকে নিয়ে যখন কথা হয় তাতেই ভক্ত আনন্দে আপ্লুত হয়ে পড়ে।

গীতায় ভগবান বলছেন *কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ*, আমার ভক্ত আমারই কথা বলে, আমার কথাতেই তারা প্রীতি অনুভব করে, আমারই কথাতে তারা রমণ করে। এই যে গোপীরা যশোদার কাছে অভিযোগ অনুযোগ করছেন, এরপর যশোদা যদি শ্রীকৃষ্ণকে মারতে যান, গোপীরা আবার যশোদাকে কখনই শ্রীকৃষ্ণকে মারতে দেবেন না। ঠাকুরের মহাসমাধির পর বরানগর মঠে স্বামীজীরা ঠাকুরের কথা নিয়ে মজা করছিলেন, তখন একজন বললেন 'আপনারা ঠাকুরকে নিয়ে মজা করছেন'! স্বামীজী শুনে খুব রেগে গেছেন, বলছেন 'ঠাকুরকে নিয়ে মজা করবো না তো কি তোমাকে নিয়ে করব'? মানে, আমার মজা করার যদি থাকে সেই মজাও যিনি আমার প্রিয় তাঁকে নিয়েই করব। শ্রীকৃষ্ণ দুষ্টুমি করছেন, সেই দুষ্টুমিতেও গোপীদের আনন্দ হচ্ছে, দুষ্টুমির নালিশ করতে যাচ্ছেন, সেই নালিশ করতে গিয়েও তাঁরা আনন্দ অনুভব করছেন। মা যশোদা যখন শ্রীকৃষ্ণকে কৃত্রিম শাসন করছেন, তাই দেখেও গোপীদের আনন্দ। কিন্তু এই নয় যে শাসন করতে গিয়ে কৃষ্ণের কোন কষ্ট হোক। কথামৃতে ঠাকুর এক জায়গায় বলছেন, যেটা পরের দিকে ভক্তিশাস্ত্র গুলিতে যোগ হয়েছে, শ্রীকৃষ্ণ জঙ্গলে যাচ্ছেন, তাঁর কোমল পায়ে কাঁটা বিদ্ধ হয়ে শ্রীকৃষ্ণ যাতে কোন কষ্ট না পান তাই গোপীদের সূক্ষ্ম শরীর শ্রীকৃষ্ণের পায়ের তলায় গিয়ে লুটিয়ে পড়ছে। সূক্ষ্ম শরীর কীভাবে দিতেন আমাদের জানা নেই, কিন্তু এখানে মূল ভাব হল গোপীদের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের ভালোবাসা। গভীর ভালোবাসা এভাবেই চলে।

আমরা এর আগেও আলোচনা করেছি যে ঈশ্বরের সাধনা দুই ভাবে করা হয়। একটা নির্গুণ নিরাকার ঈশ্বরের সাধনা এবং অন্যটি সগুণ সাকার ঈশ্বরের সাধনা। নির্গুণ নিরাকার ঈশ্বরকে তো দেখা যায় না, নির্গুণ নিরাকার ঈশ্বরকে বোধে বোধ করা হয়। কি রকম বোধে বোধ হয়? এই ব্যাপারে শাস্ত্রকাররা খুব ভালো উপমা দেন, মুকাস্বাদনবৎ, বোবাকে মিষ্টি খাইয়ে যদি জিজ্ঞেস করা হয় 'মিষ্টি কেমন লাগল'? বোবা তখন নানা রকম আকার ইঙ্গিতে বোঝাবার চেষ্টা করবে কিন্তু মুখে বলতে পারবে না, সে বোধ করেছে কিন্তু বলতে পারছে না। ঠাকুর যেমন বলছেন, ঘি কেমন খেতে? যে ঘি খেয়েছে সে জানে, যে ঘি খায়নি তাকে কি করে বোঝাবে! কিন্তু সাকার ঈশ্বরের বর্ণনা করা যায়। বর্ণনা করা যায় ঠিকই কিন্তু ইতি করা যায় না। শ্রীকৃষ্ণের যত লীলা সবই যে ভাবরাজ্যের ব্যাপার তা নয়। এর মধ্যেও বাস্তবিকতা আছে। পার্ষদ রূপে ঠাকুরের সঙ্গে যাঁরা যাঁরা এসেছিলেন, ঠাকুর তাঁদের সম্বন্ধে অনেক কিছু বলেছেন, ঠাকুরকে কেন্দ্র করে তাঁদের জীবনে অনেক কিছু হয়েছে। এখন যদি আমরা বলি এগুলো সব ভাবরাজ্যের ব্যাপার, কিন্ত তা একেবারেই নয়, এর মধ্যে সত্যও আছে। যেমন ঠাকুর বলছেন নরেনকে তিনি সপ্তর্ষি মণ্ডল থেকে এনেছেন। যাঁদের বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, ভাগবত পড়া আছে তাঁরা যখন কথামৃত পড়বেন তাঁরাও দেখে অবাক হয়ে যাবেন যে, পুরো উপনিষদ, গীতা, বেদান্তে যা কিছু আছে তার সবই কথামৃতে আছে। সেই কথামৃতের যিনি কথামৃতকার, শ্রী মহেন্দ্র নাথ গুপ্ত, সবাই যাঁকে মাস্টারমশাই বলে জানতেন, তাঁর সাংসারিক জীবন ছিল পুরোপুরি বিধ্বস্ত। স্ত্রী পাগল, সাধারণ একটা স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। সংসারের জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে তিনি আত্মহত্যা করতে দক্ষিণেশ্বরে এসেছিলেন। সেখান থেকে ঠাকুরের সঙ্গে যোগাযোগ হয়ে গেল। আর সেই অবস্থা থেকে তিনি কথামৃত লিপিবদ্ধ করেছেন।

কথামৃত সত্যি সত্যিই অমৃত, *তব কথামৃতং*, তাঁর কথা পান করলে মানুষ অমৃত হয়ে যায়। বেলুড় মঠের আগেকার বড় বড় সাধুরা যে বলে গেছেন বেদ, বেদান্ত, পুরাণ, ইতিহাস যাবতীয় যা কিছু আছে, সব কিছুকে নিয়ে যে সার কথাগুলো হয়, ঠাকুর সেই সারটুকু বলে গেছেন। সেইজন্য যতক্ষণ কারুর শাস্ত্র অধ্যয়ন না করা থাকে, যতক্ষণ বাইবেল, কোরান কি বলছে ধারণা না থাকে ততক্ষণ কথামৃতের বক্তব্য উদ্ধার করা সম্ভব নয়। চলতে ফিরতে কথামৃতের কিছু কথার উদ্ধৃতি দিয়ে কেউ বাহাবা কুড়িয়ে নিতে পারবে কিন্তু ধারণা করতে গেলে পুরো হিন্দু ধর্মের সাথে সাথে অন্যান্য ধর্ম কি বলতে চাইছে আগে জেনে নিতে হবে। মাস্টারমশাই যে কাজ করে গেছেন, এই কাজ স্বামীজী, রাজা মহারাজ, মহাপুরুষ মহারাজ কেউই করতে পারেননি। যদি ঠাকুরের কথা কথামৃতে লিপিবদ্ধ না হত তাহলে আজকে আমরা ঠাকুরের ভাবধারা যে ভাবে বিশ্বের চারিদিকে প্রসারিত হয়েছে, এই জিনিষ হতো না, বা আমাদের মত কেউ যদি কথামৃত লিপিবদ্ধ করতেন, তাহলে কথামৃত আর গীতাতে কোন তফাৎ থাকতো না, উপনিষদ আর কথামৃতে, পুরাণ আর কথামৃতে কোন তফাৎ থাকতো না। ঠাকুরের কথাগুলোকে কীভাবে আমাদের শাস্ত্রের বক্তব্যের সঙ্গে মেলবন্ধন করতে হয়, কীভাবে আধ্যাত্মিক সত্যগুলোকে সহজ সরল ভাবে বোধগম্য করার মত অভিব্যক্ত করতে হয়, এগুলোই হল কথামৃতের বৈশিষ্ট্য। মাস্টারমশাইর মত একজন সামান্য শিক্ষক, যিনি বিদ্যাসাগরের স্কুলে শিক্ষকতা করতেন, যিনি সংসারের জ্বালায় পর্যুদস্ত, পরিবার থেকে প্রতারিত। মাস্টারমশাইকে যদি আমরা বাস্তবিক রূপে দেখতে যাই, তাহলে তো কলকাতায় এই রকম লোক প্রচুর ছিল। কিন্তু তাঁর মত মানুষ ঠাকুরের কথাকে লিপিবদ্ধ করার মত এই রকম একটা কাজ করলেন, ডাইরিতে নোট করছেন, সেখান থেকে তুলে পুরো জিনিষটাকে আবার নতুন করে সাজালেন, যেখানে ওনার একটু সন্দেহ আছে সেখানে চেপে যাচ্ছেন। এই কাজকে যদি আমরা সাধারণ মনে করি, আর তারপর আমরা ঠাকুরকে ভাব জগতে নিয়ে যেতে চাই, তা কখনই সম্ভব হবে না।

ঠাকুর যখন রাজা মহারাজ, শরৎ মহারাজের নামে, বিভিন্ন জনের নামে বলছেন – আমি তোমাকে অমুকের দলে দেখেছি, আমি তোমাকে চৈতন্যের দলে দেখেছি, আমি তোমাকে যিশু খ্রীষ্টের দলে দেখেছি, তখন কি এগুলো আর ভাব জগতে থাকল? কিসের ভাব জগৎ! কারণ অবতারের সব কিছুই লীলা, ভাব জগৎ বলে হাল্কা করে দেব, তা নয়। রামকথাতে বিষ্ণু বলছেন আমি আসব, তখন ব্রহ্মা সব দেবতাদের বলছেন – আপনারা এখন যান আর ভগবানের কাজে সাহায্য করবার জন্য বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে জন্ম গ্রহণ করুন। এখানে যে একটা কাহিনী নিয়ে আসা হচ্ছে, পুরোপুরি ভাব জগৎ সৃষ্টি করা হচ্ছে, তাও নয়। এর মধ্যে আবার অনেকটা বাস্তবতাও আছে। এই দুটোর যখন মেলবন্ধন হয় তখন বাস্তবিকতাটা অত্যন্ত উচ্চমানের হয়ে যায়। তারপর একজন ঋষি এসে যখন শাস্ত্রের রূপ দিচ্ছেন, তখন উচ্চ আধ্যাত্মিক জগতে যতক্ষণ না পোঁছে যাচ্ছি ততক্ষণ আমার আপনার পক্ষে শাস্ত্রের মূল বক্তব্যকে সঠিক ভাবে ধারণা করা কখনই সম্ভব নয়। তখন মনে হবে, শ্রীকৃষ্ণ চুরি করছেন, অপরের হাড়ি ভাঙছেন। কিন্তু এগুলো একেবারেই নয়। তার থেকেও আর বড় ব্যাপার হল, ভাগবতের একটি দুটি শ্লোকের উপর তখনকার দিনের মহাত্মারা, ঋষিরা যে টীকা দিচ্ছেন, যে ভাষ্য দিচ্ছেন সেগুলোকে যতক্ষণ না চিন্তন মনন করা হবে ততক্ষণ এই জিনিষগুলো বিশ্লেষণ করা অবিশ্বাস্য মনে হবে। এটা কখনই ভাববেন না যে এগুলো কোন কল্পনা, এও কখনই ভাববেন না যে এর সবটাই ভাব জগতের ব্যাপার।

ভাষ্যকার এখানে খুব সুন্দর বলছেন – যখনই ভগবানের লীলা প্রসঙ্গ আসে, তখন সব সময়ই চারটে জিনিষকে মনে রাখতে হয়, (১) ভগবানের লীলাধাম, এখানে যেমন গোকুল, পরে অবশ্য বৃন্দাবনে এসেছিলেন, (২) ভগবানের যাঁরা লীলাসঙ্গী, মানে যাঁদের সঙ্গে তিনি লীলা করছেন, (৩) ভগবানের যে লীলা শরীর, মানে যে শরীরে তিনি লীলা করছেন আর (৪) তাঁর লীলা। এই চারটে জিনিষ – লীলাধাম, লীলাসঙ্গী, লীলা শরীর আর তাঁর লীলা অপ্রাকৃত, মানে প্রকৃতির নিয়মে হয় না। জাগতিক দৃষ্টিতে এই চারটে জিনিষকে বিচার বিশ্লেষণ করলে আমাদের সর্বনাশ হয়ে যাবে, আধ্যাত্মিক সাধনা কোন ভাবেই আর এগোবে না। সেইজন্য অভক্তদের সামনে ভাগবত লীলাপ্রসঙ্গ আলোচনা বা অধ্যয়ন করা একেবারেই অনুচিত। রাসলীলা বর্ণনা করার সময়েও

ঠিক এই কথাই বলা হবে। ঠাকুর, স্বামীজীও বলছেন মন অত্যন্ত পবিত্র না হলে ভগবানের এই সব লীলা প্রসঙ্গ অধ্যয়ন করতে নেই। উপনিষদ যে কাউকে শুনিয়ে দেওয়া যেতে পারে, এবার যে যার নিজের বুদ্ধি মত সাধনা করে সেটাকে সে ধারণা করতে থাকুক। কিন্তু ভাগবত কথা সবাইকে শোনাতে নেই, যাঁদের মধ্যে ঠিক ঠিক শ্রদ্ধা, ভক্তি ও বিশ্বাস আছে তাঁদের ব্যতিরেকে অন্য কাউকে কখনই শোনাতে নেই।

মহাভারত থেকে একটি শ্লোক উদ্ধৃতি করে ভাষ্যকার বলছেন *ন ভূতসঙ্ঘসংস্থানো দেবাস্য পরমাত্মনঃ। যো বেত্তি ভৌতিকং দেহং কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ।। স সর্বস্মাদ্ বহিষ্কার্যঃ শ্রৌতস্মার্তবিধানতঃ। মুখং তস্যাবলোক্যাপি সচৈলঃ স্নানমাচরেৎ।।* ভগবানের শরীর এই ভূত সমুদয় দিয়ে নির্মিত হয় না, মানে অন্যান্য মানুষের শরীর যেমন পঞ্চভূত দিয়ে তৈরী হয়, ভগবানের শরীর সেভাবে তৈরী হয় না। মহাভারত বলে দিচ্ছে, যে মানুষ শ্রীকৃষ্ণের শরীরকে ভৌতিক শরীর বলে মনে করবে তাকে সমস্ত রকমের শ্রৌত ও স্মার্ত কর্ম থেকে, মানে বেদে যে সকল যজ্ঞের কথা বলা হয়েছে, সেই সকল ক্রিয়া থেকে বার করে দেওয়া উচিৎ। আর এই রকম লোককে দিয়ে কোন ধরণের শাস্ত্রীয় কর্ম করাতে নেই। আর যদি কোন কারণে এই ধরণের লোকের মুখদর্শন হয়ে যায় তাহলে সবস্ত্র স্নান করতে হবে। ধরুন একজন বলছে শ্রীকৃষ্ণ মানুষ, শ্রীরামকৃষ্ণ মানুষ, এই ধরণের কোন লোকের সঙ্গে যদি দেখা হয়ে যায় তাহলে তাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। কি প্রায়শ্চিত্ত করতে বলছেন? যে জামা প্যান্ট পড়ে আছে, ঐ শুদ্ধু তাকে গঙ্গায় ডুব মারতে হবে, শীতের সময় হলে কোট-প্যান্ট সমেত স্নান করতে হবে। সেইজন্য আগেকার লোকেরা কোট-প্যান্ট পড়ত না, কারণ কখন কোন অভক্ত লোকের মুখদর্শন হয়ে যাবে আর সবস্ত্র স্নান করতে হবে। বেশীর ভাগ সময় খালি গায় অথবা ধুতি পড়ে থাকত। কখন সবস্ত্র স্নান করতে হবে ঠিক থাকত না।

ভাগবতের উপর যত টীকা ও ভাষ্য লেখা হয়েছে শুধু এগুলোকেই যদি কেউ অধ্যয়ন করতে থাকে তার সারা জীবন কেটে যাবে। ভাষ্যকাররা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গোপীদের ভালোবাসার ব্যাখ্যা করে এক জায়গায় যেমন বলছেন – শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের বলছেন তোমরা আমাকে যে ভালোবেসেছ তোমাদের এই ভালোবাসার মধ্যে কোন কপটতা নেই, কোন কামনা নেই, তোমরা সব রকম বাঁধন ছিন্ন করে আমাকে এই ভাবে নিষ্কপট, নিষ্কাম ভালোবাসা দিয়ে এসেছ। আমি এই প্রেমের প্রতিদানে কোন কিছুই দিয়ে তোমাদের ভালোবাসার ঋণ শোধ করতে পারবো না। আমি তোমাদের কাছে চিরদিন ঋণী হয়েই থাকব। তোমাদের এই ভালোবাসার ঋণ যদি আমাকে শোধ করতে হয় আমাকে তাহলে অনন্ত কাল শরীর ধারণ করে তোমাদের প্রেম দিয়ে যেতে হবে, যেটা আমি কোন দিনই পারবো না। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কি গভীর, অকপট ভালোবাসা গোপীদের ছিল সাধারণ জীবের পক্ষে ধারণা করা কোন দিন সম্ভব হবে না। শ্রীরামকৃষ্ণের যে ব্যাকুলতা, কীর্তনের সময়ে ঠাকুর যে সমাধিতে চলে যেতেন সেখানেও ঈশ্বরের প্রতি এই ধরণের ভালোবাসা না থাকলে এমনটি কখনই হবে না। যদিও অন্য ভাবে নিয়েছিলেন, গান্ধীজীর জীবনেও এই ভালোবাসা দেখা যায়, যত দুঃখ-কষ্টই হোক না কেন তিনি তাঁর অহিংসা, সত্য থেকে কখনই নড়তেন না। ইসলাম সম্প্রদায়ে হজরত মহম্মদ সব সময় আল্লার কাছে প্রার্থনা করতেন, তিনি সব সময় চেষ্টা করতেন যেন আল্লার প্রতি শুধু প্রার্থনা নিয়েই থাকেন। আলির সাথে মহম্মদের মেয়ে ফতিমার বিয়ে হয়েছে। ফতিমাদের আর্থিক অবস্থা খুব একটা ভালো ছিল না। মহম্মদ তখন মদিনাতে আছেন। সেখানে মহম্মদকে একদিন খুব দুঃখ করে ফতিমা বলছে 'বাবা! আমার দুঃখ-কষ্টের কথা তো তুমি সব জান, আমি এখন কি করি বল'। মহম্মদ তখন খুব মিষ্টি করে বলছেন 'মা! আল্লার কাছে তুমি প্রার্থনা কর, তাতেও যদি না হয় তাহলে আরও প্রার্থনা কর, আল্লার ভজনা করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই'। এই হচ্ছে আল্লার প্রতি ভালোবাসা, আল্লাকে ভালোবাসার বাইরে আর কিছু নেই। এখানেও শ্রীকৃষ্ণ ঠিক একই কথা বলছেন – তোমরা আমাকে যে ভালোবাসা দিয়েছ, তোমাদের যখন মন্দ হয়েছে তখনও তোমরা আমাকে ভালোবেসে গেছ, তোমাদের যখন ভালো হয়েছে তখনও আমাকে ভালোবেসেছ। এই ভালোবাসাই দৈবী ভালোবাসা, তাই শ্রীকৃষ্ণের ছোটবেলার নানা রকমের দুষ্টুমি মিশ্রিত লীলাকে সাধারণ বাচ্চার দুষ্টুমির সাথে এক করে জাগতিক দৃষ্টিতে কখনই দেখা উচিৎ হবে না। জাগতিক দৃষ্টিতে দেখলে ভাগবত আর পুরাণ থাকবে না,

তখন ভাগবত ভক্তিশাস্ত্র না হয়ে আর দশটা সাধারণ সাহিত্য গ্রন্থ বা কাব্যগ্রন্থ হয়ে যাবে। যাই হোক এরপর একটা খুব নামকরা ঘটনার কথা বলা হচ্ছে, যেটাকে নিয়ে এবার আমরা আলোচনা করতে যাচ্ছি।

শ্রীকৃষ্ণের মাটি খাওয়া ও যশোদার দ্বিতীয়বার শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ দর্শন

এই রকম একটি বাল্য লীলার বর্ণনা করে বলছেন, একদিন দাদা বলরাম আর সব সাঙ্গপাঙ্গরা এসে যশোদার কাছে নালিশ করে বলছে, শ্রীকৃষ্ণ মাটি খেয়েছে। বাচ্চারা মাটি খেয়েই থাকে। মা যশোদা সদা সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গল চিন্তায় ব্যাকুল হয়ে থাকেন। বাচ্চা শ্রীকৃষ্ণ মাটি খেয়েছে শুনেই দৌড়ে এসে বলছে 'হ্যাঁরে! তুই কি কোন দিন একটু সুস্থির হবি না, ভালোভাবে থেকে আমাকে একটুও শান্তিতে থাকতে দিবি না! কেন লুকিয়ে লুকিয়ে তুই মাটি খেতে গেলি? তোর বন্ধুরাই বলছে তুই মাটি খেয়েছিস'। শ্রীকৃষ্ণ মা যশোদাকে বলছেন ***নাহং ভক্ষিবানম্ব সর্বে মিথ্যাভিশংসিনঃ। যদি সত্যগিরস্তর্হি সমক্ষং পশ্য মে মুখম্।।১০/৮/৩৫।*** শ্রীকৃষ্ণের বাললীলার একটা খুব মজার বৈশিষ্ট্য হল শ্রীকৃষ্ণ কখনই দোষ নিজের উপর নেবেন না, সব সময় দোষ অপরের উপর চাপিয়ে দেবেন। এখানেই বাললীলা ভাবরাজ্যে মিশে যাচ্ছে। কোন বাচ্চাই নিজের দোষ কক্ষণ নিজের ঘাড়ে নেবে না। যেখানে হাতে নাতে ধরা পড়ে যায় সেখানে কিছু করার থাকে না, কিন্তু যেখানে একটু বাঁচার সুযোগ পেয়ে যায়, সেখানে কখনই দোষ স্বীকার করে নেবে না, যদি স্বীকার করে নেয় তাহলে বুঝতে হবে বাচ্চার মাথায় কিছু গোলমাল আছে। যাদের মধ্যে এখনও পরিপক্কতা আসেনি, মানসিক শক্তি তৈরী হয়নি, ছেলেমানুষী যায়নি, তারা সব সময় দোষ অপরের উপর চাপিয়ে দেবে। 'আমি এই দোষ করেছি' বলার জন্য প্রচণ্ড মানসিক বল দরকার। মহাপুরুষ ছাড়া অন্য কারুর মধ্যে এই শক্তি হয় না। বাচ্চা ছেলেও কখন মহাপুরুষ হয় না, সেইজন্য তারাও কখনই দোষ স্বীকার করবে না। বাচ্চা যদি দোষ স্বীকার করে তাহলে বুঝতে হবে তার কোন মানসিক সমস্যা আছে, তাকে খুব তাড়াতাড়ি কোন ডাক্তারের কাছে নিয়ে চিকিৎসা করাতে হবে। আর বড় বয়সেও যারা মিথ্যা কথা বলে, তাহলে বুঝতে হবে এখনও সে সত্য কথা বলার শক্তি অর্জন করতে পারেনি। যাই হোক শ্রীকৃষ্ণও সরাসরি মা যশোদাকে বলছে 'আমি তো মাটি খাইনি মা, আমার সব বন্ধুরা এমনকি দাদা বলরামও আমার নামে মিথ্যা কথা বলছে'। সুরদাস শ্রীকৃষ্ণের এইসব লীলাকে এমন পর্যায়ে নিয়ে গেছেন যে আজও ভক্তরা সুরদাসের ভজন গান করে ভক্তিতে আপ্লুত হয়ে যায়। সুরদাস বলছেন শ্রীকৃষ্ণের মুখে একদিন মাখন লাগা অবস্থায় মা যশোদা শ্রীকৃষ্ণকে ধরে ফেলেছেন। এবার শ্রীকৃষ্ণ কি করে বাঁচবে! শ্রীকৃষ্ণ তখন মাকে বলছেন 'মা, আমার সব বন্ধুরা আমারই দুষমন হয়ে গেছে, ওরা জোর করে আমার মুখে মাখন ঘষে দিয়েছে'। এখানেও বন্ধুদের উপর সব দোষ চাপিয়ে বলছেন 'আমি মাটি খাইনি কিন্তু আমার বন্ধুগুলো সব বানিয়ে বানিয়ে তোমার কাছে আমার নামে মিথ্যা বলছে যে আমি মাটি খেয়েছি'।

যশোদ বলছেন ***যদ্যেবং তর্হি ব্যদেহীত্যুক্তঃ স ভগবান্ হরিঃ। ব্যাদত্তাব্যাহতৈশ্বর্যঃ ক্রীড়ামনুজবালকঃ।।১০/৮/৩৬।*** 'তুই বলছিস মাটি খাসনি অথচ তোর বন্ধুরা বলছে মাটি খেয়েছিস, তোর মুখটা হাঁ কর দেখি মাটি খেয়েছিস কি খাসনি'। শ্রীকৃষ্ণ তখন মুখ হাঁ করে মা যশোদাকে দেখাচ্ছেন। ভগবান তো আর মানুষ নন, লীলার জন্য তিনি এই মানব শরীর ধারণ করেছেন। ভগবানের বাহির ভেতর বলে কিছু হয় না। এগুলো কি করে আমরা বুঝবো? যেমন এখানে পৃথিবী, পৃথিবীর মধ্যে ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষের মধ্যে মথুরা, মথুরার মধ্যে ছোট্ট একটা জায়গা বৃন্দাবন, সেই বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ, তার মানে পুরো বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড শ্রীকৃষ্ণের বাইরে। কিন্তু মুখ হাঁ করতেই যশোদা দেখছেন ***সা তত্র দদৃশে বিশ্বং জগৎ স্থাস্নু চ খং দিশঃ। সাদ্রিদ্বীপাব্ধিভূগোলং সবায়ুগ্নীন্দুতারকম্।। জ্যোতিশ্চক্রং জলং তেজো নভস্বান্ বিয়দেব চ। বৈকারিকাণীন্দ্রিয়াণি মনো মাত্রা গুণাস্ত্রয়ঃ।।১০/৮/৩৭-৩৮।*** শ্রীকৃষ্ণের মুখের মধ্যেই চরাচর সমগ্র জগতকে বিদ্যমান দেখতে পেলেন। মহাকাশ, দিক্ সকল, পাহাড়, দ্বীপ, সমুদ্র নিয়ে যে পৃথিবী, গতিশীল বায়ু, অগ্নি, নক্ষত্রাদির জ্যোতিশ্চক্র, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ অর্থাৎ পঞ্চতত্ত্বকে দেখছেন। অহঙ্কারের কার্য, দেবতারা, মন-ইন্দ্রিয়, তন্মাত্রা, তিনটে গুণ সব শ্রীকৃষ্ণের মুখের মধ্যেই অবস্থিত। এই জিনিষ শুধু ভাগবতেই নয় কাক ভুষণ্ডীর ক্ষেত্রেও এই একই ব্যাপার হয়েছিল। হিন্দু ধর্মের এটা খুব প্রচলিত ধারণা যে, ভগবানের বাইরেও যা

ভেতরেও তাই। এর যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করতে হলে আকাশ দিয়ে খুব সহজে বোঝান যায়। এই গ্লাশের ভেতরেও আকাশ গ্লাশের বাইরেও আকাশ। আবার গ্লাশটা যত অনু কণা দিয়ে তৈরী হয়েছে তার ভেতরেও আকাশ, তার বাইরেও আকাশ। তার মানে আকাশই আছে। শুধু তাই নয়, আরও যখন গভীর ভাবে বিশ্লেষণ করা হবে তখন গভীরে যেতে যেতে একটা জায়গায় গিয়ে দেখা যাবে আকাশই এই গ্লাশ হয়েছে। কারণ সব পদার্থের সৃষ্টি আকাশ থেকে। সেইজন্য গ্লাশের ভেতরে বাইরে সর্বত্র আকাশই আছে। আকাশ থেকে আরও সূক্ষ্ম হল মহৎ তত্ত্ব। তাহলে গ্লাশের ভেতরে মহৎ তত্ত্ব, গ্লাশের বাইরেও মহৎ তত্ত্ব। মহৎ তত্ত্ব থেকেও সূক্ষ্ম হল প্রকৃতি, কিন্তু ভগবান হলেন সূক্ষ্মতম। তাহলে গ্লাশের ভেতরে কে আছেন? ভগবান। গ্লাশের বাইরে কে আছেন? ভগবান। তাহলে বৃন্দাবনে কে আবির্ভূত হয়েছেন? ভগবান। আর ওই ভগবানের মধ্যেই সেই বৃন্দাবন। যেমন জল, জল বরফের মত হয়ে গেছে, বরফ হয়ে বাটির মত একটা আকৃতি হয়ে গেছে। বরফের বাটিকে এবার জলে ডুবিয়ে দেওয়া হল। তাহলে বরফের বাটির ভেতরে কি আছে? জল। বাটির বাইরে কি আছে? জল। আর বাটিটা কি দিয়ে তৈরী? বরফ দিয়ে। বরফটা কি? ওটাও জল। সবটাই জল। এবার এই যুক্তিকে বিচার করতে করতে পেছনের দিকে নিয়ে গেলে দেখা যাবে জলটা এসেছে মহৎ তত্ত্ব থেকে, মহৎ তত্ত্ব আবার প্রকৃতি থেকে এসেছে। তাহলে ভেতরে কে আছে? প্রকৃতি। বাইরে কে আছে? প্রকৃতি। ওই জিনিষটাও প্রকৃতি। কিন্তু ভগবান হলেন এই প্রকৃতিরও মালিক। ভগবান শ্রীকৃষ্ণই শেষ কথা। এবার আমরা যদি ভেবে দেখি, মা যশোদা শ্রীকৃষ্ণকে ধরেছেন, যশোদা তো শ্রীকৃষ্ণের শরীরকে ধরেছেন। ওই শরীরটা কোথায় আছে? বৃন্দাবনে আছে। শরীরের ভেতরে কে আছেন? তিনিই আছেন। তার বাইরে কে আছেন? তিনিই আছেন। এই যে মাটি খাওয়ার উপমাকে ঋষিরা ব্যবহার করেছেন এর উদ্দেশ্য হল একটা অত্যন্ত গূঢ় আধ্যাত্মিক সত্যকে আমাদের ভেতরে ঢোকান। সমস্যা হল, আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধি দিয়ে এইসব গূঢ় তত্ত্বকে ধারণা করা অত্যন্ত কঠিন। এইসব কাহিনী আমাদের দেশের লোকেরা বাচ্চা বয়স থেকে শুনে আসছেন, শ্রীকৃষ্ণ মাটি খেলেন, যশোদাকে গিয়ে তাঁর বন্ধুরা নালিশ করতেই যশোদা দৌড়ে এসে শ্রীকৃষ্ণকে বকাঝকা করছেন, শ্রীকৃষ্ণ যথারীতি মাটি খাননি বলছেন। মা যশোদা মানতে চাইছেন না। তখন শ্রীকৃষ্ণ মুখ হাঁ করে দেখিয়ে বলছেন 'কই দেখো, আমি মাটি খেয়েছি কিনা দেখো, এই তো মুখ হাঁ করে দেখাচ্ছি'। মা যশোদা শ্রীকৃষ্ণের মুখের ভেতরে তাকাতেই দেখছেন পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ড শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে। আমাদের কাছে এই কাহিনীর কোন মূল্য নেই। মূল্য হল সেই ঈশ্বরের একটি গূঢ় তত্ত্বের, যিনি ভেতরে তিনিই বাহিরে।

যশোদা যে শ্রীকৃষ্ণের ওই ছোট্ট মুখের ভেতরে পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের চর অচর সব কিছু দেখছেন, ওই ছোট্ট মুখে কি এভাবে দেখা কি সম্ভব? এখানে অযৌক্তিক কিছু নেই, এর পেছনে পুরো একটা যুক্তি কাজ করছে। আমরা যে এই পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দেখছি, এটাকে আমরা কোথায় দেখছি? মনে করছি আমরা বাইরে দেখছি। কিন্তু বাইরে কখনই দেখা হয় না। বাইরের জগতের ছবিটা চোখের মাধ্যমে আমাদের মস্তিস্কে যাচ্ছে, আর ওই ছোট্ট অতটুকু মস্তিস্ক কিন্তু তার মধ্যেই আমরা পুরো জগতের ছবি দেখছি। পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যদি এতটুকু মস্তিস্কের একটা কেন্দ্রে দেখা যেতে পারে তাহলে, মুখের মধ্যে পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে কেন দেখা যাবে না! ভৌতিক ভাবেই দেখা যেতে পারে, শুধু যন্ত্রটা সেই রকম হতে হবে। যেমন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোন ছবি যদি আমাকে দেখানো হয় তখন ছবিতেই আমি পরিষ্কার দেখতে পারছি পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে ছোট্ট দেখাচ্ছে। কিন্তু আমি নিজে যখন জগৎকে দেখছি তখন ছোট্ট দেখছি, তখন বিশাল ব্যাপ্তি নিয়ে দেখছি, তার কারণ মস্তিস্ক যন্ত্র সেভাবেই তৈরী। কিন্তু যা কিছু হওয়ার সব ওই ছোট্ট পর্দাতেই হচ্ছে। তাই যশোদা যা দেখছেন তা তিনি অস্বাভাবিক কিছু দেখছেন না। কাব্যের মাধুর্য এটাই, সৃজনশীলতা যখন হয় তখন এই দুটো জিনিষকে নিয়ে হয়, একটা জিনিষের যেটা সার সেটা অপরিবর্তিত থাকবে, কিন্তু তার উপস্থাপনা বিভিন্ন আঙ্গিকে করা হচ্ছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে আমরা কোথায় দেখছি এই ব্যাপারটা ঋষিরাও জানতেন, মস্তিস্কের ওই ছোট্ট পর্দায় পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে সবাই দেখছে, সেটাই এবার মা যশোদাকে শ্রীকৃষ্ণের মুখের মধ্যে দেখিয়ে দিলেন। অন্য কোন কবি হয়তো তাঁর নখের মধ্যে এক ফোঁটা কালি ফেলে দিয়ে দেখাবেন ওই কালির বিন্দুর মধ্যে সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রতিবিম্বিত হয়ে আছে।

শ্রীকৃষ্ণের মাটি খাওয়ার ব্যাখ্যা

এবারে আবার শ্রীকৃষ্ণ মাটি কেন খেলেন এই নিয়ে আবার অনেক ব্যাখ্যা করা হয়েছে। একটা ব্যাখ্যাতে যেমন বলছেন – ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চিন্তা করলে 'আমার মধ্যে তো কেবল বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণই, কিন্তু আমাকে তো এরপর অনেক রজোগুণাশ্রাতি কাজকর্ম করতে হবে তাই কিছু রজঃ গুণ ধারণ করে নিই। রজ মানে মাটি, রজোগুণ ধারণ করা মানে একটু মাটি খেয়ে নিই'। এগুলো সব ব্যাখ্যা। শ্রীকৃষ্ণকে পরে অনেক অসুর বধ করতে হবে, বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ দিয়ে তো অসুর নিধন করা যাবে না, তাই একটু রজোগুণ ধারণ করে সত্ত্বগুণকে একটু দমিয়ে রাখা হল। আবার একটা ব্যাখ্যাতে বলছেন – পৃথিবীর একটা নাম ক্ষমা। শ্রীকৃষ্ণ ভাবলেন, এই গোপাল বালকদের সাথে আমাকে সহজ ভাব ধারণ করে খেলা করতে হচ্ছে, খেলা করতে গিয়ে এরাও আমার সাথে অনেক অপমানজনক শিশুসুলভ আচরণ করে ফেলবে। এই সরলমতি বালকরা তো আমার স্বরূপ জানে না, তাই এদের যাতে কোন পাপ না লাগে আমাকে সেইজন্য ক্ষমা ভাবটা ধারণ করতে হবে। ক্ষমা ভাব ধারণ করার জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মাটি খেয়ে নিলেন। এগুলো 'ভগবান কেন মাটি খেলেন' তারই পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যাখ্যা। আরে ভাই বাচ্চারা তো কত কিছুই মুখে দিয়ে দেয়, আর বাচ্চারা মাটি খেতে ভালোও বাসে। কিন্তু পণ্ডিতরা বলবেন, ভগবান যখন মাটি খেয়েছেন তখন এর একটা বিশেষ তাৎপর্য থাকতে হবে।

আসলে এগুলোই হল ঠিক ঠিক লীলাচিন্তন। আমাদের পারিপার্শ্বিক যা কিছু হচ্ছে সব কিছুকেই এই লীলাচিন্তনের সাথে সংযোগ করে দেখতে হবে। পরিবারের একটা বাচ্চা ছেলে যা যা করতে পারে, সেগুলোকে নিয়েই সুরদাস শত শত পদ রচনা করে গেছেন। যেমন সুরদাসজী একটা পদে ঠিক এই কথাই বলছেন – *প্রথম করী হবি মাখন-চোরী। গ্বালিনি মন ইচ্ছা করি পূরন, আপু ভজে ব্রজ খোরী।। মনমেঁ য়হৈ বিচার করত হরি, ব্রজ ঘর-ঘর সব জাউঁ। গোকুল জনম লিয়ৌ সুখ কারন, সবকৈঁ মাখন খাউঁ।। বালরূপ জসুমতি মোহি জানৈ, গোপিনি মিলি সুখ ভোগ। সূরদাস প্রভু কহত প্রেম সৌঁ, য়ে মেরে ব্রজ লোগ।।* ব্রজবুলিতে সুরদাস বলছেন নিজের পরিজন ব্রজবাসিদের সুখ দেওয়ার জন্যই ভগবান গোকুলে এসেছিলেন। মাখন তো পিতা নন্দের গৃহেও কিছু কম থাকতো না, কারণ তাঁরও প্রচুর গাভী ছিল, যত খুশী তিনি খেতে বা বিলিয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা না করে সকল ব্রজবাসীরই তিনি ছিলেন নিজের জন, তিনি সবারই হৃদয়ের মাণিকরাজ, সবাইকে তাই সুখী করার জন্য সবারই ঘরে গিয়ে মাখন চুরি করে তাদের আনন্দ দিতেন। গোপীদের মনোবাসনা পূর্ণ করার জন্যই তাঁদের ঘরে যেতেন। বস্তুত এ ব্যাপারটা চুরিই নয়, এটাই ভগবান-কর্তৃক গোপীদের পূজা স্বীকার, কারণ ভক্তবৎসল ভক্তের পূজা গ্রহণ না করে থাকতে পারেন না। আবার যখন সুরদাস বলছেন – *আজ ময় গাই চরানে জায়োঁ*। আমি আজকে গরু চরাতে যাব। বাচ্চারা এগুলো শুনে শুনে তাদের মাথায় একটা ইচ্ছা ঢুকে যাবে – একটা গরু চরাতে গেলে হয়। একটা গরুকে দেখে মনে হবে শ্রীকৃষ্ণ গরু চরাতেন, আমিও যেন গরু চরাচ্ছি। এই ভাবটুকু নিয়ে আসাই এই ধরণের রচনার উদ্দেশ্য।

দ্বিতীয় হল, বাললীলা মানেই ঈশ্বরকে বাৎসল্য ভাবে সাধনা। সুরদাস শৃঙ্গার লীলাটা শেষ করে যেতে পারেননি বলে শৃঙ্গার রসের বর্ণনা বাৎসল্য রসের মত সম্পূর্ণ আকারে পাওয়া যায় না। ভাগবতের এই দুটিই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মূল লীলা – একটি বাললীলা, ভগবানের প্রতি বাৎসল্য ভাব নিয়ে সাধনা আর দ্বিতীয় শৃঙ্গারলীলা, যা কিনা সম্পূর্ণ ব্রজগোপি আর শ্রীকৃষ্ণকে মাধ্যম করে দেখানো হয়েছে মধুর ভাবে কীভাবে সাধনা করতে হয়। এর পরের যে লীলা কাহিনী সেগুলো অন্যান্য অনেক গ্রন্থে পাওয়া যাবে, কিন্তু এই দুটি, বাৎসল্য রস আর শৃঙ্গার রস ভাগবত ছাড়া আর কোথাও পাওয়া যাবে না। সন্ত তুলসীদাসজী এত বড় কবি ছিলেন কিন্তু তিনিও রামচরিতমানসে ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের বাললীলার মত শ্রীরামচন্দ্রের বাললীলাকে সেই জায়গায় নিয়ে যেতে পারেননি। ভাগবতের বাৎসল্য রস আর শৃঙ্গার রসের উপর আধার করে ভারতে পুরো দুটো দুই শ্রেণীর সাহিত্যই দাঁড়িয়ে গেল। একজন মুনির পক্ষে এভাবে দুটো রসের উপর আধার করে কোন কিছু রচনা করা অসাধারণ প্রতিভার সাথে দৈবী শক্তির মিলন না হলে একেবারেই অসম্ভব। মীরাবাঈয়ের ভজন হল ঠিক ঠিক ভক্তিরসের ভজন। কিন্তু সুরদাসের পদ যেভাবে পাঠক-পাঠিকাকে ভাবরাজ্যে পৌঁছে দেয় ওই রকম আর কোন

রচনা নিয়ে যেতে পারেনি। পণ্ডিতরা আবার এগুলোর আবার এই বিচার সেই বিচার করে ভাবরাজ্যটাকে নষ্ট করে দেন। আবার ভাগবত এত কঠিন শাস্ত্র যে পণ্ডিতরা ব্যাখ্যা না করে দিলে বোঝারও উপায় নেই।

শ্রীকৃষ্ণ কেন মাটি খেলেন এই নিয়ে আরেকটি ব্যাখ্যায় বলছেন – পৃথিবীর সংস্কৃতে আরেকটি নাম রসা। ভগবান ভাবছেন – সব রস তো আস্বাদ করা হয়ে গেছে এবার তাহলে রসার রস আস্বাদন করে দেখি। আবার ভগবান ভাবছেন – এই পৃথিবীর মঙ্গলার্থে এবার আমার অবতরণ, আমি ভূভার হরণ করতে এসেছি। সেইজন্য আমার এই অবদানের জন্য পৃথিবীর তরফ থেকে ব্রাহ্মণদের জন্য দক্ষিণাটা আগেই নিয়ে নিই। এই ভেবে ভগবান দাঁতে একটু মাটি লাগিয়ে নিলেন। আবার বলছেন – ভগবান তাঁর আশ্রিত ভক্তদের এতো ভালোবাসেন যে, সেই ভক্তরা এই ব্রজভূমিত বিচরণ করছেন এই ভেবে তিনি ভক্তদের চরণরজ মুখে তুলে নিয়ে ভক্তদের হৃদয়ে ধারণ করে নিলেন। ইসলাম বা অন্যান্য ধর্মগ্রন্থে ভক্তির উপর খুব জোর দেওয়া হয়েছে কিন্তু ভক্তকে সম্মান দেওয়া, যদিও কিছুটা সুফিদের মধ্যে পাওয়া যায়, সুফিদের ছাড়া অন্য আর কোথাও পাওয়া যাবে না। কিন্তু ভক্তের ঠিক ঠিক সম্মান দেওয়ার ভাবটা প্রথম ভাগবতেই পাওয়া যায়। কথামৃতেও ঠাকুর বলছেন ভক্তের টানে ভগবানকে দৌড়ে আসতে হয়। ব্রজভূমির মাটি মানেই গোপীদের, গোপ বালকদের চরণস্পর্শে রঞ্জিত। বড়দের যখন প্রণাম করা হয় তখন তাঁর চরণধুলিই মাথায় ঠেকানো হয়। শ্রীকৃষ্ণ যেন সেই চরণধুলি মুখে নিয়ে ভক্তকে হৃদয়ে ধারণ করলেন। এইভাবে অনেক রকম ব্যাখ্যা করে শেষে গিয়ে সেই আগের মত বলছেন ছোট শিশুরা স্বভাববশেই মুখে মাটি দিয়ে থাকে। শিশুরা স্বভাববশে মাটি খেয়ে থাকে বললে সাধারণ মানুষ কেন ভাগবত শুনতে যাবে! তখনই মানুষ শুনবে যখন এই সাধারণ জিনিষের মধ্যেই বিশেষ একটা দৈবী ভাবকে নিয়ে ব্যাখ্যা করা হবে। এই ভাবকে অবলম্বন করে যখন ঈশ্বর চিন্তন করবে তখন এই চিন্তন-মনন করতে করতে শ্রোতার মনটা উপরের দিকে উঠে আসবে। এটাই ভাগবতের বৈশিষ্ট্য।

মূল ভাগবতে বলছেন, বাচ্চার ছোট্ট মুখের মধ্যেই মা যশোদা পাহাড় দেখছেন, পঞ্চ তন্মাত্রাগুলো দেখছেন, বুদ্ধি অহঙ্কার সব কিছু দেখছেন। যশোদা তখন ভাবতে শুরু করলেন ***কিং স্বপ্ন এতদুত দেবমায়া কিং বা মদীয়ো বত বুদ্ধিমোহঃ। অথো অমুষ্যৈব মমার্ভকস্য যঃ কশ্চনৌৎপত্তিক আত্মযোগঃ।। ১০/৮/৪০।*** ‘এ আমি কি দেখছি, যা দেখছি এটা কি স্বপ্ন, না কি ভগবান আমার সাথে কোন মায়ার খেলা করছেন, না কি আমার বুদ্ধিতে কোন ভ্রম এসে গেছে’। *অথো অমুষ্যৈব মমার্ভকস্য যঃ কশ্চনৌৎপত্তিক আত্মযোগঃ*, যশোদা ভাবছেন ‘আচ্ছা এমন তো নয় আমার ছেলে শ্রীকৃষ্ণ কোন সহজাত যোগসিদ্ধির দ্বারা আমাকে সিদ্ধাই দেখাচ্ছে। যশোদার চিত্ত পুরো সংশয়াচ্ছন্ন হয়ে গেছে। আবার বলছেন ***অথো যথাবন্ন বিতর্কগোচরং চেতোমনঃকর্মবচোভিরঞ্জসা। যদাশ্রয়ং যেন যতঃ প্রতীয়তে সুদুর্বিভাব্যং প্রণতাস্মি তৎপদম্।।১০/৮/৪১।*** এই যা কিছু দেখছি এর মধ্যে প্রভুর কিছু ব্যাপার আছে, নাহলে কি এই রকম কখন দেখা যেতে পারে? যিনি মন, চিত্ত, কর্ম, বাণী এই সব কিছুর পারে, যিনি অনুমানেরও বিষয় নন আর সারা বিশ্ব যাঁতে প্রতিষ্ঠিত, যিনি এর প্রেরক, যাঁর সত্তা মাত্রেই সব কিছুর প্রতীতি হয়ে থাকে, চিন্তা করে যাঁর স্বরূপের নাগাল পাওয়া যায় না, আমি সেই ভগবানের পরমপদে প্রণতি জানাই। যশোদার এই কথাগুলো ভাগবত এবং অন্যান্য শাস্ত্রেও বারবার বলা হয়, ভগবানকে মন, বুদ্ধি এসব কোন কিছু দিয়ে জানা যায় না।

বিপরীত ধর্মা দিয়ে কোন জিনিষকে মাপা যায় না

কোন জিনিষকে জানতে গেলে সেই জিনিষের স্বধর্মা দিয়েই জানতে হবে, স্বধর্মা না হলে কখনই সেই জিনিষকে জানা যাবে না। যেমন শচীন তেণ্ডুলকার কত বড় ক্রিকেট প্লেয়ার ছিলেন মাপতে হলে কুস্তিগীর দারা সিংকে দিয়ে মাপা যাবে না, শচীন তেণ্ডুলকারকে মাপতে হলে একজন বড় ক্রিকেট প্লেয়ারকে নিয়ে আসতে হবে। তাই যতক্ষণ স্বধর্মী না হয় ততক্ষণ একটা জিনিষকে জানা যায় না। আমরা এই জগৎকে কেন জানতে পারছি? আমাদের যে বুদ্ধি আর এই জগৎ, এই দুটো স্বধর্মী। যেমন বলা হয়, শত্রুতা, বন্ধুত্ব, বিবাহ সমানে সমানে করতে হয়। ভগবান চৈতন্য আর ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি সব জড়, আর বিচার হল জড়ের সন্তান – এরা কেউই ভগবানের স্বধর্মী নয়। তাই জড় দিয়ে সচ্চিদানন্দ, যিনি সৎ, চিৎ আর আনন্দ, তাঁকে কি করে জানবে!

সেইজন্য শাস্ত্র বলছে *অবাঙমনসগোচরম্,* অর্থাৎ যে জিনিষকে মন দিয়ে ধরা যায় না তাকে বাণী দিয়ে কীভাবে প্রকাশ করবে! তাই তিনি *অবাঙমনসগোচরম্।* স্বধর্মী ছাড়া স্বধর্মীকে মাপা যায় না। আপনি একজনের কাছ থেকে এক কেজি চিনি এনেছিলেন। সে এসে আপনাকে বলছে 'ভাই! তুমি সেদিন আমার থেকে এক কেজি চিনি নিয়েছিলে, এখন আমাকে তার বদল এক কেজি সোনা দাও'। আপনি কি তাকে এখন এক কেজি সোনা দেবেন? কখনই দেবেন না। কারণ এক কেজি চিনি দিয়ে এক কেজি চিনিরই তুলনা হবে, সোনার তুলনা কখনই হয় না। মন, বুদ্ধি এরা জড় আর জগতও জড়, তাই এক অপরকে জানতে পারে। জড় জড়কে জানতে পারার কথা নয়, কিন্তু পেছনে চৈতন্য সত্তা আছেন বলে জানতে পারছে। চৈতন্যই একমাত্র চৈতন্যকে জানতে পারে। ঈশ্বর/আত্মা/ব্রহ্মকে আত্মরূপে শুধু বোধে বোধ করা হয়। জানা মানে কর্তা আর কর্মের(দ্বিতীয়া) ব্যাপার। কিন্তু আত্মা কর্তাও নন কর্মও নন, তাই আত্মাকে শুধু বোধে বোধ করা হয়। যে কোন জিনিষকে মাপার জন্য, জানার জন্য ওই জিনিষরই স্বধর্মী বস্তু দরকার। সোনাকে সোনা দিয়েই মাপা যাবে, জড়কে জড় দিয়েই বুঝতে হবে, চৈতন্য চৈতন্যকেই বুঝতে পারবে। মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, অহঙ্কার এগুলো সব জড়। জড় জড়কে জানতে পারে বলে, এই বোতল, গ্লাশ এবং সবাই কে আমরা জানতে পারছি, আমি আপনাকেও জানতে পারছি। কিন্তু আমার আসল আমিকে জানতে পারছি না। ছেলে আর মেয়ের সঙ্গে যখন ঝগড়া হয় তখন একজন আরেকজনকে বলে 'তুমি আমাকে চিনতে পারলে না'! স্ত্রী স্বামীকে বলে 'এতদিন আমার সঙ্গে থেকে তুমি একটুও আমাকে বুঝতে পারলে না'। আমি আমাকে, আপনি আমাকে, আমি নিজেকে, আপনি নিজেকে কি কোন দিন জানতে পারা যায়? কোন দিন জানতে পারা যায় না, জানা সম্ভবই না। কারণ আমি তো আর চোখ কান নই, আমি আপনি হলাম আত্মা। অপরকে ঠিক ঠিক জানতে হলে আত্মরূপে জানতে হবে, কিন্তু আমি তো নিজেকেই জানি না, অপরকে কি করে জানতে পারব! যিনি নিজেকে আত্মা রূপে জানতে পেরেছেন তিনিই একমাত্র অপরকে জানতে পারেন। কিন্তু মন বুদ্ধি রূপে আমরা সবাই সবাইকে জানতে পারছি। মন-বুদ্ধি রূপে আমিও যা আপনিও তাই, সবাইও তাই। কারুর সাথে কারুর কোন পার্থক্য নেই, কিন্তু সবাই ভাবে আমি সবার থেকে আলাদা, এটাই আশ্চর্যের। পারমার্থিক দিক থেকে যখন দেখা হয় তখন সত্যিই কেউ কাউকে বুঝতে পারে না। তার কারণ, আমাদের আসল স্বভাব হল আত্মা। ওই আত্মা যখন বুদ্ধি দিয়ে প্রতিভাসিত হন, তখনই সেটা চৈতন্যের আলো রূপে দেখায়। বুদ্ধি দিয়ে প্রতিভাসিত হয় বলে আমার আপনার বুদ্ধি ক্রমাগত পাল্টাতে থাকে। সেইজন্য কেউ কখন একভাবে স্থিতিশীল থাকতে পারে না।

স্থিতিশীলতা ও জড়ত্ব সমার্থক

যে মানুষের মধ্যে সব কিছু স্থিতিশীল হয়ে গেছে বুঝতে হবে সেই মানুষ জড় হয়ে গেছে। যার পেছনে চৈতন্য সত্তা আছে সেই অনবরত পাল্টাতে থাকবে। যেমন যেমন তার বুদ্ধি পরিষ্কার হবে, তেমন তেমন তার আত্মার আলো বিকশিত হতে থাকবে, তখন তাকে অন্য রকম দেখাবে। যদি কেউ একই জায়গায় বছরের পর বছর পড়ে আছে, কোন পরিবর্তন নেই, তাহলে বুঝতে হবে তার মধ্যে আত্মার কোন বিকাশ হচ্ছে না। পাথরও তো কত যুগ ধরে একই জায়গায় পড়ে থাকে। আমাদের মন বুদ্ধি যদি উৎকর্ষতার দিকে অগ্রসর না হয়ে একই ভাবে একই জায়গায় স্থবির হয়ে পড়ে থাকে তাহলে পাথর আর মানুষের মধ্যে কোন পার্থক্যই থাকবে না। আমাদের মধ্যে এমন কাউকেও পাওয়া যাবে না যার জাগতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে অশান্তি হয়নি, বন্ধুত্বের সম্পর্কে অশান্তি হবে, বন্ধুত্বের সম্পর্কে যদি না হয় স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে অশান্তি হবে, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে না হলে ভাই-বোন, ভাই-ভাই, বোন-বোন সম্পর্কে অশান্তি হবে, বাবা-মা ও সন্তানের সম্পর্কে যে অশান্তি হবে না তা নয়, কিন্তু বাবা-মায়ের দিক থেকে না হলেও সন্তানের দিক থেকে বাবা-মার সাথে অশান্তি হবে, যত সম্পর্ক আছে সব সম্পর্কের মধ্যে কিছু না কিছু অশান্তি সবারই জীবনে হবে। এর কারণ কি? দুজনের যখন বন্ধুত্ব হয়েছিল তখন দুজন একই রকম ছিল, বন্ধুত্ব হওয়ার পর দুজনই উন্নত হয়েছে। দুজনে যদি একই লাইনে উন্নত হয়ে থাকে তাহলে বন্ধুত্বের সম্পর্কটা আরও দৃঢ় হবে। উন্নতিতে যদি বৈষম্য থাকে তাহলে বন্ধুত্ব আর বেশী দিন টিকতে পারবে না। একদিন এসে একজন আরেকজনকে বলবে 'তুই কেমন আগের থেকে পাল্টে গেছিস'। আপনার একদিন মনে হবে, 'আমার বাড়ির লোকগুলো কেমন বোকা, আমার আশেপাশের

লোকগুলো কি বোকা!' ওরা একটুও বোকা নয়। আপনার আশেপাশের লোকেরা এই রকমই ছিল, আপনিও এই রকমই ছিলেন, এই কয়েক দিনে আপনি এদের থেকে উপরে উঠে এসেছেন, যার ফলে সব্বাইকে এখন আলাদা দেখাচ্ছে। আপনার দৃষ্টিতে তারা আলাদা হয়ে গেছে, আবার তাদের দৃষ্টিতে আপনি আলাদা হয়ে গেছেন। যত বেশী পরিবর্তন হবে তত আপনার পক্ষে মঙ্গলজনক। তার মানে, আপনার মন বুদ্ধির উৎকর্ষতা বাড়ছে। এগুলো আমরা আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি কি নিয়ে বলছি, বুদ্ধিবৃত্তিতে যদি উৎকর্ষতা না আসে তাহলে বুঝতে হবে কোথাও কিছু গোলমাল আছে। কেউ যদি আমাকে বলে 'আপনাকে দশ বছর আগে যা দেখেছিলাম এখনও ঠিক সেই রকমই আছেন'। তার মানে আমি একটা জড়। এই দশ বছরে আমার মধ্যে যদি কোন পরিবর্তন না হয়ে থাকে তাহলে তো আমি গরু মোষের মত হয়ে গেলাম।

জগৎ শব্দ এসেছে গম্ ধাতু থেকে, গম্ মানে যাওয়া আর সংসার শব্দ এসেছে সৃপ্ ধাতু থেকে, সৃপ্ মানে সরে সরে যাওয়া। দুটোর অর্থই যাওয়া, অর্থাৎ এই জগতে কোন কিছুই স্থির নয়। স্থির নয় মানে, হয় আমি এগোচ্ছি তা নাহলে পেছোচ্ছি। আমি এগোচ্ছি কিনা যদি নিশ্চিত না হই, তাহলে এটা নিশ্চিত যে আমি পেছোচ্ছি। সমস্যা হল সমাজে পরিবারে আমাদের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সবাই পেছোচ্ছে। প্রথমে স্কুল কলেজে খুব জোর এগোতে থাকে, কারণ তখন নতুন নতুন চিন্তা-ভাবনা ভেতরে আসতে থাকে বলে বুদ্ধিবৃত্তিও খুব দ্রুত evolve করতে থাকে। তারপর ডিগ্রী পেয়ে চাকরি করতে করতে বিয়ে করে সংসারে ঢুকে পড়ল, দু-চারটে বাচ্চা হয়ে গেল। এবারে তার পেছনের দিকে ব্যাক মারা শুরু হবে। পিছিয়ে যাওয়ার ধসটা সবার এক সঙ্গে নামছে, ফলে কেউ কাউকে কিছু বুঝতে পারে না। এখন মাঝখান থেকে আপনি শাস্ত্র অধ্যয়ন করা শুরু করেছেন, শাস্ত্র অধ্যয়ন করে আপনার চিন্তাধারার মধ্যে পরিবর্তন আসছে, বাড়ির লোক, বন্ধুরা আপনাকে বলবে – তোমার চিন্তা-ভাবনা গুলো কেমন পাল্টে গেছে। এগুলো কেন হয়? বুদ্ধিবৃত্তির জন্য। সচ্চিদানন্দ বা চৈতন্যে কোন পরিবর্তন নেই। কিন্তু চৈতন্যের সত্তা এত শক্তিশালী যে, বুদ্ধিবৃত্তিতে সামান্য যদি পরিবর্তন হয় চৈতন্যের প্রকাশ সম্পূর্ণ ভাবে পাল্টে যাবে। এই পাল্টে যাওয়াটা আমাদের কল্পনার বাইরে। কোন মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির শতাংশও নয় সামান্য অংশও যদি evolve করে তাহলে চৈতন্য সত্তার প্রকাশ অন্য ভাবে আসতে শুরু হবে, তার দিকে তাকিয়ে সবাই অবাক হয়ে যাবে। গ্যাস সিলিণ্ডারে প্রচণ্ড প্রেসারে গ্যাস ভরা থাকে, নবে সামান্য একটু চাপ পড়লেই কি প্রচণ্ড গতিতে হিস্ হিস্ শব্দ করে গ্যাস বেরোতে থাকবে কল্পনা করা যায় না। এই ঘরের দেওয়ালে যদি একটা সামান্য ছেঁদা করে দেওয়া হয়, আমরা বুঝতেও পারবো না, ঘরের ভেতরে যা বাতাস, বাইরেও সেই বাতাস। চৈতন্য সত্তা এত শক্তি সম্পন্ন যে একটু যদি বুদ্ধিবৃত্তি evolve করে তাতেই তার চোখ মুখ দিয়ে চৈতন্যের প্রকাশ ফেটে বেরিয়ে আসবে।

এখানে সেটাই যশোদা বলছেন 'ভগবান মন বাণীর পারে। শুধু তাই না, তিনি আছেন বলে মন বাণী এরা কাজ করছে। আমি সেই ভগবানের পরমপদে প্রণাম করি'। যশোদা এখন শ্রীকৃষ্ণকে মনে করছেন ভগবান। কিন্তু যশোদার সমস্যা হল, এই মুহূর্তে শ্রীকৃষ্ণকে মনে করছেন ঈশ্বর কিন্তু পর মুহূর্তেই দেখছেন নিজের আদরের দুলাল সন্তান রূপে। দক্ষিণেশ্বরে যখন হলধারী নাকে নস্যি নিয়ে অধ্যাত্ম রামায়ণ, ভাগবতাদির ব্যাখ্যা করতে বসতেন তখন ঠাকুর হলধারীকে বলতেন 'ওগো! আমার ভেতরে এই সব ভাব হয়ে গেছে'। হলধারী তখন খুব গালাগাল দিয়ে বলতেন 'তোর মত অপদার্থের মধ্যে এই সব ভাব কি করে হবে! সেই তুই আবার নিজেকে অবতার মনে করছিস'। তারপর ঠাকুর পুরো ভাবাবস্থায় হলধারীর ঘাড়ের উপর চেপে বলতেন 'তবে রে শালা, তুই মানবি না!' হলধারী যখন বলতেন 'আমি মানছি' তখন ঠাকুর তাঁকে ছাড়তেন। হলধারীর সাথে ঠাকুরের এই ঘটনা অনেকবার হয়েছিল। কিন্তু তারপরেই আবার যখন নাকি নস্যি নিয়ে শাস্ত্র পড়তে বসতেন ঠাকুরকে বলতেন 'তুই হলি গদাই, তুই কিনা আবার নিজেকে অবতার মনে করিস!' কিন্তু যেমনি ঠাকুর ভাবের অবস্থায় চলে যেতেন তখন আবার হলধারী একেবারে নিশ্চিত করে বলছে 'আমি স্থির বুঝে নিয়েছি তুই ভগবান, আমার কোন সন্দেহ নেই'। লীলাপ্রসঙ্গে ঠাকুর আর হলধারীকে নিয়ে এই রকম খুব সুন্দর বর্ণনা আছে। শুধু হলধারী নয়, এই সংশয় সবারই হবে। কাদের হবে? যারা সাধারণ আধার। যখন যশোদার ভাব উপরে চলে যাচ্ছে তখন শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান দেখছেন, আবার যখন সাধারণ অবস্থায় নেমে

আসছেন তখন আবার শ্রীকৃষ্ণকে একটা বাচ্চা ছেলে রূপে দেখছেন। এগুলো ব্যক্তির ভাবের উপর নির্ভর করে। কারণ যিনি ভগবান তাঁর তো objective reality বলে কিছু নেই। শ্রীকৃষ্ণ কর্তাও নন কর্মও নয়, আজকে শ্রীকৃষ্ণকে সুন্দর দেখাচ্ছে, আজকে শ্রীকৃষ্ণকে ভালো দেখাচ্ছে না, আজকে শ্রীকৃষ্ণ মানুষ, আজকে ভগবান, এইভাবে ভগবানকে বিচার করা যায় না, তিনি যা তিনি তাই। পাল্টাচ্ছে আমার আপনার মন বুদ্ধি। সেইজন্য ঠাকুর বারবার ভাব পাকা করতে বলছেন। নিজের ভাব যদি পাকা না হয়ে থাকে, আর ভগবান যদি সাক্ষাৎ এসে সামনে দাঁড়িয়ে বলেন আমি ভগবান, তখনও সংশয়, সন্দেহ যাবে না।

আগের শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান বলার পরেই পরের শ্লোকেই বলছেন ***ইত্থং বিদিততত্ত্বায়াং গোপিকায়াং স ঈশ্বরঃ। বৈষ্ণবীং ব্যতনোন্মায়াং পুত্রস্নেহময়ীং বিভুঃ।।১০/৮/৪৩।*** যশোদার মধ্যে ঈশ্বর তত্ত্বের জ্ঞানের উদয় হয়ে গেছে, শ্রীকৃষ্ণ যে সাক্ষাত ঈশ্বর এই ব্যাপারে যশোদার কোন সংশয় নেই, কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তখন আবার সেই সর্বশক্তিমান তাঁর শক্তি যোগমায়াকে দিয়ে যশোদার বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে ফেললেন। আবার যশোদার মধ্যে সেই পুত্রস্নেহের উদয় হয়ে গেল। এই যাঁকে কিছুক্ষণ আগে ভগবান মনে করছিলেন, পর মুহূর্তেই তাঁকে নিজের সন্তান ভেবে পুত্রস্নেহে কোলে তুলে নিয়ে বুকে জড়িয়ে আদর করতে শুরু করলেন। দেবকীরও একই ব্যাপার হয়েছিল। জন্মের পর দেবকী শ্রীকৃষ্ণকে দেখছেন চতুর্ভুজ মুর্তিতে, তিনি প্রণাম করলেন, স্তুতি করলেন, সব করার পর আবার মায়ায় প্রভাবে পুত্রস্নেহে ডুবে গেলেন। রামকথাতেও শ্রীরামচন্দ্র যখন জন্ম নিয়েছেন কৌশল্যাকে এই একই রূপে দর্শন দিয়েছেন, দর্শন দিয়েই যোগমায়ার সাহায্যে কৌশল্যার হৃদয়কে ঢেকে দিলেন। অবতারের প্রতি ঈশ্বরবোধ সব সময় থাকে না। কাদের থাকে? একমাত্র যাঁরা খুব উচ্চমানের সিদ্ধপুরুষ, তাঁদের এই বোধটা সব সময়ের জন্য থেকে যায়, কখনই তাঁদের এই বোধ চলে যাবে না। শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে মা কালীর মুর্তিকে চিন্ময়ী দেখছেন, এটা হবে না যে আজকে চিন্ময়ী দেখছেন আগামীকাল পাথরের মুর্তি দেখবেন। তিনি সব সময় তাঁকে চিন্ময়ীই দেখবেন। যাঁরা সাধনা করে সিদ্ধ হয়ে গেছেন তাঁরা কখন আজকে শ্রীরামকৃষ্ণকে ভগবান দেখবেন আর আগামীকাল মানুষ দেখবেন, এই জিনিষ কখনই হবে না। কিন্তু যাদের কোন সাধনা নেই, কোন কারণে ঈশ্বর যাকে কৃপা করে দিলেন, তারা এই মুহূর্তে ঠাকুরকে ক্ষুদিরামের ব্যাটা গদাধর রূপে দেখবে আবার পর মুহূর্তেই ভগবান রূপে দেখবে।

ত্রয্যা চোপনিষদ্ভিশ্চ সাংখ্যযোগৈশ্চ সাত্বতৈঃ। উপগীয়মানমাহাত্ম্যং হরিং সামন্যতাত্মজম্।। ১০/৮/৪৫। বেদ, উপনিষদ, সাংখ্য, যোগ, ভক্তি সব দর্শনশাস্ত্র আর সমস্ত লোকের ভক্তজন যাঁর মাহাত্ম্য বর্ণনা করে, গান করে করে শেষ করতে পারছেন না, সেই পরমেশ্বর ভগবানকে যশোদা নিজের দুরন্ত শিশুপুত্র রূপেই ধারণা করতে লাগলেন। এই জিনিষ শুধু শ্রীকৃষ্ণ অবতারেই নয়, প্রত্যেক অবতারের ক্ষেত্রে এই একই জিনিষ হয়। বেদ, উপনিষদ কোন শাস্ত্রই ভগবানের ইতি করতে পারে না। কারণ যিনি নির্গুণ নিরাকার তাঁর বর্ণনাই করা যাবে না। তাঁকে বোধে বোধ হয় বলে বর্ণনা করা যাবে না। আবার সগুণ সাকার ভগবানের বর্ণনা করে শেষ করা যায় না। অথচ তাঁকেই আমরা কখন সন্তান রূপে দেখছি, কখন বন্ধু রূপে দেখছি, কখন গুরু রূপে দেখছি, ইষ্ট রূপে দেখছি।

আশা করি আমাদের মনে আছে পরীক্ষিৎ মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করছেন আর তাঁকে শুকদেব ভগবানের স্বরূপ ও লীলার বর্ণনা করে যাচ্ছেন। হঠাৎ পরীক্ষিৎ শুকদেবকে প্রশ্ন করছেন – হে ভগবন্! নন্দবাবা আর যশোদা কি এমন মহাকল্যাণকর তপস্যা করেছিলেন যে স্বয়ং ভগবানের অপার মাধুর্য লীলা আস্বাদন করার সৌভাগ্য তাঁদের হয়েছিল আর ভগবানের যাঁরা জন্মদাতা সেই বসুদেব আর দেবকীর ভগবানের এই লীলা দৃষ্টিগোচর পর্যন্ত হলো না। শুকদেব তখন বলছেন – এর পূর্ব জন্মে নন্দরাজা দ্রোণ নামে একজন শ্রেষ্ঠ বসু ছিলেন। তাঁর পত্নীর নাম ছিল ধরা। ব্রহ্মার আদেশে এনারা দুজনেই খুব তপস্যা করেছিলেন। ব্রহ্মাকে তখন এনারা বলেছিলেন – হে ভগবান! আমরা যখন পৃথিবীতে জন্ম নেব, তখন জগৎপিতা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যেন আমাদের অনন্যা ভক্তি হয়, যে ভক্তির বলে সংসারের লোক অনায়াসে জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে বেরিয়ে আসতে পারে। কিন্তু বসুদেব আর দেবকীরও এমন তপস্যা করা ছিল সেইজন্য ভগবান এমন ব্যবস্থা নিলেন

যার ফলে দুটো পরিবারেই তিনি একই সাথে অবতীর্ণ হয়ে দুটি ভিন্ন প্রকার লীলার আস্বাদন করার সুযোগ করে দিলেন।

উলূখলে শ্রীকৃষ্ণের বন্ধন

নবম অধ্যায় যদিও খুব ছোট্ট একটি অধ্যায়, মাত্র তেইশটি শ্লোক নিয়ে নবম অধ্যায়, কিন্তু এই অধ্যায়ে বেশ কয়েকটি ঈশ্বরীয় ভাবের বর্ণনা পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণ, বিশেষ করে বালকৃষ্ণ যাঁদের ইষ্ট, ভাগবতকে যাঁরা সাধনা রূপে নিয়েছেন, তাদের কাছে নবম অধ্যায় খুব মূল্যবান। এতই মূল্যবান যে, এর ভাব যে স্তরের সেই স্তরে বর্ণনা করা বা বিস্তারে ব্যাখ্যা করা সবার পক্ষে সম্ভব নয়। সাধকের আধ্যাত্মিক উত্থানের বীজ এই নবম অধ্যায়ে রয়েছে। তেইশটি শ্লোকের মধ্যে সাধনার ব্যাপারটা অনেক বেশী করে পাওয়া যায়। কথামৃতে ঠাকুর একটা কাহিনী বলছেন – গ্রামের এক জমিদার ক্ষেতের আলের উপর দিয়ে যাওয়ার সময় পা পিছলে পড়ে যায়। জমিদারের সাথে কয়েকজন মোসায়েব ছিল। পড়ে যাওয়াতে জমিদারের দুশ্চিন্তা হয়েছে, আমার অবস্থা দেখে মোসায়েব গুলো হাসবে। তখন জমিদার বলছে 'আমি যে পড়ে গেলুম, উর একটা মানে আছে'। অনেক সময় আমরা এমন এমন কিছু কাজ করে থাকি যেগুলো অতি সাধারণ, কিংবা অতি ছেলেমানুষি। কিন্তু নিজেকে মহৎ দেখানোর জন্য ওই কাজের পেছনে একটা বিশেষ তাৎপর্য দেখাবার মিথ্যা চেষ্টা করি।

রাশিয়ার বিখ্যাত লেখক লিও টলস্টয়ের ঘরের বাইরে প্রতিদিন একদল জার্নালিস্ট বসে থাকত। টলস্টয় তখন আশি বছরের এক বৃদ্ধ মানুষ। টলস্টয় যা কিছু বলতেন সঙ্গে সঙ্গে জার্নালিস্টরা সব নোট করতে থাকত। টলস্টয়ের মুখ থেকে এক একটি কথা যেটা বেরোত সেটারই দাম লাখ টাকা, সেটাই পরের দিন খবরের কাগজে বেরোত। ওই লাখ টাকার কথার মধ্যে থাকত 'এবার আমি স্নান করতে যাব'। সেটাও জার্নালিস্টরা নোট করছে। বললেন 'আমি একটু জল খাবো', তাও নোট করে যাচ্ছে। টলস্টয়ের এই কথাগুলোর মধ্যে সত্যিই বিশেষ তাৎপর্য আছে কি নেই, নাকি জমিদার বাবুর 'উয়ার একটা মানে আছে'এর মত? কথামৃতেও আছে 'ঠাকুর এবার গাত্রোত্থান করিলেন', এর মধ্যেও কি বিশেষ তাৎপর্য আছে? কথামৃতের সব কথাকেই কি গুরুত্ব দিতে হবে কিনা এই ব্যাপারে পাঠক-পাঠিকাদের কাছেও সমস্যা হয়ে যায়। মাস্টারমশাই যা দেখেছিলেন সেটাই কথামৃতে লিপিবদ্ধ করে দিয়েছেন। কিন্তু সব কিছুতেই যে অবতারের সব কথার বিশেষ অর্থ বার করতে হবে তার কোন মানে নেই। টলস্টয়ের ওই কথাগুলোতেও কোন বিশেষ তাৎপর্য নেই। কিন্তু ভাগবত অধ্যয়ন করার সময় তার প্রত্যেকটি শ্লোক, প্রত্যেকটি ঘটনার বর্ণনার পেছনে কোন বিশেষ তাৎপর্য নাও থাকতে পারে, শুধু মাত্র কাব্যিক বর্ণনা রূপেও হতে পারে, কিন্তু ভাগবতের প্রত্যেকটি শ্লোক, প্রত্যেকটি শব্দ বা বর্ণনাতে ভাবরাজ্য তৈরী হওয়ার প্রচুর সম্ভবনার বীজ লুকিয়ে আছে। যাঁর ভেতরে ভাব যত গভীর ও প্রবল, তিনি ভাগবতের সব কিছুকে তত গভীর ভাবে বিশ্লেষণ করে ভাবরাজ্য তৈরী করে শ্রীকৃষ্ণের চিন্তনে হারিয়ে যেতে সক্ষম হবেন। তাই সাধনা না থাকলে, কৃষ্ণভাবে ভাবিত না হলে ভাগবতের ভাব বোঝা খুব মুশকিল। কৃষ্ণভাবে ভাবিত হয়ে সাধনার রাজ্যে যতক্ষণ প্রবেশ না করবে ততক্ষণ ভাগবতের এক একটি শব্দ, শ্লোকের এক একটি লাইন যে কত মূল্যবান, এর থেকে যে কত গভীর ভাব বেরিয়ে আসতে পারে, ধারণাতেই আসবে না।

ভাগবতের ব্যাখ্যাকাররা যে ভাষ্য দিয়েছেন তাঁরাও সম্পূর্ণ ভাবের ঘরে বসে সব ব্যাখ্যা করে গেছেন। এই ভাবের ঘরকে বুঝতে হলে সেই স্তরে যেতে হবে। কথামৃতে ভাগবতের উপর দুটি ঘটনার কথা ঠাকুর উল্লেখ করছেন। একজন ভাগবত পণ্ডিত রাজাকে ভাগবত শোনাত। শোনাবার পর রোজ রাজাকে পণ্ডিত জিজ্ঞেস করত 'রাজা বুঝেছ', রাজা প্রতিবারেই বলত 'আগে তুমি বোঝা'। রাজা সাধারণ ভাবেই বলছে, এর মধ্যে কোন তাৎপর্য ছিল না। কিন্তু পণ্ডিত মশাই বাড়িতে এসে ভাবতে শুরু করেছেন – রাজা কেন রোজ বলে 'আগে তুমি বোঝ'। একদিন পণ্ডিতের জ্ঞানচক্ষু উন্মিলীত হয়ে গেল, এখন যখনই ভাগবত পড়তে বসছেন তখনই তাঁর দু চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে আসছে। এরপর পণ্ডিত অনেক দিন আর রাজাকে ভাগবত শোনাতে

যাচ্ছেন না। রাজা খবর পাঠিয়েছে। রাজার লোক গিয়ে বলছে 'কি হল, আপনি অনেকদিন ভাগবত শোনাতে আসছেন না?' পণ্ডিত মশাই রাজার লোককে বলে দিলেন 'যাও, রাজাকে বলে দাও এবার আমি ভাগবত বুঝেছি'। একবার একজন পণ্ডিত এক জায়গায় গীতার ব্যাখ্যা করছিলেন। সেখানে পেছনের দিকে দেখেন একজন গেঁয়ো লোক ভাবে বিভোর হয়ে শুধু চোখের জল ফেলে যাচ্ছে। পণ্ডিত তখন তাকে জিজ্ঞেস করছে 'কিগো! তুমি এর সব কিছু বুঝতে পারছো?' গেঁয়ো লোকটি বলছে 'না তো! আমি তো শুধু দেখছি যুদ্ধক্ষেত্র, ঠাকুর রথে বসে অর্জুনকে গীতার উপদেশ দিয়ে যাচ্ছেন। এছাড়া আমি আর কিছু দেখছি না'। কথামৃতে এই ছোট্ট ছোট্ট কাহিনীগুলো ঠাকুর মজা করার জন্য বলছেন না, এই কাহিনীগুলোর ভেতর খুব গভীর তাৎপর্য জড়িয়ে আছে। ঠাকুর বলছেন, শ্রীমতি চারিদিকে শ্রীকৃষ্ণ দেখছেন। বাকিরা বলছে 'কই আমরা তো দেখছি না'। রাধারানী বলছেন 'তোমরা চোখে অনুরাগ রঞ্জন লাগাওনি তাই দেখতে পারছো না'।

উচ্চতম আদর্শ

আমরা যে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার আলোচনা করতে যাচ্ছি, এই বাল্যলীলার ভাবকে ধারণা করার জন্য প্রচুর সাধনার দরকার। রাসলীলা তাও কিছুটা বোঝা যায়, সেই তুলনায় বাল্যলীলা খুব কঠিন। শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা ঠিক ঠিক শুরু হয় উলূখলে শ্রীকৃষ্ণের বন্ধন দিয়ে। প্রথম শ্লোকে শুকদেব কাহিনীর প্রেক্ষাপটকে নিয়ে আসার জন্য একটা নাতিদীর্ঘ বর্ণনা দিচ্ছেন – ***একদা গৃহদাসীষু যশোদা নন্দগেহিনী। কর্মান্তরনিযুক্তাসু নির্মমন্থ স্বয়ং দধি।।১০/৯/১।*** একদিন নন্দরানী যশোদা বাড়ি কাজের মেয়েদের বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত করে নিজের হাতে দধি মন্থন করছিলেন। দধি মন্থন করে মাখন তোলার কাজ খুব একঘেঁয়েমির কাজ, একই জিনিষ বারবার অনেকক্ষণ ধরে করে যেতে হয়। তাঁর আদরের দুলাল শ্রীকৃষ্ণ মাখন খাবে তাই তিনি নিজের হাতে ওই কাজ করে যাচ্ছেন। আগেকার দিনের মহিলারা দধি মন্থন করার সময়, জাঁতাতে গম বা দানা শস্য পেশাই করার সময় গান করতে থাকতেন, যাতে ওই একঘেঁয়েমির ভাবটা না আসে। আমরা সবাই জীবনে প্রচুর একঘেঁয়েমির কাজ করতে বাধ্য হই। মাঝে মাঝে তাই আমাদের বলতে হয়, একই কাজ বারবার করতে করতে বিরক্ত হয়ে গেলাম। এখানে শারীরিক পরিশ্রমের কথা বলা হচ্ছে না। এই যুগে এসে দধি মন্থনও করতে হয় না, মশলা পিষতেও হয় না, গম পেষাইও করতে হয় না। একটু যা রান্না করার আছে সেটাও ফাস্ট ফুড এসে যাওয়াতে বন্ধ হয়ে যাওয়ার অবস্থায় চলে এসেছে। বাড়ির মায়েদের এখন অঢেল সময়, কিন্তু সেই সময়কে তারা কীভাবে, কোন কাজে লাগাবে সেটা তাদের ব্যাপার। কিন্তু আমাদের জীবনে যদি কোন আদর্শ না থাকে তাহলে এই জীবনটা বৃথা চলে যাবে। সেবা হল অত্যন্ত উচ্চমানের আদর্শ। যত যাই করছি সবই আমি ভগবানের সেবা করছি, এই ভাব নিয়ে সব কাজ করলে আমাদের জীবনদর্শনটাই পুরো পাল্টে যাবে। শুধু সেবার আদর্শকে নীরবে নিঃশব্দে অবলম্বন করে কত মানুষের জীবন মহৎ হয়ে গেছে, যাঁদের সবার কথা আমরা জানিনা, জানার কথাও নয়। কিন্তু কিছু কিছু জীবনের কাহিনী যখন আমাদের সামনে চলে আসে তখন সেই মানুষদের কথা চিন্তা করে আমরা অবাক হয়ে যাই।

১৯৮০-৮১ সালে ইরান ইরাকের যুদ্ধের সময়ের একজন ইরানী সৈন্যের উপর সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে এক ফরাসী জার্নালিস্টের খুব সুন্দর একটি বই আছে। তাতে একজন সৈন্যের সাক্ষাৎকার দেওয়া হয়েছে। সাক্ষাৎকার দেওয়ার সময় তার চল্লিশ পয়তাল্লিশ বয়স হয়ে গেছে। জার্নালিস্ট তাকে জিজ্ঞেস করছেন 'আপনি এত কম বয়সে কেন সৈন্য দলে যোগ দিয়েছিলেন? ভদ্রলোক বলছেন 'আমার কাছে একমাত্র একটাই উদ্দেশ্য ছিল, আমি আল্লার কাজে নামছি'। ওকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে 'আপনার বিশেষ অনুভব ও অভিজ্ঞতার কথা বলুন'। তখন ভদ্রলোক নিজের অনুভূতির কথা বলতে গিয়ে বলছেন 'আমি কাউকে বিশেষ কিছু বলতাম না, যখন যা আদেশ হত তাই নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে যেতাম। কিন্তু সেই সময় অনেক রকম স্বপ্ন দেখতাম। স্বপ্ন যেটা দেখলাম পরে দেখছি সেটাই বাস্তবে ঘটে যাচ্ছে। যেমন একদিন স্বপ্নে দেখলাম আমার সামনে একটা ব্যাগ পড়ে আছে, যেমনি ব্যাগটা তুলতে গেছি সেটা বুম্ করে ফেটে গেল। পরের দিন আমি যখন ব্যারাকে ফিরছি তখন দেখি ব্যারাকের গেটের কাছে একটা ব্যাগ রাখা আছে। আমি ওটা তুলতে যাচ্ছি সেই সময় হঠাৎ

আমার স্বপ্নের কথা মনে পড়ে গেল। তখন আমরা সবাই সাবধান হয়ে গিয়ে ব্যাগটা পরীক্ষা করতেই দেখলাম ওর মধ্যে বিস্ফোরক পদার্থ রাখা আছে, আর তুললেই আমরা সবাই মারা যাব'।

আর অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে তাদেরই সমবয়সী কুড়ি-বাইশ বছরের একটি ছেলের কথা বলছেন। সেই ছেলেটির কোন প্রাণের চিন্তা ছিল না। ওর শুধু একটাই কথা ছিল – আমি আল্লাকে ভালোবাসি, আমি আল্লার কাজ করছি, আমরা সবাই আল্লারই সৃষ্টি, এই ইরাকীরা যারা আমাদের শত্রু, তারাও আল্লার সৃষ্টি। ছেলেটির মধ্যে দুটো জিনিষ – প্রচণ্ড ভালোবাসা আর সেবা। এই দুটি ছাড়া ওর মধ্যে কিছু ছিল না। যাদের সঙ্গে তাকে যুদ্ধ করতে হচ্ছে তাদের প্রতিও তার সমান ভালোবাসা। ওর সেবা কি রকম ছিল বলতে গিয়ে বলছেন – সারাদিন যুদ্ধ করে সবাই খুব ক্লান্ত হয়ে ফিরেছে, ক্লান্ত হয়ে সবাই যে যার জায়গায় এলিয়ে পড়ে আছে। কিন্তু ছেলেটি সেই সময় ব্যারাকে যত সৈন্য ছিল, প্রায় সত্তর-আশি জন, তাদের সবার বুট পালিশ করতে বসে যেত। নিজেও কিন্তু লড়াই করে ফিরেছে। একদিন লড়াই করে ফিরে আসার পর দেখছে ব্যারাকে জলের খুব সঙ্কট হয়েছে। তখন সে ব্যারাক থেকে দু কিলোমিটার দূর থেকে খাবার জল বয়ে নিয়ে এসেছে। ব্যারাকের সব কিছু টিপটপ থাকে, কারণ সব সময় ব্যারাকে ঘুরে ঘুরে বেড়াত আর সব দিকে তার নজর, সব কাজ সুন্দর ভাবে গুছিয়ে করে রাখত। ওর একটাই কথা – আমি আল্লাকে ভালোবাসি, এরা যারা এখানে আছে সবাই আল্লার দূত।

মাঝে মাঝেই ছেলেটি বলত – দ্যাখো! আমি গুলিতে মারা যাব কিন্তু ক্ষেতের নালাতেই মরে পড়ে থাকব। তোমরা তিন দিন ধরে আমাকে খুঁজবে, কিন্তু আমার মৃতদেহ খুঁজে পাবে না। একবার ব্যারাকে একটা সাপ ঢুকে গিয়েছিল। ওদেরই একজন ইরানী সৈন্য সাপটাকে মেরে দিয়েছে। আর তাতেই ছেলেটির কি রাগ, রাগে মারামারি গুঁতোগুতি করতে শুরু করে দিয়েছে 'তোমরা কেন সাপটাকে মারলে, ও আল্লার দূত, ও তোমার কি ক্ষতি করেছিল'! খুব চেঁচামেচি চলছে, সেই সময় খবর এলো ইরাকী সৈন্যরা মেশিনগান নিয়ে আক্রমণ করতে এসে গেছে। সেই ছেলেটি, যে একটা সাপ মারার জন্য অত চেঁচামেচি, ধ্বস্তাধ্বস্তি করল, খবর পাওয়ার সাথে সাথে মেশিনগান নিয়ে বেরিয়ে গেল আর দু ঘন্টা ধরে ইরাকী সৈন্যদের উপর এক নাগাড়ে গুলি চালিয়ে গেল। এক পাল ইরাকী সৈন্যকে খতম করে ব্যারাকে ফিরে আসার পর, যে ভদ্রলোকের ইন্টারভিউ নেওয়া হচ্ছিল, তিনি নিজে ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করলেন 'একটা সাপকে মারার জন্য তুমি সবার সাথে এত চেঁচামেচি, রাগারাগি করলে আর তারপরেই তুমি মেশিনগান দিয়ে এত ইরাকী সৈন্যের বুক ঝাঁঝড়া করে দিলে কি করে?' ছেলেটি তাকে বলছে 'ভাই দেখো, আমি আল্লাকে ভালোবাসি, আল্লার সৃষ্টিকে ভালোবাসি, আমার কাছে সবই আল্লার সৃষ্টি। সাপও আল্লার সৃষ্টি, সে তো কোন ক্ষতি করেনি। এই ইরাকীরা তাদেরও আমি ভালোবাসি, তাদের প্রতি আমার কোন বৈরী ভাব নেই। কিন্তু এরা আমাদের অনেক লোককে মেরেছে, আমাদের মা বোনেদের অনেকের ইজ্জত নষ্ট করেছে, এদেরকে যদি না মারা হয় তাহলে এদের পাপের অনেক বৃদ্ধি হতে থাকবে, আর এদের জন্য আমাদের সবারই অনেক কষ্ট বাড়বে, সেইজন্য আমি এদের মারছি, এরা যেন আর পাপ না করে, বিশ্বাস কর এদের প্রতি আমার কোন দুষমনী নেই'।

ভদ্রলোক সেই জার্নালিস্টকে বলছেন 'কিছু দিন পর ঠিক তাই হল। ইরাকীদের সাথে আমাদের প্রচণ্ড গোলাগুলি চলতে লাগলো। গোলাগুলি কিছুটা কমার পর ওকে আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। সবাই আন্দাজ করে বলছে ওই ক্যানেলের কাছেই হয়তো বম্বিংএ মারা গেছে। তিন দিন ধরে সবাই খুঁজলো, কিন্তু কোথাও ওর শরীরটা পাওয়া গেল না'। এই কাহিনীটা বলার উদ্দেশ্য হল, একটা অল্প বয়সী তরতাজা ইরানী যুবক ইরান-ইরাকের নামকরা যুদ্ধে অংশ নিচ্ছে, কিন্তু ওই যুদ্ধের মধ্যেও সে দেখছে আল্লার প্রতি ভালোবাসা আর সেবা কোন পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া যায়।

সেই ছেলেটিকে ওর সাথী সৈন্যরা বলতে – দেখো, ভালোবাসা খুবই ভালো, তুমি এক কাজ কর, একজনকে তুমি বিয়ে করে নাও। ছেলেটি বলত 'হ্যাঁ, আমি বিয়ে করবো'। সবাই খুব খুশী 'তাহলে তোমার জন্য আমরা মেয়ে খুঁজতে আরম্ভ করে দিই'? 'মেয়ে তো আমার দেখা হয়ে আছে'। 'কি করে ঠিক হয়েছে?'

‘এই মিলিটারি অপারেশনটা হয়ে যেতে দাও, অপারেশনের পরেই আমি বিয়ে করে নেব। এই অপারেশনে আমি মারা যাব, তারপর আমি স্বর্গে যাব সেখানে আল্লা আমার জন্য মেয়ে ঠিক করে রেখেছেন’। অপারেশন মানে একটা লড়াইয়ের পরে। ঠিক ওই অপারেশনেই ছেলেটি মারা গেল। আল্লার প্রতি কি ভালোবাসা আর সবার প্রতি কি সেবার ভাব! ভালোবাসা আর সেবার ব্যাপারে একটা যাতে ধারণা হতে পারে তাই এই কাহিনীটা বলা হল। যদিও কাহিনী কিন্তু এটি একজন জার্নালিস্ট একজন ইরানী সৈনিকের সাক্ষাৎকার নিচ্ছেন, সেই সৈনিক তার যুদ্ধের সময় তারই এক সহ সৈনিকের বর্ণনা দিয়ে তার যুদ্ধ জীবনের অভিজ্ঞতার কথা বলছেন।

সাধনার পরাকাষ্ঠা – তনু-মন-বচন দ্বারা ইষ্টের সেবা

এবার এই শ্লোকের সাথে পুরো জিনিষটাকে পাশাপাশি রাখলে কি দাঁড়ায় দেখা যাক। ***যানি যানীহ গীতানি তদ্বালচরিতানি চ। দধিনির্মন্থনে কালে স্মরন্তী তান্যগায়ত।।১০/৯/২।*** এই কথাগুলো শুকদেব পরীক্ষিৎকে বলছেন। হে পরীক্ষিৎ! তোমাকে এতক্ষণ শ্রীকৃষ্ণের যে বাল্যলীলা বর্ণনা করলাম, কৃষ্ণ পূতনাকে বধ করল, তৃণাবর্তকে বধ করল, শকট উল্টে গেল, গর্গাচার্য কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের নামকরণ, যশোদারানী শ্রীকৃষ্ণের এই সব লীলার কথা স্মরণ করে সুর করে গান করে করে দধিমন্থন করছিলেন। দধিমন্থনের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলছেন যশোদা তখনকার দিনের মেয়েরা যেভাবে শাড়ি পড়তেন, সেই রকম ক্ষৌম বস্ত্র পড়েছেন, দধিমন্থন করতে করতে বাহুযুগল পরিশ্রান্ত হয়ে গেছে, হাতের অলংকার ও কর্ণের দুল কম্পিত হচ্ছিল, মুখের উপর স্বেদবিন্দু ভেসে উঠেছে, কবরীবন্ধন থেকে মালতী ফুল একটা দুটো করে খসে পড়ছিল। কিন্তু যশোদার মন এখন এক দিব্য আনন্দে পরিপূর্ণ, সেই আনন্দে একদিকে শ্রীকৃষ্ণের কথা মনে মনে স্মরণ করছেন, মুখে গান করছেন আর অন্য দিকে হাত দিয়ে দধিমন্থন করে চলেছেন।

ভাষ্যকাররা নবম অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোককে বলছেন সাধনার পরাকাষ্ঠা, অর্থাৎ এর থেকে উপরে আর কোন সাধনা হয় না। আমরা সব কাজ আমাদের শরীর দিয়ে করি, মন দিয়ে করি আর বাণী দিয়ে করি – যেটাকে বলা হয় কায়মনোবাক্য। *মনসা বাচা কর্মণা*, আমরা যা কিছু কাজ করি সেটা আগে মনে চিন্তা রূপে ওঠে, দ্বিতীয় ধাপে সেটা বাণী হয়ে বেরিয়ে আসে আর শেষে শরীর দিয়ে কার্যে পরিণত হয়। সেইজন্য বাক্ ইন্দ্রিয়ের উপর যদি কারুর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা চলে আসে তাহলে শরীর আর মনের উপরেও সেই ক্ষমতাটা টেনে নিয়ে যাওয়া যায়। কোন অশুভ কাজ যদি মনে আসতে শুরু করে তখন সেটাকে যদি বাণীতে আটকে দেওয়া হয় তাহলে কিন্তু আর ওই অশুভ কাজটা শরীর দিয়ে বেরোবে না। সেইজন্য প্রথমে বাণীকে নিয়ন্ত্রণ করতে বলা হয়। বাণীতে আটকে গেলে আর কার্যে পরিণত হবে না। যশোদা বাৎসল্য ভাবে শ্রীকৃষ্ণের সাধনা করছেন। বাৎসল্য সাধনা সাধনার পরাকাষ্টা, এর থেকে আর উপরে কোন সাধনা হয় না। ঈশ্বরকে যখন নিজের সন্তান জ্ঞানে পূজো করা হয় এর থেকে উপরে একেবারেই আর কোন কিছু হতে পারে না। যাঁদের বাড়িতে বালগোবিন্দ, বালকৃষ্ণের বা নাড়ুগোপালের পূজো অর্চনা হয় একমাত্র তারাই এর মাধুর্য কিছুটা ধারণা করতে পারবেন। যিনি ভক্ত হবেন তাঁকে দ্বিতীয় শ্লোকে যেটা বলা হয়েছে সেটাই করতে বলা হচ্ছে। দধিমন্থন হল কার্য, ভক্ত যে কাজই করবেন সেই কাজটা সব সময় ঈশ্বরের জন্যই করা হবে, হৃদয়ে যে চিন্তন মনন হবে সেটাও ঈশ্বরীয় কথা ছাড়া আর কোন কিছুর চিন্তা ভক্ত করবে না আর ভক্তের মুখ দিয়ে বাণী রূপে যা কিছু বেরিয়ে আসবে সেটাও ঈশ্বরীয় কথা বা অবতারের লীলাগান হতে হবে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যশোদার নিজেরই সন্তান, কিন্তু মনে মনে তাঁর লীলাকথা চিন্তা করছেন আর মুখেও সেই লীলাকে নিয়ে গান করে চলেছেন। দধিমন্থনটাও শ্রীকৃষ্ণের জন্য করছেণ, আমার কৃষ্ণ মাখন খেতে ভালোবাসেন, ওর জন্য মাখন তৈরী করছি। ভাষ্যকাররা বলছেন যে কোন ভক্তের তনু-মন-বচন সবই সেই প্রিয়তম ইষ্টের ভজন সেবায় নিরত, ভক্তের সমগ্র জীবনটাই ভগবানের নৈবেদ্য।

এবার আমাদের সবাইকে নিয়ে বিচার করা যাক, আমরা এত শাস্ত্র কথা শুনছি, এত শাস্ত্র অধ্যয়ন করছি, আর এও আমরা সবাই জানি শাস্ত্রের সব কিছু আমাদের দৈনন্দিন জীবনে পালন করা খুব কঠিন। কিন্তু

আমরা যদি ঠিক করি আজকে আমরা শাস্ত্রের যে কথা শুনলাম এটাকে মাত্র দুদিন আমার জীবনে অনুশীলন করব, আমার যত কাজ আছে, সব কাজ আমার যিনি ইষ্ট শ্রীরামকৃষ্ণের জন্য করছি, চিন্তন যখন করব তখন শ্রীরামকৃষ্ণের লীলার চিন্তনই করব আর মুখে সব সময় তাঁর নামগান করে যাব। মাত্র দুদিন, রোজ করতে হবে না, এই দুদিন করলেই আমাদের পুরো ব্যক্তিত্ব পাল্টে যাবে। মনের মধ্যে যদি চাঞ্চল্য থাকে, সব সময় মনের মধ্যে যদি বিরক্তির ভাব থাকে, সারাদিনে চার ঘন্টা টানা এইভাবে ইষ্টকে নিয়ে সব কিছু করে গেলেও মন শান্ত হয়ে আসবে। যা কিছু করছি ঈশ্বরের জন্য করছি, যা কিছু রন্ধন করছি আমার ইষ্টের জন্যই করছি। ইষ্ট মানে একান্ত প্রিয়জন। নতুন বিয়ের পর স্ত্রী যেমন সব সময় স্বামীর কথা চিন্তা করে, সংসারের যা কিছু কাজ করে স্বামীকে মাথায় রেখে করে। অন্য দিকে স্বামীও তার নববিবাহিতা স্ত্রীর কথা সব সময় চিন্তা করে যাচ্ছে, যা কিছু কেনাকাটি করে সব স্ত্রীর কথা ভেবেই করে।

মা যশোদাও ঠিক এই ভাবে শ্রীকৃষ্ণের জন্য মাখন তৈরী করার জন্য দধিমন্থন করছেন আর মনে মনে শ্রীকৃষ্ণের কথা চিন্তন করতে করতে আনন্দ সাগরে ভাসমান হয়ে আছেন আর মুখে শ্রীকৃষ্ণের লীলাবিষয়ক গান করে চলেছেন। তখন বলছেন ***তাং স্তন্যকাম আসাদ্য মথ্নন্তীং জননীং হরিঃ। গৃহীত্বা দধিমন্থানং ন্যষেধৎ প্রীতিমাবহন্।।১০/৯/৪।*** সেই সময় বালক শ্রীকৃষ্ণ, তখন তাঁর কত আর বয়স, তিন-চার বছরের বালক, তিনি স্তন্যকাম হয়ে মা যশোদার কাছে ছুটে এসেছেন। স্তন্যকাম মানে মাতৃস্তন পানের জন্য উন্মুখ হওয়া। স্তন্যকাম হয়ে মন্থনরত মা যশোদার কাছে এসেছেন, কিন্তু মা যশোদা তখনও তাঁকে স্তন্য পান করতে দিচ্ছেন না। শ্রীকৃষ্ণ তখন কুপিত হয় মন্থনের দণ্ডটা আঁকড়ে ধরে রেখে দধিমন্থনের কাজে বাধা দিচ্ছেন। শ্রীকৃষ্ণের তখনও খিদে পাওয়ার কথা নয়, কারণ তাঁর এখন তিন-চার বছর হয়ে গেছে, বাইরের অন্য খাবার এখন তিনি ভালোই খাচ্ছেন, বুকের দুধ খাওয়ার অত প্রয়োজন হয় না।

‘স্তন্যকাম’ শব্দের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা

ভাষ্যকাররা স্তন্যকামকে খুব সুন্দর ব্যাখ্যা করে বলছেন – যশোদা শরীর, মন ও বচন দিয়ে যখন তাঁকেই ভাবছেন, দুই বাহু দ্বারা দধিমন্থন, হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্মরণ আর মুখে শ্রীকৃষ্ণের লীলাগান, এরপর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আর নিজেকে সামলে রাখতে পারলেন না। ভাষ্যকাররা বলছেন – যিনি নির্গুণ-নিরাকার তিনি যেন ভক্তের ডাকে সগুণ-সাকার হয়ে ‘মা’ ‘মা’ করে ডাকতে ডাকতে নিজেই ভক্তের কাছে ছুটে এসেছেন। মা যশোদা শ্রীকৃষ্ণের ভাবে এমন ব্যাকুল হয়ে বিভোর হয়ে গেছেন যে ভগবান আর নিজেকে সামলে রাখতে পারছেন না, দৌড়ে তিনি ভক্তের কাছে সশরীরে হাজির হয়ে গেছেন। ভগবান এসেই প্রথমে যশোদার মন্থন কার্যকে বন্ধ করে দিলেন, যেন বলতে চাইছেন ‘মা আর নয়, তুমি এবার ক্ষান্ত হও, তোমার এই ভালোবাসা আমি আর নিতে পারছি না’। ভাষ্যকাররা এর ব্যাখ্যা করছেন – তোমার এই সাধনার ভার আমি আর সহ্য করতে পারছি না, তোমার সাধনা তো পূর্ণ হয়েই গেছে। এর আগে আমরা বলেছিলাম, গোপীরা শ্রীকৃষ্ণকে এতো ভালবাসতেন যে, একদিন শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের বলছেন ‘তোমরা আমাকে যে এত ভালোবাসা দিয়েছ এই ভালোবাসা আমি কোন দিন তোমাদের ফেরত দিতে পারবো না। আমার জন্য যখন তোমরা এত কিছুই করলে তখন আমার একটা কাজ তোমরা করে দাও, তোমরা আমাকে ঋণমুক্ত করে দাও, কারণ এই ঋণ আমি কোন দিন তোমাদের ফিরিয়ে দিতে পারবো না’। এই যে যশোদার শ্রীকৃষ্ণের প্রতি, গোপীদের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভালোবাসা, এই ভালোবাসা পবিত্রতায় একেবারে পরিপূর্ণ। এরপর শ্রীকৃষ্ণ আর এই ভালোবাসা নিতে পারছেন না, বলছেন ‘মা! থামো থামো! আমি আর পারছি না’। এখানে অনেক বিচিত্র ভাবের উদয় হয়। ভগবানকে যখন কেউ ভালোবাসে ভগবান তাঁর কাজ কমিয়ে দেন। শুধু যে ভাগবতেই এই ভাব এসেছে তা নয়, অন্যান্য শাস্ত্রেও এই ভাব আসে। কথামৃতেও ঠাকুর অনেকবার বলছেন – ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা এলে তিনি কাজ কমিয়ে দেন। বাইবেলেও মেরী ও মার্থা দুই বোনের কাহিনীতে ঠিক এই ভাবটাই নিয়ে আসা হয়েছে।

ভক্তের তিনটে স্তর। প্রথম স্তরে ফাঁকিবাজ ভক্ত। গুরু শিষ্যকে বললেন ‘যাও, আমার জন্য তামাক সেজে নিয়ে এসো’। শিষ্য বলছে ‘গুরুদেব! আমি কি আপনার সেবা করার যোগ্য!’ শিষ্য আনলই না। এরা

হল সব ফাঁকিবাজ ভক্ত। ঠাকুর বলছেন – কিছু গরুর লেজে হাত দিলেই শুয়ে পড়ে। আবার বলছেন – কিছু ভক্ত আছে ভ্যাদভ্যাদে চিড়ে, একটু জল দিলেই পাঁকের মত দলা পাকিয়ে যায়। কথাই আছে 'ঠাকুরের চেলা প্রসাদ পাবার বেলা'। এরা সব ফাঁকিবাজ ভক্ত, কিন্তু পরমহংসের মত ঘুরে বেড়াবে, দেখাবে যেন সব শাস্ত্র পড়ে বুঝে ফেলেছে। ঠাকুর বলছেন – দেশে তাঁতিরা তাঁত বুনছে, সেখানে আমি গেছি। আমাকে দেখে এক অপরকে জিজ্ঞেস করছে – ইনি কোন কৃষ্ণ মানেন। ঠাকুর বলছেন – একদিকে তাঁতি আবার লম্বা লম্বা কথা। মানে তোমার কিছুই নেই, সব ফাক্কাবাজি, কয়েকটা শব্দ শিখে আওড়াচ্ছে। দ্বিতীয় স্তরের ভক্ত একনিষ্ঠ ভাবে প্রাণপাত দিয়ে কাজ করে যাবে। এক মিনিট বসে থাকবে না, চাঁদা তোলা থেকে শুরু করে বাসন মাজা, কাকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হবে, কার ছেলেকে স্কুলে ভর্তি করতে হবে, সব সময় কাজ আর কাজ। কিন্তু কাজ করতে করতে একবার পড়ে গেল তো পড়েই গেল, একবার অন্য দিকে চলে গেল তো চলেই যাবে। শিখদের গুরুদ্বারে গিয়ে শিখরা কি প্রচণ্ড সেবার কাজ করে, গুরুর প্রতি কি নিষ্ঠা নিয়ে সেবা করে যাবে। ওই ভাবে কাজ করে করে, কাজের আগুনে মনের মলিনতা সব পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়ার পর ভক্তির বীজ আসতে শুরু হয়। তৃতীয় স্তরে ভক্ত আর জাগতিক কোন কাজে জড়াবে না, যা কিছু কাজ হবে শুধু ঈশ্বরের সেবার্থে আর তা নাহলে ঈশ্বরের সেবা পূজো আর অর্চনা। যখন ঈশ্বর ছাড়া আর কিছুই চিন্তা করতে পারবে না তখন শরীর দিয়েও আর কোন কাজ হয় না। তখন স্মরণ-মনন ছাড়া আর কিছু থাকে না। যখন সব কাজ, চুল আচড়ানো থেকে শুরু করে, জামা-কাপড় পড়া থেকে শুরু করে খাওয়া-দাওয়া, চলাফেরা সব ঈশ্বরের পূজা অর্চনা মনে হবে তখন বুঝবেনে প্রভু এবার স্তন্যকাম হয়ে আপনার কাছে আসবেন। ঈশ্বরের প্রতি এই ভালোবাসা এসে গেলে তিনি আর আপনার সেবা গ্রহণ করবেন না। যেমন মেরীর সেবা যিশু আর গ্রহণ করতে পারছেন না।

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের সাথে রাজা মহারাজ আছেন, লাটু মহারাজও তখন সেখানে আছেন। রাজা মহারাজকে ঠাকুর কোন কাজের আদেশ করেছেন। রাজা মহারাজ সরাসরি অস্বীকার করে দিয়েছেন। লাটু মহারাজ দেখে বলছেন 'এ কি মশাই! উনি করতে বলছেন আর আপনি করবেন না বলে দিলেন'! রাজা মহারাজ বলছেন 'তোর যদি অতই সখ থাকে তাহলে তুই গিয়ে করগে যা না'। রাজা মহারাজের সাথে ঠাকুরের এত ভালোবাসার সম্পর্ক হয়ে গেছে, যেমন মেরী কোন কাজ করছিল না, রাজা মহারাজও কোন কাজ করতে চাইতেন না। এরপর লাটু মহারাজের সাথে রাজা মহারাজের ঝগড়া, কথা কাটাকাটি হয়ে যাওয়ার পরে ঠাকুর বলছেন – রাখাল যা বলছে ঠিকই বলছে। প্রেক্ষাপটটা একটু আলাদা কিন্তু ভাবটা একই। রাজা মহারাজ এমন জায়গায় চলে গেছেন, যেখানে আর তাঁর দ্বারা কোন কাজ হবে না। একবার শ্রীশ্রীমা কাউকে একটা কাজের দায়ীত্ব দিতে গিয়ে বলছেন 'রাখালকে দিয়ে এই কাজ হবে না, ও কাউকে দিয়ে করিয়ে নেবে কিন্তু নিজে করবে না'। রাজা মহারাজ তিনি স্বয়ং ব্রহ্মজ্ঞানী পুরুষ, কিন্তু তাই বলে ফাঁকিবাজদের দলের নন। যার জন্য ফাঁকিবাজ আর পরমহংসকে বাইরে থেকে দেখতে একই রকম মনে হবে, কথাবার্তা সমান, আচার আচরণও সমান কিন্তু একজন হল আলস্যে ভরপুর আর স্বার্থপরতায় চূড়ান্ত, কিন্তু পরমহংস হলেন একেবারে নিরহংকার, আমি বলে কোন বোধ নেই। এটা বোঝা যাবে এর আগে প্রাণপাত করা খাটনি খেটেছে কিনা, কোন একটা ভাবে, শারীরিক ভাবে কাজ করাই হোক, প্রচুর জপ-ধ্যানই হোক, তপস্যাই হোক, প্রাণপাত করা খাটনি ছিল কিনা দেখতে হবে। এই হাড়ভাঙা খাটনি যদি আগে না করে থাকে কিন্তু তা সত্ত্বেও যদি পরমহংস ভাব নিয়ে বসে আছে, তাহলে বুঝতে হবে সে এক নম্বর ফাঁকিবাজ।

এখানে যশোদা পায়ে পা দিয়ে বসে নেই, খোশ গল্প করছেন না, অপরকে উপদেশ দিচ্ছেন না, প্রাণপাত করে একঘেঁয়েমি বিরক্তিকর কাজ দধিমন্থন করে যাচ্ছেন। শ্রীকৃষ্ণ আর থাকতে পারছেন না, দৌড়ে মা যশোদার কাছে এসে গেছেন, আর শ্রীকৃষ্ণ তখন পাঁচ-ছয় মাসের শিশু নন যে যখন তখন খিদে পেয়ে যাবে। বাচ্চাদের একটা খুব মজার স্বভাব হল, মা যখন খুব ব্যস্ত থাকে তখনই বাচ্চা মায়ের কাছে এসে তার দিকে মায়ের আকর্ষণটা টেনে নিতে চাইবে। আর দ্বিতীয় মা যখন ঘুমিয়ে থাকবে তখন মায়ের কাছে এসে জিজ্ঞেস করবে 'মা! তুমি শুয়ে আছ'? কিন্তু মা যখন ফাঁকা বসে থাকবে তখন বাচ্চা মায়ের কাছে আসবে না। আবার পাড়ার মেয়েদের সাথে বসে মা যদি গল্প করে তখনও বাচ্চা মায়ের কাছে এসে বিরক্ত করতে থাকবে।

ওর বক্তব্য হল, আমি হলাম তোমার কাছে বেশী গুরুত্বপূর্ণ। তুমি যখন কাজে ব্যস্ত তখন আমার দিকে তাকাও, তুমি যখন শুয়ে আছ তখনও আমার দিকে নজর দাও, কিন্তু মা এমনি বসে আছে তখন ও কাছে আসবে না

এখানে কিন্তু ব্যাপারটা অন্য রকম। এখানে শ্রীকৃষ্ণ মায়ের দৃষ্টিকে তাঁর দিকে আকর্ষিত করতে চাইছেন না, তিনি স্তন্যকাম, আমি তোমার ভালোবাসা চাই। মনসা বাচা কর্মণা, তুমি একমাত্র আমার কথা চিন্তা করে এই যে হাড়ভাঙা খাটুনির কাজ করে যাচ্ছ, এটা আমি আর নিতে পারছি না। শ্রীকৃষ্ণ দধিমন্থনের দণ্ডটা আঁকড়ে ধরেছেন। ভাগবত দুটো স্তরে এগিয়ে চলে, প্রথম হল বাড়ির সব বাচ্চারা এই রকমই করে, মা কোন কাজ করছে ঠিক সেই সময়তেই বাচ্চা মাকে জড়িয়ে কিছু না কিছু বায়না করতে থাকবে, বাচ্চাদের স্বভাব এই রকমই। ভাগবতেও ঠিক একই জিনিষের বর্ণনা করা হচ্ছে, কিন্তু তখন আর শুধু বাল সুলভ স্বভাবের বর্ণনাতেই আবদ্ধ থাকছে না। বাল স্বভাবের বর্ণনার গতিকে ঘুরিয়ে অন্য দিকে করে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন – মা! তুমি যে এই সাধনা করছ, এর বেশী হলে আমি আর নিতে পারবো না, এবার তুমি ক্ষান্ত দাও। যিনি অদৃশ্য অপ্রকট তিনি এবার প্রকট হলেন, প্রকট হয়ে মায়ের সম্মুখে দণ্ডয়মান হয়ে গেছেন।

শ্রীকৃষ্ণের কথা চিন্তা করতে করতে এতক্ষণ কাজ করছিলেন, মুখের শ্রীকৃষ্ণের লীলাগান করছিলেন। আর এখন শ্রীকৃষ্ণ এসে তাঁর দণ্ড চেপে ধরে মন্থন কাজে বাধা দিচ্ছেন, সব মিলিয়ে যশোদার হৃদয় পুত্রের প্রতি বাৎসল্য রসে প্লাবিত হয়ে গেল, তাঁর স্তন থেকে স্বতঃই দুগ্ধ উৎসারিত হয়ে ঝড়তে শুরু করে দিয়েছে। শ্রীকৃষ্ণকে তিনি কোলে তুলে নিয়ে দুধ পান করাতে লাগলেন, শ্রীকৃষ্ণের মুখে হাসি, যশোদাও স্নেহাসিক্ত নয়নে পুত্রের হাসি অপলক নয়নে দেখতে থাকলেন। ইতিমধ্যে যশোদা দেখছেন দুধ গরম করার জন্য উনুনে চাপানো ছিল, সেই দুধ উথলে উঠেছে। তাই দেখে যশোদা ব্যস্ত হয়ে শ্রীকৃষ্ণকে মাতৃসুধা পানে অতৃপ্ত রেখে কোল থেকে নামিয়ে উনুন থেকে দুধ নামাতে চলে গেলেন।

আমি স্তন্যকাম, আমাকে স্তন্যপানে অতৃপ্ত রেখে মা চলে গেল! আর দেখে কে! ভাগবত সেই সময়কার শ্রীকৃষ্ণের অবস্থার বর্ণনা দিচ্ছেন ***সঞ্জাতকোপঃ স্ফুরিতারুণাধরং সংদশ্য দদ্ভির্দধিমন্থভাজনম্। ভিত্ত্বা মৃষাশ্রুর্দৃষদশ্মনা রহো জঘাস হৈয়ঙ্গবমন্তরং গতঃ।।১০/৯/৬।*** ব্যস্, শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে কোপের সঞ্চার হয়ে গেল। তাঁর রক্তবর্ণ অধরে নবোদ্গত দন্ত চেপে দংশন করতে করতে একটা নোড়া নিয়ে দই মন্থনের ভাণ্ডটি ভেঙে ফেললেন। আমাকে ছেড়ে চলে যাওয়া! এখানে ব্যাখ্যাকাররা খুব সুন্দর একটা ব্যাখ্যা দিচ্ছেন – মা যশোদা এই যে শ্রীকৃষ্ণের লীলার কথা স্মরণ করছেন এটা হল তাঁর ভগবানের সুখস্মৃতি। অন্য দিকে তিনি দধি মন্থন করছেন আর ভাবছেন এই দধি মন্থন করে যে মাখন তৈরী হবে সেই মাখন আমার শ্রীকৃষ্ণ খাবে আর মুখে তিনি ভগবানের লীলাগান করে চলেছেন। এইভাবে তিনটে জিনিষকে এক করে অর্থাৎ মন, কায় আর বাক্য এই তিনের সংযোগ হতেই শ্রীকৃষ্ণ যিনি নিদ্রিত ছিলেন, তিনি জাগ্রত হয়ে 'মা' 'মা' বলে ডাকতে ডাকতে মা যশোদার কাছে ছুটে আসছেন। কিন্তু মা শ্রীকৃষ্ণের দিকে নজর না দিয়ে উনুন থেকে দুধ নামাতে চলে গেলেন। সেইজন্য শ্রীকৃষ্ণ কুপিত হয়ে দধির ভাণ্ড ভেঙে দিচ্ছেন। শ্রীকৃষ্ণের ওই রাগ দেখে যশোদা আবার সব কিছু ফেলে দৌড়ে এসে শ্রীকৃষ্ণকে কোলে নিচ্ছেন।

ভাষ্যকাররা একটি ব্যাখ্যাতে এর ব্যাখ্যা করে বলছেন – ভক্তের পুরুষার্থ অর্থাৎ জীবনের উদ্দেশ্য হল ভগবানের সেবা করা। তাহলে ভক্তের পুরুষার্থ কি ভগবান নন? বিচারের দিক থেকে এই তত্ত্বটা একটু জটিল। আমাদের তিনজন নামকরা দার্শনিক – শঙ্করাচার্য, রামানুজ ও মাধ্বাচার্য। রামানুজের আবার দুটো নামকরা সম্প্রদায় ছিল। রামানুজের দুটো সম্প্রদায় কেন হল, এর পেছনেও একটা কাহিনী আছে। শিষ্যদের প্রতি রামানুজের খুব কড়া নির্দেশ ছিল, ঈশ্বরের সেবা-পূজাতে যেন কোন ত্রুটি না হয়। রামানুজের শিষ্যরা সেই থেকে সব সময় ভগবানের সেবা-পূজাতে নিজেদের ব্যস্ত রাখত। রোজই কেউ চন্দন ঘষছে, কেউ মালা গাঁথছে, কেউ ফুল তুলছে, কেউ বিষ্ণু-বিগ্রহের শৃঙ্গার করছে। একদিন সবাই এইভাবে ভগবান বিষ্ণুর সেবা-পূজাতে রত, হঠাৎ একটা রব উঠল ভগবান বিষ্ণুর রথ আসছে। এদের মধ্যে একদল সাধু নিজের কাজ ফেলে কেউ রথের পূজো দেখতে, কেউ রথের পূজো করতে বেরিয়ে গেছে। কিছু সাধু আবার সেবা পূজার কাজ ফেলে রথ

দেখতে গেল না। পরে গিয়ে রামানুজ এদের জিজ্ঞেস করছেন ‘তোমরা রথের পূজাতে এলে না কেন’? তারা তখন রামানুজকে বলছে ‘প্রভু! আপনিই তো বলেছেন ভগবানের সেবা-পূজাকে প্রাধান্য দিতে, আমরা সেবা-পূজার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম আর তখনও সব কাজ শেষ হয়নি তাই যাইনি’। রামানুজ বললেন ‘আরে তাই তো! তোমরাই ঠিক ঠিক বুঝেছ। তোমাদের সবাইকে এই নামে সম্বোধন করা হবে, তোমাদের কাজই হল ভগবানের সেবা-পূজা করা’। এবার অন্যদের জিজ্ঞেস করেছেন ‘তোমরা ভগবানের সেবা-পূজা ছেড়ে এখানে কেন চলে এলে’? তারা বলছে ‘প্রভু! আপনিই তো বলেছেন ভগবানেরই প্রাধান্য, ভগবান আসছেন বলে আমরা দৌড়ে চলে এসেছি’। রামানুজ এদেরও বললেন তোমরাও ঠিক করেছ, ঠিক আছে তোমাদের সবাইকে এই নামে সম্বোধন করা হবে। সেই থেকে রামানুজরা দুটো আলাদা সম্প্রদায় হয়ে গেল। একটা সম্প্রদায়ের কাছে ভগবান বিষ্ণুই সব আর আরেক সম্প্রদায়ের কাছে ভগবান বিষ্ণুর সেবা-পূজাই সব। এখন এর মধ্যে কোনটা ভালো কোনটা কম ভালো সেই বিতর্কে যাবো না। এখানে দুটো ভাব – একটা ভাবানুযায়ী ভগবানই সব, আরেকটা ভাবে বলবে ভগবান নয়, তাঁর সেবাই প্রাধান্য। আমাদের শরীর-মনের এমনই গঠন যে, এই গঠন অনুযায়ী কেউ শুধু ভালোই বাসতে থাকে আবার কিছু লোক আছে যারা শুধু সেবা-পূজাই করতে থাকে। কারটা ঠিক কারটা ভুল, এটা ঠিক করার কোন পথ নেই। এখন শ্রীকৃষ্ণ চাইছেন মা আমার কাছে থাকুক। কিন্তু মা যশোদার কাছে শ্রীকৃষ্ণ পুরুষার্থ নন, আমার জীবনের উদ্দেশ্য তোমার সেবা করা। এবার শ্রীকৃষ্ণ দেখাচ্ছেন, আমার সেবা তোমার পুরুষার্থ তো, ঠিক আছে তাহলে দেখ! এরপর শ্রীকৃষ্ণ সব ভেঙে তছনছ করে দিচ্ছেন, যশোদা শ্রীকৃষ্ণের জন্য যে মাখন তৈরী করেছেন সেটাও বানরকে খাইয়ে দিলেন। আমি তোমাকে চাই। এখন কোনটা ঠিক? এগুলো কিছু বলা যাবে না এগুলো যে যার নিজের নিজের ভাব।

যশোদা ভাবে বিভোর। কিসে বিভোর? যে দধি মন্থন করছেন সেটা আমার শ্রীকৃষ্ণের জন্য, হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের সুখস্মৃতির তরঙ্গ প্রবাহিত হয়ে চলেছে। কিসের সুখস্মৃতি? শ্রীকৃষ্ণের দুরন্তপনার লীলা আর মুখে গান, সেই গানও শ্রীকৃষ্ণের লীলাকে আধার করে। হাতের কর্ম শ্রীকৃষ্ণের জন্য, মনে শ্রীকৃষ্ণের চিন্তন আর মুখে শ্রীকৃষ্ণের নামগান – এই তিনটে জিনিষ, কায়, মন ও বাক্যের ঐকতানে ভগবান আর নিজেকে সামলে রাখতে পারলেন না। এই তিনটে দিয়ে যশোদা তাঁর বাল ইষ্ট শ্রীকৃষ্ণে পুরোপুরি সমাহিত। ঠিক এইভাবে ভক্ত যখন ঈশ্বরে সম্পূর্ণ রূপে সমাহিত হয়ে যান তখন তাঁর ইষ্ট যেখানে যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন, ভক্তের কাছে ছুটে আসতে তিনি বাধ্য। এরপর ভক্তের মন যদি একটু ইষ্ট থেকে সরে যায় তখন ভগবান আবার রুষ্ট হয়ে এমন কাণ্ড করতে থাকেন যাতে ভক্তের ষোল আনা মন ভগবানের দিকে যায়। এখানে যশোদা শ্রীকৃষ্ণকে অতৃপ্ত অবস্থায় কোল থেকে নামিয়ে দুধ সামলাতে ছুটে গেছেন। ইষ্টও রেগে গিয়ে দইয়ের ভাণ্ডগুলি ভাঙতে আরম্ভ করে দিয়েছেন, যাতে ভক্তের মন আমার দিকে আসে। ভাণ্ডগুলো হল সংসার ভাব, সংসার ভাবটা ভাঙতেই যশোদার আবার টনক নড়ে গেছে। তখন আবার সব কাজ ফেলে দিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে বুকে জড়িয়ে ধরার জন্য দধিমন্থনের ঘরে দিকে ছুটে এসেছেন। ভক্তও যখন কর্ম, মন ও বাক্ এই তিনটে দিয়ে ঈশ্বর চিন্তন করেন তখনই যেন শ্রীকৃষ্ণের মত ‘মা’ ‘মা’ করতে করতে ভগবান দৌড়ে ভক্তের কাছে এসে হাজির হন। দৌড়ে এসে ভগবান আবার ভক্তের পুরো মনটা পাওয়ার চেষ্টা করতে থাকেন। ভক্তের মন পুরোপুরি পাওয়ার জন্য তিনি আবার ভক্তের আশেপাশের সংসারটাকে যেন ভেঙে তছনছ করে দিতে শুরু করেন। ভক্তের যখন হুঁশ হয় তাইতো আমার মনটা এই এই জিনিষের জন্য ভগবানের থেকে সরে আসছিল। এই চেতনা আসতেই যা কিছু বাকি ছিল সব ফেলে দিয়ে পুরোপুরি মনটাকে ইষ্টে সমর্পিত করে দিল। যশোদার এখন শুধু শ্রীকৃষ্ণকে নিয়েই নাড়াচাড়া। এটাই ভক্তির পরাকাষ্ঠা। এতক্ষণ যা কিছু হচ্ছিল তারই চরম পরিণতি হল বস্তুলাভ। বাৎসল্য ভাব দিয়ে ভগবানকে কীভাবে ভালোবাসতে হয় একমাত্র যশোদাই দেখিয়েছেন।

নিজে না ধরা দিলে ভগবানকে ধরা যায় না

শ্রীকৃষ্ণকে যেখানে রেখে দৌড়ে গিয়েছিলেন উনুনের দুধ নামাতে, কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে দেখেন তাঁর আদরের দুলাল শ্রীকৃষ্ণ সেখানে নেই। ছেলেকে এদিক-ওদিক খুঁজতে খুঁজতে দেখেন একটা উল্টোনো উলূখলের ওপর দাঁড়িয়ে শিকায় তুলে রাখা মাখন তুলে নিজে কিছুটা খেয়েছে, কিছু মাটির উপর ছড়িয়েছে আর

কিছু মাখন বানরদের বিলিয়ে যাচ্ছে। দধির ভাণ্ড ভাঙা অবস্থায় ছড়িয়ে আছে। শ্রীকৃষ্ণের মনে আবার ভয়ও আছে পাছে চুরি করা অবস্থায় মা যশোদার হাতে ধরা না পড়ে যায়। শ্রীকৃষ্ণ যেই দেখলেন মা যশোদা ছড়ি হাতে এগিয়ে আসছেন তক্ষুণি উলূখল থেকে নেমে দৌড়ে পালিয়েছেন। মা যশোদাও শ্রীকৃষ্ণের পেছনে পেছনে তাড়া করে চলেছেন শ্রীকৃষ্ণকে ধরার জন্য। এখানে একটা শ্লোকে খুব সুন্দর বলছেন – ***তামাত্তযষ্টিং প্রসমীক্ষ্য সত্বরস্ততোহবরুহ্যাপসসার ভীতবৎ। গোপ্যন্বধাবন্ন যমাপ যোগিনাং ক্ষমং প্রবেষ্টুং তপসেরিতং মনঃ।।১০/৯/৯।*** মা যশোদা শ্রীকৃষ্ণকে ধরার জন্য তার পেছনে দৌড়াচ্ছেন আর শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে দেখাচ্ছেন তিনি যেন ভয় পেয়ে পালাচ্ছেন। এখানে শুকদেব বলছেন – বড় বড় যোগীরা তপস্যা করে করে নিজেদের মনকে অত্যন্ত সূক্ষ্ম আর শুদ্ধ তৈরী করে নেন, কিন্তু ভগবান এতই সূক্ষ্ম যে তাঁরাও ভগবানের মধ্যে প্রবেশ করতে পারেন না। ভগবানকে ধরা তো অনেক দূরের কথা বড় বড় ঋষিরা ভগবানের ভেতরে প্রবেশ করতেই পারেন না, সেই ভগবানের পেছনে মা যশোদা দৌড়াচ্ছেন তাঁকে ধরার জন্য, আর ভগবান ভয়ে পালাচ্ছেন। মাঝে মাঝে যদিও শ্রীকৃষ্ণ যশোদাকে দেখিয়ে দিচ্ছেন যে তিনি ভগবান, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যশোদার যে বাৎসল্য ভালোবাসা, এই বাৎসল্যতা বশতঃ যশোদার মন থেকে শ্রীকৃষ্ণ যে ভগবান এই ভাবটা হারিয়ে যাচ্ছে। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যশোদার এই ভালোবাসার পেছনে একটা দিব্য সুখানুভূতি আছে, এই সুখটাও বাৎসল্য ভাবের একটা দিক। তার সাথে ভক্তরা যখন যশোদার এই ভালোবাসার অনুধ্যান করছে তখন তার প্রভাবও অত্যন্ত সুদূর প্রসারী। যাঁরা সাধক তাঁরা ভাবছেন, আমি এত সাধনা করছি, এত তপস্যা করছি কিন্তু ঈশ্বরের ভাবটাই ধরতে পারছি না, সেখানে একজন সাধারণ গোপী শুধু ভালোবাসা দিয়ে ভগবানের পেছনে দৌড়াচ্ছেন আর ভগবান ভয়ে পালাচ্ছেন। যশোদার কী সৌভাগ্য! এই যে বলা হয় ভগবানের এত ঐশ্বর্য, কিন্তু এখানে কোন ঐশ্বর্যের বালাই নেই, ভগবান ছোট্ট শিশু, তিনি দুষ্টুমি করেছেন, মা শাস্তি দেবেন ভেবে পালাচ্ছেন আর মাও তাঁকে ধরার জন্য পেছনে পেছনে দৌড়াচ্ছেন।

ভগবানের এই বৈপরিত্য ভাবটাই আধ্যাত্মিক জগতে সত্য। কি বৈপরিত্য? ভগবান সূক্ষ্ম থেকেও সূক্ষ্মতম আবার বিরাট থেকেও বিরাট। ভগবানের মনের মধ্যে কেউ যদি প্রবেশ করতে চান, তিনি কোন দিন তা পারবেন না, কারণ ভগবান সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম। আকাশ হল সব থেকে সূক্ষ্ম উপাদান, ভগবান আকাশের থেকেও সূক্ষ্মতর। অথচ তিনি শরীর ধারণ করেছেন, এবং যশোদাও তাঁর পেছনে ছুটে চলেছেন তাঁকে ধরবার জন্য। উপনিষদেও ব্রহ্মের এই তত্ত্ব বারংবার এসেছে। মুণ্ডকোপনিষদের ঋষি বলছেন *বৃহচ্চ তদ্দিব্যমচিন্ত্যরূপং সূক্ষ্মাচ্চ তৎ সূক্ষ্মতরং বিভাতি*। এগুলো কোন কবির কাব্যিক বর্ণনা নয়, এটাই বাস্তব সত্য, দুটোই তিনি হতে পারেন। এই যে বলা হয় তিনি সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর আবার তিনি বৃহৎ থেকেও বৃহৎ, এটাই ভগবানের বাস্তবিক স্বরূপ। আসলে আধ্যাত্মিক জগৎ ভোঁতা মন ও জড়বুদ্ধি সম্পন্ন লোকেদের জন্য নয়। অত্যন্ত সূক্ষ্ম বুদ্ধি না হলে এই তত্ত্বগুলো ধারণা করা যায় না। যোগীদের বিশেষত্ব হল, তপস্যা করে করে মনকে সূচাগ্রের মত একাগ্র করার ক্ষমতা অর্জন করার ফলে তাঁদের মনটাও অত্যন্ত সূক্ষ্ম হয়ে যায়। কিন্তু তাঁরাও ভগবানের মনে প্রবেশ করতে পারেন না। অথচ এখানে যশোদা সেই ভগবানের পেছনে দৌড়াচ্ছেন।

যশোদার শরীর কিঞ্চিৎ স্থূল হওয়ার জন্য খুব জোরে দৌড়োনো তাঁর পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না। কিন্তু যাই হোক শেষ পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণ মা যশোদাকে ধরা দিলেন। ভগবানও চাইছিলেন না মা যশোদাকে আর কষ্ট দেওয়া হোক। ভগবান নিজে যদি ধরা না দেন তাহলে কোন দিন ভগবানকে ধরা যাবে না। এখানে বলছেন ***কৃতাগসং তং প্ররুদন্তমক্ষিণী কর্ষন্তমঞ্জন্মষিণী স্বপাণিনা। উদ্বীক্ষমাণং ভয়বিহ্বলেক্ষণং হস্তে গৃহীত্বা ভিষয়ন্ত্যবাগুরৎ।। ১০/৯/১১।*** যশোদা এবার ছেলেকে বাগে পেয়ে গেছেন, বাগে পেয়ে যাওয়ার পরই যশোদা শ্রীকৃষ্ণকে কৃত্রিম বকাঝকা করছেন। শ্রীকৃষ্ণের অবস্থাও দেখার মত, অন্যায় করে ধরা পড়ে গিয়ে এক হাত দিয়ে চোখ রগড়ে রগড়ে কান্না শুরু করেছেন, ফলে চোখের কাজল সারা মুখে ছড়িয়ে পড়েছে। ভাষ্যকাররা এর খুব সুন্দর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলছেন বিশ্বের ইতিহাসে কোথাও এমন বর্ণনা পাওয়া যায় না যে ভগবান পূর্ণ অবতার রূপে ভীতসন্ত্রস্ত ভাবে অপরাধীর মত মায়ের সামনে দাঁড়িয়ে থাকবেন। কিন্তু এটাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে যায় তাঁদের কাছে যাঁদের ইষ্ট বালগোপাল। তাঁরা এই দৃশ্যের ধ্যান করতে করতে ভাবরাজ্যের এই চরম অবস্থায় পৌঁছে

যাবেন। আমরা যতই জপের কথা বলি না কেন, আধ্যাত্মিক সাধনায় জপ বেশী দূর নিয়ে যেতে পারে না, নিয়ে যায় ধ্যান চিন্তনই। নিজের ইষ্ট বালগোপালকে এইভাবে চিন্তন ও ধ্যান করতে করতে মানুষের মনের কামনা-বাসনা গুলি খসে পড়ে যায়। চিন্তন দুই রকমের হয় – ১) তত্ত্ব চিন্তন আর ২) লীলা বা রূপ চিন্তন। সবাই ঈশ্বরের তত্ত্ব চিন্তন অনেকক্ষণ করতে পারেন না, তাঁদের জন্য লীলা বা রূপ চিন্তন।

শ্রীকৃষ্ণ যে বাঁ হাত দিয়ে দু চোখ কচলে অশ্রুমোচন করছেন, ভাষ্যকাররা এর ব্যাখ্যা করে বলছেন – বাঁ হাত দিয়ে দু-চোখ রগড়ে এদের দিয়ে তিনি যেন বলাতে চাইছেন 'ইনি তো কোন কর্মেরই কর্তা নন'। এই ব্যাখ্যা ভাষ্যকারদের সংযোজন, এই ব্যাখ্যা আমরা নিতেও পারি আবার নাও নিতে পারি। ঠাকুর বলছেন ঈশ্বরই কর্তা। গীতাতে আবার এক জায়গায় বলছেন ঈশ্বরই কর্তা আবার অন্য জায়গায় বলছেন আত্মা নির্বিকার, আত্মা কোন কিছুই করেন না। এখন এই দুটো আপাত বিরোধী বক্তব্যের সমাধান কীভাবে করা যেতে পারে? তত্ত্বের দিক থেকে বিচার করলে আত্মা কোন কর্ম করতে পারেন না। কারণ কর্ম করতে গেলে আমি তুমি বোধ থাকতে হবে। কিন্তু আত্মা ছাড়া দ্বিতীয় কিছু নেই, তাহলে সেখানে আমি তুমি বোধ কোথা থেকে আসবে! দ্বিতীয় কোন কর্ম করার জন্য space দরকার, কিন্তু আত্মা অনন্ত, তিনি সব জায়গায় পরিব্যপ্ত হয়ে আছেন, সুতরাং আত্মা কোথায় আর কার ওপর কাজ করবেন! আমি জগতের সব কিছু দেখতে পারি কিন্তু নিজের চোখকে কখন দেখতে পারি না, আমার ডান হাত দিয়ে জগতের সব কিছুকে ধরে নিতে পারব কিন্তু ডান হাতকে ধরতে পারব না। যে কোন জিনিষ নিজের ওপর কাজ করতে পারে না। সেইজন্য বলা হয় আত্মা কোন কাজ করেন না, যিনি কর্ম করেন না তাই তিনি কোন কর্মের কর্তাও নন। তাছাড়া কর্ম করতে গেলে কর্মের দ্বিতীয়া লাগবে, সেটাও তো নেই, কাজ হবে কি করে! গীতায় ভগবান ঠিক এই কথাই বলছেন – *ন কর্তৃত্বং ন কর্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ। ন কর্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ততে।।৫/১৪।*

সৃষ্টির আগেও ভগবানই একমাত্র চৈতন্য সত্তা আর সৃষ্টি যখন শুরু হয়ে গেল তখনও ভগবানই একমাত্র চৈতন্য সত্তা, এই চৈতন্য সত্তা আছে বলেই পুরো জগৎটা চলছে, জগতের সব কাজ চলছে। তাই এক দিয়ে দেখলে তিনি কর্তাও নন, কর্মও নন। আবার অন্য দিক দিয়ে দেখলে তিনি আছেন বলেই জগৎ চলছে। ব্যাপার হল আমি আপনি কোন দিক দিয়ে দেখছি। ঠাকুর যখন বলছেন ঈশ্বরই কর্তা, বাকি সব অকর্তা, তখন আমরা যে কাজ করছি সেটা ভগবানই করছেন তা নয়, প্রকৃতপক্ষে তিনি আছেন বলেই সব কাজ হচ্ছে, এই অর্থে ভগবানই কর্তা। আমাদের শরীরে তিনি জীবাত্মা রূপে অধিষ্ঠান করে আছেন বলেই এই শরীর দিয়ে সব কাজ হচ্ছে। কিন্তু যে মুহূর্তে জীবাত্মা এই শরীরকে ছেড়ে বেরিয়ে চলে যাবেন তখন শরীরটা একটা জড় পদার্থ হয়ে পড়ে থাকবে, সেই শরীর দিয়ে আর কোন কাজ হবে না। আবার বলা হয় প্রকৃতিই সব কিছু করছে, এখানেও নীচের থেকে দেখা হচ্ছে বলে বলা হয় প্রকৃতি সব কিছু করে। এই যে পাখা ঘুরছে, পাখা কি নিজে থেকে ঘুরছে? ইলেক্ট্রিসিটি পাখার মধ্য দিয়ে কাজ করছে। সেই রকম যিনি ঠিক ঠিক জানেন, তিনি বলবেন ঈশ্বর বা চৈতন্য সত্তা আছেন বলেই সব কাজ হচ্ছে, প্রকৃতি কোন কাজ করে না। কিন্তু আমরা যে অর্থে কর্তা বলি সেই অর্থে ঈশ্বর কর্তা হন না। যিনি সৃষ্টির পূর্বেও ছিলেন সৃষ্টির পরেও তিনিই থাকবেন, যিনি জগতের বাইরে আছেন তিনিই আবার জগতের ভেতরেও আছেন, তিনিই আবার জগৎ রূপেও আছেন।

শ্রীকৃষ্ণ একেই এতগুলো ভাণ্ড ভেঙেছে, আর সব মাখন বানরদের বিতরণ করে খাইয়ে দিয়েছেন। মা যশোদা আর কোন উপায় না দেখে একটা উলূখলের সাথে শ্রীকৃষ্ণকে বেঁধে রেখে আবার নিজের কাজে মন দেবেন, তা নাহলে আবার কোথায় পালিয়ে যাবে! শ্রীকৃষ্ণ নিজে ধরা না দিলে মা যশোদা কখনই তাঁকে ধরতে পারতেন না, তাঁকেই কিনা এখন ধরে বাঁধবার চেষ্টা করছেন। শুকদেব খুব সুন্দর বলছেন – ***ন চান্তর্ন বহির্যস্য ন পূর্বং নাপি চাপরম্। পূর্বাপরং বহিশ্চান্তর্জগতো যো জগচ্চ যঃ।।*** *১০/৯/১৩।* ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কি বৈশিষ্ট্য? যাঁর বাহিরও নেই, ভিতরও নেই। আমাদের ক্ষেত্রে ভেতর বাহির দুটোই আছে, আমার বাইরে এই বোতল আমার ভেতরে শরীরের সব ইন্দ্রিয়গুলো আছে, আমার মন আছে ইত্যাদি। কিন্তু ভগবানের ক্ষেত্রে না আছে তাঁর বাহির, না আছে তাঁর ভেতর, তিনিই আছেন, যা কিছু আছে সবই তিনি, তিনি ছাড়া আর কিছু নেই বলেই তাঁর ভেতর বাহির বলে কিছু নেই। যাঁর আদিও নেই, অন্তও নেই; যিনি এই জগতের পূর্বেও ছিলেন,

জগতের পরেও থাকবেন। আর জগৎ রূপে যেটা প্রতীয়মান হচ্ছে সেটাও তিনি। তিনি আবার সমস্ত ইন্দ্রিয়ের পারে নির্গুণ নিরাকার অব্যক্ত। যাঁর এই বৈশিষ্ট্য সেই ভগবানই মানুষ রূপ ধারণ করেছেন আর তাঁকেই যশোদা মহারানী আমার পুত্র মনে করে সাধারণ বালকের মত রজ্জু দ্বারা উলূখলের সাথে বাঁধার প্রয়াস করছেন। এটাই পরমাশ্চর্য। অধ্যাত্ম রামায়ণেও শ্রীরামচন্দ্রের উপর ঠিক এই ভাবকে নিয়ে আসা হয়েছে, যেখানে বলছেন শ্রীরাম *ন গচ্ছতি ন তিষ্ঠতি ন শোচতি*, অর্থাৎ শ্রীরাম কোথাও যান না, তিনি কোথাও বসেনও না, শ্রীরাম কোথাও শয়নও করেন না, কখন চিন্তাও করেন না, কারণ তিনি সর্বব্যাপী। এখানেও ঠিক সেই কথাই একটু অন্য ভাবে বলছেন, শ্রীকৃষ্ণের না আছে বাহির না আছে ভেতর, শ্রীকৃষ্ণের না আছে আদি না আছে অন্ত। এই জগতের সৃষ্টির আগেও শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন, সৃষ্টির পরেও তিনি থাকবেন, জগতের মধ্যেও তিনি, জগতের বাইরেও তিনি, আর জগৎটাও তিনি। সেই ভগবানকে যশোদা কিনা একটা উলূখলের সাথে বেঁধে রাখার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছেন। এর চাইতে আশ্চর্যের আর কি আছে।

দুই আঙুল দড়ি কম পড়ার তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা

এবার ভগবান তাঁর অপার লীলা দেখাতে যাচ্ছেন। মা যশোদা শ্রীকৃষ্ণকে উলূখলের সাথে বাঁধার জন্য দড়ি নিয়ে এসেছেন। কিন্তু বাঁধতে গিয়ে দেখছেন দড়ি দুই আঙুল কম পড়ছে। বেদের পুরুষসূক্তমে ঠিক এই দু-আঙুলের কথা বলতে গিয়ে দশ আঙুলের কথা বলা হয়েছে *স ভূমিং বিশ্বত বৃত্বা অত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্* - এখানে *ভূমিং* বলতে শুধু এই পৃথিবীকেই নয় সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে বোঝাচ্ছে। পুরুষ বা ভগবান পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে রয়েছেন। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে রয়েছেন কিন্তু তিনি নিজে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড থেকে একটু বেশী। কতটা বেশী? *দশাঙ্গুলম্*, মানে দশ আঙ্গুল বেশী। দশ আঙ্গুল একটা ধারণা দেওয়ার জন্য বলা হচ্ছে, সমগ্র সৃষ্টিকে যদি মেপে নেওয়া হয় ভগবান সব সময় তার থেকেও বেশী হবেন।

বিজ্ঞানে দুটো মতবাদ আছে – একটাকে বলে Holism আরেকটাকে বলে Reductionism। Reductionismএর অর্থ হল Total is sum of his parts, অর্থাৎ মনে করা যাক এই বোতল আছে। বোতলটা কি? বোতল, জল আর ছিপি মিলিয়ে একটা পুরো জিনিষ। কিন্তু Holistic Theoryতে বলে The whole is more than sum of its parts। এর অর্থ হল, কোন বস্তুর অংশ বা টুকরোকে যদি যোগ করা হয় তাহলে যে যোগ হবে তার থেকে বস্তুর বাস্তবিক সামগ্রিকতাটা বেশী হবে। বিজ্ঞানের এই দুটো খুব নাম করা মতবাদ, আর এই দুই দলের মধ্যে সব সময় ঝগড়া লেগেই আছে। ভারতীয় দর্শনে এই থিয়োরীগুলো নিয়ে কোন আলোচনাই করবে না। মনে করা যাক এই পাখার ব্লেড থেকে শুরু করে এর সব অংশ গুলোকে যদি আলাদা করে দেওয়া হয় তাহলে পাখার অংশ আর পাখা এই দুটো একই জিনিষ হবে। তাহলে মানুষের হাত, পা, মাথা, চোখ সব অংশ গুলোকে যদি আলাদা করে দেওয়া হয় তাহলে কি আর মানুষ বলা যাবে? এই জায়গাতে এসে দুই দলে প্রচণ্ড তর্কাতর্কি লেগে যায়। বেশীর ভাগ বিজ্ঞানীরা বলবেন Reductionistরাই ঠিক। তাঁরা বলবেন, মানুষ মানে কতকগুলো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, এগুলো মিলিয়ে দিলেই মানুষ। ডাক্তাররা যেমন সব সময় শরীরের কোন অঙ্গে যে কোন ব্যাথা হলে সবাইকে প্যারাসিটামল খেতে দেন। কারণ ডাক্তারদের কাছে শরীরটাও একটা মেশিন। কিন্তু আসলে মানুষ হল Holistic, whole is more than sum of its parts। মানুষ কখনই Reductionist হতে পারে না। ফিজিক্সের সব নিয়মকে পুরোপুরি মেনে নিলে তখন এটাও মেনে নিতে হবে জগতের সমস্ত কিছুকে যদি একটা ইউনিটে জুড়ে দেওয়া হয় তাহলে জগতের sum total এনার্জী একই থাকবে। যার জন্য আগেকার পদার্থ বিজ্ঞানীরা বলতেন matter neither can be created nor destroyed, এখন বিজ্ঞানীরা বলছেন energy can neither be created nor destroyed, কিন্তু sum total of energy সব সময় সমান থাকবে। যদি sum total of energy সব সময় সমান থাকে তাহলে পুরো জিনিষটা Reductionist Theory হয়ে যাচ্ছে। এবার এখানে ভগবানকে যদি নিয়ে আসা হয়, তাহলে যাবতীয় যা কিছু আছে, জীবাত্মা, জড় পদার্থ, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব কিছু মিলিয়ে ভগবান। কিন্তু বেদ এই মতে যাবে না, বেদ বলবে *স ভূমিং বিশ্বত বৃত্বা অত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্*। ভগবান sum totalএর থেকে দশ আঙ্গুল

বেশী। দশ আঙ্গুলটা একটা সংখ্যা সূচক, এটাকে আক্ষরিক ভাবে নিতে নেই, ভগবান সব সময়ই বেশী হবেন, কতটা বেশী হবেন সেটা বড় কথা নয়, তাই এটাকে বোঝাবার জন্য একটা সংখ্যা বলে দিলেন।

বেদের পুরুষসূক্তমের এই গূঢ় তত্ত্বকেই ভাগবতে এই কাহিনীর মাধ্যমে খুব কৌশলে নিয়ে আসা হয়েছে। ভগবানের শরীর দু-আঙুল বড়, মানে দড়ি দু আঙুল ছোট। দু-আঙুল কম পড়তেই মা যশোদা আরও দড়ি এনে জোড়া দিয়ে বাঁধতে যাচ্ছেন। দেখছেন তখনও দু-আঙুল কম পড়ছে। যত দড়ি নিয়ে বাঁধছেন সব সময় দু-আঙুল দড়ি কম পড়ছে। ভাগবত সব সময় তার দৃষ্টি দিয়ে রেখেছে আমাদের বেদ উপনিষদের তত্ত্বে কি বলছে তার দিকে। তাই ভগবানের যে কোন লীলার বর্ণনা, ভগবান যা কিছু করছেন তার সব বর্ণনার আড়ালে একটা তত্ত্ব লুকিয়ে আছে, সেই তত্ত্ব আবার বেদ উপনিষদের উপর আধারিত। ভাষ্যকাররাও ভাগবতে ভগবানের লীলার বর্ণনা গুলিকে তাঁদের নিজস্ব দর্শন অনুযায়ী অর্থ করে বিভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলাতে এমন অনেক সাধারণ ঘটনা আছে যেগুলোর এমন কিছু তাৎপর্য নেই, সব বাচ্চারাই এমন করে থাকে, কিন্তু ভক্তরা যখন এগুলোকে ব্যাখ্যা করবেন তখন বিশেষ ভাবে ব্যাখ্যা করে এর অনেক তাৎপর্য দেখিয়ে দেবেন। যেমন শ্রীকৃষ্ণকে উলূখলে বাঁধা নিয়ে ব্যাখ্যাকাররা বলছেন – উলূখলের খল মানে দুষ্ট, শ্রীকৃষ্ণ যেন খলদের সাথে বেশী সঙ্গ না করতে পারে সেইজন্য উলূখলের সাথে তাঁকে বাঁধা হচ্ছে। দ্বিতীয় একটা ব্যাখ্যাতে বলছেন – এই উলূখলের উপর পা রেখেই শ্রীকৃষ্ণ মাখন চুরি করেন বলে উলূখলও সমান দোষে দোষী, তাই একেও বেঁধে রাখতে হবে। যখন সাধারণ মানুষের সামনে ভাগবত পাঠ করা হয় তখন এই ধরণের ব্যাখ্যা গুলো খুবই উপজীব্য হয়ে ওঠে, শ্রোতার মনে একটা ভাব জাগিয়ে দেওয়ার জন্য এইভাবে ব্যাখ্যা করা হয়।

আবার বলছেন দড়ির আরেকটি নাম গুণ, গুণ বলতে আবার তিনটে গুণ সত্ত্ব, রজ ও তমকেও বোঝায়। এখানে ব্যাখ্যাকাররা বলছেন – যিনি অখণ্ড চরাচর তাঁকে গুণ দিয়ে বাঁধবে কি করে! ভগবানকে কখন এই তিন গুণ দিয়ে বাঁধা যায় না অথচ তিনি এই তিনটে গুণের মধ্যেই অবস্থান করেন। এই তিনটে গুণকে আবার মায়াও বলা হয়। যশোদা দড়ি দিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে বাঁধার চেষ্টা করে যাচ্ছেন, তাই বলছেন দড়ি দিয়ে অর্থাৎ মায়া দিয়ে কখন ভগবানকে বাঁধা যায় না। মায়া যখনই ভগবানকে বাঁধতে যায় তখন মায়া যেন একটু কম পড়ে যায়। স্বামীজীর নামে গিরিশ ঘোষ বলছেন, স্বামীজী এত বিশাল যে, মায়া যখনই স্বামীজীকে বাঁধতে যায় স্বামীজী তত বিশাল হয়ে যান, মায়া সেখানে কম পড়ে যায়। আরেকটি ব্যাখ্যাতে বলছেন দড়ি হল গোবন্ধক, মানে দড়ি দিয়ে গরুদের বাঁধা হয়। গো শব্দের আরেকটি অর্থ ইন্দ্রিয়, দড়ি সব সময় এই ইন্দ্রিয়গুলিকে বাঁধে কিন্তু ভগবান হলেন এই ইন্দ্রিয়দের স্বামী, দড়িদের সাধ্য কোথায় যে তারা তাদের স্বামীকে বাঁধবে! বেদান্তের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যিনি অধিষ্ঠান তাঁর মধ্যে মায়া থাকতে পারে না, মায়া সব সময় অধ্যস্ত। যেমন মরুভূমিতে কখন মায়া থাকে না, কিন্তু যখন মরুভূমিতে মরীচিকা দেখা যায় সেটাই তখন মায়া। তিনি অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের অধিষ্ঠান, সেইজন্য মায়া দিয়ে কখন তাঁকে বাঁধা যাবে না।

দু আঙুলই কেন কম পড়ছে তার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে আমাদের পণ্ডিতরা বলছেন – যেখানেই বন্ধন সেখানেই নাম আর রূপ থাকবে। নাম আর রূপ থাকাটাই মায়া, মায়া মানেই বন্ধন। এই দুটো জিনিষ, নাম আর রূপ ভগবানের মধ্যে নেই। শ্রীকৃষ্ণ যেন মা যশোদাকে বোঝাতে চাইছেন, তুমি যে আমার শ্রীকৃষ্ণ নাম আর রূপ দেখছো এটা আমার বাস্তবিক রূপ নয়, ভগবানকে নাম-রূপের বন্ধনে বাঁধা যায় না বলেই দু-আঙুল কম পড়ছে। শ্রীকৃষ্ণ দেখছেন মা খুব ক্লান্ত ও ঘর্মাক্ত কলেবরে অবসন্ন হয়ে সব হাল ছেড়ে দিয়েছেন, মাকে আর বিরক্ত করে কাজ নেই। করুণাসিন্ধু ভগবান ভক্তের কাছে নিজেকে ধরা দেবার জন্য হঠাৎই মায়ের বন্ধনে নিজেকে ছেড়ে দিলেন। ভগবান যখন দেখেন ভক্ত ক্লান্ত হয়ে পড়ছে তখন তিনি নিজেকে ভক্তের কাছে ছেড়ে দেন। কিন্তু যতক্ষণ বাঁধার প্রয়াস করে যাবে ততক্ষণ তিনি ধরা দেবেন না। কিন্তু ভক্ত যখন অসহায় হয়ে বলে 'আমার সব চেষ্টাই বিফলে গেল, আমি আর পারছি না প্রভু! তুমি কৃপা কর প্রভু'। তখন তিনি ধরা দেন। আবার একটা ব্যাখ্যাতে বলছেন, ভগবান কখন কারুর শক্তি, সাধন, সামগ্রী দিয়ে বন্ধনে পড়েন না। তিনি নিজে থেকে যখন চাইবেন আমি বন্ধনে পড়ব তখনই তিনি বন্ধনে পড়েন।

শরণাগতির ভাব পাকা করার উপায়

এখানে প্রসঙ্গ থেকে একটু সরে এসে আমরা একটা অন্য জিনিষ নিয়ে আলোচনা করে নিলে জিনিষটা বুঝতে সুবিধা হবে। আমরা প্রায়ই ঠাকুরের ইচ্ছা, ভগবানের ইচ্ছা নিয়ে অনেক কথা বলি, এই নিয়ে অনেক আলাপ আলোচনাদিও করে থাকি। সব হিন্দুরাই বলে ঠাকুরের ইচ্ছা, মুসলমানরাও বলে আল্লার ইচ্ছা, খ্রীশ্চানরাও বলে God's will। কিন্তু এটা কিছুতেই বোঝান যায় না যে, খ্রীশ্চান ধর্মে বা ইসলামে বা অতি সাধারণ লোক যে ঈশ্বরের ইচ্ছার কথা বলে তাতে ঈশ্বরের ইচ্ছা বলতে বোঝায় যেন সব কিছু আগে থাকতেই তিনি ইচ্ছা করে রেখেছেন। আমার হাত থেকে কলমটা কেন পড়ে গেল? ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই পড়েছে। হিন্দু ধর্মে যদি বলা হয় কলমটা তাঁর ইচ্ছাতেই পড়েছে তাহলে কিন্তু হিন্দু ধর্মের মূল দর্শনের কোন অস্তিত্বই থাকবে না, হিন্দু দর্শনের ইমারত হুড়মুড় করে ভেঙে তছনছ হয়ে যাবে। আবার ঈশ্বরের ইচ্ছায় যদি না পড়ে থাকে বলা হয় তখন কিন্তু ইসলাম, খ্রীশ্চান আর জুদাইস ধর্মও ভেঙে চুড়মাড় হয়ে যাবে। সেই কারণে দর্শনের দিক দিয়ে হিন্দু ধর্মের সাথে অন্য কোন ধর্মের কখনই মিল হবে না। হিন্দু ধর্মের মূল দর্শন বলছে ঈশ্বরের বাইরে কোন কিছু নেই, চৈতন্য সত্তার বাইরে জগতের কোন কিছুই নেই। এটা ঠিকই, যা কিছু হচ্ছে সব তাঁর ইচ্ছাতেই হচ্ছে। এখানে যদি বলা হয় আগে থেকেই সব ঠিক করা আছে, তার মানে যদি কর্মবাদের দিকে চলে যাওয়া হয়, তখন ওই অর্থে কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছা বলে কিছু থাকবে না। আমাদের কাছে ঈশ্বরের ইচ্ছা মানে, যাই হোক না কেন সব তাঁর ইচ্ছাতেই হয়। কিন্তু আসল যে কর্মটা হয় সেটা হয় কর্মের গতিতে। হিন্দু ধর্ম কর্মবাদের উপর বেশী জোর দেয়, তারা বলে তোমার এই রকম কর্ম করা ছিল বলে আজ তোমার এই অবস্থা হয়েছে। তাই ঈশ্বরের উপর কোন দোষ চাপিয়ে দেওয়া যায় না। কেন একজন আরেকজনের উপর অত্যাচার করছে? হিন্দুরা বলবে এরা এক সময় অন্যদের উপর অত্যাচার করেছিল বলে আজ তাদের উপর এই অত্যাচার হচ্ছে। মুসলমান ও খ্রীশ্চানরা বলবে আল্লা বা গডের ইচ্ছাতেই হচ্ছে। তাহলে একজনের উপর অত্যাচার করার পাপটা কার লাগবে? মুসলমান বা খ্রীশ্চানদের মত মানলে ঈশ্বরেরই পাপ লাগার কথা। ঈশ্বরের যদি পাপ লাগে তাহলে তিনি আর সর্বশক্তিমান হলেন কি করে! এগুলো খুব বিতর্কিত ব্যাপার। আর এর সমাধানও কোথাও দেওয়া হয় না। তবে ঈশ্বরের কাছে আমাদের প্রার্থনা করাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়। প্রার্থনাতে যে আমাদের সব কিছু পূরণ হয়ে যাবে তা নয়, কিন্তু যত ঝড়-ঝাপ্টা, দুঃখ-বিপদ আসুক না কেন সেটাকে সহ্য করার একটা অদম্য শক্তি ভেতরে চলে আসে। যেটা হবার সেটা হবেই, কিন্তু প্রার্থনা করলে যাই জীবনে আসুক না কেন, ভালো হোক মন্দ হোক, সব কিছুকে স্বাভাবিক ভাবে গ্রহণ করার শক্তিটা উন্মোচিত হয়ে যায়। আমার ইচ্ছা মত জীবন কোন দিন চলবে না, জীবন জীবনের মতই চলবে। সাফল্য, ব্যর্থতা, জীবন, মৃত্যু যাই আসুক না কেন সব কর্মের গতিতে আসবে আবার চলে যাবে। মাথা ঠুকে ঠুকে ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করলে একটা বিশ্বাসই জন্ম নেবে যে প্রার্থনা দ্বারা কিছুই হয় না, সব কিছু নিজের মত চলবে। প্রার্থনার এই পরিণামের উপর যখন বিশ্বাস জন্মাবে তখনই ভেতরে ঠিক ঠিক শরণাগতির ভাব পাকা হতে শুরু হবে।

এই শরণাগতির ভাব ঠিক ঠিক পাকা হবে তখনই যখন ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের যে বাল্যলীলার বর্ণনা করা হয়েছে, এই অতি দুরন্ত বালকের দস্যিপনাকে যখন নিজের ইষ্টের দস্যিপনা রূপে গ্রহণ করা হবে। যখনই নিজের ইষ্টকে ছোট্ট দুরন্ত বালক শ্রীকৃষ্ণের মত দেখা হবে তখন চিন্তা আসবে এই দস্যি বালককে আমাকেই তো সামলে রাখতে হবে। মা যশোদাকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দু-দুবার দেখিয়ে দিলেন পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আমার মধ্যে অবস্থিত, কিন্তু তবুও শ্রীকৃষ্ণের প্রকৃত স্বরূপ যশোদার মাথায় ঢুকছে না। যশোদার সব সময় দুশ্চিন্তা আমি যদি আমার কৃষ্ণকে না দেখি তাহলে কে দেখবে! শ্রীরামকৃষ্ণের ঠিক এই ভাব হয়েছিল যখন তিনি রামলালাকে নিয়ে স্নান করাচ্ছেন, খাওয়াচ্ছেন। ইষ্টের প্রতি যখন এই ভাব আসে, আমি ছাড়া তো তাঁকে আর কেউ সামলাবার নেই, তখন আমাদের যত রকমের বোকা বোকা প্রার্থনা, হে ঠাকুর আমার বাড়িটা ঠিক করে দাও, হে ঠাকুর আমার যেন একটা চাকরি হয়, ঠাকুর আমার যেন সব ঝামেলা মিটে যায়, এই জিনিষগুলো মন থেকে খসে পড়ে যায়। এখানে কি হচ্ছে, আমার যে ভগবান তাকে তো আমাকেই সামলাতে হয়, তিনি আমাকে কি সামলাবেন! যশোদা শ্রীকৃষ্ণের কাছে কী প্রার্থনা করবেন! উল্টে তাঁকেই শ্রীকৃষ্ণকে সামলাতে হচ্ছে। এই ভাব

নিয়ে যাঁরা নিজের ইষ্টকে ছোট্ট বালগোপাল রূপে সেবা করবেন তাঁদের আধ্যাত্মিক অগ্রগতি অনেক দ্রুত গতিতে হবে। তার থেকে আরও যেটা গুরুত্বপূর্ণ তা হল, ভগবানের সান্নিধ্য অনেক নিবিড় হবে। কারণ তিনি তো জানেন আমার জাগতিক চাহিদা আমার এই ছোট্ট ভগবান কোন দিন মেটাতে পারবেন না। শ্রীরামকৃষ্ণ যাঁর ইষ্ট তিনি যদি মনে করেন আমার ইষ্ট আমাকে কি করে সামলাবেন! যিনি নিজের কোমরের ধুতিটাই সামলাতে পারতেন না, তাঁকে আর আমার ঝামেলার কথা বলে কি লাভ হবে! যিনি সমাধিতে লীন হয়ে থাকেন তাঁকে আমি আমার কী সমস্যার কথা বলতে যাব! এই ভাব যখন এসে যায় তখন কর্মটাই প্রধান হয়ে যায়, কর্ম নিজের গতিতে চলবে। কর্মের গতিতে সব কিছু চলছে এই বিশ্বাসের উপর যখন দৃঢ় প্রত্যয় এসে যাবে তখন ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করা, ঈশ্বরের কাছে কোন কিছুর প্রত্যাশা করা বন্ধ হয়ে যাবে। জঙ্গীরা কেন এত অত্যাচার করছে? নারীদের প্রতি এত অত্যাচার কেন হচ্ছে? আমেরিকা কেন অন্যায় ভাবে অন্য দেশের লোকদের খুন করে যাচ্ছে? এই ধরণের নানান প্রশ্নও আর মনের মধ্যে তখন আসবে না।

লোকমুখে প্রচলিত সুরদাসের জীবনের একটা খুব সাধারণ ঘটনা আছে। সুরদাসের ইষ্ট হলেন এই বালগোপাল শ্রীকৃষ্ণ। তিনি একবার কাশীতে গেছেন। রাস্থা দিয়ে যাচ্ছেন তখন একটা রব উঠল পাগলা হাতি সবাইকে তাড়া করেছে। সুরদাস ছিলেন অন্ধ। তিনি ওই চেঁচামেচি শুনতেই প্রাণ ছেড়ে রাস্থা ছেড়ে পালিয়ে গলির ভেতরে ঢুকে গেছেন। সুরদাসকে তখন একজন বলছেন, আপনি কেন পালাচ্ছেন? আপনার ইষ্টই আপনাকে রক্ষা করবেন। সুরদাস শুনে খুব সুন্দর বলছেন – আমার ইষ্ট আমাকে কি রক্ষা করবেন! তাঁকেই তো আমায় রক্ষা করতে হয়, আমার বালগোপাল ছোট্ট বাচ্চা ছেলে আমি না দেখলে কে তাঁকে দেখবে!

যমলার্জুন উদ্ধার

নবম অধ্যায়েই একটা কাহিনীর প্রেক্ষাপট তৈরী করা হয়েছে, যেটা দশম অধ্যায়ে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এখানে একদিকে যেমন মায়ের সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাওয়ার পর মা ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে পড়েছেন তখন ভগবান মায়ের বন্ধনে নিজেকে সঁপে দিলেন, অন্য দিকে এর থেকেও বেশী গুরুত্ব ছিল শ্রীকৃষ্ণ জানতেন তাঁকে দু-জন অভিশপ্ত যক্ষকে উদ্ধার করতে হবে। উলূখলে যদি শ্রীকৃষ্ণকে না বাঁধা হয় তাহলে ভগবানের একটি গুরুত্বপূর্ণ লীলা পোষ্টাই হবে না। শ্রীকৃষ্ণের যমলার্জুন উদ্ধার লীলার খুব গভীর তাৎপর্যপূর্ণ মাধুর্য হল, তিনি নিজের বন্ধন দিয়ে অপরের বন্ধন মোচন করেন। এখান থেকেই ঠিক ঠিক যমলার্জুনের কাহিনী শুরু হয়। যমলার্জুন মূলতঃ দুটো অর্জুন গাছকে নিয়ে শ্রীকৃষ্ণের একটি লীলা কাহিনী। ভগবান হলেন সচ্চিদানন্দ, তিনি সব সময়ই আছেন। কিন্তু তাঁর থেকে যখন সৃষ্টি হয় তখন সেই সৃষ্টিতে তিনি বিভিন্ন রকমের জাতি, প্রজাতি, জীবের সৃষ্টির সঙ্গে অনেক রকম দিব্য জিনিষেরও সৃষ্টি করনে। এই দিব্য সৃষ্টির মধ্যে যক্ষদের কাজ হল দেবতাদের ধন সম্পদের রক্ষণা-বেক্ষণ করা। যক্ষদের রাজা হলেন কুবের। আমাদের পরম্পরাতে সাধারণতঃ শক্তি ঈশ্বরের সঙ্গেই থাকেন। যেমন শিব আর শক্তি সব সময় একসাথে আছেন। তেমনি ব্রহ্ম আর শক্তি একসঙ্গে আছেন। একমাত্র ভগবান বিষ্ণু আর লক্ষ্মী এইভাবে এক সঙ্গে থাকেন না। লক্ষ্মীর জন্ম অনেক পরে সমুদ্র মন্থনের সময় হয়েছিল। সেইজন্য শ্রী আর বিষ্ণু প্রথম থেকেই একসঙ্গে ছিলেন না, পরে একসাথে হয়েছেন। একটা কাহিনীতে বলা হয় ভগবান বিষ্ণু লক্ষ্মীকে বিবাহ করার সময় পত্নীকে প্রচুর অলঙ্কারাদি দিতে হয়েছিল। বিষ্ণু অত টাকা কোথায় পাবেন! ভগবান বিষ্ণু তখন কুবের থেকে অনেক টাকা ধার করেছিলেন। বলা হয় ভগবান বিষ্ণু কুবেরের ধার এখনও নাকি শোধ করতে পারেননি। তিরুপতি মন্দিরে যত প্রণামী পড়ে সব অর্থ নাকি কুবেরের ধার শোধ করতেই চলে যায়।

এই কুবেরের দুটি খুব প্রিয় সন্তান ছিল, এদের নাম ছিল নলকূবর ও মণিগ্রীব। কুবেরের সন্তান বলে কথা, জগতের সব থেকে ধনীর সন্তান, এদের কে সামলাবে! কিছুদিন আগে এক এমএলএর ছেলে তার গাড়ীর সামনে সাইনবোর্ড লাগিয়েছে, তাতে লেখা 'পূর্ব বিধায়ক পুত্র', বর্তমান বিধায়ক নয়, আগে বাবা কোন সময় এমএলএ হয়েছিল, তার ছেলেরই এত অহঙ্কার যে গাড়ীতে সাইনবোর্ড লাগিয়ে বলে দিতে হচ্ছে। এগুলো নতুন কিছু নয়। কত হাজার হাজার বছর আগে এই ধরণের ঘটনা আমাদের শাস্ত্রে বর্ণনা করে দেখিয়ে

দেওয়া হয়েছে। বড়লোকের ছেলেদের হাতে প্রচুর টাকা, ইয়ং ছেলেদের হাতে মোটা টাকা এসে গেলে প্রথমেই তারা মেয়ে আর মদের পেছনে ছুটবে। বলছেন – কুবেরের এই দুই পুত্রের শ্রীমদ্ ছিল। শ্রীমদ্ মানে যখন প্রচুর ধন-সম্পত্তি হয় তখন আরও ধন-সম্পত্তি অর্জন করার নেশা। আর যখনই প্রচুর ধন-সম্পদ হয়ে যাবে তখন তিনটি সমস্যা তাকে গ্রাস করে নেবে, এই তিনটে হল – মেয়ে, মদিরা আর জুয়া। তার সাথে এরা আবার হয়ে গেল শিবের গণ, তাতে তাদের আরও অহঙ্কার আর ঔদ্ধত বেড়ে গেছে।

একদিন নলকূবর আর মণিগ্রীব এক সরোবরে নিজেদের মেয়ে ইয়ার বন্ধুদের নিয়ে অর্থাৎ অপ্সরাদের সঙ্গে জলকেলি করছিল। দেবর্ষি নারদ সেই সময় ঐ সরোবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। সরোবরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় দেবর্ষিরও খুব অস্বস্তি হচ্ছিল। ***তং দৃষ্ট্বা ব্রীড়িতা দেব্যো বিবস্ত্রাঃ শাপশঙ্কিতাঃ। বাসাংসি পর্যধুঃ শীঘ্রং বিবস্ত্রৌ নৈব গুহ্যকৌ।।*** *১০/১০/৬।* দেবর্ষি নারদকে দেখে যত অপ্সরা ছিল সবাই লজ্জা পাওয়ার থেকে মনের মধ্যে ভয়টা বেশী ঢুকে গেছে, এক্ষুণি কোন অভিশাপ না দিয়ে দেন। সাধু-সন্ন্যাসীদের সামনে সবারই আচার আচরণ ও ব্যবহারের একটা রীতি আছে, সেই রীতিকে কখনই উল্লঙ্ঘন করতে নেই। কারণ এনারা অত্যন্ত শুদ্ধ-পবিত্র হন। সাধু-সন্ন্যাসীদের মধ্যে যাঁরা গোলমেলে হন, তাঁরাও সাধারণ মানুষের থেকে অনেক উপরে থাকেন। কোন সাধুর মধ্যে যতই গণ্ডগোল থাকুক না কেন, কিন্তু যেদিন তিনি সাধু হওয়ার জন্য বাড়ি ছেড়েছেন সেই দিন থেকে আজ পর্যন্ত, কখনও না কখনও তিনি নিঃস্বার্থ ভাবে ভগবানকে একবারের জন্যেও ডেকে থাকবেন। সাধারণ মানুষ যত বড় ধার্মিকই হোক না কেন, ভালো করে বিচার করে দেখলে দেখা যাবে সম্পূর্ণ ভাবে নিঃস্বার্থ তারা কখনই হতে পারে না। আর ভক্তরা তো মন্দিরে ঠাকুরের কাছে যখনই যায় তখনই একটা বিরাট লম্বা ফর্দ ঠাকুরের হাতে ধরিয়ে দিয়ে আসবে। সেই ফর্দে কী না নেই, আমার যেন চুল না পড়ে যায়, এই প্রার্থনা থেকে শুরু করে আমার মেয়ের যেন একটা ভালো পাত্র জোটে, তারপর প্রমোশন হওয়া, রোগ ভালো হওয়া, ছেলের চাকরি পাওয়া পর্যন্ত দুনিয়ার সব প্রার্থনা ওই ফর্দের মধ্যে থাকবে। আমাদের কাছে ভগবান হলেন আলাদীনের জিনের মত, যখন যেটা চাইব সেটাই সেই ভগবান নামক জিন সঙ্গে সঙ্গে করে দিয়ে আমাদের সব মনোবাসনা, ইচ্ছাকে পূর্ণ করে দেবেন। কিন্তু সাধু-সন্ন্যাসীদের মানুষ যতই গালাগাল দিক, তাঁরা কোন না কোন সময়ে ভগবানকে নিঃস্বার্থ ভাবে ডেকেছেন, আর কখন না কখন ঈশ্বরের জন্য তাঁর চোখ থেকে দু-ফোঁটা জল বেরিয়ে থাকবে। আমাদের চোখের জল, বাদ-বিবাদ শুধু কামিনী-কাঞ্চনের জন্য। ঠাকুর বলছেন — মানুষ মাগ-ছেলের জন্য ঘটি ঘটি কাঁদে ঈশ্বরের জন্য কে কেঁদেছে! কিন্তু সাধু যতই লম্পট হয়ে যাক, লম্পট হওয়ার আগে কখন না কখন তাঁর ঈশ্বরের দিকে মন ছিল আর ঈশ্বরের জন্য কোন না কোন সময় দু-ফোঁটা চোখের জল সে ফেলে থাকবে। সেইজন্য যে কোন সাধু-সন্ন্যাসীদের থেকে খুব সাবধানে থাকতে হয়। আর যিনি ঠিক ঠিক শুদ্ধ-পবিত্র সন্ন্যাসী, তাঁর তো কোন কথাই নেই, তাঁর মন তো সব সময় ঈশ্বরে লেগে আছে, তাঁর আশীর্বাদ ফলবেই আর তিনি যদি কারুর উপর রুষ্ট হয়ে যান, তাঁর ঐ রাগ তাকে শেষ করে দেবে, কেউ বাঁচাতে পারবে না। অপ্সরারাও তাই ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি কাপড় চোপড় দিয়ে নিজেদের অনাবৃত শরীরকে আচ্ছাদিত করে নিয়েছে।

কিন্তু কুবেরের ছেলে দুটো এমন মদ আর মেয়েতে আসক্ত হয়ে আছে যে নারদকে দেখেও তাদের কোন হুঁশ নেই, কোন জামা কাপড়ও পরিধাণ করা ছিল না। চিরকাল এই একই জিনিষের পুনরাবৃত্তি হয়ে আসছে। আমরা যে বলি আজকালকার ছেলেমেয়েরা একেবারে উচ্ছন্নে গেছে, কিন্তু তারা একবার আমাদের এইসব শাস্ত্রগুলো খুলে দেখুক, এ জিনিষ সেই প্রাচীন কাল থেকে চলে আসছে। যুবকদের হাতে যদি প্রচুর টাকা-পয়সা আর ক্ষমতা চলে আসে এরা স্বভাবতই প্রচণ্ড ঔদ্ধত হয়ে ওঠে, বড়দেরও তখন এরা কোন সম্মান দেবে না। নারদ দেখে খুব অসন্তুষ্ট হয় গেছেন, সাধু সন্ন্যাসীদের সামনে এই ভাবে এসে কেউ দাঁড়াতে সাহস পায় কি করে! টিভি সিরিয়াল, হিন্দী সিনেমাতে স্বল্পবাস মেয়েরা ছেলেদের সাথে নাচ-গান করছে দেখে সবাই বলছে অপসংস্কৃতিতে দেশ গোল্লায় গেছে। আর ভাগবতে বর্ণনা করছে মেয়েরা কাপড় ছাড়াই স্নান করছে, একটা দুটো নয়, অনেক মেয়ে, সেখানে শুধু মেয়েরাই নেই, ছেলেরাও আছে। ছেলেদের সঙ্গে মেয়েরা উলঙ্গ হয়ে স্নান করছে। এই যুগেও সুইমিং পুলে এইভাবে স্নান করার কারুর দম হবে না। কিন্তু এদের কাছে এগুলো

কোন ব্যাপারই ছিল না, চিরদিনই ভোগ, ঐশ্বর্যের মধ্যে এভাবেই ডুবে থাকত আর এখনও এভাবেই আছে। জগৎ কোন দিন পাল্টায় না। কিছু লোকে এসব দেখে না সিটকায়, সেটাও আবার লজ্জাতে বা নিন্দা করার জন্য সিটকায় না, নিজেদের করার সেই ক্ষমতা নেই, সুযোগ পাচ্ছে না বলে সিটকাচ্ছে, সুযোগ পেলে সেও ঝাঁপিয়ে পড়তে এক মুহূর্ত সবুর করবে না। ঘুষখোর দেখলে গায়ে জ্বালা ধরে, কারণ সে ঘুষ নেওয়ার সুযোগ পাচ্ছে না, সুযোগ পেলে আবার বুকের সেই পাটা নেই যে ঘুষ চাইবে। নারদ কিন্তু এদের এই বেলেল্লাপানা দেখে খুব অসন্তুষ্ঠ হয়ে গেছেন।

কুবেরের সন্তানদের প্রতি নারদের উপদেশ

তৌ দৃষ্টা মদিরামত্তৌ শ্রীমদান্ধৌ সুরাত্মজৌ। তয়োরনুগ্রহার্থায় শাপং দাস্যন্নিদং জগৌ।। ১০/১০/৭। একজন ঋষি সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন, তাও এদের লজ্জা নেই, মেয়েরাও তাও কিছুটা লজ্জিত হয়ে জামা-কাপড়ে নিজেদের আচ্ছাদিত করে নিয়েছে, কিন্তু কুবেরের দুটো সন্তানই একেবারে উন্মত্ত হয়ে ভোগের মধ্যে ডুবে আছে, ঋষিকেও সম্মান জানাতে ভুলে গেছে। নারদ তখন কুবেরের সন্তানদের অনুগ্রহ করার জন্যই অভিশাপ দিতে উদ্যত হয়ে বলছেন – ***ন হ্যানো জুষতো জোষ্যান্ বুদ্ধিভ্রংশো রজোগুণঃ। শ্রীমদাদাভিজাত্যাদির্যত্র স্ত্রী দ্যুতমাসবঃ।।১০/১০/৮।*** দেবর্ষি নারদ বলছেন 'যারা বিষয়সেবন করে তাদের বুদ্ধিকে বিনাশ করার জন্য সব থেকে বড় মদ হল শ্রীমদ্'। ভোগ মানেই বুদ্ধির নাশ হবেই। শ্রী মানে যাদের প্রচুর ধন-সম্পদ, মান-যশ আছে। শ্রী অনেকেরই থাকতে পারে কিন্তু শ্রী থাকলেই যে শ্রীমদ্ হবে তা নয়, যারা বিষয়সেবন করছে না অথচ শ্রী আছে তাদের শ্রীমদ্ হবে না। এর খুব ভালো উদাহরণ হল বিড়লা পরিবার। বিড়লা পরিবার প্রচুর ধন-সম্পদের মালিক, কিন্তু এঁদের পরিবারের সদস্যরা কখনই বিষয়সেবন করেন না। যার জন্য বিড়লা পরিবারের কেউ ঔদ্ধত হয়েছে শোনা যায় না। কিন্তু এখন এমন অনেক নতুন নতুন উঠতি কোটিপতি হয়েছে যাদের নানা রকমের কেচ্ছা কাহিনী রোজ খবরের কাগজে বেরোচ্ছে। এরাই ঠিক ঠিক শ্রীমদ্, মানে এরা শ্রী জিনিষটা হজম করতে পারছে না, কারণ এরা বিষয়সেবন করছে। ঘনশ্যাম দাস বিড়লা গান্ধীজীর সমসাময়িক ছিলেন এবং তিনি নিজেও গান্ধীজীর একান্ত অনুগামী ছিলেন, তিনি তাঁর সন্তানদের বলতেন 'দেখো বাপু! আমরা হলাম সমাজের ট্রাস্টি, আমাদের কাছে যা কিছু ধন-সম্পদ আছে এগুলো আমাদের ভোগ করার জন্য নয়, এই ধন-সম্পদের আমার শুধু ট্রাস্টি'। ভোগবিলাস বিড়লারা জানেই না। নারদ ঠিক এই কথাই বলছেন 'শ্রীমদ্ যদি হয়ে যায় তখন এর থেকে বিপজ্জনক আর কিছু হতে পারে না'। দেবর্ষি বলছেন 'রজোগুণ থেকে উৎপন্ন হিংসা আর উচ্চকুলে জন্মলাভজনিত অভিমান, কিংবা কেউ যদি মনে করে আমার বিরাট পাণ্ডিত্য আছে এগুলোও শ্রীমদের মত ক্ষতিকারক নয়'। শ্রীমদ্এর শ্রী হল টাকার অর্থে কিন্তু এর সাথে ঐশ্বর্য, ক্ষমতা ইত্যাদি আরও অন্যান্য জিনিষকে এক সঙ্গে মিলিয়ে শ্রীমদ্ বলা হচ্ছে। শ্রীমদের সাথে আরও তিনটে জিনিষ অবশ্যম্ভাবি ভাবেই জড়িয়ে যাবে, এই তিনটে হল – স্ত্রীব্যসন, দ্যুতক্রীড়া আর মদ্যপান। টাকা যেখানে থাকবে মেয়েমানুষও সেখানে এসে জুটে যাবে, মেয়েমানুষ জুটে গেলে মদও এসে যাবে আর জুয়াও এসে যোগ দেবে। এগুলো খুব পুরনো সমস্যা, বিশেষ করে আগেকার দিনের বড়লোকদের এগুলো নিত্য সমস্যা ছিল। অথচ গত দুশ তিনশ বছরের এই সমস্যা অনেক কমে গিয়েছিল। টাকা যার আছে এই তিনটে জিনিষ তার কাছে আসবেই। সেইজন্য শ্রীমদ্ মানুষকে একেবারে বিনাশের দিকে টেনে নিয়ে যায়।

দ্বিতীয় হল ***হন্যন্তে পশবো যত্র নির্দয়ৈরজিতাত্মভিঃ। মন্যমানৈরিমাং দেহমজরামৃত্যু নশ্বরম্।। ১০/১০/৯।*** এই ধরণের শ্রীমদ্ বিশিষ্ট লোকেরা প্রথমে নিজেদের অজর অমর মনে করে আর তারপরেই নিজের মতই শরীর যাদের আছে তাদের পশুর মত নৃশংশ ভাবে হত্যা করে নিজেদের নশ্বর দেহের পরিতৃপ্তি করতে ব্যস্ত থাকে। একমাত্র মানুষই নিজের স্বজাতিকে বিনা কারণে মারে, মানুষ ছাড়া অন্য কোন পশুদের মধ্যে এই রকম স্বজাতি নিধন দেখা যায় না। একমাত্র যে প্রজাতির মধ্যে একটি পুরুষকে কেন্দ্র করে বংশ বিস্তার হয়, যেমন বানররা যখন একটা গ্রুপ করে চলে তখন তাদের মধ্যে একটাই পুরুষ থাকে আর সব কটা মেয়ে বানর। বানর মানেই এক পাল মেয়ে আর একটি মাত্র পুরুষ। কোন মেয়ে বানরের যদি ছেলে হয়ে যায়

তখন ওই পুরুষ বানরটা সঙ্গে সঙ্গে সেই বানরটাকে মেরে ফেলে। এই একটি ক্ষেত্রেই কোন পশু তার স্বজাতি পশুকে মারতে দেখা যায়, তাছাড়া আর কোথাও মারবে না। হাতিদের ক্ষেত্রেও এই একই ব্যাপার দেখা যায়। কিন্তু তাতে এক অপরের মাংস খায় না। নেকড়েরা যদি নিজেদের মারামারি করে মারা যায় তখন অন্য নেকড়েরা তার মাংস খায়। কিন্তু সাধারণ অবস্থায় নেকড়ে নেকড়েকে মারবে না। কোন কারণে যদি দুটো নেকড়ের মধ্যে লড়াই লাগে, আর যদি খাদ্যের অপ্রাচুর্য দেখা দেয় তখনই এই ধরণের পরিস্থিতি তৈরী হয়। কিন্তু প্রাণীদের মধ্যে একমাত্র মানুষই অকারণে মানুষকে মারতে পারে। কেন করে? টাকা আর ক্ষমতার জন্য। অথচ নিজেকে মনে করে অজর, অমর, আমি কোন দিন মরবো না। সন্ত্রাসবাদীরা যে নিজের জীবন বিপন্ন করে এত লোক মারছে, তারাও মনে করছে আমি যদি এভাবে মারা যাই তাহলে স্বর্গে যাব, স্বর্গে গিয়ে আমি অজর অমর হয়ে থাকবো। দেখা যায় গরীব কখন গরীবকে খুন করে না। খুনোখুনি হয় তাদেরই মধ্যে যাদের ঐশ্বর্য আছে, যাদের মধ্যে শ্রীমদ্ আছে। এরা নিজদের অজর অমর মনে করছে, আমি চিরদিন বেঁচে থাকবো, আমার প্রচুর ক্ষমতা, আমাকে কেউ কিছু করতে পারবে না, এই ভেবেই এরা মত্ত হয়ে নিজের সামনের মানুষগুলিকে পশুর মত মনে করে। নারদ এই কথা বলে যাচ্ছেন।

দেবর্ষি নারদ কুবের পুত্রদের বলছেন ***দেবসংজ্ঞিতমপ্যন্তে কৃমিবিড়্ভস্মসংজ্ঞিতম্। ভূতধ্রুক্ তৎকৃতে স্বার্থং কিং বেদ নিরয়ো যতঃ।।১০/১০/১০।*** আর শুধু তাই নয় এরা নিজেদের ভূদেব, নরদেব, দেব প্রভৃতি নামে অভিহিত করে আর শরীরকে এমন ভাবে সাজায় যেন মনে করে আমি একজন দেবতা। মিথ্যাকে নিয়ে হিউমার করে একটা গল্পে বলছে বাচ্চা বয়সে মিথ্যা কথা বললে সেটা দোষ, বড় হয়ে ব্যবসাতে মিথ্যা কথা বললে সেটা হয়ে যায় আর্ট, ভালোবাসাতে মিথ্যা কথা বলাতে খুশী করা হয় এইভাবে বিয়েতে মিথ্যা কথা বলা হয় বেঁচে থাকার জন্য। এই এক মিথ্যাই কত রকমের রূপ ধারণ করে। অথচ এরা একবারও ভেবে দেখে না যে যদি অজানা অচেনা জায়গায় মরে থাকো তখন তোমার এই শরীরকে কদিন পরে পোকায় খাবে, নয়তো পাখির বিষ্ঠা হবে। মুসলমান হলে তোমাকে মাটির নীচে কবর দিয়ে দেবে, সেখানে তোমার এই শরীরকে পোকায় খাবে, জরাথ্রুষ্ট হলে তোমাকে একটা খোলা জায়গায় রেখে দেবে, সেখানে পাখিরা এসে তোমার মরা পচা শরীরের মাংস খেয়ে তোমার শরীরকে বিষ্ঠা রূপে ত্যাগ করবে আর যদি হিন্দু হয়ে থাক তাহলে তোমার দেহটাকে চিতার আগুনে পুড়িয়ে ভস্ম করে দেওয়া হবে, আর এই শরীরটা এক মুঠো ছাই হয়ে যাবে, সেই দেহকে নিয়ে তোমাদের কিসের অহঙ্কার!

ঠাকুর খুব মন দিয়ে ভাগবত আর অধ্যাত্ম রামায়ণ শুনতেন। ঠাকুরের অনেক উপমা ভাগবত ও অধ্যাত্ম রামায়ণ থেকে নেওয়া। ঠাকুরও বারবার বলছেন, যে দেহকে নিয়ে এত অহঙ্কার সেই দেহের এই তো পরিণতি। এটাই আমি, আমাদের এখানে এমন কাউকে পাওয়া যাবে না যে, মরে গেলে যার এই পরিণতি হবে না। মৃত্যুর পর সবারই এই এক পরিণতি হবে। কিন্তু মানুষ নিজের দেহের পূজো আর যাকে ভালোবাসে তার দেহের পূজো করতেই থাকে। জানে আমরা সবাই একদিন মারা যাব আর মৃত্যুর পর আমাদের সবারই দেহের এই পরিণতি হবে, কিন্তু মানুষ নিজের ব্যাপারে কখন এই জিনিষ চিন্তাই করবে না। এটাকেই বেদান্তীরা অনেক সময় আবার ইতিবাচক ভাবে বলেন – আসলে মানুষ সেই শুদ্ধ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম, এই ভাবটা ভেতরে আছে বলে মানুষের মনে অজান্তে কোথাও নাড়া দিতে থাকে আমার জীবনটা চিরন্তন, আমার কোন দিন নাশ হবে না। কিন্তু একবারও সে ভাবতে পারে না যে, আমার এই দুরবস্থা হবে। উপরন্তু অন্য প্রানীকে হিংসা করে। দেখা যায় যে জাতি খুব সুসংস্কৃতি সম্পন্ন তারা অযথা কাউকে কষ্ট দিতে যায় না। গ্রামের লোকরা এখনও পোকা-মাকড়, সাপ-বিছেকে অযথা মারে না।

নারদ কুবেরের ছেলেদের বোঝাচ্ছেন ***দেহঃ কিমন্নদাতুঃ স্বং নিষেক্তুর্মাতুরেব চ। মাতুঃ পিতুর্বা বলিনঃ ক্রেতুরগ্নেঃ শুনোঽপি বা।।১০/১০/১১।*** তোমরা একবার ভেবে দেখ এই শরীরটা কার? মা, যিনি গর্ভে নয় মাস ধারণ করেছিলেন, নাকি বাবা যিনি গর্ভাধান করেছিলেন? এখন অবশ্য নতুন প্রক্রিয়াতে সৃষ্টির কাজে পুরুষের কোন দরকারই হয় না। উদ্ভিদের ক্ষেত্রে যে গ্রাফটিং হয় আর প্রাণীদের ক্ষেত্রে যে ক্লোনিং করে

সৃষ্টি হচ্ছে সেখানে পুরুষের কোন দরকারই নেই। তবে ক্লোনিংএর ক্ষেত্রে সব সময় তার মায়ের মতই আকৃতি হবে, আর ক্লোনিং করার পর প্রচুর জেনেটিক রোগের আক্রমণ হবে। পুরুষ শুধু সৃষ্টিতে বৈচিত্র নিয়ে আসে, আর এতে রোগের আক্রমণটাও অনেক কম হবে। সেইজন্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে পুরুষের ভূমিকা কোন দিন শেষ হয়ে যাবে না। যাই হোক, এখানে মূল কথা হল আমাদের এই শরীরটা কার? বাবার, যিনি গর্ভাধান করেছেন, নাকি মায়ের, যিনি নয় মাস গর্ভে ধারণ করেছিলেন? নাকি সেই বলবান পুরুষ, যে তাকে ধরে তার গোলাম করে নিজের কাজ করিয়ে নেয়। আগেকার দিনে ক্রীতদাস প্রথা যদিও ভারতে কম ছিল কিন্তু বিদেশে প্রচুর লোককে ক্রীতদাস প্রথায় বড়লোকরা নিজেদের গোলাম করে রেখে তাকে দিয়ে সব কাজ করিয়ে নিত। বলছেন তোমার এই শরীরটা কি সেই রকম কোন বড়লোকের যে তোমাকে গোলাম করে রেখে তোমার শরীরকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেয়, নাকি টাকা দিয়ে তোমাকে যার ক্রয় করে নেয়, সেই ক্রেতার? নাকি যখন চিতার আগুনে তোমাকে পুড়িয়ে দেবে সেই অগ্নির? নাকি তোমার মৃত্যুর পর যে কুকুর-শেয়ালরা তোমার শরীরকে ছিঁড়ে খাবে তাদের? আমরা মনে করতে পারি বাকি গুলো না হয় ঠিক আছে কিন্তু কুকুর-শেয়ালের কেন হতে যাবে! কেন হবে না, আপনি এখন যে চাল-গম কিনেছেন যেটা এক মাস ধরে খাবেন, আপনি জানেন এই চাল-গম আমার। আর কুকুর-শেয়ালদের মধ্যে কেউ জ্যোতিষি থাকে আপনার জন্ম হওয়ার পর সেই জ্যোতিষি জ্ঞাতি ভাইদের বলবে – এই যে লোকটা দেখছিস! এটা আমার কপালে আছে, কিংবা বলবে এটা তোর কপালে আছে। কেনা চাল-গমটা যদি আপনার বরাদ্দে থাকে তাহলে আপনার এই শরীরটা যে কাক-কুকুর-শেয়ালের বরাদ্দ নয় আপনি কি করে বলবেন! এই সব ভাবলে কিছু আর করা যায় না, সেইজন্য বলে বুড়ো বয়সে, যখন কানে কিছু শুনতে পায় না, চোখে কিছু দেখতে পায় না, সব ইন্দ্রিয়গুলোর কার্যশক্তি শেষ হয়ে গিয়ে সব দিকে অক্ষম হয়ে গেছে, তখন শাস্ত্র পড়তে হয়।

এই সব কথার জন্য হিন্দু ধর্মকে অনেকে নৈরাশ্যবাদীদের ধর্ম বলে। কিন্তু এখানে নৈরাশ্যবাদীর কিছু নেই, এটাই বাস্তব চিত্র। ধর্মশাস্ত্রের এসব কথা পড়ার পর যদি কারুর মনে হয়, আমাকে তো একদিন না একদিন মরতেই হবে, বেঁচে থেকে তাহলে আর অশান্তি ভোগ না করে ঠিক আছে চল এখনই মরে যাই, তখন তাহলে সেই ধর্ম নৈরাশ্যবাদীদের ধর্ম হয়ে যাবে। হিন্দুদের কোন শাস্ত্রই নৈরাশ্যবাদী নয়, প্রচণ্ড জীবনমুখী। শাস্ত্র এগুলোকে দেখিয়ে বলে দিচ্ছে এবার তোমার আসলটার দিকে দৃষ্টিটা ঘুরিয়ে দাও। সাধারণতঃ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে খুব বিখ্যাত লোকেরা যে কাজ করছেন, তারা ঠিক এই সিদ্ধান্ত নিয়েই কাজ করেন – মরতে তো আমাকে হবেই, ঘরে বসে থাকলেও মরব, বাইরে বেরোলেও মরব, লড়লেও মরব, না লড়লেও মরব, চল! এবার আমি আমার শক্তির খেলা দেখাচ্ছি। এখানে ঠিক তাই করা হচ্ছে, তুমি যত কেউকেটাই হও না কেন, তুমি মিস ইণ্ডিয়া হতে পারো, মিস ইউনিভার্স হতে পারো তোমাকে মরতে হবে, আর মরলে হয় তোমাকে কবরে পুতে দেবে, না হয় মাঠে ফেলে দেবে নয় তো চিতার আগুনে পুড়িয়ে দেবে। তোমার এই শরীরকে ক্রিমি খাবে, পশু-পাখিরা খাবে নয়তো আগুনে ভস্ম করা হবে। কথামৃতে ঠাকুর বলছেন – একজন মাতাল দূর্গাপ্রতিমার দিকে তাকিয়ে বলছে, যতই সাজো মা! তিন দিন পরে তোমাকে টানতে টানতে নদীর জলে ফেলে দেবে। একবার যখন আমরা বুঝে নেব, আরে! এই তো আমাদের শরীরের পরিণতি, তাহলে এই শরীরকে নিয়ে বেশি মাতামাতি না করে সেই জিনিষের প্রতি বেশী জোর দিতে হবে যেটা এই শরীরের থেকে আরও বেশী স্থায়ী। আমাদের শাস্ত্রের উদ্দেশ্য হল এই দেহের স্তর থেকে তুমি আরও উচ্চ স্তরে উঠে এস, ক্ষণিক স্থায়ী বস্তুর থেকে সরে এসে যেটা চিরন্তন স্থায়ী সেই বস্তুর দিকে মন দাও। আমরা সবাই এই দেহ ছাড়া কিছু বুঝি না, সারাটা দিন শুধু নিজের খাওয়া, নিজের ঘুম, নিজের আরাম, নিজের সুখ কীভাবে পাওয়া যাবে তার পেছনে ছুটে চলেছি। শাস্ত্র বারবার বলছে যতই তুমি এই শরীরের তোয়াজ কর, খাতির কর এর পরিণতি এই। কিছুক্ষণের জন্যেও এই শরীর বোধ থেকে বেরিয়ে এসে একটু কিছু কষ্ট কর। কি কষ্ট করব? কষ্ট করে একটু পড়াশোনা কর, কষ্ট করে একটু জপ-ধ্যান কর, কষ্ট করে অপরের যাতে একটু মঙ্গল হয় তার জন্য কিছু কাজ কর। তোমার এই আত্মকেন্দ্রিক জীবন, ক্ষুদ্র দেহবোধ থেকে বেরিয়ে বাইরে এসো। দেহবোধ থেকে যতক্ষণ না বেরোতে পারছে ততক্ষণ এই মনুষ্য জীবনটা একটা বিরাট শূন্য।

একটা মাছ বড়শিতে মুখ দিতেই ফেঁসে গেছে, এবার সে দড়িটা মুখে নিয়ে পালাচ্ছে। কিন্তু কত দূর পালাবে, আর পালিয়ে যাবেই বা কোথায়! যেখানেই যাক এবার সুতো আস্তে আস্তে গুটিয়ে তাকে টেনে নিয়ে জল থেকে আড়ায় তোলা হবে। আমাদের সবার মুখে মৃত্যুর ফাঁস পড়ে আছে, পালিয়ে কোথাও বাঁচতে পারবো না। একটা কিছু অন্ততঃ করুন, না হয় একটু হরি নাম করুন, না হয় অপরের সেবা করুন, এমন একটা বই পড়ুন যেটা পড়তে কষ্ট হয়। এটাই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য, আমাদের সজাগ করে দেয়, জীবনের যেটা ইতিবাচক দিক সেই দিকে আমাদের সবার নজর ঘুরিয়ে দিচ্ছে। বাচ্চারা পড়াশোনা করতে চায় না, সব সময় খেলনা নিয়ে খেলে যাবে, না হয় কম্প্যুটারে গেমস্ খেলতে থাকবে আর তা নাহলে টিভিতে খেলা, সিরিয়াল নিয়ে পড়ে আছে। বাড়ির বড়রা এসে ধমক দেয়, কথা না শুনলে খেলনাগুলো উপরে তুলে রাখে যাতে নাগাল না পায়, টিভি কম্প্যুটারের সুইচ অফ্ করে দিয়ে পড়তে বসতে বলে। শাস্ত্র ঠিক এই কাজ করছে, আমাদের জীবনে যত রকম খেলনা আছে, সেগুলোকে শাস্ত্র ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে। আমাদের জীবনের সব কিছুই খেলনা, দেহটা খেলনা, আমাদের স্ত্রী-পুত্র-স্বামী সবই খেলনা। আমাদের নিজেদের এত গুরুত্বপূর্ণ মনে করি যে, আমি ছাড়া এই জগৎ চলবে না। শাস্ত্র এই জিনিষগুলোতে হাতুড়ি দিয়ে পেটায়, ওখান থেকে বেরোও, বেরিয়ে এসো, এগুলো তোমার আসল স্বরূপ নয়, তুমি তোমার আসল পরিচয় পাওয়ার চেষ্টাতে নামো। ঠাকুর উপমা দিচ্ছেন বর্ষাকালে গঙ্গায় কাঁকড়ার যে গুড়ি গুড়ি লক্ষ লক্ষ বাচ্চা দেখা যায় এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সেই একটা কাঁকড়ার বাচ্চার থেকেও ছোট, আর এই রকম লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড রয়েছে, সেখানে তোমার এই দেহটাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না, আর এই দেহকেই তুমি এত গুরুত্ব দিয়ে তারা মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থেকো না, এই দেহবোধ থেকে বেরিয়ে এসে তোমার আসল স্বরূপকে জানো। কিন্তু মানুষ পারে না, নিজের দেহকে, নিজের মনকে, নিজের পরিবার পরিজনকে প্রচণ্ড ভালোবাসে, আমার কত কেউ নেই, আমার মত বিদ্বান কেউ নেই, আমার মত দেখতে সুন্দরী কেউ নেই। নিজের দেহ ও মনের পর নিজের স্বামী বা স্ত্রী, সন্তান পরিবারের লোকদের ভালোবাসে। ভালোবাসতে কেউ নিষেধ করছে না, কিন্তু সবাই সবার প্রতি আসক্ত হয়ে আছে, আমি ওকে ছাড়া বাঁচবো না, ও আমাকে ছাড়া বাঁচতে পারবে না। মোহ আর আসক্তিতে আমরা সবাই অচেতন হয়ে আছি, শাস্ত্র এই জায়গা গুলিতে ঘা মেরে মেরে আমাদের সচেতন করে দিচ্ছে।

নারদ আবার বলছেন – দেখো যে জিনিষটা প্রকৃতি থেকে জন্ম নেয় তার পরিণতি প্রকৃতিতে গিয়েই শেষ হয়ে যায়। এই কথাগুলো দেবর্ষি নলকূবর আর মণিগ্রীবকে বলছেন, কারণ এরা নিজেদের দেহকেই গুরুত্ব মনে করে, দেহকে সুখ দেওয়ার জন্য সরোবরে এইভাবে মেয়েদের সঙ্গে জলকেলি করছে। আর ঋষি এসে যখন তাদের সামনে দাঁড়াচ্ছেন তখন তাদের কোন হুঁশও নেই আর কোন গ্রাহ্যও করছে না। তখন একটা শ্লোকে নারদ বলছেন ***অসতঃ শ্রীমদান্ধস্য দারিদ্রং পরমঞ্জনম্। আত্মৌপম্যেন ভূতানি দরিদ্রঃ পরমীক্ষতে।। ১০/১০/১৩।*** আগেকার দিনের লোকেদের একটা বিশ্বাস ছিল, চোখের জ্যোতি কমে গিয়ে যদি ভালো দেখতে না পায়, তখন চোখে অঞ্জন লেপন করলে চোখের জ্যোতি নাকি ঠিক হয়ে যায়। এখানে বলছেন চোখে অঞ্জন লাগালে যেমন চোখের জ্যোতি ফিরে আসে, যারা মদান্ধ, অর্থাৎ ছটি রিপু কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্যতে একেবারে অন্ধ হয়ে যায় তখন এর একমাত্র ওষুধ হল, দারিদ্র্য রূপ অঞ্জন। দারিদ্র্য ছাড়া এই মদান্ধতা যাবে না। কাম হল কিছু জিনিষের প্রতি কামনা-বাসনা, যে জিনিষগুলো আমি পেতে চাইছি আর আমার কাছেই রাখতে চাইছি, এটাকে বলে কাম। যখন এই কাঙ্খিত বস্তুগুলো না পায় তখন মনে ক্রোধের সঞ্চার হয়। একটা জিনিষ চাইছি কিন্তু পাচ্ছি না, আমি জানি পাওয়া যেতে পারে, মন সেটার প্রতিই পড়ে আছে, জিনিষটা পেলে হয়, এটা হল লোভ। এই লোভই যখন আরও ঘনীভূত হয় তখন সেটাকে বলছেন মোহ। লোভ হল অনেক নিকৃষ্ট স্তরের। কোন রকমে কায়দা করে, ছল করেও যদি নিয়ে নেওয়া যায়, লোভে এই ধরণের মনোভাব থাকে। আর মোহ হল যখন ওটাতেই মন পড়ে থাকে। এগুলো সব কামেরই সন্তান, কাম থেকেই জন্ম নিচ্ছে। কাম যখন পুর্তি হয়ে যায় তখন আসে মদ, মানে অহঙ্কার। শিশুরা যখন মনের মত কিছু খেলনা পেয়ে যায় তখন তার হাঁটা চলাটাই অন্য রকম হয়ে যায়, বড় হয়েও এই স্বভাবটা থেকে যায়। কোন কিছু পেয়ে শরীরটা চাঙ্গা হয়ে গেছে, এবার তার আসবে মদ, গীতার ষোড়শ অধ্যায়ে এর খুব সুন্দর বর্ণনা

আছে *কোহন্যোহস্তি সদৃশো ময়া*, আমার মত আর কে আছে! এই ধরণের লোকেদের কথা বলা শুরুই হবে এই ভাবে – আরে তোমাকে আমার জানা আছে, তুমি আমার সামনে দাঁড়বে কি করে! মাৎসর্য হল, নিজে পেলো না কিন্তু অপরের কাছে আছে, তখন তার প্রতি হিংসা আসছে। মদ আর মদান্ধ একই জিনিষ, মদ খেলে নেশা হয় আর মানুষের মধ্যে এই ছটি রিপু থাকলে নেশার মত অন্ধ হয়ে যায়। হিন্দীতে খুব সুন্দর একটা দোঁহাতে বলছে – কনক শব্দের দুটো অর্থ হয়, কনকের একটা অর্থ সোনা আর হিন্দীতে কনকের অন্য অর্থ হয় ধুতড়া। বলছে ধুতড়া খেলে যে নেশা হয় তার থেকে সোনার নেশা শতগুণ বেশী। একটাকে খেলে নেশা হয়, আরেকটাকে পেলেই নেশা হয়ে যায়। ধুতড়া, মদ, ভাঙ এগুলো খেতে হবে, না খেলে নেশা হবে না। কিন্তু হাতে টাকা-পয়সা, ধন-দৌলত এলেই নেশা হয়ে যাবে। কথামৃতে ঠাকুর বলছেন – একটা ব্যাঙের কি করে একটা টাকা হয়েছিল। একদিন একটা হাতি ব্যাঙের গর্ত ডিঙিয়ে গেছে, হাতিকে লাথি দেখিয়ে ব্যাঙটা বলছে 'তোর এত দুঃসাহস! আমার বাড়ি ডিঙিয়ে যাচ্ছিস্!' টাকা হলেই মানুষ পুরো পাল্টে যায়, কিছু করার থাকে না। দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে এক পূজারী ছিল। পরে চাকরি ছেড়ে অন্য কিছু করতেন। একবার ঠাকুর হৃদয়রামকে সঙ্গে নিয়ে নৌকা করে কোন্নগরে গেছেন। নৌকা থেকে নেমেই দেখেন লোকটি সেই ঘাটে বসে আছে। ঠাকুরকে দেখেই লোকটি বলছেন 'বলি ও! ভটচাজ্জি মশাই! আছো কেমন'? শুনেই ঠাকুর হৃদয়রামকে বলছেন 'ওরে হৃদু! এর টাকা হয়েছে'। টাকা হলেই মানুষের কথা বলার ঢঙই পাল্টে যায়। টাকা এমনই জিনিষ, খেতে হবে না, পেলেই নেশা হয়ে যাবে। ইদানিং নতুন প্রজন্মের ছেলেরা আইটি সেক্টরে কাজ করে রাতারাতি এমন টাকা উপার্জন করতে শুরু করে দিল যে কাউকে আর তোয়াক্কাই করে না।

এটাই দেবর্ষি নারদ নলকূবর আর মণিগ্রীবকে বলছেন – যখন মদ হয় তখন চোখ অন্ধ হয়ে যায়। এই অন্ধ চোখ কীভাবে খুলবে? দারিদ্র রূপ অঞ্জন লাগালে। দারিদ্র ছাড়া এই মদান্ধতা যাবে না। যে পেটের খিদে কী জিনিষ একবার দেখে নিয়েছে একমাত্র তারই মদান্ধতা হবে না। কিন্তু যারা ছোটবেলা থেকে টাকা-পয়সা ঐশ্বর্যের মধ্যে বড় হয়েছে, তাদের নিয়ন্ত্রণে আনা খুব মুশকিল। হেনরি ফোর্ড ছিলেন ফোর্ড গাড়ী কোম্পানীর পথিকৃৎ। তিনি একবার একটি হোটেলে গিয়ে বলছেন 'আপনারা যদি একটা সস্তা ঘর দেন'। হোটেলের মালিক জানেন ইনি হেনরি ফোর্ড, তখন পৃথিবীর মধ্যে সব থেকে বড়লোকদের মধ্যে একজন। হোটেল থেকে দেখানো হল 'এই আমাদের ঘর আছে'। উনি জিজ্ঞেস করছেন 'এর থেকে সস্তার কোন ঘর নেই?' 'হ্যাঁ আছে, ছাদের উপর একটা কুঁড়ে ঘর আছে'। 'ওটাই আমাকে দিন'। তখন হোটেলের মালিক বলছেন 'আপনার ছেলেরা যখন আসে তখন বলে সবচেয়ে দামী ঘর দিন, আর আপনি এই রকম সস্তার ঘরের কথা বলছেন কেন?' উনি বলছেন 'ওদের বাবা কোটিপতি, আমার বাবা কোটিপতি ছিলেন না'। দারিদ্রতাকে যতক্ষণ কাছ থেকে না দেখা হবে, দারিদ্রতা কি জিনিষ না অভিজ্ঞতা হবে ততক্ষণ মদান্ধতা যাবে না।

এরপর পর পর কয়েকটা জিনিষ দিয়ে নারদ বলছেন। একটা প্রবাদ আছে বন্ধ্যা ও যুবতী নারী প্রসব পীড়া কী জিনিষ জানে না। যে প্রসব পীড়া জানে সে যখন শুনবে কারুর প্রসব হচ্ছে তখন সে বুঝে নেবে তার কী অসহ্য পীড়া হচ্ছে। তুমি যদি দারিদ্রতা কী জিনিষ না দেখে থাকো তাহলে তো তোমার মদান্ধতা হবেই। কুবেরের সন্তান, দারিদ্র এই শব্দটাই তাদের অভিধানে নেই, তার আর মদান্ধতা না হয়ে যাবে কোথায়। সেটাই নারদ বলছেন, দেহে একটা কাঁটা ফুটে যখন যন্ত্রণা অনুভব হয়, তখনই সে জানতে পারে অন্যের কাঁটা ফুটলে তার কী কষ্টই না হয়। নিজে যতক্ষণ কোন কষ্ট অনুভব না করে থাকে অপরের কষ্ট সে ততক্ষণ নিতে পারে না। গরীবদের মধ্যে যে একতা ও পরস্পরের প্রতি প্রীতি ভালোবাসা থাকে বড়লোকদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সেই প্রীতি ভালোবাসা কখনই থাকে না। আমরা যে বলি, ভারতের লোকেদের মধ্যে আগে কত সততা ছিল, ভালোবাসা ছিল, কারণ ভারত আগে খুব গরীব দেশ ছিল, ধনী হয়ে গেলে এই জিনিষ কখনই আর থাকবে না। বড়লোকদের মধ্যে একতা কখন হয় না, একতা হবে যখন কোন বিপ্লব, কোন বিদ্রোহ হয় তখন নিজেদের স্বার্থে তারা একজোট হয়। কিন্তু সাধারণতঃ মূল্যবোধ, সততা, একতা, এক অপরের কষ্টের অংশীদার হওয়া এগুলো একমাত্র যারা গরীব, যারা অভাব দেখেছে, তাদের মধ্যেই দেখা যায়।

দেবর্ষি নারদ আবার খুব সুন্দর কথা বলছেন ***দরিদ্রো নিরহংস্তম্ভো মুক্তঃ সর্বমদৈরিহ। কৃচ্ছ্রং যদৃচ্ছয়াহহপ্নোতি তদ্ধি তস্য পরং তপঃ।।১০/১০/১৫।*** ভাই! যারা দরিদ্র, অকিঞ্চন, তাদের মধ্যে শ্রীমদ্ থাকে না। সমস্ত রকম গর্ব থেকে তারা মুক্ত। যে জানে আমার কাছে টাকা নেই তার অহঙ্কার অনেক কম হবে। ঠাকুর একবার অনেকের সাথে ব্রাহ্ম সমাজের বাৎসরিক উৎসবে এক ব্রাহ্মের বাড়িতে গেছেন। সঙ্গে রাখালও (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) আছেন। বাড়ির কর্তাদের বয়স কম, ঠাকুরকে সেই ভাবে আপ্যায়ন করা হচ্ছে না। স্বামী ব্রহ্মানন্দ তখন যুবক রাখাল, রাখাল খুব রেগে গিয়ে বলছেন 'চলুন মশাই! এরা আমাদের সম্মান দিচ্ছে না'। ঠাকুর বলছেন 'এখন দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে খাবো কি! আর গাড়ী ভাড়া কে দেবে! ফাঁকা রোখ করলেই হয় না'। এটাই গৃহস্থ ধর্ম। যার টাকা নেই সে জানে, গাড়ী ভাড়া কোথা থেকে দেবে! রাখালের বয়স কম, টাকা-পয়সার দায়ীত্ব এখনও কাঁধে আসেনি, ভাবছেও না এর পরিণাম কি হতে পারে! এক রাত না হয় খাবো না। ঠাকুর কখন এই জিনিষ করবেন না, দরিদ্র ব্রাহ্মণের কুটিরে তাঁর জন্ম, তিনি জানেন এগুলোর একটা দাম আছে। বাড়ির মায়েরা এক একটা জিনিষকে কত সামলে গুছিয়ে রাখেন, তাঁরা কষ্ট কি জিনিষ নিজের চোখে দেখেছেন কিনা। বিশ্বের সর্বত্র এই একই চিত্র। এসব বলার পর দেবর্ষি বলছেন 'দৈববশে এই দারিদ্রতার কারণে তাদের যে কষ্ট ভোগ করতে হয়, সেটাই তাদের পরম তপস্যা হয়ে দাঁড়ায়'। কারণ সে জানে এছাড়া আমার বাঁচার কোন পথ নেই।

দেবর্ষি নারদ বলছেন ***নিত্যং ক্ষুৎক্ষামদেহস্য দরিদ্রস্যান্নকাঙ্ক্ষিণঃ। ইন্দ্রিয়াণ্যনুশুষ্যন্তি হিংসাপি বিনিবর্ততে।।১০/১০/১৬।*** যারা অত্যন্ত গরীব সাধারণ মানুষ, তাদের প্রত্যেক দিনের অন্ন যোগাড়ের জন্য কত কষ্ট করতে হয়, তা সেটা ভিক্ষা করেই হোক বা দিনমজুরের কাজ করেই হোক। একবেলা আহারের জন্য এই প্রাণান্তক পরিশ্রম করে করে তাদের দেহটা শীর্ণকায় হয়ে যায়। শরীর এত দুর্বল হয়ে যায় যে তাদের ইন্দ্রিয়গুলো ভোগের কথা চিন্তাই করতে পারে না আর ভোগ করার শক্তিও থাকে না, ইচ্ছেও হয় না। সেইজন্য নিজের ভোগের জন্য তারা অপরকে কক্ষণ কষ্ট দেয় না, কারুকে হিংসা করে না। ভাগবতাদির মত গ্রন্থ যাঁরা রচনা করেছেন তাঁদের কী সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা ছিল কল্পনা করা যায় না! বলছেন, যারা গরীব তারা ঠিকমত খাওয়া-দাওয়া না করে করে তাদের ইন্দ্রিয়গুলো শুকিয়ে যায়, তখন তারা কোন কিছু আর ভোগ করতে চায় না। অথচ আমরা জানি গরীব পরিবারে সন্তান-সন্ততি বেশী হয়। সেটা আবার পুরোপুরি আলাদা একটা দিক, এর সঙ্গে আরও অনেক কিছু ব্যাপার জড়িয়ে থাকে। কিন্তু গরীব লোকেরা, সাধারণ বাড়ির ছেলেরা কখন নানান রকমের ইন্দ্রিয় সুখের দিকে যায় না। অথচ বড়লোকেরা ইন্দ্রিয় সুখে যযাতির মত আহুতি দিয়েই যাচ্ছে, কিন্তু তাও শান্তি পায় না। কম বয়সেই এদের ছেলেমেয়েরা কত রকমের পার্টিতে যাচ্ছে, ড্রাগস্ নিচ্ছে, মদ খাচ্ছে। ইন্দ্রিয় ভোগের উপর কোন নিয়ন্ত্রণ নেই, নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতাটাই নষ্ট হয়ে গেছে। কারণ ইন্দ্রিয়কে সব সময় প্রশ্রয় দিয়েই যাচ্ছে। আর বড়লোক বাড়ির বুড়ো বুড়ী গুলোকে দেখলে করুণা হয়, বুড়িগুলো এমন সাজ-পোশাক আর প্রসাধনে নিজেকে সাজিয়ে রাখে যেন পারলে এখনই কাউকে বিয়ে করে নেবে। অথচ এদের নাতি-নাতনীদেরই বিয়ে হয়ে গেছে। দিদিমা বলে সম্বোধন করলে আবার রেগে যায়।

যাঁরাই আধ্যাত্মিক জীবন-যাপন করতে চাইছেন তাঁদের জন্য ষোল নম্বর শ্লোকটি খুবই অনুধাবনীয়। ইংরাজীতে দুটো শব্দ আছে Abstinence and Indulgence। Abstinence মানে কোন জিনিষ থেকে সরে থাকা। আমাদের দেশে আগের দিনে দেখা যেত বিধবাদের বিভিন্ন দিনে উপোস করতে হত। বিধবাদের দিয়ে উপোস করানোর একটাই উদ্দেশ্য যাতে তাদের ইন্দ্রিয়গুলো শুকিয়ে যায়। ইন্দ্রিয় শুকিয়ে গেলে বিষয়ভোগের বাসনাটাও শিথিল হয়ে আসে। এছাড়া বিধবাদের মাছ, মাংস, পেঁয়াজ, রসুন অর্থাৎ কামোত্তেজক খাদ্য খাওয়া নিষেধ ছিল। মজার ব্যাপার হল সন্ন্যাসীদের জন্যও এই একই নিয়ম করা হয়েছে, আবার বৈষ্ণব সাধকরাও এই একই নিয়ম পালন করে চলেন। মুসলমানরা যে এক মাস রোজা রাখে তারও পেছনে এই একই উদ্দেশ্য, যাতে তুমি একটি মাস ভোগ থেকে বিরত থেকে একমাত্র আল্লাতে মন-প্রাণ একাগ্র করতে পারো। এই জগৎ যে অনিত্য আর গরীবরা যেভাবে দিনের পর দিন কষ্ট ভোগ করে যাচ্ছে এই দুটো জিনিষকে বোঝবার চেষ্টা কর। কিভাবে বুঝবে? তপস্যা করলে বুঝতে পারবে। এক মাস যদি তুমি রোজা রাখ তাহলে

তোমার শরীরটাও শুকিয়ে যাবে আর এর সাথে ইন্দ্রিয়ের বিষয় ভোগের প্রতি টানটাও কমে যাবে। বিধবাদের যে জীবন, সন্ন্যাসীদের যে জীবন, নিষ্ঠাবান মুসলমানরা রোজার এক মাস যেভাবে জীবন-যাপন করেন এটাই ঠিক ঠিক তপস্যার জীবন। গরীবরা যেভাবে জীবন চালায় তাতে তাদের শরীরটা শুকিয়ে যায়, যেহেতু শরীরের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের গভীর সম্পর্ক তাই শরীর শুকিয়ে গেলে তাদের ইন্দ্রিয়গুলিও শিথিল হয়ে আসে। কিন্তু আবার যখন তাদের ভালো খাওয়া-দাওয়া জুটতে থাকে তখন আবার ইন্দ্রিয়গুলোও সতেজ হয়ে ওঠে। এর কারণ একটাই, শরীর আর ইন্দ্রিয় পরস্পর সম্পর্ক যুক্ত।

দেবর্ষি নারদ এত সব কথা কুবেরের দুই সন্তানকে বলে যাচ্ছেন। তিনি আবার বলছেন ***সাধূনাং সমচিত্তানাং মুকুন্দচরণৈষিণাম্। উপেক্ষ্যৈঃ কিং ধনস্তম্ভৈরসদ্ভিরসদাশ্রয়ৈঃ।।১০/১০/১৮।*** সাধুপুরুষরা সমদর্শি হন, সবার প্রতি তাঁদের সমান দৃষ্টি, বড়লোক আর সাধারণ লোকের মধ্যে তাঁরা কখন তফাৎ দেখেন না। কিন্তু তবুও বলা যেতে পারে দরিদ্রদের জন্যই সাধুপুরুষরা সুগম। কারণ তাঁদের ভোগবাসনা আগে থাকতেই চলে গেছে। ভোগবাসনা যাদের নেই তাদের হাতে প্রচুর সময় এসে যায়। শ্লোকের এই বক্তব্যকে আমাদের খুব ভালো করে বোঝা দরকার। ভাগবতও বলছে, আধ্যাত্মিক জীবনের জন্য প্রথম শর্ত সাধুসঙ্গ, আধ্যাত্মিক জীবন শুরুই হয় সাধুসঙ্গ দিয়ে। যার সাধুসঙ্গ হয়নি, নির্দ্বিধায় বলে দেওয়া যায় তার আধ্যাত্মিক জীবন এখনও শুরু হয়নি। এখানে ভাগবত বলছে, নির্ধনদের পক্ষে সাধুসঙ্গ সুগম। দেখা যায় যাঁরা ঠিক ঠিক সাধু হন, তাঁরা বড়লোকদের থেকে সব সময় দূরে থাকার চেষ্টা করেন। সাধু-সন্ন্যাসীকে কাজের সূত্রে পাঁচ জন লোকের সাথে মেলামেশা হতেই পারে, সেটা অন্য ব্যাপার। দেখতে হবে মাখামাখিটা কাদের সঙ্গে করছেন, কাদের সঙ্গ করাতে সন্ন্যাসী নিজেকে আরাম বোধ করছেন দেখতে হবে। বড়লোকদের সঙ্গে কথা বলে সাধু যদি আনন্দ পেয়ে থাকেন, তাহলে বুঝতে হবে তিনি আর যাই হতে পারেন, সাধু-সন্ন্যাসী নন। সাধু-সন্ন্যাসী কার সঙ্গ খোঁজেন, যে ঈশ্বরীয় কথা বলছে। বড়লোকরা আর যাই করুক, ঈশ্বরীয় কথা ভুলেও তারা কখনই প্রসঙ্গক্রমে তুলবে না।

এক মহাত্মার অনেক শিষ্য ছিল। হঠাৎ সেই মহাত্মার মাথায় কি করে চিন্তা এসে গেল, আমার এত শিষ্য হয়ে গেছে, এদের সবার পাপ নিলে আমাকে তো নরকে যেতে হবে। সেই মহাত্মা এবার নিজের গুরুর কাছে গিয়ে বলছে 'গুরু! আমাকে উদ্ধার করুন, আমার এত শিষ্য-শিষ্যা হয়ে গেছে, এবার তো আমাকে নরকে যেতে হবে'। গুরু তখন তার কানে ফিস্‌ফিস্ করে কিছু একটা বলে দিয়েছেন। গুরুর কাছে থেকে ফিরে আসার পর মহাত্মার জঙ্ঘাতে বিরাট বড় একটা ফোড়া হয়ে গেছে। সব শিষ্যদের মধ্যে প্রচার করে দেওয়া হল মহাত্মা এবার মারা যাবেন। শিষ্যরা সবাই বিরাট বড়লোক, সবাই মহাত্মাকে ঘিরে কাঁদছে। তখন বলা হল, যদি কেউ আমার এই ঘা চুষে নেয় সে মরে যাবে আর আমি বেঁচে যাব। সবাই কাঁদছে কিন্তু সবারই কিছু না কিছু পিছু টান আছে, কেউ গুরুর ঘা চুষতে রাজী হচ্ছে না। একজন অশিক্ষিত, গরীব দেহাতী শিষ্য বারবার গুরুর কাছাকাছি আসতে চাইছে কিন্তু তাকে আসতে দেওয়া হচ্ছে না। গুরু কিন্তু দূর থেকে দেখে নিয়েছেন, তিনি সেবকদের আদেশ দিলেন 'ওকে কাছে আসতে দাও'। লোকটি কাছে এসে বলছে 'গুরুদেব! আমার জীবনে তো কিছুই নেই, কিন্তু আপনার এত শিষ্যকে দেখে আমার কেবলই মনে হচ্ছে এই জীবনের বিনিময়েও যদি আপনার প্রাণ রক্ষা হয়ে যায় তাহলে এত লোকের মঙ্গল হবে, তাই আমাকে আপনার এই ঘা চুষে নিতে দিন'। তখন গুরু তাকে নিজের কাছে টেনে এনে লোকটিকে চুষতে দিয়েছে। গুরু তাকে জিজ্ঞেস করছেন 'কিগো! চুষতে কেমন লাগছে'। 'আজ্ঞা গুরুদেব! খুব মিষ্টি লাগছে'। তারপর দেখা গেল ফোড়া টোড়া কিছুই নেই, পরীক্ষা নেওয়ার জন্য তিনি ওখানে একটা মিষ্টি আম কাপড় পেচিয়ে বেঁধে রেখেছিলেন। সেই আমটাই দেহাতী শিষ্যটি চুষে যাচ্ছে আর তার খুব মিষ্টি লাগছে। এই মহাত্মার গুরু তাঁকে বলে দিয়েছিল, যে এই ঘা চুষবে একমাত্র তারই পাপ তোমার লাগবে, অন্য কোন শিষ্যের পাপ লাগবে না। এটাই নারদ বলছেন, সাধুরা সমদর্শি, সবারই জন্য তাঁরা ভাবেন, কিন্তু যারা অসহায়, অকিঞ্চন একমাত্র তারাই সাধুদের কাছে ঠিক ঠিক পৌঁছে যেতে পারে।

আমাদের সবাই এখন যে অবস্থায় আছি, আগে হয়তো এর থেকে ভালো অবস্থা ছিল কিংবা এখন আগের থেকে ভালো আছি, একই অবস্থা কখন কারুর থাকে না। কিন্তু দেখা যায় টাকা যখন এক সময় বেশী ছিল বা এখন বেশী আছে, এই অবস্থায় আমরা বেশী সুখ অনুভব করি, কারণ একটা নিরাপত্তা বোধ আমাদের ভেতরে সব সময় কাজ করছে। বড়লোকের ঘুম না হোক, খাওয়া হজম না হোক, ছেলে লম্পট হয়ে যাক, মেয়ে দুশ্চরিত্রা হয়ে যাক টাকাকে সে কখন ছাড়বে না। বিশ্বের সর্বত্র এই একই চিত্র, সাধু সন্ন্যাসীরাই টাকা ছাড়তে চায় না, সাধারণ মানুষের আর কী কথা! একমাত্র হিন্দু ধর্মই ত্যাগকে, বিশেষ করে টাকার মোহ ত্যাগকে ধর্মীয় রূপ দিয়ে দিয়েছে। যিশুও এই পথ দেখিয়ে গেছেন। শহরের এক বড়লোক একদিন যিশুর কাছে এসে বলছে 'আমি আমার বাকি জীবনটা আপনার পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলতে চাই'। যিশু তাকে বললেন 'তোমার যা কিছু আছে সব বিক্রী করে গরীবদের মধ্যে বিলিয়ে দিয়ে আমার কাছে চলে এস'। লোকটি আর যিশুর কাছে ফিরে আসেনি।

দূর্গাপূজার সময় লক্ষ লক্ষ লোক বেলুড় মঠে আসছে, এদের কজন আসে সাধুসঙ্গ পাওয়ার জন্য? কজন আসে ঠাকুরের ভাব ভক্তি লাভের জন্য? দরিদ্ররাই ঠিক ঠিক সাধুসঙ্গ করে, কারণ তাদের ভোগটা মিটে গেছে। সবারই দেখা যায় হয় তাদের ভগবান আছেন, তা নয়তো ভোগ আছে। দুটোতেই 'ভগ' শব্দ আছে। ভগ শব্দের অর্থ ঐশ্বর্য। আলো শব্দও 'ভগ' শব্দ থেকে এসেছে। ভগবানও 'ভগ' থেকে এসেছেন ভোগও সেখান থেকেই এসেছে। একদিকে ভগবান আরেকদিকে ভোগ, এই দুটো ছাড়া তৃতীয় কিছু নেই। যার ভোগ নেই সে কোথায় যাবে? ভগবানের দিকেই যাবে। যে দরিদ্র তার ভোগ করার ইচ্ছাটাই চলে যায়। আমাদের একটা ভুল ধারণা যে, দরিদ্র মানুষেরও ভোগ করার ইচ্ছা থাকে। একটা গরীব মানুষ যখন মুষল ধারায় বৃষ্টির মধ্যে ফেঁসে যায় সে তখন কোন রকমে একটা গাছের তলায় বা কারুর বারান্দায় আশ্রয় নিয়ে চুপ করে বসে থাকে। তার জন্য সে কারুর উপর দোষারোপ করে না, শুধু প্রার্থনা করে হে ঠাকুর বৃষ্টিটা যদি থেমে যায়। কিন্তু কোন বড়লোক যদি বৃষ্টির মধ্যে এই রকম ফেঁসে যায় সে যে তখন কত রকম গালাগাল দিতে থাকবে, ছাতা নিয়ে কেন বাড়ি থেকে বেরোলাম না, আজ বাড়ী থেকে না বেরোনই উচিৎ ছিল ইত্যাদি। গরীবদের যদি জিজ্ঞেস করা হয় তোমার কত টাকা হলে চলে যাবে, তার শুরুই করবে দু-পাঁচশ টাকা থেকে। কিন্তু বড়লোকদের শুরুই হয় কৌন বনেগা ক্রোড়পতি দিয়ে। কিন্তু গরীব লোক যদি দু'শ টাকা পায় তখন তার ইচ্ছে হবে ঘরের চালটা একটু সারাই করে নিই, ব্যস্ অতটুকুতেই সে সন্তুষ্ট হয়ে যাবে। এদের তখন ইচ্ছে হয় সাধুসঙ্গ করার। এখানে দারিদ্রের যে প্রশংসা করা হচ্ছে এটা অন্য অর্থে করা হচ্ছে। তুমি দরিদ্র হও কিন্তু তোমার ভেতরে সংবেদনশীলতা যেন থাকে, এই সংবেদনশীলতাতেই বুদ্ধি বিকশিত হয়। যতক্ষণ মার না খেয়ে থাকে, দারিদ্রতার মুখোমুখি না হয়ে থাকে ততক্ষণ তার দ্বারা কিছু হবে না।

এই বক্তব্যের একেবারে জাজ্বল্য উদাহরণ হল এখানে যাঁরা ভাগবতাদির মত শাস্ত্র কথা শুনতে আসছেন। যতজন এখানে শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে আসছেন এনাদের মধ্যে একজনও নেই যে খুব বিশাল বড়লোক। এখানে দরিদ্র বলতে কাঙালী অর্থে বলছেন না। যারা বিষয় থেকে সরে এসেছে। বিষয় থেকে কীভাবে মানুষ সরে আসে? যাদের প্রচুর টাকা-পয়সা আছে তারা বিষয় থেকে সরে আসতে পারে না। দুই একটি যে ব্যতিক্রম হবে না তা নয়, সব জায়গাতেই কিছু না কিছু ব্যতিক্রম থাকে। কিন্তু যাদের খুব বেশী টাকা-পয়সা থাকে না, তাদের ছাড়া কেউ আধ্যাত্মিক পথে আসে না। আধ্যাত্মিক পুরুষদের বেশীর ভাগই আসেন অত্যন্ত সাধারণ মধ্যবিত্ত আর তা নাহলে মধ্যবিত্তদের থেকে। কিন্তু বয়স্ক লোক, প্রচুর টাকা পয়সা আছে, এখনও ভোগের মধ্যে আছে, একটা বয়সে যা ভোগ করার সব হয়ে গেছে, এখন বয়সের ভারে শরীরের ইন্দ্রিয়গুলিও শিথিল হয়ে গেছে, তবুও শ্রদ্ধা ভক্তি নিয়ে এদের ভগবানের কথা শোনার ইচ্ছে হবে না। এই ধরণের বয়স্ক কিছু লোকের ভগবানের কথা শোনার ইচ্ছে হবে, যদি তাদের ছোটবেলা থেকে সংস্কার থাকে। এরা আবার আলাদা থাকের। কিন্তু সেখানেও আবার দেখা যায় এরা আজকে এই সাধু, কাল অন্য সাধুদের দিয়ে ভাগবত কথা পাঠ করাবার আয়োজন করবে। এটাও এক ধরণের মদ। আমার কাছে এত সাধু মহাত্মারা আসেন – এটাও এক ধরণের মদ।

জেন্‌ মাস্টারদের খুব মজার মজার কাহিনী আছে। বৌদ্ধরা ভারত থেকে ধ্যানকে নিয়ে গিলেন চীনে, চাইনিজ্‌ ভাষায় ধ্যান হয়ে গেল চাং। চাং পাল্টে গিয়ে হয়ে গেল জেন্‌। পরে জেন্‌ মাস্টাররা বৌদ্ধদের মধ্যে খুব জনপ্রিয় হয়ে গেলেন। জেন্‌ মাস্টারদের যদি কেউ প্রশ্ন করে ওনারা তার কোন উত্তরই দেবেন না। একবার নতুন এক শিষ্য সকালে টিফিন করে জেন্‌ মাস্টারকে গিয়ে বলছে 'মাস্টার! একটা প্রশ্ন ছিল'। মাস্টার শুনে বলছেন 'সকালের টিফিন হয়ে গেছে'? 'হ্যাঁ, হয়ে গেছে'। 'যাও! বাসনটাকে ভালো করে মাজো গিয়ে'। জেন্‌ মাস্টারদের বক্তব্য হল, তোমার প্রশ্নের উত্তর তুমি নিজেই পেয়ে যাবে। সাধুসঙ্গে ঠিক এটাই হয়। সাধুর পূণ্য সান্নিধ্যে যখন থাকছে তখন তাতেই তার আধ্যাত্মিক উন্নতি হবে। এই সাধুসঙ্গ ঠিক ঠিক কারা করতে পারে? যাদের বিষয়বাসনা সব চলে গেছে। বিষয়বাসনা কখন যায়? যখন শরীরকে শুকিয়ে দেওয়া হয়। শরীরকে শুকিয়ে দেওয়া মানে, ইন্দ্রিয়ের বিষয় রসকে শুকিয়ে দেওয়া। ইন্দ্রিয়ের বিষয় রসকে শুকিয়ে দিতে পারে তারাই যারা নির্ধন ও দরিদ্র।

দেবর্ষি নারদ দেখছেন এরা হল লোকপাল কুবেরের সন্তান কিন্তু এতই ভোগাসক্ত যে মদিরা পান করে বস্ত্রহীন হয়ে লাম্পট্যে মত্ত হয়ে আছে। এতই নির্লজ্জ যে, একজন সাধুকে দেখেও এদের মধ্যে কোন সম্বিৎ নেই যে, আমি কার সামনে উলঙ্গ হয়ে লাম্পট্য করে যাচ্ছি! যদি সম্বিৎও থাকে তাহলে তারা সাধুকে কোন গ্রাহ্যই করছে না। কোন কিছুর ব্যাপারে যাদের হুঁশই নেই তাই এদের এমন একটা যোনিতে গিয়ে জন্ম নেওয়া দরকার যাতে করে সেখানে গিয়ে এরা ঠিক ঠিক ভোগ করতে পারবে। যেহেতু তোমাদের শরীরের কোন বোধ নেই, সেইহেতু তোমরা সেই যোনিতে চলে যাও যেখানে কোন শরীর বোধই থাকবে না, মানে কোন বৃক্ষ হয়ে যাও। বৃক্ষ হয়ে যাওয়া মানে এবার তুমি সব সময় উলঙ্গ হয়ে থাকবে, শরীরে কোন বস্ত্র দেওয়ার প্রয়োজন হবে না। পুনর্জন্মের যে কথা বলা হয় তাতে এটাই বলা হয়, মৃত্যুর সময় মনে যে ধরণের প্রবৃত্তি থাকবে সেই প্রবৃত্তিগুলো নিয়েই সে সেই রকম যোনি পাবে যেখানে এই প্রবৃত্তিগুলো কার্যকর করতে পারবে। ভোগে তোমরা এমনই মত্ত যে তোমাদের কোন শরীর বোধই নেই। শরীরে যে কোন বস্ত্র নেই তাতেও তোমাদের কোন হুঁশ নেই আর মনটা তোমাদের একেবারে জড় হয়ে গেছে। ঠিক আছে তাহলে জড় হয়েই জন্ম নাও। দেবর্ষি নারদের এই অভিশাপ শুনে কুবেরের দুই পুত্র তো ভয়ে কাঁপতে শুরু করে দিয়েছে। নারদের হাতে পায়ে ধরে ক্ষমা চাইতে আরম্ভ করল। নারদ তখন তাদের আশ্বাস দিয়ে বললেন তোমরা অর্জুন বৃক্ষ হয়ে এইভাবে অনেক দিন পড়ে থাকবে। কত দিন পড়ে থাকবে? দেবতাদের একশ বছর পর্যন্ত। মানুষের একটি বছরে দেবতাদের একটা দিন, আবার একটি বছরে দেবতাদের একটি রাত, এই হিসাবে দিব্য শতবর্ষ কুবেরের দুই পুত্র অর্জুন বৃক্ষ হয়ে থাকবে। কিন্তু তোমরা যে কুবেরের সন্তান এই স্মৃতিটা তোমাদের থাকবে। স্মৃতি যদি না থাকে তাহলে দণ্ড যাকে দেওয়া হল তার তো কোন বোধই থাকবে না। বেহুঁশ লোককে ডাণ্ডা পেটা করলে তার তো কোন বোধই হবে না। সেইজন্য পুলিশ যখন দেখে কোন কয়েদীকে মারতে মারতে বেহুঁশ হয়ে গেছে তখন আবার জলটল খাইয়ে তার হুঁশটা ফিরিয়ে এনে আবার মারতে থাকে। তোমাদের যে অভিশাপ দেওয়া হল, শুধু একটা অর্জুন গাছ হয়ে থাকলে তো বুঝতে পারবে না, সেইজন্য তোমাদের এই স্মৃতিটা থাকবে। এরপর যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অবতার হয়ে আসবেন তখন তিনি তোমাদের উদ্ধার করবেন।

কুবেরের সন্তানদ্বয়ের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের কৃপা দৃষ্টি

এখন শ্রীকৃষ্ণকে যশোদা বিরক্ত হয়ে উলূখলের সাথে বেঁধে দিয়ে ঘরের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেই সময় দুটো অর্জুন গাছের দিকে নজর গেছে। এরাই হল সেই অভিশপ্ত যক্ষাধিপতি কুবেরের দুই পুত্র। তখন ভগবান বলছেন ***দেবর্ষিমে প্রিয়তমো যদিমৌ ধনদাত্মজৌ। তত্তথা সাধয়িষ্যামি যদ্‌ গীতং তন্মাহাত্মনা।।১০/১০/২৫।*** দেবর্ষি নারদ আমার খুবই প্রিয়, এরা কুবেরের সন্তান। আর কুবেরও তো আমারই ভক্ত। সেইজন্য নারদ যা বলেছিলেন আমাকে তাঁর কথার মর্যাদা রক্ষা করতে এদের মুক্তির ব্যবস্থা করে দিতে হবে। ভগবান কুবেরের দুই পুত্রের মুক্তির ইচ্ছায় তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন। শ্রীকৃষ্ণ তখন নেহাতই বাচ্চা। তাতেই তিনি মা যশোদার দৃষ্টির অগোচরে ঐ উলূখলটাকে টানটে টানতে পালাতে শুরু করেছেন। যেতে যেতে ঐ দুটো যমজ অর্জুন গাছের মাঝখান দিয়ে যাওয়ার সময় দুটো যমজ গাছের মধ্যে

উলূখলটা ফেঁসে গেছে। শ্রীকৃষ্ণের কোমরে দড়ি লাগানো আর দড়িটা উলূখলে বাঁধা, সেই উলূখলটা আবার দুটো গাছের মাঝখানে ফেঁসে গেছে।

শুকদেব খুব সুন্দর বলছেন ***বালেন নিষ্কর্ষয়তান্বগুলূখলং তদ্ দামোদরেণ তরসোৎকলিতাঙ্ঘ্রিবন্ধৌ। নিষ্পেততুঃ পরমবিক্রমিতাতিবেপস্কন্ধপ্রবালবিটপৌ কৃতচণ্ডশব্দৌ।। ১০/১০/২৭।*** শ্রীকৃষ্ণ তো উলূখলে ফেঁসে থাকার জন্য আসেননি। ভগবান হলেন অমিত বিক্রমশালী, জগতে যা কিছু শক্তি সব শক্তি ভগবানের মধ্যেই পুঞ্জিভূত হয়ে আছে। সেইজন্য আচার্য শঙ্কর ভগবানকে পরিভাষিত করতে গিয়ে বলছেন তিনি হলেন ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ, তাই শক্তি, বল ও বীর্য এই তিনটে সব সময় ভগবানের মধ্যে আছে। শক্তি, বল ও বীর্য এই তিনটেকে এক অপরের সাথে পরিবর্তিত করা যায়। আচার্যের ব্যাখ্যা অনুযায়ী বলা যায় ভগবানের ভেতরে যে শক্তি আছে সেটা বাইরে প্রকাশিত হয়। যেমন অনেকের ভেতরে শক্তি আছে কিন্তু তিনি সেই শক্তিকে প্রকাশ করতে পারেন না, তিনি নিজের পরাক্রম দেখাতে পারেন না। যিনি জগতের সমস্ত শক্তির নিধান, তিনি একটু সামান্য টান দিলেই তো যে কোন জিনিষ স্থানচ্যুত হয়ে যাবে। আমরা যত কাজ করি, সব কাজের পেছনে আমাদের কোন না কোন একটা উদ্দেশ্য থাকে। আমাদের জীবন কার্য-কারণ সম্পর্কের মধ্যে, যুক্তি-তর্কের মধ্যে আবদ্ধ। কিন্তু ভগবানের সব কিছুই লীলা। 'লীলা' শব্দটা ভক্তিশাস্ত্রের নিজস্ব। লীলা বলতে সাধারণতঃ বোঝায় সব কাজের মধ্যে কোন যুক্তি-তর্ক বা কার্য-কারণ সম্পর্ক থাকতে হবে তার কোন মানে নেই। নিজস্ব কোন উদ্দেশ্য তো কখনই থাকবে না। আচার্য শঙ্করও বারবার এই কথা বলছেন, ভগবানের নিজস্ব কোন প্রয়োজন থাকে না। তাহলে কার প্রয়োজন? যাঁরা ভক্ত তাঁদের প্রয়োজন। যেমন নলকূবর আর মণিগ্রীব এই দুজন মোহান্ধ হয়ে গিয়েছিল, এদের দুজনকে সোজা পথে নিয়ে আসতে হবে। নারদ আবার অভিশাপ দিয়ে দিয়েছেন। এখন নারদের কথা রক্ষা করতে হবে। এদের দুজনকেও একটা যোনি মুক্তি দিতে হবে। ভগবান এখানে যা কিছু করছেন এতে তাঁর নিজের কোন উদ্দেশ্য নেই। তাঁর যাঁরা শরণাগত, তাঁর ভক্ত যাঁরা আছেন তাঁদের সব রকম মনস্কামনা পূর্ণ করার জন্যই যা কিছু করা।

কিন্তু মুশকিল হল, এর মধ্যে আবার নানান রকম জট পাকিয়ে আছে। যেমন বৃষ্টি পড়লে চাষীদের মঙ্গল, আবার অন্য দিকে বৃষ্টি হলে ধোপাদের অমঙ্গল কারণ তাদের কাপড় জামা শুকোবে না। ভগবানকে তো সবাইকেই দেখতে হয়। যেখানে বন্যা হয় সেখানকার লোকদের মধ্যে কি বিভীষিকা! মিশন থেকে ত্রাণ যাচ্ছে, সরকারের তরফ থেকে নানা রকমের কাজের জন্য রিলিফের টাকা যাচ্ছে। সেই টাকা আত্মসাৎ করে অনেকে বড়লোক হয়ে যাচ্ছে। আবার বন্যার জল নেমে যাওয়ার পর সমস্ত অঞ্চলটা শস্য শ্যামলা বসুন্ধরা হয়ে ওঠে। গ্রামের লোকেরা বলে বন্যা হলে আমাদের তিনটে ফসল হয় তার উপর আবার রিলিফ, ধরতে গেলে চারটে ফসল। কিন্তু বন্যা না হলে দুটো ফসলই হয় মাঝখান থেকে রিলিফটাও পাওয়া যায় না। সেইজন্য ভগবানের কোনটা লীলা, আর কোনটা লীলা নয় আমরা কখন কোন দিন বুঝতে পারবো না। ভগবানকে সবার জন্য ভাবতে হয়, সবাইকে দেখতে হয়, তিনি নিজের জন্য কিছু করেন না। আবার পাঁচ রকম ভক্তের পাঁচ ধরণের প্রার্থনা থাকে, ভগবানকে সবারই কথা শুনতে হবে। তাই বলতে হয়, ভগবানের কার্য কিছু বোঝা যায় না। ঠাকুরও বলছেন – ঈশ্বরের কার্য কি বোঝা যায় গা!

একজন একটা চাকরির ইন্টারভিউ দেওয়ার আগে মায়ের মন্দিরে গিয়ে খুব করে প্রার্থনা করছে 'মা! দেখো আমার যেন চাকরিটা হয়'। মা তখন তাকে দেখা দিয়ে বলছেন 'বাবা! এই কিছুক্ষণ আগে আরেকজনও এসে এই প্রার্থনা করে গেছে, কিন্তু চাকরি তো একটাই, আমি আর তোমাকে কোথা থেকে চাকরি দেব!' আমরা মনে করি ঠাকুর আমার প্রার্থনা শুনলেন না, কিন্তু ঠাকুরকে যে সব দিক ম্যানেজ করে চলতে হয়, সেটা তো আমরা বুঝি না। পঞ্চাশ জন লোক পঞ্চাশটা বিপরীত প্রার্থনা নিয়ে তাঁর দরবারে হাজির হচ্ছে, এদের সবাইকে নিয়েই তো তাঁকে চলতে হবে। কিন্তু তিনি তো অমিত পরাক্রমশালী, একটু পরাক্রম লাগালেই সব কাজ উদ্ধার হয়ে যায়, কিন্তু তাতে তাঁর কোন স্বার্থ থাকে না। বলছেন এখন ঐ পরাক্রম দিয়ে শ্রীকৃষ্ণ সামান্য একটু টান দিতেই *স্কন্ধপ্রবালবিটপৌ কৃতচণ্ডশব্দৌ*, দুটো গাছই প্রবল কম্পন সহ প্রচণ্ড শব্দে এক সাথে সমূলে উৎপাটিত হয়ে ভূতলে নিপাতিত হয়ে গেল।

তখন কি দেখা গেল? ***তত্র শ্রিয়া পরময়া ককুভঃ স্ফুরন্তৌ সিদ্ধাবুপেত্য কুজয়োরিব জাতবেদাঃ। কৃষ্ণং প্রণম্য শিরসাখিললোকনাথং বদ্ধাঞ্জলী বিরজসাবিদমূচতঃ স্ম।।১০/১০/২৮।*** আর সেখান থেকে অগ্নি তুল্য তেজস্বী দুজন সিদ্ধ পুরুষ বেরিয়ে এলেন। তপস্যা করলেই শরীরে তেজ বৃদ্ধি হবে। আমরা মনে করছি এই দুই যক্ষ অভিশপ্ত, অভিশপ্ত ঠিকই কিন্তু অভিশাপ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য এরা তপস্যা করেছে। নারদ এদের বলে দিয়েছিলেন – তোমরা তপস্যা কর, তোমাদের শ্রীকৃষ্ণ এসে উদ্ধার করবেন। সেই থেকে দুজন মন-প্রাণ এক করে শ্রীকৃষ্ণ আসবেন এই আশায় এক জায়গাতে দৈব শতবর্ষ ধরে মাটি কামড়ে পড়ে ছিল। সেইজন্য অর্জুন গাছ উৎপাটিত হতেই তাদের জ্বলজ্বল করা দিব্যকান্তি যুক্ত শরীর বেরিয়ে এসেছে, অভিশপ্ত কিন্তু শরীরটা অগ্নির মত দীপ্যমান। বাল্মীকি রামায়ণেও ঠিক একই ধরণের ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। গৌতম মুনির অভিশাপে তাঁর স্ত্রী অহল্যার বায়ু শরীর হয়ে গিয়েছিল। গৌতম মুনি অহল্যাকে বলে দিয়েছিলেন, শ্রীরামচন্দ্র যখন এখানে আসবেন তখন তাঁকে দর্শন করে তোমার মুক্তি হয়ে যাবে। সেই থেকে অহল্যা সেখানে পড়ে থেকে তপস্যা করতে শুরু করে দিলেন। অনেক বছর পর ঘুরতে ঘুরতে যখন শ্রীরামচন্দ্র সেই স্থানে পোঁছেছেন তখন তিনি সেখানে দেখছেন এক জ্যোতির্ময় তেজোদীপ্ত নারীকে। তপস্যা করে করে অহল্যার বায়ু শরীর এমন তেজোময় হয়ে গেছে যে, শ্রীরামচন্দ্রও তাঁকে স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছিলেন। তিনি গিয়ে অহল্যাকে প্রণাম করলেন। বাল্মীকি রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্রকে ভগবান রূপে বর্ণনা করা হয়নি, তিনি একজন মহামানব। কিন্তু অন্যান্য রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্র ভগবান, অহল্যা ভগবান শ্রীরামচন্দ্রকে প্রণাম করে পাথরের শরীর থেকে মানব শরীর ফিরে পেয়েছিলেন। কিন্তু বাল্মীকি রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্র অহল্যাকে প্রণাম করছেন। অহল্যা আবার বায়ু শরীর থেকে মুক্ত হয়ে অর্ঘ্য দিয়ে যথাবিহিত ভাবে শ্রীরামচন্দ্রের পাদবন্দনা করলেন। তপস্যা করলেই চেহারায় একটা তেজ এসে যাবে, মন স্বাভাবিক ভাবেই অন্তর্মুখী হয়ে যাবে, সহজে তাঁর সামনে কেউ দাঁড়াতে পারবে না। এই দুই যক্ষ এরাও ঠিক তাই করেছেন, যদিও বৃক্ষ যোনি।

আমাদের খুব পুরনো বিশ্বাস যে সব পাথর পাথর নয়, সব বৃক্ষ বৃক্ষ নয়। ভারতবর্ষে বৃক্ষকে শুধু বৃক্ষ রূপে, কোন পাথরকে শুধু একটা পাথর রূপে দেখা হয় না। আমরা দেখছি একটি সাধারণ বৃক্ষ কিন্তু সেই বৃক্ষে হয়তো কোন সিদ্ধপুরুষ আশ্রয় করে তপস্যা করে যাচ্ছেন। পতঞ্জলী যোগসূত্রে একটি সূত্রে ***(নির্মাণচিত্তান্যস্মিতামাত্রাৎ)*** বলছেন যোগী বুঝতে পারছেন তাঁর কর্মাশয়ে যত কর্ম জমা আছে সেগুলোকে শেষ করার জন্য যে তপস্যা করতে হবে সেই তপস্যা এই একটা শরীর দিয়ে শেষ করা যাবে না। তখন যোগী একসাথে অনেকগুলো শরীর তৈরী করে নেন। এইভাবে নির্মিত শরীরকে বলা হয় কায়ব্যূহ। যোগী হয়তো একটা পাথরের শরীরে মধ্যে ঢুকে বসে আছেন, যাতে কেউ বিরক্ত করতে না পারে, কোন গাছের একটা শরীরে ঢুকে তপস্যা করে যাচ্ছেন। যাঁরা প্রচুর জপ-ধ্যান করছেন, একটা অবস্থার পর খিদে পাওয়া, তেষ্টা পাওয়া, কোন শব্দ, কোলাহল এগুলোতে তাঁদের প্রচণ্ড বিরক্তি এসে যায়। যোগীরাও অনেক দিন সাধনা করে করে অনেক কিছুর উপর তাঁদের নিয়ন্ত্রণ চলে আসে। তাঁরাও সেই সময় এমন একটা শরীর চান যে শরীরে বেশী খাওয়া-দাওয়া করতে হবে না, বেশী ঘুমোবার প্রয়োজন হবে না। কারণ যোগীর কাছে তখন মনটাই প্রধান, তাঁদের কাছে শরীরের কোন গুরুত্ব নেই। তাঁর কাছে একটা পাথরও যা আর এই পঞ্চভূতের শরীরও তাই, সেইজন্য হয়তো তিনি একটা পাথরের মধ্যে প্রবেশ করে গেলেন। এরপর পাথরে রোদ, বৃষ্টি, ঠাণ্ডা, বরফ সবই পড়ছে, কিন্তু তিনি সমাধিতে লীন, এগুলো তাঁকে কোন স্পর্শ করতে পারে না। দুই যক্ষও এতদিন তপস্যা করেছে বলে এরাও তেজোময় হয়ে গেছে। তপস্যা করলে মনও শুদ্ধ পবিত্র হয়ে যায়। শুদ্ধ পবিত্র হয়ে যাওয়া মানেই, কোন ধরণের কামিনী-কাঞ্চন সম্ভোগের ইচ্ছা চলে গেছে। কামিনী-কাঞ্চনের প্রতি ভোগের ইচ্ছা হয় আমি ভাব থাকলে, এদের সেই আত্মভাব অর্থাৎ আমি ভাবটাই চলে গেছে। যাঁর মন শুদ্ধ পবিত্র হয়ে গেছে, আমি ভাব চলে গেছে, তার মানে তার মন পুরোপুরি ঈশ্বরে সমর্পিত হয়ে গেছে। এখানেই তো তাদের সমস্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়ে গেল।

যমলার্জুন কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণ স্তুতি

এদিকে যশোদা আর ব্রজের সবাই দৌড়ে গেছেন, ভাবছেন ঐ গাছে চাপা পড়ে শ্রীকৃষ্ণের কিছু না হয়ে থাকে। গিয়ে দেখে কোথায় গাছ, দুজন তেজোময় যক্ষ দাঁড়িয়ে আছেন। এইখানেই নলকূবর আর মণিগ্রীবের গতি হয়ে গেল। মুক্ত হয়ে যেতেই দুজনেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কৃতজ্ঞ চিত্তে ভগবান রূপে শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করতে শুরু করেছেন। কারণ তাঁরা বুঝে গেছেন শ্রীকৃষ্ণ কে? তপস্যা না করলে ঈশ্বর তত্ত্ব কোন দিন বোঝা যাবে না, ঈশ্বর তত্ত্ব বোঝার জন্য জন্ম জন্ম ধরে প্রচুর সাধনা করে যেতে হয়। কথামৃত সবাই পড়ছে, গীতাও কিছু লোক পড়ে কিন্তু তপস্যা না থাকলে কথামৃত বা গীতার একটি কথাও ধারণা করা যাবে না। যশোদা শ্রীকৃষ্ণকে প্রচণ্ড ভালোবাসেন ঠিকই, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের আসল স্বরূপ তাঁর জানা নেই। গোপীরাও শ্রীকৃষ্ণকে ভালোবাসেন কিন্তু ঈশ্বর তত্ত্ব জানেন না। ঈশ্বর তত্ত্ব জানতে গেলে তপস্যা করতে হবে। এঁরা দুজন তপস্যা করেছিলেন বলে বুঝতে পারছেন শ্রীকৃষ্ণ কে।

অবতার জন্ম থেকেই যোগী

অবতার রূপ ধারণ করার পর ব্রজধামে এই প্রথম শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে কোন স্তুতি করা হচ্ছে। এর আগে অবশ্য কংসের কারাগারে শ্রীকৃষ্ণ বিষ্ণুর চতুর্ভুজ মুর্তিতে জন্ম নেওয়ার পর তাঁর পিতামাতা বসুদেব ও দেবকীও ভগবানের স্তুতি করেছিলেন। কংসের কারাগারে বসুদেব ও দেবকী তাঁদের সন্তানকে বিষ্ণুর চতুর্ভুজ রূপে দেখে স্তুতি করেছিলেন, কিন্তু এখানে শ্রীকৃষ্ণ উলূখলে বাঁধা হয়ে আছেন, তাও তিনি চার বছরের শিশু। যাউ হোক যক্ষদ্বয় স্তুতি করে বলছেন – ***কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাযোগিংস্ত্বমাদ্যঃ পুরুষঃ পরঃ। ব্যক্তাব্যক্তমিদং বিশ্বং রূপং তে ব্রাহ্মণা বিদুঃ।।১০/১০/২৯।*** এই শ্লোকগুলো স্তুতি বটে কিন্তু এর মধ্যে ঈশ্বর তত্ত্বের আলোচনা করা হয়েছে, আবার সব স্তুতিতেই যে ঈশ্বর তত্ত্ব থাকতে হবে তার কোন মানে নেই। এই ধরণের শ্লোক ঈশ্বর তত্ত্বে সমৃদ্ধ হওয়ার জন্য অত্যন্ত মূল্যবান শ্লোক। শ্রীকৃষ্ণকে প্রথম থেকেই যোগী সম্বোধন করা হচ্ছে। ভগবানকেই একমাত্র পরমযোগী বা মহাযোগী বলা হয়। যোগশাস্ত্রে পাতঞ্জলী বলছেন *স পূর্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ*, অন্য গুরুরা সবাই কালে আবদ্ধ কিন্তু ঈশ্বর কালে আবদ্ধ নন। যোগীরা সমাধিতে গিয়ে নিজের স্বরূপে অবস্থান করেন কিন্তু ভগবান সব সময়ই স্ব-স্বরূপে অবস্থান করে আছেন। যোগীরা সমাধিতে গিয়ে যে অবস্থায় অবস্থান করছেন ভগবান সব সময়ই সেই অবস্থায় স্থিত হয়ে আছেন, মানে নিজের স্বরূপে অবস্থা করছেন। এখানে যোগী মানে যোগ সাধনা করাকে বোঝাচ্ছে না। তাই তিনি মহাযোগী। অবতার পুরুষদের এটাই বৈশিষ্ট্য, সব অবতাররাই যোগী হন। যিশু যোগী ছিলেন, মহম্মদও যোগী ছিলেন, শ্রীরামচন্দ্র যখন বনবাসে ছিলেন তখন তো তিনি পুরোপুরি যোগী হয়েই কাটিয়েছিলেন। এখানেও শ্রীকৃষ্ণকে যোগী বলা হচ্ছে। অবতারের প্রথম শর্তই হল তিনি যোগী। অবতারের মধ্যে পাণ্ডিত্য থাকতেও পারে আবার নাও থাকতে পারে কিন্তু যোগী অবশ্যই হবেন। শ্রীকৃষ্ণ এখনও ছোট শিশু, যোগ সাধনাই শুরু হয়নি তাঁর, কিন্তু তা সত্ত্বেও শ্রীকৃষ্ণকে যোগী বলে সম্বোধন করা হচ্ছে।

মহাভারতে নর ও নারায়ণ ঋষির বর্ণনা আছে। সেখানে বলা হয় শ্রীকৃষ্ণ হলেন সেই নারায়ণ ঋষি, নারায়ণ ঋষি সব সময় যোগে অবস্থিত। শ্রীকৃষ্ণ মহাভারতে পরিষ্কার বলছেন – আমার চারটে রূপ, একটা রূপ নির্গুণ নিরাকার, দ্বিতীয় রূপ ক্ষীরসাগরে অনন্তনাগের উপর আমি শয়ন করে আছি, তৃতীয় হল নারায়ণ ঋষি হয়ে আমি বদ্রিকাশ্রমে তপস্যা করে যাচ্ছি আর চতুর্থ রূপে আমি অর্জুনের সারথি হয়ে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অর্জুনকে দিয়ে যুদ্ধ করাচ্ছি। একই সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ চারটি রূপে অবস্থান করে আছেন। সেইজন্য যক্ষ কুমাররা শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করে বলছেন *কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাযোগী*। মহাযোগী মানে তাঁর যোগের সামনে ধারে কাছে কেউ দাঁড়াতে পারে না। অবতার মানেই পরমযোগী তিনি। তিনি পরমযোগী আর তার সাথে *পুরুষঃ পরঃ*, তিনি সেই পরম পুরুষ। ভগবানের সাথে যখনই 'পুরুষ' শব্দটা আসে তখন আমাদের মনে রাখতে হবে বেদ থেকেই এই 'পুরুষ' শব্দটা নেওয়া হয়। কারণ বেদে কোন ঈশ্বর বা ভগবানের ধারণা দেওয়া হয়নি। ভগবানকে বোঝানোর জন্য বেদে প্রথমে বলা হয় পুরুষ, তারপর পুরুষ থেকে পার্থক্য করার জন্য বলা হয় তিনি আদি পুরুষ। পরের দিকে এই আদি পুরুষকেই পরম পুরুষ বলা হয়েছে, সব কিছুর পারে যিনি তিনিই পরম পুরুষ। অন্যান্য

পুরুষের জন্ম হয়, কিন্তু ভগবান থেকে সব পুরুষের জন্ম হয়, কারণ তিনিই আদি পুরুষ। ভগবানের পেছনে আর কিছু হয় না। তাই ভগবানের জন্ম কে দিয়েছেন, এই প্রশ্নগুলো হয় না।

ব্যক্ত ও অব্যক্ত জগৎ ঈশ্বরেরই রূপ

ব্যক্তাব্যক্তমিদং বিশ্বং রূপং তে, কুবেরের পুত্রদ্বয় স্তুতি করে বলছেন, যাঁরা বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ তাঁরা জানেন ব্যক্ত এবং অব্যক্ত যা কিছু আছে সবটাই আপনি। *তে রূপং*, আপনার রূপ হল এই ব্যক্ত অব্যক্ত জগৎ। জগতের দুটি রূপ, একটি ব্যক্ত জগৎ, আরেকটি অব্যক্ত জগৎ। ব্যক্ত মানে পঞ্চ ইন্দ্রিয় দিয়ে যাকে জানা যায়। পঞ্চ ইন্দ্রিয় দিয়ে যাকে জানা যায় না তাকে অব্যক্ত বলছেন। অব্যক্ত আবার প্রকৃতিকেও বলা হয় আবার কোন কোন সময় অব্যক্ত বলতে ঈশ্বরকেও বোঝায়। অব্যক্তের তিনটে অর্থ – যেটা ইন্দ্রিয় দিয়ে জানা যায় না, যেমন যাদের এখনও জন্ম হয়নি তাদের আমরা দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু এখন অব্যক্ত রূপে আছে পরে ব্যক্ত হবে। গীতায় অর্জুনকে ভগবান ঠিক এই কথাই বলছেন *অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত। অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা।।২/২৮।* আপনি আগে অব্যক্ত ছিলেন, এখন ব্যক্ত হয়েছেন পরে আবার অব্যক্ত হয়ে যাবেন। অর্থাৎ আগে আপনি দৃষ্টিগোচর ছিলেন না, এখন দৃষ্টিগোচর হয়েছেন, পরে আবার দৃষ্টির অগোচর চলে যাবেন। অব্যক্তের এই একটা অর্থ হয়। দ্বিতীয় অর্থ, প্রকৃতিকেও অব্যক্ত বলা হয়, প্রকৃতির মধ্যেই সমস্ত কিছু সুপ্ত হয়ে রয়েছে, প্রকৃতি থেকেই সব কিছু বেরিয়ে আসে, ইন্দ্রিয় দিয়ে জানা যায় না বলে প্রকৃতিকেও অব্যক্ত বলছেন। ঈশ্বরকে তো অব্যক্ত বলাই হয়, কারণ পঞ্চ ইন্দ্রিয় দিয়ে তাঁকে কখনই জানা যায় না। এখানে অব্যক্ত বলছেন জগতের অর্থে। বলছেন, এই ব্যক্ত জগৎ যেটাকে আমরা পঞ্চ ইন্দ্রিয়ে দিয়ে জানতে পারছি, আর অব্যক্ত জগৎ, যে জগৎ এখনও ব্যক্ত হয়নি ভবিষ্যতে হবে, সব আপনারই রূপ। গীতার পঞ্চোদশহধ্যায়ে ঠিক এই কথাই বলা হয়েছে – *দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চক্ষর এব চ*। ক্ষর পুরুষ আর অক্ষর পুরুষ এই দুটোই আপনি। শুধু এই দুটোই নয়, *উত্তমঃ পুরুষস্তন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ*, এই দুই পুরুষের পারে যে উত্তম পুরুষ সেটাই আপনি, আপনিই পরমাত্মা। সাধনার শেষ অবস্থায় দেখেন ঈশ্বর ছাড়া কিছু নেই, ঈশ্বরই সব কিছু হয়েছেন। ঠাকুরও বলছেন উত্তম ভক্ত দেখে তিনিই সব কিছু হয়েছেন।

ত্বমেকঃ সর্বভূতানাং দেহাস্বাত্মেন্দ্রিয়েশ্বরঃ। ত্বমেব কালো ভগবান্ বিষ্ণুরব্যয় ঈশ্বরঃ।। ১০/১০/৩০। আপনি সকল প্রাণীর দেহ, সকলের অন্তঃকরণ, সমস্ত প্রাণ এবং ইন্দ্রিয় সমূহের অধিপতি আপনিই। আমাদের প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয়ের একজন করে দেবতা আছেন, যেমন হাতের দেবতা ইন্দ্র, মনের দেবতা চন্দ্রমা, চোখের দেবতা আদিত্য ইত্যাদি। এখানে দুটো তত্ত্বকে নিয়ে আসা হয়েছে, একটা হল জগতে এমন কিছু নেই যেটা ঈশ্বরের বাইরে, আর যেটা আপাতদৃষ্টিতে আলাদা মনে করছি, যেমন আমার হাত আর আমি আলাদা কিন্তু শাস্ত্র বারবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এই একটি কথাই বলবে, তুমি আর তোমার যে হাত সেটাও তিনি, তোমার যে ইন্দ্রিয় সেটাও তিনিই আর ইন্দ্রিয়দের যিনি চেতনা দিচ্ছেন, ইন্দ্রিয়গুলিকে যিনি ধরে রাখছেন সেটাও তিনি এবং যে বলছে 'আমি' সেও তিনি আর তার যে বিশুদ্ধ আত্মা সেটাও তিনি। তার সাথে মায়াজনিত তোমার মধ্যে যে এই বোধ হচ্ছে তুমি আলাদা আর তোমার প্রভু আলাদা এই মায়াটাও তিনি। শাস্ত্রের কথা শোনার পর যে তোমার মনে থাকছে আর তুমি যে আবার শাস্ত্রের কথা পরে ভুলে যাচ্ছ এই দুটোও তিনি। গীতার পঞ্চদশোহধ্যায়ে ভগবান এই কথাই বলছেন *মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনঞ্চ*, আমার থেকেই স্মৃতি ও জ্ঞান হচ্ছে আবার সব কিছু স্মৃতি থেকে চলে যাওয়া, ভুলে যাওয়াটাও আমার থেকেই হয়। চেতনা না থাকার জন্য তুমি যে তাঁর জ্ঞান ভুলে যাচ্ছ, সেটাও তাঁর কাছ থেকেই আসছে। এগুলো যে শুধু তত্ত্বের সিদ্ধান্ত বলে মেনে নিতে হবে তা নয়, এটাই একমাত্র সত্য। কারণ ভগবানের বাইরে কোন কিছুর অস্তিত্বই হয় না। ভগবানের বাইরে যদি কিছু থাকে তাহলে সেটা আকাশকুসুমের মত সত্তাহীন হয়ে শব্দমাত্র হয়ে থাকবে।

আমাদের সবারই জীবন ধারণ হয় তাঁরই প্রাণের প্রক্রিয়ায়। ঠাকুর বলছেন ভগবানই সবার জীবন ধারণ করে আছেন। ভগবান যদি ঠিক করে থাকেন ওকে মারবো, তাকে আর কেউ বাঁচাতে পারবে না। ঠিক তেমনি তিনি যাকে বাঁচিয়ে রাখতে চাইবেন, কারুর ক্ষমতা নেই তাকে মেরে ফেলবে। দেখে মনে হবে এই

বুঝি সব শেষ হয়ে গেল, কিন্তু শেষ হয়ে যাবে না। উত্তরাখণ্ডে প্রকৃতির এই তাণ্ডবলীলার পর মিলিটারিরা সেখানে গিয়ে অনেককে উদ্ধার করতে নেমে পড়েছে। এক বৃদ্ধ তখন তাদের বলছে 'আমাকে বাঁচান, আমি আর বাঁচবো না'। সেই বৃদ্ধকে একজন উদ্ধারকারী মিলিটারি বলছে 'আপনি মরবেন না, মরা এত সহজ নয়'। খুব সুন্দর লাগলো কথাটা। সত্যিই মৃত্যু অত সহজে আসে না। যখন কেই মারা যায় তখন বুঝতে হবে এখানেই তার আয়ু শেষ। কারণ ভগবান হলেন জীবনের পশ্চাতে যে ঈশ্বর তিনি সেটা নিজে। প্রথমে ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ের পেছনে একজন করে দেবতা আছেন, সেই দেবতারা আবার ঈশ্বরেরই অভিব্যক্তি। *ত্বমেব কালঃ*, আপনি হলেন সর্বশক্তিমান কাল, কাল মানে মৃত্যু। *ভগবান্ বিষ্ণুরব্যয় ঈশ্বরঃ*, আপনিই সর্বব্যাপী অবিনাশী পরমেশ্বর। দুজন যক্ষ এই কথা কাকে বলছেন? তিন চার বছরের একটা বাচ্চা ছেলেকে, যে আবার উলূখলে দড়ি দিয়ে বাঁধা রয়েছে।

ভগবান সব সময় তিনটে অবস্থায় বর্তমান থাকেন

যক্ষদ্বয় স্তুতি করে বলছেন ***ত্বং মহান্ প্রকৃতিঃ সূক্ষ্মা রজঃসত্ত্বতমোময়ী। ত্বমেব পুরুষোঽধ্যক্ষঃ সর্বক্ষেত্রবিকারবিৎ।।১০/১০/৩১।*** এই শ্লোকগুলোই ভাগবতের দর্শন। ভাগবতের কাহিনী যেমন একটা দিক, দর্শনও ভাগবতের একটা বিশাল দিক। সেই দর্শনকেই এই স্তুতির মাধ্যমে বলা হচ্ছে। আপনিই মহৎ তত্ত্ব, আপনিই সত্ত্ব, রজ ও তমো এই ত্রিগুণাত্মিকা পরম সূক্ষ্ম প্রকৃতি। সমস্ত রকমের সূক্ষ্ম এবং স্থূল শরীরে যত রকম কর্ম হয়, যত ভাব, যত ধর্ম হয় তার জ্ঞাতা আপনি তাই আপনি হলেন সব কিছুর সাক্ষী সেই পরমাত্মা। এই ভাব আমাদের অন্যান্য শাস্ত্রে বিভিন্ন ভাবে বলা হয়, আর বিভিন্ন ভাষ্যকাররা তাঁদের নিজেদের মত ব্যাখ্যা করতে থাকেন। মূল কথা হল ভগবানই আছেন, কিন্তু তাঁরই একটা খুব ছোট্ট একটা অংশ কোন এক রহস্যজনক কারণে বিভিন্ন স্তরে স্তরে পরিবর্তিত হতে হতে এই জগৎ রূপ ধারণ করে। এই ব্যাপারটা সব সময় আমাদের মাথায় রাখতে হবে – রহস্যজনক বলার কারণটা কি, এর কোন ব্যাখ্যা নেই। সেইজন্য কেউ বলেন জগৎ বলে কিছু নেই, জগৎ মিথ্যা। কেউ বলেন এটাই ভগবানের লীলা, আবার কেউ একে বলেন মায়া, কেউ একে শক্তি বলছেন, কেউ বলেন এটা তাঁরই ইচ্ছা। এইভাবে বিভিন্ন শব্দ দিয়ে বিভিন্ন দর্শনে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে। শুদ্ধ সচ্চিদানন্দের উপর যেন একটা রেখা টেনে দেওয়া হয়েছে। এই রেখাকে কেউ বলছে মায়া, এই রেখাকেই কেউ বলছে দেশ, কাল ও পাত্রের ঘটনাক্রম। রেখার এই পার থেকে অখণ্ড অব্যক্ত সচ্চিদানন্দকে ব্যক্ত মনে হয়। কিন্তু যা কিছু হচ্ছে সব কিছু ভগবান থেকেই হচ্ছে।

যখন পরিবর্তনটা হয় তখন বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়ে সৃষ্টি এগোতে থাকে। জল যখন বরফ হবে বা বাষ্প থেকে যখন বরফে রূপান্তরিত হবে তখন তাকেও ধাপে ধাপে একটা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হতে হবে। জল যখন শূন্য ডিগ্রীতে থাকে তখন জল জলও থাকে আবার বরফও থাকতে পারে। কিন্তু বরফকে যখন জল করতে হবে তখন তাকে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ তাপ দিতে হবে, পদার্থ বিজ্ঞানীরা বলছেন প্রতি গ্রামে আশি ক্যালরি তাপ দিতে হবে। জল শূন্য ডিগ্রী থেকে বরফ হতে যে শক্তি নেয়, বরফ থেকে জল হতে একই শক্তি নেয়। এর উপর অনেকেই এখন বিজ্ঞানের অনেক থিয়োরী দাঁড় করাতে চাইছেন। একটা স্টেজ থেকে আরেকটা স্টেজে যখন দাঁড় করান হয় তখন তার জন্য একটা শক্তির দরকার হয়, তখন মনে হয় যেন জিনিষটা দাঁড়িয়ে আছে। যেমন এই ভারতকে দেখে মনে হয় একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে, তার মানে ভারত এখন শক্তি consume করছে। ভারতে ইংরেজরা যখন ছিল তখন মনে হচ্ছিল ভারত যেন লাফিয়ে লাফিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। এরপর যেন ভারত একটা জায়গায় এসে স্থির হয়ে গেল। স্থির কিছুই হয়নি, এখন ভারত শুধু energy consume করে যাচ্ছে, এটাকে বলে phase transition। এই phase transitionএর জন্য একটা শক্তি লাগে। কিন্তু পদার্থ বিজ্ঞানে এর বাইরে আরেকটি থিয়োরী আছে যাকে বলছেন triple point। এই থিয়োরিতে বলা হয় বরফ, জল আর বাষ্প এই তিনটে এক সঙ্গেই থাকে। ল্যাবরোটরিতে যদি শূন্য ডিগ্রী আর একটা নির্দিষ্ট প্রেসার যদি রাখা হয় তখন জল (H_2O) এক সঙ্গে তিনটে অবস্থায় থাকে। ভগবান ঠিক এই triple pointএর মত, তিনি তিনটে অবস্থাতেই থাকেন। তিনি নির্গুণ, তিনি সগুণ আবার তিনিই এই জগৎ, এই তিনটে অবস্থায় ভগবান এক সঙ্গে আছেন। তাঁরই আবার phase transition হয়ে যায়, তখন

জগৎটা চলে যায় সগুণ ব্রহ্মে। এরপর আবার একটা phase transition হয়, সগুণ চলে যায় নির্গুণ ব্রহ্মে। তিনিই আবার triple pointeএ চলে যান, তখন তিনটেই আছে। এগুলো উপমা, বক্তব্যটা বোঝাবার জন্যই পদার্থের নিয়ম দিয়ে বোঝানো হল। কোন বাচ্চাকে যদি বলা হয় তুমি যে আইসক্রীম খাচ্ছো, এই আইসক্রীম আর বাষ্প, যেটা দিয়ে স্টীম ইঞ্জিন চালান হচ্ছে, দুটো কিন্তু এক। বাচ্চা কোন দিন তা মানতে চাইবে না।

সাংখ্যবাদীরা আবার এই জিনিষটাকেই অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে পরিষ্কার ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেবেন সৃষ্টি কীভাবে হয় আর সৃষ্টির সাথে পুরুষের কি সম্পর্ক। দেশ, কাল ও পাত্রকে যে বিভাজন রেখা বিভাজন করে দিচ্ছে এটাকেই বলছেন সত্ত্বগুণ, রজোগুণ আর তমোগুণের খেলা, যার মধ্যে একটাতে স্থিতির ভাব থাকে, একটার মধ্যে ক্রিয়ার ভাব থাকে আর অন্যটাতে স্থিতি আর ক্রিয়ার ভারসাম্য বজায় রাখার ভাব থাকে। সেখান থেকেই এই বিভাজন হয়ে যায়, সচ্চিদানন্দের উপর যেন একটা পর্দা পড়ে গেল। কিন্তু তিনি সৎ চিৎ ও আনন্দ কিনা তাই সত্ত্ব, রজ ও তমগুণী পর্দাটা আলোকিত হয়ে ওঠে, এই আলোকিত পর্দাটাই মহৎ তত্ত্ব। সেইজন্য বলা হয় প্রকৃতি থেকে প্রথম আসে মহৎ তত্ত্ব, মহৎ হল সমষ্টি মন। এর উপর এবার অনেক কিছু খেলা শুরু হবে। বলছেন, আপনি শুধু তাই নন, *ত্বমেব পুরুষোহধ্যক্ষঃ*, সব কিছুর অধ্যক্ষ আপনি, আপনি আছেন বলে সব কিছু নিজের নিজের কাজ করছে। আমাদের যে ঋতুর পরিবর্তন হচ্ছে, কেন হচ্ছে? তিনি আছেন বলে। আমার কর্ম আমার কাছেই ফিরে আসে, আপনার কর্ম আপনার কাছে যাচ্ছে। কেন যায়? তিনি অধ্যক্ষ রূপে আছেন বলে। *সর্বক্ষেত্রবিকারবিৎ*, বিকার রূপে যা কিছু আছে তারও জ্ঞাতা আপনি।

বৃত্তি জ্ঞান আর স্বরূপ জ্ঞান

জ্ঞান দুই রকমের হয়, একটাকে বলে বৃত্তি জ্ঞান আর আরেকটিকে বলে স্বরূপ জ্ঞান। জগতের যা কিছু জানছি এটাকে বলছে বৃত্তি জ্ঞান। যোগশাস্ত্রে বলছে *যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ*। আমাদের মন হল একটা পুকুরের জলের মত। পুকুরে একটা ঢিল ফেললে পুকুরের জলে ঢেউ উঠবে। এই মন রূপী পুকুরের মধ্যে অনবরত পাথর পড়ছে। মনের মধ্যে যখনই কিছু প্রবেশ করে তখন হয় তা ইন্দ্রিয় দিয়ে নয়তো যেটা ভেতরে আছে তার মাধ্যমে প্রবেশ করছে। তখন মনে একটি ঢেউ ওঠে, সেই ঢেউয়ের নাম বৃত্তি। মনে এই যে বৃত্তি বা ঢেউ উঠছে এটাই জ্ঞান। যেমন ধরুন আমি এখানে হাতটা উপরে তুললাম, এই হাত তোলাটা আলোর মাধ্যমে আপনার কাছে গেল, গিয়ে আপনার চোখের স্নায়ুতে ধাক্কা মারল, স্নায়ুর মাধ্যমে মস্তিষ্কে গিয়ে ধাক্কা দিল। মস্তিষ্কে যখন ধাক্কা মারছে তখন সেখানে একটা চাঞ্চল্য সৃষ্টি করছে। মস্তিষ্কের এই চাঞ্চল্যটাই জ্ঞান। এটাকেই বলে বৃত্তি জ্ঞান। আজ থেকে প্রায় আড়াই তিন হাজার বছর আগে আমাদের ঋষিরা একেবারে লিপিবদ্ধ করে দিয়ে গেছেন – জ্ঞান এইভাবে হয়। স্বামীজী আরও এক ধাপ এগিয়ে বলছেন ঝিনুকের পেটে যদি কোন ভাবে একটা বালিকণা চলে যায় তখন ঝিনুকের শরীরের ভেতরে একটা উত্তেজনা সৃষ্টি হয়, শরীর থেকে তখন একটা রস নির্গত হতে থাকে, রসটা বালিকণার চারিপাশে একটা আবরণ দিয়ে ঢেকে ফেলে, সেই থেকে মুক্তার সৃষ্টি হয়ে যায়। আমি যে হাতটা উপরে তুললাম, এটা একটা বালিকণার মত আপনার মনে ঢুকে গেল। এবার মন এর উপর একটা প্রতিক্রিয়া ছুড়তে শুরু করে। এই যে প্রতিক্রিয়া ছাড়ছে এটাই জ্ঞান।

তাহলে সব জ্ঞান কোথা থেকে হচ্ছে? আমাদের মনের ভেতর থেকেই হচ্ছে। কিন্তু কেন হচ্ছে? বাইরে থেকে উত্তেজনা আসছে। তাহলে বাইরের উত্তেজনাকে ভেতরে আসা বন্ধ করতে হলে সব জানলা, দরজা, ভেন্টিলেশন বন্ধ করে দিলেই হল, তাহলেই তো সমাধি হয়ে গেল। না, তাতে সমাধি হবে না। কারণ, এনারা বলেন এই যে বৃত্তি জ্ঞান হয়, এই জ্ঞান অনেক ভাবে হয় – প্রমাণ, বিপর্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি – এই পাঁচ ভাবে আমাদের সব জ্ঞান হয়। এতক্ষণ আমরা প্রমাণের কথাই বর্ণনা করলাম, প্রমাণে যে জ্ঞান হয় সেটা ইন্দ্রিয় দিয়ে আসে। বিপর্যয়, শুধু কল্পনা করেই কত জ্ঞান হয়ে যাচ্ছে, বিকল্প, যেখানে কিছু নেই সেখানেও একটা কিছু দেখে জ্ঞান হয়ে যাচ্ছে, তাছাড়া, স্বপ্ন ও স্মৃতিতেও কত জ্ঞান হচ্ছে। আমরা যদি কেউ হিমালয়ের গুহাতেও চলে যাই সেখানে আমাদের প্রত্যক্ষ প্রমাণ বন্ধ হয়ে যাবে ঠিকই কিন্তু বিপর্যয় ও বিকল্প অর্থাৎ আমাদের চিন্তা ভাবনাগুলো কোথায় যাবে! ঘুমের মধ্যে স্বপ্নও আসবে আর স্মৃতি, জন্মাবার পর থেকে জ্ঞান

হওয়ার সময় থেকে আজ পর্যন্ত যা যা করেছি এর স্মৃতিগুলো আমাদের ছাড়বে না। বৃত্তি জ্ঞান অসম্ভব শক্তিশালী, এই বৃত্তি জ্ঞান দিয়েই জগতের সব কিছুর জ্ঞান আসে।

বৃত্তি জ্ঞান যদি কোন ভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয় তখন আসে স্বরূপ জ্ঞান। এই স্বরূপ জ্ঞানকে যোগশাস্ত্রে বলছে ***তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানম্***, তখন মানুষ স্বরূপে অবস্থান করে। নিজের স্বরূপকে জানা এই জানাকে কি জ্ঞান বলা যায়? ঠিক ঠিক অর্থে নিজের স্বরূপকে জানা জ্ঞান বলা যায় না। সাধারণ ভাবে জ্ঞান বলতে আমরা যা বুঝি ওই অর্থে জ্ঞান হয় না। বোতলকে আমরা যেভাবে জানছি, আমি নিজেকে সেই ভাবে কি করে জানব! আমি আছি এটাই তো জ্ঞান। স্বরূপ জ্ঞান বোধে বোধ হয়। আমি ঘুমিয়ে স্বপ্নে অনেক কিছু দেখছিলাম, কখন বাঘ হয়ে যাচ্ছি, কখন সিংহ হয়ে যাচ্ছি। তারপর হঠাৎ ঘুমটা ভেঙে গেল। ঘুম ভাঙতেই স্বপ্নের স্মৃতিতে আমি ভাবছি, আমি এসব কি দেখছিলাম! আমি তো তা নয়! আমি যেমন ছিলাম তেমনই আছি। স্বরূপ জ্ঞানে ঠিক এটাই হয়। যার জন্য স্বরূপ জ্ঞানকে বলা হয় মন ইন্দ্রিয়ের পারে। মন ইন্দ্রিয় বৃত্তি জ্ঞান দেবে, বৃত্তি জ্ঞান ছাড়া আর কিছু দিতে পারে না। স্বরূপ জ্ঞানের সব থেকে বড় বিঘ্ন মন আর ইন্দ্রিয়।

ঘোল বানানোর সময় দইকে ঘুটনিতে খুব করে মন্থন করতে হবে। কিন্তু দুধ থেকে দই বানাতে হলে দুধকে কি মন্থন করতে হবে? কোন দিন আর দই পাওয়া যাবে না। দই পাততে হলে নির্জনে দুধের পাত্রটাকে রাখতে হবে, দুধের পাত্রকে কোন রকম নাড়ানাড়ি করা চলবে না। দুধ থেকে দই করার জন্য চাই স্থৈর্য, আর দই থেকে ঘোল করার জন্য চাই চাঞ্চল্য। জগৎ জ্ঞান হয় চাঞ্চল্য দিয়ে আর স্বরূপ জ্ঞান হয় স্থৈর্য দিয়ে। বৃত্তি জ্ঞান মানেই চাঞ্চল্য, চাঞ্চল্য যতক্ষণ আছে ততক্ষণ স্বরূপ জ্ঞান হবে না। চাঞ্চল্য থাকলে দুধ থেকে দই হবে না, আবার চাঞ্চল্য না থাকলে দই থেকে ঘোল হবে না। জগতকে জানার জন্য চাই চাঞ্চল্য কিন্তু নিজেকে জানার জন্য দরকার স্থৈর্য। মন ও ইন্দ্রিয় হল প্রমথনশীল, এরা মন্থন করে। মন্থন করে আমার স্বরূপে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে দেয়। যারা বলছে আমার মন ইন্দ্রিয়কে দিয়ে ভগবানকে জানবো, কিন্তু তা তারা কোন দিনই জানতে পারবে না। মন ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা ভগবানকে কখনই জানা যাবে না। কারণ বৃত্তি জ্ঞান দিয়ে কখনই ঈশ্বরকে জানা যায় না, সম্ভবই নয়। বৃত্তি জ্ঞান অনেক পরে এসেছে, কারণ মন ইন্দ্রিয় এদের জন্ম অনেক পরে। কিন্তু ভগবান তো অনেক আগে থেকেই আছেন, তাই কি করে মন ইন্দ্রিয় দিয়ে তাঁকে জানা যাবে! জানা অসম্ভব।

ভগবান নিজের মহিমার পেছনে নিজেকে সংগোপন রাখেন

তস্মৈ তুভ্যং ভগবতে বাসুদেবায় বেধসে। আত্মদ্যোতগুণৈশ্ছন্নমহিম্নে ব্রহ্মণে নমঃ।।১০/১০/৩৩।

যাই হোক নলকূবর আর মণিগ্রীব দুজনে বলছে – হে সর্ব প্রপঞ্চের বিধাতা ভগবান বাসুদেব! আপনাকে প্রণাম। আপনার দ্বারা প্রকাশিত এই তিনটে গুণ আর এই তিনটে গুণেই আপনি আবৃত হয়ে রয়েছেন। মানুষকে আপাদমস্তক বস্ত্র দিয়ে আচ্ছাদিত করে দিলে সেই মানুষকে চেনা যায় না, ঠিক তেমনি আপনি এই তিনটে গুণ দিয়ে নিজেকে আচ্ছাদিত করে রেখেছেন। আপনারই গুণ দিয়ে আপনি নিজের মহিমাকে আচ্ছাদিত করে রেখেছেন, সেইজন্য কার সাধ্য আছে আপনাকে চেনার! ঠাকুরও বারবার এই কথা বলছে, ঈশ্বরের ঐশ্বর্যকেই সবাই চায় তাঁকে কেউ চায় না। পুরুষসূক্তমে বলছেন *এতাবানস্য মহিমা*, এই জগৎ তাঁর মহিমা। মহিমা মানে বিস্তার, এই জগৎটা তাঁর বিস্তার, আপনি এই জগতে হারিয়ে আছেন। জগতের মহিমা দেখে, জগতের ঐশ্বর্য দেখে আমরা মুগ্ধ হয়ে ভুলে থাকি। ভগবানের ঐশ্বর্যই তাঁর মহিমা। ভগবান তাহলে কোথায় লুকিয়ে আছেন? তাঁর মহিমার মধ্যে। জাদুকর ম্যাজিক দেখিয়ে আমাদের অবাক করে দিচ্ছে। কিন্তু আমরা ম্যাজিকটাই দেখি জাদুকরকে দেখিনা, ম্যাজিকের খেলা না দেখে জাদুকরের দিকে লক্ষ্য রাখলে তার কারুকুরিটা সব ধরে ফেলব। কিন্তু এমনই জাদুকরের ভেলকি যে আমরা জাদুকরকে না দেখে তার ম্যাজিকের দিকেই তাকিয়ে তাজ্জব বনে যাচ্ছি। জাদুকর তার ম্যাজিকের পেছনে নিজেকে লুকিয়ে রেখেছেন। ভগবানও ঠিক সেইভাবে তাঁর মহিমার পেছনে নিজেকে লুকিয়ে রেখে তাঁর মহিমা দেখিয়ে আমাদের ভেলকি লাগিয়ে যাচ্ছেন। তাই বলছেন *ব্রহ্মণে নমঃ*, সেই ভগবানকে আমরা প্রণাম করছি।

অবতারের শরীর প্রাকৃত শরীরের পারে

কুবেরের দুই সন্তান এখানে শ্লোকে খুব সুন্দর কথা বলছেন ***যস্যাবতারা জ্ঞায়ন্তে শরীরিষ্বশরীরিণঃ। তৈস্তৈরতুল্যাতিশয়ৈর্বীর্যৈর্দেহিষ্বসংগতৈঃ।।১০/১০/৩৪।*** ভগবানের কখন প্রাকৃত শরীর হয় না। আমরা কথায় কথায় বলি ঠাকুর ভগবান, তিনি অবতার, শ্রীরামচন্দ্র অবতার, শ্রীকৃষ্ণ অবতার। আসলে আমরা যে শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখছি তিনি অবতার নন, যিনি ভগবান তিনিই শ্রীরামকৃষ্ণ হয়েছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেই আমরা মনে মনে ধারণা করে নিই যে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ রূপী এই প্রাকৃত শরীরে অবস্থান করছেন। কিন্তু ভগবান সব সময়ই প্রাকৃত শরীরের বাইরে। অথচ তিনি যখন এই প্রাকৃত শরীর ধারণ করেন তখন এমন এমন কার্য করেন যে কার্য অবতার ভিন্ন অন্য যাঁদের শ্রেষ্ঠ প্রাকৃত শরীর রয়েছে তাঁরা সেই শরীর দিয়ে সেই কার্য করতে পারবেন না। আমার এই শরীর যদি সবার থেকে শ্রেষ্ঠ প্রাকৃত শরীর হয় তখন এই শরীর দিয়ে আমি পরাক্রম দেখাতে পারবো, এই শরীর দিয়ে তপস্যা দেখানো যাবে, ভোগ করে দেখাতে পারি আর মন দিয়ে মনের শক্তি দেখাতে পারি, ঈশ্বরের অনুভূতি দেখাতে পারি। এর বেশী কিছু করতে পারবো না। ভগবান শরীর ধারণ করে যে কার্যই করুন না কেন, সেই কার্য অন্য যে কোন শ্রেষ্ঠ পুরুষের সেই একই কার্যকে অতিক্রম করে যাবে। যেমন রাবণ তার সময়ের সব থেকে শক্তিমান পুরুষ। কিন্তু শ্রীরামচন্দ্র এসে তাকে পরাস্ত করে দিয়ে চলে গেলেন। শ্রীকৃষ্ণ কি করলেন? মানুষ একটা বউকেই সামলাতে পারে না, ভগবান ষোল হাজার একশ আট জনকে বিয়ে করে নিলেন। চিন্তা করলেই আমাদের মাথা খারাপ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। এটা তো গেলে ভোগের দিকে। এবার তপস্যার দিক দিয়ে দেখা যাক, সেই ভগবান নর-নারায়ণ ঋষির শরীর ধারণ করে বদ্রিকাশ্রমে এমন তপস্যা করছেন যে, তাঁর শরীরে হাড় আর চামড়া ছাড়া কিছু নেই। ভগবান বুদ্ধের নামে শোনা যায়, তিনি যখন তপস্যা করছিলেন তখন তাঁর পেট স্পর্শ করতে গিয়ে পিঠ স্পর্শ হয়ে যেত, মানে পেট আর পিঠ এক হয়ে গিয়েছিল। বলছেন নরনারায়ণ ওই তপস্যার মধ্যেই হারিয়ে আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ অবতারে মূল বৈশিষ্ট্যই হল আধ্যাত্মিক জাগরণ। আমরা ঠাকুরের যত রকমের আধ্যাত্মিক সাধনা ও আধ্যাত্মিক অনুভূতির বর্ণনা পাই, বিশ্ব ইতিহাসে এ রকমটি আর কোথাও পাওয়া যাবে না। বিজ্ঞান ও দর্শন তার বিজ্ঞানী ও দার্শনিককে জগতে অবশ্যই একটা স্থান দিয়ে দেবে, কিন্তু কিছু দিন পর সেটা একটা সীমিত গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ হয়ে যায়। যেমন সক্রেটিস তাঁর নিজের সময় কত বিখ্যাত ছিলেন, যিশুও এত বিখ্যাত ছিলেন না। কিন্তু সক্রেটিস আজ দর্শনের যে ইতিহাস তার কয়েকটি বইয়ে আবদ্ধ, কিন্তু যিশু জনগণের মধ্যে ছেয়ে আছেন। দর্শন, বিজ্ঞান, যুদ্ধ যে ক্ষেত্রেই যাওয়া হোক না কেন, ভগবান যখন শরীর ধারণ করেন এবং শরীর ধারণ করার পর তাঁর মধ্যে যে গুণগুলোর অভিব্যক্তি হয়, ভগবান সেখানে সবার থেকে অনেক বেশী এগিয়ে থাকবেন। অথচ তাঁর প্রাকৃত শরীর নেই, বিবর্তনের ভেতর দিয়ে যে সেখানে যাবেন সেই শরীরটাও তাঁর নেই। কিন্তু তিনি এমন এমন পরাক্রম দেখান যেটা কোন মানুষের পক্ষে দেখান সম্ভব নয়। তখনই বোঝা যায় তিনি অবতার। শ্রীরামকৃষ্ণের যে আধ্যাত্মিক অনুভূতি, মানুষের পক্ষে সেই অনুভূতি লাভ সম্ভব নয়। একটা পথে সাধনা করতেই মানুষের সারাটা জীবন চলে যায়। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ বিশ্বে যত ধর্ম মত আছে সব মতে সাধনা করে সব ধর্মের চরম অবস্থাকে জয় করেছেন। এই জিনিষ প্রাকৃত শরীর দিয়ে কোন দিনই সম্ভব হবে না। সেইজন্যই তিনি ভগবান।

পরের শ্লোকে বলছেন ***স ভবান্ সর্বলোকস্য ভবায় বিভবায় চ। অবতীর্ণোঽংশভাগেন সাম্প্রতং পতিরাশিষাম্।।১০/১০/৩৫।*** হে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ! এবার আপনি যে সর্বশক্তি সমন্বিত অবতারত্ব গ্রহণ করেছেন এর উদ্দেশ্য হল সমস্ত জগতের অভ্যুদয় আর নিঃশ্রেয়স। অভ্যুদয় হল মানবজাতির জাগতিক কল্যাণ আর নিঃশ্রেয়স হল মানুষ যখন ত্যাগ তপস্যায় প্রতিষ্ঠিত হয় আর সন্ন্যাসের পথে মানুষ যখন আত্মজ্ঞানের দিকে অগ্রসর হয়। অভ্যুদয়ের পথে ধর্ম, অর্থ আর কাম থাকে আর নিঃশ্রেয়সের পথ পুরোপুরি মোক্ষের পথ। এই দুটোকে জগতে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এবার আপনি সমস্ত শক্তি নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছেন। কিন্তু শ্লোকে বলছেন *অবতীর্ণোঽংশভাগেন*, মানে শ্রীকৃষ্ণকে যেন অংশাবতার বলতে চাইছেন। বৈষ্ণবরা এই জিনিষ কখনই মানবে না, তারা বলে *কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং*। শ্লোকের এই ছোট ছোট জিনিষ নিয়ে অনেক বিতর্ক হয়। আমাদের এই

বিতর্কের মধ্যে যাওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। এইসব ধর্মগ্রন্থে অনেক জায়গায় কিছু ফাঁক দেখা যায়। ভাগবতের অনেক জায়গায় বলছেন শ্রীকৃষ্ণই সাক্ষাৎ ভগবান হয়ে অবতীর্ণ হয়েছেন। আবার এখানে বলছেন *অবতীর্ণোঽংশভাগেন*, যিনি ভগবান তিনি তাঁর একটা অংশকে নিয়ে শ্রীকৃষ্ণ অবতারে এসেছেন। ঠাকুরও মাঝে মাঝে ভক্তদের প্রশ্ন করতেন – তোমার কি বোধ হয় অংশ না কলা?

এইভাবে স্তুতি করার পর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বারংবার প্রণাম জানিয়ে বলছেন ***নমঃ পরমকল্যাণ নমঃ পরমমঙ্গল। বাসুদেবায় শান্তায় যদূনাং পতয়ে নমঃ।।১০/১০/৩৬।*** শ্রীকৃষ্ণ এখন তিন-চার বছরের শিশু, তাঁকে তাঁরা কীভাবে পূজন করবেন যেন বুঝতে পারছেন না। কিন্তু তপস্যার দ্বারা শুদ্ধিকৃত মন নিয়ে স্তুতি করে যাচ্ছেন। যিনি পরমকল্যাণ স্বরূপ, যিনি পরমমঙ্গল স্বরূপ তাঁকে আমাদের প্রণতি জানাই। *বাসুদেবায় শান্তায়*, তিনি পরমশান্ত। ভগবান ছাড়া পরম শান্ত আর কেউ হতে পারবে না, কারণ তিনি অনন্ত কিনা। যিনি অনন্ত তাঁর চাঞ্চল্য কোথা থেকে হবে! চাঞ্চল্য হওয়ার জন্য একটু জায়গার দরকার, যাতে নড়াচড়া করতে পারে। তিনি তো অনন্ত, তিনি ছাড়া আর কিছু নেই, তাঁর আর ফাঁকা জায়গা কোথায়, তাই তিনি হলেন পরম শান্ত। বৃত্তিজ্ঞান আর স্বরূপ জ্ঞানের যে কথা আলোচনা করা হয়েছে সেখানেও বলা হয়েছিল বৃত্তি জ্ঞান মানেই চাঞ্চল্য, পরম শান্ত যখনই হবে তখনই স্বরূপ জ্ঞান হবে। আপনি হলেন অনন্ত! দেবর্ষি নারদ আমাদের আশীর্বাদ করেছিলেন তাই আমাদের মত দুরাচারী মানুষও আপনার দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করেছে।

আধ্যাত্মিক জীবনচর্চার মুল কয়েকটি অনুশীলন

কুবের সন্তানদ্বয় শ্রীকৃষ্ণকে স্তুতি করে খুব সুন্দর কথা বলছেন। ***বাণী গুণানুকথনে শ্রবণৌ কথায়াং হস্তৌ চ কর্মসু মনস্তব পাদয়োর্নঃ। স্মৃত্যাং শিরস্তব নিবাসজগৎপ্রণামে দৃষ্টিঃ সতাং চ দর্শনেঽস্তু ভবত্তনূনাম্।।১০/১০/৩৮।*** যাঁরা এই জীবনেই আধ্যাত্মিক সাধনার চরম শৃঙ্গকে জয় করতে চাইছেন তাঁদের জন্য এই শ্লোকটি অত্যন্ত মূল্যবান। প্রত্যেক মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য কি এবং সেই উদ্দেশ্যের লক্ষ্যে মানুষের কি কর্তব্য সেটাই নলকূবর ও মণিগ্রীব ভক্তিযুক্ত চিত্তে করজোড়ে প্রার্থনা করে বলছেন – হে প্রভু! *বাণী গুণানুকথনে*, আমাদের বাণী যেন সর্বদা আপনারই গুণের অনুকীর্তন করতে থাকে। মানুষের কর্তব্য হল সমস্ত রকম জাগতিক বাক্যালাপ, গ্রাম্য কথা পরিত্যাগ করে একমাত্র ঈশ্বরীয় কথাই বলে। *শ্রবণৌ কথায়ং*, হে প্রভু! আমাদের কর্ণ যেন সর্বদা আপনারই কথা শ্রবণে রত থাকে। *হস্তৌ চ কর্মসু*, হে প্রভু! আমাদের এই দুটি হাত সর্বদা যেন আপনারই সেবা-কার্যে নিয়োজিত থাকে। হয় আমি ভগবানের সেবা-কার্য করবো আর তা নাহলে যা কিছু কাজ করবো মনে করবো ভগবানেরই সেবা করছি। আধ্যাত্মিক জীবন কত কঠিন ও দুর্গম আমরা সাধারণ মানুষ কল্পনাই করতে পারি না। আজকে মিলিটারিদের কত সম্মান করা হয়। উত্তরাখণ্ডের এই ভয়ঙ্কর প্রাকৃতি বিপর্যয়ের মধ্যে আমাদের সৈন্যরা নিজেদের জীবন বিপন্ন করে কত লোককে উদ্ধার করে তাদের জীবন দান করছে। এর জন্য তাদের কত বছর ধরে কত কষ্ট করে কত রকমের কঠিন কঠিন ট্রেনিং নিতে হয়েছে, কত পরিশ্রম করতে হয়েছে। সেইজন্য আজ তারা দেশবাসীর কাছে কত সম্মানীয়, বরণীয়, বীরত্বের শিরোপায় ভূষিত। ঠিক তেমনি আমাকে আধ্যাত্মিক সাধক রূপে মান্যতা অর্জনের জন্য এদের থেকেও শতগুণ বেশী খাটতে হবে। শাস্ত্রের কথা শুনে শুনে আমরা আনন্দ পাচ্ছি, মজা পাচ্ছি, রস পাচ্ছি, এতে আমাদের কি লাভ! কিন্তু একটুও যদি না খাটি এগুলো কোন কাজে আসবে না, কিছু না করার থেকে দিনে পাঁচ মিনিট করলে সেটাও মন্দের ভালো, পনের মিনিট করলে একটু ভালো, আধ ঘন্টা করলে আরও ভালো, এক ঘন্টা করলে খুব ভালো আর চব্বিশ ঘন্টা করলে তো কেল্লা ফতে।

কি কি অনুশীলন করতে বলছেন? আমাকে তো কথাবার্তা বলতেই হবে কিন্তু শুধু যেন আপনারই কথাবার্তা বলি। তাহলে ঝগড়া করার সময় কি হবে? যার সঙ্গে ঝগড়া করছো তাকেই মনে করবে ভগবান, আমি এভাবেই ঝগড়া করে তাঁর পূজো করছি। কদিন পরেই নিজের ভেতর অপরাধ বোধ জেগে উঠবে 'ছিঃ! আমি একি করছি, এই কটূ শব্দ দিয়ে কি ভগবানের কখন পূজো হয়'! তখন দেখবেন আস্তে আস্তে আপনার কটূ কথা বলাটা বন্ধ হয়ে আসবে। আর কি করবে? ভগবানের কথাই শ্রবণ করবে। কিন্তু সিনেমা, টিভি

সিরিয়ালও তো আমার দেখতে ইচ্ছে করে। এগুলোও ভগবানের কথা ভেবে দেখতে থাকো। সব সময় বিচারটা রাখতে হবে। তখন দেখা যাবে কিছু দিন পরে নিজেরই মনে হবে 'ছিঃ! এগুলো কি কখন ভগবানের কথা হতে পারে'! এরপর সিনেমা দেখার, টিভি দেখার ইচ্ছাতো চলে যাবেই, ওগুলোর প্রতি ঘেন্না এসে যাবে। *মনস্তব পাদয়োর্নঃ,* আমাদের মন যেন সর্বদা আপনার চরণকমলে সংলগ্ন হয়ে থাক। *স্মৃত্যাং শিরস্তব নিবাসজগৎপ্রণামে,* এই সম্পূর্ণ জগৎ আপনার নিবাসস্থান আর আমাদের মস্তক যেন সর্বদা এই সর্বজগতের প্রতি প্রণতিনিবেদনে নত থাকে। *দৃষ্টিঃ সতাং চ দর্শনেহস্তু ভবত্তনূনাম্,* সাধু, মহাত্মারা হলেন আপনার প্রত্যক্ষ শরীর, আমাদের নয়ন যেন সর্বদা তাঁদের দর্শনে নিরত থাকে।

সংক্ষেপে কি কি করতে বলছেন – আমাদের বাণী ও কর্ণ দিয়ে যেন তাঁরই কথা হয়, মন যেন ঈশ্বরের পাদপদ্মে পড়ে থাকে, জগতের প্রতি যেন আমরা নতমস্তক হয়ে থাকি, অর্থাৎ আমাদের যেন অহঙ্কার না আসে আর নিয়মিত সন্তপুরুষের দর্শন যেন হয়। এখানে বৈশিষ্ট্য হল আমরা সাধারণত বলি আমাদের চোখ যেন সর্বদা ঈশ্বরের রূপ দর্শন করে, কিন্তু এখানে একটু অন্য ভাবে বলছেন আমাদের চোখ যেন সাধু মহাত্মাদের দর্শন করে, কারণ ভগবান সাধুপুরুষদের শরীরকে আশ্রয় করে আছেন। ভগবান সবারই শরীরকে আশ্রয় করে আছেন কিন্তু আবরণের একটা তফাৎ থাকে, কোথাও খুব পাতলা আবরণ, কোথাও মলিন আবরণ আবার কোথাও অনেক পুরু আবরণ।

এইভাবে নলকূবর ও মণিগ্রীব খুব সুন্দর স্তুতি করার পর শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করেছেন। শ্রীকৃষ্ণ তখন নেহাতই শিশু, তাও আবার উলূখলে বাঁধা। শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু স্মিত হাস্যবদনে তাঁদের বলছেন 'আমি আগে থেকেই জানি যে তোমরা দুজনে শ্রীমদে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলে। সেইজন্য করুণাবশতঃ দেবর্ষি নারদ তোমাদের অভিশাপ প্রদান করে তোমাদের ঐশ্বর্যকে নষ্ট করে দিলেন'। দেবর্ষি নারদ সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে বিচিত্র রকম ধারণা তৈরী হয়ে আছে, তিনি নাকি সব জায়গায় ঝগড়া আর ঝামেলা লাগিয়ে বেড়ান। এগুলো একেবারেই ভুল ধারণা, তিনি কখনই কারুর ক্ষতি করেননি। নারদ দেখতেন যার মধ্যে ভক্তি লাভের সম্ভবনা আছে কিন্তু একটা জায়গায় আটকে আছে, তখন যে জায়গাতে আটকে আছে তিনি এমন কিছু করে দেন যাতে সেটা নাশ হয়ে গিয়ে সে ভক্তির পথ অনুসরণ করে দ্রুত এগিয়ে যেতে পারে। শ্রীকৃষ্ণ নারদের সম্বন্ধে বলছেন ***সাধূনাং সমচিত্তানাং সুতরাং মৎকৃতাত্মনাম্। দর্শনান্নো ভবেদ্ বন্ধঃ পুংসোঽক্ষ্ণোঃ সবিতুর্যথা।।১০/১০/৪১।*** সাধুরা সমদর্শি, কেউ তাঁর বিশেষ প্রিয়, কেউ কম প্রিয় কখনই হয় না। সাধুরা সমচিত্ত হন, কারুর প্রতি পক্ষপাত করবেন না। সেইজন্য কি হয়, এঁদের মন পুরোপুরি আমাতে থাকে। সমদর্শি ও সমচিত্ত না হলে কখনই ঈশ্বরে মদ্‌গতচিত্ত হবে না। এর ফলস্বরূপ এঁদের দ্বারা কখনই কারুর ক্ষতি হতে পারে না। যেমন সূর্যোদয়ে সমস্ত অন্ধকার অন্তর্হিত হয়ে যায় ঠিক তেমনি সমদর্শি, সমচিত্ত ও মদ্‌গতচিত্ত পরায়ণ সাধুদের দর্শনে হৃদয়ের সমস্ত রকমের মলিনতা, কালিমার অন্ধকার দূর হয়ে অন্তরে ভগবানের প্রতি ভক্তি ভাব উদয় হয়। সেইজন্য ভগবান বলছেন – নারদ তাই তোমাদের কখনই ক্ষতি হোক চাইবেন না। অভিশাপ দিয়ে তিনি তোমাদের মঙ্গলই করেছিলেন। ঠিক আছে, এবার তোমরা নিজেদের লোকে ফিরে গিয়ে সব সময় মৎপরায়ণ হয়ে কাজ করে যাও আর তাছাড়া এই সংসার চক্র থেকে উদ্ধারকারী আমার প্রতি অনন্য ভক্তি তো তোমরা পেয়েই গেছ।

সবাইকে আধ্যাত্মিক উত্থানের জন্য নিজেকেই চেষ্টা করতে হবে, গুরু কিংবা ঈশ্বর কখন এসে কাউকে উত্থান করে দেন না। নিজের উদ্ধার নিজেকেই করতে হয়। গীতাতেও ভগবান একই কথা অর্জুনকে বলছেন *উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং,* তোমার উদ্ধার তোমাকে নিজেই করতে হবে। এই আধ্যাত্মিক উত্থান কীভাবে হবে? আমাদের মন সব সময় বহির্মুখী, একমাত্র তখনই আধ্যাত্মিক উত্থান হবে যখন এই বহির্মুখী মনকে একটা অবস্থার পর মোড় ঘুরিয়ে অন্তর্মুখী করবে। মোড় ফেরানোর অনেক পথের কথা আমাদের শাস্ত্র বলে দিচ্ছে। তুমি জ্ঞানযোগের পথ অবলম্বন করতে পারো, অথবা রাজযোগ, কর্মযোগ ও ভক্তিযোগের যে কোন একটা পথকে তোমার রুচি ও মানসিক গঠন অনুযায়ী বেছে নিয়ে নেমে পড়তে পারো। একটু যখন মোড় ফিরবে তখন ভগবানের মুখোমুখি হওয়ার তীব্রতটা বাড়তে শুরু করবে। ভগবানের মুখোমুখি হওয়াটা হল, হয় প্রার্থনা

করা নয়তো ধ্যান করা। প্রার্থনাও এক ধরণের ধ্যানই। আসলে প্রার্থনা দিয়ে কিছু হয় না, যা হওয়ার ধ্যানের দ্বারাই হয়। প্রার্থনা ধ্যানের দিকে নিয়ে যেতে সাহায্য করে। ধ্যান করার আবার অনেক পথ আছে। তার মধ্যে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হল তত্ত্ব চিন্তন। ভাগবতে মাঝে মাঝেই প্রসঙ্গ ক্রমে ঈশ্বরের অনেক তত্ত্ব কথা আসছে, যার কিছু কিছু ইতিমধ্যে আমরা আলোচনা করেছি। তত্ত্ব চিন্তন ছাড়া ঈশ্বরের সাথে একাত্ম হওয়া যায় না। কারণ ঈশ্বরীয় তত্ত্ব হল আসলে ঈশ্বরের স্বরূপের বর্ণনা, ঈশ্বরের স্বরূপের চিন্তন করতে করতে একটা সময় নিরানন্দের ভাবটা একেবারেই চলে গিয়ে একটা নির্মল আনন্দের স্রোত সব সময় প্রবাহিত হতে শুরু করে। ঈশ্বর চৈতন্য স্বরূপ, তিনিই ঠিক ঠিক চেতন, সেই চৈতন্যের চিন্তন করতে করতে আমাদের ভেতরে যে চৈতন্য সত্তা রয়েছে সেই সত্তা ক্রমশ বিস্তার হতে শুরু করে, তখন বুদ্ধিটাও ক্রমশ খুলতে থাকে। ঠাকুর বলছেন – ভক্ত হবি কিন্তু বোকা হবি না। ভক্তরা কখন বোকা হয় না। ভক্ত মানেই তার তুখোড় বুদ্ধি, কারণ ঈশ্বর হলে চিৎ স্বরূপ, ভক্ত তাঁরই অংশ সুতরাং ভক্তের বুদ্ধিও প্রচণ্ড সূক্ষ্ম হবে। ধর্ম কখনই মুর্খদের জন্য নয়।

ভগবানের আরেকটি স্বরূপ হল তিনি সৎ স্বরূপ, তিনিই আছেন, তিনিই ছিলেন, তিনিই থাকবেন। ভগবানকে সৎ স্বরূপে চিন্তন করলে ধীরে ধীরে আমাদের মৃত্যু ভয়টাই চলে যাবে, কারণ আমি তখন দেখছি আমার জন্ম নেই, মৃত্যু নেই আমি সেই সৎ স্বরূপ ভগবানের সাথে এক হয়ে আছি। সেইজন্যই বলে ধ্যান ছাড়া কখনই আধ্যাত্মিক উত্থান হয় না। বাকি সব কিছু কাজ হল ধ্যানের প্রস্তুতি। রান্না করার আগে কত কিছু আয়োজন করতে হয়, উনুন আনতে হবে, উনুন ধরাবার জন্য জ্বালানীর ব্যবস্থা করতে হবে, তারপর চাল-ডাল, আনাজ মশলা সব নিয়ে আসতে হবে, সেগুলো কাটাকাটি ধোয়াধুয়ি কত কিছু করার পর রান্না শুরু হবে। রান্না করাটা হল ধ্যান, আর বাকি সব কাজ জপ, পাঠ, পূজা, অর্চনা, তীর্থ করা এগুলো হল রান্নার প্রস্তুতি।

তত্ত্ব চিন্তন আবার সবার দ্বারা সম্ভব নয়। যারা তত্ত্ব চিন্তন করতে পারবে না, ঈশ্বরের গুণ চিন্তন, অবতারের লীলা চিন্তন তাদের আধ্যাত্মিক উত্থানে সাহায্য করে। দীক্ষা নেওয়ার সময় গুরু শিষ্যকে একটা মন্ত্র আর ইষ্টের একটা রূপ দিয়ে কিছু তত্ত্ব কথা বলে দেন। প্রথম অবস্থায় তত্ত্বটা ধারণা করা যায় না, তখন তাই রূপ চিন্তনের সাথে সাথে মন্ত্র জপ করে যেতে হবে। কিন্তু তার সাথে খুব গুরুত্ব হল লীলা চিন্তন। ভাগবতে যে এত কাহিনী বলা হয়েছে এর একমাত্র উদ্দেশ্য হল মানুষ যাতে ভগবদ্ রসে রমণ করতে পারে। শ্রীকৃষ্ণের কাহিনীগুলিতে শ্রীকৃষ্ণের একটা ভাবকে অভিব্যক্ত করা হয়েছে, কৃষ্ণভক্ত শ্রীকৃষ্ণের এই ভাবের মধ্যে রমণ করতে চায়। এই সব কাহিনীর ঘটনাগুলোকে কখনই যুক্তি তর্ক দিয়ে বিচার করা উচিৎ নয়। পুরাণ বা ভাগবতের অন্যতম উদ্দেশ্য হল কাহিনীর মাধ্যমে ঈশ্বরের দিকে নিয়ে যাওয়ার মানসিক প্রস্তুতি করিয়ে দেওয়া। কিন্তু মূল উদ্দেশ্য হল মনকে ঈশ্বরের তত্ত্ব চিন্তনে বসানো।

যমলার্জুন বৃক্ষ দুটো উৎপাটিত হয়ে যাওয়ার শব্দ শুনে গোকুলের সব মানুষ কি না কি হয়েছে মনে করে দৌড়ে চলে এসেছে। ঘটনাস্থলে বাচ্চা গোপরা যারা ছিল তারা সব্বাইকে বলছে – উলূখলে বাঁধা এই যে শ্রীকৃষ্ণকে দেখছেন, এই কৃষ্ণই তো দুটো গাছের মাঝখান দিয়ে যাওয়ার সময় গাছ দুটো ভেঙে গেল। বাচ্চাদের কথা আবার কেউ বিশ্বাস করতে চাইছে না। নন্দ বাবাও এসে সব দেখছেন, ছেলেকে দড়ি দিয়ে বাঁধা দেখে তিনি একটু হেসে শ্রীকৃষ্ণের কোমড় থেকে দড়িটা খুলে দিলেন। এখানে ভাষ্যকাররা নন্দ বাবার হাসির কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলছেন – নন্দ বাবা ভাবছেন বাচ্চা যেন ভয় না পায়, মা বেঁধেছেন এবার বাবা এসে আমাকে না প্রহার করেন সেইজন্য হাসি দিয়ে ছেলেকে যেন একটু ভরসা দিলেন।

বালক কৃষ্ণকে নিয়ে গোপীদের আনন্দ

শ্রীকৃষ্ণ আগের থেকে একটু বড় হয়েছেন। তাঁর স্বভাবটা এখন কেমন হয়েছে সেই নিয়ে বলছেন ***গোপীভিঃ স্তোভিতোঽনৃত্যদ্ ভগবান্ বালবৎ ক্বচিৎ। উদ্গায়তি ক্বচিন্মুগ্ধস্তদ্বশো দারুযন্ত্রবৎ।।১০/১১/৭।*** যিনি ভগবান তিনি এখনও ছোট্ট শিশু, দেখতে মিষ্টি বালক, ভগবানের শক্তি ভেতরে থাকার জন্য তাঁর মোহিনী শক্তির আকর্ষণ ক্ষমতা সাঙ্ঘাতিক। ব্রজললনারাও ওই ছোট্ট শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে কি করবে ঠিক নেই। গোপীরা মজা করে বলত একটু নাচো তো যশোদা দুলাল। শ্রীকৃষ্ণও সঙ্গে সঙ্গে নাচ দেখাতে শুরু করে দিত। আবার

যদি বলত একটু গান গাও তো বাছা, সেও গান শুনিয়ে দেবে। এখানে একটা শব্দ বলছেন *দারুযন্ত্রবৎ*, তখনকার দিনেও কিছু কিছু খেলনা ছিল যেগুলো স্প্রিং বা দম দেওয়া পুতুলের মত নাচত। গীতাতেও অর্জুনকে এক জায়গায় ভগবান বলছেন *যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া*, আমি যন্ত্রচালিত পুতুলের মত মায়া দিয়ে সবাইকে নাচাই। বোঝা যায় তখনকার দিনে এই ধরণের কিছু খেলনা ছিল, কিন্তু বিশদ ভাবে জানা যায় না কীভাবে তাঁরা এগুলো তৈরী করতেন। এখানে বলছেন শ্রীকৃষ্ণ যেন গোপীদের হাতে কাঠের পুতুলের মত যন্ত্রবৎ ছিল। এগুলোকে নিয়েই অনেকে পরে মজা করে বলছে গোপীরা হাততালি দিত আর কৃষ্ণ বানর নাচ নাচত। কথামৃতেই ঠাকুর বলছেন কবীর দাস এই কথা বলে শ্রীকৃষ্ণের নিন্দা করতেন। নিন্দার কিছু নয় সব ভাবের ব্যাপার। এখানে মজার ব্যাপার হল, ভগবান যিনি পুরো সৃষ্টিকে চালাচ্ছেন, যাঁর কাছে এই জগৎটা একটা খেলনা আর তিনি হলেন সেই যন্ত্র, যে যন্ত্র এই খেলনাকে নাচিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এখানে উল্টো হচ্ছে। গোপীরা হলেন সেই শক্তি, যাঁদের কথা মত ভগবান নাচছেন। ভক্ত যেমনটি চায় ভগবান তেমনটি করেন। ঠাকুর বলছেন –প্রথমে ভগবান চুম্বক হন ভক্ত লোহা, পরে আবার পাল্টে যায় ভগবানই ভক্তের টানে দৌড়ে আসেন।

আবার যখন কেউ বলেন বসার পিড়ি নিয়ে এস, শ্রীকৃষ্ণ গিয়ে পিড়ি নিয়ে আসছেন, খড়ম নিয়ে এসো, খড়ম নিয়ে আসছেন। আবার কখন কখন বলছেন একটু পালোয়ানদের মত কেরামতি করে দেখাও তো, সেটাও করে দেখাচ্ছেন, নিজের জানুতে হাত ঠুকে দেখাচ্ছেন আমি কত বড় পালোয়ান। বলছেন ***দর্শয়ংস্তদ্বিদাং লোক আত্মনো ভৃত্যবশ্যতাম্। ব্রজস্যোবাহ বৈ হর্ষং ভগবান্ বালচেষ্টিতৈঃ।।১০/১১/১০।*** ভগবান তিনি সর্বশক্তিমান, সেই সর্বশক্তিমান ভগবান নানান রকম বাললীলার দ্বারা ব্রজবাসিদের মনে আনন্দ বর্ধন করছেন আর জগৎকে দেখাচ্ছে *ভৃত্যবশ্যতাম্*, ভক্তের কাছে আমি চাকরের মত অধীন।

অবতার ও শক্তিমান পুরুষের মধ্যে পার্থক্য

ভাগবত প্রতি পদে পদে দেখিয়ে যাবে যে শ্রীকৃষ্ণ হলেন ভগবান। শ্রীকৃষ্ণকে যদি ভগবান বলে মানা না হয় তাহলে ভাগবত পড়ার কোন অর্থ হয় না। কিন্তু তিনি যে ভগবান এর প্রমাণ কি? একজন অবতার আছেন আর সেখানে অবতারেরই সমতুল্য একজন শক্তিমান ব্যক্তি আছেন, এই দুজনের মধ্যে অবতারকে কি কি লক্ষণ দিয়ে চেনা যাবে? স্বামীজীও বক্তৃতা দিতেন, কেশবচন্দ্র সেনও তখনকার দিনের খুব নামকরা বাগ্মী ছিলেন, কিন্তু স্বামীজীকে ঐশ্বরীক শক্তি সম্পন্ন বলা হয়, কেশবচন্দ্র সেনের ব্যাপারে বলা হয় না। আসলে এই জায়গাতেই অবতার ধরা পড়ে যান। অবতার যখন কিছু করেন তখন দেখা যায় মানুষ তার সমস্ত শক্তি দিয়ে যত দূর সেটা করতে পারবে, অবতার সেটাকেও একটু ছাড়িয়ে যান। কেশবচন্দ্র সেন যখন বক্তৃতা দিচ্ছেন সেখানে স্বামীজী বক্তৃতায় একটা জায়গায় তাঁকে যেন এক ধাপ ছাড়িয়ে যাচ্ছেন। একেবারে যে অস্বাভাবিক ভাবে এগিয়ে যাবেন সেটা হবে না, এক ধাপ একটু এগিয়ে থাকবেন। এটা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। যেমন, স্বামীজী চিকাগো ধর্মসভায় প্রথমেই সিস্টারস্ এ্যণ্ড ব্রাদারস্ অফ আমেরিকা বলার পরেই সারা হলে অনেকক্ষণ ধরে বিরাট হাততালি চলল। বিশ্ব ইতিহাসে আমরা কোথাও পাই না যেখানে একজন বক্তৃতায় প্রথম বাক্য উচ্চারণ করছেন আর সবাই হাততালিতে ফাটিয়ে দিচ্ছে। ভগবানের এই একটু ছাড়িয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা বোঝানোর জন্য অবতারের এই লীলাগুলোর বর্ণনা করা হয়। ভগবান যখন মানুষের শরীর ধারণ করে অবতার হয়ে আসেন তখন তাঁর সব লীলাই মানুষের মতই হয়। কিন্তু মাঝে মাঝে একটা অলৌকিক কিছু হয়ে যায়। অলৌকিক এই অর্থে যে, এগুলো কোন অস্বাভাবিক কিছু নয়, কিন্তু মনে হয় মানুষের দ্বারা এই কাজ যেন সম্ভব নয়। লৌকিক আচরণই করবেন, সংসারীদের মতই সব কিছু হবে কিন্তু একটু যেন ছাড়িয়ে যান।

শ্রীকৃষ্ণ যদি অবতার হন আর তাঁর যত ঘটনা ও লীলা মহাভারত ও ভাগবতে বর্ণনা করা হয়েছে এগুলো যদি বিশাস নাও করা যায় কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের সুদর্শন চক্রের ঘটনা আমরা সবাই মানতে বাধ্য। সুদর্শন চক্র মানে ভগবান বিষ্ণুর সুদর্শন চক্র নয়, এটা শ্রীকৃষ্ণের নিজস্ব একটি বিশেষ অস্ত্র। এটাকে আমরা মানতে বাধ্য। কারণ শ্রীকৃষ্ণ অবতারে রজোগুণের প্রাধান্য, সুতরাং তাঁর এমন একটি অস্ত্র হতেই হবে যার ধারে কাছে কারুর কোন অস্ত্র দাঁড়াতে পারবে না। এই ব্যাপারটা যদি না হয় তাহলে পুরো কাহিনীটাই মিথ্যা হয়ে যাবে।

ঠিক একটা জায়গায় অবতারকে সবার থেকে ছাড়িয়ে যেতে হবে। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাব পুরো শুদ্ধ সত্ত্বগুণের ভাব, যেখানে ধ্যান সমাধিরই সবচেয়ে বেশী প্রাধান্য। ধ্যান সমাধি তো কত মহাত্মা, ঋষিদের হচ্ছে, শাস্ত্রেই কত বর্ণনা পাওয়া যায়। কিন্তু ঠাকুর যে নিজের ইচ্ছা মত যখন খুশী সমাধিতে চলে যাচ্ছেন, এই জিনিষ অন্য কোথাও পাওয়া যাবে না, এখানে সবাইকে ঠাকুর ছাড়িয়ে যাচ্ছেন। অশ্বত্থামা একবার শ্রীকৃষ্ণের কাছে সুদর্শন চক্রটা চেয়েছিলেন। মহাভারতে এর খুব সুন্দর বর্ণনা আছে। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন 'ওই তো ওখানে রাখা আছে নিয়ে নাওগে যাও'। অশ্বত্থামা মাটিতে বসে দু হাত দিয়ে জাপটে মাটি থেকে সুদর্শন চক্রকে তুলতেই পারলেন না, অথচ অশ্বত্থামা তখনকার দিনে খুব নামকরা একজন বড় যোদ্ধা ছিলেন, দ্রোণাচার্যের ছেলে বলে কথা। অথচ সুদর্শন চক্রকে শ্রীকৃষ্ণ একটা আঙুলের উপর নিয়ে ঘোরাতেন। অশ্বত্থামা তখনকার দিনের একজন শ্রেষ্ঠ বীর যোদ্ধা সেও বলছে 'আমার দ্বারা হবে না'। এই জায়গাতেই অবতার ধরা পড়ে যান। যিনি সর্বশক্তিমান তাঁকে এখন গোপীরা পুতুলের মত নাচাচ্ছেন ঠিকই, কিন্তু এর পরে শ্রীকৃষ্ণের যে বিভিন্ন লীলা কাহিনীর বর্ণনা আসবে, যদিও তাতে অনেক অলৌকিকতার আশ্রয় নেওয়া হয়েছে ঠিকই, কিন্তু আসলে এর উদ্দেশ্য হল আমাদের ধারণা করে মনের মধ্যে একেবারে বসিয়ে দেওয়া যে শ্রীকৃষ্ণ ভগবান।

দ্বিতীয় আরেকটি দিয়ে অবতারকে বোঝা যায়, সেটা হল পরম্পরা বিদ্যাতে, আচার্য শঙ্কর যাকে সম্প্রদায় বিদ্যা বলছেন। যেমন শ্রীরামকৃষ্ণকে বুঝেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। স্বামী বিবেকানন্দ আবার নিজের গুরুভাইদের বলছেন তিনি অবতার। স্বামীজীর উপর তাঁদের অগাধ বিশ্বাস, তাঁরাও মেনে নিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ অবতার। এরপর ঠাকুরের অন্যান্য শিষ্যরা, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী শিবানন্দ প্রমুখ শিষ্যদের আবার অনেক শিষ্য ছিল। সেই শিষ্যরা আবার তাঁদের গুরুদের বিশ্বাস করেন। এইভাবে হতে হতে বর্তমানে যাঁরা মঠ মিশনের অধ্যক্ষ আছেন, সেক্রেটারিরা আছেন এনাদের আমরা সবাই শ্রদ্ধা করি, বিশ্বাস করি। এনারাও বলছেন ঠাকুর অবতার, তাই ঠাকুরও আমাদের কাছে অবতার। বর্তমান অধ্যক্ষকে যদি কেউ জিজ্ঞেস করে 'আপনি কী দেখে বলছেন যে ঠাকুর অবতার'? উনি বলবেন 'আমরা আমাদের গুরুর কাছে শুনেছি'। তাঁর গুরু কি করে জানলেন ঠাকুর অবতার? তিনি তাঁর গুরুর কাছে শুনেছেন। এইভাবে শেষে স্বামী বিবেকানন্দ পর্যন্ত চলে যাবে। তিনি বলছেন 'ঠাকুর অবতার'। এই পরম্পরার মাধ্যমে অবতারকে আমরা জানতে পারি। আপনি যদি বলেন 'আমি স্বামী বিবেকানন্দকে মানি না'। তাহলে আপনার ঠাকুরকেও অবতার বলে মানতে হবে না, আপনার পক্ষে স্বামীজীকে মানা তো সম্ভব নয়। আপনি যদি স্বামী বিবেকানন্দকে মহান বলে জানেন তবেই তো আপনি ঠাকুরকেও জানবেন। স্বামীজীকে বোঝার ক্ষমতা তো এখন আপনার নেই, আপনার বোঝার ক্ষমতার দৌড় তাই আমার পর্যন্ত, আমাকে আপনি বুঝতে পারেন। আমি কাকে বুঝতে পারবো? আমার যাঁরা গুরু ছিলেন তাঁদেরকে আমি পুরো বিশ্বাস করি। বাচ্চারা প্রথমে জগতের কোন কিছুই বিশ্বাস করতে চায় না, কিন্তু মা যেটা বলে দিচ্ছে সেটা চোখ-কান বুঝে বিশ্বাস করে নিচ্ছে। মা বলে দিয়েছে 'অমুক তোর বাবা'। তাকেই বাবা বলে বিশ্বাস করে বসে আছি। কথামৃতে ঠাকুরও বলছেন – মা বলে দিয়েছে অমুক তোর দাদা, ছেলে বিশ্বাস করে নিয়েছে সে তার দাদা। অবতারকে জানার এই দুটি পথ। কিন্তু মূল পরম্পরাতে কাকে অবতার মানবে এই নিয়ে অনেক সমস্যা হয়ে যায়। তাই এখানে শুরুই হয় ব্রহ্মা থেকে। যতক্ষণ ব্রহ্মা থেকে না শুরু করা হবে ততক্ষণ লোকে মানবেই না।

এরপর আরেক দিনের একটি লীলা কাহিনীতে বলছেন। ***ফলবিক্রয়িণী তস্য চ্যুতধান্যং করদ্বয়ম্। ফলৈরপূরয়দ্ রত্নৈঃ ফলভাণ্ডমপূরি চ।।১০/১১/১১।*** একদিন এক ফলওয়ালী ফল বিক্রী করতে এসে ফল কেনার জন হাঁক দিয়েছে। সেই ডাক শুনেই অচ্যুত, যিনি সবার ফলদাতা, তিনি তাড়াতাড়ি করে নিজের ছোট্ট দুটি হাত অঞ্জলী করে কিছু ধান নিয়ে এসেছে। আগেকার দিনে কেনাবেচা অর্থের বিনিময়ে না হয়ে দ্রব্যের বিনিময়ে হত। বাচ্চা ছেলে হাতে করে ধান নিয়ে আসছে, যেতে যেতে পথেই বেশীর ভাগ ধান পড়ে গেছে। ফলওয়ালী কিন্তু ওই ছোট্ট হাত দুটিতে ফল দিয়ে ভরিয়ে দিয়েছে। তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁর যোগশক্তির দ্বারা যত ফল ফলওয়ালী দিয়েছিল তার থেকে অনেক বেশী রত্ন দিয়ে ফলের ঝুড়িটি ভরিয়ে দিলেন। শঙ্করাচার্যের জীবনেও এই ধরণের কাহিনী আছে, যেখান থেকে তিনি বিখ্যাত অন্নপূর্ণা স্তোত্র রচনা করলেন। আচার্য একদিন

ভিক্ষায় বেরিয়ে এক দরিদ্রা ব্রাহ্মণীর কুটিরে উপস্থিত হয়েছেন। ব্রাহ্মণী এত কাঙালী যে ঘরে সেদিন কিছুই নেই যে ভিক্ষা দেবেন। আচার্য শঙ্করের ভেতরে দরিদ্রা বৃদ্ধার প্রতি একটা অহেতুক করুণার উদ্রেক হয়েছে। তিনি বলছেন 'মা! কিছু একটা ভিক্ষা দিন'! ব্রাহ্মণী তখন ঘর থেকে খুঁজে শেষে একটা গোটা আমলকী পেয়ে সেটা আচার্য শঙ্করকে দিয়েছেন। তখন সেই আমলকী হাতে নিয়ে আচার্য মা অন্নপূর্ণার কাছে প্রার্থনা করছেন 'মা! আপনি প্রসন্না হয়ে এই দরিদ্রাকে কিছু দিন'। অন্নপূর্ণা তখন আবির্ভূতা হয়ে আচার্যকে বলছেন 'এই রমণী মহা কৃপণ, একে আমি কিছু দিতে পারছি না'। আচার্য বলছেন 'না মা! আমাকে আমলকী দিয়েছে'। বলেই সেইখানে দাঁড়িয়ে তৎক্ষণাৎ আচার্য অন্নপূর্ণার স্তব রচনা করে স্তুতি করলেন। আচার্যের স্তুতিতে অন্নপূর্ণা দেবী খুব প্রসন্না হয়ে গেছেন। ওই যে দরিদ্রা একটা আমলকি আচার্যকে ভিক্ষা দিয়েছিল, এখন অন্নপূর্ণার কৃপাতে সেই দরিদ্র কুটিরে সুবর্ণ আমলকি বৃষ্টির মত ঝরে পড়তে শুরু হয়ে গেল। এগুলো আখ্যায়িকা, যাতে এই সব কাহিনী পড়ে মানুষের মন ত্যাগের দিকে যায়।

গোকুল থেকে বৃন্দাবন গমন

সেই সময় গোকুলে উপনন্দ নামে একজন বয়স্ক গোপ ছিলেন। তিনি শুধু বয়সেই বড় ছিলেন না, গোপেদের মধ্যে একজন পাকা বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তিনি একদিন নন্দকে বলছেন 'আমরা যে এই গ্রামে আছি এখানে নানা রকমের উৎপাত লেগেই রয়েছে। সেই পূতনা থেকে শুরু হয়ে একের পর এক কত বিপদ আসছে, কতবার এই বালক কৃষ্ণ অলৌকীক ভাবে রক্ষা পেয়ে গেছে। এটা ঠিকই যে ভগবান যদিও আমাদের রক্ষা করেছেন কিন্তু বেশী অনর্থ হওয়ার সুযোগ দিতে নেই। তাই গোকুল ও গোকুলবাসীদের মঙ্গলের জন্য আমার এই ইচ্ছা যে এখানকার বাস উঠিয়ে অন্যত্র কোথাও উপযুক্ত জায়গাতে চলে যাই। কোথায় যাওয়া যেতে পারে সেটাও আমি আগেই ভেবে রেখেছি'। উপনন্দ তখন বৃন্দাবনের খুব সুন্দর বর্ণনা করে বলছেন ***বনং বৃন্দাবনং নাম পশব্যং নবকাননম্। গোপগোপীগবাং সেব্যং পুণ্যাদ্রিতৃণবীরুধম্।।১০/১১/২৮।*** পাশেই বৃন্দাবন নামে অতি শোভনীয় মনোরম বন আছে। সেই বন কচি কচি সবুজ তৃণতে আচ্ছাদিত, চিরশ্যামল বৃক্ষ দ্বারা পরিপূর্ণ, আমাদের গবাদি পশুদের জন্য যা খুবই উপযোগী। তাছাড়া সেখানকার পর্বত থেকে শুরু করে তৃণলতা পর্যন্ত সব কিছুই অতি পবিত্র। সুতরাং এই স্থানটি গোপ, গোপী ও গোধন সবারই পক্ষে সব দিক দিয়ে খুবই সুবিধাজনক। সেইজন্য চল আমরা বৃন্দাবনকেই আমাদের বাসভূমি করি।

মজার ব্যাপার হল কংসাদির উপদ্রব থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্য তাঁরা যে গোকুল ছেড়ে বৃন্দাবনে এসে বসবাস করবেন এটা ঠিক যুক্তিতে দাঁড়ায় না। কারণ গোকুল মথুরা থেকে অনেক দূরে অবস্থিত। সেই তুলনায় বৃন্দাবন মথুরার অনেক কাছে। রাক্ষসদের উৎপাত থেকে বাঁচতে হলে তাঁদের মথুরার কাছে বৃন্দাবনে না এসে আরও দূরে অন্য কোন জায়গায় চলে যাওয়ার কথা। আসলে এই যাদবকুলের লোকেদের পেশা ছিল পশুপালন, গোপালন ইত্যাদি। একটা জায়গায় অনেক দিন থাকার পর দেখা যেত সেখানে গবাদি পশুর খাওয়ার ঘাস কমে যেত, সেইজন্য এরা এক জায়গায় কয়েক বছর থাকার পর অন্য জায়গায় চলে যেতেন, যেখানে জলের, ঘাসের প্রাচুর্য আছে, আবার হিংস্র জন্তু জানোয়ারদের উপদ্রবও নেই। এখনও যখন সরকারের তরফ থেকে কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানকে শিল্প স্থাপনের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়, তখন সেই কোম্পানি প্রথমে সরকারের কাছে এই চারটে জিনিষ চাইবে – রাস্তা, জল, বিদ্যুৎ আর নিরাপত্তা। আগেকার দিনেও এনারা এই চারটেই দেখতেন – রাস্তার খুব বেশী দরকার হতো না কারণ তারা নিজেদের কমিউনিটির মধ্যেই থাকত, জীবন ধারণের জন্য জল সব কালেই লাগবে, আগেকার দিনে যে খাওয়া-দাওয়টা ছিল সেটাই এখন ইলেক্ট্রিসিটি হয়ে গেছে, আমাদের সব কিছু এখন বিদ্যুতের উপর নির্ভর। সেইজন্য আগের থেকে খুব বেশী পাল্টায়নি। এখানে আরেকটা মুশকিল হল, ওই সব অঞ্চলে সেই সময় যমুনা তার গতিপথ মাঝে মাঝেই পরিবর্তন করত। তাই বৃন্দাবন সেই সময় ঠিক কোন জায়গায় ছিল সঠিক ভাবে নির্ণয় করা খুব কঠিন। তবে বর্তমানে যে বৃন্দাবন আমরা দেখছি, এই বৃন্দাবনকেই মহাপ্রভু ভাবরাজ্যে দেখে বলেছিলেন এখানেই শ্রীকৃষ্ণের লীলা হয়েছিল, সেটাই আমাদের সবাই মেনে নিয়েছে। যাই হোক সবাই খুব উৎসাহ নিয়ে আনন্দ করতে করতে বৃন্দাবনের দিকে যাত্রা করেছেন। বলছেন, বৃন্দাবনে যে ঋতুই হোক না কেন শুধু আনন্দ

আর আনন্দ। তবে এখানে বৃন্দাবনের যে বর্ণনা আছে বর্তমান বৃন্দাবনের সাথে অনেক কিছুই মেলে না, বিশেষ করে বৃষ্টিপাত। এখন তো দেখা যায় বৃন্দাবনের চারি পাশে বৃষ্টি হয় কিন্তু বৃন্দাবনে সারা বছরেই বৃষ্টিপাতের পরিমাণ খুব কম। অবশ্য সময়ের সাথে সাথে আবহাওয়াও পাল্টে যেতে পারে।

কৃষ্ণ বলরাম এখন পাঁচ বছরের বালক। নতুন বাসভূমিতে এসে এদের আনন্দ আর কে দেখে! দুই বালক তাদের বালকসুলভ আচরণ আর মিষ্টি মিষ্টি কথায় ব্রজবাসীদের প্রচুর আনন্দ বর্ধন করছে। কিছু দিন পর তারা বড়দের সাথে গোবৎস চারণ করতে যেতে শুরু করেছে। অন্যান্য গোপবালকদের সাথে একসঙ্গে খেলে বেড়াচ্ছে। বলছেন ***বৃষায়মাণৌ নর্দন্তৌ যুযুধাতে পরস্পরম্। অনুকৃত্য রুতৈর্জন্তূংশ্চেরতুঃ প্রাকৃতৌ যথা।।১০/১১/৪০।*** গোচারণ করতে গিয়ে গরুগুলো নিজেদের মতে চড়ে বেড়াচ্ছে আর তাঁরা নিজেদের মধ্যে নানা রকম খেলা করতে শুরু করে দিতেন, কখন নিজেরাই বৃষ সেজে গর্জন করছেন, কখন ময়ূর, কোকিল পাখিদের ডাক অনুকরণ করছেন। ভাগবত বলছেন শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম দুই অপ্রাকৃত পুরুষ সাধারণ প্রাকৃত বালকের মত খেলা করতেন। এই দুই অপ্রাকৃত পুরুষ আর তাঁদের খেলার সাথী গোপবালকদের নিয়ে বৃন্দাবনের শান্ত জীবন আনন্দে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। কিছু দিন পর আবার একটা অঘটন।

বৎসাসুর ও বকাসুর উদ্ধার

একদিন সব বাচ্চারা খেলা করছিল, গোবৎসরা নিজেদের মত তৃণাচ্ছাদিত মাঠে চড়ে বেড়াচ্ছে। সেই সময় একটা দৈত্য কৃষ্ণ ও বলরামকে হত্যার উদ্দেশ্যে বাছুর রূপ ধারণ করে গোবৎসদের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টিকে সে ফাঁকি দিতে পারেনি। শ্রীকৃষ্ণ দেখছেন বাছুরটা আসলে একটা ছদ্মবেশী অসুর আমাদের বাছুরদের মধ্যে মিশে আছে। আরব্য রজনীতে এই ধরণের প্রচুর কাহিনী পাওয়া যায়, একটা ডাইনী একটা পুরুষকে কখন ভেড়া বানিয়ে দিয়েছে, কখন কুকুর বানিয়ে দিচ্ছে। একজন লোককে এইভাবে কুকুর বানিয়ে নিজের বাড়িতে নিয়ে গেছে, তার মেয়ে আবার ডাইনী। মেয়েটি চেঁচাচ্ছে 'বাবা! তুমি পর পুরুষের সামনে আমাকে দাঁড় করাচ্ছ'! বাবা বলছে 'আরে এটা তো কুকুর'। 'এটা কুকুর নয়, এটা মানুষ এর উপর মন্ত্র মারা আছে'। 'তুমি ওর কুকুরের রূপটা সরিয়ে দিতে পারবে?' 'হ্যাঁ এক্ষুণি সরিয়ে দিচ্ছি'। মন্ত্র মেরে কুকুরের রূপটা সরিয়ে দিচ্ছে। খুব মজার ব্যাপার হল, আমাদের এই বাহ্যিক রূপটার সত্যিই কোন দাম নেই। এই সব কাহিনীতে এই ব্যাপারটাকেই সাধারণ মানুষকে বোঝাবার চেষ্টা করা হচ্ছে। আর দেখানো হয়, যখনই তাকে মারতে যাওয়া হবে তখন সে তার আসল রূপে চলে আসে। যেমন পূতনাকে যখন মারা হচ্ছে তখন তার রূপসী নারীর ভেতর থেকে আসল রূপটা বেরিয়ে আসছে। আমাদের সবার ক্ষেত্রেও তাই হয়, আমরা যখন মারা যাই তখন এই শরীর থেকে আমাদের আসল শরীর, যেটা সূক্ষ্ম রূপে থাকে, সেটা বেরিয়ে আসে। তাই এই শরীরের কোন দাম নেই। মজার ব্যাপার হল, মুসলমানরাও এই ব্যাপারটা জানতো, কিন্তু এই সূক্ষ্ম শরীরের অস্তিত্বের যে একটা দীর্ঘস্থায়ী মূল্য আছে, ধর্মীয় গুরুত্ব আছে, সেটাকে ওরা খুব বেশী এগিয়ে নিয়ে যেতে পারলো না।

যাই হোক বাছুরের ছদ্মবেশে দৈত্যকে দেখতে পেয়েই পাঁচ বছরের বাচ্চা শ্রীকৃষ্ণ ওর লেজ সমেত পেছনের পা-দুটো ধরে শূন্যে তুলে পাক দিতে শুরু করেছেন। এইভাবে ঘোরাতে ঘোরাতে দৈত্যের প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেলে শ্রীকৃষ্ণ ওটাকে একটা গাছের উপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন। তখন সেই দৈত্য বাছুর থেকে বিশাল শরীর নিয়ে বেরিয়ে বৃক্ষ সমেত মাটিতে পতিত হয়ে গেল। যিনি সমস্ত জগতের রক্ষক, তিনি এখন বৃন্দাবনে গরুদের ও গোপবালকদের রক্ষক হয়ে নানা রকম লীলা করে যাচ্ছন।

এরপর আসে বকাসুর বধ। একদিন সব গোপবালকরা নিজেদের গাভীদের এক জলাশয়ের ধারে জল খাওয়াতে নিয়ে গেছে। সেখানে গিয়ে দেখে জলাশয়ের ধারে একটা বিরাট অদ্ভুত জীব বসে আছে। আসলে ওই বিরাটাকার জীবটি ছিল মহাসুর বক, সে বকপাখির রূপ ধরেই বসে আছে। বকাসুরকে পাঠানো হয়েছিল বদলা নেওয়ার জন্য। বকাসুর তখন শ্রীকৃষ্ণকে আসতে দেখেই আচমকা ওকে লম্বা ঠোঁট দিয়ে ধরেই গপ্ করে গিলে ফেলেছে। শ্রীকৃষ্ণকে গ্রাস করে নিতে দেখেই বলরাম আর সব গোপবালকদের ভয়ে প্রাণ রুদ্ধ হয়ে গেল।

এখানে শুকদেব খুব সুন্দর বলছেন ***তং তালুমূলং প্রদহন্তমগ্নিবদ্ গোপালসূনুং পিতরং জগদ্গুরোঃ। চচ্ছর্দ সদ্যোহতিরুষাক্ষতং বকস্তুণ্ডেন হন্তুং পুনরভ্যপদ্যত।।১০/১১/৫০।*** এই জগতের যিনি পিতা, সেই ব্রহ্মারও পিতা হলেন ভগবান, তাই তাঁকে কে নাশ করবে! বকাসুরের মুখের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ ঢুকে গেছেন। কিন্তু সেখানেও তিনি তাঁর যোগশক্তির দ্বারা বকাসুরের তালুমূলে আগুনের মত দহন করতে শুরু করে দিলেন। বক দেখছে তার তালুতে প্রচণ্ড জ্বলন শুরু হয়ে গেছে, বিপদ বুঝে তাড়াতাড়ি করে শ্রীকৃষ্ণকে মুখ থেকে বার করে দিল। মুখ থেকে বার করেই সঙ্গে সঙ্গে নিজের চঞ্চু দিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে আক্রমণ শুরু করেছে। শ্রীকৃষ্ণ তখন দু হাত দিয়ে বকের বিরাট লম্বা চঞ্চুকে ধরে সবার সামনে, আখকে যেমন মাঝখান দিয়ে চিরে দেওয়া হয়, ঠিক সেইভাবে বকাসুরকে চিরে দুটো টুকরোতে আলাদা করে ফেলে দিলেন। একটা বাচ্চা ছেলেকে এইভাবে এক অভূতপূর্ব কাণ্ড করতেই সব গোপবালকরা বিস্মিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণকে দেখতে লাগলো। এই ঘটনাকেই পরে শিশুপাল যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের সভায় সবাইকে বলছে 'যে কিনা একটা পাখিকে মেরে দিল, একটা বাছুরকে মেরে দিল তাতেই তোমরা মনে করছ কৃষ্ণ বিরাট একটা কিছু, একে কিনা ভগবান বলছো!'।এইভাবে শ্রীকৃষ্ণ নানা রকম লীলা করে চলেছেন। এরপর আসে অঘাসুর উদ্ধার।

অঘাসুর উদ্ধার

এখনও শ্রীকৃষ্ণ পাঁচ বছরের শিশু, একেবারেই বাচ্চা। এখন থেকেই তিনি নিয়মিত গরু চরাতে যাচ্ছেন, সেখানে গোপবালকদের সঙ্গে নানা রকমের খেলা করছেন, ছুটোছুটি করছেন, পাখিদের কন্ঠস্বর অনুকরণ করছেন, কেউ বানরের নকল করছেন। একটা শ্লোকে বলছেন ***ইত্থং সতাং ব্রহ্মসুখানুভূত্যা দাস্যং গতানাং পরদৈবতেন। মায়াশ্রিতানাং নরদারকেণ সাকং বিজহ্রুঃ কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ।।১০/১২/১১।*** ভগবান কি কি করেন? যাঁরা জ্ঞানী সাধুপুরুষ, যাঁরা গভীর ধ্যানে নিমগ্ন, তাঁদের কাছে তিনি মুর্তিমান ব্রহ্মানন্দের অনুভূতি স্বরূপ। তার মানে, জ্ঞানীরা যে আত্মজ্ঞানকে বোধে বোধ করেন, সেই আত্মজ্ঞান এখন মুর্তিমান হয়ে শ্রীকৃষ্ণ রূপে সামনে আবির্ভূত। আমাদের অনেকের মনে হয় ভগবান যেন মনের কল্পনা, কিন্তু তা নয়। ভগবান যদি মনের কোন কল্পনা হতেন তাহলে উপনিষদ, গীতা, ভাগবতের মত গ্রন্থ রচিত হত না। যিনি ভগবান তিনিই ব্রহ্ম, কিন্তু মায়ার আবরণ দিয়ে যখন দেখা হয় তখন ব্রহ্মই ঈশ্বর রূপে দেখান। যখন মায়ার আবরণ সরিয়ে দেওয়া হয় তখন বোধে বোধ করেন। এই মন দিয়ে যদি জানতে হয় তখন ব্রহ্মকে কখন জানা যাবে না, ঈশ্বরকেই জানা যাবে। মনের যেখানে লয় হচ্ছে সেইখানেই ব্রহ্মকে জানা যাবে, দুটোতে কোন তফাৎ নেই। কিন্তু যিনি জ্ঞানী, যিনি ব্রহ্মকে জেনে গেছেন, যেমন শ্রীরামকৃষ্ণ তোতাপুরীর কাছে বেদান্ত মতে সাধনা করে যখন অদ্বৈত জ্ঞানের চরম অনুভূতি লাভ করলেন, তারপরেও তিনি মা কালীকে মানছেন, আর বারবার বলছেন 'যিনি কালী তিনিই কৃষ্ণ, যিনি কালী তিনিই ব্রহ্ম, যিনি ব্রহ্ম তিনিই কালী'। ঠাকুর আসলে কি বলতে চাইছেন? জ্ঞানীরা যাঁকে বোধে বোধ করেন, সেই অনুভূতিই মূর্তিমান হয়ে শ্রীকৃষ্ণ রূপে শরীর ধারণ করেন। আমাদের মত সাধারণ লোক এর কি তাৎপর্য বুঝবো! কিন্তু স্বামীজীর মত ঋষিরা, যাঁরা সাধনা করেছেন যাঁদের সমাধির জ্ঞান আছে একমাত্র তাঁরাই জানতে পারেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ সাক্ষাৎ ভগবান। কারণ সমাধিতে তাঁর যে অনুভূতি হচ্ছে, সেই অনুভূতিই আবার শরীরেও হচ্ছে। যাঁরা দাস্য ভক্তি নিয়ে ভগবানের ভজনা করছেন তাঁদের কাছে তিনি পরম আরাধ্য দেবতা। একদিকে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমব্রহ্ম আবার অন্য দিকে যাঁদের ভক্তিভাব আছে তাঁদের কাছে তিনি আরাধ্য দেবতা। *মায়াশ্রিতানাং নরদারকেণ*, কিন্তু সংসারের বিষয়ে যারা মোহান্ধ হয়ে আছে, মায়াকে যারা আশ্রয় করে আছে তারা সব সময় শ্রীকৃষ্ণকে সামান্য মানুষ রূপেই দেখে। বলছেন, এই যাঁর তত্ত্ব তিনিই এখন গোপবালকদের সাথে লীলা করে চলেছেন।

যৎ পাদপাংসুর্বহুজন্মকৃচ্ছ্রতো ধৃতাত্মভির্যোগিভিরপ্যলভ্যঃ। স এব যদ্দৃগ্বিষয় স্বয়ং স্থিতঃ কিং বর্ণ্যতে দিষ্টমতো ব্রজৌকসাম্।।১০/১২/১২। বহু বহু জন্ম ধরে কত কৃচ্ছ্র সাধন করে, কত তপস্যা করে নিজেদের ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণকে জয় করে যোগীরাও যে ভগবানের সাক্ষাৎ পান না, সেই ভগবান এখন স্বয়ং ব্রজবাসিদের স্থূল চোখের সামনে বালক রূপ ধরে তাঁদের আনন্দ বিতরণ করছেন, প্রিয় খেলার সাথিদের সঙ্গ

দিচ্ছেন, এর চাইতে বড় সৌভাগ্যের কথা কী আর হতে পারে! যতই আমরা লীলা কাহিনী বলে চালিয়ে দিই না কেন, যাঁরা ভাগবতাদি গ্রন্থ রচনা করেন তাঁরাও কোথাও একটা যুক্তি তর্ক রাখতে চান। এই যে গোপবালকদের এত সৌভাগ্য, এই সৌভাগ্য কি করে হল! বলবেন এদের আগের আগের জন্মে হয়তো কোন বিরাট তপস্যা ও সাধনা করা ছিল। তাহলে কামারপুকুর, জয়রামবাটীতে যাঁরা ঠাকুর, মায়ের সময় ছিলেন তাঁরাও সেই রকম কোন মুণ্ডুকাটা তপস্যা করেছিলেন। মঠের প্রাচীন সন্ন্যাসীদের অনেকে ছিলেন, যাঁরা ঠাকুরের একেবারে একনিষ্ঠ ভক্ত, তাঁরাও কিন্তু কামারপুকুর ও জয়রামবাটীর গ্রামবাসীদের সেই দৃষ্টিতেই দেখতেন। জয়রামবাটী, কামারপুকুর থেকে কোন লোক বেলুড় মঠে এলে তাঁদের প্রত্যেককে কী প্রচণ্ড শ্রদ্ধা ভক্তি নিয়ে আদর আপ্যায়ানাদি করতেন ভাবা যায় না। এই সব সন্ন্যাসীদের মধ্যে এই ভাবটাই বিরাজ করত – এঁরা সবাই ধন্য, ধন্য না হলে কি ঠাকুরের জন্মস্থানে জন্ম নেবেন!

এখানে যে কটি অসুর, দৈত্যকে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধার করছেন বা বধ করছেন এরা সবাই কংসের লোক বলেই ভাগবতে উল্লেখ করা হয়েছে। নন্দবাবার গোপাল বালক শ্রীকৃষ্ণকে কংস যে করেই হোক নাশ করতে চাইছে। সেই উদ্দেশ্যে একের পর এক তখনকার দিনের সব নৃশংস, ক্রুর, পরাক্রমশালী নামকরা দৈত্য, অসুরদের ব্রজভূমিতে পাঠিয়ে যাচ্ছেন। শ্রীকৃষ্ণকে বধ করার জন্য এবার কংস অঘাসুরের উপর দায়ীত্ব অর্পণ করে বৃন্দাবনে পাঠিয়েছে। অঘাসুর আসলে একটি অজগর সাপ। আবার বলছেন এই অঘ নামে এক মহাদৈত্য ছিল। সে আবার পূতনা এবং বকাসুরের ছোটভাই। যাই হোক, অঘাসুর একদিন শ্রীকৃষ্ণ বলরাম সহ সব গোপবালকরা যেখানে খেলা করছিল সেখানে এক বিরাট অজগরের রূপ ধারণ করে এসে শ্রীকৃষ্ণকে দেখছে আর ভাবছে এই শ্রীকৃষ্ণই আমার ভাই ও বোনের হত্যাকারী, আজকে আমি এর সঙ্গীসাথীদের সমেত শ্রীকৃষ্ণকে সবাইকে বধ করব আর এটাই হবে আমার মৃত ভাই ও বোনের উদ্দেশ্যে তর্পণ। শ্রীকৃষ্ণ এবং আর সবাইকে গিলে ফেলার জন্য সেই অজগর সাপ বিরাট পর্বতের মত মুখটা প্রসারিত করে রেখেছে। কত বড় হাঁ করেছে? বলছেন মুখের নীচের পাটি মাটিতে লেগে আছে আর উপরের পাটি আকাশে মেঘের গায়ে গিয়ে ঠেকছে। অঘাসুরের জিভটা যেন সেই গুহার ভেতরে যাওয়ার রাস্তা। গোপবালকরা ওই রকম বিরাট আকৃতির মুখ দেখে সরল মনে ভাবছে এটা যেন বৃন্দাবনেরই কোন অদ্ভুত প্রাকৃতিক দৃশ্য। আর ইদানিং বৃন্দাবনে তো অনেক রকম অদ্ভুত দৃশ্যই দেখা যাচ্ছে, এটাও সেই রকম কোন দৃশ্য হবে। এই সব নানা রকম কথা ভাবতে ভাবতে তারা সেই অজগরের সাপের মুখ দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেছে। শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু বুঝতে পেরেছেন এটি আসলে এক ভয়ংকর অজগর সাপ, আর শ্রীকৃষ্ণ বোঝার আগেই গোপবালকরা না বুঝে এর মুখ দিয়ে ঢুকে ততক্ষণে অজগরের পেটে চলে গেছে। তখন শ্রীকৃষ্ণও অঘাসুরের মুখের ভেতর গিয়ে নিজের দেহের আকার বৃদ্ধি করতে শুরু করতে থাকলেন। ওই বিশাল অজগরের মুখ, তার শরীরটাও সেই অনুপাতে বিশাল হবে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ নিজের দেহের আকারকে বাড়াতে বাড়াতে এত বড় করে দিয়েছেন যে অজগরের গলাটা রুদ্ধ হয়ে গেছে। গলা রুদ্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে তার শ্বাসরোধ হয়ে গেছে। শ্বাসরোধ হতেই অঘাসুর যন্ত্রণায় ছটফট করতে শুরু করে দিয়েছে। শ্বাসরুদ্ধ হয়ে সাপটা মরে যেতেই সবাই দেখছে – এ তো কোন প্রাকৃতিক দৃশ্য নয়, আসলে এটা তো একটা বিশালাকৃতির সাপ ছিল।

এখানে একটি খুব মজার শ্লোকে বলছেন *এতৎ কৌমারজং কর্ম হরেরাত্মাহিমোক্ষণম্। মৃত্যোঃ পৌগণ্ডকে বালা দৃষ্ট্বোচুর্বিস্মিতা ব্রজে।।১০/১২/৩৭।* ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই যে অঘাসুরের আক্রমণ থেকে নিজের খেলার সাথী গোপবালকদের রক্ষা করলেন, এই ঘটনাটি তাঁদের পাঁচ বছর বয়সে সংঘটিত হয়েছিল। কিন্তু তাঁরা যখন ব্রজবাসীদের কাছে এই ঘটনার বর্ণনা করছেন তখন তাঁদের ছয় বছর বয়স হয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ অজগর সাপকে বধ করলেন তাঁদের পাঁচ বছর বয়সে, কিন্তু বাড়িতে ফিরে বড়দের কাছে সেই ঘটনার বর্ণনা যখন করছেন তখন তাঁদের ছয় বৎসর বয়স হয়ে গিয়েছে। শুকদেবের মুখে এই ব্যাপারটা শুনে অবাক হয়ে পরীক্ষিৎ শুকদেবকে প্রশ্ন করছেন 'আপনি বলছেন ভগবান শ্রীহরি পঞ্চম বর্ষে যে লীলা করেছিলেন, ব্রজবালকেরা ষষ্ঠ বর্ষে গিয়ে সেই ঘটনার বর্ণনা করছে যেন এটা কিছুক্ষণ আগে হয়েছে। এটা কি করে সম্ভব! এই অদ্ভুত রহস্য জানার জন্য আমার মন খুব উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে। মনে হয় এটি ভগবানের অঘটন-ঘটন-

পটিয়সী মায়ারই কোন রহস্য'। ভাগবতের এই কাহিনীটি একটি অনন্যসাধারণ অনুপম কাহিনী। শ্রীরামচন্দ্রের এমন অনেক কাহিনী আছে যার পুনরাবৃত্তি অন্য অনেক কাহিনীতেও পাওয়া যাবে, কিন্তু ভাগবতের এই কাহিনীর বর্ণনা সম্পূর্ণ ভাবে ভাগবতেরই বিশেষ বর্ণনা। এই কাহিনীর বৈশিষ্ট্য হল, পুরো একটা বছর গোপবালকদের জীবন থেকে হারিয়ে গেছে। কীভাবে একটি বছর এদের জীবন থেকে হারিয়ে গেল? এই প্রশ্নের উত্তরে শুকদেব যে কাহিনী নিয়ে আসছেন এটি পুরোপুরি ভাগবতের নিজস্ব আঙ্গিকে রচিত। অত্যন্ত কঠিন আধ্যাত্মিক উচ্চ তত্ত্ব সমুদয়কে সাধারণ মানুষের মনে একটু সামান্যতম ধারণা জন্মাবার জন্য আমাদের ঋষিরা কত ভাবে, কত রকম নতুন নতুন আঙ্গিকে কাহিনীকে সাজিয়ে আমাদের উপস্থাপনা করে গেছেন, ভাবলেও আমাদের অবাক হয়ে যেতে হয়। আমাদের প্রতি ঋষিদের যে কি অপার করুণা ভেবে তার কুল পাওয়া যাবে না, শুধু তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধায় আমাদের মস্তক নত হয়ে আসে।

জীবনের হতাশা আর নিরাশার ভাব দূর করার সহজ উপায়

বাল্মীকি রামায়ণ আর ব্যাসদেব রচিত মহাভারত মূল এই দুটি মহাকাব্য ভারতের জনমানসে দুটি মহান চরিত্রকে স্থায়ী ভাবে বসিয়ে দিয়েছে। একজন শ্রীরামচন্দ্র আর দ্বিতীয় জন শ্রীকৃষ্ণ। এই দুটি চরিত্র সারা ভারতের চেতনার কেন্দ্র বিন্দুতে চিরস্থায়ী ভাবে বসে গেছেন। পরবর্তি কালের সাহিত্যিক বা কবিরা, যাঁদের মধ্যে পাণ্ডিত্য এবং সাহিত্যিক প্রতিভা আছে, তাঁরা এই দুটি মূল চরিত্রের কিছু কিছু ঘটনাকে নিয়ে, যেমন শ্রীরামচন্দ্রের অযোধ্যায় জন্ম, শ্রীরামচন্দ্রের সাথে সীতার বিবাহ, চৌদ্দ বছর বনবাস, সীতার অপহরণ, রাবণ বধ এই ধরণের চার পাঁচটি ঘটনাকে রসদ করে তাঁদের সৃজনশীলতাকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে গেছেন। ঠিক তেমনি ভাগবতে বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণের কিছু লীলাকাহিনীকে আধার করে ভারতে প্রচুর কাব্যগ্রন্থ, সাহিত্য রচিত হয়েছে। এই ধরণের সাহিত্যে কতকগুলি উচ্চ ভাবকে তুলে ধরা হয়েছে, এর মধ্যে ইতিহাস খুঁজতে যাওয়াটা আমাদের কখনই উচিৎ নয়। কোন সাহিত্যেই শ্রীকৃষ্ণের জীবনের সব ঘটনা এক ভাবে পাওয়া যাবে না। আর কেউ যদি এই পার্থক্য গুলিকে ধরে এর মধ্যে ইতিহাসকে মেলাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে তাহলে তার পক্ষে তা একটা মারাত্মক ভুল হবে, বড় একজন তার্কিক হয়তো সে হতে পারবে কিন্তু সাধক কোন দিন হতে পারবে না। যিনি শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত, তিনি শ্রীকৃষ্ণের কিছু কিছু ঘটনাকে তাঁর সাধনার অঙ্গ রূপে গ্রহণ করে তাঁরই মনন চিন্তনে সর্বক্ষণ ডুবে থেকে তাঁর আধ্যাত্মিক উত্থানকে ত্বরান্বিত করতে সক্ষম হন, সমস্ত রকম হতাশা নৈরাশ্য থেকে মুক্ত হয়ে এক আনন্দময় জীবন অতিবাহিত করে যান।

যিনি জীবনের সমস্ত রকম হতাশা ও নিরাশার ভাব থেকে বেরিয়ে এসে শান্তি পেতে চাইছেন, সমস্ত রকম অস্থিরতার অবসান ঘটিয়ে যিনি জীবনকে একটা স্থিতিশীলতায় নিয়ে যেতে চাইছেন, তাহলে তাঁকে প্রথমেই দেখতে হবে কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে তিনি তাঁর কর্মকুশলতা আর তাঁর শারীরিক ও মানসিক শক্তিকে পূর্ণ রূপে প্রয়োগ করতে পারছেন। আমি কিসে পারদর্শী, এইটি জেনে বুঝে নিয়ে এবারে তার সমস্ত শক্তিকে ওই একটি ক্ষেত্রে একাগ্র করে সঞ্চালিত করে যেতে হবে। যেমন ধরুন, একজন খুব ভালো নৃত্য করতে পারে। আজকাল অনেকেই নাচ করছে, শুধু তাই নয়, পূজা পার্বণে, বাড়িতে বিয়ের অনুষ্ঠানে অনেকেই নাচ-গান করে। এর মধ্যেও সে মনে মনে কিন্তু ভালো করে জানে আমি এদের থেকেও অনেক ভালো নাচতে পারি। এবার সে যদি সত্যিই বড় হতে চায়, তার সমস্ত হতাশার ভাব, নিরুৎসাহের ভাব কাটিয়ে যদি শান্তি পেতে চায়, তাহলে তাকে প্রথমে তার সমস্ত শক্তিকে সংহত করে নাচের মধ্যে ঢেলে দিতে হবে। তারপর যেটা সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ তা হল এবার সে যেন শুধু ঈশ্বরের জন্যই নৃত্যকলা পরিবেশন করতে থাকে। শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীরামচন্দ্রের জীবনের যে কোন এক বা একাধিক লীলাকাহিনীর অন্তর্নিহিত মাধুর্যতাকে সে তার নৃত্যকলার শৈলীতে প্রয়োগ করে ফুটিয়ে তুলুক। তারপর দেখা যাবে তার জীবনের গতি অন্য খাতে চলতে আরম্ভ করেছে, কোথা দিয়ে যে তার সময় চলে যাচ্ছে বুঝতেও পারবে না।

আমাদের জীবনে যে দুঃখ কষ্ট আর হতাশা, এর দুটোই কারণ, প্রথম কথা আমরা আমাদের সামর্থ্যের পরিধি কতুটুকু জানিনা। আমাদের সবারই মধ্যে অফুরন্ত শক্তি আছে, কিন্তু জানিনা এই শক্তিকে আমার পক্ষে

কোথায় সংহত করা উচিৎ। জানার সব থেকে ভালো উপায় হল, নিজের স্কুল জীবনের দিকে একটু ফিরে তাকাতে হবে, ক্লাশ টু থেকে ক্লাশ এইট পর্যন্ত এই সময়টাতে কোন্ কোন্ জিনিষের প্রতি তার স্বাভাবিক প্রবণতা ছিল, কোন কাজগুলি করতে বেশী ভালো লাগত, আর পরীক্ষায় কোন কোন বিষয়ে তার নম্বর বেশী হত, হতে পারে অঙ্ক, বা ইতিহাস বা বিজ্ঞান বা সাহিত্য, কিংবা ছবি আঁকতে ভালো লাগত, তা যে কোন বিষয়েই হতে পারে। যে জিনিষটা করতে বেশী ভালো লাগত বুঝবেন সেটাই তার প্রতিভা স্ফুরণের স্বাভাবিক ও উপযুক্ত জায়গা। তারপর ওই জায়গাতে তাকে পুরো মনোনিবেশ করতে হবে। তারপর যেটা করতে হবে, তা হল, যেটাই করুক তা যেন ঈশ্বরের জন্যই করতে থাকে, ঈশ্বরকে ভালোবেসে, একমাত্র ঈশ্বরকে পরিতৃপ্ত করার জন্য করুক, এরপর কেউ বাহাবা দিক আর নাই দিক তাতে আমার কিছু যায় আসে না, আমি জানি আমার প্রভু খুব সন্তুষ্ট হয়ে আমার প্রশংসা করবেন, এই মানসিকতা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। এই পথ অবলম্বন করেই ভারতের আধ্যাত্মিকতার ঐতিহ্য সমৃদ্ধ হয়েছে। যাঁরা খুব প্রতিভাবান ছিলেন তাঁরা শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরামচন্দ্রের বিভিন্ন ঘটনাকে বিশ্লেষণ করে কত দর্শন, কত কাব্য রচনা করে গেছেন। এক ভদ্রমহিলার সাথে একজন সাধুর পরিচয় হয়েছিল। পরে জানা গেল সেই ভদ্রমহিলা সাধুর পূর্বাশ্রম শহরের একজন খুব সম্ভ্রান্ত ও ধনী পরিবারের গৃহবধু ছিলেন। তাঁর স্বামী অনেক দিন হয় মারা গেছেন। স্বামীর মৃত্যুর পর ভদ্রমহিলার এত ধন সম্পত্তি উত্তরাধিকারি সূত্রে এসে গিয়েছিল যে তিনি নিজেও জানতেন না কোন্ কোন্ ব্যাঙ্কে তাঁর কত টাকা জমা আছে। সাধুটি একবার তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, আপনি সারাদিন কীভাবে সময় কাটান। ভদ্রমহিলা তাঁর সারাদিনের সময় কাটানোর তালিকা শুনে সাধু মহোদয় আশ্চর্য হয়ে ভাবছেন, এই হল ভারতের ঠিক ঠিক জীবনদর্শন। ভদ্রমহিলা বলছেন উনি সারাটা দিন শ্রীকৃষ্ণের চিন্তন করেন আর প্রত্যেক দিন শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে একটা করে কবিতা বা গান রচনা করেন, আর তিনি কবিতা বা গান কারুর সামনে পড়বেনও না কাউকে দেখানও না। এটাই একজন মানুষের মহান হয়ে ওঠার জায়গা। প্রথমে দেখে নিতে হবে কোন জিনিষের প্রতি তার স্বাভাবিক ভালো লাগার প্রবণতা, এরপর পুরোপুরি ঈশ্বরে মন সমর্পিত করে সমস্ত শক্তি তাতে লাগিয়ে দিতে হবে।

ভাগবতের ক্ষেত্রেও ঠিক এই ব্যাপারটাই হয়েছে। যাঁরা এর রচনা করেছেন, যদিও আমরা জানি ব্যাসদেবই ভাগবত-প্রণেতা, কিন্তু অনেকে বলেন পরবর্তি কালে অনেক ঋষি কবিদেরও ভাগবতের উপর কলম চলেছে। হতেও পারে আবার নাও হতে পারে। কিন্তু যিনিই রচনা করুন না কেন, সাহিত্য কোন্ উচ্চ পর্যায়ে যেতে পারে আর কতটা সাহিত্য প্রতিভা থাকলে এই ধরণের উচ্চ আঙ্গিকে একটা সাহিত্য পৌঁছতে পারে, ভাগবতের দশম স্কন্ধ না পড়লে বোঝা যাবে না। অধ্যাত্ম পিপাসু মানুষের কাছে ভাগবতের যে এত কদর শুধু ভাগবতের এই দশম স্কন্ধের জন্য।

ভগবান কর্তৃক ব্রহ্মার মোহ নাশ

যাই হোক এখানে সংক্ষেপে কাহিনী হল, বৃন্দাবনের মাঠে ঘাটে শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম আর তাঁদের বন্ধু গোপবালকরা এক দিব্য আনন্দের সাথে খেলা করে বেড়ায়, ধেনু চড়ায়। বৃন্দাবনে আসার পর থেকে আগের মতই আবার শান্ত, নিস্তরঙ্গ ব্রজভূমিতে নানান ধরণের উৎপাত শুরু হয়েছে। দৈত্য গোবৎস রূপ ধারণ করে শ্রীকৃষ্ণকে বধ করতে আসছে, তাকে বধ করে দিতেই কিছু দিন বাদে বাদেই এক এক করে কখন সেই অসুর, কখন সেই দৈত্য বধ করে চলেছেন, কখন বকাসুরকে বধ করছেন, কখন অঘাসুরকে উদ্ধার করছেন। এইসব ঘটনার পরেই আসে ব্রহ্মাকে নিয়ে ভগবানের একটি মজার অথচ উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাবসমৃদ্ধ লীলা কাহিনী, ব্রহ্মার মোহ নাশের কাহিনী। এই ঘটনাকে অনেকে বলবেন ব্রহ্মার মোহনাশ, কেউ বলবেন ব্রহ্মার দর্পচূর্ণ, আবার কেউ বলবেন ব্রহ্মার ইচ্ছে হয়েছিল শ্রীকৃষ্ণের লীলা আস্বাদন করা। যে যেভাবেই বলুন না কেন তাতে কাহিনীর আড়ালে উচ্চ আধাত্মিক তত্ত্বের কোন হেরফের হয় না। আমরা এর আগে অনেকবার সৃষ্টির কথা বলেছি। সৃষ্টির আদিতে ভগবান বিষ্ণু। সেই ভগবান বিষ্ণু থেকে জন্ম নিলেন ব্রহ্মা। দৃশ্যমান জগতের প্রথম সৃষ্টিকর্তা হলেন ব্রহ্মা, যার জন্য ব্রহ্মাকে পিতামহও বলা হয়। ব্রহ্মাও এক সময় সাক্ষাৎ ভগবানের কাছে

প্রার্থনা করেছিলেন তিনি যেন এই পৃথিবীর ভূভার হরণ করার জন্য মানবদেহে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন। এখন ব্রহ্মার মনে হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণ কি সত্যিই সেই সাক্ষাৎ ভগবান হয়ে আবির্ভূত হয়েছেন? তিনি পরীক্ষা নেওয়ার জন্য একটু মজা করতে চাইলেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় রাণী এলিজাবেথের রয়েল পরিবারের একটি মেয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে গেছে ট্রেনিং নিতে, আসলে সৈন্যদের উৎসাহিত করার জন্যই গিয়েছিল। দু সপ্তাহ এ্যাম্বুলেন্স চালানোর ট্রেনিং নিয়েছে। ট্রেনিং শেষ হওয়ার পর রাজকুমারীর বাবা নিজে এসেছেন মেয়েকে নিয়ে যেতে। বাবা হলেন রাণী এলিজাবেথের ছেলে, আর সে ছিল বেশ রসিক ও মজাদার লোক। মেয়ে ট্রেনিং নিয়ে আসছে, আর মনে মনে ঠিক করে রেখেছে আমি কেমন গাড়ি চালাতে শিখেছি বাবাকে আমি নিজে গাড়ি ড্রাইভ করে নিয়ে গিয়ে দেখাব। বাবা খুব রসিক ছিলেন, তিনি আগেই গাড়ির কারবোরেটরের তারটা খুলে রেখেছেন। রানীর ছেলে এসেছেন রাজকুমারীকে নিয়ে যেতে, সবাই দাঁড়িয়ে আছে সেলুট করার জন্য।

রাজকুমারী জিপের ড্রাইভারের সীটে বসে গাড়িতে স্টার্ট দিচ্ছে কিন্তু কিছুতেই গাড়ী স্টার্ট নিচ্ছে না। রাজকুমারীরতো ঘাম ছুটে গেছে। লজ্জায় মাথা তুলতে পারছে না। বাবা কিন্তু জেনেশুনেই মেয়ের সঙ্গে তামাশা করার জন্যই এই কাণ্ডটা করে রেখেছেন। বাবা আরো মজা করে বলছেন 'মা, তুমি একটু দেখো না কি হল! তুমিতো পনের দিন ধরে গাড়ির ট্রেনিং নিলে'। কিন্তু মেয়ের মাথাতেই আসছে না যে ফুয়েল সাপ্লাইয়ের তারটাই কাটা। এটাও ভালোবাসার একটা রূপ, এই রূপে ভালোবাসাকে প্রকাশের জন্য বাবা এই লীলাটুকুর আশ্রয় নিয়েছেন। এইভাবে লীলা আস্বাদন করতে চাইছেন বাবা। মা যেমন আড়ালে লুকিয়ে সন্তানের খেলা দেখতে ভালোবাসে, বাচ্চা মাকে খুঁজে না পেয়ে কাঁদতে থাকে, কিন্তু মা হয়ত একটা পর্দার পেছনে নিজেকে আড়াল করে সন্তানের মায়ের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসাকে উপভোগ করতে থাকেন। আমরা এখন সম্পূর্ণ রূপে ভক্তিশাস্ত্রের ভক্তি সাগরে অবগাহন করছি, এখানে কোন প্রকারের কূট প্রশ্ন বা যুক্তি তর্ককে আনা যাবে না। এটাই ভক্তিশাস্ত্রের প্রধান ও অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ভক্তির কাছে সব যুক্তি তর্ক উড়ে যায়, এটা শুধু যে ভারতের ভক্তিশাস্ত্রের ক্ষেত্রেই হবে তা নয়, বিশ্বের যে কোন ধর্মের ভক্তিগ্রন্থের ক্ষেত্রেও এই একই ব্যাপার প্রযোজ্য।

কামাসক্ত পুরুষের মত ভক্ত ঈশ্বরকে ক্ষণে ক্ষণে নতুন নতুন রূপে দেখে

পরীক্ষিতের এক প্রশ্নের উত্তরে শুকদেব খুব সুন্দর বলছেন ***সতাময়ং সারভৃতাং নিসর্গো যদর্থবাণীশ্রুতিচেতসামপি। প্রতিক্ষণং নব্যবদচ্যুতস্য যৎ স্ত্রিয়া বিটানামিব সাধু বার্তা***।।১০/১৩/২। পরীক্ষিতের প্রশংসা করে শুকদেব বলছেন *সতাময়ং সারভৃতাং*, যাঁরা ঠিক ঠিক ভগবানের ভক্ত, শুধু ভক্তই নয় যাঁর মধ্যে সার গ্রহণ করার ক্ষমতা আছে, সারগ্রাহী রসিক যিনি তাঁর বৈশিষ্ট্য হল, তাঁদের বাণী, কর্ণ এবং হৃদয় নিরন্তর একমাত্র ভগবানের কীর্তন, শ্রবণ এবং মননে ব্যাপৃত থাকে। একটা বয়সের পর মানুষের সংসারটা আলুনি লাগে, কিন্তু সংসারের এমনই জ্বালা আর বন্ধন যে মানুষ সংসার থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না। এদের তখন ধীরে ধীরে ধর্মীয় ও শাস্ত্রীয় কথার প্রতি একটু টান আসতে থাকে, কিন্তু ঈশ্বরীয় কথা আর সাংসারিক প্রসঙ্গ এই দুটোর মধ্যেই ঘুরঘুর করতে থাকে। এরা হল মক্ষিকাবৃত্তি যুক্ত মানুষ। কিন্তু যাঁরা সারগ্রাহী রসিক পুরুষ তাঁরা ঈশ্বর ছাড়া অন্য কিছুর দিকে তাকাবেনই না। রসিক শব্দটা আমরা সাধারণতঃ খুব হাল্কা মজা করে বলি। কিন্তু আধ্যাত্মিক জগতে রসিক শব্দ খুব গভীর তাৎপর্য ভাব বহন করে, শাস্ত্রে রসিক মানে যাঁর সার গ্রহণ করার ক্ষমতা আছে। এনারা হলেন মধুকর বৃত্তি সম্পন্ন। মক্ষিকাবৃত্তি হল, মাছি যেমন সন্দেশেও বসছে আবার ময়লাতেও বসছে। কিন্তু মধুকরবৃত্তি মানে, মৌমাছি যেমন ফুল ছাড়া অন্য কিছুতে বসবে না। সাধু-মহাত্মার হলেন মধুকরবৃত্তির, তাঁদের বাণী, কর্ণ ও হৃদয় সর্বদা নিরন্তর নিত্য ভগবদ্ রসাস্বাদনের জন্য ঈশ্বরেতেই বিচরণ করবে আর সাধারণ মানুষরা হল মক্ষিকাবৃত্তির। এই এতক্ষণ শাস্ত্র কথা শুনছে, খুব ভালো লাগছে আবার এখান থেকে বাড়ি গিয়ে টিভিতে সিরিয়াল দেখতে বসে যাবে আর তা নাহলে পরনিন্দা আর পরচর্চা নিয়ে মেতে উঠবে। পরনিন্দা-পরচর্চার আনন্দের কাছে টিভির সিরিয়ালও হার মেনে যায়। বিছানায় মৃত্যু শয্যায় শুয়ে আছে, হাঁটাচলার ক্ষমতা নেই, কিন্তু তার পাশে বসে কেউ যদি কারুর নিন্দা

করতে শুরু করে তখন সোজা উঠে বসে বলবে 'এই ব্যাপারে আমারও কিছু দুটো বক্তব্য আছে'। সাধু-মহাত্মারা কারুর নিন্দা হচ্ছে শুনলে তৎক্ষণাৎ সেই আলোচনা বন্ধ করে ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ শুরু করে দেবেন, আর তা নাহলে সেখান থেকে সরে আসেন। শুধু তাই নয় তাঁরা ভগবানের কথা সব সময় নতুন ভাবে অনুভব করেন। এই যেমন শ্রীমদ্ভাগবতে নতুন কোন কথা যোগ হচ্ছে না, আজ থেকে কয়েক হাজার বছর আগে যে কটি পাতা ছিল সেকটি পাতাই ভাগবতে আছে, নতুন কোন পাতা যোগ হয়নি। কিন্তু সাধু, মহাপুরুষরা ভাগবতের কথাগুলো যখন প্রতিদিন শ্রবণ করছেন, অধ্যয়ন করছেন তাঁরা তাঁদের হৃদয়ে তখন ভাগবতের ভাব নিত্য নতুন ভাবে অনুভব করেন। এই জিনিষটাকে শুকদেব তুলনা করছেন *স্ত্রিয়া বিটানামিব সাধু বার্তা*, লম্পট কামী লোকেদের মেয়েদের সম্বন্ধে কল্পনা করতে, আলোচনা করতে যেমন কোন ক্লান্তি বোধ হয় না, সাধুরাও ঠিক সেইভাবেই কল্পনা করেন, আলোচনা করেন কিন্তু তাঁরা সেটা ঈশ্বরের ব্যাপারে করেন।

সারা ভারতে এখন বছরের ছশ থেকে সাতশ সিনেমা তৈরী হয়, কিন্তু সব সিনেমাতে তো মোটামুটি সেই একই কাহিনী, একটা ছেলে মেয়েকে কিংবা মেয়ে ছেলেকে ভালোবেসেছ, সেখান থেকে শুরু করে মাঝখানে বিরহ, ভুল বোঝাবুঝি, ভিলেনের সাথে মারামারি হয়ে শেষে আবার দুজনে মিলে যাচ্ছে। জীবনে যদি কেউ প্রচণ্ড আবেগপ্রবণ না হয়, অর্থাৎ এই জিনিষটাকে আমি ভালোবেসেছি, আমার মন-প্রাণ এই জিনিষের প্রতি দিয়ে দেব, নচিকেতা যেমন তাঁর বাবাকে বলছেন 'আপনি আমাকে যমলোকে যেতে বলেছেন, আপনি আপনার সত্য রক্ষা করে আমাকে যমলোকে প্রেরণ করুন কারণ মানুষ *সস্যমিব মর্ত্যাঃ পচ্যতে সস্যমিবাজায়তে পুনঃ*, মানুষ শস্যের মত মরে আর শস্যের মত জন্মায়'। এই হচ্ছে সত্যিকারের আবেগপ্রবণতা বলতে কি বোঝায়। ভ্যান গগ্‌ও ছিলেন প্রচণ্ড আবেগপ্রবণ সম্পন্ন মানুষ। যাঁরাই সৃজনশীল কবি, শিল্পী, লেখক, গায়ক হন তাঁরা সবাই অত্যন্ত আবেগপ্রবণ হন। যাঁরাই প্রচণ্ড আবেগপ্রবণ হবেন তাঁরা যে জিনিষটা সৃষ্টি করবেন তাতে তাঁদের প্রতিভা শক্তির পুরো ব্যাপারটা থেকে একটু বেশী অন্য কিছু থাকবে। তাঁদের হাঁটাচলা, চাহনি, কথাবার্তাতেই মনে হবে যেন অন্য জগতের লোক।

ভ্যান গগ্‌ যখন ছবি আঁকতেন তখন পুরো ওই ছবির মধ্যেই ডুবে থাকতেন, খাওয়া-দাওয়া ভুলে যাচ্ছেন, পাগলের মত যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। মাথার মধ্যে সব সময় ছবির বিষয় ঘুরছে। তুলির শেষ টান না হওয়া পর্যন্ত এভাবেই মাসের পর মাস চলতে থাকত। ছবি আঁকা যখন শেষ হয়ে যেত তারপরই তার খাওয়া ঘুম সব চলে যেত। তাঁর একজন গার্লফ্রেণ্ডের মত ছিল। ছবি শেষ হয়ে যেতে ভ্যান গগের ঠিকানা হয়ে যেত গার্লফ্রেণ্ডের বাড়ি, সব সময় মেয়েটির কাছেই পড়ে থাকতেন। মেয়েটি একদিন খুব ভালোবেসে আবেগ নিয়ে বলছে 'তোমার কান দুটো কি সুন্দর! আমার মাঝে মাঝে মনে হয় ইস্‌ যদি সব সময় এই কানদুটো আমার কাছে রাখতাম'! ভ্যান গগ্‌ সোজা মেয়েটি ঘর থেকে বেরিয়ে নিজের বাড়িতে এসে একটা ছুড়ি দিয়ে নিজের একটা কান কেটে আবার সোজা মেয়েটির কাছে গিয়ে বলছে 'তুমি আমার কান চেয়েছিলে, এই নাও আমার কান'। ভ্যান গগের কান থেকে ঝরঝর করে রক্ত বেরোচ্ছে, আর মেয়েটি চিৎকার করে যাচ্ছে। লোকজন দৌড়ে এসেছে 'কি হল! কি হল!' সারা জীবন ভ্যান গগের একটা কানই ছিল। ভ্যান গগের জীবনের এটি খুব নামকরা ঘটনা। যাঁরা আবেগপ্রবণ হন তাঁরা এই ধরণেরই হন। আমরা বলবো, লোকটি বদ্ধ পাগল ছিল। ঠিকই! বদ্ধ পাগল, কিন্তু এই পাগলের এক একটা ছবি কয়েক কোটি টাকা মূল্য দিয়েও আমাদের ক্ষমতা নেই কেনার।

কামী পুরুষদের যেমন কামের প্রতি আবেগ থাকে, সব সময় নারীর চিন্তা করে যাচ্ছে, আর নতুন নতুন ভাবে নারীর কল্পনা করে যাচ্ছে, যাকে ভালোবাসে আর যদি নাও ভালোবাসে কিন্তু নিত্য নতুন নারীকে নিয়ে আসছে, নারীর দেহটা পাল্টে যাচ্ছে কিন্তু 'নারী' সব সময় আছে। ভগবানের ভক্তরা ঠিক এই রকমই হন, ওই একই ভগবানের কথা, একই কাহিনী, শ্রীকৃষ্ণের ওই একই কতকগুলি লীলা, কিন্তু যিনি সন্ত-মহাত্মা, যাঁর রস বোধ আছে, তাঁদের কাছে ভগবানের একই কথাতে বা কাহিনীতে কোন ক্লান্তি আসবে না, প্রত্যেক দিন, প্রতি মুহূর্তে তাঁরা ঈশ্বরীয় লীলা, ভগবানের কথাতে আনন্দরস পান করেন। আমাদের তিনটে শাস্ত্র, উপনিষদ, গীতা আর ভাগবত এই তিনটে শাস্ত্রের জন্য তিন ধরণের অধিকারী সম্পন্ন ব্যক্তিত্বের দরকার।

যাঁরা খুব উচ্চমানের জ্ঞানী, যাঁর মধ্যে সব কিছু চটপট বুঝে নেওয়ার ক্ষমতা আছে, উপনিষদ তাঁদের জন্য। তুখোড় ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধি না থাকলে উপনিষদের কোন কিছুই ধারণ করতে পারা যাবে না। বেদ ব্রাহ্মণ ছাড়া কেউ অধ্যয়ন করতে পারতো না, আবার ব্রাহ্মণদের মধ্যেও মুষ্টিমেয় কয়েকজন যাঁরা খুব উচ্চ মেধাবী সম্পন্ন তাঁরা উপনিষদ অধ্যয়ন করার সুযোগ পেতেন। শুধু তীক্ষ্ণ বুদ্ধি থাকলেই হবে না, ত্যাগ বৈরাগ্যেও প্রতিষ্ঠিত থাকতে হবে, ত্যাগ বৈরাগ্যের একটু ফাঁক যদি থাকে তাহলেও উপনিষদ বুঝতে পারা যাবে না। খুব উচ্চস্তরের আধ্যাত্মিক সাধকদের জন্য গীতা। খুব উচ্চমানের আধ্যাত্মিক সাধক না হলে গীতা কি বলতে চাইছে কিছুই বুঝতে পারবেন না। ভাগবত হল তাঁদের জন্য, যাঁরা পরাভক্তির অবস্থায় পৌঁছে গেছেন। গোপী ও শ্রীরাধার মত আমরা ভগবানকে ভালোবাসতে পারবো না ঠিকই, কিন্তু ভক্তির এই গুণগুলো থাকতে হবে, তুমি আমাকে ভালোবাসো আর নাই বাসো আমি তোমাকে ভালোবেসে যাবো, তুমি ছাড়া আমার আর কিছু নেই।

এক রাজার এক দেহরক্ষীর দরকার ছিল। রাজার দেহরক্ষীর কার্যে নিযুক্ত হওয়ার জন্য বিভিন্ন জায়গা থেকে অনেকে এসেছে। তাদের পরীক্ষা দিতে হবে। পরীক্ষা হতে হতে শেষ পর্যন্ত দুজন থেকে গেল, দেখা গেল সব ক্ষেত্রে এই দুজন সমান দক্ষ। কিন্তু এদের মধ্যে একজনকে বাদ দিতে হবে। কী ভাবে বাদ দেওয়া যাবে? আবার পরীক্ষা শুরু করতে গিয়ে একজনকে প্রশ্ন করা হল রাজাকে যদি কেউ বন্দী করে তখন কি করবে? সে উত্তর দিল, আমি সব সৈন্য নিয়ে আক্রমণ করে এদের তছনছ করে দেব। দ্বিতীয় জনকে প্রশ্ন করতে সে কিছুই উত্তর দিচ্ছিল না। উত্তর দেওয়ার জন্য কয়েক বার অনুরোধ করার পর দ্বিতীয়জন খুব গম্ভীর ভাবে বলছে 'আমার আর কিছুই করার থাকবে না'। 'কেন? কিছু করার থাকবে না'? 'কারণ আমি বেঁচে থাকতে রাজাকে কেউ বন্দী করতেই পারবে না, আমাকে মেরে ফেললেই রাজাকে বন্দী করতে পারবে, আমি মরে গেলে আমি আর কি করতে পারব'! ভালোবাসা মানে এটাই। আমি নিজেকে তোমার কাছে সঁপে দিয়েছি, এরপর তুমি আমার দিকে তাকাও আর নাই তাকাও তাতে আমার কি আসবে যাবে! এই তীব্র আবেগপ্রবণতা যদি না থাকে কোন দিন পরাভক্তির দিকে এগোতে পারবে না। আর পরাভক্তিতে না এগোলে, যেখানে মন-প্রাণ সব কিছু সমর্পিত না হবে, সব কিছু যদি কৃষ্ণময় না হয়ে যাচ্ছে তত দিন যতই শাস্ত্র শুনি, জপ-ধ্যান করি কিছুই হবে না। এখানে কৃষ্ণের জায়গায়, শিব নিয়ে আসুন, কি কালী নিয়ে আসুন, কি শ্রীরামকৃষ্ণকে নিয়ে আসুন একই জিনিষ হবে। এখানে ঘটনা বা কাহিনী কোন বড় কথা নয়, কিন্তু কাহিনীর ভেতর যে মূল আধ্যাত্মিক ভাব আছে সেটাই আসল শক্তি, এই আধ্যাত্মিক ভাবের উপরে শুধু একটা ঘটনার প্রলেপ দেওয়া হয়েছে। এনারা যে উপমাগুলো নিয়ে আসছেন সবই জাগতিক ভালোবাসা, প্রেমের, লম্পট চরিত্রের, বিষয়ীদের। কিন্তু এর ভেতরের ভাবকে বোঝা আমাদের পক্ষে খুব কঠিন। শ্রীরাধার চরিত্র না হয় কাল্পনিক মনে করতে পারি, কিন্তু মীরাবাঈয়ের জীবনের ঘটনাতো মানুষের চোখের সামনে রয়েছে। মীরাবাঈ বলছেন শ্রীকৃষ্ণের সাথে আমার বিবাহ হয়েছে, তিনিই আমার স্বামী। পরে বিয়ের পর নিজের স্বামীর দিকে একটি বারের জন্য ফিরেও তাকালেন না। তার জন্য তাঁর জীবনে কত কিছু হয়ে গেল, কিন্তু মীরাবাঈয়ের কাছে কোন ব্যাপারই নয়। আমরা বলতে পারি মীরাবাঈয়ের মাথা খারাপ ছিল, যাই বলি না কেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আমি একবার নিজেকে সমর্পিত করে দিয়েছে, আমি আর কারুর দিকে তাকাবো না, এই ভাব নিয়েই তিনি শ্রীকৃষ্ণকে প্রতি ক্ষণে ক্ষণে নতুন নতুন রূপে দেখছেন। এর উপমা কিসের সঙ্গে করছেন? কামাসক্ত পুরুষ যেমন নারীকে নতুন নতুন কল্পনা করতে থাকে।

ব্রহ্মা কর্তৃক গোবৎস ও গোপবালক হরণ

তখন শুকদেব বলছেন ***শৃণুষ্বাবহিতো রাজন্নপি গুহ্যং বদামি তে। ব্রূয়ুঃ স্নিগ্ধস্য শিষ্যস্য গুরবো গুহ্যমপ্যুত।।১০/১৩/৩।*** গুরু যে তাঁর সব শিষ্যকেই সমান ভালোবাসবেন, সবাইকে সব কথা অকাতরে বলবেন তা নয়, কিন্তু কখন সখন দেখা যায় গুরুর সাথে কোন বিশেষ শিষ্যের একটা অত্যন্ত মধুর সম্পর্ক তৈরী হয় যেখানে গুরু অত্যন্ত গুহ্য কিছু জিনিষ সেই শিষ্যকে পরিষ্কার করে বলে দেন। হে পরীক্ষিৎ! তুমি খুব ভালো করে শুনে রাখো, আমি তোমাকে একটি রহস্যময় এবং খুব গোপনীয় বিষয় বলছি। এবারে শুকদেব

এক বছরের রহস্যটা পরিষ্কার করে বলছেন। অঘাসুরকে বধ করার পর গরু বাছুর গুলিকে ঘাস খাওয়ার জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়েছে আর কিঞ্চিৎ দূরে যমুনা পুলিনে শ্রীকৃষ্ণ ও গোপ বালকরা এক জায়গায় জড়ো হয়ে খাওয়া-দাওয়া করছেন। শ্রীকৃষ্ণ ও সবাই খাওয়া-দাওয়াতেই ব্যস্ত। বাছুর গুলো ঘাস খেতে খেতে জঙ্গলের দিকে চলে গেছে। সেই সময় শ্রীকৃষ্ণ বলছেন 'তোমরা খাওয়া-দাওয়া করতে থাক, আমি গিয়ে দেখে আসছি বাছুরগুলো কোন দিকে গেছে'। এদিকে ব্রহ্মা এসে সব বাছুরগুলিকে চুরি করে এক পর্বতের গুহায় বন্দী করে রেখে দিয়েছেন। গোচারণ ভূমিতে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণ দেখছেন গাভীগুলো নিজেদের মত চড়ে বেড়াচ্ছে কিন্তু তাদের কোন বাছুরের চিহ্নই নেই। ওখানে বাছুরদের না দেখতে পেয়ে গোপ বালকদের কাছে ফিরে এসে দেখেন আরও বিষ্ময়কর কাণ্ড। গোপ বালকরাও সবাই উধাও। যতক্ষণে শ্রীকৃষ্ণ আর বলরাম গরু-বাছুরের খোঁজ করতে আড়ালে গেছেন, ব্রহ্মা ততক্ষণে সব গোপ বালকদেরও হরণ করে ঐ পর্বতের গুহায় বন্দী করে রেখে দিয়েছেন। বাছুর আর গোপবালকদের উধাও করে ব্রহ্মা নিজেও সেখান থেকে উধাও হয়ে গেলেন। তিনি নিজে যে দাঁড়িয়ে দেখবেন ভগবান এই ব্যাপারটা কীভাবে সামলান, সেটা আর দেখলেন না। ব্রহ্মার মনে একটাই অভিলাষ, ভগবানের নরলীলার অনেক লীলাইতো দেখলাম, এবার নররূপে এই লীলাটা কীভাবে তিনি সামাল দেন দেখি।

আত্মা বা ঈশ্বরই একমাত্র জ্ঞাতা

সমগ্র বন তন্ন তন্ন করে অনেক অনুসন্ধান করেও না দেখা মিলল বৎস, না দেখা গেল কোন বৎস-রক্ষক গোপবালকদের। শ্রীকৃষ্ণ তখন চিন্তা করতেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল যে ব্রহ্মাই এই অভাবনীয় কাণ্ডটি ঘটিয়েছেন ***ক্বাপ্যদৃষ্ট্বান্তর্বিপিনে বৎসান্ পালাংশ্চ বিশ্ববিৎ। সর্বং বিধিকৃতং কৃষ্ণঃ সহসাবজগাম হ।।১০/১৩/১৭।*** শ্রীকৃষ্ণ, তিনি হলেন সব কিছুর সর্বশেষ জ্ঞাতা। আমরা যখন কোন কিছু দেখি তখন মনে করছি চোখ দিয়ে দেখছি, কিন্তু আসলে মনই সব কিছু দেখে। কিন্তু আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে পাতঞ্জলী যোগসূত্রে বলছেন, আমাদের মন সেও কিন্তু কিছু দেখে না, আমাদের মস্তিষ্ক সেও কিছু দেখে না, কিন্তু এদের সবার পেছনে যিনি চৈতন্য পুরুষ রয়েছেন তিনিই সব কিছুর জ্ঞাতা, তিনিই সব কিছুকে ঠিক ঠিক বোধ করেন। বেদান্তেরও একই মত। বেদান্ত বলে আমাদের মন বুদ্ধি হল জড় পদার্থ, কোন চেতনাই তাদের নেই, আত্মাই একমাত্র চৈতন্যবান পুরুষ। আত্মা, ব্রহ্ম, ঈশ্বর, ভগবান সব এক। তাই শেষ জ্ঞাতা হলেন ভগবান। ভগবান ছাড়া কেউই জানার নেই, সেইজন্য আমরা যখন বলি ঠাকুরের ইচ্ছাতেই সব কিছু হয়, তখন এই অর্থেই বলা হয়। কারণ চৈতন্য পেছনে না থাকলে এই জগত চলবে না, তাঁর ইচ্ছাতেই সব কিছু চলছে, তাই তিনিই একমাত্র জ্ঞাতা। সেই জ্ঞাতাই এখন শ্রীকৃষ্ণ রূপে শরীর ধারণ করে বৃন্দাবনে লীলা করছেন। যিনি সর্বজ্ঞ তিনি একটু চিন্তা করতেই তাঁর এই সর্বজ্ঞতা শক্তির সাহায্যে মুহুর্তের মধ্যে বুঝে নিলেন এই অভাবনীয় কাণ্ডটি ব্রহ্মারই কীর্তি।

শ্রীকৃষ্ণের সম সংখ্যক গোপবালক ও গোবৎস হয়ে যাওয়া

শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গে সঙ্গে করলেন কি – ***ততঃ কৃষ্ণো মুদং কর্তুং তন্মাতৃণাং চ কস্য চ। উভয়ায়িতমাত্মানং চক্রে বিশ্বকৃদীশ্বরঃ।।১০/১৩/১৮।*** সৃষ্টির মূল কারণ ভগবান, সৃষ্টিকার্যে ব্রহ্মা শুধু যন্ত্র মাত্র। কারখানার মেশিনে কত কিছু তৈরী হচ্ছে। সেখান থেকে একটা গ্লাশ তৈরী হয়ে বেরিয়ে এল। বাচ্চারা বলবে মেশিন গ্লাশটা তৈরী করল। বাচ্চাদের থেকে যার একটু বুদ্ধি বেশী সে বলবে সুপারভাইজার মেশিনের সাহায্যে তৈরী করছে। কিন্তু এদের থেকেও যার বুদ্ধি অনেক উন্নত, সে জানে সুপারভাইজারের আগে একজন ইঞ্জিনিয়ার আছেন যাঁর মাথায় এই গ্লাশের ডিজাইনটা এসেছিল, আর এই ডিজাইনে গ্লাশ তৈরী করতে কি রকম মেশিন লাগবে সেটাও তিনিই ঠিক করে দিয়েছেন। আমরা বলছি বাবা-মা আমাদের জন্ম দিয়েছেন। যারা আরেকটু উন্নত তারা বলবে জীবাত্মা নিজের মত জন্ম গ্রহণ করছে। যারা আরও উন্নত তারা বলবে ব্রহ্মা সব কিছু সৃষ্টি করছেন। এদের থেকে উন্নত যারা, তারা বলবে ভগবান সৃষ্টি করেছেন। আমরা মনে করছি এই কথাগুলো আমাদের সব জানা, কিন্তু এই জানাটা আমাদের মুখের কথা। ঈশ্বর থেকেই সব কিছু সৃষ্টি হচ্ছে, ঠিক ঠিক এই

বোধ হওয়া খুব কঠিন। এই বোধ যাঁর হয়ে যাবে তিনি তো মুক্ত পুরুষ হয়ে গেলেন। আর ভগবান যদি এইভাবে সবাইকে মুক্ত পুরুষ করে দিতে শুরু করে দেন তাহলে তো তাঁর এই জগৎ সংসার আর চলবে না। তাই তিনি এই সংসার বোধটাও দিয়ে রেখেছেন। যে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে ভগবান সৃষ্টি করেছেন বলে বলছি, সেই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড তো আমরা দেখছি কিন্তু এই স্থূল জগতের পেছন সূক্ষ্ম জগৎ আছে, সূক্ষ্ম জগতের পেছনে কারণ জগৎ আছে তার উপর আবার কত রকমের লোক আছে যার ব্যাপারে আমাদের কোন ধারণাই নেই, কল্পনাও করতে পারবো না। সেই ভগবানের পক্ষে কটি বালক আর কটি বাছুর তৈরী করা কী আর এমন ব্যাপার!

জগতের যিনি কর্তা, যিনি সর্বশক্তিমান জগদীশ্বর তিনি এক নতুন আনন্দলীলা করবার জন্য গোবৎস্য ও গোপবালকদের মায়েদের এবং সেই সঙ্গে প্রজাপতি ব্রহ্মারও আনন্দ বিধানের জন্য তিনি নিজেই গোপবালক আর গোবৎস্য হয়ে গেলেন। যখন বিচার করে করে আমরা একটা শেষ অবস্থায় পৌঁছাব তখন দেখবো আত্মাই সব কিছু হয়েছেন আবার ভক্তি পথের শেষ ধাপে ভক্ত দেখেন ভগবানই সব কিছু হয়েছেন। কিন্তু এই জিনিষটা যতক্ষণ না শেষ অবস্থায় যাচ্ছে ততক্ষণ আমরা ধারণা করতে পারবো না, তাই ঈশ্বর বা আত্মাই যে সব কিছু হয়েছেন এই ব্যাপারটা বোঝাবার জন্য সহজ সরল একটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে বলছেন তিনি নিজেই গোপবালক আর বাছুর হয়ে গেলেন। এই কাহিনী শোনার পর আমাদের মনে একটা ধারণার সংস্কার তৈরী হতে সাহায্য করবে যে, এই সৃষ্টি ভগবান নিজেই হন।

এই কথা বলার পর পরের শ্লোকে শুকদেব খুব সুন্দর বলছেন – ***যাবদ্ বৎসপবৎসকাল্পকবপুর্যাবৎ করাঙ্ঘ্র্যাদিকং যাবদ্ যষ্টিবিষাণবেণুদলশিগ্ যাবদ্ বিভূষাম্বরম্। যাবচ্ছীলগুণাভিধাকৃতিবয়ো যাবদ্ বিহারাদিকং সর্বং বিষ্ণুময়ং গিরোঽঙ্গবদজঃ সর্বস্বরূপো বভৌ।।১০/১৩/১৯।*** ব্রহ্মা যাদের অপহরণ করেছিলেন সেই গোপবালক এবং গোবৎসরা যত সংখ্যায় ছিল, তাদের চেহারা যেমন ছোট বা বড় ছিল, তাদের হাত-পা প্রভৃতি অঙ্গ যেমনটি ছিল, তাদের হাতে যে বেত, শিঙ্গা, বাঁশি, পাতা, শিকা ছিল এবং তাদের শরীরে যেমন যেমন বস্ত্র অলঙ্কারাদি ছিল, এমনকি তাদের স্বভাব, গুণ, নাম, চেহারা, বয়স এবং আহার-বিহার পর্যন্ত যেমন যেমন ছিল, সেই সব কিছুই অবিকল নতুন সৃষ্টি হয়ে গেল। ভগবান নিজেই সব কিছুর রূপ ধারণ করে প্রকট হয়ে গেছেন, সমগ্র জগৎই বিষ্ণুময় বেদের এই বাণী *সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম* যেন মুর্ত রূপ ধারণ করল। সৃষ্টি কীভাবে হয় আর আধ্যাত্মিক তত্ত্বের শেষ যে কথা সেটাকে এই কাহিনীর মাধ্যমে উপস্থাপনা করা হচ্ছে।

বৃন্দাবনে গোবৎস ও গোপবালকদের আত্মস্বরূপ রূপে শ্রীকৃষ্ণের নতুন খেলা শুরু

তারপর বলছেন ***স্বয়মাত্মাঽঽত্মগোবৎসান্ প্রতিবার্যাত্মবৎসপৈঃ। ক্রীড়ন্নাত্মবিহারৈশ্চ সর্বাত্মা প্রাবিশদ্ ব্রজম্।।১০/১৩/২০।*** শ্রীকৃষ্ণ শাস্ত্রের বাণীকে মুর্ত রূপ করে দেখাচ্ছেন আমিই গোবৎস হয়েছি, আমিই গোপবালক হয়ছি। শ্রীকৃষ্ণ এবার নিজের আত্মস্বরূপ গোবৎস আর গোপবালকদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করে নিজেরই সাথে নানাপ্রকার খেলাধূলা করার পর দিনান্তে ব্রজে ফিরে এলেন। সব কিছু শ্রীকৃষ্ণ নিজেই হয়েছেন বলে গোবৎস আর গোপবালকদের মধ্যে তাঁর প্রকাশটা আরও বেশী হয়ে গেছে। যার ফলে ব্রজে এক নতুন খেলা শুরু হয়ে গেল।

যাদের ব্রহ্মা অপহরণ করে নিয়েছেন সেই গোপবালক আর বাছুর গুলোও তো ভগবানই আর এখন যে গোপবালক ও বাছুর হয়েছে সেটাও ভগবানই হয়েছেন। তাহলে তফাৎটা কোথায়? আসল নকল বুঝবো কি করে? একজন খুব হামবড়া লোক ছিল, সে প্রচুর বড় বড় কথা বলত। সেই লোকটি একদিন সবাইকে বলছে 'আমি সুন্দরবনে দেখে এলাম গাছ থেকে পাতা পড়ছে। সেই পাতা মাটিতে পড়লে বাঘ হয়ে যাচ্ছে আর জলে পড়লে সেই পাতা কুমির হয়ে যাচ্ছে'। সেখানে একজন বাঙালী জিজ্ঞেস করছে 'পাতার অর্দ্ধাংশ যদি জলে আর বাকিটা ডাঙায় পড়ে তখন কি হবে'? তখন হামবড়া লোকটি রেগে গিয়ে বলছে 'ভাগ্ শালা বাঙালীর বাচ্চা, বাঙালী গুলো সব জায়গায় শুধু গোলমাল পাকাবার জন্যই বসে থাকে'। আসলে এখানে একটা ভাব বা আদর্শকে আমাদের কাছে পৌঁছাবার জন্য এই ধরণের কাহিনীর আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। এরপর আমরা যদি নানান রকমের প্রশ্ন করতে থাকি, যেমন অঘাসুরের এত বড় মুখ যে তার নীচের অংশটা মাটিতে আর উপরের

অংশ আকাশে, তাহলে যে পাখিগুলো আকাশে উড়ে যাচ্ছিল তারা কোথায় যাচ্ছিল? সেইজন্য বারবার বলা হচ্ছে এগুলো কাহিনী, কাহিনীর মাধ্যমে একটা উচ্চ আধ্যাত্মিক সত্যকে আমাদের মনে ধারণা করানোর প্রয়াস করা হচ্ছে। সৃষ্টিতে ভগবানই সব কিছু হয়েছেন এটাই আধ্যাত্মিক সত্য কিন্তু যে কোন কারণেই হোক আমাদের দৃষ্টিতে তিনি সৃষ্টি ব্রহ্মাকে দিয়ে করিয়েছেন, জীবাত্মাকে আসতে হচ্ছে, মা-বাবাকেও এর মধ্যে যুক্ত থাকতে হয়, সেইজন্য আমাদের দৃষ্টিতে এত কিছু দেখাচ্ছে।

বলছেন ***তন্মাতরো বেণুরবত্বরোত্থিতা উত্থাপ্য দোর্ভিঃ পরিরভ্য নির্ভরম্। স্নেহস্নুতস্তন্যপয়ঃসুধাসবং মত্বা পরং ব্রহ্ম সুতানপায়য়ন্।।১০/১৩/২২।*** গোপবালকরা দিনের শেষে গোষ্ঠ থেকে ফিরে আসছে, মায়েরা যখন তাদের বংশধ্বনি শুনলেন তক্ষুণি দৌড়ে বাড়ির বাইরে এসে নিজের সন্তানদের বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরেছেন আর তাঁদের হৃদয় পুত্র স্নেহের প্রবল আবেগে এমন প্লাবিত হয়ে গেছে যে আপনা থেকেই তাঁদের স্তন্যসুধা ক্ষরিত হয়ে শুরু করে দিয়েছে, তাঁরা সন্তানদের সেই স্তন্য পান করাতে লাগলেন। এখানে কিন্তু পুত্রের প্রতি স্বাভাবিক ভালোবাসা থেকে এই স্নেহ উথলে উঠছে না, শ্রীকৃষ্ণ নিজেই সব কিছু হয়েছেন বলেই সন্তানের প্রতি তাঁদের মমত্ব বোধ সহস্রগুণ বর্ধিত হয়ে গেছে। কৃষ্ণ নামের অর্থই হল, সবাইকে যিনি নিজের দিকে আকর্ষণ করেন। এইভাবে প্রতিদিন দিনান্তে সেই গোপবালকদের রূপ ধারণ করে গোচারণ করে ভগবান গোপীদের কাছে ফিরে আসতেন আর নানান রকম বালসুলভ আচরণ করে মায়েদের আনন্দ দিতেন। মায়েরাও পুত্রস্নেহে বিভোর হয়ে কত যত্ন করে শরীরে তৈল মর্দন করে দিতেন, স্নান করাতেন, পরম স্নেহে ভোজন করাতেন আরও কত ভাবে যে নিজেদের বাৎসল্যতাকে উজাড় করে দিতেন ভাষায় বর্ণনা করা যাবে না।

গোগোপীনাং মাতৃতাস্মিন্ সর্বা স্নেহর্দ্ধিকাং বিনা। পুরোবদাস্বপি হরেস্তোকতা মায়য়া বিনা।।১০/১৩/২৫। এই গোপবালকদের সাথে যখন গোবৎসরা তাদের গোশালায় চলে এসেছে তখন সেখানেও এই একই অদ্ভুত কাণ্ড ঘটতে লাগল। *গোগোপিনাং মাতৃতাস্মিন সর্বা স্নেহার্দ্ধিকাং বিনা*, সন্তানরা যখন নিজের নিজের মায়ের কাছে গেছে, আর গোবৎসরা নিজের নিজের গাভীমাতার কাছে গেছে, তখন মায়েদের যে সহজ মাতৃভাব, সেই মাতৃভাব 'ঐশ্বর্য জ্ঞান রহিত' হয়ে আরও বিশুদ্ধ হয়ে উঠল। সন্তানের প্রতি মায়ের ভালোবাসা এমনিতেই শুদ্ধ ভালোবাসা। কিন্তু আশ্চর্যভাবে হঠাৎ দেখা যাচ্ছে *স্নেহার্দ্ধিকাং বিনা*, তাদের সন্তানের প্রতি যে স্নেহ ভালোবাসা আগে ছিল, সেই বাৎসল্যের ভালোবাসাটা তার থেকে অনেক গুণ বেড়ে গেছে। মায়েদের এই যে ভালোবাসা এটাকে ভাগবত বলছে 'ঐশ্বর্য জ্ঞান রহিত', তাঁদের যে কোন জ্ঞান এসে গেছে, তাঁরা যে কোন বুদ্ধিসম্পন্ন হয়ে গেছেন, তা নয়, এই শিশু বালকরা, বাছুরগুলি যে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ এটাও তাঁরা বুঝতে পারছেন না, কিন্তু অজান্তে তাঁদের সন্তানদের প্রতি স্নেহ ভালোবাসাটা যেন অনেক গুণ বর্দ্ধিত হয়ে গেছে। আমাদের ভালোবাসা যতক্ষণ আধ্যাত্মিক স্তরে উন্নীত না হয় ততক্ষণ সেই ভালোবাসা ঠিক ঠিক ভালোবাসা হয় না।

আগেকার দিনে বিয়ের পর যখন স্বামী স্ত্রী দাম্পত্য জীবন শুরু করতেন তখন তাঁদের পরস্পরের ভালোবাসার আধার কিন্তু সব সময় আধ্যাত্মিকতায় আশ্রিত থাকত। আমরা এক অপরের সাহায্য নিয়ে আধ্যাত্মিক জীবনে এগিয়ে যাব, এই ভাব যদি দাম্পত্য জীবনে না থাকে তাহলে কদিন পরেই বিবাহিত জীবনে পরস্পরের মধ্যে মনোমালিন্য, অশান্তি শুরু হতে বেশী দেরী হবে না, হতে বাধ্য। যেমন আমরা নিজের গুরুর সঙ্গে ঝগড়া বা কথা কাটাকাটি করতে যাই না, ঠিক তেমনি যদি কোন স্বামী-স্ত্রী মনে করেন আমাদের দাম্পত্য জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হল আমরা এক অপরের সাহায্য নিয়ে আধ্যাত্মিক জীবনে এগোব, তখন কোন স্বামী নিজের স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করবে না বা কোন স্ত্রীও স্বামীর সাথে কলহে নামবে না। আমরা সবাই নিজেদের শরীরের প্রতি, শরীরের যত্ন নিতেই ব্যস্ত, কারণ আমরা জানি আমার যা কিছু হবে এই শরীর দিয়েই হবে, ভোগ এই শরীর দিয়ে হবে, কাজকর্ম এই শরীর দিয়ে হবে, জপ-ধ্যান এই শরীর দিয়েই হবে। আমরা জানি এটাই সেই নৌকা যার দ্বারা আমাকে এই ভবনদী পার হতে হবে, এই নৌকা যাতে ফুটো না হয়ে যায়। যার কাছে আধ্যাত্মিক জীবনটাই উদ্দেশ্য, আর আমার স্বামী বা স্ত্রীই আমার ভরসা, এই মনোভাব থাকলে

পরস্পরের প্রতি ভালোবাসাটাই অন্য রকম হয়ে যাবে। স্বামী-স্ত্রীর ভালোবাসা এই আদর্শের উপর দাঁড়িয়েই দাম্পত্য জীবনকে সুদৃঢ় করে। এখানে গোপীদের ক্ষেত্রেও ঠিক একই জিনিষ হয়েছে। আগে নিজের সন্তানদের প্রতি ভালোবাসায় আধ্যাত্মিকতার একটা প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত হচ্ছিল। কিন্তু এখন আর প্রতিফলন নেই এখন বাস্তবিক ছবিটাই এসে গেছে। গয়নার ছবি দেখা আর গয়নাকে হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখা, এই দুটো প্রতিক্রিয়া সব সময় আলাদা হবে। আমি যাকে ভালোবাসি তার ছবি দেখতে ভালোবাসি, কিন্তু সেই ভালোবাসার লোকই যদি সামনে এসে যায় তখন ভালোবাসা পুরো অন্য রকম হয়ে যাবে। গোপীরা সন্তানের মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণকেই ভালোবাসতেন, এখন শ্রীকৃষ্ণ নিজেই সন্তান হয়ে এসেছেন। শ্রীকৃষ্ণ কয়েক ধাপ নীচে নেমে নেমে সন্তান হয়ে আসেন আর এখানে তিনি সরাসরি এসে গেছেন, দুটো ভালোবাসাতে তফাৎ তো হবেই।

ব্রজৌকসাং স্বতোকেষু স্নেহবল্ল্যাব্দমন্বহম্। শনৈর্নিঃসীম ববৃধে যথা কৃষ্ণে ত্বপূর্ববৎ।।১০/১৩/২৬।

এই যে এক বৎসর পর্যন্ত দিনে দিনে নিজের সন্তানদের প্রতি ভালোবাসা বাড়ছিল, এমন কি আগে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যে ভালোবাসা ছিল এখন সেই ভালোবাসাটা তাঁদের নিজের সন্তানদের প্রতি এসে গেছে। এর আগে গোপীরা নন্দবাবার গৃহে নানা অছিলায় ছুটে ছুটে যেতেন শুধু একটি বারের মত শ্রীকৃষ্ণকে দেখার জন্য। এবার তাঁরা সবাই নন্দগৃহে আসা বন্ধ করে দিয়েছেন। কারণ সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণই এখন তাঁদের গৃহে অবস্থান করছেন। যাঁদের বাড়ির বালকদের ব্রহ্মা অপহরণ করে নিয়েছেন, তাঁদের বাড়ির সেই অপহৃত বাচ্চাদের রূপ পরিগ্রহ করে সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণই এখন গোপীদের বাড়িতে অবস্থান করছেন। গোপীরা শ্রীকৃষ্ণকেই ভালোবাসতেন, এখন তাঁরা নিজেরাও বুঝতে পারছেন না কেন তাঁদের সন্তানদের প্রতি এত অপত্য স্নেহ উথলে উঠছে। তাঁরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছেন, হ্যাঁগো এখন আর শ্রীকৃষ্ণকে দেখার ইচ্ছে হয় না কেন!

ঠিক তেমনি গাভীরাও নিজেদের বৎসদের সাঙ্ঘাতিক ভালোবাসতে শুরু করেছে। সমস্ত গাভীরা, গোবৎসরা আগে শ্রীকৃষ্ণের জন্য ছটফট করত, তাদের সেই ছটফটানিটাও এখন বন্ধ হয়ে গেছে। এমনকি এখন দেখা যাচ্ছে সায়াহ্নে যখন গোবৎসরা গৃহে প্রত্যাবর্তন করছে সব গোয়ালিনীরা তাদের জন্য উন্মুখ হয়ে অপেক্ষা করতে শুরু করেছেন, মানে গোপীরাও বাছুরগুলোকে প্রচণ্ড ভালোবাসতে শুরু করেছেন, কারণ সবই তো স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ নিজে রূপ পরিগ্রহ করে আছেন। সংসারী জীবের ধর্ম হল তারা আরও ভালোবাসার কোন জিনিষ যদি পেয়ে যায় তখন আগেরটার প্রতি তাদের আগের টানটা, ভালোবাসাটা কমে যায়। ঠাকুর একজনকে বলছেন – কিগো! আগে অনেক আসতে এখন আগের মত এখানে আসো না কেন? নিশ্চয়ই পরিবারের প্রতি বেশী ভালোবাসা হয়েছে। গোপীদের ও গাভীদের মধ্যে মাতৃস্নেহ আগেও ছিল কিন্তু আগে তাদের সন্তানদের প্রতি যে ভালোবাসা ছিল সেই তুলনায় এখন ভালোবাসা অনেক গুণ বেড়ে গেছে। তার একটাই কারণ স্বয়ং ভগবান এখন তাদের সন্তান রূপ ধারণ করেছেন। ভগবানের প্রতি ভালোবাসা কি রকম হতে পারে বোঝাবার জন্যই এই ভাবটা দেখানো হয়েছে।

এক বছর হতে পাঁচ ছয় দিন বাকি আছে। সেই সময় একদিন বলরামকে সঙ্গে নিয়ে শ্রীকৃষ্ণ বাছুরদের চরাতে চরাতে জঙ্গলের অনেক ভেতরে প্রবেশ করে গেছেন। অন্য দিকে গোবর্ধন পাহাড়ের উপর গাভীরা তৃণ ভক্ষণ করতে করতে নীচে বাছুরগুলোর দিকে নজর চলে গেছে। বাছুরদের প্রতি নজর পড়তেই গাভীরা উঁচু পাহাড় থেকে এমন তীব্র বেগে নীচের দিকে নামতে শুরু করেছে যে তাদের পালকরা কিছুতেই গাভীদের সামলে রাখতে পারছিল না। গাভীদের স্তন থেকে দুধ স্বতই উৎসারিত হয়ে যাচ্ছিল। এটাই দেখাচ্ছেন যে, গাভীরাও শ্রীকৃষ্ণকে এমন ভালোবেসেছিল যে শ্রীকৃষ্ণই এখন স্বয়ং বাছুর রূপে আছেন বলে তাদের গতি কেউ থামাতে পারছিল না। এগুলো হল কাব্যিক বর্ণনা। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের দিকে দৃষ্টিপাত করলে সেখানেও এই জিনিষেরই পুনরাবৃত্তি দেখতে পাবো। যাঁরা শ্রীরামকৃষ্ণকে ভালোবাসতেন তাঁদের সেই ভালোবাসা কী গভীর ভালোবাসা ছিল কল্পনাই করা যায় না। আমরা বলতে পারি কলকাতার সব লোক তো ঠাকুরকে ভালোবাসতেন না, তাহলে তিনি আর কিসের অবতার হলেন। তাহলে তো বলতে হয় কংস আর তার দলের লোকেরাও তো

কেউই শ্রীকৃষ্ণকে ভালোবাসত না। অবতার বলেই যে সবাই তাঁকে ভালোবাসবে তা নয়, ভেতরে যদি আধ্যাত্মিক ভাব না থাকে তাহলে অবতারকে ভালোবাসতে পারবে না।

শ্রীকৃষ্ণের এই লীলার ব্যাপারটা বলরাম কিন্তু জানতেন না। সব ব্যাপার স্যাপার দেখে বলরামের মনে একটা সন্দেহ দানা বেঁধেছে। বলছেন ***কিমেতদ্ভুতমিব বাসুদেবেহখিলাত্মনি। ব্রজস্য সাত্মনস্তোকেষ্বপূর্বং প্রেম বর্ধতে।।১০/১৩/৩৬।*** কি অদ্ভুত ব্যাপার! শ্রীকৃষ্ণ হলেন স্বয়ং ভগবান, যারা আমাকে আর শ্রীকৃষ্ণকে এত দিন যে গভীর ভাবে ভালোবাসত, তাদের সেই ভালোবাসা এখন জাগতিক জিনিষের প্রতি কি করে চলে যাচ্ছে! আমাদের দুজনের প্রতি যে ভালোবাসা এখন সেটা ব্রজবালক আর গোবৎসদের প্রতি চলে গেছে এবং তা যেন দিন দিন বেড়েই চলেছে। ***কেয়ং বা কুত আয়াতা দৈবী বা নার্যুতাসুরী। প্রায়ো মায়াস্তু মে ভর্তুর্নান্যা মেহপি বিমোহিনী।।১০/১৩/৩৭।*** এটা কি কোন দেবতা, মানুষ বা অসুরের মায়া? কিন্তু তা কি করে সম্ভব হবে! নিশ্চয়ই আমার প্রভুরই মায়া। কারণ ভগবানের মায়া ছাড়া এমন কোন মায়ার শক্তি নেই যে আমাকে বোকা বানাবে। এই রকম চিন্তা করতে করতে বলরাম জ্ঞানদৃষ্টি অবলম্বন করতেই তাঁর কাছে সব কিছু স্পষ্ট হয়ে গেল। আরে এই ব্যাপার, শ্রীকৃষ্ণ নিজেই সব কিছু হয়েছেন। আসলে শ্রীকৃষ্ণ বলরামের রূপ ধরেননি, বলরাম বলরামই আছেন, বলরাম ছাড়া বাকি সব কিছু ব্রজবালক, বাছুর শ্রীকৃষ্ণ নিজেই হয়েছেন। বলরাম তখন শ্রীকৃষ্ণকে বলছেন 'কি ব্যাপার বলুন তো! আমি দেখছি আপনিই এই গোপবালক, বাছুর সব কিছু হয়েছেন। আপনি কেন হঠাৎ এই সব রূপ ধারণ করতে গেলেন, এর রহস্যটা কি আমাকে পরিষ্কার করে বলুন'। শ্রীকৃষ্ণ বলরামের মনের সন্দেহ দূর করতে ব্রহ্মার সব কীর্তির কথা প্রকাশ করে দিলেন এবং বলরামও পুরো ব্যাপারটা অবগত হয়ে গেলেন।

ব্রহ্মের মোহ নাশ লীলার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য

জগতে যা কিছু আছে ভগবান নিজেই সব হয়েছেন, এই তত্ত্ব মানুষকে বোঝাবার জন্য ভাগবত ব্রহ্মার মোহভঙ্গের লীলাকে মাধ্যম করেছে। ভগবান যখন নিজেই নররূপ ধারণ করেন তখন তো আর কোন কথাই থাকে না। ভগবানই সব কিছু হয়েছেন মেনে নিলে ইসলাম ধর্মে আর খ্রীশ্চান ধর্মে অনেক সমস্যার উদ্ভব হবে। এই তত্ত্বকে পুরোপুরি মেনে নিতে অনেক হিন্দুদের কাছেও সমস্যা হবে, কিন্তু আমাদের ঋষিরা কায়দা করে পৌরাণিক কাহিনীতে নিয়ে গিয়ে তত্ত্বটিকে সাধারণ মানুষের সামনে তুলে ধরছেন। এই কাহিনী শোনার পর কেউ একে একটা আখ্যায়িকা মনে করলেও তার অবচেতন মনের গভীরে তত্ত্বটা কাজ করতে শুরু করতে থাকবে, কেউ বলবে এটাই ঠিক। এখন সমস্যা হল ভগবান কি হতে পারেন আর কি হতে পারেন না। বলছেন – ভগবান সবই হতে পারেন। কিন্তু ভগবানের সবই হওয়ার কথা নয়। খ্রীশ্চান ধর্ম একটা সময় বলতে শুরু করল – A God who is not rational is no God, যে ভগবান যুক্তি দিয়ে চলেন না সে ভগবান ভগবান নয়। খ্রীশ্চান ধর্ম অনেক দিন আগেই বলে দিয়েছিল, ভগবান যুক্তি ও অযুক্তির পারে। উপনিষদও একই কথা বলে। কিন্তু যখন যুক্তিবাদী চিন্তাধারা ইংল্যাণ্ড আর ফ্রান্সে প্রভাব বিস্তার করতে শুরু হল তখন এরাই আবার বলতে আরম্ভ করল ভগবান অযৌক্তিক হতে পারেন না। কেননা যুক্তিবাদীদের যুক্তির সামনে দাঁড়িয়ে থাকার মত আমাদের ঋষিদের যে তপস্যা আর মেধা শক্তি ছিল পাশ্চাত্যের ধর্মীয় নেতাদের মধ্যে সেই তপঃশক্তি ছিল না। যুক্তিবাদীরা বলছে – তুমি বলছ ভগবান সর্বশক্তিমান, তা তোমার ভগবান এমন কোন ভারী পাথর বানাতে পারবেন কি যেটা ভগবান তুলতে পারবেন না? ঈশ্বর যদি সর্বশক্তিমান হন তাহলে বলতে হবে হ্যাঁ তিনি পারবেন। কোন পাথরটা? যেটা তিনি নিজে তুলতে পারবেন না। তাহলে তো বিপরীত হয়ে গেল। তুলতে যদি না পারেন তাহলে তিনি তো আর সর্বশক্তিমান থাকলেন না। আর যদি তিনি তুলতে পারবেন এমন পাথর যদি না বানাতে পারেন তাহলেও তিনি সর্বশক্তিমান হলেন না। যুক্তিবাদীদের এই সব উদ্ভট যুক্তির সামনে খ্রীশ্চান ধর্ম মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে। আজ পর্যন্ত ওদের কাছে এর উত্তর নেই। উত্তর নেই কেন? কারণ ধর্মের আদর্শ, দর্শন যেটা থাকা উচিৎ ছিলো আধ্যাত্মিক উপলব্ধি সম্পন্ন পুরুষদের হাতে, সেটা তাঁদের হাতে না থেকে চলে গেল কিছু বুদ্ধিজীবিদের কাছে। বুদ্ধিজীবি আর ক্ষমতাবান লোকেদের হাতে

যখন কোন ধর্ম চলে যায়, সেই ধর্মের মূল আদর্শটাই তখন নষ্ট হয়ে যায়। হিন্দু ধর্মের দর্শন আর আদর্শকে ধরে রেখেছেন সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীরা। হিন্দু ধর্মেও অনেক সমস্যা আছে, কিন্তু হিন্দু ধর্ম কোন কিছুকেই উড়িয়ে দেয় না। গিন্নীরা যেমন বাড়ির কোন কিছুই ফেলতে চায় না, দড়ি দিয়ে বাঁধা একটা প্যাকেট বাড়িতে এসেছে, সেই দড়িটাকেও ওরা গুছিয়ে রেখে দেবে, পুরুষরা সব ডাস্টবিনে ফেলে দেবে। হিন্দু ধর্ম ঠিক বাড়ির গিন্নীদের মত, সব কিছুকে যত্ন করে রেখে দেয়। অন্যান্য ধর্ম সব ছুঁড়ে ফেলে দেয় বলে তাদের অনেক সমস্যার মধ্যে পড়তে হয়।

এখানে বলছেন – ভগবান কি হতে পারেন আর কি হতে পারেন না। হিন্দু ধর্ম বলছে ভগবান ছাড়া আর কিছু নেই। ঠাকুর খুব সুন্দর ভাবে বলছেন – একজন বৈকুন্ঠ ধামে গিয়েছিলেন, ফিরে আসার পর তাঁকে দুই বন্ধু জিজ্ঞেস করছে – ভগবান কি করছেন দেখে এলে? বলছেন দেখে এলাম ভগবান ছুঁচের ফুটোর মধ্যে দিয়ে হাতি উট এই সব পার করাচ্ছিলেন। যে কেউ শুনলে বলবে আজগুবি গপ্পো। একজন বন্ধু বললে – তা কি কখন সম্ভব! তুমি নিশ্চয়ই মিথ্যা কথা বলছ, আদপেই হয়তো তুমি বৈকুণ্ঠে যাওনি। আরেক বন্ধু বলছে – ভগবান সব পারেন। ঠাকুর আসলে বলতে চাইছেন ঈশ্বরের কার্যকে তুমি তোমার বুদ্ধি দিয়ে বিচার করতে যেও না। বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে কোন দিন ঈশ্বরীয় তত্ত্ব ধারণা করা যাবে না। আপনি এখন হিসেব করতে বসে যাবেন – ছুঁচটা কত বড় ছিল, তার ছেঁদা কত বড় ছিল, হাতি, ঘোড়াগুলো কি রকম সাইজের ছিল। এভাবে আমরা যতই হিসাব করতে থাকি না কেন কোন দিন ঈশ্বরের কোন কিছুই মেলাতে পারব না। কেন পারবো না? কারণ আমাদের মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় সব সীমিত। একটা সসীম বস্তু দিয়ে অসীমকে কখনই মাপা যাবে না। তাই এর বেশী তুমি বোঝবার চেষ্টা করো না।

যে কাহিনীটা ভাগবত এখানে নিয়ে এসেছে, এখানে এটাই বলতে চাইছেন – ব্রহ্মা নিজেই ভগবানের আদেশে সৃষ্টি করেছেন। সেই ব্রহ্মা এখন সব গোপবালক আর গোবৎসদের হরণ করে সরিয়ে দিয়েছেন। ব্রহ্মার কারসাজি বুঝে ফেলতেই শ্রীকৃষ্ণ অবিকল ঠিক আগের মতই সব গোপবালক আর গোবৎসের মত রূপ ধারণ করে নিলেন। সম্পূর্ণ আলাদা ভাবে সৃষ্টি করেছেন বলে আসল নকলের মত এদের মধ্যে যে কোন পার্থক্য থাকবে, তা কিন্তু হয়নি। সবার যে শীল, স্বভাব, গুণ, চেহারা, তাদের যে খাওয়া দাওয়ার অভ্যাস, তাদের চলা ফেরার কায়দা, সব কিছু অবিকল আগের মতই থেকে গেছে। আর এরা সবাই কি হয়েছে? ভগবান নিজেই এই সব হলেন – *সর্বং বিষ্ণুময়ং*। সব কিছু সাক্ষাৎ বিষ্ণুই হয়েছেন।

ঠাকুর বলছেন — কোন পিঠের ভেতর ক্ষীরের পুর থাকে কোনটাতে কলাইয়ের পুর থাকে। আমাদের মত সাধারণ লোকের পক্ষে এই পার্থক্যটা ধরা অসম্ভব। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ করেছেন বলেই এটা সম্ভব হয়েছে, শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া অবিকল একই জিনিষ আর কারুর পক্ষে তৈরী করা সম্ভব নয়, একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই পারেন, কারণ তিনি ভগবান। যদি বলি তিনি ব্রহ্মা থেকেও ভালো সৃষ্টি করতে পারেন তাহলেও আবার ধরা পড়ে যাবে। আপনি আমি যদি একই জিনিষ দুবার করে তৈরী করি তাহলে আমাদের দুটো সৃষ্টির মধ্যে একটু না একটু তফাৎ থাকবেই। কিন্তু ভগবান যখন একই জিনিষ সৃষ্টি করবেন তিনি ঠিক সেই রকমটিই করবেন যে রকমটি আগে ছিল। দোকান থেকে দুটো সাদা টেনিস বল কেনার পর দুটোর মধ্যে কোন পার্থক্য করা যায় না। এটাই ভগবানের বৈশিষ্ট্য, তিনি সৃষ্টি করেন। কোথা থেকে সৃষ্টি করেন? শুধু চিন্তা মাত্রই তিনি সৃষ্টি করেন — 'এটা হোক' মনে ভাবা মাত্রই সৃষ্টি হয়ে গেল। ধ্যানের বিষয়ের জন্য বা গভীর চিন্তনের জন্য ভাগবতের এই জায়গাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ।

কোন শারীরিক ক্রিয়া নেই, শুধু চিন্তাতেই সৃষ্টি হয়ে যায়। আর এটা কোন নতুন সৃষ্টি নয়। এখানে পুরনো সৃষ্টির উপরেই কাজ করা হয়েছে। এখনকার দিনে পুরনো জিনিষকে সারিয়ে নেওয়ার মিস্ত্রি পাওয়া মুশকিল। এটাও একটা শিল্প। কিন্তু খুব কষ্টসাধ্য। দোকানে পুরনো জিনিষ সারাতে গেলে বলবে নতুন জিনিষ নিয়ে নিন। ভগবান ঠিক তাই করেন, তিনি যেটা সৃষ্টি করেন সেটা আগে থাকতেই ছিল, পুরনো জিনিষকেই

তিনি সৃষ্টি করেন, আর অবিকল সেটাই যেটা আগে ছিল। এটাই ঈশ্বরের শক্তি। ব্রহ্মাকে যদি বলেন – এখান থেকে চারটে জিনিষ হারিয়ে গেছে, আপনি সেই চারটে জিনিষকেই সৃষ্টি করে দিন, ব্রহ্মা পারবেন না।

একটা মত আছে যেখানে বলে – there is nothing objective, এখানে এই জলের বোতলটা আছে, এটাকে আমরা বলছি দ্বিতীয়া। কর্তা, করণ ও কর্ম যেটাকে বলছি, ইংরাজীতে বলে object, আর আমি কর্তা, ইংরাজীতে বলা হয় subject। বোতলের একটা objective reality আছে, মানে বোতলটা বাস্তবিকই আছে। কিন্তু যখন স্বপ্নের মধ্যে কিছু কর্ম করা হয় তখন সেখানে কোন objective reality থাকে না, কিংবা যখন কোন চিন্তা করছে তখন তারও কোন objective reality থাকে না। এখন যদি বেদান্ত মতে আসা যায় তাহলে প্রশ্ন আসে দুটো জিনিষের কি কখন objective reality থাকতে পারে? যারা ঘোর বেদান্তী তারা এটাকে মানবেন না। এই শ্লোকটা কিন্তু বেদান্ত মতের বিরুদ্ধে গিয়ে objective realityকেই দেখাচ্ছে। যখন শ্রীরামকৃষ্ণ মা ভবতারিণীর পূজা করছেন, সাধনা করছেন, তখন দক্ষিণেশ্বরের অনেকেই লক্ষ্য করেছিলেন, এমনকি রানী রাসমনিও মথুর বাবুকে বলছেন যে প্রতিমা যেন জ্বলজ্বল করছে, মায়ের প্রতিমার প্রতি সবারই আকর্ষণ যেন বেড়ে গেছে। লীলাপ্রসঙ্গে এর খুব সুন্দর বর্ণনা আছে। মথুর বাবুকে রানী রাসমনি বলছেন 'দ্যাখো, মা এই প্রতিমাতে আবির্ভূতা হয়েছেন'। আবির্ভূতা হওয়ার অর্থটা কি? মানে দক্ষিণেশ্বরে মা ভবতারিণীর প্রতিমা আছে, এখন এই প্রতিমাতে মা আবির্ভূতা হয়েছেন। এখানে পার্থক্যটা বোঝা যাচ্ছে। এখানে কিন্তু কোন subjective change আসেনি, এটাই objective change। Objective change এসে যায় বলে যারা মন্দিরে প্রতিমা দর্শন করতে যাচ্ছেন তাঁদের মনের মধ্যেও মা ভবতারিণী ছাপ ফেলে দিচ্ছে। যারা জানেনা যে আগে এখানে যে মুর্তিটা আছে আগে এই মুর্তি অন্য রকম ছিল এখন অন্য রকম হয়েছে, তাদের মনের মধ্যেও একটা অন্য রকমের অনুভূতি হবে। বেলুড় মঠে ঠাকুরকে অন্যান্য জায়গা থেকে অন্য রকম মনে হয় কেন? এখানেও সেই objective change। তাই বলে কি দু'হাজার বছর পরেও একই রকম থাকবে? নাও থাকতে পারে। কলকাতার মল্লিকদের বাড়িতে ঠাকুর সিংহবাহিনীর দর্শন করতে গেছেন, সেখানে ঠাকুর দেখছেন চারিদিকে সব শ্রীহীন কিন্তু তারই মাঝখানে প্রতিমা যেন জ্বলজ্বল করছে। এটা কেন হয়, কীভাবে হয় আমরা বুঝতেও পারব না, ব্যাখ্যাও করতে পারব না। যখন যুক্তি তর্কের ব্যাপার আসবে তখন বলবে – we will decide either there is objective reality or there is not, it does not matter। হিন্দু ধর্মের তাই কোন সমস্যা হয় না। তোমার মনের যেমন ভাব তুমি সেই রকমই দেখবে।

কিন্তু এখানে কি হচ্ছে? ব্রহ্মা যে জিনিষটা সৃষ্টি করেছেন সেটার প্রতি আমাদের যে আকর্ষণটা হবে সেটা অন্য রকম হবে কিন্তু যখন ওই জিনিষটাই ভগবানের সৃষ্টি হবে তখন তার প্রতি আকর্ষণ অনেক গুণ বেশী হয়ে যাবে। কিন্তু ভগবানতো সৃষ্টি করেন না, কারণ ভগবানের বাইরে তো কিছু নেই, সুতরাং ঈশ্বর যেটা সৃষ্টি করবেন সেটা তাঁকে নিজেকেই হতে হবে। তাই তিনি যে গোপবালক আর গোবৎস্য সৃষ্টি করলেন এগুলো সব তিনি নিজেই হলেন। যেমন পিঠে হয়, পিঠের মধ্যে আমি ক্ষিরের পুর দিয়েছি, এটা একটা দিক, আরেকটা হল ক্ষিরটাকেই আমি পিঠের আকৃতি দিয়ে দিলাম, তখন সবটাই ক্ষির হয়ে গেছে। এই হচ্ছে পার্থক্য। মানুষের ভিতর ঈশ্বর আছেন আর ঈশ্বরই মানুষের আকৃতি নিয়েছেন। দুটো ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া আলাদা হবে।

শ্রীকৃষ্ণ এখানে ঠিক তাই করলেন। গোপবালক আর গোবৎসদের ঠিক অবিকল তাদের আগে সেই আকৃতি আর গুণে সৃষ্টি করলেন – '*যাবচ্ছীলগুণাভিধাকৃতিবয়ো*' তাদের আগে যা শীল, গুণ ছিল সব সমান ভাবেই আছে। আগে তাদের ভেতর ভগবান ছিলেন, এবার ভগবান নিজেই সব হয়ে গেছেন। এক বোকা জামাই ছিল, বেশী কথাবার্তা বলতে পারতো না। শ্বশুড় বাড়ি গেছে, যাওয়ার আগে বাবা মা বলে দিয়েছে যাতে সবার সাথে একটু আধুটু কথা বলে। কথা বলতে বলে দিয়েছে, তাই শ্বশুড় বাড়ি গিয়ে শ্বশুড়কেই গিয়ে জিজ্ঞেস করছে 'শ্বশুড় মশাই, আপনার বিয়ে হয়েছে'? খাওয়ার পর জামাইকে পায়েস খেতে দিয়েছে। এতদিন বাড়িতে ভাতের মাড়ের সাথে চিনি মিশিয়ে পায়েস বলে তাকে খেতে দেওয়া হত। শ্বশুড় বাড়ীতেও পায়েস দিয়েছে দেখে জামাই বলছে 'না না, আমাকে মাড় ভাত দেবেন না'। শাশুড়ী জোরাজুরি করতে গিয়ে

পায়েসের দু-এক ফোঁটা জামাইর পাতে পড়ে গেছে। যখন চেটে দেখেছে তখন বুঝতে পেরেছে যে এটা মাড় ভাত নয় এটা অন্য জিনিষ। আসল পায়েসের স্বাদ পেয়ে বোকা জামাইয়ের মাথা গেছে ঘুরে, আবার লজ্জায় চাইতেও পারছে না। যাই হোক, রাত্রে বাড়ির সবাই ঘুমিয়ে পড়ার পর জামাই বাবাজী চুপি চুপি রান্না ঘরে গেছে। সেখানে গিয়ে দেখে কিছু নেই, হাড়িটা শুধু পরে আছে, আর তার গায়ে পায়েসের কিছু কাই লেগে রয়েছে। জামাই হাড়িতে মুখ ঢুকিয়ে সেটাকেই চাটতে শুরু করেছে। রান্নাঘরে বাসনের আওয়াজে বাড়ির লোকের ঘুম ভেঙ্গে গেছে, ভেবেছে রান্না ঘরে কুকুর ঢুকেছে। শ্বশুড় মশাই লাঠি নিয়ে রান্না ঘরে এসে দেখছে জামাই বাবাজী পায়েসের হাড়ির মধ্যে মুখ ঢুকিয়ে হাড়িটাকে চাটছে। যদিও এটা হাসির গল্প কিন্তু এখানে মাড় ভাতকে পায়েস মনে করে খেত কিন্তু এখন পুরোটাই পায়েস, দুটোর স্বাদ পুরো আলাদা, এই স্বাদটা জামাই কোন দিন পায়নি, আজ পেয়ে সে লুকিয়ে খেতে এসেছে। ঠিক সেই রকম এত দিন মায়েরা তাদের যে সন্তানকে ভালোবাসতো সেই সন্তানদের শরীর ধারণ করেছেন স্বয়ং, মায়েরা সেটা নিজেরাও জানে না, কিন্তু মায়েদের সন্তানদের প্রতি আগের স্নেহ ভালোবাসাটা গুণগত ভবে পুরোপুরি পাল্টে গেছে।

কিন্তু সবচেয়ে বাজে ব্যাপার যেটা হল, যে গোপীরা সারাদিন যশোদার বাড়িতে নানা অছিলায় ছুটে যেতেন, কিংবা নন্দবাবার গৃহের আশেপাশে যাঁর জন্য ঘুরঘুর করতেন, তাঁরা যশোদার বাড়িতে যাওয়াই বন্ধ করে দিলেন। আমরা মনে করি ভক্তি কোন যুক্তি তর্কের ধার ধারেনা, কিন্তু ভক্তি প্রচণ্ড যুক্তিবাদী হয়। গোপীদের বাড়িতেই যদি ভগবান থাকেন, গোপীরা অপরের বাড়িতে যাবেন কেন! ভগবানই এখন তাদের সন্তান হয়ে গোপীদের বাড়িতে বাস করছেন, এখন তাঁরা আর কেন যশোদার বাড়িতে শ্রীকৃষ্ণকে দেখার জন্য দৌড়ে যাবেন! গোপীরা কৃষ্ণকে দেখতে যশোদার বাড়িতে যেত, সেই যাওয়াটা এখন বন্ধ করে দিল। এখন যশোদা ভাবছেন এই মেয়েগুলো আমার বাড়িতে এত আসত, কিন্তু কী এমন হল যে তারা আর আমার বাড়িতে আসা বন্ধ করে দিয়েছে। ওদের যদি জিজ্ঞেসও করে ওরাও কোন উত্তর দিতে পারছে না। এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্যটা হল, মানুষ যেখানে আনন্দ পায় সেখানেই দৌড়ে যায়। আগে আনন্দ পাচ্ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের টানে যশোদার বাড়িতে গিয়ে। এখন শ্রীকৃষ্ণই তাঁদের বাড়িতে দিবারাত্র আছেন, তাদের আনন্দ মিটে যাচ্ছে, যশোদার বাড়িতে যাওয়ার আর কিসের প্রয়োজন!

এটাই এই কাহিনীর অন্তর্নিহিত তত্ত্বের গভীরতা। এগুলোই গভীরে ভাবে ধারণা করার বিষয়। যেখানে আনন্দ পায় সেখানেই মানুষ ছুটে যায়। ঠাকুর যেমন বলছেন – বাচ্চা বয়সে মেয়েরা পুতুল নিয়ে খেলা করে। যখন বিয়ে হয়ে যায় তখন আর পুতুল নিয়ে খেলা করে না, পুতুলগুলিকে গুছিয়ে বাক্সবন্দী করে তুলে রাখে। তখন পুতুলের সঙ্গে আনন্দ ছিল এখন নিজের বরের সঙ্গে আনন্দ। এটাই গোপীদের ক্ষেত্রে হয়েছে। এই গোপীদের সাথে ভগবানের এই খেলা পুরো এক বছরের জন্য চলেছিল। বলরাম কিন্তু বলরামই ছিলেন, তাঁকে ব্রহ্মা অপহরণ করেননি। কিন্তু সব ব্যাপারটা বলরামের কাছে খুব রহস্যময় লাগছে। কোন বালকই শ্রীকৃষ্ণকে কোন গুরুত্ব দিচ্ছে না, গোপীরাও শ্রীকৃষ্ণকে ডেকে ডেকে বাড়ি নিয়ে যাচ্ছেন না, গাভীরা তাদের বাছুরের পেছনে দৌড়ে যাচ্ছে।

ব্রহ্মা গোপবালক ও গোবৎসদের নিয়ে গিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছিলেন। ব্রহ্মার এক ত্রুটির পর, ত্রুটি মানে, আমাদের পরম্পরাতে যে ভাবে সময়ের পরিমাপ করা হয় সেই হিসাবে ত্রুটি হল সব থেকে ছোট, ন্যানো সেকেণ্ডের মত কিছু একটা হবে। তীক্ষ্ণ সূচের অগ্রভাগ দিয়ে একটা পদ্মফুলের পাপড়িকে ছিদ্র করতে যেটুকু সময় লাগবে সেটুকু সময়কে বলছেন ত্রুটি। বিভিন্ন লোকে সময় বিভিন্ন ভাবে চলে, মানুষের সময় আর দেবতাদের সময় এক ভাবে চলবে না, দেবতাদের সময় আর ব্রহ্মার সময় আবার এক ভাবে চলবে না। এই ধারণাটা কোথা থেকে কীভাবে ঋষিদের মনে এসেছে বোঝা যায় না। অথচ সময়ের এই পরিমাপ বুঝতে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীদের আইনস্টাইনের থিয়োরি অফ রিলেটিভিটি আবিষ্কার হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে থাকতে হয়েছিল। সময় কখন absolute হয় না, আমাদের ঋষিরা পাঁচ-ছয় হাজার বছর আগে এই জিনিষটা জানতেন, শুধু জানতেনই না, একেবারে লিপিবদ্ধ করে গেছেন।

ব্রহ্মা একবার চোখটা বন্ধ করছেন, তাতেই আমাদের এক বছর হয়ে যাচ্ছে। এক বছর অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পর ব্রহ্মা চোখ খুলেই দেখছেন ব্রজের জীবন স্বাভাবিক ভাবেই চলছে, কোথাও কোন নিরানন্দের ভাব নেই, সন্তানরা ফিরছে না বলে কারোরই মনে কোন উৎকণ্ঠা নেই। ব্রহ্মা আবার দৌড়ে সেই পাহাড়ের গুহায় গেলেন, যেখানে তিনি সব কটি বাচ্চাকে লুকিয়ে মায়া দিয়ে অচেতন করে রেখেছিলেন, গিয়ে দেখছেন সব কটি বাচ্চা ওখানে আগের মতই বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছে। এদিকে আবার ব্রজের সব কিছুই স্বাভাবিক, গোপবালকদের নিয়ে শ্রীকৃষ্ণ আগের মত আনন্দে খেলা করে যাচ্ছেন, গাভীরা তাদের বৎস্যদের আদর করছে। একই জিনিষের যেন পুরো দুটো আলাদা ইউনিট হয়ে গেছে। ব্রহ্মা যিনি নাকি সৃষ্টি কার্য সামলান, তিনি নিজেও শত চেষ্টা করেও বুঝতে পারছেন না, কোনটা আসল আর কোনটা নকল। যারা বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছে তারা ব্রহ্মার সৃষ্টি, এদেরই যারা বাইরে আছে তারা ভগবানের সৃষ্টি। কিন্তু দুটোর মধ্যে কোথাও কোন তফাৎ নেই। শ্রীকৃষ্ণের এই কাণ্ড দেখে ব্রহ্মার তখন মোহ ভঙ্গ হয়ে গেছে।

শুকদেব তখন পরীক্ষিৎকে বলছেন ***এবং সম্মোহয়ন্ বিষ্ণুং বিমোহং বিশ্বমোহনম্। স্বয়ৈব মায়য়াজোঽপি স্বয়মেব বিমোহিতঃ।।১০/১৩/৪৪।*** শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান, সেই ভগবানের মায়ায় সমগ্র জগৎ বিমোহিত হয়ে আছে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ নিজে মায়াতীত, কোন মায়াই তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। গীতায় ভগবান বলছেন *দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।।৭/১৪।* এই যে মায়া, এই মায়া কোন মায়াজাল নয়, মায়া দৈবী আর তিনটে গুণ সত্ত্ব, রজো ও তমো এর মধ্যে সব সময় বিদ্যমান। দৈবী মানে সেই সচ্চিদানন্দই আছেন, এই মায়াও সেই সচ্চিদানন্দের, তিনি এমন এক শক্তির খেলা দেখান যেখানে এককে বহু দেখায়। বহু যখন হয়ে যায় তখন এক অপরকে জানতে পারে না আর এর উৎসকেও জানতে পারে না। আমরা সবাই সেই এক সচ্চিদানন্দ কিন্তু পরিষ্কার দেখছি আমি আলাদা আপনি আলাদা। সচ্চিদানন্দ তাঁরা মায়া দ্বারা সমস্ত জগৎকে এইভাবে বিমোহিত করে রেখেছেন কিন্তু তিনি সমস্ত মায়া-মোহের ঊর্ধ্বে। ঠাকুর উপমা দিয়ে বলছেন – সাপের মুখে বিষ আছে কিন্তু সেই বিষে সাপের কিছু হয় না। ব্রহ্মা যিনি নিজেও সেই সচ্চিদানন্দের মায়াতে সৃষ্ট হয়েছেন, আর সবাই মানছে যে ব্রহ্মার ক্ষমতা আছে, কিন্তু তিনি এখন সেই মায়াধীশ ভগবানকে মায়ার দ্বারা মোহিত করতে চেয়েছিলেন। মাঝখান থেকে ব্রহ্মা নিজেই এখন মায়ার ফাঁদে পড়ে বিমূঢ় হয়ে গেলেন। মানে ভগবানকে ফাঁসাতে গিয়ে ব্রহ্মা নিজেই ফেঁসে গেছেন।

তম্যাং তমোবন্নৈহারং খদ্যোতার্চিরিবাহনি। মহতীতরমায়ৈশ্যং নিহন্ত্যাত্মনি যুঞ্জতঃ।।১০/১৩/৪৫। গভীর নিশীথের ঘোর অন্ধকারে যেমন কুয়াশা হলে বোঝা যায় না, আবার দিনের আলোতে যেমন জোনাকির দীপ্তি লুপ্ত হয়ে যায় ঠিক তেমনি স্বল্প শক্তিসম্পন্ন পুরুষ যখন কোন মহাপুরুষের উপর নিজের মায়া প্রয়োগ করে তাঁকে ভোলাতে যায়, তখন তারা তা পারে না। ব্রহ্মা তখন ভাবতে বসে গেলেন, 'এ আমি কি করলাম, কী বুদ্ধিভ্রম হল যে আমি শ্রীকৃষ্ণের উপর মায়ার প্রভাব বিস্তার করতে গেলাম'। ব্রহ্মা আকাশ-পাতাল চিন্তা করেও কোন কুল কিনারা করতে পারছিলেন না। এইভাবে ভাবতে ভাবতে হঠাৎ তিনি দেখেন ***চতুর্ভুজাঃ শঙ্খচক্রগদারাজীবপাণয়ঃ। কিরীটিনঃ কুণ্ডলিনো হারিণো বনমালিনঃ।।১০/১৩/৪৭।*** যত গোপবালক ছিল, যত বাছুর ছিল দেখতে দেখতে সবার রূপ পাল্টে গেছে। রূপ পাল্টে গিয়ে তারা সবাই ভগবানের চতুর্ভুজ রূপ শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্মধারী মূর্তিতে শোভা পাচ্ছেন। সবাই পীতাম্বর বস্ত্র পরিধাণ করে আছেন, সবারই মস্তকে মুকুট, কর্ণে কুণ্ডল, কণ্ঠে মনোহর হার এবং বনমালা শোভা পাচ্ছিল। এক সঙ্গে দুটো রূপই দেখতে পাচ্ছিলেন, এই গোপবালক রূপ আবার ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রূপ। ***আত্মাদিস্তম্বপর্যন্তৈর্মূর্তিমদ্ভিশ্চরাচরৈঃ। নৃত্যগীতাদ্যনেকার্হৈঃ পৃথক্ পৃথগুপাসিতাঃ।।১০/১৩/৫১।*** ব্রহ্মা দেখছেন তাঁরই মত বহু সংখ্যক ব্রহ্মা থেকে শুরু করে তৃণ পর্যন্ত সমস্ত বিশ্ব চরাচর মূর্তিমান হয়ে নৃতগীতাদির দ্বারা বহু রকম বিচিত্র পূজা উপাচারে ভিন্ন ভিন্ন ভগবানের রূপের সামনে আরাধনা করে যাচ্ছে। তার মানে ব্রহ্মা নিজে দেখছেন তাঁরই মত অনেক ব্রহ্মা বিভিন্ন স্তবাদির দ্বারা ভগবানের আরাধনা করে যাচ্ছেন। আর অণিমা-লঘিমাদি যত রকমের সিদ্ধি আছে, চব্বিশ তত্ত্ব, বিভিন্ন বিভূতি সকল মূর্তিমান হয়ে ভগবানকে চতুর্দিকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে। হিন্দুদের এটি একটি খুব প্রাচীন অভ্যাস, যে

কোন বিমূর্তকে তাঁরা মূর্ত করে একটা শরীর দিয়ে দেবে। সেখান থেকেই হিন্দুদের এত দেবী দেবতার জন্ম হয়েছে।

এখানেও আবার এক গভীর তত্ত্বকে বিশ্লেষণ করে বলছেন ***কালস্বভাবসংস্কারকামকর্মগুণাদিভিঃ। স্বমহিধ্বস্তমহিভির্মূর্তিমদ্ভিরুপাসিতাঃ।।১০/১৩/৫৩।*** ভূত, ভবিষ্যত আর বর্তমান এই তিনটে আমাদের সবাইকে বাধিত করে। কীভাবে বাধিত করে? যেমন আমি এখন এখানে আছি অন্য জায়গাতে আমি নেই, এখন এখানে আছি দু ঘন্টা পরে এখানে থাকবো না। কিন্তু এই তিনটে ভগবানকে বাধিত করতে পারে না, ভগবান আজকে আছেন আগামীকাল থাকবেন না, বেলুড়ে আছেন শালকিয়ায় নেই, এরকম কিছু হবে না। ভগবান হলেন ত্রিকালাতীত, তিনটে কালের পারে। কিন্তু ভগবান ছাড়া সব কিছুই কাল ও স্থান দ্বারা নির্দিষ্ট হয়ে আছে। আমাদের সব সময় হয় কালের মধ্যে পরিবর্তন হচ্ছে, নয়তো দেশে পরিবর্তন হচ্ছে আর তা নাহলে দুটোতেই আমাদের পরিবর্তন হচ্ছে। কিন্তু ভগবান যিনি, তাঁর উপরই সময় ও কাল পরিবর্তিত হচ্ছে, তাই ভগবান দেশ কালের পারে। ভগবানের মধ্যে জড়ত্ব ও চেতনত্বের কোন তফাৎ নেই, সবটাই এক রস। যা কিছু আছে সব সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণেরই স্বরূপ। এখন সব গোপবালক ও বাছুর গুলো সব বিষ্ণুর চতুর্ভুজ রূপ ধারণ করতেই এই কাল, যত স্বভাব, সংস্কার আছে, যত কামনা-বাসনা আছে, কর্ম ও কর্মের যত ফল আছে এরা সবাই মূর্ত রূপ ধারণ করে শ্রীভগবানের প্রতি নিজের নিজের ভাব অনুযায়ী উপাসনাতে রত হয়ে গেলেন। এই জিনিষগুলো ব্রহ্মা দেখে যাচ্ছেন। দেখতে দেখতে ব্রহ্মার উপলব্ধি হল যে, সব কিছুই সেই সত্যস্বরূপ, স্বয়ংপ্রকাশ আর শুধু আনন্দঘন মূর্তি, কোথাও কোন ভেদ প্রতীতি হচ্ছে না, এক অখণ্ড একরসের প্রত্যয় হচ্ছে।

এই পরম আশ্চর্যময় দৃশ্য দেখার পর ব্রহ্মার চেতনাই যেন হারিয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। ব্রহ্মা নিজে সর্ববিদ্যার অধীশ্বর হয়েও ভগবানের এই দিব্যস্বরূপের ধারণা করতে অসমর্থ হয়ে বিহ্বল হয়ে পড়েছেন, তাকিয়ে দেখার ক্ষমতাটুকুও হারিয়ে ফেলে আস্তে করে চোখ দুটো বন্ধ করে দিলেন। ব্রহ্মার এই মোহপ্রাপ্তি হওয়া ভগবানের অজ্ঞাত ছিল না। তিনি তখুনি কিছুক্ষণের জন্য ইচ্ছামাত্র ব্রহ্মার উপর থেকে মায়ার পর্দাটা সরিয়ে দিলেন। ভগবানের কৃপাতে ব্রহ্মা লুপ্ত বাহ্যজ্ঞান দশা থেকে সচেতন অবস্থায় ফিরে এসেছেন। চেতনা ফিরতেই ব্রহ্মা একবার ভগবানের সেই নিরাকার রূপ দেখছেন, যেখানে তিনি মন-বাণীর পারে অবস্থিত, আবার অন্য দিকে তিনি দেখছেন চারিদিকে সেই বিশাল রূপ, সামনে বৃন্দাবন যেখানে তাঁর অভিনব লীলা সংঘটিতে হয়ে চলেছে। এটাই হল ভাবমুখ। ভাবমুখে দুটো জিনিষ একই সঙ্গে দেখতে পারেন, একদিকে ভগবানের অখণ্ড রূপ আর অন্য দিকে ভাব রূপ, যেখানে এক বহু হয়ে জগৎ রূপ ধারণ করেছেন। ব্রহ্মা এখন ভাবমুখে জগৎকেও দেখছেন আবার জগৎকর্তাকেও দেখছেন।

এখানে পর পর কয়েকটি শ্লোকে বৃন্দাবনের বর্ণনা করা হয়েছে। ভাগবতে বৃন্দাবনের বিরাট মাহাত্ম্য। বৃন্দাবনের এত স্থান মাহাত্ম্য কেন? কারণ বৃন্দাবন হল ভগবানের পবিত্র লীলাভূমি। সেইজন্য ষড়রিপুরা বৃন্দাবনে কখন প্রবেশ করতে পারে না। মানুষ পশু-পাখি, বৃক্ষাদি, লতাগুল্ম সবাই এক অপরের প্রতি স্নেহ-ভালোবাসা নিয়ে এখানে আনন্দে ও শান্তিতে বসবাস করে। বৃন্দাবনের এই স্নিগ্ধ, পবিত্র রূপ ব্রহ্মা দেখছেন আবার অন্য দিকে তিনি শ্রীকৃষ্ণের অখণ্ড সচ্চিদানন্দ রূপ, যা মন ও বাণীর পারে, সেই রূপও দেখছেন। ভগবানকে এই ভাবে দেখার পর ব্রহ্মা এবার আর কোন ভুল করলেন না, তিনি সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বাহন হংসের পিঠ থেকে লাফিয়ে নেমে পড়লেন, যেন আর দেরী করতে চাইছেন না। লাফিয়ে নেমেই সোজা শ্রীকৃষ্ণের সামনে দৌড়ে গেলেন। শ্রীকৃষ্ণ তখন ছ-সাত বছর বয়সের এক বালক। ব্রহ্মা গিয়ে সেই বালক রূপী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলে ঝাঁপিয়ে পড়ে ভূলুণ্ঠিত হয়ে গদগদ স্বরে হাতজোড় করে স্তুতি করতে শুরু করেছেন।

যদিও এখানে পুরাণের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী একটা কাহিনীর রূপে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু এই কাহিনীর অনেক গভীর তাৎপর্য আছে। এর একটা তাৎপর্য হতে পারে, যেটা ভাষ্যকাররা তাঁদের ভাষ্যে উল্লেখ করেননি, ঠাকুর একবার নরেনকে বলছেন – তুই কি চাস্? স্বামীজী তখন ঠাকুরকে নিজের ইচ্ছার কথা বলতে গিয়ে বলছেন – আমি সব সময় নির্বিকল্প সমাধিতে ডুবে থাকতে চাই, মাঝে মাঝে নীচে নেমে এসে শরীর ধারণের

জন্য সামান্য কিছু খাদ্য গ্রহণ করে আবার লীন হয়ে থাকবো। ঠাকুর তখন নরেনকে বলছেন – ওরে! এর থেকেও অনেক উঁচু অবস্থা রয়েছে। তিনিই সব কিছু হয়েছেন এই উচ্চ ভাবের কথাই ঠাকুর নরেনকে বলতে চাইছেন। ঈশ্বরের দুটি রূপ – একটি হল ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণকে সাক্ষাৎ সামনে দেখছি। দ্বিতীয় রূপ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণই এই সমগ্র জীব, জগৎ হয়েছেন। সাধারণ মানুষের ধারণা ঈশ্বর আকাশের কোথাও অবস্থান করে কলকাঠি নাড়ছেন, এদের থেকে যাঁরা উন্নত তাঁরা মনে করেন ভগবান অন্তর্যামী রূপে সবার মধ্যে অবস্থিত। যাঁরা বিজ্ঞানী তাঁরা দেখেন ঈশ্বরই এই জীব জগৎ হয়েছেন।

আমাদের মত মানুষ ঈশ্বর দর্শন বলতে বোঝে, ঠাকুরের ধ্যান জপ করার পর দেখবো তিনি আমাদের সামনে সশরীরে মুর্তিমান হয়ে এসে দাঁড়িয়েছেন। কিন্তু এর থেকেও যে উচ্চ অবস্থা – শ্রীরামকৃষ্ণই সব কিছু হয়েছেন, এই অবস্থাটা আমরা ধারণা বা চিন্তাতেও নিয়ে আসতে পারিনা। সন্ত তুলসীদাস যে বলছেন – সীয়ারামময় ম্যায় সব জগ জানু, পুরো জগৎকে আমি সীতারামময় বলে জানি। অর্থাৎ এই জগৎ সীতারামময়, এছাড়া আর কিছু নয়। ঠিক এই ভাবটাই এই কাহিনীর মধ্যে নিয়ে আসা হয়েছে। ব্রজকুলে সেই শ্রীকৃষ্ণ আগের মতই বিরাজ করছেন, কিন্তু গোপীদের এখন সেই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আগের মত আকর্ষণ নেই। শ্রীকৃষ্ণ এখন নিজেই সব গোপবালক ও বৎস হয়ে বিরাজ করছেন তাই গোপীদের আকর্ষণ এখন তাদের প্রতিই ধাবিত হয়েছে। তার মানে, শ্রীকৃষ্ণময় জগৎ এই ভাবটা যখন মনের মধ্যে উদিত হয় তখন একটা বিশেষ মুর্তিতে শ্রীকৃষ্ণের রূপকে আবদ্ধ রাখার আকর্ষণটাই চলে যায়। ঠাকুরকেও তাঁর বিশেষ বিশেষ ভাবের অবস্থায় বলতে দেখা গেছে – আমার এই ভাবটা এখন আলুনি লাগে। যখন বলছেন – একটা জায়গায়, একটা মুর্তির মধ্যে ভগবানের প্রকাশকে দেখতে আলুনি লাগছে। তাহলে তাঁর কী ভালো লাগছে? যিনি সর্বব্যাপী, তিনি সব জায়গাতেই আছেন, এই ভাবটা তাঁর এখন ভালো লাগছে। গোপীরাও জানতেন না যে শ্রীকৃষ্ণই এখন তাঁদের পুত্র হয়ে বিরাজ করছেন কিন্তু তা সত্ত্বেও শ্রীকৃষ্ণের থেকেও তাঁদের নিজেদের সন্তানদের প্রতি মন প্রাণ বেশী আকর্ষিত হচ্ছে। যশোদা ও নন্দবাবার গৃহে যে শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ রূপ বিরাজ করছে, শ্রীকৃষ্ণের সেই রূপ এখন তাঁদের কাছে আলুনি লাগছে, কারণ গোপীদের ভাব এখন পাল্টে গেছে। যদিও তাঁরা নিজেরাও জানেন না যে শ্রীকৃষ্ণই তাঁদের পুত্র রূপে তাঁদের কাছেই রয়েছেন কিন্তু স্বাভাবিক ভাবেই সব মায়েদের পুত্রস্নেহ আগের থেকে শত গুণ বেড়ে গেছে। আধ্যাত্মিক জীবনেও ঠিক তাই হয়। ঈশ্বরই সমস্ত জীব, জগৎ হয়েছেন এই ভাবটাই আধ্যাত্মিক জীবনের উচ্চ অবস্থা।

আধ্যাত্মিক জীবনে স্তব স্তুতির মাহাত্ম্য

যাই হোক এই ঘটনার পর ব্রহ্মা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিরাট স্তুতি করছেন আর এখান থেকেই চতুর্দশ অধ্যায় শুরু হয়। ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক সাধনার ক্ষেত্রে স্তুতি হিন্দুদের কাছে খুব প্রাচীন অথচ গুরুত্বপূর্ণ একটি অঙ্গ। বেদের প্রণামমন্ত্রেই অনেক স্তুতি আছে। ঋকবেদ পুরোটাই স্তুতি। বেদের বেশীর ভাগ স্তুতি দেবতাদের উদ্দেশ্যে করা হয়। মহাভারতে স্তুতিকে আরও বেশী গুরুত্ব দিয়ে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে, সেখানে আবার দেখানো হয়েছে কোন দেবতা যদি কুপিত হয় তখন সেই দেবতাকে শান্ত করার জন্য কীভাবে স্তুতি করতে হয়। পাশ্চাত্যের মনস্তত্ত্ববিদরা স্তুতি বা প্রার্থনাকে ভয় আর লোভের অভিব্যক্তি বলে মনে করেন। খ্রীশ্চান ধর্মেও প্রার্থনার উপর খুব জোর দেওয়া হয়েছে। তাদের প্রার্থনার মূল ভাব হল ঈশ্বর হলেন একজন রাজার মত, রাজাকে সবাই ভয়ও পায় আবার এই বিশ্বাসও আছে যে তাঁর কাছে প্রার্থনা করলে তিনি সন্তুষ্ট হয়ে প্রার্থনার অনেক কিছু পূরণও করে দেন। বেদে দেবতার উদ্দেশ্যে যে প্রার্থনা করা হয় তাতে একটা জিনিষের উপরই জোর দেওয়া হয়, তা হল ঋতম্ যেন ঠিক থাকে। ঋতম্ মানে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড যে নিয়মের উপর চলছে, সেই নিয়মটা যেন ঠিক থাকে। যেমন বর্ষা ঋতুতে বৃষ্টি যেন ঠিক ভাবে হয়, বৃষ্টির পর ফসলের ফলন যেন ঠিক মত হয়, গরু যেন ঠিক ভাবে দুধ দেয়। কিন্তু আমার মেয়ের বিয়ে হোক, ছেলের চাকরি হোক ঠিক এই অর্থে বেদে দেবতাদের উদ্দেশ্যে স্তুতি করার প্রবণতা ছিল না। কিন্তু কোন দেবতা কুপিত হয়ে গেলে, যেমন মহাভারতে কয়েকটি কাহিনী আছে যেখানে কেউ অগ্নির কোপে পড়ে গেছেন, তখন তিনি অগ্নির স্তুতি করছেন, কিংবা প্রচণ্ড বৃষ্টিপাতে প্লাবনের আশঙ্কা তৈরী হয়েছে তখন ইন্দ্রের স্তুতি করা হচ্ছে। স্তুতির তৃতীয় আরেকটি দিক আছে,

যেটা হিন্দুদের মধ্যেই সব থেকে বেশী পাওয়া যায়, যেখানে স্তুতি কোন ভয় বা লোভের জন্য করা হয় না। সেখানে স্তুতির একটাই ভাব, আমি তোমাকে অকপট ভাবে ভালোবাসি সেইজন্য তোমার স্তুতি করছি। স্তুতিতে তুমি দেখতে কেমন, তোমার কি গুণ, তোমার লীলা কেমন তার বর্ণনা করছি কারণ আমি তোমাকে ভালোবাসি। শুধু ভালোবাসার জন্য ভালোবাসা, এটাকে উল্লেখ করে স্বামীজী বলছেন, আমি হিমালয়কে ভালোবাসি, কিন্তু হিমালয় সেই ভালোবাসার বিনিময়ে আমাকে কিছু দেয় না, তবুও হিমালয়কে ভালোবাসি। এই যে তিনটে ব্যাপার, আমার লোভ আছে, সেই লোভের জন্য কিছু পাওয়ার আশায় স্তুতি করা, আমার ভয় আছে সেখানেও কিছু পাওয়ার আশা থাকে যাতে আমার জীবন নির্ভয়ে মসৃন্ ভাবে চলে, কিন্তু এই দুটোর বাইরে একটা ব্যাপার থেকে যায়, শুধু ভালোবাসা। হিন্দু পরিবারে পরম্পরা অনুযায়ী ছোটবেলা থেকেই আমরা বড়দের সঙ্গে প্রত্যহ কিছু কিছু স্তব স্তুতি আবৃত্তি করতে করতেই বড় হই। এই স্তব স্তুতিকে কেন্দ্র করেই আমাদের ধর্মীয় জীবন গড়ে ওঠে, আর এই স্তব স্তুতিই আমাদের ধর্মীয় জীবনকে পুষ্ট করে। এইসব স্তুতিতে ভগবানের শরীরের বর্ণনা, তাঁর গুণের বর্ণনা আর তাঁর লীলার বর্ণনাই বেশী থাকে। আমাদের বিশ্বাস এইসব স্তুতি করলে ভগবান প্রসন্ন হন। পাঁচ বছরের সন্তানও যদি মাকে বলে 'মা! এই শাড়ীতে তোমাকে কী সুন্দর দেখাচ্ছে'। সন্তানের এটুকু প্রশাংসাতেই মায়ের মন কিছুক্ষণের জন্য নড়ে ওঠে। আর একটু বড় হয়ে সন্তান যখন মায়ের কাছ থেকে টাকা আদায় করতে গিয়ে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে তখন মা জানে সন্তান আমাকে বোকা বানাচ্ছে, তাও মা দিয়ে দেন। তা ভগবানও কি এই রকম বোকা। আসলে আমাদের বুদ্ধি যেমনটি ভগবানকে আমরা তেমনটিই দেখি। কিন্তু সব কিছুর চাওয়া-পাওয়াকে ছাড়িয়েও ভগবান বা দেবতাদের উদ্দেশ্যে স্তব স্তুতির মাধ্যমে প্রার্থনা মানুষকে আধ্যাত্মিকতার একটা উচ্চতায় নিয়ে যেতে প্রভূত সাহায্য করে।

ব্রহ্মা কর্তৃক ভগবানের স্তুতি

ভাগবতে যত স্তুতি আছে তার মূল তত্ত্ব মোটামুটি একই। ভাগবতের যে কোন একটি স্তুতিকে যদি ভালো করে বিশ্লেষণ করা হয়, তখন এই ধরণের যে কোন একটি স্তুতি থেকেই হিন্দু ধর্মের সার তত্ত্বটি বেরিয়ে আসবে। আমরা এখানে ব্রহ্মার স্তুতি নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই লীলার মাধ্যমে ব্রহ্মার যে অহঙ্কার ছিল যে আমিই একমাত্র সৃষ্টিকর্তা, সেটাকে চূর্ণ করে দিলেন। অহঙ্কার চূর্ণ হওয়ার পর ব্রহ্মা ভগবানের অনেক স্তুতি করছেন। আমাদের যত স্তুতি আছে তার বেশীর ভাগ শুরুই হয় ভগবানের শরীরের বর্ণনা দিয়ে। ব্রহ্মাও এখানে প্রথমে শরীরের বর্ণনা দিয়েই শুরু করছেন। ***নৌমীড্য তেঽভ্রবপুষে তড়িদম্বরায় গুঞ্জাবতংসপরিপিচ্ছলসম্মুখায় বন্যস্রজে কবলবেত্রবিষাণবেণুলক্ষ্মশ্রিয়ে মৃদুপদে পশুপাঙ্গজায়।।১০/১৪/১।*** 'হে প্রভু! নিখিল বিশ্বে আপনিই একমাত্র স্তবস্তুতির দ্বারা বন্দনীয়। আপনার চরণে প্রণতি জানিয়ে আমি আপনার স্তুতি করছি। আপনার এই দেহ বর্ষা ঋতুর বারিপূর্ণ জলধরের মত শ্যামল'। শ্যামল আর কালো রঙের মধ্যে একটা পার্থক্য আছে। যখন নতুন দূর্বা ঘাস জন্মায় তখন তার কচি পাতার রঙটা ঠিক পরিষ্কার ভাবে বোঝা যায় না যে এটা কালো, না নীল, না সবুজ। এই তিনটে রঙেই দূর্বার কচি পাতার রঙটা মিশে থাকে, আর ক্ষণে ক্ষণে রঙটা যেন পাল্টাতে থাকে। একেবারে নতুন ঘাসের কচি পাতার রঙ প্রথমে কালো দেখায়, তারপর আস্তে আস্তে যেন নীল হতে থাকে, তারপর সবুজ রঙটা এসে যায়। যখন শ্যামল বর্ণের বলা হয় তখন এই তিনটে রঙের সংমিশ্রণকে নিয়েই বলা হয়, কিন্তু দেখার সময় আসলে কালোই দেখায়। কিন্তু কালো রঙের প্রলেপটা এত সূক্ষ্ম যে এটা আসলে নীল না সবুজ বলা মুশকিল। সেইজন্য অনেক সময় ছবিতে ভগবানের বিগ্রহের রঙ নীল দেখিয়ে দেওয়া হয়। আসলে নীল নয়। ঠাকুর এটাকেই আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ দিয়ে ব্যাখ্যা করে বলছেন – তিনি দূরে বলে কালো দেখায়, কাছে গেলে কোন রঙ নেই। এখানে ব্রহ্মা বলছেন ভগবানের শরীরের রঙ বর্ষার জলভরা মেঘের মত শ্যামল। শ্রীরামচন্দ্রের শরীরের বর্ণনাতেও এই রঙ দেখানো হয়েছে, শ্রীকৃষ্ণের শরীরকেও এই একই রঙে বর্ণনা করা হয়। দ্রৌপদীর শরীরেরও এই রঙ। এই রঙের জন্য দ্রৌপদীর একটা নামই ছিল কৃষ্ণা।

যাই হোক, ব্রহ্মা ভগবানের শরীরের রঙের বর্ণনা করার পর বলছেন 'আপনার শ্যামল অঙ্গে পীতাম্বর বস্ত্র, গলায় গুঞ্জমালা, কর্ণে কুণ্ডল' ইত্যাদি। এইভাবে বর্ণনা করে বলছেন ***অস্যাপি দেব বপুষো মদনুগ্রহস্য***

স্বেচ্ছাময়স্য ন তু ভূতময়স্য কোঽপি। নেশে মহি ত্ববসিতুং মনসাঽন্তরেণ সাক্ষাত্তবৈব কিমুতাত্মসুখানুভূতেঃ।।১০/১৪/২। 'আপনি এখন গোপাল বালকের বেশ ধারণ করে আছেন। আমার মত যত ভক্ত তাদের উপর কৃপা করার জন্যই আপনি এই বিগ্রহ ধারণ করেছেন'। ভগবান যে বিভিন্ন রূপ ধারণ করেন তার পেছনে তাঁর কোন উদ্দেশ্য থাকে না। রামায়ণাদিতে যখন উদ্দেশ্যের ব্যাখ্যা করা হয় তখন এই একটা কথাই বলা হয় – ভক্তদের অনুগ্রহ করার জন্য তিনি এই রূপ পরিগ্রহ করেছেন। ভক্তদেরও নানা রকমের সমস্যা আছে, তাদের উপর দৈত্য দানবের অত্যাচার হয়, ধর্মের গ্লানি হয় ইত্যাদি। ভগবানকে তাই ভক্তের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করার জন্য বিভিন্ন রূপ ধারণ করতে হয়। আবার অনেক ভক্তের ইচ্ছে হয় তাঁর গুণ দর্শন করবো। ব্রহ্মা বলছেন 'আপনার এই শরীর তো কোন ভৌতিক স্থূল শরীর নয়, এটা আপনার অপ্রাকৃত শরীর। কিন্তু আপনার এই শুদ্ধসত্ত্বময় তনুর অলৌকিক মহিমা আমার দ্বারা বা অন্য কারুর দ্বারা নির্ণয় করা সম্ভব নয়। আমি যদি সমাধিতেও চলে যাই তাও কিন্তু আপনার এই সচ্চিদানন্দ বিগ্রহের সাকার রূপের সাক্ষাৎ কখনই করতে পারবো না'। আমরা শাস্ত্রে যেসব সিদ্ধান্ত বাক্য পাই সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ভগবানের সাক্ষাৎ এই সাকার রূপ চর্ম চক্ষে দর্শন কারুর পক্ষে কখনই সম্ভব নয়। খুব বিরল সাধক ছাড়া ভগবানের সাকার রূপ সামনা সামনি দর্শন করার সৌভাগ্য কারুর হয় না। কথামৃতে ঠাকুরও বলছেন – জ্ঞানীরাও ভগবানের সাকার রূপ দর্শন পান না। শ্রীরামচন্দ্র যখন কয়েকজন ঋষিদের কাছে গেছেন তখন তাঁরা বলছেন 'আমরা জানি আপনি দশরথের ব্যাটা আপনাকে আমরা অবতার বলে মানতে পারবো না'।

এই অবতার রূপ দর্শন এমনই কঠিন যে আমরা চিন্তাও করতে পারবো না। ঠাকুর বলছেন – এরপর আরেকবার আসতে হবে, তারপর অনেক দিন আর আসা হবে না। ভাবুন তো – হাঁটতে হাঁটতে যদি দক্ষিণ ভারত পর্যন্ত চলে যাওয়া যায়, যেতে যেতে ভারতের শেষ প্রান্ত কন্যাকুমারীতে চলে গেলাম। কন্যাকুমারীর পরেই সমুদ্র, সেই সমুদ্রের সামান্য একটু পরেই বিবেকানন্দ রক। বিবেকানন্দ রকের পর আবার দক্ষিণ দিকে যেতে শুরু করলে শুধু জল আর জল। তারপর আসবে সাউথ পোল। ঠাকুরের এই অবতারের পর একটা ছোট্ট অবতার আসবেন, তারপরে বিরাট লম্বা সময়ের জন্য বিনাশ। সেই সময় যত বড় বড় সাধক আসবেন তাঁরা কিন্তু ঈশ্বরকে এই রূপে আর পাবেন না। আমরা দেখছি আমাদের ভৌতিক শরীর আছে, সেই শরীরের হাত-পা-চোখ-কান-নাক-মুখ সবই আছে, এই হাত দিয়ে যদি ঈশ্বরকে স্পর্শই না করতে পারলাম, এই চর্ম চক্ষু দিয়ে যদি ঈশ্বরের রূপ দর্শন নাই করতে পারলাম, কান দিয়ে তাঁর কণ্ঠস্বর যদি নাই শুনতে পারলাম, মনের মধ্যে একটা খেদ থেকে যাবে। ঈশ্বরের জ্ঞান পাওয়া খুব একটা দুঃসাধ্য নয়, কিন্তু তাঁর এই সাকার শরীর, সাক্ষাৎ এই শরীরে তাঁর দর্শন পাওয়া অতীব দুঃসাধ্য, তাঁর এই অবতার বিগ্রহের ভাবঘন শরীরের দর্শন পাওয়ার আলাদা একটা মাহাত্ম্য ও মাধুর্য আছে।

ঠাকুর বলছেন আমি পাঁচ রকম ব্যঞ্জনের রান্না খাই, আমি ঝোল, ঝাল, অম্বল সবেতেই আছি। তার মানে? ঠাকুর নিরাকারেও আছেন, সাকারেও আছেন আবার সাক্ষাৎ সামনা-সামনি দর্শনেও আছেন। ঠাকুর এই সাক্ষাৎ দর্শনের উপর খুব জোর দিতেন। ঠাকুর বলছেন, মাইরি বলছি তিনি কথা কন। ঠাকুর আবার হাত পা টিপে টিপে দেখতেন। ব্রহ্মা এই কথাই বলছেন, একাগ্র মন দিয়ে আপনার এই বিগ্রহ রূপকে জানা যায় না। যাঁরা সাধুসঙ্গ করেন, নিত্য আপনার লীলাকথা শ্রবণ করেন, আপনাতে মন-প্রাণ সমর্পণ করে আপনাকেই শুধু ভালোবাসেন, একমাত্র তাঁরাই আপনার এই অবতারের বিগ্রহ রূপ দর্শনে সক্ষম হন। গীতাতেও বিশ্বরূপ দর্শন করবার পর অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বলছেন *অদৃষ্টপূর্বং হৃষিতোঽস্মি দৃষ্ট্বা*, আপনার এই রূপ আগে আর কেউ দেখেননি। খুব বিশিষ্ট ভক্ত ছাড়া ভগবানকে সশরীরে দর্শন করতে পারে না। ঠাকুর যখন কলকাতা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন তখন এত লোক, এত সিপাহী, এত ইংরেজরা দেখছে, কিন্তু কে বুঝবে যে স্বয়ং ভগবান কলকাতার রাস্তায় ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। আজকে আমরা ঠাকুরকে অবতার রূপে, ভগবান রূপে পূজো করছি। কিন্তু আমাদের পূর্বজরা কি আমাদের তুলনায় মুর্খ ছিলেন? কেশবচন্দ্র সেন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র কি আমাদের তুলনায় মুর্খ ছিলেন? আমরা বুঝতে পারছি ঠাকুর অবতার, ঠাকুর ভগবান কিন্তু তাঁরা বুঝতে পারলেন না! এগুলো খুব জটিল, আমরাও এর ব্যাখ্যা দিতে পারি না। আসলে আমরা কোথাও শুনেছি, কেউ বলে দিয়েছে

আর নয়তো এরা ঠাকুরকে অবতার বলছে তাই হুজুগে আমিও বলছি ঠাকুর ভগবান। এছাড়া আর কোন তফাৎ নেই, আমরা সবাই মুর্খদের দলেই আছি। তখনকার দিনে ঠাকুরকে খুব মুষ্টিমেয় কয়েকজন চিনেছিলেন, এক নরেন্দ্রনাথ দত্ত চিনেছিলেন তাও অনেক পরীক্ষা করে, নাগমশাই চিনেছিলেন, যিনি ঠাকুরকে ঠিক ঠিক ভক্তি করতেন আর শ্রীমা চিনেছিলেন। কাশীপুরে ঠাকুরও বলছেন – যখন অনেকে জানতে পারবে তখন এই শরীরটা চলে যাবে।

ভগবানের নির্গুণ স্বরূপের অনুভূতি নিয়ে ব্রহ্মা বলছেন ***তথাপি ভূমন্ মহিমাগুণস্য তে বিবোদ্ধুমর্হত্যমলান্তরাত্মভিঃ। অবিক্রিয়াৎ স্বানুভবাদরূপতো হ্যনন্যবোধ্যাত্মতয়া ন চান্যথা।।১০/১৪/৬।*** যাঁরা অমলাত্মা অর্থাৎ যাঁদের অন্তঃকরণ একেবারে পবিত্র, তাঁরা যদি আপনার নির্গুণ স্বরূপকে জানতে চান তাহলে তা তাঁরা খুব সহজেই জেনে নিতে পারেন। নির্গুণ স্বরূপকে জানা মানে ভগবানকে তত্ত্ব রূপে জানা। ইন্দ্রিয়সমূহকে প্রত্যাহার করে মনকে যখন ভেতরের দিকে টেনে আনা হয় তখন মন যে অন্য কোন রূপ ধারণ করবে, সেটা মন করে না। ইন্দ্রিয়গুলিকে ভেতরে টেনে নেওয়ার পর মন ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে আসে। শান্ত হয়ে সে নিজের স্বরূপে অর্থাৎ আত্মাতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। তখন কি হয়? *স্বানুভবাদরূপতঃ*, স্ব অনুভব, তখন নিজের স্বরূপের অনুভব হয়। 'আমি ব্রহ্মকে জানি' বা 'আমি ব্রহ্মকে জানলাম' এইভাবে সে অনুভব করে না, এই অনুভব স্বয়ংপ্রকাশ। এই ব্যাপারটা বোঝা অত্যন্ত কঠিন। আমার হাতে কলম, আমি জানি আমি আলাদা কলম আলাদা, আমি কলমকে দেখতে পাচ্ছি। আমরা সবাই মনে করি ঈশ্বর দর্শন বা ব্রহ্মজ্ঞান এই রকমই কিছু একটা হবে। যাঁর ব্রহ্মজ্ঞান হয় তাঁর সেই জ্ঞান স্বয়ংপ্রকাশ রূপেই হয়। এই হাত বা চোখ আত্মার ব্যাপারে কিছুই জানতে পারে না। হাত এই কলমকে স্পর্শ করে একটা অনুভূতি মস্তিষ্কে পাঠিয়ে দিল, মস্তিষ্কের স্নায়ুকেন্দ্রে কোথাও গিয়ে এই বোধটা হয় যে এটা কলম, এই কলমটা মেটাল দিয়ে বা প্লাস্টিক দিয়ে তৈরী। বিজ্ঞান বলে আমাদের মস্তিষ্কে এমন ভাবে নানা রকমের combination হয়ে আছে যে তাতেই আমরা বোধ করি জিনিষটা এই রকম। বেদান্ত বিজ্ঞানের এই মতকে মানবে না। বেদান্ত বলবে, সব কিছু জানার পেছনে আত্মাই আছেন, আত্মাই সব কিছু বোধ করেন। আত্মাই যে সব কিছু বোধ করছে এটা কীভাবে জানা যাবে? আত্মা সব সময় বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে যার ফলে বুদ্ধিতে অনবরত ঢেউ উঠেই চলেছে। যখন সমস্ত বুদ্ধিবৃত্তি বন্ধ হয়ে যাবে, যে আত্মা এতক্ষণ বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিল সে তখন আর বাইরের দিকে না তাকিয়ে নিজের দিকে তাকায়। নিজের দিকে তাকাতেই সে নিজের স্বরূপে অবস্থিত হয়ে যায়। স্বরূপে যখন অবস্থিত হয়ে যায় তখন তার সাধনার উপর নির্ভর করে হয় তার সগুণ সাকার ঈশ্বরের বোধ হবে, নয় তো নির্গুণ নিরাকার ঈশ্বরের বোধ হবে। স্বরূপের অবস্থানকে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ভাবে বর্ণনা করা হয় কিন্তু বস্তু রূপে কখন আত্মার বোধ হবে না। আমি যেমন বলছি আমি এই কলমকে জানি, এই কলমটা প্লাস্টিকের তৈরী। ঠিক তেমনি আমি ব্রহ্মকে জানি, তিনি নির্গুণ নিরাকার বা তিনি সগুণ সাকার, এই ভাবে কখন ঈশ্বর বা ব্রহ্মের বা আত্মার কোন বোধ হবে না। স্বয়ংপ্রকাশ রূপেই বোধ হবে।

ঈশ্বরের মহিমা, তাঁর সগুণ স্বরূপের গুণ সমূহকে কেউ কোন দিন পরিমাপ করে জানতে পারবে না। এটাই ব্রহ্মা স্তুতি করে বলছেন ***গুণাত্মনস্তেহপি গুণান্ বিমাতুং হিতাবতীর্ণস্য ক ঈশিরেহস্য। কালেন যৈর্বা বিমিতাঃ সুকল্পৈর্ভূপাংসবঃ খে মিহিমা দ্যুভাসঃ।।১০/১৪/৭।*** যদি এমন কোন সুদক্ষ সামর্থবান পুরুষ পৃথিবীর সব ধুলিকণা, আকাশের সমস্ত হিমকণাকে গণনা করে নিতে সক্ষম হয়ে যান, যদি আকাশের তারার কিরণসমূহ, পরমাণু নিচয়ের গণনাও করে নিতে পারেন, তার মানে তিনি বিজ্ঞানের শেষ পর্যায়ে পোঁছে গেছেন, এই পর্যায়ে পোঁছাতে গিয়ে তাঁকে কত জন্ম জন্ম ধরে পরিশ্রম করতে হয়েছ, কিন্তু তাঁর পক্ষেও আপনার অশেষ কল্যাণগুণের আকর নিঃশেষে অবধারণ করা দূরে থাক, তার সামান্য ভগ্নাংশও জানার সাধ্য নেই। বিরাট বড় আর অনন্তের সাথে একটা মৌলিক তফাৎ থাকে। মানুষের মন বিরাট বড় কিছুর ধারণা করতে পারে কিন্তু অনন্তের ধারণা করতে পারে না। ঈশ্বর কিন্তু বিরাট নন, ঈশ্বর অনন্ত। যেহেতু মন এই ব্যাপারটা ধারণা করতে পারে না তাই অনন্তকে বোঝান খুব কঠিন। অনন্তের এই ব্যাপারটা বোঝানোর জন্য এনারা তাই এই ধরণের কথা বলে একটু ধারণার করাতে চেষ্টা করেন, যেমন এখানে বলছেন, আকাশে যত হিমকণা আছে, মহাকাশে

যত জ্যোতিষ্ক আছে, পৃথিবীতে যত ধুলিকণা আছে সব তুমি গণনা করে নিতে পারবে কিন্তু ঈশ্বরের কত গুণ থাকতে পারে সেটা কোন দিন পরিমাপ করে জানতে পারবে না।

সেইজন্য প্রকৃত বুদ্ধিমান ব্যক্তি কি করেন? ***তত্তেহনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্। হৃদ্বাগ্বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্।।১০/১৪/৮।*** ঈশ্বরের গুণের পরিমাপ করা কখনই সম্ভব নয়। তাই বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা এইসব তত্ত্ববিচারে না গিয়ে, এসবের পেছনে অযথা সময়ের অপব্যবহার না করে আপনার পরমপদে নিজেকে সম্পূর্ণ রূপে সমর্পিত করে দেন, তাঁর জীবনে প্রারব্ধ অনুসারে যেমনটি সুখ বা দুঃখ আসে তিনি তা নির্বিকার চিত্তে গ্রহণ করে নেন। আমাদের শাস্ত্র বারবার এই কথাই বলবে তোমার জীবনে যা কিছু আসছে, সেটা সুখ হোক বা দুঃখ হোক, যেমনটি আসবে তেমনটি গ্রহণ করে নাও। খুব ভালো সংস্কারসম্পন্ন একটি যুবতী মেয়ের বিয়ে হল, বিয়ের পর সন্তানও হল, তারপর হঠাৎ তার স্বামীটি মারা গেল। মেয়েটির কি তাই বলে কোন দুঃখ হবে না? প্রচণ্ড দুঃখ হবে, দুঃখ না হওয়াটাই অযৌক্তিক। ওই অবস্থায় শাস্ত্রের এই কথাগুলো বলে যদি কেউ তাকে সান্ত্বনা দিতে যায় তাতে তার মনের দুঃখ ছিটেফোঁটাও লাঘব হবে না, উল্টে হয়তো তাকে কিছু ছুড়ে মারতেও পারে, যদি না মারে তাহলে বুঝতে হবে তার মাথা খারাপ আছে। সেইজন্য আমাদের শাস্ত্র বলে, ভাই! একটা বয়স পর্যন্ত তো তুমি ভোগ করলে, ভোগের একটা শৃঙ্গ আছে, ভোগের সেই শিখর তো তুমি দেখে নিয়েছ। দুঃখের যে চরমতম রূপ সেটাও তো দেখে নিলে। এবার তোমার জীবনে যা কিছু আসবে তার রূপটা ছোটই হবে, তোমার আনন্দও এর থেকে কম হবে, তোমার দুঃখও এর থেকে কম হবে। এই জিনিষটা বুঝে নিয়ে এবার তোমার মনকে ঘুরিয়ে উচ্চ চিন্তনে লাগিয়ে দাও।

গীতায় ভগবান বলছেন *যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ। যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে।।৬/২২*। ভগবান এত বড় যে, ভগবানকে লাভ করার পর সাংসারিক কিছু পেলে সে কখনই মনে করতে পারে না যে আমি বিরাট কিছু পেলাম। একজন কোটিপতি লোককে দৌড়ে গিয়ে একটি বাচ্চা ছেলে খবর দিচ্ছে 'স্যার খুব বিরাট খবর আপনি লটারিতে পাঁচ টাকা জিতেছেন'। লটারি জেতার খবর পাওয়ার পর লোকটির কী প্রতিক্রিয়া হবে? কিছুই হবে না, খুব বেশী না হলে বলবে 'বেশ! বেশ'! আমাদের এখন ঈশ্বর জ্ঞান, আত্মজ্ঞান কিছুই হয়নি। কিন্তু আমাদের মধ্যে মোটামুটি সবাই সংসারের চরমতম সুখ ভোগ করে নিয়েছেন, নারীসুখ করে নিয়েছেন, সন্তানসুখ পেয়ে গিয়েছেন, রসনার সুখ করে নিয়েছেন। আবার জীবনে অনেক দুঃসহ মর্মান্তিক বেদনাও সহ্য করতে হয়েছে, কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়েছে, এরপরও আপনি কি চাইছেন? কিসের আশায় সংসারে পড়ে আছেন? কিসের পেছনে এখনও ছুটছেন? তখন বলবেন – আমার এখনও অনেক আশা মেটেনি, নাতির মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে আমার আশ মিটতে চায় না। আবার যার নাতি নেই সে কত আশা করে বসে আছে কবে আমার নাতি হবে, সেই নাতি একটু বড় হবে, আমি ঘোড়া হব, নাতি আমার পিঠে চাপবে। সব বয়স্করা এই রকমই হয়। এই সুখটা পাচ্ছে না বলে প্রাণটা যাচ্ছে না।

জীবনে যে জিনিষগুলোর উপর আমরা বেশী নির্ভরশীল, যেগুলো কাছে থাকলে মনে খুব ভরসা পাই, সেগুলো যতক্ষণ ভেঙে চুরমার না হয়ে যায় ততক্ষণ মানুষ আধ্যাত্মিক পথে এগোতে পারে না। বাড়ির কাজের মেয়ের যে ছোট্ট ছেলে সেও মালিকের ছেলেকে রেগে গিয়ে বলে 'জানিস আমার মা আছে! মাকে আমি সব বলে দেব'। সে জানে আমার মা এই জগতে সব থেকে শক্তি ধরে। তার মায়ের ক্ষমতা যে কত সীমিত সেটা বুঝতে বাচ্চার সময় লাগে। একটা বয়সে যখন জানে মা কত অসহায়, তখন তার একটা অন্য রকম অভিজ্ঞতা হয়। এইভাবে জীবনের প্রত্যেকটি স্তরে আমরা একজন না একজনের উপর প্রচণ্ড ভাবে নির্ভরশীল। কিন্তু যখন এই ভরসার জায়গাটা ভাঙতে থাকে তখন তার মনের উপর প্রচণ্ড একটা আঘাতের মত নেমে আসে। যখন বুঝে যায় আমার বাবার ক্ষমতা সীমিত, আমার মায়ের ক্ষমতা সীমিত, আমার স্বামী একটা কাপুরুষ তখন এটা যে তার উপর কত নিপীড়ণ মনে হয়, কত যন্ত্রণাদায়ক হয় কল্পনা করা যায় না। যখন কোন সন্তান দেখে তার বাবা কারুর কাছে অপমানিত হচ্ছে তখন সে মরমে মরমে শেষ হয়ে যায়। কিন্তু একবার যদি এই বোধ হয়ে যায় যে আমার ঈশ্বর আছেন, আমি ঈশ্বরের চরণে আমার সব কিছু সমর্পণ করে তাঁর শরণাগত হয়ে গেলাম।

তখন তার জাগতিক যা কিছু ভালো হোক সেই ভালোটা তার ঈশ্বরের তুলনায় অতি তুচ্ছ, খারাপ যাই কিছু হোক তখন মনে করে তুমি তো আমার আছ তাই এই খারাপের কোন মূল্য নেই। এই ভাব যত দিনে দিনে পাকা হতে থাকবে তত তার জগতের সব কিছুর প্রতি অনীহা এসে যাবে, সংসারের ঝুট ঝামেলা, ঝগড়া, আনন্দ হুল্লোড় কোনটাই তাকে আর নাড়াতে পারবে না। ব্রহ্মা এখানে ঠিক এই কথাই স্তুতির মাধ্যমে ভগবানকে বলছেন, আপনাকে যখন কেউ মন-প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে তখন আপনার কথা বলতে গিয়ে তার বাকরুদ্ধ হয়ে যায়, তার হৃদয়ের সমস্ত মলিনতা অপসৃত হয়ে যায়, তাঁর সমগ্র জীবনটা আপনার উদ্দেশ্যে সমর্পিত নৈবেদ্য স্বরূপ হয়ে যায়, তখন যে সুখ আসে সেই সুখ তাকে আকাশে তুলে দিতে পারে না, আর যে দুঃখ আসে তখন সেই দুঃখ তাকে ধরণীর ধুলিতলে ফেলে দিতে পারে না।

শ্লোকের শেষ লাইনে বলছেন *জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্*, এই রকম যিনি জীবন যাপন করেন তিনি আপনার বিষ্ণুপদ, পরমপদ, মোক্ষপদ, ব্রহ্মপদ পাওয়ার অধিকারী ঠিক সেইভাবে হন, যেভাবে সন্তান তার পিতার সম্পদের অধিকারী হয়। অর্থাৎ বলতে চাইছেন সুখ-দুঃখ যাঁর সমান হয়ে গেছে মুক্তি তাঁর মুঠোয়। সমগ্র গীতা শুধু এই একটি কথা বলতে চাইছে – *ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।* আচার্য শঙ্কর গীতার ভাষ্য দিতে গিয়ে বলছেন শোক আর মোহ এটাই সংসার। যেটা চলে গেছে, আমার হাতের মুঠো থেকে যেটা হারিয়ে গেছে সেটার জন্য শোক হচ্ছে আর যেটা আমার কাছে নেই সেটাকে পেতে চাইছি এটাই মোহ। সংসার মানেই এই দুটো, শোক আর মোহ। সংসারে এই দুটো ছাড়া আর কিছু নেই। প্রকৃতি প্রকৃতির মত চলছে কিন্তু তার মধ্যে আমরা নিজেদের জড়িয়ে রেখেছি আর মনে করছি যা কিছু হচ্ছে সব আমার উপরই হচ্ছে। বেশী গরম পড়ছে, হাঁকপাঁক করছি। ঠাণ্ডা পড়ছে, ঠাণ্ডায় জমে কুঁকড়ে যাচ্ছি। বালবুদ্ধি যাদের তাদের এই রকম হওয়ারই কথা। যারা যৌবনে টগবগ করে ফুটছে, তাদের সব কিছু হরমোনাল ভারসাম্যহীনতায় চলছে। সে সামলাতে চাইলেও সামলে উঠতে পারছে না। ঠাকুর যখন নরেনের প্রশংসা করছেন তখন তিনি এই কথাই বলছেন – নরেনের এত গুণ আবার এদিকে কামজয়ী, বলে বিয়ে করবে না। কুড়ি বাইশ বছরের ছেলে বলছে বিয়ে করবে না, এ অসম্ভব জিনিষ। কিন্তু যারা বিয়ে করছে তাতে কোন দোষ নেই, যাদের বিয়ে করার ইচ্ছে আছে নিশ্চয়ই বিয়ে করবে। ঠাকুরও ঠিক এই কথাই বলছেন – বর্ষাকালের জল বাঁধ দিলে বাঁধ ভেঙে যাবে। বলেই আবার বলছেন – অনেক জল তো বেরিয়ে গেছে এবার বাঁধটা দাও। গৃহস্থদের জন্য ঠাকুরের এটি একটি অত্যন্ত মূল্যবান উপদেশ। ঠাকুর কোথাও গৃহস্থদের কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগের কথা বলছেন না, শুধু বলছেন বর্ষাকালের জল বাঁধ দিলে বাঁধ ভেঙে উড়ে যাবে, কিন্তু এখন অনেক জল তো বেরিয়ে গেল এবার বাঁধটা দাও। তার মানে? কামিনী-কাঞ্চনের অনেক ভোগ তো করে নিয়েছ, এবার একটু ক্ষ্যামা দাও, ক্ষ্যামা দিয়ে এবার একটু ভগবানকে ধর।

ব্রহ্মা এইভাবে স্তুতি করে খুব মিষ্টি ভাবে আবেগের সঙ্গে বলছেন ***উৎক্ষেপণং গর্ভগতস্য পাদয়োঃ কিং কল্পতে মাতুরধোক্ষজাগসে। কিমস্তিনাস্তিব্যপদেশভূষিতং তবাস্তি কুক্ষেঃ কিয়দপ্যনন্তঃ।।১০/১৪/১২।*** ‘শিশু যখন মায়ের গর্ভে হাত পা ছোড়ে, তখন কি মা ভাবী সন্তানের কোন অপরাধ নেয়? ঠিক তেমনি সমগ্র বিশ্বজগৎ আপনার উদরে, আমিও তো আপনার ভেতরে, আমি যদি কোন অপরাধ করে থাকি তাহলে আমাকে ক্ষমা করে দিন’।

জগৎত্রয়ান্তোদধিসংপ্লবোদে নারায়ণস্যোদরনাভিনালাৎ বিনির্গতোহজস্ত্বিতি বাঙ্ ন বৈ মৃষা কিং ত্বীশ্বর ত্বন্ন বিনির্গতোহস্মি।।১০/১৪/১৩। ‘হে নারায়ণ! আপনিই শ্রেষ্ঠ। শ্রুতি বলে, তিনটে লোকের প্রলয় হয়ে যাওয়ার পর চারিদিকে যখন একমাত্র সেই প্রলয়কালীন জল ছিল সেই সময় আপনার নাভি কমলে আমার জন্ম হয়, সেইজন্য আমি হলাম আপনার পুত্র। শ্রুতির কথা মানে আপনারই কথা, সেই শ্রুতি বলছে আমি আপনার পুত্র, এটা তো তাই মিথ্যা হতে পারে না। আমি যদি পুত্র হই তাহলে আমি যে অহঙ্কার করে অপরাধ করেছি সেই অপরাধ আপনি পিতা হয়ে ক্ষমা করে দেবেন’। এখানে তিনটে লোক বলতে বোঝায় ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ। স্বঃ মানে উপরে যাবতীয় যা কিছু আছে সবটাকে স্বঃ দিয়ে বলা হচ্ছে। আমরা যেখানে বাস করছি তা হল

ভূঃ লোক আর ভূঃ এবং স্বঃ এর মাঝামাঝিতে যা কিছু আছে তাকে ভূবঃ লোক বলে। পাতাললোককে এই হিসাবের মধ্যে নেওয়া হয় না। তিনলোকের আরেকটি অর্থ হতে পারে স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ নিয়ে যে তিনটে জগৎ। এই তিনটে জগৎ তখন কোথায় ছিল? বলছেন প্রলয়কালীন জলে অবস্থিত ছিল। দশাবতারের কাহিনীতেও এই প্রলয় জলের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই জিনিষগুলোকে যখন পুরাণের দৃষ্টিতে দেখা হয় তখন দেখি বিরাট বন্যার মত কিছু হয়েছে, আর সেই বন্যায় সব কিছু ভেসে গেছে। আসলে তা নয়, আমাদের দর্শনে এই জলকে বলা হয় কারণ সলিল। কারণ মানে সৃষ্টির সময় যেখান থেকে সব কিছু বেরিয়ে আসে। বোঝাবার জন্য বলা হয় কারণ সলিল, কারণ আমরা জানি জল থেকেই সব কিছুর উৎপত্তি। স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ তখন মহাকারণে লয় হয়ে থাকে। মহাকারণে যখন সব কিছু লয় হয়ে থাকে তখন পুরাণের পরিভাষায় তাকে বলছেন প্রলয়কালীন জল। তার মানে সৃষ্টি তখন নেই, সৃষ্টি তখন মহাকারণে লয় হয়ে আছে।

তাহলে তখন কি ছিল? ব্রহ্মা বলছেন – তখন শ্রীনারায়ণই ছিলেন, ভগবান ছাড়া আর কিছুই ছিল না। সেই ভগবান নারায়ণের নাভিকমল থেকে ব্রহ্মার জন্ম। এই কথা আমি অর্থাৎ ব্রহ্মা বলছেন না, শ্রুতি এই কথা বলছে, শ্রুতি মানে বেদ বলছে। যদিও আমরা এখানে পুরাণের কথা বলছি কিন্তু পুরাণও সেই শ্রুতির কথা টেনে নিয়ে আসছে। আর ব্রহ্মা সেই ছোট্ট বালক রূপী ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বলছেন, সেইজন্য আমি তো আপনারই পুত্র। শ্রীকৃষ্ণের বয়স তখন মাত্র ছয় কি সাত বছর, তাঁকে ব্রহ্মা হাতজোড় করে বলছেন – আমি তো আপনারই পুত্র, কারণ শ্রুতি বলে গেছে ব্রহ্মার জন্ম ভগবান নারায়ণের নাভিকমল থেকে।

ব্রহ্মা বলছেন ***নারায়ণস্ত্বং ন হি সর্বদেহিনামাত্মাস্যধীশাখিললোকসাক্ষী নারায়ণোঽঙ্গং নরভূজলায়না-ত্তচ্চাপি সত্যং ন তবৈব মায়য়া।।১০/১৪/১৪।*** হে প্রভু! আপনি হলেন সর্বজীবের আত্মা সেইজন্য আপনার নাম নারায়ণ। নার মানে জীব আর অয়ন মানে আশ্রয়, সর্বজীবের যিনি আশ্রয় তিনিই নারায়ণ। নারায়ণের দ্বিতীয় অর্থ হয়, আপনি জগৎ আর জীবের অধীশ্বর, আপনি সবারই মালিক। এখানে নার মানে জীব আর অয়ন মানে প্রবর্তক অর্থাৎ চালক। আপনি সমস্ত জীবের অধীশ্বর তাই আপনার নাম নারায়ণ। নারায়ণের তৃতীয় অর্থ – যিনি সর্বলোকের সাক্ষী, অর্থাৎ নার মানে জীব আর অয়ন মানে জ্ঞাতা। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যাবতীয় যা কিছু ঘটন-অঘটন হয় তার সব কিছুর সাক্ষী ভগবান। নয়ন আর অয়ন একই ধাতু থেকে উৎপন্ন, নয়ন মানে দেখা আর অয়ন মানে সাক্ষী। যিনি জীবের সব কিছুর, জীব যা কিছু করছে তিনি তার সাক্ষী। হিন্দু মতে বা বেদান্ত মতে pre-destiny বলে কিছু হয় না। ভগবান আগে থাকতেই সব ঠিক করে রেখেছেন এই কথা আমাদের হিন্দু ধর্মের কোন শাস্ত্রই বলে না। হিন্দু ধর্ম ছাড়া অন্যান্য ধর্মে এই মতকেই মানা হয়। ইসলাম বা খ্রীশ্চান ধর্ম যদি pre-destiny না মানে তাহলে তাদের ধর্মটা ভেঙে যাবে, এদের ভগবান হলেন Created God। বেদান্তে ঈশ্বর সব সময় সাক্ষী। ঈশ্বর শুধু দেখেন। ঈশ্বর সব কিছুর মধ্যে জড়িয়ে পড়তে পারেন কিনা এই নিয়ে নানান রকমের তর্কবিতর্ক আছে। এর উপর বইয়ের পর বই লিখে দেওয়া যায়। কথামৃতেও এই নিয়ে অনেক কথা পাওয়া যায়। বেদান্তে ঈশ্বর হলেন সাক্ষী, তিনি কর্মাধ্যক্ষ। যত কিছু কর্ম হয় সব কর্ম ভগবানের অধীনেই হয়ে থাকে, তিনি যদি সাক্ষী না থাকেন তাহলে কোন কিছুই হবে না। আজকে যদি কোন ট্রেন দুর্ঘটনা হয়, তার জন্য রেলমন্ত্রীকে দায়ী করা হয় না, দায়ী করা হয় ড্রাইভারকে বা রেলের অন্য কোন কর্মচারীকে। কিন্তু এর মধ্যে রেলওয়ে মন্ত্রককেও দায় এড়িয়ে যেতে দেওয়া হয় না। প্রধানমন্ত্রী রেলমন্ত্রীকে বলতে পারেন – কি হে! তোমার দায়ীত্ব নেওয়ার পর রেলের এত দুর্ঘটনা বেড়ে যাচ্ছে কেন। কিন্তু যাই হোক না কেন, দুর্ঘটনার জন্য রেলমন্ত্রী কোন ভাবে দায়ী নন, কিন্তু তাঁকেও ধরা হয়। ঠিক তেমনি ভগবান এর জন্য আদপেই দায়ী নন। কিন্তু তাও ভগবানকে দায়বদ্ধতা থেকে রেহাই দেওয়া হয় না। কিন্তু এই রেহাই না দেওয়ার মধ্যেও ঈশ্বরের ব্যাপারে কিছু ভ্রান্ত ধারণা কাজ করে। কারণ ভগবান হলেন কর্মাধ্যক্ষ, তিনি আছেন বলে সব কিছু ঠিক ঠিক মত কাজ করছে। যখন তিনি দেখেন এই জায়গাতে গোলমাল হচ্ছে তখন অফিসারদের যেমন সরিয়ে দেওয়া হয়, তিনিও ওই জায়গার দায়ীত্বে যিনি আছেন তাঁকে সরিয়ে দেন।

কর্মবাদের প্রধান কার্যকরি শক্তিই হল কর্ম। বেদে এই কার্যকরী শক্তিকেই বলা হয় ঋতম্। ঋতমের শক্তি সব কিছুকে ঠিক ভাবে একটা সুনির্দিষ্ট নিয়মের মধ্যে চালায়, বৌদ্ধ ধর্মে এই ঋতমকেই বলা হয় ধর্মচক্র, খ্রীশ্চান ধর্মে বলে God's Will। মুসলমানরা বলে আল্লার মর্জিতে সব কিছু চলছে। কিন্তু হিন্দুরা বলবে সব কিছু কর্মের জন্য চলছে। কার কর্মের জন্য চলছে? তোমার নিজের কর্মের জন্যই চলছে। অন্যান্য ধর্ম কর্মের জন্য সব কিছু চলছে বললে বলবে, এটা অযৌক্তিক। কর্মবাদ যদি অযৌক্তিক হয় তাহলে তোমার ধর্মচক্রও কি যুক্তিযুক্ত? তোমার আল্লার মর্জিও কি যুক্তিপূর্ণ? কর্মবাদ যদি অযৌক্তিক হয় তাহলে এগুলোও অযৌক্তিক। স্বামীজী বার বার বলছেন, কর্মের ব্যাখ্যা করার জন্য যত মত আছে তার মধ্যে কর্মবাদই যৌক্তিকতার দিকে থেকে সব থেকে পূর্ণ। হিন্দু ধর্ম ভগবানের উপর সব দোষ না চাপিয়ে পুরোপুরি নিজের উপরে নিয়ে নেয়।

এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আমাদের কাছে একটা বিরাট প্রশ্নবোধক। এই জগৎটা কি? এই জগৎ কীভাবে সৃষ্টি হল? একে কি সৃষ্টি করলেন? ইত্যাদি। তখন বিভিন্ন পণ্ডিতরা এই প্রশ্নের মীমাংসার জন্য বিভিন্ন রকম মডেল দেন। মডেল মানে একটা বিশেষ মতে ব্যাখ্যা করা। যেমন, আইনস্টাইন একটা মডেল দিলেন, সেই মডেলের কিছু কিছু মৌলিক ধারণা আছে। কিছু দিন আগে বিজ্ঞানীরা বললেন আইনস্টাইনের মডেলে আলোর যে গতির কথা বলা হয়েছে, আলোর গতিকে কেউ অতিক্রম করতে পারে না, এই থিয়োরী আর চলছে না। কারণ নিউট্রিন আলোর গতিকে অতিক্রম করে যাচ্ছে। আমরা বলতে পারবো না, শেষ পর্যন্ত আধুনিক বিজ্ঞানীদের এই থিয়োরী প্রমাণিত হবে কিনা। যদি প্রমাণিত হয়ে যায় তাহলে কি জগৎটা উল্টে যাবে নাকি? কিছুই হবে না। এরপর হয়তো আরও কোন বড় বিজ্ঞানী আসবেন, তিনি নিউটনের সিদ্ধান্ত, আইনস্টাইনের সিদ্ধান্ত, কোয়ান্টামের সিদ্ধান্তকে নিয়ে আরেকটা কোন ভালো মডেল দিয়ে দেবেন। যত দিন আইনস্টাইন ছিলেন না, তত দিন কি আমাদের গ্রহ নক্ষত্ররা চলছিল না, স্টিম ইঞ্জিন চলছিল না? আমাদের কাজকর্ম কি সব তখন বন্ধ ছিল? সব কিছুই চলছিল। কোন্ সিদ্ধান্তে চলছিল? নিউটনের সিদ্ধান্তে। পরে আইনস্টাইন এসে বললেন, নিউটনের সিদ্ধান্তে কিছু কিছু ফাঁক থেকে গেছে। আইনস্টাইন তখন কিছু সিদ্ধান্ত দিয়ে আরও অনেক কিছু পরিষ্কার করে দিলেন। আইনস্টাইনের সিদ্ধান্তে আবার কিছু সমস্যা দেখা দিয়েছে, তখন আরেকজন আবার একটা ভালো সিদ্ধান্ত দেবেন। জগৎকে ব্যাখ্যা করার জন্য যত গুলো সিদ্ধান্ত আছে তার মধ্যে কর্মবাদ হল যৌক্তিকতার দিক থেকে সব থেকে শ্রেষ্ঠ সিদ্ধান্ত। অনেকে বলবেন এর মধ্যেও অনেক ফাঁক আছে। ফাঁক তো সব কিছুর মধ্যেই পাওয়া যাবে, তাহলে কর্মবাদের থেকেও ভালো কোন সিদ্ধান্ত নিয়ে আসুক না কেউ। তোমাকে তো কেউ নিষেধ করছে না, তুমিও তাহলে নতুন কিছু সিদ্ধান্ত নিয়ে আসো। তুমি যে বলছ সব ঈশ্বরের মর্জি বা আল্লার মর্জি, এর থেকে বেশী অযৌক্তিক কি আর কিছু হতে পারে! ঈশ্বর একজনকে খুব বড়লোক করে পাঠাবেন আরেকজনকে হতদরিদ্র করে পাঠাবেন, এই জিনিষ কি কখন হতে পারে! এই ধরণের এক আহাম্মক ভগবানকে নিয়ে আমাদের কোন দরকার নেই। সেইজন্যই স্বামীজী খুব রেগে গিয়ে বলেছিলেন – যে ভগবান এখানে আমাকে এক টুকরো রুটি দিতে পারেন না আর সেই ভগবান আমাকে স্বর্গে অনন্ত সুখ দেবেন, আমি সেই ভগবানকে বিশ্বাস করি না। তাহলে বেদান্তের ভগবান কে? তিনি সাক্ষী স্বরূপ। তাহলে চালাচ্ছেন কে? তোমার কর্ম। কর্ম ছাড়া কিছু নেই।

এখানে সেটাই বলছেন, নার মানে জীব আর অয়ন মানে দেখা। যিনি কর্মাধ্যক্ষ রূপে জীবের সব কিছু কর্ম শুধু দেখে যাচ্ছেন, কোথাও তিনি মাথা গলাবেন না। এই ব্যাপারটা ঠাকুর অতি সাধারণ একটা উপমা দিয়ে খুব সুন্দর বুঝিয়ে দিচ্ছেন। উৎসব বাড়িতে একজন কর্তা আছেন এবং একজন ভাণ্ডারীও আছেন। ভাণ্ডারী এখন ভাণ্ডারের সব দায়ীত্বে আছেন, এই মুহুর্তে কারুর যদি কিছু দরকার হয় আর সে যদি গৃহকর্তার কাছে গিয়ে চায় তখন গৃহকর্তা বলবেন – ভাণ্ডারে একজন আছেন, তোমাকে বাপু তাঁর কাছেই চাইতে হবে। শীতকালে ঠাণ্ডায় আমি জমে যাচ্ছি আর ঠাকুরকে বলছি – হে ঠাকুর আমাকে ঠাণ্ডা থেকে বাঁচাও। ঠাকুর তখন কি বলবেন? ঠাকুর বলবেন – আমার ভাণ্ডারি আছে। ভাণ্ডারি মানে, আমি আগুন দিয়ে রেখেছি, আগুনের কাজ হল গরম করা। তুমি বাপু নিজে আগুনটা জ্বালাও, আগুন জ্বালানো আমার কাজ নয়। সূর্যও ঠাকুরের আরেকজন

ভাণ্ডারী, সূর্যের কাজ হল আলো দেওয়া। তোমার ক্ষিধে পেয়েছে? তার জন্য খাদ্য আমি আগেই পাঠিয়ে দিয়েছি। তোমাকে নিজে খেটেখুটে খাদ্য জোগাড় করে খেতে হবে। তোমার পেট ভরাতে হলে তোমাকেই খেতে হবে, আমি খেয়ে তোমার পেট ভরিয়ে দিতে পারবো না। সব জায়গাতেই ভগবানের একজন ভাণ্ডারী আছেন। কেউ যদি ভাণ্ডারীকে অতিক্রম করে যান তখনই ভগবান তাঁর দায়ীত্ব নেন। এই ধরণের মহাত্মা জগতে অতি দুর্লভ। এই ধরণের মহাত্মাদের জন্যই গীতায় ভগবান বলছেন *যোগক্ষেমং বহাম্যহম্*। যাঁরা খুব উচ্চকোটির পুরুষ তাঁদের ভগবান তাঁর ভাণ্ডারীদের দিয়ে কিছু পাঠান না, ভগবান নিজে তাঁদের জন্য বহন করে নিয়ে যান। অন্যদের ভগবানই দিচ্ছেন কিন্তু ভাণ্ডারীর মাধ্যমে দিচ্ছেন।

নারায়ণের আরেকটি অর্থ করছেন – অয়ন মানে নিবাসস্থান আর নার মানে জল, জলে যিনি নিবাস করেন তিনিই নারায়ণ। যেহেতু তিনি ক্ষীরসাগরে শেষনাগের উপর শয়ন করে আছেন তাই তাঁর আরেকটি নাম নারায়ণ। অনেক জায়গায় ক্ষীরসাগর না বলে বলা হয় প্রলয়কালীন জল, এই প্রলয়কালীন জলের উপর তিনি শয়ন করে থাকেন, ব্রহ্মার যে প্রথম দর্শন হয় তা এখানেই হয়, তিনি জলের উপর শয়ন করে আছেন, সেইজন্য ভগবানের আরেকটি নাম নারায়ণ। এইভাবে ব্রহ্মা এখানে নারায়ণের চারটি অর্থ করছেন। ভক্তি আর মেধার যুগলবন্দীতে আধ্যাত্মিক শাস্ত্র যে কত উচ্চ পর্যায়ে যেতে পারে এই শ্লোকটিই তার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। চারটি অর্থই উপযুক্ত অর্থে প্রযুক্ত হয়। মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন – আমি এক সঙ্গে চারটি রূপে বিরাজ করে থাকি। তিনি সর্বব্যাপী নির্গুণ নিরাকার রূপে আছেন, তিনি ক্ষীরসাগরে শেষনাগের উপর শয়ন করে আছেন, বদ্রীনাথে তিনি নারায়ণ ঋষি হয়ে তপস্যা করে যাচ্ছেন আর শ্রীকৃষ্ণ রূপে দেহধারণ করে অর্জুনকে উপদেশ দিচ্ছেন।

ঈষোপনিষদের প্রথম মন্ত্রেই বলা হচ্ছে *'ঈশাবাস্যমিদং সর্বং'*। কি সর্বং? সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে যত জড় আর চেতন আছে সব কিছুর মালিক তিনি নিজে। কেন মালিক? তিনি হলেন প্রবর্তক, অগ্নিতে কেন দাহিকা শক্তি আছে? কেননা ভগবান নিজেই অগ্নিকে দাহিকা শক্তি প্রদান করে তাকে ঐ কাজে লাগিয়েছেন। আমরা যে প্রার্থনা করি – হে ভগবান, তুমি আমাকে ভালোর দিকেও নিয়ে যাও আবার খারাপের দিকে তুমিই পাঠাও। আমাদের ধর্মে তাই খারাপ কিছুর জন্য কোন সমস্যা হয় না। অন্যান্য ধর্মে যেমন বলে ভালো জিনিষটা ভগবান করান আর খারাপ জিনিষটা শয়তান করে। কিন্তু হিন্দু ধর্মে ভালোটাও তাঁর আবার খারাপটাও তাঁর।

মজার ব্যাপার হচ্ছে, এই ভাবে স্তুতি করে ব্রহ্মা শ্লোকের শেষাংশে বলছেন *নারায়ণোঽঙ্গং নরভূজলায়নাত্তচ্চাপি সত্যং ন তবৈব মায়া।* দশম স্কন্ধের চতুর্দশ অধ্যায়ের এই চৌদ্দ নম্বর শ্লোকটি খুব জটিল। কৃষ্ণভক্তরা এই শ্লোকের উপর বেশী জোর দেন। এই ধরণের শ্লোকের জন্যই ভাগবতকে অত্যন্ত কঠিন গ্রন্থ বলা হয়। ভাগবতের মত কঠিন গ্রন্থ হিন্দু ধর্মে আর আছে কিনা বলা মুশকিল। কারণ, এর মধ্যে এত রকমের দর্শনকে নিয়ে আসা হয়েছে যার ফলে ভাগবত কি ভক্তিগ্রন্থ, নাকি অদ্বৈত গ্রন্থ, নাকি বিশিষ্টাদ্বৈত, না সমন্বয় গ্রন্থ বলা প্রায় অসম্ভব। যেমন এখানে বলছেন আপনি যে ক্ষীরসাগরে শেষনাগের উপর শয়ন করে আছেন, এই নারায়ণ আপনারই একটা অংশ। শ্রীকৃষ্ণ যিনি, তাঁরই একটা অংশ হলেন বিষ্ণু। কিন্তু আমরা যখন শাস্ত্র অধ্যয়ন করি তখন বেশীর ভাগ জায়গায় যখন শ্রীকৃষ্ণকে অবতার বলা হয় তখন তাঁকে বিষ্ণুর অংশে অবতার বলা হয়। গীতার ভাষ্যে আচার্য শঙ্করও এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু ভাগবত কোথাও কোথাও ভগবান বিষ্ণুকে শ্রীকৃষ্ণের অংশ রূপে বর্ণনা করে নারায়ণকেই অবতার বানিয়ে দিচ্ছেন আর শ্রীকৃষ্ণকে অবতারি বলছেন। কিন্তু সচরাচর বলা হয়, শ্রীকৃষ্ণ হলেন অবতার আর ভগবান বিষ্ণু হলেন অবতারি। কিন্তু এই শ্লোকে পুরো ব্যাপারটাকে ঘুরিয়ে দিচ্ছেন।

এই শ্লোকটিকে যদি ভক্তির দৃষ্টিতে ভক্তের বিশেষ ভাবের অভিব্যক্তি রূপে ভাবা হয়, ভক্ত নিজেকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণে সমর্পিত করে দিয়ে একটা যে ভাবের উদ্গার হচ্ছে, সেই ভাবের দৃষ্টিতে দেখলে ঠিক আছে। কিন্তু শ্লোকের অর্থকে পুরোপুরি আক্ষরিক ভাবে নিলে শাস্ত্রের অনেক বক্তব্যকেই পরস্পর বিরোধী বক্তব্যে দাঁড় করিয়ে দিয়ে তালগোল পাকিয়ে দেবে। বৈষ্ণব ভক্তদের সাথে বাকি মতাবলম্বীদের বিবাদের এটাই একটা

প্রধান বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। বৈষ্ণবরা বলেন কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং, বাকি সবাই অংশ বা কলা। তাই যে নারায়ণের কথা বলা হচ্ছে তিনিও ভগবানের একটা অংশ মাত্র। অংশ বলেই আবার বলছেন এটা আপনারই মায়া। যেই মায়া বলে দেওয়া হল তখন এটাই ঘোর অদ্বৈত বেদান্তে চলে গেল। অথচ তার আগে যেভাবে বলা হয়েছে সেটা দেখে মনে হবে যেন দ্বৈতভাবের কথা বলা হচ্ছে। তবে এখানে ব্রহ্মা স্তুতি করছেন, ব্রহ্মা প্রথম নারায়ণের দর্শন করেছেন, দর্শন করেছেন বলে তিনি মায়া থেকে উৎপন্ন হয়ে গেলেন, কারণ মন বুদ্ধি দিয়ে তাঁকে বোঝা যাচ্ছে। তাই নারায়ণও মায়াজাত, যা কিছু মায়াজাত সেটাই নিকৃষ্ট। সেইজন্য বিষ্ণু হয়ে গেলেন নিকৃষ্ট। ব্রহ্মার তুলনায় নিকৃষ্ট নন, শ্রীকৃষ্ণের অংশ রূপে নিকৃষ্ট। কিন্তু এখন যে শ্রীকৃষ্ণকে ব্রহ্মা মন বুদ্ধি দিয়ে দেখছেন, সেই ব্যাপারে আর কিছু বলছেন না। আসলে ভক্তিশাস্ত্র এভাবেই চলে, ভক্তের ভক্তির তোড়ে যে উদ্গার হয় তাতে অনেক কিছুই বেরিয়ে আসতে পারে, যা অতিশায্য দোষে সম্পৃক্ত হলে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

সেইজন্য ভাগবতের অনেক শ্লোককে আধার করে দ্বৈত, অদ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈত এই তিনটে দর্শনকেই প্রাণ খুলে ব্যাখ্যা করে দেওয়া যায়। যিনি একটা মতকে ধরে নিয়েই এগোতে চাইবেন তাঁর পক্ষে ভাগবতকে অনেক শ্লোকের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে প্রচুর সমস্যায় পড়তে হবে। অবশ্য শ্লোকের মধ্যে এতো স্বাধীনতা দেওয়া আছে যে, যার জন্য যে কোন মতের পণ্ডিত ভাষার অর্থকে কায়দা করে পাল্টে নিয়ে নিজের মতকে ব্যাখ্যা করে বেরিয়ে যেতে পারবেন। উপনিষদে এই কায়দা করার সুযোগ একেবারেই পাওয়া যাবে না। কারণ উপনিষদে যত মন্ত্র দেওয়া আছে তার কোনটাকেই দ্বৈত বা বিশিষ্টাদ্বৈত মতে ব্যাখ্যা করা যায় না। কিন্তু ভাগবতের শ্লোকগুলিকে নিয়ে অনেক ভাবে খেলা করা যেতে পারে। যেমন এর আগে আমরা একটা শ্লোকে দেখলাম যেখানে শ্রীকৃষ্ণকে বলছেন – হে প্রভু! বেদে যাঁকে নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্ম বলছে সেটা আপনারই লীলা। অর্থাৎ, যিনি ভগবান তাঁর লীলা হলেন ব্রহ্ম, তাঁরই মায়াশক্তিতে ব্রহ্ম হয়ে যান নির্গুণ নিরাকার। অথচ বেদান্ত মতে যিনি ব্রহ্ম, তাঁরই মায়াতে নির্গুণ ব্রহ্মকে সগুণ ঈশ্বর রূপে দেখায়।

এই শ্লোকে ব্রহ্মা বলছেন – হে প্রভু! এই যে আপনার নারায়ণ নামের এত রকম অর্থ করা হল, এই নারায়ণ আপনারই একটা অংশ। এর মানে কি দাঁড়াল? ব্রহ্মার কথা ছেড়ে দিন, যে বিষ্ণুকে সবার উপরে রাখা হয়েছে যে তিনিই একমাত্র ঈশ্বর, ব্রহ্মার এই উক্তিতে সেই বিষ্ণুর উপরেও আরেকজন এসে গেলেন। এখানে আবার অনবস্থা দোষ এসে যাচ্ছে। কিরকম? অবতার কে হন? ভগবান বিষ্ণুইতো অবতার হন, এখন শ্রীকৃষ্ণকে বলা হচ্ছে, ঐ যে নারায়ণ যিনি অবতার হন, আপনি তাঁরও পারে। তার মানে আপনি হলেন অবতারি। মানে যেখান থেকে যাঁর শক্তিতে অবতরণ হয়। তাহলে এখন বিষ্ণুর দুটো দিক এসে যাচ্ছে একটা উচ্চ দিক আরেকটা তার থেকে কম উচ্চ দিক। উচ্চ দিক কোনটা? শ্রীকৃষ্ণ, যাঁকে ভাগবত বলছে *'কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং'*। এই তত্ত্বটা বারবার হিন্দু দর্শনে আসবে। তাহলে বিষ্ণু কে? বলছেন, আপনারই রূপ কিন্তু ছোট রূপ। খ্রীশ্চান ধর্মেও এই ধরণের ধারণা পাওয়া যাবে, তারাও বলে ভগবানের দুটি রূপ। একটা God আরেকটা God Head। God Head হলেন এই যে শ্রীকৃষ্ণকে বন্দনা করা হচ্ছে, তিনি, আর God হলেন যেন ভগবান বিষ্ণুর স্বরূপ। এটাই কিন্তু original concept in Christianity কিন্তু পরবর্তি কালে তারা এই ধারণাকে বাদ দিয়ে নিয়ে এল শুধু God এর ধারণা। হিন্দুদের অবতার আর অবতারির যে ধারণা এটাকে ইংরাজীতে অনুবাদ করলে God and God Head হবে। ভগবান বিষ্ণুর যে রূপ আমরা দেখছি তাঁরও ওপরে একটা রূপ আছে তিনিই হচ্ছেন অবতারি, মানে যেখান থেকে আর যাঁর শক্তিতে অবতাররা যুগে যুগে আসেন।

এরপর ব্রহ্মা আরও স্তুতি করে ভগবান কীভাবে সৃষ্টি করেন সেটাকে একটু ব্যাখ্যা করে বলছেন। আমরা এর আগে আগে সৃষ্টির ব্যাপারে অনেক আলোচনা করেছি, তাই এর মধ্যে না গিয়ে অন্য শ্লোকে চলে যাচ্ছি। একটা স্তুতিতে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলছেন ***একস্ত্বমাত্মা পুরুষঃ পুরাণঃ সত্যঃ স্বয়ংজ্যোতিরনন্ত আদ্যঃ। নিত্যোঽক্ষরোঽজস্রসুখো নিরঞ্জনঃ পূর্ণোঽদ্বয়ো মুক্ত উপাধিতোঽমৃতঃ।।১০/১৪/২৩।*** ঈশ্বরের স্তুতি করার জন্য এটি খুব সুন্দর একটি শ্লোক। *একঃ ত্বম্ আত্মা*, আপনিই সেই একমাত্র আত্মা, *পুরুষঃ পুরাণঃ*, আপনি সেই পুরাণ পুরুষ। বেদে আগে ঈশ্বর বা ভগবানের কোন ধারণা ছিল না, বেদে আদিপুরুষ, অধিপুরুষ

বা শুধু পুরুষের ধারণাই ছিল। ব্রহ্মাও ঠিক সেইভাবে বলছেন আপনি সেই পুরাণ পুরুষ মানে আদিপুরুষ, আদি কাল থেকে আপনিই আছেন। *সত্যঃ স্বয়ংজ্যোতিরনন্ত আদ্যঃ*, আপনিই সত্য, আপনি স্বয়ং প্রকাশ। স্বয়ং প্রকাশ মানে, জগতের যে কোন জিনিষকে দেখার জন্য আলো দরকার, আলো আছে বলে আমরা এক অপরকে দেখতে পাই আর আলোকেও দেখতে পারছি, কিন্তু ভগবান স্বয়ং প্রকাশ, ভগবানকে দেখার জন্য বুদ্ধির আলো বা অন্য কোন আলোর দরকার হয় না।

ব্রহ্মা বলছেন *নিত্যোহক্ষরোহজস্রসুখো*, আপনি অবিনাশী তাই আপনি নিত্য আর আপনার আনন্দও অখণ্ডিত। *নিরঞ্জনঃ*, আপনার মধ্যে কোন ধরণের মল নেই তাই আপনি নিরঞ্জন, *পূর্ণোঽদ্বয়ো*, আপনি সব সময় পূর্ণ, অদ্বয়। *মুক্ত উপাধিতোঽমৃতঃ*, সমস্ত রকম উপাধি থেকে আপনি মুক্ত, তাই আপনি অমৃতস্বরূপ। এগুলোই ভগবানের ঠিক ঠিক গুণ। যার যিনি ইষ্ট তাঁর উপর এই গুণগুলো আরোপ করে ঈশ্বরের গুণচিন্তন করা যেতে পারে। শ্রীকৃষ্ণ যার ইষ্ট সেও শ্রীকৃষ্ণের উপর এই শ্লোক আরোপ করতে পারবে, শ্রীরামচন্দ্র যার ইষ্ট সেও শ্রীরামচন্দ্রের উপর এই গুণগুলো আরোপ করতে পারবে, শ্রীরামকৃষ্ণ যদি কারুর ইষ্ট হন সেও এই শ্লোকটিকে আরোপ করে সেইভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের গুণচিন্তন করতে পারে।

পরের শ্লোকে এই ভাবকেই যেন বলতে চাইছেন – ***এবংবিধং ত্বাং সকলাত্মনামপি স্বাত্মানমাত্মাতয়া বিচক্ষতে। গুর্বর্কলব্ধোপনিষৎ সুচক্ষুষা যে তে তরন্তীব ভবানৃতাম্বুধিম্।।১০/১৪/২৪।*** মানুষের মধ্যে যে চৈতন্য বিদ্যমান, সেই চৈতন্যকে যিনি আগের তেইশ নম্বর শ্লোকের বর্ণনা অনুযায়ী বুঝে নেন, সবারই স্বরূপ সেই ভগবান, তখন তাঁর কি হয়? *যে তে তরন্তীব ভবানৃতাম্বুধিম্*, গুরুর কাছে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে যিনি আপনাকে মানে ভগবানকে নিজের আত্মস্বরূপে সাক্ষাৎ করেন তাঁরা অনৃত, অর্থাৎ মিথ্যা জন্ম-মৃত্যু রূপ যে সমুদ্র, তার পারে চলে যান। জন্ম-মৃত্যুর পারে কা যাবে? বলছেন একমাত্র আপনার ভক্তই পারে যায়। কোন ভক্ত? যে ভক্ত তাঁর ইষ্টকে নিজের আত্মস্বরূপে দর্শন করেন, তার মানে, যিনি জ্ঞানী, যিনি আত্মাকে সাক্ষাৎ করে নিয়েছেন তিনিই একমাত্র আত্মজ্ঞান পেয়ে যান। কীভাবে আত্মা সাক্ষাৎ করেন? তেইশ নম্বর শ্লোক, *একস্ত্বমাত্মা পুরুষঃ পুরাণঃ*, আমার যে আত্মা তাঁর এই এই গুণ – তিনিই একমাত্র সত্য, তিনিই সবার আত্মা, তিনি আদিপুরুষ, তিনি স্বয়ংপ্রকাশ। আত্মাকে যে শুধু হিন্দুরাই এভাবে দেখবে তা নয়। মুসলমানদের মধ্যে যাঁরা সাধক তাঁরাও এইভাবেই দেখেন, খ্রীশ্চানদের যাঁরা ডেজার্ট ফাদার ছিলেন তাঁরাও এভাবেই দেখেন। সাধনা করে আত্মাকে সাক্ষাৎ করার পর যেভাবে তাঁরা আত্মার বর্ণনা করেছেন, তাতে সবার একই অভিব্যক্তি।

যাই হোক ব্রহ্মা স্তুতি করে বলছেন যে যিনি আপনার আশ্রয় নেন তিনি মুক্তি পেয়ে যান, এইসব বলার পর বলছেন ***অজ্ঞানসংজ্ঞৌ ভববন্ধনমোক্ষৌ দ্বৌ নাম নান্যৌ স্ত ঋতজ্ঞভাবাৎ। অজস্রচিত্যাত্মনি কেবলে পরে বিচার্যমাণে তরণাবিবাহনী।।১০/১৪/২৬।*** এটিও একটি খুব মজার শ্লোক। ভক্তিমার্গের পণ্ডিতরা বলে থাকেন ভক্তদের ভক্তিরস আস্বাদন করাবার জন্যই নাকি ভাগবত গ্রন্থ রচিত হয়েছে। যদিও এখানে ব্রহ্মা কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি হচ্ছে, কিন্তু এই শ্লোকগুলো অদ্বৈতের পরাকাষ্টা, অদ্বৈত জ্ঞানের শেষ কথা। ব্রহ্মা বলছেন – জগতে ভববন্ধন আর মোক্ষ এই যে দুটি কথা শোনা যায়, এই দুটোই অজ্ঞান কল্পিত। যারা বলছে আমি বন্ধনে আছি তারাও অজ্ঞান থেকেই বলছে, আর যারা বলে আমি মুক্তি চাই, তারাও অজ্ঞান থেকেই মুক্তির আকাঙ্খা করছে। অষ্টাবক্র সংহিতাতেও এই কথাই তোলা হয়েছে। সবাই বলে মনেতেই বদ্ধ মনেতেই মুক্ত, কিন্তু যে মন নিয়ে বলা হচ্ছে এই মনটাই তো অজ্ঞানের এলাকার। তাহলে মুক্তিও অজ্ঞানেরই ব্যাপার। এই তত্ত্বটি অদ্বৈত বেদান্তের শেষ কথা, যেখানে বলা হয় সৃষ্টিই নেই। মাণ্ডুক্যকারিকা উপনিষদে যে অজাতবাদের কথা বলা হয় তাতে সৃষ্টি বলে কিছু নেই। সৃষ্টিই যদি না থাকে তাহলে বন্ধন কোথা থেকে আসবে! যেখানে বন্ধনই নেই সেখানে মুক্তির কথা কি করে আসতে পারে! তুমি জগৎ দেখছ মানে তোমার বন্ধন আছে, সেখান থেকে তুমি যে মুক্তির চেষ্টা করছ সেটাও অজ্ঞানবশত।

আমরা এখানে মাণ্ডুক্যকারিকা অধ্যয়ন করতে আসিনি, ভাগবতের প্রসঙ্গের মাধ্যমে আমরা ভক্তিরস আস্বাদন করতে চাইছি অথচ সেই ভাগবত বলছে – বন্ধন আর মুক্তি এই দুটোই অজ্ঞান কল্পিত, অজ্ঞানেরই

দুটি নাম বন্ধন ও মুক্তি। যিনি সত্য জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মা, তাঁর বাইরে কিছু নেই। পরমাত্মার বাইরে যদি কিছু নাই থাকে তাহলে বন্ধনটা কোথা থেকে আসবে! আর মুক্তিই বা কোথা থেকে আসছে! খুব সহজ যুক্তি, এটা বোঝার জন্য খুব বেশী যুক্তিতর্কের দরকার পড়ে না। কিন্তু ধারণা করা অত্যন্ত কঠিন। অজ্ঞান কল্পনাটা কেমন? বেদান্ত বলছে ঈশ্বর ছাড়া আর কিছু নেই। দ্বৈতবাদীরা এটাকে অন্য দিক দিয়ে বলবে, যেমন এই বোতলের মধ্যে যে জল রয়েছে এই জলটা তো বন্ধনে রয়েছে। ঠিক তেমনি ঈশ্বর এই শরীরের মধ্যে আছেন, তিনিও তো বন্ধনে পড়ে গেলেন। তাহলে এখানে অন্য রকম কেন বলা হল? আর আমি যে এই সাধনা করছি, কিসের জন্য করছি? এই বন্ধন থেকে বেরিয়ে আসার জন্যই তো সমস্ত রকমের সাধনা। তখন বেদান্ত বলবে – না, তুমি যে বন্ধনে পড়ে আছ মনে করছ এটা অজ্ঞানের থেকে বলছ, আর তুমি যে বন্ধন থেকে মুক্তির চেষ্টা করে যাচ্ছ এটাও অজ্ঞান প্রসুত, আর তোমার যে মুক্তি হয়ে যাচ্ছে মনে করছ এটাও অজ্ঞানের থেকে কল্পনা করছ। প্রকৃতপক্ষে তুমি সব সময় মুক্তই আছো। আর তোমার যা হচ্ছে সবটাই তোমার অজ্ঞান থেকে হচ্ছে। কিসের অজ্ঞান? কল্পিত অজ্ঞান। তাই এই বন্ধনটা সত্য নয়, কল্পিত।

অনেক দার্শনিকের মতে বন্ধনটা সত্য, যেমন মাধ্বাচার্যের মতে, অর্থাৎ যারা দ্বৈতবাদী, তাদের মতে বন্ধনটা সত্য, কিন্তু অদ্বৈত মতে বন্ধনটা কল্পিত। আমি আর আপনি এক, কিন্তু কল্পনা করছি আমরা আলাদা। এই শ্লোকগুলো সাধারণ মানুষের পক্ষে ধারণা করা অত্যন্ত কঠিন। আচার্য শঙ্কর খুব সহজ ভাবে বলছেন – এই যে তুমি বন্ধনের কথা বলছে, এই বন্ধনটা কোথা থেকে এসেছে? বন্ধন ভেতরে থেকে আসে নাকি বাইরে থেকে আসে? আমি তো জানি আমি দেহের বন্ধনে আছি, মনের বন্ধনে আছি, আমি ভালোবাসা পাওয়ার জন্য ছটফট করছি, মনের মধ্যে কত রকম কামনা-বাসনা গিজ্‌গিজ্ করছে। আমরা মনে করছি এই বন্ধনগুলো আমাদের বাইরে থেকেই এসেছে। কিন্তু তার আগে কামিনী-কাঞ্চন ভোগের ইচ্ছাটা আমার ভেতর থেকেই তো জন্ম নিয়েছিল। তাহলে যে আমাকে বেঁধেছে তাকে প্রকৃতি বলুন, মায়া বলুন যাই বলুন, যে আমাকে বেঁধে রেখেছে সে আমাকে ছাড়তে যাবে কেন? বিনা পয়সায় যদি বেগার খাটার চাকর পেয়ে যাই আমি তাহলে তাকে ছাড়তে যাব কোন দুঃখে! কাউকে গাঁজা, ভাঙ, আফিং খাইয়ে তাকে দিয়ে যা খুশি করিয়ে নেওয়া যেতে পারে। যে এইভাবে বন্ধনে পড়ে থাকে মুক্তি তার কোন দিন হবে না। তাহলে বন্ধন কোথা থেকে এসেছে? অবশ্যই ভেতরে থেকে এসেছে। বন্ধনটা আমি আপনি নিজেই তৈরী করেছি। বন্ধন যদি আমারই তৈরী হয় তাহলে বন্ধনটাই তো মিথ্যা। বন্ধন যদি মিথ্যা হয় তাহলে মুক্তিটাও তো মিথ্যা হবে।

ব্রহ্মা বলছেন, সূর্যে যেমন দিন ও রাত্রির কোন ভেদ থাকে না, শুধু আলোই থাকে। ঠিক তেমনি যদি বিচার করা হয় তাহলে দেখবে শুদ্ধ আত্মাতে না আছে বন্ধন, না আছে মুক্তি। যারা অজ্ঞানে পড়ে আছে তারা মনে করে আমি বন্ধনে পড়ে আছি, আর যারা অজ্ঞানের মধ্যে পড়ে আছে তারাই বলে আমি মোক্ষের চেষ্টা করছি। বন্ধন আর মুক্তি শব্দ মাত্র। যাঁরা বলেন বন্ধনটাও অজ্ঞান, মুক্তিটাও অজ্ঞান, এঁরাই হলেন অজাতবাদ। অজাতবাদের উল্টো হল জাতবাদ, জাতবাদ মানে জন্ম মৃত্যুকে যারা মানে। যদি জন্ম হয়ে থাকে তবেই তো বন্ধনের কথা আসবে। জন্ম হয়ে থাকলে ভগবান থেকে আলাদা, কিন্তু ভগবান থেকে আলাদা কিছু নেই। ভগবানের থেকে আলাদা কিছু যদি না হয়ে থাকে তাহলে বন্ধনের প্রশ্ন কোথা থেকে আসবে! ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করে এই কথাই বলছেন।

ব্রহ্মা বলছেন – হে প্রভু! কি আশ্চর্যের কথা। আপনি সবারই আত্মা, আপনি সবারই আপন, অথচ সবাই মনে করে আপনি পর আর যা বস্তুত পর, সেই দেহাদিকেই আত্মা মনে করে। ***অন্তর্ভবেঽনন্ত ভবন্তমেব হ্যতত্ত্যজন্তো মৃগয়ন্তি সন্তঃ। অসন্তমপ্যন্ত্যহিমন্তরেণ সন্তং গুণং তং কিমু যন্তি সন্তঃ।।১০/১৪/২৮।*** যিনি মনে করছেন ভগবান আমার ভেতরেই বাস করছেন, তিনিই আমার অন্তর্যামী তখন তিনি তাঁকে আর কোথাও খুঁজতে যাবেন না। সেইজন্য সৎপুরুষরা আপনার অতিরিক্ত যা কিছু প্রতীয়মান হয়ে থাকে, সেগুলোকে পরিত্যাগ করে নিজেদের অন্তঃকরণেই আপনার অন্বেষণ করে থাকেন। কিন্তু যে মনে করছে ভগবান বাইরে, আমি আর তিনি আলাদা, সে তখন ভগবানকে মন্দিরে খুঁজবে, গীর্জায় খুঁজবে, মসজিদে খুঁজবে, সব জায়গাতে

খুঁজতে থাকবে। মানুষের এই তিনটি বড় অজ্ঞান – প্রথম অজ্ঞান, মন্দিরাদিতে তাঁর প্রতিমা নির্মাণ করে পূজা করা, দ্বিতীয় অজ্ঞান আমি বন্ধনে আছি ভাবা আর তৃতীয় অজ্ঞান মুক্তির কথা ভাবা।

বেদান্তের দৃষ্টিতে আসলে এগুলো সত্যই অজ্ঞান। আমার বুদ্ধি নেই বলে আমি তাকে পুরুষ এবং একে নারী রূপে দেখছি, আমি সবাইকে আলাদা দেখছি। আর এই আলাদা দেখার জন্য আমার মধ্যে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ও মাৎসর্যের জন্ম হচ্ছে। ঈশ্বরই যখন সব কিছু হয়েছেন তখন নরকও তিনি, স্বর্গও তিনি। কিন্তু আমাকে বলতে হবে – হে ঈশ্বর! আমি তোমাকে এই রূপে দেখতে চাই না, আমি জানি নরকও তুমি, স্বর্গও তুমিই হয়েছে, কিন্তু আমি তোমার ওই নরক রূপটা দেখতে চাই না, আমি দেখতে চাই সব জীবে তুমিই বিদ্যমান, আমি দেখতে চাই আমার নিজস্ব সত্তা বলে কিছু নেই, আমার সত্তাতে তুমিই বিরাজিত হয়ে আছো। এই ভাবে শ্রীভগবানের স্তুতি করার পর ব্রহ্মা তাঁকে তিনবার প্রদক্ষিণ করার পর প্রণাম করে নিজের স্বধামে ফিরে গেলেন।

কালিয় নাগের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ

শ্রীকৃষ্ণ এখনও এই অসুর, সেই অসুর নিধন করে যাচ্ছেন। এসব কাহিনীর মাঝখানে আসে বিখ্যাত কালিয়দমনের লীলা কাহিনী। পুরাণের সব কাহিনীর আড়ালে একটা আধ্যাত্মিক সত্য লুকিয়ে আছে। কাহিনী আমাদের লক্ষ্য নয়, মূল লক্ষ্য হল আধ্যাত্মিক সত্যটাকে বার করে সামনে নিয়ে আসা। আধ্যাত্মিক মূল্যে দুটো জিনিষ হয়, একটা হল আমাদের আধ্যাত্মিক উত্থান আর দ্বিতীয় হল, অবতারের লীলাকে এমন ভাবে বর্ণনা করা যাতে বোঝানো যেতে পারে যে তিনি আমাদের সবার থেকে একটু বেশী ক্ষমতাবান, এটাই পরে গিয়ে আমাদের লীলা চিন্তনে খুব সহায়ক হয়। দীক্ষার সময় গুরু যে মন্ত্র দেন সেই মন্ত্র আমরা জপ করি। কিন্তু শুধু জপ করলে মন নিয়ন্ত্রণে আসে না। আবার ধ্যান করার জন্য চাই মনের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ। মনের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ না এলে ধ্যান হবেই না। মনকে নিয়ন্ত্রণ করার প্রাথমিক সাধনা হল লীলা চিন্তন। আমার যিনি ইষ্ট তিনি শরীর, বাক্য, মন দিয়ে যা কিছু করেছিলেন সেই সেই ঘটনা গুলোকে নিয়ে চিন্তন করাকে বলে লীলা চিন্তন। ইষ্টের লীলা চিন্তন করতে করতে ইষ্টের প্রতি মনটা তন্ময় হয়ে যায়। এই যে কালিয় নাগ দমনের বর্ণনা করা হচ্ছে, এখানে ঈশ্বরীয় শক্তির বর্ণনা করা হচ্ছে যা কিনা আমাদের লীলা চিন্তনে সাহায্য করে। এই ধরণের কাহিনীতে এমন কিছু আধ্যাত্মিক প্রসঙ্গের অবতারণা করা হয়েছে, যেটা আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনে সরাসরি প্রযোজ্য হতে পারে।

যমুনার জলে মহাবিষধর কালিয় নাগ তার পরিবার সহ বাস করত। বলে কালিয় নাগের বিষের প্রভাবে যমুনার জলের রঙ নাকি কালো হয়ে গিয়েছিল। যমুনার পারে রাখালরা গরু চড়াতে যেতো, যমুনার জলে গোপ বালকরা খেলা করত। এর আগে কালিয় নাগের দংশনে এদের অনেকের প্রাণ হরণ হয়েছিল। পুরাণের একটা বৈশিষ্ট্য হল যাই ঘটুক না কেন, সেটাকেই পুরাণ অনেক বাড়িয়ে বলবে। হয়তো কোন সাপ টাপ থাকতে পারে। যদি বলা হত যমুনার জলে একটা বিষাক্ত সাপ বাস করত, যার ভয়ে কেউ যমুনার দিকে যেতো না, শ্রীকৃষ্ণ সেই সাপটাকে মেরে দিয়েছেন, এটুকু বলে দিলে সেটা আর ভাগবত-কথা হবে না। যদি কোন ঘটনাকে পুরাণের ছাঁচে দাঁড় করাতে হয় তাহলে সেই ঘটনার কাহিনীকে একটার বিশেষ রূপ দিতে হয়। এই রূপ দিতে গিয়ে তখন বলবে কালিয় কোথা থেকে এসেছে, তাঁর জন্ম বৃত্তান্ত, এর আগে সে কি কি করেছিল এইসব নানান কথা দিয়ে শুরু করা হলে তবেই সেটা ঠিক ঠিক পৌরাণিক কাহিনীতে গিয়ে দাঁড়াবে।

যাই হোক, এই কালিয় নাগের উপদ্রব থেকে ব্রজের প্রাণিকুলকে রক্ষা করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ যমুনার জলে ঝাঁপ মারলেন। যমুনার জলে নেমে শ্রীকৃষ্ণ দেখাচ্ছেন তিনি যেন অন্য বাচ্চাদের মত জলে খেলা করতেই নেমেছেন। শ্রীকৃষ্ণ যমুনার জলে নেমেছেন খবর পেয়ে অন্যান্য গোপবালকরা খুব ভয় পেয়ে গেছে। খবর পেয়ে বলরাম কিন্তু ভয়ে ঘাবড়ে যাননি, বলরাম তো জানতেন তাঁর এই ছোটভাইটির কত ক্ষমতা ও প্রভাব! তিনি নিজের ভাব গোপন করে সবার সাথে শ্রীকৃষ্ণের অনুসন্ধানে এগিয়ে চলেছেন। যেতে যেতে তাঁরা সবাই গরুর

খুড়ের ছাপ আর তার সাথে গোপবালকদের পায়ের ছাপও লক্ষ্য করলেন। শুকদেব বলছেন ***তে তত্র তত্রাব্জযবাঙ্কুশাশনিধ্বজোপপন্নানি পদানি বিশ্‌পতেঃ। মার্গে গবামন্যপদান্তরান্তরে নিরীক্ষমাণা যযুরঙ্গ সত্বরাঃ।।১০/১৬/১৮।*** তাঁরা সর্বত্র গোপবালকদের পায়ের ছাপই দেখতে পাচ্ছিলেন। কিন্তু তারই মধ্যে কিছু কিছু বিশেষ চিহ্ন বিশিষ্ট পায়ের ছাপ লক্ষ্য করছিলেন। সেগুলোর মধ্যে পদ্ম, যব, অঙ্কুশ, বজ্র এবং ধ্বজের চিহ্ন দেখা যাচ্ছিল। বলা হয় যাঁর পায়ে এই পাঁচটি চিহ্ন থাকে তিনি ভগবান। শরীরের বিশেষ বিশেষ অঙ্গে সবারই কিছু কিছু চিহ্ন থাকে, এই চিহ্ন দিয়ে জাতকের অনেক কিছু বিচার করা হয়। যে বিদ্যা দিয়ে শরীরের চিহ্নের বিচার করা হয় তাকে সামুদ্রিক বিদ্যা বলে। হস্তরেখার বিচার ভারতে কোন দিনই ছিল না, পরের দিকে এই বিদ্যা বিদেশ থেকে ভারতে এসেছে। আমাদের পারম্পরিক বিদ্যা হল চিহ্ন বিচার। পরে সামুদ্রিক বিদ্যা আর হস্তরেখা বিচার এই দুটোকে মিলিয়ে জগাখিচুড়ি বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই চিহ্নকে অনুসরণ করতে করতে সবাই যমুনার তীরে পৌঁছেছে। কালিয় দমন কাহিনী আমাদের সবারই মোটামুটি জানা।

যাই হোক, এদিকে যমুনার জলে নামার কিছুক্ষণ পরেই কালিয় জলের তলদেশ থেকে উপরে ভেসে উঠে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বিষ ঢালতে তেড়েফুড়ে এসে শ্রীকৃষ্ণকে একেবারে কব্জা করে নিয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ তখন নিজের শরীরকে এত বড় করতে শুরু করেছেন যে, তাতেই কালিয়র প্রাণান্তক অবস্থা। শ্রীকৃষ্ণ কালিয়র মাথায় পা রাখতেই কালিয় একেবারে দমে গিয়ে নিস্তেজ হয়ে গেছে। এরপর কালিয় তার শত ফণা বিস্তার করেছে, শ্রীকৃষ্ণ তখন সেই ফণার উপরে উঠে নৃত্য করতে শুরু করলেন। আর নৃত্য করার ছলে তিনি কালিয়র মস্তকে প্রচণ্ড ভাবে পদাঘাত করে চলেছেন। শ্রীকৃষ্ণ হলেন যোগীশ্বর, এবার তিনি যোগশক্তির এমন বিস্তার করতে শুরু করলেন যে শ্রীকৃষ্ণের শরীরের ওজনের ভারে কালিয়র তখন নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে, তার জ্ঞান লুপ্ত হতে যাচ্ছে, তার রক্ত বমন শুরু হয়ে গেছে। এবার সবাই নিশ্চিত যে কালিয় আর বাঁচবে না, এবার তাকে মরতেই হবে। অন্যান্য অসুরদের শ্রীকৃষ্ণ যেভাবে বধ করেছিলেন, এবার কালিয়কেও তিনি সেইভাবে হয়তো শেষ করে দেবেন। তখন কালিয়র পত্নীরা অর্থাৎ নাগপত্নীরা ছুটে এসে শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করতে শুরু করলেন। এই স্তুতিটাই কালিয় দমন কাহিনীর সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

নাগপত্নীগণ কর্তৃক ভগবানের স্তুতি

নাগপত্নীরা বলছেন ***ন্যায্যো হি দণ্ডঃ কৃতকিল্বিষেঽস্মিংস্তবাবতারঃ খলনিগ্রহায়। রিপোঃ সুতানামপি তুল্যদৃষ্টের্ধৎসে দমং ফলমেবানুশংসন্।।১০/১৬/৩৩।*** ভগবানের অবতারত্ব গ্রহণের মূল উদ্দেশ্য হল মানুষকে জ্ঞান ভক্তির শিক্ষা দেওয়া। ঠাকুরও এই কথা বলছেন, অবতারের একমাত্র কাজ জ্ঞান ও ভক্তির শিক্ষা দেওয়া। আচার্য শঙ্কর তাঁর গীতার ভাষ্যে প্রথমেই ধর্মের ব্যাখ্যা করে ধর্ম কীভাবে হ্রাস হয়, আর অবতার সেই ধর্মের শিক্ষা দিয়ে কীভাবে আবার ধর্মকে ঠিক পথে নিয়ে আসেন বলেছেন। ভাগবতে অনেক অবতারের কথা পাওয়া যায়, বেশীর ভাগ অবতারকে দেখা যায় তাঁরা জগৎকে জ্ঞান ভক্তির শিক্ষাই দিয়ে গেছেন। কপিল মুনি জ্ঞান ভক্তির শিক্ষা দিলেন, দত্তাত্রয়ের মত অবধূত তিনিও জ্ঞান ভক্তির শিক্ষা দিয়েছিলেন। আবার কখন সখন আসুরিক শক্তির প্রভাব এমন ভাবে বেড়ে যায় যে তখন সেখানে শুধু জ্ঞান ভক্তির শিক্ষা কোন কাজ করে না। তখন তিনি বিভিন্ন দৈত্য, অসুরদের বধ করতে নেমে পড়েন। কিন্তু সেখানেও আসুরিক শক্তির বিনাশের সাথে সাথেই যে সব কিছু আবার ঠিক ঠিক ভাবে ফিরে আসবে তা কিন্তু হয় না, তাই সেখানেও অবতারকে পরে জ্ঞান ভক্তির শিক্ষা দিতে হয়। অবতারকে সেখানে তাই দুটো কাজ করতে হয়, শিষ্ট রক্ষণ আর দুষ্ট দমন। ভগবান একটা সংসারের প্রবর্তন করে দেওয়ার পর সেই সংসার যখন নানা রকম বেনিয়ম ও বিশৃঙ্খলার ফলে দুর্বল হয়ে যায় তখন তিনি এই সংসারের মধ্যে আবির্ভূত হয়ে আবার একটা শক্তি সঞ্চারিত করে সংসারের সব কিছুকে একটা নিয়মের মধ্যে নিয়ে আসেন।

সংসারের এই প্রবর্তনটা হয় ঋতমের জন্য, ঋতম মানে Cosmic Law, যে নিয়মের জোরে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সব কিছু ঠিক মতে চলে। ঋতম যখন মানুষের মধ্যে দিয়ে আসে তখন তা জ্ঞান ও ভক্তি দিয়ে প্রকাশিত হয়। ভগবানের অনেক রকম লীলা আছে, তিনি দেবলীলা করেন, জগৎলীলা করেন, ঈশ্বরলীলা

করছেন, নরলীলা করছেন। আবার তিনি অনেক রকম অবতার হয়েও লীলা করেন, কচ্ছপ অবতার হয়ে আসছেন, মৎস্যাবতার হয়ে আসছেন। ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি এক এক রূপে এক এক ধরণের লীলা করে জগৎ সংসারকে ঠিক পথে সঞ্চালিত করে দেন। কিন্তু ভগবান যখন অবতার রূপ ধারণ করে নরলীলা করেন তখন তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য থাকে মানুষকে জ্ঞান ভক্তির শিক্ষা দেওয়া। শ্রীকৃষ্ণও নররূপ ধারণ করে মানবজাতিকে জ্ঞান ভক্তির শিক্ষা দিয়েছেন, গীতাতে তিনি পুরো জ্ঞান ভক্তির কথাই বলছেন। কিন্তু জ্ঞান ভক্তির শিক্ষা দেওয়ার সাথে সাথে তিনি দুষ্ট দমনও করেন। দুটো জিনিষ যে একই অবতারে করবেন তার কোন মানে নেই। যেমন কপিল মুনি, ভগবান বুদ্ধ, শ্রীরামকৃষ্ণ এনারা দুষ্ট দমন করেননি। শ্রীরামচন্দ্র আর শ্রীকৃষ্ণ এই দুজন অবতারকেই সাধারণ মানুষ বেশী জানে, রামাবতারে রাবণ বধ হয়েছে আর শ্রীকৃষ্ণ অবতারে তিনি কংসকে বধ করলেন। সেই থেকে আমাদের ধারণা হয়ে আছে যে অবতার মানে শুধু দুষ্টের দমন। কিন্তু একেবারেই তা নয়। দুষ্ট দমন করছেন ঠিকই কিন্তু সাথে সাথে জ্ঞান ও ভক্তির শিক্ষা দেওয়াতেই তাঁর একমাত্র লক্ষ্য থাকে।

এই দুটোকে একসাথে নিলে দেখা যায় ভগবানের অবতারত্ব গ্রহণের মূল উদ্দেশ্য হল সমগ্র প্রাণীজগতের বিবর্তনের মধ্যে একটা আলোড়ন তৈরী করে সবাইকে একটা নিম্ন অবস্থা থেকে উচ্চতর অবস্থায় তুলে আনা। আজকে আমরা যারা মানুষ হয়ে জন্মা নিয়েছি, আমরা সবাই সেই ক্ষুদ্র ব্যাকটেরিয়া থেকে শুরু করে বিভিন্ন যোনির মধ্যে দিয়ে বিবর্তনের ভেতর দিয়ে আজ মানুষের দেহে এসে পৌঁছেছি। নিম্ন যোনি থেকে উচ্চ যোনিতে কীভাবে উঠছে? কঠোপনিষদে যমরাজ নচিকেতাকে বলছেন *যোনিমন্যে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ। স্থাণুমন্যেঽনুসংযন্তি যথাকর্ম যথাশ্রুতম্।।২/২/৭।* যেমনটি কর্ম করেছে আর যেমনটি জ্ঞান ও চিন্তা ভাবনা করেছে সেই অনুসারে কোন জীব শরীর গ্রহণের জন্য মাতৃগর্ভে প্রবেশ করে এবং কেউ স্থাবরত্ব প্রাপ্ত হয়। তাহলে বলতে হয় ঘোড়ার যোনিতে জন্ম নিয়ে যে ঘোড়া হয়ে জন্মেছে তাকে এখন ঘোড়া হয়েই বারবার জন্মাতে হবে, ঘোড়ার শরীর দিয়ে তো ভালো কাজ বা ভালো চিন্তা ভাবনা করে উপরে আসার সুযোগ নেই। যদি প্রকৃতির নিয়মে চলতে থাকে, তাহলে চলতে চলতে কখনও হঠাৎ ঘোড়াটা আরেকটু নিজেকে বিবর্ধন করবে। কিন্তু হিন্দু ধর্ম এই মতকে কখনই মানবে না। আমরা এটাই মানি যখন কোন চৈতন্য সত্তা এসে ওই ঘোড়া যোনিকে একটা বিবর্তনের ধাক্কা দেবে সেখান থেকে তখন সে আরও একটা নতুন উন্নত যোনিতে চলে আসবে। সেখান থেকে ঘুরে ঘুরে শিম্পাঞ্জি বনমানুষ থেকে মানুষ যোনিতে এসে জন্মাবে। ভগবান আমাদের যখন জ্ঞান ভক্তির শিক্ষা দেন তখন সবার কর্ম আর *শ্রুতম্, শ্রুতম্* মানে জ্ঞান, এই কর্ম আর জ্ঞান পাল্টাতে থাকে। কর্ম ও জ্ঞান যখন পাল্টাতে থাকে তখন সে উন্নতির দিকে যেতে শুরু করে। যখন মানুষ যোনিতে এসে গেল, তখনও সে এই যোনিতে এসে আটকে গেল। যে কোন জিনিষের ধর্ম হল নীচের দিকে যাওয়া, মানুষও আবার যে কোন সময় নীচের দিকে যেতে শুরু করে দিতে পারে। ভগবান তাই একটা দ্বিমুখী কার্য সাধন করেন, একটা হল মানুষ যোনি থেকে সে যেন আর নিম্ন যোনিতে না চলে যায়, আর দ্বিতীয় হল মানুষ যোনি থেকে সে যেন দেবযোনির দিকে এগোতে থাকে। ভগবান যখন এই বিবর্তনমূলক একটা ধাক্কা দিচ্ছেন তখন এই দুটো কাজ একসঙ্গে করে দিচ্ছেন – নীচের দিকে যাওয়াকে আটকে দিচ্ছেন আর উপরে যাওয়ার দিকে ঠেলে দিচ্ছেন। এই বিবর্তনমূলক ধাক্কাতে সর্বকালে, সর্বত্র, সমান ভাবে তিনি একটাই পদ্ধতি অবলম্বন করেন তা হল *যথাকর্ম যথাশ্রুতম্*, কর্ম আর জ্ঞানটাকে ঠিক করা। ঠাকুর যেটা খুব সহজ ভাষায় বলছেন – অবতার আসেন জ্ঞান ও ভক্তির শিক্ষা দিতে।

এখানে কিন্তু নাগপত্নীরা বলছে আপনি এসেছেন দুষ্ট দমনের জন্য। কারণ তাদের চেতনার স্তর যে রকম তারা সেই রকম চিন্তা ভাবনা নিয়েই বলছে। তাছাড়া সবাই চোখের সামনে দেখছেন এই ছয়-সাত বছরের মধ্যে এতটুকু বাচ্চা ছেলে ইতিমধ্যে এতগুলো অসুরকে বধ করে দিয়েছে। তাই নাগপত্নীরা বলতেই পারে আপনি দুষ্ট দমনের জন্য এসেছেন। তবে আমাদের খুব ভালো করে মনে রাখতে হবে ভগবান অবতার হয়ে দুষ্টের দমন করেন আর শিষ্টের রক্ষণ করেন। এই শিষ্ট রক্ষণটা তিনি করেন জ্ঞান ও ভক্তির শিক্ষার দ্বারা। বেশীর ভাগ অবতার যত এসেছেন, আমরা যাঁদের কথা প্রায়ই শুনে থাকি, যেমন স্বামীজী শিষ্ট রক্ষণ করলেন

দেশে বিদেশ জ্ঞান ভক্তির শিক্ষা দিয়ে, শঙ্করাচার্যও জ্ঞান ভক্তি শিখিয়ে শিষ্টের রক্ষণ করলেন, ভগবান বুদ্ধ, যিশু এঁরাও জ্ঞান ভক্তি শিখিয়ে শিষ্ট রক্ষণ করে গেছেন। কিন্তু কখন সখন তিনি দুষ্টের দমনও করেন, যেমন শ্রীরামচন্দ্র অবতারের ক্ষেত্রে করেছেন, শ্রীকৃষ্ণ অবতারে করেছেন। কিন্তু নাগপত্নীদের কাছে ভগবানের কাজ হল একমাত্র যেন দুষ্টদমন করা। শুধু নাগপত্নীরাই নয় এখনও সাধারণ হিন্দুদের বিশ্বাস যে ভগবান শুধু দুষ্ট দমনের জন্যই অবতার হয়ে আসেন।

শ্লোকের দ্বিতীয় অংশে নাগপত্নীরা খুব সুন্দর একটা কথা বলছেন, এই যে আপনি এখন কালিয়কে বধ করতে যাচ্ছেন বা যখন অন্যান্য অসুরদের বধ করছিলেন, তখন আপনি কিন্তু কারুর প্রতি কোন শত্রুভাব নিয়ে কাউকে বধ করছেন না। কারণ আপনার কারুরই প্রতি কোন দ্বেষ ভাব নেই। নাগপত্নীরা ঠিকই বলছেন, ভগবানের কারুর প্রতি কোন বিদ্বেষ ভাব, শত্রু ভাব থাকে না, থাকতেই পারে না। কিন্তু যখন কেউ তার মর্যাদাকে উল্লঙ্ঘন করে যায় তিনি তখন তাকে একট দণ্ড দিয়ে ঠিক পথে নিয়ে আসেন। তিনি কীভাবে দণ্ড দেন? নাগপত্নীরা বলছেন *সুতানামপি*, মা যেমন ভাবে নিজের সন্তানকে দণ্ড দিয়ে শিক্ষা দেয়। মা সন্তানকে অনুশাসনে রাখার জন্য সাজা দেন। মনুস্মৃতিতেও মনুবাবা বলছেন, মানুষ যখন কোন দোষ করে তখন সেটা তার জন্য একটা পাপকর্ম। পাপ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য প্রায়শ্চিত্তের বিধান শাস্ত্রই ঠিক করে দিয়েছে। এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত কীভাবে হবে? রাজা যখন তাকে কোন সাজা দিয়ে দিল তখনই তার প্রায়শ্চিত্ত হয়ে গিয়ে সেই পাপকর্ম থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। যদি উদ্দেশ্য প্রায়শ্চিত্ত না হয় তাহলে ওই সাজা দিলেও সেই পাপটা থেকে যাবে। যেমন ছাত্র যদি কোন অন্যায় করার পর শিক্ষক সেই ছাত্রকে শাস্তি দিতে গিয়ে নিজের আগের যত রাগের ঝাল মিটিয়ে শাস্তি দেন তখন সেটা আর অনুশাসন থাকে না। ছেলে অন্যায় করার পর মা ছেলেকে উত্তম মধ্যম দেওয়ার পর মাও কাঁদে ছেলেও কাঁদে। মনু এই জিনিষটার উপর খুব জোর দিয়েছেন। কাউকে যখন দণ্ড দেওয়া হবে তখন তার একমাত্র উদ্দেশ্য থাকবে প্রায়শ্চিত্ত, যাতে মানুষ দোষযুক্ত কর্ম থেকে মুক্ত হয়ে আরও উপরে উঠে আসতে পারে। শ্রীশ্রীমায়ের জীবনেও এই রকম ঘটনা আছে। অন্যায় কাজের জন্য একজন সন্ন্যাসীকে মঠ ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে, চলে যাওয়ার সময় সেই সন্ন্যাসীও কাঁদছেন শ্রীমাও কাঁদছেন। দণ্ড প্রদানের আদর্শ সব সময় এটাই হবে, প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা পাপকর্ম থেকে মুক্ত হয়ে উপরে উঠে আসা। সেইজন্য আজকের দিনে আমাদের ভারতীয় দণ্ডবিধির বর্তমান প্রক্রিয়া অত্যন্ত হতাশাজনক। ভারতীয় দণ্ডবিধি বা দণ্ডসংহিতা ইংরেজরা তৈরী করেছিল অন্য একটা জাতিকে দাবিয়ে রাখার জন্য। কিন্তু দুশ বছর পর এখনও আমরা ইংরেজদের তৈরী দণ্ডবিধিকেই মেনে চলছি। একজন কেউ দোষ করেছে তাকে তুমি শাস্তি দিচ্ছ ঠিক আছে। কিন্তু এই শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্যের ব্যাপারে এনারা কি বলছেন? শাস্তি দেওয়া হচ্ছে যাতে অন্যরা দেখে শিক্ষা পায়, কেউ যেন আর এই দোষ করার সাহস না করে। কিন্তু এভাবে অন্যকে ঠিক করা যায় না, অন্যকে সামলাবার জন্য অন্য উপায় বার করতে হবে। দোষ করে ফেলেছে, এখন সে ক্ষমাপ্রার্থি, তাকে ক্ষমা করে দিন। আবার অনেকে বলে দোষ করলে তার বদলা নিতে হবে। একজন কেউ দোষ করেছে সেই দোষকে প্রতিবাদ করতে আপনি আবার একটা হিংসার আশ্রয় নিচ্ছেন। কাউকে প্রাণদণ্ড দিয়ে যখন আপনি আনন্দ পাচ্ছেন তখন আপনিও কিন্তু সেই একই পাপ করছেন। সেইজন্য সমাজের আজ এই দুরবস্থা। কিন্তু নাগপত্নীরা এখানে স্তুতি করে শ্রীকৃষ্ণকে বলছেন, আপনি যখন কাউকে দণ্ড দেন তখন তা অনুশাসনের জন্যই দেন।

নাগপত্নীরা খুব সুন্দর বলছেন, আপনি কালিয়কে যে তাড়না দিয়েছেন তাতে আপনি আমাদের উপর কৃপাই করেছেন। কারণ আমরা অনেক পাপ করেছি বলেই আজকে সর্পযোনিতে এসে পতিত হয়েছি। এখানে হিন্দু ধর্মের একটা মৌলিক ধারণাকে তুলে আনা হয়েছে। সৃষ্টির আদিতে সব কিছুই পবিত্র ছিল, সেখান থেকে যেমন যেমন তার প্রবৃত্তি, যেমন যেমন তার কর্ম হয়েছে তেমন তেমন তার যোনি পাল্টাতে শুরু করল। হতে হতে এখন এমন একটা অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে যে আমরা এখন আমাদের পেছনের কথা কল্পনাও করতে পারিনা। আজকে আমি যেমন কর্ম করব আগামী জন্মে আমার তেমন যোনিতে যেতে হবে। ভালো কর্ম করলে দেবতাদের যোনিতে যাবে, সাধারণ কর্ম করলে মানুষ যোনিতেই ঘুরবে আর অত্যন্ত গর্হিত কর্ম করলে তির্যকাদি যোনিতে যাবে। গীতাতে ভগবান ঠিক এই কথাই বলছেন *উর্ধ্বং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ।*

জঘন্যগুণবৃত্তস্থা অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ।।১৪/১৮। সত্ত্বগুণী সব সময় উপরের দিকে যায়, রজোগুণীরা মধ্যম যোনিতে আর যারা তামসিক তারা নিম্ন যোনিতে যায়। এটাই বলছেন, আমরা মহাপাপী তা নাহলে কেন আমরা সর্পযোনিতে এসে জন্ম নেব! আপনি যে আমাদের দণ্ড দিলেন এতেই এবার আমাদের যোনি মুক্তি হয়ে যাবে। শ্রীশ্রীমা বলছেন 'ঠাকুরকে যারাই দেখেছে তাদের সবার মুক্তি হয়ে যাবে'। একজন ভক্ত বলছেন 'ঘোড়াগুলোও তো ঠাকুরকে দেখেছিল'। মা বলছেন 'ঘোড়ারও মুক্তি হয়ে যাবে'। কিন্তু শাস্ত্র বলছে জ্ঞান ছাড়া মুক্তি হয় না। শ্রীশ্রীমা এখানে ঘোড়ার যোনিমুক্তির কথা বলছেন, অবতারকে দেখেছে, এবার তার ঘোড়ার যোনি থেকে মুক্ত হয়ে অন্য কোন ভালো যোনিতে জন্ম হবে। সেইজন্য বলা হয় কোন আধিকারিক পুরুষ যদি কোন দণ্ড দিয়ে দেন তাতেই তার প্রায়শ্চিত্ত হয়ে যায়। রাজা যে শাস্তি দেন তাকে বলা হয় রাজদণ্ড। অনুশাসন আর প্রায়শ্চিত্ত দুটো আলাদা। মা যখন সন্তানকে শাস্তি দিচ্ছেন, মারছেন তখন সেটা আর প্রায়শ্চিত্ত হচ্ছে না তখন সেটা হয়ে যায় অনুশাসন। রাজদণ্ডে অনুশাসনও থাকে আবার প্রায়শ্চিত্তও হয়ে যায়।

নাগপত্নীরা খুব সুন্দর কথা বলছেন ***তপঃ সুতপ্তং কিমনেন পূর্বং নিরস্তমানেন চ মানদেন। ধর্মোঽথবা সর্বজনানুকম্পয়া যতো ভবাংস্তুষ্যতি সর্বজীবঃ।।১০/১৬/৩৫।*** নাগপত্নীরা একদিকে বলছেন আমরা এত পাপ করেছি বলে সর্পযোনি প্রাপ্ত হয়েছি আবার এখানে বলছেন আমাদের স্বামী কালিয় নিশ্চয়ই এর আগের আগের কোন জন্মে খুব বড় তপস্যা করেছিলেন অথবা নিরহঙ্কার হয়ে কাউকে সম্মান দিয়েছিলেন অথবা সর্বজীবের প্রতি দয়ার ভাবে রেখে প্রচুর ধর্মাচরণ করে জীবন অতিবাহিত করেছিলেন, যার জন্য সর্বজীব-স্বরূপ আপনি আমাদের পতির উপর এত সন্তুষ্ট হয়েছেন। একটা সামান্য সাপ, যার স্বভাব ক্রোধ করা, সেই সাপকে ভগবান দণ্ড দিয়ে কৃপা করেছেন বলে আজ সে মুক্তি পেয়ে যাচ্ছে, নিশ্চয়ই তার কোন বিরাট পূণ্যকর্ম করা আছে। আমাদের মনুবাবাও বলছেন দোষ করে শাস্তি পেয়ে গেলে তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়ে পাপ থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। কিন্তু দোষ করেছে কিন্তু কোন শাস্তি সে পাইনি, আমরা মনে করছি সে বেঁচে গেল। কিন্তু সে কখনই বাঁচতে পারবে না। দোষ করার পর যদি শাস্তি না পায়, প্রায়শ্চিত্ত যদি না করা হয় তাহলে প্রথমে সামাজিক কোন অপবাদ হয়ে অল্পের উপর দিয়ে বেরিয়ে যাবে। যদিও গীতায় ভগবান বলছেন সম্মানীয় ব্যক্তির পক্ষে সামাজিক অসম্মান হওয়া মৃত্যুর সমান, *সম্ভাবিতস্য চাকীর্তির্মরণাদতিরিচ্যতে*। যদি সামাজিক নিন্দা না হয় তাহলে এবার আপনাকে শরীরের উপর আঘাত হানবে। শরীরের প্রথমে মারবে কোমরের উপর। কোমরের ব্যাথার জন্য চলতে ফিরতে পারছে না, বুঝতে হবে এমন কোন পাপ কাজ করেছে যার প্রায়শ্চিত্ত করা হয়নি। যদি কোমরে কিছু না হয় তাহলে আরও খারাপ হবে যখন মাথায় এসে মারবে। মাথায় যখন মারবে তখন হয় তার ঘুম হবে না, খিটখিটে হয়ে যাবে আর সবার সাথে ঝগড়া করে বেড়াবে, আর তা নাহলে পাগল হয়ে যাবে। কিছু কিছু মানুষ আছে যাদের জন্ম থেকেই এই সমস্যাগুলো আছে, আমরা তাদের নিয়ে এখানে কোন আলোচনা করছি না। এখানে যারা দোষ করে তাদের কথা বলা হচ্ছে, দোষ কর্মের জন্য শাস্তি ভোগের দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত করে নিলে সেই দোষ পরিষ্কার হয়ে যাবে। শাস্তি পেলে তখন সব জানাজানি হয়ে যাবে, সবাই জেনে গেলে তখন তার একটা অপমান হয়ে গেল। এটুকু হয়ে গেলে খুব সস্তায় বেঁচে গেল। যদি এভাবে দোষ কর্ম থেকে পরিষ্কার না হয়ে থাকে তাহলে এক এক করে ওই ভাবে মারতে থাকে, যেটা আমরা এর আগে বললাম। মাথাতেও যদি কিছু না হয়ে থাকে তাহলে ধর্মের আশ্রয় নিতে হবে, মান সাপ, ব্যাঙ হয়ে জন্মাতে হবে।

কস্যানুভাবোঽস্য ন দেব বিদ্মহে তবাঙ্ঘ্রিরেণুস্পর্শাধিকারঃ যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাঽঽচরত্তপো বিহায় কামান্ সুচিরং ধৃতব্রতা।।১০/১৬/৩৬। হে দেব! আমরা কি এমন তপস্যা করেছি যে আপনার চরণধূলার স্পর্শ পাবো। আপনার চরণধূলি লাভের জন্য স্বয়ং লক্ষ্মীদেবীও কত দীর্ঘকাল যাবৎ তপস্যা করে যাচ্ছেন। আর এই কালিয় নাগের কী এমন সাধনা আছে, কী এমন পূণ্য করেছে যে আপনার চরণধূলির আশ্রয় লাভ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছে! আরেকটি শ্লোকে নাগপত্নীরা বলছেন ***নমস্তুভ্যং ভগবতে পুরুষায় মহাত্মনে। ভূতাবাসায় ভূতায় পরায় পরমাত্মনে।।১০/১৬/৩৯।*** আপনি অনন্ত, আপনার কল্পনাতীত ঐশ্বর্য, সব কিছুর

নিধান আপনি, আপনাকে প্রণাম। আপনি সকল পদার্থের আশ্রয়। গীতাতেও বারবার এই ভাবকে তুলে ধরা হয়েছে। গীতার সপ্তম অধ্যায়ে ভগবান বলছেন আমার দুটো প্রকৃতি – পরা প্রকৃতি আর অপরা প্রকৃতি। অপরা প্রকৃতিতে সব জড় পদার্থের সৃষ্টি হয় আর পরা প্রকৃতিতে চেতনা। প্রত্যেকে প্রাণীর মধ্যে পরা প্রকৃতিও আছে আবার অপরা প্রকৃতিও আছে। সমস্ত প্রাণীর যে স্থূল শরীর, এই শরীর জড় পদার্থ অর্থাৎ অপরা প্রকৃতির দ্বারা নির্মিত। কিন্তু পরা প্রকৃতি আর অপরা প্রকৃতি দুটোই ভগবানের। সেইজন্য বলছেন ভগবান সব জীব আর সব পদার্থের শেষ আশ্রয়।

শুধু তাই নয়, ***জ্ঞানবিজ্ঞাননিধয়ে ব্রহ্মণেঽনন্তশক্তয়ে। অগুণায়াবিকারায় নমস্তেঽপ্রাকৃতায় চ।। ১০/১৬/৪০।*** যত রকমের জ্ঞান ও বিজ্ঞান আছে তারও নিধান আপনি নিজেই। জ্ঞান মানে, যে কোন বিষয়কে জানা, যখন বিশেষ ভাব জানা হয়, মানে উপলব্ধি করা হয় তখন সেটাই বিজ্ঞান হয়ে যায়। খুব সহজ ভাবে ঠাকুর বলছেন – কেউ দুধের কথা শুনেছে, কেউ দুধ দেখেছে আর কেউ দুধ খেয়ে হৃষ্টপুষ্ট হয়েছে। যিনি দুধ দেখেছেন তিনি জ্ঞানী, যিনি দুধ খেয়ে হৃষ্টপুষ্ট হয়েছেন তিনি বিজ্ঞানী। আমি ভগবানের কথা শুনেছি, শুনেছি যখন তখন সেটাও এক রকমের ভালো। কিন্তু শোনার পর চিন্তন করে করে আমার মনে ঈশ্বরের ব্যাপারে একটা দৃঢ় ধারণা তৈরী হয়ে গেল, যে ধারণা থেকে আর কেউ আমাকে নাড়িয়ে দিতে পারবে না। তখন আমি হয়ে গেলাম জ্ঞানী। কিন্তু যখন সাক্ষাৎ ভগবানের দর্শন করছি, তাঁর স্পর্শন হচ্ছে, তাঁকে সম্ভাষণ করছি, তাঁর সঙ্গে রমণ করছি, তখন এটাই বিজ্ঞানীর অবস্থা। নাগপত্নীরা বলছেন এই জগতে যাবতীয় জ্ঞান ও বিজ্ঞানের নিধি আপনি। আর আপনার শক্তি ও মহিমা অনন্ত। আপনার যা কিছু আছে সবই অপ্রাকৃত। প্রকৃতি মানে, জাগতিক রূপে যা কিছু ব্যক্ত হয়ে গেছে। প্রকৃতির সব থেকে উচ্চ ব্যক্ত রূপ হল মন। কিন্তু ভগবান হলেন অপ্রাকৃত, অর্থাৎ তিনি প্রকৃতির এলাকার বাইরে। ফলে ভগবানকে মন দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে কখন জানা যায় না।

এখন প্রশ্ন হতে পারে ভগবানের শরীর প্রাকৃত না হয়ে অপ্রাকৃত কেন হবে? একটা শিশু তার নিজের জামাকে আমি মনে করে, আমি আর আমার জামা এক। জামা ধরে টানলে বাচ্চা সব সময় বলবে 'তুমি আমাকে টানলে কেন'? 'আমি তো তোমার জামাকে টেনেছি, তোমাকে তো টানিনি' এই কথা বললে বাচ্চা কিছুতেই মানতে চাইবে না, বলবে 'না! তুমি আমাকে টেনেছ'। এই একই ব্যাপার তার খেলনাকে নিয়েও হবে। নিজের সব কিছুর সাথে সে নিজেকে অভিন্ন মনে করে। কিন্তু যত বড় হতে থাকে ধীরে ধীরে তার এই চেতনা আসে যে আমি আর আমার জামা আলাদা। কিন্তু তখন তার দেহের সাথে একাত্ম বোধ হয়ে যায়। প্রত্যেক মানুষ নিজের দেহের সাথে একাত্ম হয়ে আছে, এই দেহবোধ থেকে কখনই বেরিয়ে আসতে পারে না। কিন্তু যখন আত্মজ্ঞান হয়ে যায় তখন দেখে এই দেহ আর আমি আলাদা। বাচ্চার যেমন যেমন বুদ্ধির বিকাশ হতে থাকে তেমন তেমন সে বুঝতে পারে আমি আর আমার জামা আলাদা। ঠিক তেমনি আত্মজ্ঞানী পুরুষ পরিষ্কার দেখেন তিনি আর তাঁর দেহ আলাদা। ঠাকুরকে একজন বলছেন 'পওহারি বাবার ওখানে দেখলাম আপনার ছবি রাখা আছে'। ঠাকুর বলছেন 'খোলটার'। এটা কোন কথার কথা নয়, এটাই বাস্তব। যারা 'আমি আর আমার শরীর এক' মনে করছে তারা যখন শ্রীরামচন্দ্রের শরীর, শ্রীকৃষ্ণের শরীর বা শ্রীরামকৃষ্ণের শরীর দেখেছে তখন তারাও মনে করে এনারা আর এনাদের শরীর এক।

'আমি' মানে যেখানে আমিত্ব বোধ আছে। আমরা যদি খুব ভালো করে বিচার করে দেখি যে আমার আমিটা কোন জায়গায় আছে, চিন্তা করতে করতে বিচার করে করে দেখা যাবে যে জিনিষের সাথে আমি নিজেকে একাত্ম করে রেখেছি সেটাতেই আমিটা আটকে আছে। আমার একটা নাম আছে, আমি যখন যুবক ছিলাম তখন আমি বলতাম আমি অমুক। আজকে আমার বয়স হয়েছে আজেকেও বলছি আমি অমুক, অথচ আমি জানি বাচ্চা বয়সে আমার দাঁড়ি-গোফ ছিল না, একটা বয়স থেকে দাড়ি-গোঁফ বেরিয়েছে, এখন পাকতে শুরু করেছে, একটা বয়সে আমি রোগা ছিলাম, এখন আমি মোটা হয়েছি। আমার শরীর ও মনে সব সময় একটা পরিবর্তন হয়ে চলেছে, অথচ আমি ভাবটা সব সময় থেকে যাচ্ছে। তাহলে আমার মধ্যে নিশ্চয়ই পরিবর্তনশীল আর অপরিবর্তনশীল দুটো জিনিষের যৌথ খেলা চলছে। যেদিন থেকে আমার এই শরীরের বোধ

তৈরী হয়েছে তবে থেকে আজ পর্যন্ত আমার আমি বোধটা থেকে গেছে। কিন্তু আমি দেখছি যে জিনিষকে আমার মনে হচ্ছে 'এটাই আমি', সেই জিনিষটা প্রতি মুহুর্তে পাল্টে যাচ্ছে, আমার দেহ প্রতিদিন পাল্টাচ্ছে, আমার মন অনবরত পাল্টে যাচ্ছে। কিন্তু আমার আমি বোধটা কিন্তু কখনই পাল্টাচ্ছে না।

ধর্ম ঠিক এই জায়গা থেকে শুরু হয় – আমার শরীর প্রতিনিয়ত পাল্টাচ্ছে, আমার মন পাল্টে যাচ্ছে, তাও আমার আমি বোধটা এক ভাবে থেকে যাচ্ছে। ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদে বলে, একটা বস্তু যখন অনবরত চলতে থাকে তখন সেই বস্তুকে স্থির বলে মনে হবে। যেমন পাখাটা একটা স্পীডে ঘুরছে মনে হচ্ছে যেন একটা সলিড জিনিষ। ঠিক তেমনি এনারা বলেন আমাদের অনবরত চিন্তা ভাবনা পাল্টাচ্ছে বলে আমি বোধের ধারাবাহিকাটা চলতে থাকে। বেদান্তীরা বলবেন এটা আসলে তা নয়। তাঁরা বলবেন – তুমি যখন মনন করতে শুরু করবে, মনন করতে করতে যখন গভীরে যাবে তখন দেখবে তোমার দেহটা গৌণ আর মনটাই মুখ্য। সেইজন্য যোগীরা নিজেদের সঞ্চিত কর্মগুলিকে বার করার জন্য এই দেহকে ছেড়ে এক সঙ্গে আরও দশটা শরীর তৈরী করে নেন, এটাকে বলে ব্যুহকায়। তাহলে মনই বেশী গুরুত্ব পেয়ে গেলে, তখন শরীরের আর গুরুত্ব থাকলো না। এর থেকেও আরও উচ্চ অবস্থায় বিশেষ ভাবে সাধনা করতে করতে দেখেন এই মনটাও একটা জড় পদার্থ। যে 'আমি' ভাবছিল সে মন নয়, মনের পেছনে আরেকটা শক্তি আছে সেটাই আসল আমি। কিন্তু এই অবস্থায় আসার জন্য আমাদের অনেক কাঠখড় পোড়াতে হবে। একটা শরীরের বোধ থেকেই আমরা বেরোতে পারছি না, মন থেকে নিজেকে কি করে আলাদা করব! আর শাস্ত্রও বারবার বলছে যোগীদেরই মনের বোধ থেকে বেরিয়ে আসা প্রায় অসম্ভব, আমার আপনার কথা ছেড়ে দিন।

অবতারের সাথে আমাদের তফাৎ এখানে এসেই ধরা পড়ে। আমরা অনেক জন্ম জন্মান্তর কঠোর সাধনা করে করে কোন রকমে পৌঁছে দেখি আমি তো এই মনের পারে, কিন্তু অবতার ওই অবস্থায় নিত্য প্রতিষ্ঠিত। আমরা যেমন জামা পাল্টাই অবতার তেমনি তাঁর শরীরকে পাল্টে নিতে পারেন, নিজের মনও পাল্টে দিতে পারেন। আমরা যখন শ্রীরামকৃষ্ণকে অবতার বলছি তখন আমরা ভাবছি অবতার মানে শ্রীরামকৃষ্ণের শরীরটা, ঠাকুর যেটাকে বলছেন 'খোলটার ছবি'। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ যখন বলছেন 'আমি', তখন উনি কিন্তু কখনই নিজেকে নিজের শরীর বা মনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে বলছেন না। যিনি শুদ্ধ চৈতন্য, যাঁর দ্বারা পুরো জগৎ চলছে, যেটা দিয়ে তাঁর শরীর চলছে সেই আমিটাকে 'আমি' বলছেন। গীতায় ভগবান বলছেন *জন্ম কর্ম চ মে দিব্যম্*, আমার জন্ম, আমার কর্ম সবই দিব্য। এখানেই অবতারের সাথে আমাদের তফাৎটা ধরা পড়ে। দিব্য মানে কি? আমরা যখন জন্ম নিচ্ছি তখন আমরা একটা শরীরকে ছেড়ে আরেকটা শরীর গ্রহণ করি আর সেই শরীরের মাধ্যমে আমাদের কর্মের প্রবাহ চলতে থাকে। এই প্রবাহ আমি চালাচ্ছি না, আমার কর্ম আমাকে দিয়ে এই প্রবাহ চালিয়ে যাচ্ছে। আমি যেন একটা কয়েদী, কয়েদীকে যেমন একবার টেনে জেলের ওই কুঠুরির মধ্যে ঢুকিয়ে দিচ্ছে আবার টেনে অন্য কোন কুঠুরির মধ্যে সেঁদিয়ে দিচ্ছে। অবতার কখন এই ভাবে চলেন না। কর্ম আমাদের নাকে দড়ি দিয়ে টেনে শরীর ধারণ করিয়ে নেয়। আর অবতার নিজের ইচ্ছায় শরীর ধারণ করেন। অবতারের মনে হল জগতে অধর্ম খুব বেড়ে গেছে, যাই একটু জ্ঞান ভক্তির শিক্ষা দিয়ে ধর্মকে ঠিক করে আসি। ভগবান কি কোন এক ব্যক্তি বিশেষ যে, পোশাক পাল্টে আসরে নেমে পড়বেন! কখনই নন, তিনি তো সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ, তিনি অদ্বিতীয়, তিনি অনন্ত। কিন্তু যখন দেখেন মায়ার রাজ্যে এত কিছু অনিয়ম ঘটছে তখন তিনিও তাঁর যোগশক্তিকে আশ্রয় করে এই মায়ার রাজ্যে ঢুকে পড়েন। মায়ার রাজ্যে আসতে হলে তাঁকে একটা শরীর ধারণ করতে হবে, তা সে কচ্ছপের শরীরই হোক, মাছের শরীরই হোক, শ্রীকৃষ্ণের শরীরই হোক বা শ্রীরামকৃষ্ণের শরীরই ধারণ করুন, একটা শরীর তাঁকে অবশ্যই ধারণ করতে হবে। কিন্তু এই শরীরের মধ্যে সেই 'তিনি'টা কে? তিনি সেই শুদ্ধ চৈতন্য।

গীতায় ভগবান বলছেন সবাই মনে করে আমার সেদিন জন্ম হল, কিন্তু আমার আবার কিসের জন্ম! যেদিন কেউ এই অবতার তত্ত্বকে বুঝে নেবে সেদিন সে মুক্ত পুরুষ হয়ে যাবে। গীতাতে ভগবানও বলছেন, *জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ। ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জন।।৪/৯।* যিনি আমার জন্মকে দিব্য বলে জানেন, আমার কর্মকে দিব্য বলে জেনে গেছেন তাঁকে আর এই শরীর ত্যাগ করার পর

আর জন্ম নিতে হবে না। দিব্য মানে, বাবা-মার সম্পর্কে অবতারের জন্ম হয় না, কোন কর্মের দ্বারা প্রেরিত হয়ে তাঁকে জন্ম নিতে হচ্ছে না। জন্ম নিলেও তিনি সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দই থেকে যান। যে মায়াকে তিনি বিস্তার করে রেখেছেন সেই মায়াকে আশ্রয় করে এবার তিনি শরীর ধারণ করবেন। এখন কামারপুকুরে শ্রীরামকৃষ্ণ যদি হঠাৎ করে ম্যাজিকের মত এসে আবির্ভূত হয়ে যান তখন স্বাভাবিক ভাবে সবারই মনে পাঁচটা প্রশ্ন উঠবে। লোকে মনে করতে পারে এটা কোন ভূত, নয়তো এটা কোন ম্যাজিক, আর তা নাহলে এটা নিশ্চয়ই কোন চোর ডাকাত। হয়তো চোর ডাকাত মনে করে পিটিয়ে মেরেই ফেলবে। হঠাৎ যদি কোন বাচ্চা হয়ে এসে যান তখন সবাই বলবে কোন অবৈধ সন্তানকে এখানে ফেলে দিয়ে গেছে। বাঘ সিংহ রূপ নিয়ে এলে লোকে গুলি করে মেরে দেবে। সেইজন্য তাঁর পক্ষে সহজ ও নিরাপদ পন্থা হল কোন একটা গর্ভকে আশ্রয় করে প্রাণীদের মতই জন্ম গ্রহণ করা। জন্ম নেওয়ার পরেও মানুষ যেরকমটি আচরণ করে তিনিও ঠিক সেই রকমটি আচরণ করেন, যা যা লোকাচার আছে সব লোকাচারকে মেনে চলেন। কিন্তু এর মধ্যে থেকেই তিনি এমন এমন কার্য করতে থাকেন যে তাতেই মানুষ হতবাক হয়ে যায়। সাধারণ মানুষ দেখছেন এই শরীর দিয়ে যা সম্ভব নয় তিনি সেই শরীর দিয়েই সেই অসম্ভবকে সম্ভব করে দিচ্ছেন। যেমন ঠাকুরের মুণ্ডুকাটা তপস্যা আমার আপনার শরীর দিয়ে কোন দিন সম্ভব নয়।

কালায় কালনাভায় কালাবয়বসাক্ষিণে। বিশ্বায় তদুপদ্রষ্ট্রে তৎকর্ত্রে বিশ্বহেতবে।।১০/১৬/৪১। আপনি কালেরও সাক্ষী। সৃষ্টিতে প্রথমে কালের জন্ম হয়, কাল আবার সবার সাক্ষী, সেই কালেরও দ্রষ্টা ভগবান। সৃষ্টি যখন হয় তখন দেশ, কাল ও পাত্র এই তিনটে একসাথে জন্ম নেয়। পাত্র বলতে এখানে বোঝাচ্ছে ঘটনা সমূহ। দুটো ঘটনাকে সময় দিয়ে মাপা হয়। এই তিনটে আবার ভগবানকে আশ্রয় করে সব কিছুর সাক্ষী হয়ে আছে। নাগপত্নীরা আবার বলছেন ***নমোহনন্তায় সূক্ষ্মায় কূটস্থায় বিপশ্চিতে। নানাবাদানুরোধায় বাচ্যবাচকশক্তয়ে।।১০/১৬/৪৩।*** আপনি হলেন দেশ, কালের বাইরে, তার মানে দেশ কাল দিয়ে আপনাকে মাপা যায় না, কারণ আপনি অনন্ত। আপনি সূক্ষ্ম থেকেও সূক্ষ্ম। যার যেমন বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে আপনার ধারণা করে তাদের সেই অভিষ্ট তত্ত্বরূপে বুদ্ধিবৃত্তিতে আপনিই প্রতিভাসিত হন। আপনি বাচক আবার বাচ্যও, যেমন নাম আর নামী অভেদ। আপনার এই সর্বরূপকে আমরা প্রণাম জানাই।

নমঃ প্রমাণমূলায় কবয়ে শাস্ত্রযোনয়ে। প্রবৃত্তায় নিবৃত্তায় নিগমায় নমো নমঃ।।১০/১৬/৪৪। এখানে ভগবানের খুব সুন্দর ব্যাখ্যা করা হচ্ছে। *নমঃ প্রমাণমূলায়*, প্রমাণ মানে যেটা দিয়ে একটা জিনিষকে জানা হয়। তিনটে খুব নামকরা প্রমাণ হল – প্রত্যক্ষ প্রমাণ, অনুমান প্রমাণ আর শাস্ত্র প্রমাণ। প্রত্যক্ষ প্রমাণ হল ইন্দ্রিয় দিয়ে জানা, অনুমান প্রমাণ মানে যেখানে যুক্তির সাহায্যে জানা হয় আর বেদ উপনিষদাদি হল শাস্ত্র প্রমাণ। কিন্তু এখানে বলছেন আপনি প্রমাণের মূল। আশ্চর্যের ব্যাপার হল আমরা শাস্ত্র দিয়েই ভগবানের কথা জানতে পারি, অথচ তিনি হলেন প্রমাণের মুলে, তার মানে যেটাকে দিয়ে তাঁকে জানছি তিনি তার মূলে আছেন। *কবয়ে শাস্ত্রযোনয়ে*, আমাদের শাস্ত্রে কবি শব্দের অর্থ হল যিনি ভূত, ভবিষ্যত ও বর্তমান এই তিনটে কালকে জানেন অর্থাৎ সব জ্ঞান যাঁর কাছে স্বয়ংপ্রকাশ। আর সমস্ত শাস্ত্রের যোনি ভগবান নিজে। ব্রহ্মসূত্রে বলছে *শাস্ত্রযোনিত্বাৎ*, সমস্ত শাস্ত্র ভগবান থেকেই বেরিয়েছে। বেদ উপনিষদের এত মাহাত্ম্য এই কারণেই, কারণ এগুলো ভগবান থেকে বেরিয়েছে। কোরানও তাই, আল্লার কথা বলে কোরানের এত দাম। বাইবেল হল যিশু, যিনি ভগবানের সন্তান, তাঁর কথা। কথামৃত ভগবানের কথা। ভগবানের কথা যদি না হয় তাহলে শাস্ত্র বলে কেউ গ্রহণ করবে না। *প্রবৃত্তায় নিবৃত্তায়*, মানুষ যখন কোন কিছুতে প্রবৃত্ত হচ্ছে আর আবার যখন সব কিছু থেকে নিবৃত্তি নিয়ে নিচ্ছে, এই দুইয়ের মূল হল বেদ, সেই বেদও আপনিই।

এই শ্লোকটিও খুব মজার। বলছেন ***নমঃ কৃষ্ণায় রামায় বসুদেবসুতায় চ। প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় সাত্বতাং পতয়ে নমঃ।।১০/১৬/৪৫।*** ভগবান শ্রীকৃষ্ণের একটা রূপ হল চতুর্ব্যূহ রূপ – শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই চারজনকে একত্রে একক ব্যক্তিত্ব রূপে গণ্য করা হয়। মজার ব্যাপার হল নাগপত্নীরা ছয়-সাত বছর বালক শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করছেন, শ্রীকৃষ্ণের এখনও বিয়ে হওয়ার কথাই নয় কিন্তু এখানে তাঁর দুই

পুত্রের নাম উল্লেখ করে নাগপত্নীরা স্তুতি করছেন। এটাকে আমরা দু ভাবে দেখতে পারি, নাগপত্নীদের একটা আধ্যাত্মিক জ্ঞান হয়ে থাকতে পারে সেখান থেকে তাঁরা চতুর্ব্যুহের একটা ভাবকে প্রণাম করছে। আর দ্বিতীয় হতে পারে এই রচনাগুলো অনেক পরে রচিত হয়েছে, সেইজন্য নাগপত্নীদের দিয়ে এইভাবে স্তুতি করান হচ্ছে।

নমো গুণপ্রদীপায় গুণাত্মাচ্ছাদনায় চ। গুণবৃত্ত্যুপলক্ষ্যায় গুণদ্রষ্ট্রে স্বসংবিদে।।১০/১৬/৪৬। সত্ত্ব, রজো ও তমো এই তিনটে গুণ, যে গুণ দিয়ে সমগ্র সংসার চলছে। এই গুণগুলোকে আপনিই প্রদীপ্ত করে রেখেছেন। এর আগে একটা আলোচনায় এসেছিল যেখানে বলা হয়েছিল ভগবান যখন সত্ত্ব, রজো ও তমো এই তিনটে গুণকে সৃষ্টি করে সৃষ্টির কাজে লাগালেন, তখন এই তিনটে গুণ প্রথমে কোন সৃষ্টি কার্যই করতে পারছিল না। এগুলো তো জড় পদার্থ, তাই কোন কিছু সৃষ্টি করার ক্ষমতা তাদের না থাকারই কথা। তখন এই তিনটে গুণ ভগবানের কাছে গিয়ে বলছে – আমরা তো সৃষ্টি করতে পারছি না। ভগবান তখন নিজে এই তিনটে গুণের মধ্যে প্রবেশ করে গেলেন। ভগবান তাদের মধ্যে প্রবেশ করতেই নির্জীব জড় চৈতন্যের জ্যোতিতে প্রদীপ্ত হয়ে গেল, তখন সৃষ্টির কার্যও শুরু হয়ে গেল। নাগপত্নীরা তাই খুব সুন্দর বলছেন *গুণপ্রদীপায়*, গুণ গুলিকে যিনি প্রদীপ্ত করেন। হিন্দুদের মতে অনু থেকেও যে অনু রয়েছে, তার থেকেও যে অনু রয়েছে সেই অনুর মধ্যেও পরমাত্মা বিদ্যমান। নির্জীব জড় পদার্থ দিয়ে কখন সৃষ্টি কার্য করা যাবে না। সেইজন্য নাগপত্নীরা বলছেন *নমো গুণপ্রদীপায়*, যিনি গুণকে প্রদীপ্ত করে রেখেছেন সেই আপনাকে আমরা প্রণাম করি।

আবার বলছেন 'আপনি নিজেকে কখন কর্তা মনে করেন না, কর্তাপনের কোন ভাব আপনার মধ্যে নেই। সেইজন্য আপনি কোন কাজও করেন না'। আমরা কেন কাজ করছি? কারণ আমরা মনে করছি এই শরীরটা আমি, এই মনটা আমি, সেইজন্য যা কিছু হচ্ছে মনে করছি আমি করছি। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ জানেন তিনি শরীর নন, তিনি মন নন। সেইজন্য যখন কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ করাচ্ছেন তখন তিনি বলতে পারছেন *হত্বাপি স ইমাঁল্লোকান্ন হন্তি ন নিবধ্যতে*। সমস্ত সৃষ্টিকে যদি নাশ করে দেন আত্মজ্ঞানী কক্ষণ বলবেন না যে আমি নাশ করেছি, আর তাঁর গলা যদি কেউ কেটে দেয় তখনও তিনি বলবেন আমার তো কিছু হয়নি, জ্ঞানীরা দুটোতেই নির্বিকার থাকেন। যখন তিনি মারছেন তখনও নির্বিকার যখন তাঁকে কেউ মারছে তখনও তিনি নির্বিকার। এই যে ঈশ্বরের মধ্যে কর্তাপনের অভাব আর তার ফলস্বরূপ যে কর্মের অভাব এটাই ভগবান ও জীবকে আলাদা করে দেয়। এখানেই বোঝা যায় জ্ঞানী আর অজ্ঞানীর মধ্যে পার্থক্য কোথায়। জ্ঞানীর মধ্যে কর্তাপনের ভাব থাকে না, অজ্ঞানীর মধ্যে সব সময় কর্তাপন ভাব থাকে। এর থেকে বাঁচার পথ কি? যেটা শঙ্কারাচার্য তাঁর গীতার ভাষ্যে বলছেন *অহং কর্তা ঈশ্বরায় ভৃত্যবৎ করোমি*। সাধারণ জীব তো নিজের কর্তাপন বোধ থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে না, তাই আচার্য বলেই দিচ্ছেন তুমি নিজেকে কর্তা বলেই মনে করে এই ভেবে কাজ কর যে, আমি ঈশ্বরের জন্য তাঁর চাকরের মত সব কাজ করছি। ঠাকুরও বলছেন – এই আমি তো যাবার নয়, তাই থাক শালা দাস আমি হয়ে।

এইভাবে অনেক স্তুতি করার পর নাগপত্নীরা বলছেন – আপনি আমাদের দয়া করুন, আমাদের স্বামীর প্রাণ যেতে বসেছে। আমরা অবলা নারী, স্বামীহারা হলে আমাদের অবস্থা অতি শোচনীয় হবে, আপনি এর প্রাণ দান করুন। আমরা আপনার দাসী, আপনি আমাদের আদেশ করুন আপনার কী সেবা আমরা করতে পারি, ইত্যাদি। নাগপত্নীদের স্তুতিতে ভগবান সন্তুষ্ট হয়ে তিনি কৃপা করে কালিয়কে ছেড়ে দিলেন। ধীরে ধীরে কালিয়র প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের সব চেতনা ফিরে আসতে শুরু হয়ে গেছে। চেতনা ফিরে পাওয়ার পর এবার কালিয়ও অতি দীনভাবে কৃতাঞ্জলিপুটে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি শুরু করেছেন।

কালিয়নাগ কৃত শ্রীকৃষ্ণ স্তুতি

কালিয় স্তুতি করে বলছে ***বয়ং খলাঃ সহোৎপত্ত্যা তামসা দীর্ঘমন্যবঃ। স্বভাবো দুস্ত্যজো নাথ লোকানাং যদসদ্গ্রহঃ।।১০/১৬/৫৬।*** 'হে প্রভু, আমরা জন্ম থেকেই তমোগুণী আর দুষ্ট স্বভাবের আর ক্রোধী। কিন্তু আমাদের ক্রোধের যেটা সবচেয়ে বড় দুর্গুণ, সেটা হল অনেক দিন পরেও আমরা বদলা নিয়ে নিই'। এই

ব্যাপারে আমাদের একটা প্রবাদ আছে যে, নাগকে যদি কেউ মারে তখন নাগের চোখে তার ছবিটা বসে যায়। তারপর সে তাকে খুঁজে বেড়াতে থাকে, ওকে পেলেই সে কামড়াবে সে যত দিনেই হোক। কিন্তু আরো বিপজ্জনক হল, নাগ যদি ইতিমধ্যে মরে যায় তখন ওর যে নাগিন থাকে সেই নাগিন নাগ থেকে ওর ছবিটা নিয়ে নেয়, আর সেই নাগিনও তখন ঐ লোকটাকে খুঁজে বেড়ায়। এটা নিছকই একটা প্রবাদ। কিছু দিন আগে ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রক থেকে একটা ক্ষেপণাস্ত্র তৈরী করা হয়েছে যার নাম নাগ মিসাইল। নাগ মিসাইল এই প্রবাদ অনুযায়ীই কাজ করে, যার জন্য এর নাম দেওয়া হয়েছে নাগ মিসাইল। মিসাইলে কোন শহরের ছবি দিয়ে দেওয়া হয়, তারপর তাকে যখন উৎক্ষেপণ করা হয় তখন মিসাইল খুঁজে খুঁজে শহরটাকে ওই ছবির সাথে মেলাতে থাকে। যখন ছবির সঙ্গে মিলে যাবে তখন ঐখানে গিয়েই সে বিস্ফোরণ ঘটাবে। এই প্রবাদ যে শুধু গ্রামের লোকেদের মধ্যেই আছে তা নয়, বিজ্ঞানীদের মধ্যেও এই প্রবাদ প্রচলিত। গ্রামের লোকেরা বলে – সাপ যদি মেরে দাও তাহলে আগে ওর চোখটা নষ্ট করে দাও, তা নাহলে চোখ থেকে নাগিন ছবি নিয়ে নেবে।

কালিয় নাগ বলছে, জীবের পক্ষে নিজের স্বভাব পরিত্যাগ করা অত্যন্ত কঠিন। এই কারণেই সংসারের লোকেদের নানান দুরাগ্রহের বশে বহু দুর্দশার মধ্যে পড়তে হয়। কালিয় নাগের এই উক্তিটি অত্যন্ত মূল্যবান। কেউ নিজের স্বভাব পাল্টাতে পারবে না। আমার স্বভাবকে যেমন আমি নিজে পাল্টাতে পারবো না, তেমনি অন্য কেউ এসেও আমার স্বভাবটা পাল্টে দিতে পারবে না। কারণ আমি যে সংস্কার নিয়ে জন্মেছি, আমাকে আগে সেই সংস্কারকে বার করে পরিষ্কার করতে হবে। এই সংস্কার তখনই পাল্টাবে যদি প্রচুর সাধ্য সাধনা করা হয়, প্রচুর চেষ্টা করলে একটু একটু করে স্বভাব পাল্টাবে। আর দ্বিতীয়, যদি সৎসঙ্গ করা হয়, ঈশ্বরের যদি কৃপা হয়, অবতারের যদি কৃপা থাকে তখন অশুভ সংস্কারগুলো চাপা পড়ে গিয়ে শুভ সংস্কারগুলো বেরিয়ে আসবে। অশুভ সংস্কার গুলো চলে যাবে না, চাপা পড়ে থাকবে, যখন বেরোবে তখন একটা সময় দুম্ করে বেরিয়ে এসে অশুভ সংস্কারের পুটলিটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। অশুভ সংস্কারগুলো এমন তীব্র ভাবে বেরোতে থাকবে যে তিন জন্মে তার যত খারাপ হওয়ার কথা ছিল সেটা এক জন্মেই একসাথে সব বেরিয়ে গেল। এই এক জন্মে তাকে যে কত আপদ-বিপদে পড়তে হবে আর শারীরিক ব্যাধিতে ভুগতে হবে কল্পনাও করা যাবে না। স্বামী যতীশ্বরানন্দজী বলতেন, যদি দেখ তোমার জীবন খুব মসৃন্ ও ভালোভাবে চলছে তাহলে বুঝতে হবে তোমার আধ্যাত্মিক জীবনে কিছু গোলমাল আছে। গোলমাল মানে, বোঝাই যাচ্ছে তার আধ্যাত্মিক জীবন এখনও শুরুই হয়নি। আধ্যাত্মিক জীবনে যাঁরা প্রবেশ করেছেন, তাঁর জীবন এই মুহূর্তে হিমালয়ের চূড়ায় উঠে যাবে আর তার পর মুহূর্তেই একেবারে সমুদ্রের অতল গহ্বরে নেমে যাবে।

কালিয় নাগ তাই স্তুতি করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বলছে – ***ত্বয়া সৃষ্টমিদং বিশ্বং ধাতর্গুণবিসর্জনম্। নানাস্বভাববীর্যৌজোযোনিবীজাশয়াকৃতি।।১০/১৬/৫৭।*** হে প্রভু! আপনি এই জগতের সৃষ্টি করেছেন। কিরকম সৃষ্টি করেছেন? নানান রকমের স্বভাব, নানান রকমের বীর্য, নানান রকমের শক্তি, নানান রকমের যোনি, নানান রকমের বীজ, নানান রকমের চিত্ত, নানান রকমের আকৃতি। এই যে দুটো প্রাণীর মধ্যে পার্থক্য, কোন প্রাণীর কিছু করার শক্তি বেশী আবার কোন প্রাণীর কম শক্তি, নিজেকে বিকশিত করে দেওয়ার যে শক্তি সেটাও প্রাণীদের ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা, এটা কে করেছেন? ভগবান নিজেই এই পার্থক্যটা করে রেখেছেন। আপনার যে সৃষ্টি, এই সৃষ্টির মধ্যে যে সর্প, সেটাও আপনারই রচনা, তাই আমরা কোন বাইরে থেকে আসিনি। এই যে সৃষ্টির বিরাট চালচিত্র, এই চালচিত্রে আমাদেরও স্থান দেওয়া হয়েছে। আমরা যে জন্ম থেকেই ক্রোধী, এতে আমাদের কোন হাত নেই, আপনিই আমাদের এই গুণ দিয়ে তৈরী করেছেন। আমরা নিজেরাও এই যে মায়ার চক্র, এই চক্রের মধ্যে ঘুরছি।

হে প্রভু! সত্ত্ব, রজ ও তমো এই তিনটে গুণ আপনারই রচনা। প্রাণীর মধ্যে যে ক্রোধ উৎপন্ন হয় সেই ক্রোধও আপনি রচনা করেছেন। আমরা জাতিতে সর্প, আমাদেরও আপনিই রচনা করেছেন। সর্পজাতির মধ্যে ক্রোধ আপনিই আগে থেকে দিয়ে রেখেছেন। আপনি এখন যদি আশা করেন আমরা আমাদের স্বভাবকে পরিত্যাগ করে ক্রোধশূন্য হবে, আমাদের পক্ষে তা কখনই সম্ভব নয়। আমরা শুধু যে ক্রোধী তাই নয় আমরা

প্রতিশোধপরায়ণ প্রাণী, এই স্বভবাটাও আপনিই আমাদের মধ্যে দিয়েছেন। আমি যদি চাই তাও আমি আমার ক্রোধকে ছাড়তে পারবো না। আপনি যে মনে করছেন আমি দুষ্ট, ক্রোধী, লোকের অহিত করি, এতে আমার কোন হাত নেই। আমাদের জন্মই হয়েছে এই দুর্গুণকে সঙ্গ করে, we are born like this. শুধু তাই নয়, সংসারে যত লোক আছে সবাই নিজের নিজের দুরাগ্রহের মধ্যে, দুঃস্বভাবের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে আছে।

এইভাবে কালিয় স্তুতি করে যাচ্ছে। নরেন্দ্রপুরের একটি ছাত্র ভীষণ বদমাইশ আর নোংরা স্বভাবের ছিল। ওখানকার এক মহারাজ ছাত্রটিকে ভালো করার জন্য একটা নতুন ডাইরি দিয়ে বলছেন 'তুই ডাইরিতে ভালো ভালো যে সব কথা শুনবি, পড়বি সব লিখে রাখবি'। তখনকার দিনে ডাইরি খুব দুর্লভ বস্তু ছিল। কয়েক দিন পর মহারাজ ছাত্রটিকে ডেকে ডাইরিটা দেখতে চাইলেন। ডাইরিটা আনার পর মহারাজ খুলেই একবারে তাজ্জব বনে গেলেন, দেখেন যত রাজ্যের সিনেমার হিরো হিরোইনদের ছবিতে ঠাসা। তারপর থেকে মহারাজ আর ডাইরি দেখতে সাহস করলেন না। এটাই হয়, আমাদের মধ্যে যে স্বভাব তৈরী হয়ে আছে, সেখান থেকে কিছুতেই বেরিয়ে আসতে পারিনা। এই সমস্যা প্রত্যেক মানুষের। আমরা মনে করি আপনার এক রকমের স্বভাব, আমার অন্য রকমের স্বভাব, পশুদের ক্ষেত্রেও এই জিনিষ দেখা যায়। যদিও বলা হয় প্রত্যেক পশুর একই স্বভাব কিন্তু আপনি দশটা ছাগলকে মাঠে ঘাস খেতে ছেড়ে দিয়ে দেখুন দশটা ছাগলের চলাফেরা দশ রকমের। আমাদের মনে হবে সব সাপ এক রকমেরই হয়, কিন্তু বিভিন্ন সাপের বিভিন্ন গতিপ্রকৃতি হয়।

জেরাল্ড ডোরেলের Natural Historyর উপর লেখা গল্পগুলি পড়লে এই ব্যাপারটা আরো ভালো ধারণা করতে পারা যাবে। জেরাল্ড ডোরেল প্রায় নব্বুইটা বই লিখেছেন। বাচ্চা বয়স থেকে ওনার নেশা ছিল যত পশু, পাখি, পোকামাকড় এইসব সংগ্রহ করা। জেরাল্ড ডোরেল জীবনে লেখাপড়া শিখলেনই না। কিন্তু পশুপাখিদের নিয়ে খুব মজার মজার কাহিনী লিখে গেছেন, আর ওনার স্ত্রী লেখার ভুলগুলো সংশোধন করে দিতেন। পাণ্ডুলিপিগুলি পড়তে পড়তে ওনার স্ত্রী খুব হাসতেন, বউয়ের হাসি দেখে ডোরাল জিজ্ঞেস করত 'আমার লেখাগুলি খুব ফানি হয়েছে, না'? বউ বলছে 'আমি তোমার কাহিনী পড়ে হাসছি না, তোমার বানানের ছিরি দেখে হাসছি'। মানে একটা বানানও ঠিক থাকত না। আর তাঁরই কলম দিয়ে নব্বুই খানা বই বেরিয়েছে, ভাবা যায়! জেরাল্ড ডোরেলের ছোটবেলায় প্রচুর মজার মজার সব কাণ্ড আছে। বাবা ছিল না, বিধবা মা, আর ভাই বোনদের নিয়ে ছিল সংসার। একদিন একটা বিছেকে দেখছেন যে বিছেটার সবে ডিম থেকে বাচ্চাগুলি বেরিয়েছে আর বিছেটা বাচ্চাগুলিকে পিঠে নিয়ে চলেছে, প্রায় হাজার খানেক বাচ্চা। তখন ওনার বয়স মাত্র ছয় বছর। তিনি পুরো ঐ বাচ্চাগুলিকে ধরে একটা দেশলাই বাক্সে ভরে নিয়েছেন। বাড়িতে এনে টেবিলে রেখে দিয়েছেন। ডোরেলের দাদা সিগেরেট খাবার জন্য ঐ দেশলাই বাক্সটা যেই খুলেছে হাজারটা বিছের বাচ্চা পুরো টেবিলে ছড়িয়ে পড়েছে। সারা বাড়িতে হুলুস্থুলু কাণ্ড। সবাই বলছে এই ছেলেকে জঙ্গলে ছেড়ে দাও।

পরবর্তি কালে তিনি নিজেই একটা ছোটখাট চিড়িয়াখানা বানিয়ে নিয়েছিলেন। পশু পাখিদের আচরণ তিনি খুব গভীর ভাবে পর্যবেক্ষণ করে এই সব বই লিখেছেন। সেখানে তিনি বলছেন দুটো পশুর মধ্যে তাদের স্বভাবে কত পার্থক্য। সারা বিশ্ব থেকে তিনি নানা পশু পাখি পোকামাকড় সংগ্রহ করতেন। হিংস্র পশু, বিষাক্ত পোকা সব ধরণের প্রাণী তার সংগ্রহের মধ্যে ছিল। নিজের লেখা বইতে তিনি উল্লেখ করেছেন এগুলো তিনি কীভাবে সংগ্রহ করেছেন, কীভাবে পরিপালন, পরিচর্যা করে রক্ষা করতেন। যদিও আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় সব সাপ একই রকমের কিন্তু তাদের মধ্যেও অনেক পার্থক্য আছে। এখানে এই কথাই বলছেন যে মানুষ নিজের নিজের মানসিকতার মধ্যে ঘুরপাক খেতে থাকে।

আমরা এর আগেও বলেছিলাম, সাপের ডিম ফুটে যখন বাচ্চাগুলো বেরোতে শুরু করে তখন সাপের মা নিজের বাচ্চাগুলোকে গপ্ গপ্ করে গিলতে থাকে। ওখান থেকে যে কটা বেঁচে বেরিয়ে আসতে পারে তারাই বড় হয়ে সাপ হয়। সাপেরা কে প্রিয় কে অপ্রিয়, কে শত্রু কে মিত্র তফাৎ করতে পারেনা, সাপেরা একটাই বুঝতে পারে তা হল কোন কিছুর নড়াচড়া। যতক্ষণ ডিম আছে কোন নড়াচড়া নেই, যেই ডিম ফুটে বাচ্চা বেরোতে থাকে তখন বাচ্চাগুলো কিলবিল করে নড়তে থাকে, তখনই সর্পিনী বাচ্চাগুলিকে গিলতে থাকে,

ওর যে নিজের সন্তান না অপরের সন্তান সেসব কিছু বোঝে না। সেইজন্য বলে সাপ যদি তেড়ে আসে তখন সে যদি পাথরের মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে তাহলে সাপ আর কামড়ায় না। সাপেরা দুটো কাজই জানে পালাও, না হয় আক্রমণ কর, এই দুটো কাজ ছাড়া আর কিছু জানেনা। কালিয় তাই বলছে – 'এই মোহেতে আমরা নিজেরাই তো মরছি তা আমরা কি করে নিজেদের স্বভাবকে ছেড়ে দেব বলুন'!

কালিয় এক এক করে যুক্তি দিয়ে বলছে – ***ভবান্ হি কারণং তত্র সর্বজ্ঞো জগদীশ্বরঃ। অনুগ্রহং নিগ্রহং বা মন্যসে তদ্ বিধেহি নঃ।।১০/১৬/৫৯।*** হে জগদীশ্বর! আপনি সর্বজ্ঞ, সমস্ত সংসারের আপনি স্বামী। একদিকে আপনি সব কিছুর স্বামী, প্রভু আর আপনি নিজে আমাদের এইভাবে সৃষ্টি করেছেন, আপনি এখন আমাকে শাস্তি দিতে চাইছেন শাস্তি দিন, কিন্তু আমার দোষটা কোথায় বলুন! আপনি বলছেন আমাকে আপনি শেষ করে দেবেন, আপনি প্রভু, সকলের স্বামী, আপনার হাতে ক্ষমতা আছে তা আপনি শেষ করতেই পারেন। কিন্তু আমার দোষটা কোথায় দেখিয়ে দিন, কারণ এই সংসারে যা কিছু আছে সব আপনিই তৈরী করেছেন, আর আপনিই আমাদের জন্ম থেকেই এই স্বভাব দিয়েই সৃষ্টি করেছেন। তার মানে কালিয় বলতে চাইছে, ভগবানই তাকে এভাবে সৃষ্টি করেছেন আবার এখন কেন তিনি তাকে দণ্ড দিতে চাইছেন!

এগুলো হল ধর্মকে নিয়ে ধর্মবিরোধী ও শাস্ত্রবিরোধীদের খুব চালাকি সুলভ প্রশ্ন। শাস্ত্র বলছে ভগবানই সব করেছেন, যদি তাই হয় তাহলে তিনি কেন শাস্তি দেবেন। গানে বলছে 'আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী', মানে তিনিই চালাচ্ছেন, তিনিই যখন চালাচ্ছেন তাহলে আমি কেন শাস্তি ভোগ করব! প্রায়ই আমাদের এই ধরণের প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়, তাই এর উত্তরও আমাদের জেনে রাখা খুব প্রয়োজন। যারা আমাদের শাস্ত্রবিরোধী তারাই এই সব প্রশ্ন করেন। একটা বাস যদি কাউকে চাপা দেয় তাহলে বাসের দোষ না ড্রাইভারের দোষ? সবাই ড্রাইভারকেই দোষী বলবে। তাহলে বাসটাকে পুড়িয়ে দেওয়ারতো কোন যুক্তি থাকতে পারে না। এখানে কালিয় যেটা বলছে তাতে বাসটাকে পুড়িয়ে দেওয়ার কথাই বলা হচ্ছে। আমরা যদি তত্ত্বটা ঠিক না বুঝি তাহলে এই জায়গা থেকেই ধর্মের নামে যত রকমের লোক ঠকানো, ধাপ্পাবাজী আরম্ভ হয়ে যাবে। আর আজকাল ধর্মের নামে যত রকমের ধাপ্পাবাজী এই ধরণের ভুল চিন্তা ভাবনা থেকেই হচ্ছে। 'আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী' এর উপর কথামৃতে ঠাকুরকে একজন প্রশ্ন করছেন – তিনি যদি যন্ত্রী হন তাহলে আমি কেন শাস্তি পাব? ঠাকুর বলছেন – আগে তুমি বিচার করে দেখ তো তুমি কে?

এটাই আমাদের মূল সমস্যা। আমরা আধখানা নিই আর বাকী আধখানা নিই না। এই যে বলছে আমি কেন শাস্তি পাব, আমিতো যন্ত্রী নই। এখন যদি জিজ্ঞেস করি আপনি কি? আপনি কি শরীর? আপনি কি মন? আপনি কি বুদ্ধি? আপনি কি? যখন বিচার করতে যাব তখন দেখবো আমি এই শরীর নই, আমি মন নই, বুদ্ধি নই। আর যা কিছু হচ্ছে আমার উপরে আদপেই হচ্ছে না। যিনি ঠিক ঠিক জানেন তিনি যন্ত্রী, তিনি এটাও জানতে বাধ্য যে এই যা কিছু হচ্ছে তাঁর ওপরে কিছু হচ্ছে না। কালিয় তো বলছে যে, আপনি আমাকে এই রকম বানিয়েছেন। কালিয় যদি আত্মজ্ঞানী হত সে কখনই বলতো না যে আপনি আমাকে শাস্তি দিচ্ছেন। কালিয় যদি আত্মজ্ঞানী হত তাহলে বলত – আপনি কি করবেন আমাকে! আমার এই শরীরটাকে কেটে ফেলবেন তো, কিন্তু আমিতো শরীর নই, শরীর থাকলেও আমি থাকব, শরীর কেটে ফেললেও আমি থাকব, তাতে আমার কিছু যায় আসে না, আমি আত্মা, আত্মার জন্মই নেই মৃত্যুও নেই। কিন্তু আমাদের সমস্যা হচ্ছে আমরা দুটোকে মিশিয়ে ফেলি।

আমরা কিন্তু কোথাও মনের ভেতরে ধরে বসে আছি যে আমি দেহ, কিন্তু আমাদের উচ্চ আদর্শ থেকে বলা হচ্ছে তুমি দেহ নও, আবার সেই আদর্শ এটাও বলছে যে সব তিনিই চালাচ্ছেন, তিনিই সব সৃষ্টি করেছেন। তিনিই সব চালাচ্ছেন এটা মেনে নিচ্ছি কিন্তু যে বলছে তুমি দেহ নও সেটাকে মানছি না বলেই আমাদের গোলমাল বেঁধে যায়। হয় আপনাকে বলতে হবে আপনিই চালাচ্ছেন আর আপনিই সব আর সেটা যদি না বলেন তাহলে বলতে হবে তিনি চালাচ্ছেন তিনিই সব। দণ্ড, শাস্তি কে দিচ্ছেন? ভগবান। কাকে দিচ্ছেন? ভগবান নিজেই নিজেকে দিচ্ছেন। There cannot be two realities, দুটো সত্তা কখন হতে

পারে না, সত্তা একটাই, হয় আপনি নয়তো তিনি। আমাদের সমস্যা হচ্ছে আমরা দুটোকেই সত্তা বলে মনে করি। হয় আপনাকে বলতে হবে আমিই সব, তার মানে – এই কর্মটা আমি করছি, এই শাস্তি আমি পাচ্ছি, এই শাস্তি আমিই দিচ্ছি। অথবা বলতে হবে – তিনিই আছেন, তিনিই এই সব কিছু হয়েছেন, তিনিই এই সব করাচ্ছেন। কালিয় যখন বলছে 'আপনিই সব কিছুর সৃষ্টি করেছেন, আমার কি দোষ' – এখানে সে কায়দা করে দ্বৈত বুদ্ধি চালাচ্ছে। আপনি আলাদা আমি আলাদা কিন্তু আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে আমাদের মধ্যে কোন ভেদ নেই। যখন আধ্যাত্মিকতার চরম জ্ঞান লাভ হয় তখন হয় বলবে সব তুমি নয়তো বলবে আমিই সব হয়েছি।

আমরা অনেকবার এই উচ্চ আদর্শ নিয়ে আলোচনা করেছি, আমরা দেহ নই, মন নই, বুদ্ধি নই আমি হচ্ছি শুদ্ধ আত্মা। এই জীব জগত যা কিছু দেখছি সব ঈশ্বরই সৃষ্টি করেছেন, শুধু যে সৃষ্টি করেছেন তা নয়, তিনিই এই সব কিছু নিজে হয়েছেন। এই কথাগুলো আমরা অনেক বার শুনেছি, আলোচনা করেছি কিন্তু এখনও আমরা হৃদয়ঙ্গম করতে পারছি না। কারণ আমাদের এখনও সেই প্রস্তুতি আসেনি, এতে কোন দোষ নেই। অনেক দিন ধরে শুনে যেতে হবে, শুনতে শুনতে একটা সময় নিজে থেকেই সব পরিষ্কার হয়ে যাবে। হয় ঈশ্বরই সব কিছু হয়েছেন নয়তো আমিই সব কিছু হয়েছি। যখন দেখছে আমিই সব কিছু হয়েছি তখন সেটাই হয়ে যাবে অদ্বৈত বা জ্ঞানমার্গ। আবার যখন দেখছি তিনিই সব কিছু হয়েছেন তখন সেটাই হয়ে যাবে ভক্তিমার্গ। ভক্তিমার্গে তিনিই সব চালাচ্ছেন। কাকে চালাচ্ছেন? নিজেকেই নিজে চালাচ্ছেন। কিন্তু আমরা বলি আমাকে তিনি চালাচ্ছেন আর তাই এই গণ্ডগোল হয়ে যায়। জ্ঞানমার্গে যখন বলে আমিই সব চালাচ্ছি, তখন কেউ কাউকেই চালাচ্ছে না, কেউ কাউকে মারেনি, ওগুলো সব তোমার কল্পনা। এই সব কারণেই বলা হয় আধ্যাত্মিক তত্ত্ব খুব সূক্ষ্ম ও গভীরের ব্যাপার। এটা না হয় খুব উচ্চ আদর্শ। তা এখন আদর্শটা কি? আদর্শ যদি না জানা থাকে তাহলে উচ্চ আদর্শ বলে লাভটা কি। বিল গেট্‌সের প্রচুর টাকা আছে, তাতে আমার আপনার কি হবে! যাই হোক, তখন কালিয় বলছে 'আপনি আমাকে বলুন আপনি আমাকে কি শাস্তি দিতে যাচ্ছেন, আমি আপনার সব শাস্তি মাথা পেতে নেব'।

কালিয় দমন লীলার অন্তর্নিহিত ভাব

কালিয়ের কথা শুনে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন 'তুমি যা বলছ ঠিকই বলেছ, আর আমি এও জানি গরুড়ের ভয়ে তোমাদের এখানে লুকিয়ে থাকতে হচ্ছে। এখন তুমি নির্ভয়ে সমুদ্রে যে তোমাদের আসল জায়গা রামানাথ দ্বীপ সেখানে চলে যাও। আমি যে তোমার মাথায় নৃত্য করেছি তাতে আমার পদচিহ্ন তোমার মাথায় থেকে গেল, এই চিহ্ন থাকার ফলে গরুড় আর তোমাকে কিছু করতে পারবে না'। কালিয় এরপর যমুনা ছেড়ে সমুদ্রে চলে গেল। একটা মধুরেণ সমাপয়েৎ হল। ভক্তিশাস্ত্রের এটাই মাধুর্য। ভক্তিশাস্ত্রের কোথাও কারুর শাস্তির কথা নেই, সব সময় বলছে উদ্ধার। এখানেও কালিয়কে দণ্ড দেওয়া হচ্ছে বলছে না, ভাগবত বলছে কালিয় নাগের প্রতি অনুগ্রহ বা কালিয়ের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের কৃপা। ভক্তশাস্ত্র যে একেবারেই যুক্তিকে তোয়াক্কা না করে সব কিছু বলবে, তা নয়। দুষ্ট লোক তার স্বভাবকে কি ভাবে ত্যাগ করবে!

স্বামীজী বলছেন – তোমার কিসের এত অহঙ্কার! তুমি একজন ভালো লোক বলেই কি তোমার অহঙ্কার! ভালো হওয়া ছাড়া তো তোমার অন্য কিছু হওয়ার বা করার ক্ষমতাই নেই। যে মহিলা নিজের সতীত্বের জন্য অহঙ্কার করছে, তাকে যদি বলা হয় একবার অসতী হয়ে দেখাক তো। অসতী হওয়ার মত দমই নেই। মহিলা চাইলেও অসতী হতে পারবে না। তাহলে কিসের অহঙ্কার করছে! যে বলছে আমি সৎ লোক, আর তার জন্য খুব অহঙ্কার। খুব ভালো কথা, কিন্তু ভাই তুমি কি অসৎ হতে পারবে? তোমার দমই নেই। যদি কেউ বলে আমার চুরি করারও ক্ষমতা আছে আবার সৎ থাকারও ক্ষমতা আছে, আমার মিথ্যে কথা বলার ক্ষমতা আছে আবার সত্যি কথা বলারও ক্ষমতা আছে, তা সত্ত্বেও আমি সৎ পথে চলছি, সত্য কথা বলছি। গান্ধীজীও বলছেন – যে খুন করতে পারে সেই একমাত্র অহিংসার অনুশীলন করতে পারবে। স্বামীজীও বলছেন, যে দুষ্ট সে তার স্বভাব থেকে বেরোতে পারছে না, যে শ্রেষ্ঠ সেও তার স্বভাব থেকে বেরোতে পারছে না, তাহলে তোমার কিসের অহঙ্কার!

কাহিনীকে এখানে যেভাবে অন্য দিকে মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে, এতে কোন দোষ নেই, এটাই যুক্তিযুক্ত। কালিয় নিজের দলবল নিয়ে মজায় একটা জায়গায় থাকত। গরুড় সাপেদের শত্রু, সেখানে কালিয়দের গরুড় আক্রমণ করত বলে ওখান থেকে পালিয়ে তারা যমুনায় বাসা করে থাকতে শুরু করল। কিন্তু কালিয় নিজের স্বভাব অনুসারে কিছু হিংসার কাজ করেছে। শ্রীকৃষ্ণ সাবধাণ করতে এসে কালিয়কে বুঝিয়ে দিলেন আমি এখানে আমার সখাদের সঙ্গে খেলা করি, নৃত্য করি, তুমি আমাদের কোন বিরক্ত করতে পারবে না। এখন কালিয় তার যুক্তি দেখিয়েছে। শ্রীকৃষ্ণও তার যুক্তিকে মেনে নিয়ে দুজনের মধ্যে একটা সমঝোতায় উপনীত হলেন। তোমার কাজ হয়ে যাবে আমারও কাজ হয়ে যাবে, কারুর পক্ষেই ভয়ের কিছু থাকবে না।

কালিয়-উদ্ধার কাহিনীকে যদি যুক্তি দিয়ে বিচার করা হয় তাহলে কালিয় যে যুক্তি দেখিয়েছে, আপনিই তো আমাকে এই স্বভাব দিয়ে সৃষ্টি বানিয়েছেন তাহলে আবার আমাকে কেন শাস্তি দিতে এসেছেন, এই যুক্তিকে শ্রীকৃষ্ণ যদি মেনে নিয়ে বলতেন, হ্যাঁ তাই তো! ঠিক আছে তুমি যা করছ কর। তাহলে তো সারা জগৎ সর্পময় হয়ে যেত আর সর্প দংশনে শুধু প্রাণহানিই হতে থাকত। এই ব্যাপারটাও তো হতে দেওয়া যায় না। আপনি কি তাহলে একটা সীমা রেখা বেঁধে দেবেন? আর সীমাটা কি ঠিক করে দেবেন? এই প্রশ্ন আলোচনা করা যায় না। স্বভাবে এই রকম হচ্ছে, চিন্তা করে কোন লাভ নেই, কারণ ভগবানের এখানে কোন লেনাদেনা নেই। সেইজন্য ঠাকুরের জীবনী ভালো করে জানা থাকলে বোঝা যায় অবতারের কি কাজ। প্রকৃতিতে যে নিয়ম বেঁধে দেওয়া আছে সেখানে অবতাররা কখনই হাত দেবেন না। প্রকৃতিতে সাপ আছে, সাপের বিষ থাকে। এখন ভগবান সর্বশক্তিমান তিনি ইচ্ছে করলে সব সাপের বিষগুলোকে নষ্ট করে জগতের সমস্ত সাপকে কেঁচো করে দিলে সব ল্যাঠা চুকে যাবে। কাশীপুরের সেই বিখ্যাত ঘটনা আমাদের সবারই জানা। শীতের সময় নরেন আর তার সাঙ্গপাঙ্গরা ঠিক করল খেজুরের রস খাবে। ঠাকুর তখন বিছানায় শয্যাশায়ী, তিনি নিজে এপাশ থেকে ওপাশে কাত হয়ে শুতে পারেন না, শোওয়াতে অন্যের সাহায্যের দরকার। ওই অবস্থায় একদিন শ্রীমা দেখছেন ঠাকুর তীর বেগে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলেন। আবার কিছুক্ষণ পরে তীর বেগে ঘরে এসে শুয়ে পড়লেন। মা এসে ঠাকুরকে জিজ্ঞেস করছেন। ঠাকুর বলছেন 'তুমি কাউকে বলো না, নরেনরা যে খেজুর গাছের রস খেতে যাবে সেই গাছে একটা কাল সাপ বাস করে। আমি গিয়ে তাকে ওখান থেকে চলে যেতে বললাম, আমার ছেলেরা রস খেতে যাবে'।

কালিয়-উদ্ধার কাহিনীর সাথে ঠাকুরের এই ঘটনার প্রচুর মিল পাওয়া যাবে। ঠাকুর ইচ্ছে করলে সাপটাকে মেরে ফেলতেও পারতেন, কিন্তু তিনি সাপটাকে চলে যেতে বললেন। প্রকৃতির এই বিশাল ক্যানভাসে সাপও একটা বিশেষ রূপ নিয়ে ক্যানভাসের সৌন্দর্যের শোভা বর্ধন করছে। প্রকৃতির রঙ্গমঞ্চে সাপও একটা বড় ভূমিকা পালন করছে। সেইজন্য তাকেও প্রকৃতি থেকে নির্মুল করে দেওয়া যাবে না। আবার সাপ যদি চারিদিকে ঘুরে বেড়ায় সেটাও অভিপ্রেত নয়, সাপের বিষ থেকে মানুষকেও নিরাপত্তা দিতে হবে। আবার তার জন্য সব সাপকে পৃথিবী থেকে নির্মুল করে দেওয়াও চলবে না। জনমেজয় যখন জগৎ থেকে সমস্ত সর্পকে নির্মূল করার জন্য যে সর্পযজ্ঞ করেছিলেন তখন এই উদ্দেশ্যেই সর্প নিধন যজ্ঞকে আটকান হয়েছিল। প্রকৃতির ভারসাম্যকে কখনই নষ্ট হতে দিতে নেই। কালিয় দমনেও আমরা এটাই দেখতে পাই যে অবতার কখনই প্রকৃতির নিয়মকে উল্লঙ্ঘন করবেন না। তিনি তো ইচ্ছামাত্রই যা কিছু করে দিতে পারেন, কিন্তু তাঁরা তা করেন না, কেননা প্রকৃতিতে সবারই প্রয়োজন আছে। সাপ আছে বলে প্রকৃতির আরেকটা দিক রক্ষা পাচ্ছে, তা নাহলে সবার বাড়ি ব্যাঙ আর ইঁদুরে ভরে যেতে। বাঘ, সিংহও প্রকৃতিতে একটা সুন্দর ভারসাম্য রক্ষা করছে। যে কোন একটা প্রাণীকে নির্মূল করে দিলে খাদ্য খাদকের সম্পর্কের চক্রতে এমন একটা গোলমাল শুরু হয়ে যাবে যে প্রকৃতি তার ভারসাম্য হারিয়ে ফেলবে। কালিয় উদ্ধার কাহিনীর মূল তাৎপর্য এটাই।

বেণুগীত, চীরহরণ ও রাসলীলার প্রাসঙ্গিকতা

কালিয় দমনের পর ভাগবতের কয়েকটি অধ্যায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এই অধ্যায়গুলোকে ভাগবত থেকে সরিয়ে দিলে ভাগবতের আর কোন মাহাত্ম্য থাকবে না। সমগ্র ভাগবতের প্রাণ হল রাসলীলার পাঁচটি

অধ্যায়। প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান এই পাঁচটি প্রাণের দ্বারা আমাদের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ কাজ করে। ভাগবতের পঞ্চপ্রাণ হল রাসলীলার পাঁচটি অধ্যায়। রাসলীলার প্রস্তুতি রূপে রাসলীলার আগে নিয়ে আসা হয়েছে চীরহরণ, আর চীরহরণের আগে আছে বেণুগীত। বেণুগীত ও চীরহরণের একটি করে অধ্যায় এবং রাসলীলার পাঁচটি অধ্যায়, এই সাতটি অধ্যায়ের আলোচনা করতে গিয়ে এমন অনেক কিছু বিষয়কে সামনে নিয়ে আসতে হবে যা কিনা জাগতিক ভাব সম্পন্ন লোকেদের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকারক। কারণ এই কটি অধ্যায়ে শুধুই প্রেম ভালোবাসার কথা। এর মধ্যে এমন ধরণের কিছু ভালোবাসার অভিব্যক্তি আছে যার সম্বন্ধে অনেকের কোন ধারণাই নেই। সেইজন্য যাদের মধ্যে সামান্যতম বিষয়-বাসনা বা কামগন্ধ আছে তাদের এই কটি প্রসঙ্গ বিশেষ করে রাসলীলার কথা শ্রবণ করা কঠোর ভাবে নিষেধ করা হয়েছে, শোনাটাই পাপ। যাঁরা খুব উচ্চ আধারের আর যাঁদের মধ্যে ঈশ্বরের প্রতি গভীর নিষ্কাম ভক্তি ভাব আছে একমাত্র তাঁরাই এই অধ্যায়গুলো শোনার অধিকারী। আবার অন্য দিকে বলা হয় ভাগবত কথা শ্রবণ করা মানেই রাসলীলার কথা শোনা, ভাগবত থেকে রাসলীলাকে সরিয়ে দিলে ভাগবতের কোন বিশিষ্টতাই থাকবে না। আঠারোটি পুরাণের মধ্যে যে ভাগবতের বিশেষ স্থান তা একমাত্র রাসলীলার জন্য। ভাগবতকে যে পঞ্চম বেদ বলা হয়, হিন্দু ধর্মে ভাগবতকে যে এত উচ্চ স্থানে রাখা হয়েছে শুধু এই রাসলীলার জন্য। রাসলীলা আলোচনা করার আগে ভাগবতে চীরহরণ আর চীরহরণের আগে বেণুগীতের বর্ণনা করা হয়েছে। বেণুগীত বা চীরহরণে যদিও অতটা নেই কিন্তু রাসলীলাকে একসাথে নিয়ে বলতে হয়, নারী ও পুরুষের মধ্যে যে প্রেম, মূলতঃ সেই প্রেমকে আধার করেই পুরো বেণুগীত থেকে রাসলীলা পর্যন্ত সব কিছু বর্ণনা করা হয়েছে। এর ভাবকে অনুকরণ করে পুরো ব্যাপারটাকে বিষয়ী কামাসক্ত মানুষরা সাহিত্য, কাব্যাদি রচনা করছেন। নবরাত্রীতে গুজরাটে গাড়োয়া নৃত্য যেটা হয় সেটাও রাসলীলাকে অনুকরণ করেই হয়, যেটা অত্যন্ত নোংরামীর পর্যায়ে চলে গেছে।

বেণুগীত, চীরহরণ আর রাসলীলার আধ্যাত্মিক তাৎপর্য যদি কেউ ঠিক ঠিক ধারণা করতে চান তাদের পক্ষে ধারণা করা সহজ হবে যদি তাঁরা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গের যেখানে ঠাকুরের মধুর ভাবে সাধনার কথা আছে বা ঠাকুরের সাধনার কথা যেখানে বর্ণনা করা হয়েছে, এই দুটো অংশ যদি একবার অধ্যয়ন করে নেন। ভাগবতের যে অংশ ভাগবতের প্রাণ, এই অংশটা বুঝতে গেলে লীলাপ্রসঙ্গের মধুর ভাব পড়া না থাকলে রাসলীলার তাৎপর্য বোঝা অসম্ভব। স্বামীজী এক জায়গায় বলছেন, রাসলীলাতে গোপীদের যে প্রেম, এই প্রেমে সগুণ আর নির্গুণ দুটো এক সঙ্গেই আছে। শাস্ত্রে আমাদের অনেক রকম সাধনার কথা বলা হয়েছে। আচার্য শঙ্কর গীতার ভাষ্যে জ্ঞান আর কর্ম এই দুটো পথের কথা বলছেন। জ্ঞানের পথ তাঁদেরই জন্য যাঁদের অভেদ বোধ হয়ে গেছে আর অন্য দিকে যাদের মধ্যে দ্বৈত বোধ প্রবল তাদের জন্য কর্ম পথের কথা বলছেন। কর্মের পথে আমি আছি তুমি আছ আর এই জগৎ আছে। সেইদিক থেকে দেখলে ভক্তি কোথাও যেন কর্মের মধ্যেই পড়ে যায়। কিন্তু যাঁরা ভক্ত তাঁরা এভাবে ভক্তিকে দেখেন না। বর্তমান কালের সাধনার পদ্ধতিতে, যা ঠাকুরও আলোচনা করেছেন, সেখানে জ্ঞান আর ভক্তি এই দুটি পথকেই নিয়ে আসা হয়েছে। জ্ঞানমার্গের সাধকরা মনে করেন আত্মাই আছেন, আত্মা ছাড়া কিছু নেই। আত্মার বাইরে যা কিছু আছে সবই বাণীবিলাস, শব্দ মাত্র, এটাকেই বেদান্ত নাম ও রূপ বলছে। সমুদ্র যখন উত্তাল তরঙ্গে হিন্দোলিত হয়ে ওঠে তখন তাকে বলছি ঢেউ। ঢেউ মানেই একটা নাম আর তার একটা রূপ, সমুদ্র ছাড়া কিছু নেই। সমুদ্র আর সমুদ্রের ঢেউ কি আলাদা নাকি! একই জিনিষ। কিন্তু আবার ঢেউও আছে, ঢেউয়ের একটা নাম আছে তার একটা রূপও আছে। ঠিক তেমনি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, এখানেও আত্মা ছাড়া কিছু নেই। কিন্তু নাম ও রূপে আমরা অনেক কিছু দেখছি, গ্লাশ, টেবিল, পাখা, মানুষ, গাড়ি, বাড়ি সব আছে। নাম আর রূপকে সরিয়ে যদি দেখা যায় তাহলে আত্মা ছাড়া আর কিছুই থাকবে না। অন্য দিকে যাঁরা ভক্তি পথে সাধনা করছেন, ঈশ্বরকে অবলম্বন করে যাঁরা জপ-ধ্যান-পূজার মাধ্যমে এগোচ্ছেন তাঁরা দেখেন ঈশ্বর ছাড়া এই জগতে কিছু নেই। জগতে যা কিছু আছে সব ঈশ্বরই হয়েছেন, নানান রূপে ঈশ্বর নিজেই বিরাজ করে আছেন। একটি পথে আত্মা ছাড়া কিছু নেই দেখেন আরেকটি পথে ঈশ্বর ছাড়া কিছু নেই। আসলে দুটোর মধ্যে কোন তফাৎ নেই, দুটো একই কথা। দুটো ক্ষেত্রেই জগতকে উড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। তার থেকেও বড় হল দুটোর ক্ষেত্রেই ‘আমি’ ব্যাপারটা থাকছে না। আমিও থাকছে না

জগতও থাকছে না। হয় ঈশ্বরই থাকছেন আর তা নাহলে আত্মাই থাকছেন, আচার্য শঙ্কর, স্বামীজী সবাই বলছেন আত্মাও যা, ঈশ্বরও তাই আর ব্রহ্মও তাই। আমাদের মত সাধারণ মানুষের পক্ষে এর বেশী ধারণা করা সম্ভব নয়।

অন্য দিকে বেদান্তে আচার্য পুরো যুক্তি দিয়ে দেখাচ্ছেন সচ্চিদানন্দের যেটা সৎ সেটাই চিৎ, যেটাই চিৎ সেটাই আনন্দ, যেটাই আনন্দ সেটাই সৎ। তার মানে যখন সচ্চিদানন্দ বলা হয় তখন মনে হবে তিনটে আলাদা জিনিষ বলা হচ্ছে, আসলে তা নয়, তিনটে একই জিনিষ। কিন্তু তাঁকে আমরা তিন ভাবে দেখছি। চিৎ হল জ্ঞান আর আনন্দ হল ভালোবাসা। যেটাই জ্ঞান সেটাই ভালোবাসা, যেটাই জ্ঞান সেটাই প্রেম, যেটাই ভক্তি সেটাই জ্ঞান, সেইজন্য বলে To know is to love, to love is to know। যখন কোন জিনিষকে আমি জানছি তখন সেই জিনিষটাকে আমি ভালোবাসছি অথবা যে জিনিষটাকে আমি ভালোবাসি সেই জিনিষটাকে আমি জানি। আপনি হয়তো বলবেন 'আমি যদি সাপকে ঠিক ঠিক জেনে যাই তাহলে সাপকে কি আমি ভালোবাসব'? হ্যাঁ, সাপকে যদি পুরোপুরি জানতে পারেন আপনি সাপকেও ভালোবাসবেন। যারা সাপ নিয়ে গবেষণা করে তারা সাপকেও ভালোবাসে। কারণ সাপের ব্যাপারটা তাদের জানা আছে। যারা বিষ নিয়ে পড়াশোনা করে তারা বিষকে ভালোবাসে। একটা জিনিষের গভীরে যত আপনি যাবেন তত ওই জিনিষের প্রতি আপনার ভালোবাসা জন্মাতে থাকবে। একটা জিনিষকে যত আপনি ভালোবাসবেন সেই জিনিষটাকে তত জানবেন। যারা Agriculture নিয়ে ডিগ্রী কোর্সে ভর্তি হতে আসছে তাদের বেশীর ভাগ ছাত্র-ছাত্রী চাষবাস করতে ভালোবাসে না। চাষবাস করতে ভালোবাসে না অথচ Agriculture নিয়ে ডিগ্রী নিতে এসেছে। আসলে তাদের ডিগ্রীটা দরকার। কী দুর্ভাগ্য! এরাই পরে পাশ করে Agriculture Officer হবে অথচ চাষবাস ভালোবাসে না। গাছপালাকেই যদি না ভালোবাসে এখন কতটুকু সে গাছের ব্যাপারে জানবে। যাঁরা অনেক দূর থেকে কষ্ট করে এখানে শাস্ত্র কথা নিয়মিত শুনতে আসছেন তাঁরা নিশ্চয়ই কোথাও একটা বিষয়কে ভালোবেসেছেন, ভাগবতের উপর একটু ভালোবাসা এসেছে বলেই বিষয়টা জানতে আসছেন। আস্তে আস্তে এবার শাস্ত্র যত কৃপা করতে থাকবে, তত শাস্ত্র-কথা পরিষ্কার হতে থাকবে। কারণ একটা জিনিষকে জানা আর একটা জিনিষকে ভালোবাসা একই কথা। ঈশ্বরের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই, জ্ঞানও যা ভক্তিও তাই। কথামৃতে ঠাকুর কতবার বলছেন জ্ঞান আর ভক্তি এক। যারা কাঁচা লোক তারা জ্ঞানকে শুষ্ক বলে। গীতায় পদে পদে ভগবান এই একই কথা বলছেন, যিনি পরমাত্মা তিনিই শ্রীকৃষ্ণ, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই আত্মা।

কথামৃতে ঠাকুর ভক্তির কথা বলতে গিয়ে বলছেন – ভক্তি দুই প্রকার, বৈধী ভক্তি আর রাগাত্মিকা ভক্তি। অনেকে ভক্তির কথা বলতে গিয়ে পরা ভক্তি ও অপরা ভক্তি, প্রেমা ভক্তি নানা রকম শব্দের ব্যবহার করেন। বৈধী ভক্তি মানে যেখানে বিধি লাগানো আছে অর্থাৎ আমাকে এত পূজো করতে হবে, এত অর্চনা করতে হবে, এত জপ করতে হবে, এইসব তীর্থ করতে হবে। বৈধী ভক্তির আরেকটি পরিভাষা অপরা ভক্তি। সারা বিশ্বে সব ধর্মে যাঁরাই ভক্তির অনুশীলন করছেন সবাই এই বৈধী ভক্তিরই অনুশীলন করছেন। আমরা যখন জপ করছি তখন বৈধী ভক্তি করছি, যখন ধ্যান করছি তখনও বৈধী ভক্তি করছি। বৈধী ভক্তির আবার তারতম্য আছে, যেমন আগেকার দিনে নিষ্ঠাবান সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণরা যা কিছু করতেন সেটাও বৈধী ভক্তির মধ্যে পড়ে, কিন্তু খুব উচ্চমানের ভক্তি। সেই তুলনায় আমাদের ভক্তি খুবই সাধারণ, কিন্তু বৈধী ভক্তি। যখন এই ভক্তি প্রেমা ভক্তিতে যাবে, যাকে রাগাত্মিকা ভক্তি বা পরা ভক্তি বলা হচ্ছে, তখন সেই ভক্তিকে আমাদের মত সাধারণ মানুষের পক্ষে ধারণা করা একেবারেই অসম্ভব। প্রেমা ভক্তিতে যে ভালোবাসা বা প্রেমের বর্ণনা শাস্ত্রে এবং কিছু কিছু মহাপুরুষের জীবনে দেখা যায়, ঈশ্বরের প্রতি এই প্রেম হওয়া খুব কঠিন। যাঁদের এই প্রেমাভক্তি হয়েছে তাঁদের সাধন-জীবনের ইতিহাস পড়লেই আমাদের শরীরে কাঁটা দিয়ে ওঠে।

আবার বলা হচ্ছে, যদি কারুর ইচ্ছে হয় ভাগবত বুঝবো, রাসলীলা বুঝবো তাঁরা একবারটি অন্তত লীলাপ্রসঙ্গে ঠাকুরের সাধনার অংশটুকু অধ্যয়ন করুন, তবেই পরিষ্কার হবে প্রেমাভক্তি আসলে কি বস্তু। এক জায়গায় লীলাপ্রসঙ্গকার বর্ণনা করছেন, ঈশ্বরের প্রতি প্রেম এত গভীর যে, ঈশ্বরের বিরহে ঠাকুরের এমন অবস্থা যে বিরহের জ্বালায় তাঁর শরীরে গাত্রদাহ হচ্ছে, গায়ে আগুন জ্বলছে। গঙ্গার তীরে ভিজে মাটিতে পড়ে

থাকতেন, গায়ের সংস্পর্শে এসে মাটি পুড়ে যাচ্ছে। শুধু ঈশ্বরের বিরহে শরীরের এই গাত্রদাহ কি কখন আমরা কল্পনা করতে পারি! ঠাকুরের এই যে মধুর ভাবে ঈশ্বরের প্রতি প্রেম, প্রেমের যে অভিব্যক্তি, যে প্রেমের আকুলতায় ঠাকুরের যা যা হয়েছিল তা আমরা কল্পনা করতে পারি না, কিন্তু যাঁরা এই জিনিষ নিজের চোখে দেখেছিলেন তাঁদের কথা, আবার ঠাকুরও তাঁর অন্তরঙ্গদের কিছু কিছু যে বর্ণনা করে গেছেন সেগুলো আজ অনেক গ্রন্থে এমনকি কথামৃতেও লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। এই জিনিষ শুধু যে ঠাকুরের ক্ষেত্রেই হয়েছে তা নয়, এই একই অভিব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণের জীবনে বা অনেক সাধকের জীবনেই হয়েছে। ভাগবত কোন ইতিহাস গ্রন্থ নয়, এখানে আধ্যাত্মিক সাধনা কীভাবে, কত ভাবে হয় আর কত রকমের আধ্যাত্মিক অনুভূতি হতে পারে সেগুলোকে কাহিনীর মাধ্যমে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এবার ব্যাসদেব, যিনি নিজেই একজন অত্যন্ত উচ্চকোটির ঋষি ছিলেন, তিনি এখন ভক্তির কত রকম রূপ ও অভিব্যক্তি হতে পারে তারই বর্ণনা দিয়ে যাচ্ছেন। তার মধ্যে তিনি ভগবানের বাল্যলীলা বর্ণনা করে ভক্তির বাৎসল্য ভাব এবং আরও বিভিন্ন রকম ভাবকে নিয়ে এসেছেন, সেখান থেকে এখন তিনি প্রবেশ করছেন পরা ভক্তিতে।

আমরা এখানে কল্পনা করে নিতে পারি ব্যাসদেব হয়তো কারুর মধ্যে প্রেমা ভক্তির উচ্ছ্বাস দেখেছিলেন বা তাঁর নিজেরই প্রেমা ভক্তির উদয় হয়েছিল। সেখানে তিনি উপলব্ধি করছেন ঈশ্বরের কথা চিন্তা করলে তাঁর শরীরের গাত্রে উত্তাপ সৃষ্টি হয়ে যেন তীব্র জ্বালা অনুভব হচ্ছে। এই অনুভূতিকে এবার ব্যাসদেবে অন্যদের কী করে বোঝাবেন? অনেক জায়গায় বলা হয়, প্রেমা ভক্তিতে ঈশ্বরের প্রেমিক ভক্ত ভাবে হাসে, ভাবে কাঁদে। কিন্তু ভাবে হাসে, ভাবে কাঁদে এই জিনিষ বৈধী ভক্তিতেও হতে পারে। বৈষ্ণবরা কীর্তন করতে করতে নৃত্য করছে, দেখা যায় তখন তাঁদের চোখ দিয়ে অবিরত জল বেরিয়ে আসছে। স্বামীজী এই ধরণের ভাবোচ্ছাসের প্রচণ্ড নিন্দা করছেন। কীর্তন করতে গিয়ে সত্যিকারের চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে আসছে, এখানে কোন নাটক নেই। কিন্তু কীর্তন থেকে বেরিয়ে আসার পর তার আসল মানুষটি খোলস ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে। খাওয়া, পড়া, টাকা-পয়সা সব কিছুতে তখন হিসাব করতে বসে যায়। তাহলে এই চোখের জলকে আমরা কি বলব? এগুলো কিছুই নয়, ভাবের একটা উদ্রেক, আধ্যাত্মিকতায় বা প্রেমা ভক্তিতে এর কোন মূল্যই নেই। স্বামীজী এই ধরণের ভাবের আতিশয্যকে শুধু তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়েই থেমে থাকেননি, ব্যঙ্গ করে বলছেন – যখন নৃত্য করে তখন নিজের বউয়ের কথা ভেবে চোখের জল ফেলে।

কিন্তু যেখানে সত্যিকারের প্রেমা ভক্তির উদয় হয়, মীরাবাঈয়ের মধ্যে যে ভক্তি ছিল বা ঠাকুরের সাধনার ইতিহাসে যে প্রেমা ভক্তির কথা বলা হয়েছে বা অন্যান্য অনেক বড় বড় সাধকদের জীবনে যে প্রেমা ভক্তি দেখা যায়, এই প্রেমা ভক্তিকে যখন কোন লেখক তাঁর লেখনীর দ্বারা বর্ণনা করবেন তখন তিনি তা কীভাবে বর্ণনা করবেন? প্রেমা ভক্তিকে লেখনীর দ্বারা অভিব্যক্ত করা একেবারেই অসম্ভব। ব্রহ্ম কী বস্তু যেমন মুখে বলা যায় না, আত্মা কী বস্তু যেমন বলা যায় না, আনন্দ জিনিষটা কি যেমন বলা যায় না, ঠিক তেমনি প্রেমা ভক্তি বা পরা ভক্তিকেও কোন ভাবেই বর্ণনা করা যায় না। কিন্তু শাস্ত্রকার যদি প্রেমা ভক্তির বর্ণনা না করেন তাহলে তাঁর গ্রন্থতো অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। নবধা ভক্তিও বৈধী ভক্তের মধ্যে পড়ে যাচ্ছে। সব রকম ভক্তি মানেই বৈধী ভক্তি। কিন্তু যেখানে শুধু ভালোবাসা, ঈশ্বরের প্রতি প্রেম, সেখানে ঠাকুর বর্ণনা করছেন – যে শরীর এত প্রিয় ঈশ্বরের প্রতি প্রেম অনুরাগ এলে সেই শরীরও ভুল হয়ে যায়। হনুমান লঙ্কায় অশোকবনে সীতাকে দেখছেন মলিন বস্ত্র পরিহিতা এক অতি শীর্ণকায় দেবী। সীতার সমস্ত মন শ্রীরামচন্দ্রে পড়ে আছে। শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি সীতার কী ভালোবাসা ছিল, এই ভালোবাসাকে কি কখন কেউ ভাষা দিয়ে বোঝাতে পারবে! সীতার ভালোবাসা একটা আধ্যাত্মিক বর্ণনা। এই ভালোবাসার নমুনা কাছাকাছি একমাত্র আমরা পাই একটা ছেলে আর মেয়ের ভালোবাসায়। এই প্রেমা ভক্তিকে তুলনা করা হয় সতীর পতির উপর টান, মায়ের সন্তানের উপর টান আর বিষয়ীর বিষয়ের উপর টান, এই তিন টানকে এক সঙ্গে করার পর যে টান হবে তার সাথে। শুধু তাই নয়, এই পরা ভক্তিকে যদি বর্ণনা করতে হয়, শুধু প্রেমকেও যদি বর্ণনা করতে হয় তাহলে একমাত্র পরকীয়া প্রেমের সাথেই তুলনা করা যায়। ঠাকুর কথামৃতে পাতায় পাতায় এগুলোকে নিয়ে মজা করে বলেছেন। ঠাকুর এক জায়গায় বলছেন, স্ত্রীরা অপরের স্বামীকে মনে করে রসরাজ আর নিজের স্বামী যেন

যেমন তেমন। সারাক্ষণ আমাদের চারিপাশে যে প্রেম দেখে থাকি এগুলো আবেগের উচ্ছ্বাস ছাড়া কিছু নয়। কাউকে যদি মাদক দ্রব্য সেবন করিয়ে দেওয়া হয় সে তখন অনেক রকম কথা বলবে, কিন্তু সেটা তার স্বাভাবিক অবস্থার কথা নয়। স্লিপিং পিল খাইয়ে দিলে যার ঘুম হয় না, সেও ঘুমিয়ে পড়বে, কিন্তু এটা তার সুস্থতার লক্ষণ নয়। ঠিক তেমনি আবেগের উচ্ছ্বাসে যা কিছু হয় সেগুলোও সুস্থ মানসিকতার লক্ষণ নয়।

প্রেম হল, আমি তোমাকে ভালোবেসেছি, এরপর তুমি আমার দিকে তাকাও আর নাই তাকাও তাতে আমার কিছু যায় আসে না। আগেকার দিনে যাদের বিয়ে হত সেখানে বাবা-মা একটা ছেলেকে পছন্দ করে নিজের মেয়েকে ছেলেটির হাতে তুলে দিয়ে বলে দিত আজ থেকে এ তোমার স্বামী। মেয়েটিও সেদিন থেকে বলতে শুরু করে দিত 'আমি আমার স্বামী ছাড়া আর কাউকে জানি না'। তাই বলে কি সেই স্বামীর প্রতি মেয়েটির যে প্রেম, ঈশ্বরীয় প্রেম কি সেই রকম কিছু হয়ে যাবে? অসম্ভব। স্বামীর প্রতি স্ত্রীর সেই ভালোবাসা হলে সে তো সীতা হয়ে যাবে। আমি তোমাকে ভালোবাসি – এগুলো সব মুখের কথা। স্বামীর প্রতি যদি সেই প্রেম থাকে, স্বামী মারা গেলে সেই স্ত্রী তো তার জীবন বিসর্জন দিয়ে সতী হয়ে যাবে। কোন কারণে যদি তাকে বাঁচিয়ে নেওয়া যায়, বাকি জীবনটা তো সে সাধ্বী হয়ে যাবে। কারুর মধ্যে সত্যিকারের প্রেম যদি থাকে, আবেগের খেলাও যদি হয়ে থাকে তখন জগতের সব কিছুই তার মিষ্টি মিষ্টি লাগবে।

একজন লোক পাগলা গারদে দেখতে গিয়েছিল পাগলরা কি রকম আচরণ করে নিজের চোখে দেখার জন্য। সেখানে সেই লোকটি দেখছে একটা পাগল দেওয়ালে মাথা ঠুকছে আর কোকিল কণ্ঠে খুব মিষ্টি করে শুধু বলে যাচ্ছে 'কুহু' 'কুহু' 'কুহু'। লোকটি পাগলা গারদের ম্যানেজারকে জিজ্ঞেস করল 'কী ব্যাপার! এই পাগলটি এরকম করছে কেন?' ম্যানেজার বলছে 'কুহু' বলে একটি মেয়ে ছিল, এই ছেলেটি ওকে ভালোবাসত, পরে মেয়েটি ধোকা দিয়ে দিয়েছে, তারপর থেকে লোকটির মানসিক ভারসাম্য নষ্ট হয়ে গেছে'। সেখান থেকে আরেকটা ঘরে গিয়ে দেখছে একটা পাগল সেও দেওয়ালে মাথা ঠুকে যাচ্ছে আর অনর্গল 'কুহু' 'কুহু' করে যাচ্ছে। লোকটি তখন ম্যানেজারকে বলছে 'মহা বদমাইশ মেয়ে তো! একেও ধোকা দিয়েছিল'? ম্যানেজার সঙ্গে সঙ্গে বলছে 'না, না, একে বিয়ে করেছিল'। যাকে বিয়ে করেছে সে মাথা ঠুকছে আর যাকে ধোকা দিয়েছে সেও পাগল হয়ে গেছে। প্রেমের তীব্রতা কত গভীরে যেতে পারে, এই যে লোকটি মেয়েটিকে ভালোবেসেছে, সে মিষ্টি সুরে হৃদয় বিদীর্ণ করে কুহু কুহু করে যাচ্ছে, ঠিক এটাই হয়। যখন একটা কলম নিয়ে দেওয়ালে ছবি আঁকছে তখনও সে তার প্রেমিকাকে দেখছে, তার পাশে ফুল দেখছে, ভ্রমরের গুঞ্জন শুনছে। এ্যবনর্মাল হয়ে গেছে সেটা আলাদা, একটা বিষয়কে নিয়ে চিন্তা করেছে বলে এ্যবনর্মাল হয়েছে। বিষয়ের চিন্তা না করে এখানে যদি শুধু ঈশ্বর চিন্তা করত তাহলে সে একজন মহাত্মা হয়ে যেত।

বিষয় চিন্তা একটা স্তরের পর আর অতিক্রম করার অনুমতি দেয় না, কিন্তু ভক্তি সাধনাতে দেয়। প্রেমের এই তীব্রতা স্বামী স্ত্রীর মধ্যে হওয়া প্রায় অসম্ভব, হয় না যে তা নয়, কিন্তু খুব বিরল। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে স্বামীর প্রতি ভালোবাসা হল, পরম্পরাতে এভাবে সবাই ভালোবেসে এসেছে তাই চলে আসছে, বাবা-মা একটা ছেলের সাথে বিয়ে দিয়েছেন বলে বিয়ে হয়েছে, আর এত দিনের সঙ্গ ছাড়া যায় না তাই ধরে আছে, এর থেকেও গুরুত্বপূর্ণ হল নির্ভরতা, একে ছেড়ে যাবেটা কোথায়। কিন্তু যখন নিজে থেকে কাউকে ঠিক ঠিক ভালোবেসে থাকে তাহলে তাকে কোন কিছুই আর আটকে রাখতে পারবে না। ভর্তৃহরি প্রথম জীবনে একজন খুব নামকরা রাজা ছিলেন। বৈরাগ্যশতকম্ তাঁর খুব বিখ্যাত বই। ভর্তৃহরি নিজের স্ত্রীকে অর্থাৎ রানীকে খুব ভালোবাসতেন। তিনি একবার খুব দামী একটা মুক্তার হার ভালোবেসে নিজের স্ত্রীকে উপহার দিয়েছেন। রানীর আবার মন্ত্রীর সঙ্গে খুব ভালোবাসা ছিল। সেই মুক্তার হার রানী আবার মন্ত্রীকে উপহার দিয়েছেন। মন্ত্রী আবার এক বেশ্যাকে খুব ভালোবাসত, মন্ত্রী তাকে সেই মুক্তোর হার দিয়েছে। ওই বেশ্যা আবার ভর্তৃহরিকে খুব ভালোবাসত। রাজা যখন সেই বেশ্যার কাছে গেছে, সেই মুক্তার হারটা রাজার কাছেই ফেরত চলে এসেছে। সেদিনই ভর্তৃহরির মধ্যে বৈরাগ্য জেগে গেল, সঙ্গে সঙ্গে সব কিছু ছেড়ে তিনি বেরিয়ে গেলেন। যেখানেই সততা, পতিব্রতা সেখানেই বুঝবেন সুযোগের অভাব। কিন্তু যখন ভালো কাউকে পাবে, তাকে যখন প্রেম করতে শুরু করবে এবার আমরা বুঝতে পারবো প্রেম কাকে বলে। যদিও সেটা অত্যন্ত নিম্ন মানের। এই যে

প্রেম এখানে নিজের মর্যাদাকে ছাড়িয়ে গিয়ে এবার সে বেরিয়ে পড়বে। ঠাকুর বলছেন, একটি স্ত্রী একজনকে উপপতি করেছিল, সে রাস্থায় বেরিয়ে তার জামা টেনে বলছে 'তবে রে! তোর জন্য আমি নষ্টা হলাম, আর বলিস কিনা আমাকে নিবি না'! তার মানে, মেয়েটি যখন কাউকে ভালোবেসেছে তখন সে তার লজ্জা, ভয় সব কিছুকে বিসর্জন দিয়ে দেবে। সে তার কুল মর্যাদা, স্বামী, পরিবার কাউকেই আর তোয়াক্কা করবে না, যাকে প্রেম করেছে তার জন্য সে পথে নেমে আসবে। ঠিক এই ভাবটাকে যদি কেউ একবার ধারণা করে নিতে পারে আর এই ভাবকে আশ্রয় করে যদি কৃষ্ণপ্রেমে লাগিয়ে দেয় তাহলে এবার পরা ভক্তি কাকে বলে কিছুটা ধারণা করতে পারবে, অবশ্য যদি তার হৃদয় শুদ্ধ হয়ে থাকে। অশুদ্ধ হৃদয় থাকলে শুধু প্রেম দেখবে, উপন্যাসকাররা, চলচ্চিত্রকাররা যেসব রোমাঞ্চকারী প্রেমের উপন্যাস লিখছেন তার বাইরে আর কিছু দেখতে পারবেন না।

ঈশ্বরের প্রেম হলে ঠিক ঠিক কি হয়? তখন নিজের পরিধাণের কাপড়ের দিকেও খেয়াল থাকবে না। নিজের শরীর যে এত প্রিয় সেই শরীরের যত ক্রিয়া খাওয়া-দাওয়া, ঘুমনো এসবের কোন কিছুর দিকে তার আর হুঁশ থাকবে না। যোগীরা কত দিন ধরে নিয়মিত প্রাণায়াম অভ্যাস করে কুম্ভক করতে সক্ষম হন। প্রেমে কুম্ভক আপনা আপনিই হয়ে যায়। যাঁদের হৃদয়ে ঈশ্বরের প্রতি প্রেমের তীব্রতার অনুভূতি যদি একদিনের জন্যও হয়ে থাকে, যদি ভাগবতের রাসলীলা তাঁদের একবারও পড়া থাকে তাহলে একটু ধারণা করতে পারবেন পরা ভক্তি কী আর প্রেমা ভক্তি কী। যদি প্রেমের অনুভূতি না হয়ে থাকে তাহলে কিন্তু রাসলীলা ধারণা কোন ভাবেই করা যাবে না। যদি আপনার হৃদয়ে কখন প্রেমের তীব্র আকুতি কখন হয়ে থাকে বা আপনার মধ্যে প্রেমের ভাব আছে অথচ আপনার ভেতরে আধ্যাত্মিক ভাব নেই তখন এই প্রেমই আপনাকে নীচের দিকে টেনে নিয়ে যাবে। পরা ভক্তিতে দুটোই থাকতে হবে – ভেতরে তীব্র প্রেমের আবেগ আর আধ্যাত্মিক গুণ। ভেতরে আধ্যাত্মিক গুণ না থাকলে এই প্রেমই দৈহিক পর্যায়ে নেমে যাবে। সেইজন্য প্রথম থেকেই বলে দেওয়া হয় যাদের মধ্যে সামান্য কাম গন্ধ আছে তাদের ভাগবতের এই কটি অধ্যায়, বিশেষ করে চীর হরণ আর রাসলীলা শুনতে নেই, শুনলে পাপ হয়।

প্রেম কি একদিনেই হয়ে যায়? বলে Love at first sight। প্রথম দর্শনেই ভালোবাসা হয়ে যাওয়ার অনেক ঘটনা আছে। নল-দময়ন্তী কাহিনীতে কেউ কাউকে দেখেইনি, হাঁস এসে এক অপরের প্রশংসা করে যাচ্ছে। তারপর ছবি দেখে তাদের মধ্যে ভালোবাসা হয়ে গেল। তাহলে কি বলা যাবে প্রথম নজর পড়তেই ভালোবাসা হয়ে যায়? এগুলো না বুঝলে বেণুগীত, চীরহরণ, রাসলীলা কিছু বোঝা যাবে না, কারণ এই তিনটে কাহিনীর সাথে প্রেমের মনস্তাত্ত্বিকতার সরাসরি যোগ রয়েছে। প্রেমের বিশ্লেষণ যতক্ষণ না বোঝা যাবে ততক্ষণ পরা ভক্তি বা রাসলীলার তাৎপর্য কোন দিন বুঝতে পারবো না। অনেকেই আছে যাদের প্রথম দেখেই প্রেম হয়ে গেছে বা ভালো লেগে গেছে। কিন্তু তাহলেও কী সেখানে সম্পূর্ণ সমর্পণ হয়? না, কখনই হয় না, তার জন্য একটা সময় দিতে হবে। এই যে প্রথম যাকে দেখে ভালো লাগলো, সেখান থেকে শুরু করে ধীরে ধীরে যেতে যেতে যেখানে গিয়ে দুজনে এক হয়ে নিজেদের ব্যক্তিসত্তা লুপ্ত হয়ে সম্পূর্ণ হারিয়ে যাচ্ছে, কঠোপনিষদ যাকে বলছে *যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধমাসিক্তং তাদৃগেব ভবতি*, শুদ্ধ জলে যদি শুদ্ধ জল মিশিয়ে দেওয়া হয় তখন সেটা এক রসত্ব প্রাপ্ত হয়ে যায়, দুটোকে আলাদা করা যায় না, প্রেমা ভক্তি বা পরা ভক্তি মানে ঠিক এটাই, শুদ্ধে জলে শুদ্ধ জল মিশে গেল। আত্মজ্ঞানে কি হয় বোঝাতে গিয়ে কঠোপনিষদ এই মন্ত্র দিয়ে বোঝাচ্ছে, শুদ্ধ জলে শুদ্ধ জল মেশার সাথে প্রেমা ভক্তি বা পরা ভক্তির কোথাও কোন পার্থক্য নেই।

কিন্তু তার আগে যখন বলছেন *নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো নাসমাহিতঃ। নাশান্তমানসো বাহপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ।। ১/২/২৪।* আপনি যে নিজেকে শুদ্ধ করবেন, যেখান থেকে শুদ্ধ বুদ্ধি হবে, শুদ্ধ আত্মা হবে, শুদ্ধ আত্মার সাথে শুদ্ধ আত্মার মিলন হবে, এর জন্য আগে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়। ঠিক তেমনি প্রেমাভক্তিতেও অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়। আমরা যে মনে করছি প্রথম দিন থেকেই গোপীরা একেবারে কৃষ্ণপ্রেমে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, তা নয়। তাঁদেরকেও অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছিল। আমরা যে মনে করছি এই ছেলেমেয়েরা এক অপরকে শিস্ মারছে আর তারপর থেকেই বলছে 'আমি তুমি এক'। কখনই তা হয় না। সকালবেলা থেকে শুরু হয় I love you, I love you দিয়ে আর শুধু এটাকে নিয়েই সারাটা দিন

এসএমএস আর ফোন চলছে তো চলছেই। তারপর একদিন ছেলেটা কোন ভালো আরেকটা মেয়েকে দেখে ভালো লেগে গেলো, ওখানেই এই খেলাটা শেষ হয়ে গিয়ে পরেরটির সাথে আবার সেই একই খেলা চলতে শুরু করবে। আগের প্রেমিকা যদি আরেকটি ছেলেকে এর মধ্যে কব্জা না করতে পারে তাহলে হয় গলায় দড়ি দেবে তা নাহলে স্লিপিং পিল খাবে। আসলে এখানে দুজন দুজনকে কেউই জানে না, চেনে না। এও দুনম্বরী, সেও দুনম্বরী। কিছু দিন পরে সে বুঝে গেল মেয়েটি দুনম্বরী, তার থেকে আরেকটা ভালো জিনিষ পেয়ে গেলে তার কাছে থাকতে যাবে কেন। কিন্তু তার আগে যে এদের কুহু কুহু মিষ্টি ডাক ছিল সেটা কী ছিল? কিছুই না, এটাকে বলে plain sex desire। হিন্দীতে খুব বিখ্যাত শায়ের আছে – কভি জান কী কসম্ খাতে থে অব্ জনাজে মে সামিল হোনে কি কসম্ খাতে হ্যায়। আগে তুমি আমার জন্য তোমার জানের কসম খেতে আর আজকে আমি মারা গেলে আমার শব মিছিলে তুমি সামিল হওয়ার কসম খাচ্ছ। এই তো ভালোবাসা! এরা আবার বলে প্রেমের কথা। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে আমাদের মনে হবে ছেলেমেয়েদের প্রেম আর প্রেমা ভক্তি যেন এক। ঠিকই, একই জিনিষ। কিন্তু প্রেমা ভক্তি যখন শুরু হয় তখন ওই অবস্থা থেকে উপরের দিকে উঠতে শুরু করে। আর ছেলেমেয়েদের প্রেম একেবারে উপর থেকে শুরু হয়ে নীচের দিকে পড়তে থাকে। আর ওখান থেকে উপরে উঠবে না। প্রেমা ভক্তিতে যেখান থেকে শুরু করেছে ওখান থেকে এবার উপরেই যাবে, নীচ কখন যাবে না। কারণ process of knowing begins। আমার আপনার যখন process of knowing শুরু হয়, তখনই ঠিক ঠিক পরা ভক্তির বীজ অঙ্কুরিত হতে শুরু করে।

ঠাকুর নারী শরীরের বর্ণনা করছেন – নারীর শরীরে কি আছে! চামড়া, মল-মূত্র, অস্তিমজ্জা। ঠাকুর তো মেয়েদের শরীরের বর্ণনা দিচ্ছেন, কিন্তু মেয়েদের মন যদি ঘাঁটতে যাওয়া হয়, তখন খালি পচা গোবর ছাড়া কিছুই বেরোবে না। একটা মজার গল্পে স্বামীর উপর রেগে গিয়ে স্ত্রী বলছে 'তুমি এখান থেকে এক্ষুণি বেরোও, তোমাকে দেখে আমার মাথায় আগুন জ্বলছে'। স্বামীও তখন বলছে 'তাই বলি গোবর পোড়ার গন্ধ কোথা থেকে আসছে'। সত্যিই তাই, সমস্ত রকম সম্পর্কে গোবর ছাড়া কিছুই নেই। কিন্তু যেখানে প্রেম আছে সেখানে যখন ঘাঁটাতে শুরু করেন তখন দেখা যাবে খাঁটি সোনাই শুধু আছে। সেইজন এই সমীকরণ কখনই আমাদের ভুলে যাওয়া উচিৎ নয় To know is to love, to love is to know, জানা মানেই ভালোবাসা, ভালোবাসা মানেই জানা।

আমি তোমাকে ভালোবেসেছি, তোমাকে ছাড়া আমি থাকতে পারবো না। ভালোবেসেছি, এবার তোমাকে আমি জানতে চাইব। জানতে গিয়ে দেখছি খালি গোবর বেরোচ্ছে। কোথাও গরুর গোবর, কোথাও শূকরের গোবর, গোবর ছাড়া কিছু নেই। গোবরের শুধু গুণগত পার্থক্য ছাড়া আর কিছু নেই। যেখানেই ভালোবাসা আছে সেখানেই একটু নাড়িয়ে দেখুন, কোথাও গরুর গোবর, কোথাও শূকরের গোবর, কোথাও কুকুরের গোবর আর কখন বেড়ালের গোবর। জানতে গিয়ে গোবর পেল, এবার কি করবে? আরেক জায়গায় গোবরের সন্ধানে যাবে। নারদ একটা গুবরে পোকাকে বলছেন 'তোমার বড় কষ্ট, চল তোমাকে বৈকুণ্ঠে নিয়ে যাই'। গুবরে পোকা বলছে 'যেতে তো পারি কিন্তু বৈকুণ্ঠে ভালো গোবর পাবো তো'। কোন ছেলে মেয়ের মধ্যে যখন প্রথম ভালোবাসা হয় তখন প্রথমে তারা অনুসন্ধান করতে থাকে। আর প্রথমটাতেই বলে 'ইস্! ছিঃ! এটা বেড়ালের গোবর'। তারপর আরেকটাকে ধরে, সেখানে দেখে কুকুরের। সেটাকে ছেড়ে আরেকটাতে গিয়ে দেখে সেটা শূকরের। শেষ পর্যন্ত একটা গোবরে গিয়েই আশ্রয় নেয়। আগেকার দিন এই সমস্যা ছিল না, তখনকার দিনে বাবা-মা একটা গোবরে গিয়ে বসিয়ে দিয়ে আসতেন। এখন নিজেরাই বেছে নেয়, যার ফলে গোবর গরু পর্যন্তও আসতে পারে না, গরুর নীচেই থাকে। কিন্তু যেখানে সত্যিকারের প্রেম আছে, ভালোবাসা আছে, সেখানে যেমনি সামান্য একটু নাড়া দেওয়া যাবে তখন ঠাকুরের সেই কাঠুরের গল্পের মত হতে থাকবে। প্রথমে চন্দন কাঠ, তারপর রূপোর খনি, রূপোর খনির পর সোনার খনি, তারপর হীরের খনি। তখন বলে আমার আর কোথাও গিয়ে কাজ নেই, আমি এখানেই থাকবো। জাগতিক প্রেম আর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেমে এটাই মৌলিক তফাৎ। জাগতিক প্রেম চূড়া থেকে নীচের দিকে নামে আর ভক্তি সব সময় নীচ

থেকে উপরের দিকে যেতে থাকে। তবে এটাই আশ্চর্যের, দুটোর যে শুরু হয় সেটা একই জায়গা থেকেই শুরু হয়, বরঞ্চ ভক্তিতে আরেকটু নীচের থেকে হতে পারে।

সতীদের যে নিজের স্বামীর প্রতি প্রেম, সেই প্রেমই কিন্তু এই ঈশ্বরীয় ভক্তি, যদিও তারা পরা ভক্তিতে যেতে পারে না। আগেকার দিনে বাবা-মা দেখে-শুনে একটা ছেলের সাথে বিয়ে দিয়ে বলে দিল এই তোর বর, এই তোর সব কিছু। এরপর মেয়েটি সেবা করতে শুরু করে, সেবা করতে করতে এক সময় নিজেকে স্বামীর কাছে সম্পূর্ণ সমর্পণ করে দিল। যারা সত্যিকারের সতী এখানে তাদের কথাই বলা হচ্ছে। আর অর্ধসতীদের তো দুরবস্থার শেষ নেই। এরা সতীও থাকতে পারে না আবার অন্য দিকে অসতী হওয়ারও মুরোদ নেই। কি আর করবে! তখন ওই গোবরের ঢিবিতেই পড়ে থাকে। এমন অনেক প্রেমিক প্রেমিকা দেখা যায়, বিয়ে হয়নি কিন্তু এক অপরেকে প্রচণ্ড ভালোবাসে, দুজনেই নিজেদের আধ্যাত্মিক লাইনের লোক বলে মনে করে। কুড়ি বছর, পঁচিশ বছরের সম্পর্ক। এক অপরকে কেউ কাউকে ছেড়ে থাকতে পারছে না। কিন্তু একদিন সকাল হতেই দেখা গেল দুজনের কেউ কাউকে আর সহ্য করতে পারছে না, জীবনে আর কেউ কারুর মুখও দেখল না। কুড়ি বছর, পঁচিশ বছরের ভালোবাসা ভেঙে যাচ্ছে। আপনি যদি কাউকে এত বছর ভালোবাসতে পারেন তাকে কখন আপনি ছেড়ে যেতে পারবেন না। তার মানে তাদের মধ্যে কিছু আধ্যাত্মিক গুণের ঘাটতি বরাবরের জন্য থেকে গেছে। দুজনের জীবনের blue printএ কিছু ভুল আছে, ভুল থাকতে বাধ্য। আধ্যাত্মিক গুণ সম্পন্ন ব্যক্তি যদি কারুকে ছ'মাস কি এক বছরের জন্য ভালোবাসে, সে জীবনে আর তাকে ছাড়তে পারবে না, তার খুশীর জন্য সে সব কিছুই করবে। আমরা হলাম সাধারণ মানুষ, যে একটু ভালোবাসা দেখায় তার দিকে আমরা ঢলে পড়ি, তারপর যখন সে লাথি মারে তখন আরেক দিকে মুখ থুবড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ি। এই করেই জগতের বেশীর ভাগ মানুষের জীবন চলছে।

পরা ভক্তির প্রস্তুতি পর্ব

যখন জানার প্রক্রিয়াটা শুরু হয়ে যায় তখন একটা একটা করে তার পর্দা সরতে থাকে আর হতবাক হয়ে যায়, ওরেঃ বাফ্! ওর মধ্যে এত গুণ! এবার সে আস্তে আস্তে তার জন্য উদগ্রীব হতে শুরু করবে। এর খুব সহজ ও জীবন্ত দৃষ্টান্ত হল ঠাকুর ও মা কালীর সম্পর্কের ক্ষেত্রে। সতী নারীর যেমন কোন ছেলের সাথে বিয়ে হয়, ঠিক তেমনি ঠাকুরের সাথে কোন ভাবে মা কালীর সঙ্গে যোগাযোগ হয়ে গেল। রানী রাসমণী প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণেশ্বরে ভবতারিণী মন্দিরে পূজারীর চাকরি পেয়েছেন। শক্তি মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে তিনি পূজা শুরু করলেন। বৈধী ভক্তি দিয়েই পূজা আরম্ভ হয়েছে। ঠাকুরের কোন শাস্ত্র পড়া নেই, শাস্ত্রের নিয়ম-কানুন সেরকম কিছুই জানেন না। কিছু শেখানো মন্ত্র দিয়ে মায়ের পূজো করে যাচ্ছেন। হঠাৎ একটা সময় তাঁর মনে প্রশ্ন জাগতে শুরু হল। প্রশ্ন জাগা মানে, এবার মাকে জানার প্রক্রিয়াটা শুরু হয়ে গেল। কিন্তু তারও আগে মা ভবতারিণীর সাথে তাঁর ভালোবাসার সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে গেছে। মাকে তিনি শাড়ি পড়াচ্ছেন, ফুল দিয়ে সাজাচ্ছেন, পূজো করছেন, খাওয়াচ্ছেন, শয়ন দিচ্ছেন, মায়ের সব কিছু তিনি গভীর নিষ্ঠা সহকারে নিজের হাতে করে যাচ্ছেন, আর এইভাবে দিনে দিনে জগতের মার সঙ্গে ভালোবাসা নিবিড় থেকে নিবিড়তর হচ্ছিল। বেলুড় মঠে যাঁরা প্রথম সন্ন্যাসী হতে আসেন, তাঁদের প্রথমে অনেক বিধি নিয়ম পালন করতে হয় – রোজ মঙ্গলারতির আগে ঘুম থেকে উঠবে, মঙ্গলারতিতে যাবে, রোজ দুবেলা ঠাকুরকে প্রণাম করতে যাবে, সঙ্ঘগুরুকে প্রণাম করবে, বিশেষ তিথিপূজাতে সাধুদের প্রণাম করবে। এইভাবে করতে করতে ভেতরে একটা পরিবর্তন আসতে থাকে। এরপর আরও উন্নত হতে হতে কেউ হয়তো সাধারণ স্তরেই থেকে গেলেন আবার কেউ হয়তো বৈদিক যুগের ব্রাহ্মণদের বৈধী ভক্তির স্তরে চলে গেলেন। আর যাঁরা মহাত্মা তাঁরা ওখান থেকে পরা ভক্তির স্তরে চলে যান। এই ধরণের পরা ভক্তি সম্পন্ন সন্ন্যাসীরা রামকৃষ্ণ ভাবান্দোলনকে সমৃদ্ধ করে ভাবীকালের অগণিত সন্ন্যাসী ও ভক্তদের প্রেরণা জুগিয়ে যাচ্ছেন। এখনও সন্ন্যাসীদের চোখের সামনে স্বামী ভূতেশানন্দজীর জীবন জীবন্ত হয়ে আছে, মহারাজকে দেখে মনে হত তিনি যেন তাঁর মনকে জোর করে নামিয়ে সাধু সন্ন্যাসীদের সঙ্গে হাসি-মজা করছেন। কিন্তু তাঁর চোখের দিকে তাকালেই বোঝা যেতে তিনি অন্য এক রাজ্যে হারিয়ে রয়েছেন। এগুলোই প্রেমাভক্তির লক্ষণ।

গোপীদের ক্ষেত্রেও ঠিক এই জিনিষই হয়েছে। যতই বলা হোক না কেন, গোপীরা আগের জন্মে ঋষি ছিলেন, ভগবানের প্রেম আস্বাদনের জন্য তাঁরা গোপী হয়ে ব্রজে জন্ম নিয়েছেন, আবার কোথাও বলছে বেদের ঋচারাই গোপী হয়ে জন্মে নিয়েছেন। আমরা এগুলোকে মাথা থেকে নামিয়ে দিয়েই গোপীদের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভালোবাসার কথা আলোচনা করতে যাচ্ছি। আমরা জানি গোপীরা ছিলেন অত্যন্ত সাধারণ গোয়ালিনী গ্রাম্য রমণী। এই সাধারণ রমণীরা শ্রীকৃষ্ণের একটার পর একটা লীলা দেখে যাচ্ছেন। তাঁর সেই অত্যাশ্চর্য কাণ্ডগুলো দেখছেন, তাঁর সেই মনোমুগ্ধকারী বাঁশীর তান, গান, মিষ্টি মিষ্টি কথা শুনছেন, ভুবন ভোলান নৃত্য, দুষ্টুমি, বদমাইসি সব দেখছেন। এবার ধীরে ধীরে গোপীদের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেম ঘনীভূত হতে শুরু করেছে। প্রেম জাগার পর ঘনীভূত হতে হতে প্রেম একটা জায়গায় এসে থেমে যায়। যে কোন এক তরফা প্রেম একটা অবস্থার পর এসে থমকে যায়। তখন সেই প্রেমকে অন্য দিক দিয়ে আসতে হয়।

এবার জাগতিক প্রেমের দৃষ্টিকোণ দিয়ে বিচার করে ব্যাপারটা দেখা যাক। একটা ছেলে একটি মেয়েকে দেখার পর থেকে তাকে ভালোবাসতে শুরু করেছে। মেয়েটি হয়তো দোতালার বারান্দায় এসে দাঁড়ায়, ছেলেটি রাস্তায় দাঁড়িয়ে মেয়েটির দিকে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকে। এরপর সব বন্ধুদের সে বলতে থাকে 'জানিস্! আমি মেয়েটিকে ভালোবাসি'। দ্বিতীয় ধাপে, হঠাৎ মেয়েটি একদিন তার হাতটা ইশারার মত করে ছেলেটিকে ইঙ্গিতে কিছু একটা দেখিয়ে দিল। ব্যস্, এবার ছেলেটির কবিতা লেখা শুরু হয়ে গেল, শুধু মেয়েটির আঙুলের উপরেই এক গুচ্ছ কবিতা রচনা করে ফেলল। সেখান থেকে একদিন মেয়েটি ছেলেটির দিকে তাকিয়ে তার মুখটা আরও ভালো করে দেখিয়ে দিল। ছেলেটি আরও পাগলের মত উন্মত্ত হয়ে মেয়েটির রূপের বর্ণনা করে অনেক কিছু রচনা করতে শুরু করে দিল। কবিতার পর কবিতা লিখে যাচ্ছে। দেখতে দেখতে ছেলেটির কবিতা চারিদিকে খুব প্রশংসা পেতে আরম্ভ করেছে, তার কবিতার সাথে তারও খুব নাম হয়ে গেছে। একদিন মেয়েটি শেষ পর্যন্ত বলেই দিল 'আমি শুধু তোমারই'। এরপর কোন এক মুহূর্তে মেয়েটি নিজেকে অনাবৃত করে এগিয়ে এসে বলছে 'আমি সম্পূর্ণ রূপে শুধু তোমারই'। এখন ছেলেটির কি হবে? ছেলেটি তার সাথে এক হয়ে গেল। এরপর ও কিন্তু আর কোন কবিতা লিখবে না, কারুর কাছে কিছু বর্ণনা করবে না। কারণ পূর্ণ কুম্ভ হয়ে গেছে। বেদে এটাকেই বলছে *যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ*। যখন ব্রহ্মজ্ঞান হয় তখন বাণী মন সব থেমে যায়, মন ফিরে চলে আসে।

রাসলীলাতেও তাই হয়। রাসলীলাতে শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের পূর্ণ করে দিচ্ছেন। কিন্তু তার আগে পর্যন্ত কী হবে? প্রেয়সীর আঙুলের বর্ণনা, প্রেয়সীর চোখের বর্ণনা, আমার প্রেয়সীর ওষ্ঠদ্বয় এমন। এই বর্ণনা হতে হতে পরা ভক্তিতে গিয়ে সব হারিয়ে যাচ্ছে। ভাগবতে কোথাও শ্রীরাধার নাম উল্লেখ নেই। মহাভারতেও কোথাও রাধার নাম নেই। শ্রীরাধার নাম না থাকা নিয়ে অনেকে ব্যাখ্যা করে বলেন, রাসলীলার যখন ব্যাসদেব রচনা করছিলেন তখন তিনি এত ভাব বিহ্বল ছিলেন যে শ্রীরাধার কথা চিন্তা করলেই তাঁর সমাধি হয়ে যেত, সেইজন্যই ব্যাসদেবে শ্রীরাধার কথা উল্লেখ করে যেতে পারেননি। আমাদের কাছে ঠিক বিশ্বাসযোগ্য নয়, কিন্তু অবিশ্বাসযোগ্যও নয়। ব্যাসদেবের মত যিনি সিদ্ধপুরুষ, শ্রীরাধার প্রেম এমন উচ্চমানের যে সেই প্রেমের ভাব যদি একবার তাঁর মনে পড়ে গেলে তাঁর শরীরের সমস্ত অঙ্গ অবশ হয়ে যাবে এ কোন আশ্চর্যের নয়, তাঁর পক্ষে শ্রীরাধার কথা লেখা বা বলা সব বন্ধ হয়ে যাবে।

বাল্যলীলা আর রাসলীলাকে যদি শ্রীকৃষ্ণরূপী ভাবনদীর দুটি তট ভাবা হয়, তাহলে বেণুগীত আর চীরহরণ হল এই দুটি তটের সেতুবন্ধন। শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা আর রাসলীলাকে সংযোগ করছে বেণুগীত আর চীরহরণ লীলা। বাল্যলীলা পর্যন্ত এতক্ষণ গোপীদের এক তরফা প্রেম চলছিল, গোপীরা শুধু শ্রীকৃষ্ণকে পর্যবেক্ষণ করে যাচ্ছিলেন। এবার শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে গোপীদের কাছে অল্প অল্প করে খুলতে শুরু করেছেন। খুলতে খুলতে রাসলীলাতে গিয়ে মিলন হয়ে যাচ্ছে। ঠাকুরের ক্ষেত্রে কি হয়েছে, ঠাকুরের ব্যাকুলতা তীব্র থেকে ক্রমশ তীব্র হচ্ছে, একটা অবস্থার পর ঠাকুর আর মায়ের অদর্শন সহ্য করতে পারছেন না। প্রেমা ভক্তিতে সহ্যের সীমা একটা অবস্থার পর আর ধরে রাখা অসম্ভব। এবার ঠাকুর নিজের গলা কেটে দেবেন, তখন মা কালী দর্শন দিচ্ছেন। মা কালী ঠাকুরকে কী রূপে দর্শন দিলেন? জিভ বার করা চারটে হাত নিয়ে কি দর্শন

দিলেন? একেবারেই না, ঠাকুরকে তিনি চৈতন্য রূপেই দেখা দিলেন। মা কালী তাঁর চৈতন্য সত্তাকে ঠাকুরের কাছে উন্মোচন করে দিলেন। কিন্তু সেটা ছিল প্রথম একটা ঝলক। সেখান থেকেই শুরু হয় ঠাকুরের মুণ্ডুকাটা সাধনা। বেণুগীতকে ঠাকুরের এই অবস্থার সাথে তুলনা করা যায়, যেখানে ঠাকুর দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্ছেন আর বলছেন 'মা! তুই রামপ্রসাদকে দেখা দিলি, মা তুই কমলাকান্তকে দেখা দিলি, আমাকে তুই কৃপা করলি না কেন'? বেণুগীতে শ্রীকৃষ্ণ বংশীধ্বণি দিয়ে যেন নিজেকে খুলছেন, আমি তো তোমাদের। বেণু হল বাঁশের বাঁশি। শ্রীকৃষ্ণ গোচারণে যাচ্ছেন, বেণুতে সুর তুলছেন আর গোপীদের হৃদয় গহ্বরে, প্রকৃতির অন্তরে, পশুপাখীদের মধ্যে, বৃক্ষের শাখায় শাখায় সেই সুর অনুরণিত হয়ে তার যে প্রভাব পড়ছে, আর সেই প্রভাবে গোপীদের মধ্যে যে প্রচণ্ড ব্যাকুলতার প্রকাশ, এই ব্যাকুলতাই ঠাকুরের একমাত্র সাধনা ছিল। ঠাকুর যখন প্রথম মা কালীকে ভালোবাসতে শুরু করেছেন তখন তিনি কোন শাস্ত্র জানতেন না, কোন সাধন পদ্ধতির শিক্ষা তিনি পাননি। ভেতর থেকে তাঁর স্বতঃপ্রণোদিত একটাই সাধনা এসেছিল শুধু ব্যাকুলতা, আমি মাকে চাই। পরা ভক্তির সূচনা হচ্ছে বেণুগীতে, সেখানেও ব্যাকুলতা ছাড়া কিছু নেই। ঠাকুরের সাধনা আর গোপীদের সাধনার শুরুতে একটাই সাযুজ্য পাই তা হল দুটো সাধনাই শুরু হয় একমাত্র ব্যাকুলতা দিয়ে। বেণুগীত হল ব্যাকুলতার পরাকাষ্ঠা। কারুর মধ্যে ব্যাকুলতা কী রকম হতে পারে আর সেই ব্যাকুলতাকে তীব্রতর করার জন্য প্রেমিক আরও কত রকম দুষ্টুমি করতে পারে, তার নিদর্শন হল বেণুগীত। ব্যাকুলতা বাড়াবার জন্য তিনি হয়তো একটু ঝাঁকি দর্শন দিয়ে দিলেন, কিন্তু পূর্ণ মিলন হচ্ছে না। পূর্ণ মিলন হলে চুপ হয়ে যাবে।

বেণুগীত হল শ্রীকৃষ্ণের জন্য গোপীদের ব্যাকুলতার সূচনা। সেখানে শ্রীকৃষ্ণ একটু একটু যেন খেলা করছেন, অর্থাৎ তিনি বাঁশি বাজাচ্ছেন, গোপীদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে ঠোঁটের কোণে একটু মিষ্টি হাসি মিশিয়ে তাঁদের প্রতি বিদ্যুৎ চমকের মত এক পলকের একটা দৃষ্টি ছুঁড়ে দিচ্ছেন। কোথাও কোথাও তিনি গোপীদের এবার তিনি যেন নাচাতে শুরু করেছেন। তবে মজার ব্যাপার হল, ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের সেই সময়ের বয়সের কথা উল্লেখ করে বলছেন শ্রীকৃষ্ণ তখন সবে আট বছরের একটি বালক। সেইজন্য এখানে কামগন্ধের কোন সম্ভবনা নেই। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ এখন যা যা করছেন আর পরে রাসলীলায় গোপীদের সাথে যা যা করবেন তার যে বর্ণনা করা হয়েছে আট বছরের ছেলের পক্ষে এ ধরণের কাণ্ড করা কেউ কল্পনাই করতে পারবে না, অন্ততঃ ষোল সতের বছরের হলে তাও কিছুটা কল্পনা করা যেত। আসলে এগুলো কিছুই নয়, ব্যাসদেব রাসলীলার কাহিনীতে দৈহিক প্রেমকে অবলম্বন করে পরা ভক্তিতে নিয়ে গিয়ে দেখাচ্ছেন ঈশ্বরের প্রতি পূর্ণ সমর্পণে কী কী হতে পারে। সেইজন্য তাঁর কাছে শ্রীকৃষ্ণ আট বছর কি ষোল বছরের ছেলে হবেন কিনা এই নিয়ে কোন মাথাব্যাথা নেই। আট বছর হওয়াতে সুবিধা হয়েছে এখানে কাম ব্যাপারটা আসার কোন সম্ভবনা নেই। রাসলীলাতে তাই কোথাও কোন দৈহিক সম্বন্ধের কোন কিছু একেবারেই নেই, রয়েছে শুধু মনের ব্যাপার, প্রেমের ব্যাপার আর পরা ভক্তির ব্যাপার।

পরা ভক্তিকে ব্যাখ্যা করার জন্য ব্যাসদেব এমন একটি মাধ্যম বেছে নিলেন, যেটা প্রথমতঃ মানুষ বুঝতে পারবে, দ্বিতীয় যেটা দিয়ে সব থেকে সহজে পরা ভক্তিকে ব্যাখ্যা করা যায়। একটা ময়ূরকে আমরা দেখতে পারি, ময়ূরের সব বর্ণনা করে দিতে পারি কিন্তু যতক্ষণ ময়ূর পেখম বিস্তার না করে দেয়, যতক্ষণ ওই পেখম তুলে নৃত্য না করছে ততক্ষণ এই দৃশ্য আমাদের কল্পনাতেই থেকে যাবে। কবির বর্ণনায়, লোকের মুখে যতই ময়ূরের পেখম ছড়ানো নৃত্যের সৌন্দর্যের কথা শুনে থাকি, যাই করে থাকি না কেন, যতক্ষণ আমি ময়ূরের নৃত্য নিজের চোখে না দেখছি ততক্ষণ কিন্তু কোন দিন বুঝতে পারবো না ময়ূরের পেখম ছড়ানো নৃত্য কী জিনিষ। আর যতই আমি ময়ূর দেখতে থাকি না কেন, আমার যতই ইচ্ছা হোক না কেন কখনই ময়ূরকে পেখম ছড়ানো অবস্থায় দেখতে পাবো না, যতক্ষণ না ময়ূর নিজে থেকে পেখম বিস্তার করে আমাকে তার নৃত্য দেখিয়ে দিচ্ছে। পরা ভক্তিও ঠিক তাই, আমরা এখানে ওখানে, লোকের মুখে, শাস্ত্রে কিছু ভক্তির কথা শুনে বা পড়ে থাকতে পারি। শোনার পর টুকটাক একটু একটু করে বৈধী ভক্তি করতে শুরু করলাম, তাঁর কাছে ঘুরঘুর করতে শুরু করলাম। কিন্তু যাই করে থাকি না কেন, যতক্ষণ তিনি নিজে আমার হাত ধরে তুলে না নেন, ততক্ষণ পরা ভক্তি হবে না। এই কথাই কঠোপনিষদে বলছেন *যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ*, আত্মা যাঁকে বরণ

করেন তিনিই আত্মাকে একমাত্র জানতে পারেন, তাছাড়া কেউই আত্মাকে জানতে পারবে না। শ্রীকৃষ্ণও যতক্ষণ কাউকে বরণ করে না নিচ্ছেন ততক্ষণ কারুরই প্রেমা ভক্তি হবে না। সেই বরণ হবে রাসলীলাতে। কিন্তু তার আগে প্রস্তুতির প্রক্রিয়াটা শুরু হতে হবে, সেই প্রস্তুতিটা শুরু হয় বেণুগীতে।

স্বাভাবিক ভাবে আমাদের অনেকের মনে প্রশ্ন আসতে পারে, যে প্রশ্ন পরীক্ষিৎও শুকদেবকে পরে করবেন – যে জিনিষকে সমাজে খুব খারাপ দৃষ্টিতে দেখা হয়, সেই পরকীয়া প্রেমকে এখানে কেন ব্যাসদেব পরা ভক্তি বা প্রেমা ভক্তির উপমা হিসাবে নিয়ে এসেছেন। ইদানিং কালে Power of positive emotion নিয়ে অনেক আলোচনা হচ্ছে, কিন্তু emotion মাত্রই সব সময় negative হবে, emotion কখনই positive হয় না। স্বামী স্ত্রীর মর্যাদা রেখা যখন উল্লঙ্ঘন হয় তখন সেখানে নিশ্চয়ই emotion অনেক বেশী হয়ে গেছে। তাই সেটাকে নিন্দা করা হচ্ছে। দ্বিতীয় এতে সমাজের ভিতটা নড়ে চুড়মার হয়ে যাবে। পরীক্ষিৎ শুকদেবকে বলছেন – মহাপুরুষরা যা করেন সেটাই সাধারণ লোকেরা অনুকরণ করে। শ্রীকৃষ্ণকে আমরা সবাই ভগবান বলে জানি, তিনি অপরের স্ত্রীদের সাথে যা করেছেন সমাজের চোখে তা খুবই নিন্দনীয়। কারণ বাকীরাও তো এই জিনিষই করতে চাইবে। এখনকার দিনে একদল ছেলে মেয়ে গ্রুপ করে কত কিছু করে বেড়াচ্ছে, যেগুলোকে আমরা নিন্দা করছি। আর এখানে শ্রীকৃষ্ণ একাই পুরুষ, আর বাকি সব মেয়ে। তিনি এতগুলো মেয়েকে নিয়ে রাসলীলা করছেন, সমাজের চোখে তো এই জিনিষ প্রচণ্ড আপত্তিজনক। ব্যাসদেবের মনেও এই ভয় ছিল, তাঁরও আশঙ্কা ছিল লোকেরা এটাকেই সামান্য ধর্ম বলে গ্রহণ করে নেবে। সেইজন্য তিনি পরীক্ষিৎকে দিয়ে প্রশ্ন তুলিয়েছেন – এটা তো অন্যায় কাজ, কেন তিনি নিজে ভগবান হয়ে সমাজের ক্ষতি হতে পারে এমন কাজ করতে গেলেন? শুকদেবও পরে পরীক্ষিৎকে এর খুব সুন্দর উত্তর দিয়েছেন। পরবর্তি কালে ভাষ্যকাররাও তাই নিষেধ করে বলে দিলেন যাদের মধ্যে সামান্যতম কামগন্ধ আছে, যাদের মধ্যে উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাব নেই তাদের ভাগবতের রাসলীলা ও চীরহরণের মত অধ্যায় গুলো পড়তে নেই বা শুনতেও নেই। এখানে যাঁরা শাস্ত্র কথা শুনতে আসছেন তাঁরা বলতে পারেন আমার মধ্যেও তো সেই উচ্চ ভাব নেই। কিন্তু আপনারা একটা শ্রদ্ধা ভক্তি নিয়ে এখানে শাস্ত্র কথা শুনতে আসছেন। এখানে আপনারা সবাই লক্ষ্য করে থাকবেন, যখন আপনার গোপীদের প্রেমকথা শুনছেন বা পরে রাসলীলা শুনবেন তখন তাতে আপনাদের কারুরই মধ্যে কোন ধরণের কামের উদ্দীপন হচ্ছে না। সিনেমায় হিরো হিরোইনদের নাচ-গান বা প্রেমের ছবি দেখে অল্প বয়সী ছেলেমেয়েদের মধ্যে যে ধরণের অনুভূতি জাগে সেই জিনিষ এখানে আপনাদের মধ্যে হচ্ছে না, বরঞ্চ আপনাদের মনে একটা শ্রদ্ধা ভক্তির ভাব জাগছে। তার মানে, গোপীদের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেমাভক্তির কথা শোনার একটা প্রস্তুতি আপনাদের এতদিনে হয়ে গেছে। গোপীদের প্রেম ও ভালোবাসাকে শাব্দিক অর্থে নেওয়া যাবে না, শাব্দিক অর্থে নিলে পুরো ব্যাপারটাই অন্য দিকে চলে গিয়ে আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনের সর্বনাশ হয়ে যেতে কিছু বাকী থাকবে না। ঈশ্বরের প্রতি যখন সাধক বা সাধিকার হৃদয়ে প্রেমাভক্তির উদয় হয় তখন সেই প্রেমাভক্তি কি রকম হতে পারে এবং সাধক বা সাধিকার মনের কী অবস্থা হতে পারে, তারই একটা রূপক হল শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গোপীদের প্রেম, যা কিনা চীরহরণ ও রাসলীলার মাধ্যমে বর্ণনা করা হয়েছে।

লায়লা-মজনুর কাহিনী আমাদের সবারই অল্প বিস্তর জানা আছে। লায়লা-মজনুও কোন চিরাচরিত প্রেমগাথা নয়। ঈশ্বরের প্রতি প্রেমাভক্তির উদয় হলে কী হতে পারে, সেই প্রেমাভক্তিকে জাগতিক দৃষ্টিতে বোঝানর ক্ষেত্রে সুফিদের কাছেও সমস্যা হয়েছিল। তখন তাঁরা লায়লা-মজনুর কাহিনী নিয়ে এলেন। মজনুর আসল নাম ছিল কায়েশ। লায়লার ভালোবাসায় মজনু মজে গিয়েছিল, সেই থেকে তার নাম হল মজনু। লায়লার আরেকজনের সাথে আগেই বিবাহ হয়ে গিয়েছিল, মজনু বিবাহ করলই না। কিন্তু তাদের দুজনের মধ্যে এক গভীর ভালোবাসা তৈরী হয়েছিল। এখানে প্রশ্ন হল, বিবাহের সূত্রে যে পারিবারিক ও সামাজিক দায়বদ্ধতা তৈরী হয় সেই ক্ষেত্রে এই ধরণের প্রেমের পরিণাম কী হতে পারে? এখানে কোন দায়বদ্ধতা আসার কোন প্রশ্নই নেই। যখনই এই ধরণের রূপক কাহিনীকে শাব্দিক অর্থে নেওয়া হবে তখন অনেক ধরণের দায়বদ্ধতা এসে যায়। কিন্তু এখানে যে লায়লা-মজনুর কাহিনী বা শ্রীকৃষ্ণ ও গোপীদের কাহিনী নিয়ে আসা হয়েছে তাতে শুধু দুটো চরিত্রকে নিয়ে ঈশ্বরের প্রতি প্রেমাভক্তির গভীরতা কিরকম হয়, ঈশ্বরের প্রতি ব্যাকুলতা সাধককে কোন

স্তরে নিয়ে যেতে পারে, ঈশ্বর বিরহ কত তীব্র হতে পারে আর মিলন কীভাবে হয় এই জিনিষগুলোকে রূপকের মাধ্যমে দেখানো হচ্ছে। এই দুটো কাহিনীকে শাব্দিক অর্থে নিলে আমাদের মন পুরো সংশয়াবৃত হয়ে যাবে, সংশয়াচ্ছন্ন মন ঈশ্বরের প্রতি প্রেমাভক্তি ভক্তকে কোন পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারে কোন দিন জানতে পারে না, প্রেমাভক্তির স্বরূপ না জানা থাকলে ঈশ্বরকে ভালোবাসার চেষ্টা শুরুই হয়তো হবে না। তাই বলা হচ্ছে, শাব্দিক অর্থে নিলে প্রচুর সমস্যা এসে যাবে। লায়লাকে যখন মারা হচ্ছে তখন মজনুর শরীরেও দাগ হয়ে যাচ্ছে, হয়তো হয়েছিল বা নাও হতে পারে। কিন্তু পরে পরে যখন সুফিদের আধ্যাত্মিক সাধনার কাহিনী রূপে দাঁড় করান হল তখন এই ঘটনাগুলো ঠিক এই রকমই হতে হবে, তা যদি না হয় তাহলে এই কাহিনীর আর কোন আধ্যাত্মিক মূল্য থাকবে না। যেখানে লায়লা-মজনু এক, যেখানে রাধা আর কৃষ্ণ এক সেখানে দায়বদ্ধতা কোথা থেকে আসবে! একজন বন্ধু যখন লায়লাকে মজনুর সাথে দেখা করানোর জন্য নিয়ে এসেছে তখন লায়লা আর মজনু দুজনেই শারীরিক ভাবে একটা দূরত্ব বজায় রেখে চলেছিল। পরে যখন মজনুকে বন্ধু জিজ্ঞেস করছে 'তুমি লায়লাকে আলিঙ্গন করলে না কেন'? তখন মজনু বলছে 'আমরা যদি দুজনে আলিঙ্গন করতাম আমাদের দুজনের শরীর থেকে প্রাণ চলে যেত'। দুজনের প্রাণ যদি চলে যেত তাতে অসুবিধার কি ছিল, ভালোই তো হত। কিন্তু তা কখনই প্রেমিক ভক্ত হতে দিতে চায় না। ঠাকুর এক জায়গায় বলছেন 'আমি চিনি হতে চাই না, চিনি আস্বাদ করতে চাই'। লায়লা-মজনুর যে প্রেম এখানেও তারা আস্বাদ করতে চাইছে, আস্বাদ করার জন্য একটা দূরত্ব সব সময় বজায় রাখতে হবে, তা নাহলে ঐ উদ্দাম ভালোবাসার উন্মাদনাকে নিতে পারবে না।

এখানে যে ভালোবাসার কথা বলা হচ্ছে তাতে এটাই বলার উদ্দেশ্য যে জীবাত্মা যখন পরমাত্মাকে ভালোবাসতে শুরু করেছে বা জীব ঈশ্বরকে ভালোবাসতে শুরু করে তখন তাঁর কথা শুনতে শুনতে তার মনে নানা রকম চিন্তা জাগতে শুরু হয়। চিন্তা জাগতে জাগতে আসে ব্যাকুলতা। বেণুগীত হল এই ব্যাকুলতার আধার। ব্যাকুলতার পর আসে অষ্টপাশ খুলে যাওয়ার সূচনা, যেটা চীরহরণে গিয়ে হয়েছে। জীব অষ্টপাশে আষ্টেপৃষ্টে বাঁধা হয়ে আছে, এই অষ্টপাশ যতক্ষণ না খুলে যায় ততক্ষণ দৈবী মিলন সম্ভব নয়। অষ্টপাশ খসে যাওয়ার পর জীবাত্মা পরমাত্মার সাথে মিলে যায়, যেটা আমরা রাসলীলাতে পাই। এই তিনটে ধাপ, প্রথম আসে ব্যাকুলতা, ব্যাকুলতার পর অষ্টপাশ হরণ, এরপর মিলন। মিলনের একটা অঙ্গ বিরহ। যার জন্য রাসলীলাতে ঈশ্বরের অদর্শনে যে বিরহ জ্বালা, বিরহের সেই তীব্রতার বহিঃপ্রকাশকেও ব্যাসদেব অত্যন্ত প্রাঞ্জল ও সাবলীল ভঙ্গীতে উপস্থাপন করে দিয়েছেন। বিরহের উদ্দেশ্য মিলনের তীব্রতাকে বাড়ানো।

শুকদেব পরীক্ষিতের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বলছেন – যাঁরা অতিমানবিক শক্তি সম্পন্ন তাঁরা অনেক সময় অনেক ক্ষেত্রে মর্যাদার উল্লঙ্ঘন করেন, যাতে সাধারণ লোকেদের কোন অধিকারই নেই। যেমন সূর্য, অগ্নি এঁরা প্রচুর ক্ষমতা সম্পন্ন, এনারা অনেক সময় নিজেদের মর্যাদাকে উল্লঙ্ঘন করেন। শুকদেব আবার শিবের উপমা দিয়ে বলছেন – শিব হলাহল পান করে সেই হলাহলকে হজম করে নিয়েছিলেন কিন্তু সাধারণ লোক এক ফোঁটা বিষ পান করলে সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুকে বরণ করে নেবে। শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা হল শিবের হলাহল পান করার মত, সাধারণ লোকেদের জন্য রাসলীলা নয়। যাঁদের মধ্যে বিশেষ শক্তি ও ক্ষমতা আছে তাঁরা অনেক সময় বিশেষ কারণে বা লোকশিক্ষার জন্য অনেক কিছু করে থাকেন। শুকদেব লৌকিক দৃষ্টিতে এই ব্যাখ্যা দিলেন – যাঁরা আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ করতে চাইছেন তাঁদের কখনই লৌকিক দৃষ্টিতে কোন কিছুর বিচার করা ঠিক নয়। এর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা হল – যখন পরা ভক্তি হয়, সেই পরা ভক্তিকে ব্যাখ্যা করার জন্য পরকীয়া প্রেম, যেখানে সমস্ত রকমের লোক মর্যাদাকে অতিক্রম করে প্রেম করছে, এই পরকীয়া প্রেমকে না নিয়ে এলে পরা ভক্তিকে কোন ভাবেই অপরকে বোঝানো যাবে না। ব্যাসদেব এখানে সেটাই করছেন, পরকীয়া অর্থাৎ ছেলে-মেয়ের অবৈধ প্রেমকে অবলম্বন করে তিনি ঈশ্বরের প্রতি প্রেমাভক্তি কি রকম হতে পারে তারই কাব্যিক শৈলীতে বিশ্লেষণ করে সবাইকে বুঝিয়ে দিচ্ছেন। কিন্তু প্রেমাভক্তি আসার আগে ব্যাকুলতা কত তীব্র হতে পারে তারই বর্ণনা হল এই বেণুগীত। ব্যাকুলতার তীব্রতা কীভাবে হচ্ছে আর তার অভিব্যক্তি কেমন হতে পারে, এই দুটোই বেণুগীতে বর্ণনা করা হচ্ছে।

বেণুগীত

ভাগবত মূলতঃ ভক্তিশাস্ত্র, তাই বলে শুধু ভালোবাসা, প্রেম, ভক্তির কথাই বলতে থাকবে তা নয়, যে কাহিনীগুলিকে নিয়ে আসা হবে সেটাও পুরোপুরি ভক্তিরসে পূর্ণ থাকবে। শ্রীকৃষ্ণ এখন একটু বড় হয়েছেন, গোপীরাও বড় হয়েছেন। বেণু মানে বাঁশ, বাঁশ থেকে বাঁশরী হয়, শ্রীকৃষ্ণ এই বাঁশরী বাজান। গোপীরা শ্রীকৃষ্ণকে ভালোবাসেন। ভক্তিশাস্ত্র মানেই ভগবানের প্রতি ভালোবাসার নানা রকমের অভিব্যাক্তির কথা বলা, ঈশ্বর বিরহে এক রকম, ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগে আরেক রকম। এগুলোকে নিয়েই ভাগবতে নানান ধরণের গীত রচনা করা হয়েছে। বেণুগীতের মতই গোপীকাগীত, ভ্রমরগীত ইত্যাদি অনেক গীত ভাগবতের কাব্যিক মাধুর্য্যকে সমৃদ্ধ করেছে। গোপীদের কৃষ্ণের প্রতি যে ভালোবাসা, সেই প্রেম, ভালোবাসাকে এই ধরণের গীতের মাধ্যমে ভাগবতে বিভিন্ন আঙ্গিকে বর্ণনা করা হয়েছে।

বেণুগীত খুবই গতিময় আর সুললিত ছন্দে রচিত। এখানে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গোপীদের আকুতিপূর্ণ ভালোবাসার ব্যাকুলতাকে এত সুন্দর ও মধুর ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে ভক্তের হৃদয়কে ঈশ্বরীয় আবেশে স্পর্শ না করে যায় না। শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম দুজনই এখন অনেকটা বড় হয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণ বাঁশি বাজিয়ে ধেনু চড়ান। শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বণি গোপীদের মনে মিলনের তীব্র আকাঙ্খাকে জাগিয়ে দিয়েছে। বংশীধ্বণিতে তাঁরা তন্ময় হয়ে গেছেন। গোপীরা বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন না, নিজেদের ঘরেই আছেন। কিন্তু এমন তন্ময় হয়ে গেছেন যে তাঁদের সূক্ষ্ম শরীর ব্রজভূমিতে সেখানে চলে গেছে যেখানে শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম গোপবালকদের সাথে ধেনু চড়াতে চড়াতে খেলা করছেন। তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের চরণের ছাপে অঙ্কুশ, শঙ্খ, পদ্ম ইত্যাদি চিহ্ন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন। ঈশ্বর যখন অবতার হয়ে আসেন তখন তাঁর মানব শরীরে বিশেষ কিছু চিহ্ন থাকে, বিশেষ করে তাঁর পায়ের তলায় এই ধরণের কিছু কিছু চিহ্ন দেখা যায়। এটা ভাগবতের নিজস্ব বর্ণনা। এদিকে গোপীরা সবাই যে যার নিজের ঘরে বসে আছেন, কিন্তু বাইরে শ্রীকৃষ্ণের সব কিছু যেন পরিষ্কার চোখের সামনেই দেখছেন। গোপীদের এই অবস্থা এক ধরণের সমাধির অবস্থা। কিন্তু ওখানে সবাই আছেন, শ্রীকৃষ্ণও আছেন আবার গোপীরাও আছেন। এর মধ্যে গোপীরা পরস্পর কথাও বলে যাচ্ছেন, কিন্তু তন্ময় হয়ে আছেন। এমন তন্ময়তা যে, তাঁদের স্থুল শরীরটা রয়েছে ঘরে কিন্তু মন প্রাণ চলে গেছে শ্রীকৃষ্ণের কাছে। শুধু মন প্রাণই যায়নি, গোপীরা সত্যিই সব কিছু স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন। মনস্তাত্ত্বিক বিজ্ঞানেও আজকাল অনেক রকম শব্দ ব্যবহার করা হচ্ছে যেমন Extra Sensory Perception (ESP), এতে মনস্তাত্ত্বিক বিজ্ঞানীরাও বলছেন মানুষ অনেক সময় অনেক দূরের কথা শ্রবণ করতে পারে, প্রিয়জন হয়তো অনেক দূরে আছে কিন্তু সে কি করছে, কি রঙের পোশাক পড়েছে সব দেখতে পায়। হিন্দু শাস্ত্রে বলে, মানুষ যাকে খুব ভালোবাসে সে কি চাইছে সব বুঝতে পারে। নবজাত সন্তানকে রেখে মা কয়েক ঘন্টার জন্যও বাইরে গেলে বুঝতে পারে আমার ছেলে এখন আমার জন্য কাঁদছে, ওর এখন খিদে পেয়েছে। এমন কি বড় হয়ে যাওয়ার পরেও সন্তান হয়তো অনেক দূরে হোস্টেলে আছে, সেখানে তার যদি কোন সমস্যা হয় বা সঙ্কটে পড়ে, মা বুঝতে পারে, অজানা কারণে মায়ের মনটা চঞ্চল হয়ে ওঠে। সন্তান আর মায়ের মন এক, এক অপরের শরীরের অঙ্গ হয়ে যায়। দুটো শরীর আলাদা হলেও, বেরিয়েছে তো একই শরীর থেকে, তাই শরীরের অঙ্গ হয়ে যায়। প্রেমে ঠিক একই জিনিষ হয়। দুটো শরীর আলাদা কিন্তু দুটো মন এক হয়ে গেছে।

গোপীরা এখানে পরস্পরকে নিজেদের ভাবের কথা বলে যাচ্ছেন। কিন্তু মজার ব্যাপার হল, শুকদেব প্রথমে বলছেন গোপীরা যাঁর যাঁর নিজের ঘরে বসে আছেন, কিন্তু মন তাঁদের পৌঁছে গিয়েছিল ব্রজভূমিতে। সেখানে তাঁরা মনে মনে শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করছেন। আলিঙ্গন করার পর গোপীরা এক অপরের সাথে নিজস্ব অনুভূতির কথা বলছেন। এই যে নিজেরা পরস্পরের ভাব বিনিময় করছেন এখানে পরিষ্কার করে বলা নেই যে, গোপীরা নিজেদের গৃহে বসে কথা বলছেন, নাকি তাঁরা ব্রজভূমিতে যেখানে শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম ধেনু চরাচ্ছেন সেখানে গিয়ে বলছেন, নাকি সূক্ষ্ম শরীরের এক অপরের সঙ্গে কথা বলছেন। শুধু এটুকুই বলছেন গোপীরা

নিজেদের মধ্যে কথা বলছেন। এখানে সংলাপগুলো বহুবচনে আছে বলে মনে করা হচ্ছে গোপীরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে যাচ্ছেন, আর তা নাহলে কোন গোপী হয়তো আক্ষেপ করছেন।

গোপীরা এক অপরকে সম্বোধন করে বলছেন ***অক্ষণ্বতাং ফলমিদং ন পরং বিদামঃ। সখ্যঃ পশূননুবিবেশয়তোর্বয়স্যৈঃ। বক্ত্রং ব্রজেশসুতয়োরনুবেণু জুষ্টং যৈর্বা নিপীতমনুরক্তকটাক্ষমোক্ষম্।। ১০/২১/৭।*** সখী! আমাদের যত ইন্দ্রিয় আছে, যেমন এই চোখ, আমাদের এই চোখ ধন্য হয়ে গেল বলরাম আর শ্রীকৃষ্ণের অনিন্দ্য সুন্দর দিব্যকান্তকারী রূপ দেখে। তিনি ধেনু আর বৎসগুলি নিয়ে গোষ্ঠে যাচ্ছেন, দিনান্তে আবার সেখান থেকে ব্রজে ফিরে আসছেন, অধরে তাঁর মোহন বেণু, সেই বেণু থেকে সুরের লহরী আমাদের হৃদয়ের মর্মস্থলে ঢেউ তুলছে। এই দৃশ্য অবলোকন করে আমাদের চোখ দুটি ধন্য হয়ে যাচ্ছে'। আবার শ্রীভগবানের যে বাঁশরীর সুর লহরী জড় চেতন সবারই মন হরণ করে নেয়। সেই বেণুর সুরের মুর্ছনার বর্ণনা করতে করতে গোপীরা তন্ময় হয়ে যাচ্ছেন। গোপীদের এই ভাবকে পরে পরে অনেক গানের মাধ্যমেও বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন এই চোখ তখনই সার্থক হবে যখন চোখ দিয়ে ভগবানের রূপ দর্শন হবে, এই কর্ণকুহর তখনই সার্থক হবে যখন কর্ণ দিয়ে ভগবানের কথা শ্রবণ করা হবে, এই হাত তখনই সার্থক হবে যখন হাত দিয়ে তাঁর সেবা করা হবে, মন তখনই সার্থকতা পাবে যখন মন দিয়ে ভগবানের চিন্তন করা হবে ইত্যাদি। এসব নিয়ে ভক্তিশাস্ত্রে পরের দিকে অনেক সুন্দর সুন্দর কাব্যগীতি রচিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, তিনি যখন গোষ্ঠ থেকে ফিরে আসছেন তখন আমাদের প্রতি তাঁর অনুরাগমিশ্রিত পদ্মপলাশনেত্রের উন্মোলিত নিমেষ কটাক্ষে আমাদের ধন্য করে দিচ্ছেন। ছোট শিশু যখন 'মা' বলে ডাক দেয় তখন মায়ের মন শিহড়িত হয়ে ওঠে, ওই 'মা' ডাক শোনার জন্য মায়ের হৃদয় কান পেতে বসে থাকে। ঠিক তেমনি যে যাকে ভালোবাসে সে যদি দেখে তার দৃষ্টি আমার দিকে তখন তার হৃদয়ের মর্মস্থলে বিদ্যুতের শিহরণ খেলে যায়, ক্ষণিক মুহুর্তের এক দৃষ্টিতেই তার মন-প্রাণ জুড়িয়ে যায়। এগুলোই প্রেমাভক্তির লক্ষণ, যা কিনা গোপীদের মাধ্যমে বর্ণনা করা হচ্ছে। ভগবানের প্রতি গভীর ভালোবাসা জন্মালে সাধক কীভাবে তাঁর ইষ্টদেবতাকে দেখেন এখানে তাঁরই কাব্যিক বর্ণনা চলছে।

এখানে পর পর বর্ণনা চলছে। ***চূতপ্রবালবর্হস্তবকোৎপলাব্জমালানুপৃক্তপরিধানবিচত্রবেষৌ। মধ্যে বিরেজতুরলং পশুপালগোষ্ঠ্যাং রঙ্গে যথা নটবরৌ ক্ক চ গায়মানৌ।।১০/২১/৮।*** গোপীরা শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের পরিধেয় সাজপোশাকের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছেন 'তোরা এই দুজনের বেশভূষা দেখেছিস! বেশভূষা দেখে মনে হচ্ছে এঁরা দুজনেই যেন অভিনয় করতে যাচ্ছেন'। মানুষ যখন বাড়িতে থাকে তখন তার পোশাক এক রকম থাকে, বাইরে বেরোবার সময় অন্য রকম পোশাক আর যখন অভিনয় করতে যায় তখন আরেক রকম সাজ। গ্রামের দিকে লোকেরা সামাজিক অনুষ্ঠানে যাওয়ার সময় খুব একটা সাজগোজ করে না, কিন্তু যখন কোন অভিনয় করতে হয় তখন খুব জমকালো পোশাক ব্যবহার করে। শ্রীকৃষ্ণ আর বলরাম সব সময় গলায় কখন আম্রপল্লব, কখন ময়ূরের পুচ্ছ দিয়ে, কখন পদ্ম, কুমুদ, বনফুলের মালা ধারণ করতেন। দেখে মনে হবে যেন তাঁরা অভিনয় করতে যাচ্ছেন। অভিনয় করতে যাওয়ার কথা কোন খারাপ অর্থে বলা হচ্ছে না, এখানে প্রশংসার অর্থেই বলা হচ্ছে। এটাই ওনাদের স্বভাব। একজন ডাক্তার ছিলেন, রাত দুটোর সময়ও যদি কোন রোগীর লোকেরা তাঁর দরজায় টোকা দেয়, আর যদি তিনি দরজা খোলেন উনি সব সময় থ্রী পিস স্যুট পড়েই বেরোবেন। ডাক্তার দরজা খুলবেনই না যতক্ষণ স্যুট না পড়া হয়। এগুলো খারাপ কিছু নয়, এর দ্বারা বোঝা যায় আপনার সাজপোশাকের ব্যাপারে সচেতনতা কেমন। শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামও সব সময় গলায় মালা, মাথায় মুকুট লাগিয়ে, পীতাম্বর ধারণ করে এমন সেজেগুজে থাকতেন যে মনে হয় যেন দুজন অভিনয় করতে চলেছেন।

গোপীদের মনের মধ্যে উদয় হলেন সেই বংশীবাদক, কিন্তু মনে মনেই সেই ভগবানকে বদ্ধ করলেন নিবিড় আশ্লেষে। এইভাবে গোপীদের ভাব আরও গভীর থেকে গভীরতর হয়ে যাচ্ছে। সেই গভীর ভাব থেকে ব্রজাঙ্গনারা পরস্পরকে বলতে লাগলেন ***গোপ্যঃ কিমাচরদয়ং কুশলং স্ম বেণুর্দামোদরাধরসুধামপি***

গোপিকানাম্। ভুঙ্‌ক্তে স্বয়ং যদবশিষ্টরসং হ্রদিন্যো হৃষ্যত্ত্বচোঽশ্রু মুমুচুস্তরবো যথাহর্যাঃ।।১০/২১/৯।
শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গোপীদের কী গভীর তন্ময়তা। গোপীরা বলছেন 'এই যে বাঁশ, জাতিতে সে পুরুষ, কিন্তু পূর্বজন্মে সে কি এমন পূণ্য কর্ম করেছে, কি তপস্যা করেছে যে, যেটা আমাদের সম্পদ', গোপীদের কি সম্পদ? শ্রীকৃষ্ণের ওষ্ঠোদ্বয়, শ্রীকৃষ্ণের পদ্ম পাপড়ির মত কোমল অধরে গোপীদেরই একমাত্র অধিকার। কিন্তু সেই ওষ্ঠের সুধা কে পান করছে? এই পুরুষ জাতি বাঁশ। গোপীরা এই প্রথম নিজেদের প্রেমকে সবার সামনে প্রকাশ করে দিচ্ছেন। 'কিন্তু আমরা তো নারী, শ্রীকৃষ্ণের অধরদ্বয় আমাদের চির অভিলষ্সিত জিনিষ, আমাদের একান্ত নিজস্ব সম্পদ, কিন্তু পুরুষ হয়ে সেই বাঁশ *বেণুর্দামোদরাধরসুধামপি গোপিকানাম্* আমাদের সম্পদ শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃত পান করছে অথচ আমরা নারী হয়েও নারীর একান্ত নিজস্ব সম্পদ ভোগ করতে পারছি না। নিশ্চয়ই সে পূর্ব জন্মে খুব কঠোর তপস্যা করেছিল। আর যেভাবে এই বেণু শ্রীকৃষ্ণের ওষ্ঠে বসে অধরসুধা পান করে যাচ্ছে তাতে মনে হচ্ছে আমাদের জন্য কিছু আর অবশিষ্ট থাকবে না'! এইভাবে গোপীরা নিজেদের ভক্তি, প্রেম, ভালোবাসার আবেগকে একে অপরের কাছে নিবেদন করছেন।

যারা ভাগবত ধর্মী তাদের জন্যই বেণুগীত। ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ, ভালোবাসাতে যে ব্যাকুলতা হয় সেটাই খুব আবেগ মথিত ভাবে বেণুগীতে বর্ণনা করা হয়েছে। গোপীরা ঈশ্বরকে তাঁদের পতিরূপে, প্রেমিক রূপে সাধনা করেছিলেন বলে এই গভীর ভাবগুলিকে তুলে ধরা হয়েছে। লীলাপ্রসঙ্গে ঠাকুরের মধুরভাবের কথা যেখানে বর্ণনা করা হয়েছে, সেখানেও ঈশ্বরের প্রতি যখন তীব্র অনুরাগ হয় সেই সময় সাধকের মনের কি অবস্থা হয়, তার খুব সুন্দর ছবি আঁকা হয়েছে।

গোপীরা বলছেন – বংশে যখন ভগবদ্ভক্ত সুপুত্রের জন্ম হয় তখন তার মাতা-পিতা ও বয়োজ্যেষ্ঠদের আনন্দের সীমা থাকে না, ঠিক তেমনি এই বেণুর গৌরবে বাঁশেদের মাতৃস্থানীয়া পূণ্যতোয়া জলাশয়গুলো পদ্মফুল প্রস্ফুটিত করানোর ছলে রোমাঞ্চিত দেহ ধারণ করেছে। বাঁশ গাছের মা হল জলাশয়গুলো, কারণ জলাশয়ের রস শোষণ করেই বাঁশ গাছ জীবন ধারণ করে। আর বৃক্ষরা হল বাঁশ গাছেদের কুলবৃদ্ধ স্বরূপ। বৃক্ষরাও তাই আনন্দে তাদের ফুল ফল থেকে নিয়ত মধু ক্ষরণ করে যাচ্ছে। তাদের পাতা থেকে শিশির বিন্দু ঝরে পড়ছে মনে হচ্ছে যেন তারা আনন্দাশ্রু মোচন করছে। বংশের সন্তান বেণু আজ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ওষ্ঠে বসে তাঁর অধরামৃত পান করে যাচ্ছে, তাতে তারা গৌরবাণ্বিত হবে এতে আশ্চর্যের কি আছে। গোপীরা বলছেন পৃথিবী আজ বৃন্দাবনের গৌরবে গৌরবান্বিত, কারণ এই বৃন্দাবনের আজ বৈকুণ্ঠের সমান যশ। বৃন্দাবনের শোভা, সম্পদ, মাধুর্য, ঐশ্বর্যের সীমা নেই যেহেতু দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলের স্পর্শে সে ধন্য হয়ে গেছে। ঠাকুরও বলছেন বৃন্দাবনের রজ, গঙ্গাজল, তুলসীপাতা, জগন্নাথের আটকে প্রসাদ এগুলো ব্রহ্মবস্তু। ভক্তদের ধারণা বৃন্দাবনের নিধুবনে এখনও নিত্য রাসলীলা হয়। যারা কামী পুরুষ তাদের পক্ষে এগুলো ধারণা করা অসম্ভব।

গোপীরা বলছেন দেখো শুধু আমরাই না, বৃন্দাবনের পশুপাখিরাও শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বণি শুনে অনিমেষ নয়নে শ্রীকৃষ্ণের দিকে তাকিয়েই থাকে। পশুপাখিদের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভালোবাসার কাছে আমাদের ভালোবাসা সত্যিই কিছুই নয়। স্বর্গের যত দেবতা ও দেবীরা আছেন তাঁরাও শ্রীকৃষ্ণের বাঁশি শ্রবণ করে মোহিত হয়ে যাচ্ছেন। শ্রীকৃষ্ণের বাঁশির সুরের মুর্ছনায় স্বর্গের দেবীদেরও কোন হুঁশ থাকছে না, মুহ্যমান অবস্থায় তাঁদের বেণী থেকে মালা খসে যাচ্ছে, এমনকি তাঁদের অঙ্গের বস্ত্র শিথিল হয়ে মাটিতে লুটাচ্ছে সেদিকে কোন খেয়াল নেই। স্বর্গের দেবীদের কথা আর কী বলব, বৃন্দাবনের গাভীদের দশা দেখে অবাক হয়ে যেতে হয়। যখন শ্রীকৃষ্ণের বাঁশিতে সুরের মুর্ছনা আকাশে বাতাসে গুঞ্জরিত হয়ে ওঠে গাভীরাও তৃণলতা খাওয়া বন্ধ করে উর্দ্ধকর্ণ হয়ে স্থির ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। এই ভাবে গোপীরা ব্যাকুল হয়ে এক অপরকে নিজ নিজ অন্তরের অনুভূতির কথা নিবেদন করে যাচ্ছেন।

এক গোপী অন্য গোপীকে বলছেন ***প্রায়ো বতাম্ব বিহগা মুনয়ো বনেঽস্মিন্ কৃষ্ণেক্ষিতং তদুদিতং কলবেণুগীতম্। আরুহ্য যে দ্রুমভুজান্ রুচিরপ্রবালান্ শৃণ্বন্তিমীলিতদৃশো বিগতান্যবাচঃ।।১০/২১/১৪।***

গোপীদের শ্রীকৃষ্ণের ওষ্ঠদ্বয়ে চুম্বনলিপ্সার এই ব্যাকুলতাকে কেউ যেন প্রেমগীতি বলে মনে না করেন। গোপীদের যত জ্বালা ও ঈর্ষা সবটাই এই বাঁশির প্রতি। এখানে যাতে ভুল বোঝাবুঝি না হয় সেই কারণে বলছেন 'হে সখী! এই যে বৃন্দাবনের সব পশুপাখি শ্রীকৃষ্ণকে সবাই এত ভালোবাসে, তা গরু বাছুর এদের কথা বাদ দাও, এরাতো আমাদের ঘরেরই প্রাণী, তারাতো ভালোবাসবেই, দিনরাত সর্বদা তারা শ্রীকৃষ্ণকে দেখছে। কিন্তু বৃন্দাবনের পাখিগুলিকে দেখ! এরাতো বাইরে থেকে আসা, শ্রীকৃষ্ণকে তারা তো আগে কখন দেখেওনি, বৃন্দাবনের সাথে পাখিদের কোন সম্পর্ক নেই, তবুও পাখিরা গোবিন্দকে কত ভালোবাসে। কি করে এটা সম্ভব হতে পারে? এরা কি সত্যিই পাখি, এদের পাখি বলা কি ঠিক হবে? কারণ সাধারণ পাখি হলে এরা কোন দিন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দুর্নিবার আকর্ষণে আকর্ষিত হতো না। আমার ধারণা, এরা সাধারণ পাখি নয়, বড় বড় মুনি-ঋষিরাই হয়তো পাখির ছদ্মবেশে বৃন্দাবনের সবুজ শ্যামল বৃক্ষ ও তরুলতায় এসে বাসা বেঁধেছে। আরে দেখো! দেখো! পাখিরা বেছে বেছে সেই গাছের ডালেই বসে থাকবে যেখান থেকে মোহনচূড়াধারী গোপীজনহৃদিবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের রূপমাধুরি নির্নিমেষ নয়নে পান করতে পারে আর সমস্ত ইন্দ্রিয়কে রুদ্ধ করে তাঁর ত্রিভুবন মোহিত করা বেণুগীত অনন্য মনে এমন ভাবে শ্রবণ করে যাতে তুচ্ছ লৌকিক শব্দ কর্ণকুহরে প্রবেশ না করতে পারে। তাহলে তোমরাই বলো এঁরা মুনি-ঋষি ছাড়া আর কে হতে পারেন'!

আমরা যখন ইষ্টের ধ্যান করি তখন তিন রকমের ধ্যান হয় – প্রথম হয় তত্ত্বচিন্তন, শ্রীকৃষ্ণের যে তত্ত্ব সেই তত্ত্বকে নিয়ে ধ্যান করা, দ্বিতীয় লীলাচিন্তন আর তৃতীয় রূপ চিন্তন। প্রথম ধ্যান শুরু হয় রূপ চিন্তন আর লীলাচিন্তন দিয়ে। সেখান থেকে ধীরে ধীরে তত্ত্বচিন্তনের দিকে চলে যায়। যাদের জ্ঞানের ভাব বেশি তারা তত্ত্বচিন্তনের দিকে চলে যায়, তিনি সচ্চিদানন্দ, তিনি করুণাময় অথবা উপনিষদাদিতে যে বর্ণনা, সেই বর্ণনানুসারে জ্ঞানীরা ধ্যান করেন। সাধারণ মানুষ এভাবে তত্ত্বচিন্তন করতে পারে না, কারণ সাধারণ মানুষের মন এখনও স্থুল। স্থুল মন যতক্ষণ কোন আকৃতি না পায় ততক্ষণ সে কোন ধ্যান করতে পারে না। তাদের জন্য রূপচিন্তন। সেইজন্য ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন রূপের বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু তার থেকেও বেশী হল, আমরা চাইছি শ্রীকৃষ্ণে বা ইষ্টে আমাদের মনকে যেন অনেকক্ষণ নিবিষ্ট করে রাখতে পারি। কিন্তু তার জন্য যে আসন করে বসে ঘন্টার পর ঘন্টা ধ্যান করবো, রূপচিন্তন করবো, জপ করবো সেটাও আমাদের পক্ষে খুব একটা সহজসাধ্য নয়। যাদের কাছে সহজসাধ্য নয়, তার বদলে নির্জনে বা নিজের ঘরে চেয়ারে বা খাটে বসে শ্রীকৃষ্ণের বা ইষ্টের লীলাচিন্তন করতে তাদের কোন অসুবিধা হবে না। এখানে যে বর্ণনা চলছে, এই বর্ণনা গুলোকে একান্তে অনুরাগ সহকারে চিন্তন করাটাই লীলাচিন্তন। শ্রীকৃষ্ণ বাঁশি বাজাতে বাজাতে গাভীদের নিয়ে গোষ্ঠে যাচ্ছেন, বাঁশির সুর, দুজনের সাজ যেন অভিনয় করতে যাচ্ছেন, এইসব দেখে চারিদিকে কি ধরণের প্রতিক্রিয়া হচ্ছে গোপীরা তারই বর্ণনা করে যাচ্ছেন।

কৃষ্ণপ্রেমে পাগলিনী অন্য এক গোপী বলছেন পশুপাখিরা না হয় চেতন এদের কথা বাদ দাও, কিন্তু নদীর কথা ভাবো, নদীতো একটা জড়। যমুনা নদীর বুকে যে অসংখ্য তরঙ্গ মালা খেলা করছে, আসলে এগুলো ঢেউ নয়। যমুনারও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভালোবাসা আর সেই ভালোবাসার পরিণতি স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের সাথে মিলন খেলা করার তীব্র আকাঙ্খা যমুনার হৃদয়কে উদ্বেলিত করছে, সেই আকাঙ্খাই ঊর্মিমালা হয়ে যমুনার স্নিগ্ধ কালো জলে কার্য রূপে প্রতিভাসিত হতে দেখা যাচ্ছে। এখানে গোপীরা বলছেন নদীর প্রবাহ যেন থেমে গেছে। এটা কী অর্থে বলছেন জানা নেই। শ্রীকৃষ্ণও থেকে থেকে নদীর বক্ষে ফুল ছুড়ছেন, কখন জলে চরণ ভেজাচ্ছেন। এইসব দেখে গোপী বলছেন, দেখো নদীগুলো তরঙ্গ বাহু দিয়ে বয়ে আনা পদ্মের অর্ঘ্য অর্পণ করতে গিয়ে তাদের বুক স্ফীত হয়ে উঠছে আর উপহার অর্পণ করার সময় শ্রীকৃষ্ণের চরণ দুটি জড়িয়ে ধরে নদীদের হৃদয়ের আকাঙ্খা প্রশমিত করছে। গোপীরা নিজেদের মত কল্পনা করে যাচ্ছেন।

গোপীরা সেই কল্পনার ভাবরাজ্য থেকে এক অপরকে তাঁদের ব্যাকুলতার কথা বলে যাচ্ছেন, আচ্ছা ঠিক আছে নদীরা না হয় এই পৃথিবীর ***দৃষ্ট্বাহহতপে ব্রজপশূন্ সহ রামগোপৈঃ সঞ্চারয়ন্তমনু বেণুমুদীরয়ন্তম্। প্রেমপ্রবৃদ্ধ উদিতঃ কুসুমাবলীভিঃ সখ্যুর্ব্যধাৎ স্ববপুষাম্বুদ আতপত্রম্।।১০/২১/১৬।*** 'বৃন্দাবনের নদীগুলি

আমাদের নিজেদের মত, এরাতো শ্রীকৃষ্ণকে ভালোবাসবেই কেননা ওরাতো সর্বক্ষণ শ্রীকৃষ্ণকে দেখছে, কিন্তু মেঘের দিকে তাকাও, ওদের আচরণও কি কম আশ্চর্যজনক! যখন গোষ্ঠে দিবাকরের প্রখর তেজ মাথায় নিয়ে শ্রীকৃষ্ণ আর বলরাম গোচারণ করছেন তখন এই দুই ভাইকে দেখে শরৎঋতুর মেঘেদের ভালোবাসা যেন উপচে ওঠে, কোথা থেকে ছুটে এসে শ্রীকৃষ্ণ আর বলরামের কোমল শরীরে যাতে সূর্য কিরণের তাপ না লাগে, ওরা তাঁদের মাথার ওপরে শীতল ছায়া দিয়ে সেবা করতে থাকে। এই মেঘেরাও শ্রীকৃষ্ণকে কত ভালোবাসে, শ্রীকৃষ্ণকে ছায়া প্রদান করে শীতল করার জন্য ছুটে আসছে। শ্রীকৃষ্ণের বেণুরবে কী এমন জাদু আছে, শুধু আমরা কেন, প্রকৃতি রাজ্যের সবাই, চেতন, জড় সবাই তাঁকেই চাইছে। শুধু তাই নয়, মাঝে মাঝে মেঘেরা এঁদের সুকোমল শরীরের উপর অল্প অল্প মৃদু বারি বর্ষণ করতে থাকে, মনে হয় যেন মেঘেরা তাঁদের সাদা সাদা পুষ্প দিয়ে প্রেমের অঞ্জলি নিবেদন করছে। এত করেও কিন্তু মেঘেদের যেন আশ মিটতে চায় না – মেঘেরা যেন বলছে – দ্যাখো, আমরা তো শ্রীকৃষ্ণ আর বলরামের জন্য কিছুই সেবা করতে পারলাম না। এই প্রাণের টানে তারা যেন শ্রীকৃষ্ণকে ছায়া দেওয়া আর পুষ্প বৃষ্টির বাহানায় নিজেদের জীবনকেই শ্রীকৃষ্ণের সেবায় উৎসর্গ করে দিচ্ছে'। এই হচ্ছে ভক্তিরসের কাব্য।

বর্ষাঋতু বিদায় নিয়েছে। প্রকৃতির রঙ্গমঞ্চে শরৎঋতুর আবির্ভাব হয়েছে। ধরাতলে রৌদ্রছায়ার খেলা চলছে। প্রথমে আকাশে এক টুকরো মেঘ ভেসে এলো। সেই মেঘ শ্রীকৃষ্ণ আর বলরামের শরীরকে ছায়া দিয়ে আর মিষ্টি মিষ্টি বাতাস দিয়ে শীতল করে দিল। তারপর যখন বৃষ্টি পড়ছে তখন গোপীরা মনে করছেন যেন ফুল ঝরছে। পরিশেষে বৃষ্টি দিয়ে মেঘ যখন নিজেকে নিঃশেষ করে দিল তখন আকাশ পরিষ্কার হয়ে আবার নীলবর্ণ রূপ ধারণ করে নিল। তখন বলছেন শ্রীকৃষ্ণ আর বলরামকে সেবা করার জন্য মেঘ তার নিজের জীবনটাই উৎসর্গ করে দিল। মেঘ থেকে বৃষ্টি হয়ে আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেল বলছেন না, বলছেন মেঘ তার জীবনকে উৎসর্গ করে দিল – এই হচ্ছে কাব্যিক দৃষ্টি ও ভাগবত দৃষ্টির যুগলমিলন। দশম স্কন্ধের এটাই বৈশিষ্ট্য, এখানে ভক্তি রসের মাধুর্য্য আর কাব্যিক উৎকর্ষতার যুগলবন্দীতে যে অনুপম কাব্যরসের সৃষ্টি হয়েছে, যখন কেউ এই কাব্যরসের আস্বাদন করতে থাকবেন তখন তাঁর অন্য কোন দিকে মন যাবে না।

বেণুগীত প্রথম পড়লে মনে হবে নিছক প্রেমের কবিতা। ঈশ্বরের প্রতি তীব্র ব্যাকুলতা হলে মনের মধ্যে কি অবস্থা চলতে থাকে সেটাকে দেখানোর জন্য বেণুগীতকে মাধ্যম করা হয়েছে। জাগতিক প্রেমের কবিতার বাইরে বেণুগীতের নিজস্ব একটা বিশেষত্ব রয়েছে। শ্রীকৃষ্ণকে গোপীরা ভালোবাসছে, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁদের প্রেম এমন পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যে, শ্রীকৃষ্ণ যা কিছু করছেন, তাঁর হাঁটা-চলা, গোপীদের প্রতি তাঁর বাঁকা চাহনি, তাঁর বংশীধ্বণি সব কিছুতে গোপীরা আত্মহারা হয়ে এখন প্রকৃতিতে যা কিছু হচ্ছে সবেতেই তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রকৃতির প্রেমকে কল্পনা করে যাচ্ছেন। ফুল প্রস্ফুটিত হচ্ছে গোপীরা কল্পনা করছেন শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করার জন্য ফুল নিজেকে প্রস্ফুটিত করে দিচ্ছে, শ্রীকৃষ্ণ যদি ফুল ছোড়েন তখন তিনি যেন আলিঙ্গন করছেন, পাখি যদি ডাকে তখন মনে করছে শ্রীকৃষ্ণকে পাখিরা তাদের মনের আকুতি জানাচ্ছে, পাখি যদি চুপ হয়ে যায় তখন মনে করছে শ্রীকৃষ্ণের ভাবে সে তন্ময় হয়ে গেছে। গোপীদের এমনই ব্যাকুলতা যে প্রকৃতির সব কিছুতে শ্রীকৃষ্ণের প্রেম ছাড়া আর কিছু দেখতে পারছেন না। ঠাকুর বলছেন, তোমরা গোপীদের ওই টানটুকু নাও। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গোপীদের ওই টানটুকু নেওয়া ছাড়া সত্যিই আর কিছু নেওয়ার নেই। আমাদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, গোপীরা এগুলো কী করছেন, শ্রীকৃষ্ণই বা কেন এর অনুমোদন দিয়ে প্রশ্রয় দিচ্ছেন? ঠাকুর গোপীদের প্রেমের বাহ্যিক আচরণ গুলোকে নিয়ে কিছু বলছেন না, এগুলোকে নিয়ে আমাদের ভাবারও কোন প্রয়োজন নেই, সব কিছু ছেড়ে গোপীদের এই টানটুকু নিতে হবে। ঈশ্বরের প্রতি এই টান না এলে, এই ব্যাকুলতা না হলে আধ্যাত্মিক জীবনের একটা স্তরকে অতিক্রম করা অসম্ভব। জলকে ৯৯^{o} ডিগ্রীতে ফোটালে জল ফুটবে না। জল ফোটানর জন্য ঠিক একশ ডিগ্রীই চাই, ওই এক ডিগ্রীর জন্য অনেক তফাৎ হয়ে যায়। প্রেসার কুকারে জলের তাপ আরও উপরে উঠে যায়। জলের boilingটাই জলের আসল ক্ষমতা। এখানে যে ব্যাকুলতার কথা বলা হচ্ছে, গোপীদের যে টানের কথা ঠাকুর বলছেন, এটা হল প্রেসার কুকারের ক্ষমতার মত। মিলন হচ্ছে না, ব্যাকুলতা বেড়ে গেছে, কোন কিছুকে ধরে রাখতে পারছে না, অন্য দিকে টান বেড়ে

গেছে। যখন টান বেড়ে যায় তখন জগতের যেখানে যেখানে আপনার যত আকর্ষণ রয়েছে সেখান থেকে সরিয়ে আপনাকে আরেকটা দিকে ঠেলে দেবে। তখন জগতের আর কোন বন্ধন থাকে না, অষ্টপাশাদি সব খসে পড়ে যায়। লীলাপ্রসঙ্গে ঠাকুরের মধুরভাবে সাধনার প্রসঙ্গ যেখানে করা হয়েছে ওই অংশটুকু পড়লে বোঝা যায় ঈশ্বরের প্রতি প্রেমাভক্তিতে ব্যাকুলতা কোন পর্যায়ে যেতে পারে।

গোপীরা আবার বলছেন বৃন্দাবনের অরণ্যবাসী রমণীরাই ঠিক ঠিক ধন্য। কারণ সারাদিন শ্রীকৃষ্ণকে তারা এত কাছে পাচ্ছে। এদের মধ্যে সত্যিকারের ভালোবাসা, অরণ্যবাসী রমণীরা যখনই শ্রীকৃষ্ণকে দেখছে তখনই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাদের ভালোবাসাটা তীব্র ভাবে জেগে ওঠে। ওই ভালোবাসার দাপটে তাদের প্রেমব্যাধি লেগে যায়। তখন তারা কি করে জানিস? শৃঙ্গারের জন্য যত রকম প্রসাধন কুমকুমাদি, সিঁদুর হয় এরা এগুলোকে তৃণের উপর ছড়িয়ে দেয়, তারপর শ্রীকৃষ্ণ যখন ওই তৃণের উপর চরণ ফেলে যান তখন তাঁর পায়ে ওই কুমকুমাদি লেগে যায়। এরপর বনবাসী মেয়েরা ঘাসের উপর শ্রীকৃষ্ণের পা থাকে যে কুমকুম কেশরাদি লেগে থাকে সেগুলোকে তারা সযত্নে নিয়ে নিজেদের মুখে, গায়ে অনুলিপ্ত করে। বনবাসী মেয়েরাও শ্রীকৃষ্ণকে ভালোবেসে তাদের জীবনকে সার্থক করে নিয়েছে। আবার যে গোবর্ধন পাহাড় সেও ধন্য। শ্রীকৃষ্ণের ভক্তদের মধ্যে গোবর্ধন পর্বতকে শ্রেষ্ঠ বললে ভুল কিছু হবে না। বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণের চরণ স্পর্শে সব সময় সে রোমাঞ্চিত হয় আছে। গোবর্ধন পর্বতের গায়ে গায়ে তৃণলতা আচ্ছাদিত হয়ে আছে সেটাকে দেখে গোপীরা বলছেন গোবর্ধন পাহাড় বলরাম আর শ্রীকৃষ্ণের চরণকমল স্পর্শে রোমাঞ্চিত হয়ে আছে।

যাকে অকাতরে ভালোবাসছে, তার প্রতি ভালোবাসায় যখন মন পুরো তন্ময় হয়ে ডুবে যায় তখন যা কিছু চেষ্টা, যা কিছু ক্রিয়া হয় তার সব কিছুতে সে এখন একটা অদ্ভুত জিনিষ দেখতে শুরু করে। গোপীদের মন এখন ধীরে ধীরে শ্রীকৃষ্ণে মজে যাচ্ছে। এর আগে উল্লেখ করা হয়েছিল যে, অনেকে বলেন যেসব ঋষিরা অদ্বৈত সাধনা করেছিলেন তাঁদের জানার ইচ্ছে হয়েছিল ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা কাকে বলে, ইশ্বরীয় প্রেম আস্বাদন করা কাকে বলে। তাঁরাই পরে গোপী হয়ে জন্ম নিয়েছিলেন। আবার অনেকে বলেন বেদের সব ঋচারাই নাকি গোপীদের রূপ ধারণ করে এসেছেন। কিন্তু এগুলো বলা হয় সাধারণ মানুষের মন থেকে গোপীদের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেমকে জাগতিক প্রেমের সঙ্গে এক করে ফেলার শঙ্কা নিবারণের জন্য। আসল ব্যাপার হল প্রেমাভক্তিতে ভক্ত বহির্জগতের সব কিছুকে তার ইষ্টের সাথে একটা সম্পর্ক তৈরী করে সেই অনুসারে আচরণ করতে থাকে। ঠাকুর বলছেন – একজন বাবলা গাছে দেখে ভাবে অভিভূত হয়ে পড়েছে। বাবলা গাছ দেখে তার মনে পড়ে গেছে এই বাবলা গাছের ডালে কোদালের বাঁট হবে, সেই কোদাল দিয়ে মহাপ্রভুর বাগানে মাটি কোপান হবে, সেই মাটিতে সব্জী চাষ হবে, সেই সব্জী রন্ধন করে মহাপ্রভুকে ভোগ দেওয়া হবে – এই ভাবতে ভাবতে সে মহাপ্রভুর ভাবে হারিয়ে গেছে। সামান্য একটা বাবলা গাছকে জড়িয়ে কল্পনা করতে করতে একটার পর একটা ভাবতে ভাবতে শেষে মহাপ্রভুতে তার মন লীন হয়ে যাচ্ছে। ঠাকুরের ক্ষেত্রেও দেখা যায়, অন্য কোন প্রসঙ্গ চলছে, ঠাকুর সেখান থেকে সেই প্রসঙ্গকে একটার পর একটা এগিয়ে এগিয়ে গিয়ে ঠিক ঈশ্বরে নিয়ে শেষ করছেন। এই ধরণের একটা মজার গল্প আছে। মা কোন কারণে রেগে গিয়ে ছেলেকে খুব মারছে। এত মারছে কিন্তু ছেলেটি একটুও কাঁদছে না। ঠাকুরমা দেখতে পেয়ে নাতিকে মায়ের কাছ থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বলছে 'এতটুকু বাচ্চাকে এত মেরেছে যে ওর চোখ দুটো ছানাবড়া হয়ে গেছে, একটু কাঁদতেও পারছে না'। বাচ্চা তখনই ভ্যাঁ করে কাঁদতে শুরু করেছে। ঠাকুরমা জিজ্ঞেস করছেন 'এতক্ষণ তোকে এত মারছিল কাঁদলি না আর এখন এত কান্না কিসের'! বাচ্চাটি বলছে 'আমি ছানাবড়া খাবো'। যতক্ষণ মায়ের কাছে মার খাচ্ছিল ততক্ষণ ওর কোন হুঁশ ছিল না, কিন্তু যেই ছানাবড়া শুনে নিয়েছে ওর মন সঙ্গে সঙ্গে ছানাবড়াতে চলে গেছে।

আমাদের সবারই ব্যক্তিত্বের ও জীবনের একটা কেন্দ্র থাকে। আমরা যেটাই করি না কেন, ঘুরে ফিরে সেই কেন্দ্রে চলে যাবে। কিন্তু সাধারণতঃ সবার ব্যক্তিত্ব শুধু একটা কেন্দ্রেই থাকে না, অনেক কিছুতে মন ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে, কখন একবার এটাতে যাচ্ছে, কখন সেটার দিকে ছুটছে। কিন্তু যাঁরা বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক, শিল্পী এনারা যেটাই করেন সেটাকেই ঠিক তাঁদের ব্যক্তিত্বের নির্দিষ্ট কেন্দ্রের দিকে নিয়ে যাবেন।

এখানে গোপীদের ব্যাকুলতার ক্ষেত্রেও ঠিক একই জিনিষ হচ্ছে। যেখানে যা কিছু দেখছে, গাছে কচি পাতা বেরিয়েছে এক রকম দেখছে, গাছার পাতা খসে পড়ছে অন্য রকম দেখছে। নদীতে তরঙ্গ উঠছে এক রকম দেখছেন, নদী শান্ত হয়ে গেলে অন্য রকম দেখছে। কিন্তু সব কিছুকেই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভালোবাসার সঙ্গে জুড়ে নিয়ে দেখছেন। গোপীদের ব্যাকুলতা তাঁদের অন্তরে কিন্তু সেই ব্যাকুলতার প্রকাশ দেখছেন প্রকৃতিতে। আসলে এটাই বাস্তব, জগতে কোথাও কিছু হচ্ছে না, যা কিছু হয় আমাদের মনের ভেতরে, বুদ্ধিতেই সব কিছু হচ্ছে। বাইরে থেকে ভেতরে যা কিছু ঢুকছে আমরা আমাদের মনের কাঠামো অনুসারে সেটাকে ব্যাখ্যা করি। আপনার হাতে একটা পেন রয়েছে, এখানে সবাই দেখছি আপনার হাতে পেন রয়েছে। কিন্তু আসলে এটা পেন কিনা তাই জানিনা। পেনে রিফিল আছে কিনা, রিফিল থাকলে তাতে কালি আছে কিনা, কিংবা এটা কোন স্পাই ক্যামেরা কিনা আমরা কিছুই জানিনা। আমরা বাচ্চা বয়স থেকে যে শিক্ষা পেয়ে এসেছি সেই শিক্ষার দৌলতে বলছি জিনিষটা পেন। আপনার হাতে আছে বলে ধরে নিচ্ছি এটা আপনার পেন। যখনই কোন উত্তেজনা বাইরে থেকে আমাদের মস্তিষ্কে আসে তখন আমাদের মস্তিষ্কের সংস্কার ও গঠনের উপর নির্ভর করবে আমি জিনিষটা কীভাবে গ্রহণ করব। সবারই ক্ষেত্রে একই জিনিষ প্রযোজ্য। জিনিষটা বাইরে হচ্ছে, নাকি আমাদের মস্তিষ্কে হচ্ছে এই নিয়ে প্রচুর গবেষণা হয়েছে।

এটা প্রমাণিত সিদ্ধান্ত যে, মানুষ যখন কোন কিছুকে দেখে কিংবা কোন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয় তখন সব সময় সে জিনিষটাকে নিজের ইচ্ছানুযায়ীই দেখবে। এই নিয়ে কিছু দিন আগে একটা সমীক্ষা করতে গিয়ে কিছু লোককে প্রশ্ন করা হয়েছিল 'মনে করুন আপনাকে একজন পুলিশ অফিসার নিয়োগ করার দায়ীত্ব দেওয়া হয়েছে। সেখানে আপনাকে একজন মহিলা ও একজন পুরুষ থেকে বাছাই করে নিতে বলা হয়েছে। ছেলেটি খুব সপ্রতিভ ও বুদ্ধিমান কিন্তু আহামরি কিছু ডিগ্রী নেই আর মহিলাটি প্রচুর পড়াশোনা করা ও স্মার্ট। আপনি কাকে নিয়োগ করবেন'? সবাই বলবে ছেলেটিকে নিয়োগ করব। এরপর আরেকটা আলাদা গ্রুপকে একই প্রশ্ন করা হয়েছে 'একটি ছেলে আছে যার প্রচুর পড়াশোনা করা আর একটি মেয়ে যে খুব স্মার্ট ও বুদ্ধিমতি, আপনি কাকে পুলিশ অফিসার পদে নিয়োগ করবেন'। এখানেও সবাই ছেলেটিকেই নিয়োগ করার কথা বলল। মন আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছে ছেলেকেই নিতে হবে, কারণ পুলিশ মানেই ছেলে। এখন যোগ্যতার বিচার যখন করতে যাবে তখন মস্তিষ্ক সঙ্গে সঙ্গে জিনিষটাকে সেইভাবেই বিচার করে ওই সিদ্ধান্তই নেবে। আসলে আমাদের মস্তিষ্কে যে কোশিকা গুলো আছে এরাই ব্যাখ্যা দিয়ে দেয়, এছাড়া আর কিছু হয় না।

গোপীরা কৃষ্ণপ্রেমের ব্যাকুলতায় পরস্পর যে কথা বলছে এগুলো এভাবেই কাজ করছে, তাঁদের মন শ্রীকৃষ্ণে এমন ভাবে মজে গেছে, শ্রীকৃষ্ণের প্রেমে এমন ডুবে গেছে, তাঁদের মন প্রেসার কুকারের তাপের মত ১২০ ডিগ্রী ১৩০ ডিগ্রীতে চলে গেছে, পাঁচ মিনিটের মধ্যে পুরো সিদ্ধ হয়ে যাবে। বরফের দেশে উনুনে রান্না করতে গেলে রান্নাই হবে না, ওখানে প্রেসার কুকার ছাড়া রান্নাই করা যাবে না। সেইজন্য আগেকার দিনে ঠাণ্ডা দেশের লোকেরা খুব একটা সেদ্ধ করা খাবার পেত না, যার জন্য হজম করতে পারতো না বলে তাদের আয়ুও খুব কম হত। আমাদের জীবনও ঠিক তাই, আমরা জল অনেক কম ডিগ্রীতে ফুটিয়ে যাচ্ছি ফলে আমাদের কোন আধ্যাত্মিক উন্নতি নেই। প্রেসার কুকার, স্টীম ইঞ্জিন তাপটাকে এমন ভাবে ধরে রাখে যার ফলে তাপের প্রেসারটা খুব তাড়াতাড়ি উপরের দিকে উঠে আসে। গোপীদের মত এই ব্যাকুলতা না হলে আমাদের তাপমাত্রা উপরের দিকে উঠবে না। ব্যাকুলতা না হলে প্রেমাভক্তি হবে না, প্রেমাভক্তি না হলে ঈশ্বর জ্ঞান হবে না।

গোবর্ধন পর্বতের প্রশংসা করার পর গোপীরা বলছেন 'হে সখীরা! তোমরা সেই বিচিত্র দৃশ্যটিকে একবার মনের চিত্রপটে অঙ্কিত করে দেখ, এই দুই ভাই বলরাম আর শ্রীকৃষ্ণ সেজেগুজে গাভী নিয়ে গোষ্ঠে যাচ্ছেন, রাখাল বালকদের সঙ্গে সেখানে বিচরণ করছেন, গোধূলিতে গরুর পাল নিয়ে ব্রজভূমিতে ফিরে আসছেন আর বাঁশিতে তুলছেন সুরধ্বণি, সে কী আকাশ-পাতাল আকুল করা গভীর নাদ! শুধু এটুকু জানি, এই মধুর গভীর বংশী নাদ যত সচল চেতন দেহধারী প্রাণীকে করে দেয় নিশ্চল, নিশ্চল জড়কে করে দেয় সচল। নদীগুলোও সচল হয়ে উঠছে আর যারা নড়াচড়া করতে পারে না, সেই বৃক্ষরাও পুলকে রোমাঞ্চিত। মূল কথা হল গোপীরা বলতে চাইছেন শ্রীকৃষ্ণের বংশী ধ্বণির কী জাদু, চেতন প্রাণীকে নিজের দিকে টেনে নিচ্ছে অন্য

দিকে জড় পদার্থের মধ্যে প্রাণের স্পন্দন জাগিয়ে তাদের চেতন করে দিচ্ছে আর অচল বস্তুর মধ্যে রোমাঞ্চ সৃষ্টি করছে। শুকদেব তখন পরীক্ষিৎকে বলছেন ***এবংবিধা ভগবতো যা বৃন্দাবনচারিণঃ। বর্ণয়ন্ত্যো মিথো গোপ্যঃ ক্রীড়াস্তন্ময়তাং যযুঃ।।১০/২১/২০।*** হে পরীক্ষিৎ! ব্রজবিহারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই রকম অনেক দিব্য লীলা আছে, গোপীরা যা সব সময় নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে করতে শ্রীকৃষ্ণে তন্ময় হয়ে যেতেন আর মনে মনে শ্রীকৃষ্ণের প্রেমাস্বাদন করতে করতে আনন্দে মগ্ন হয়ে যেতেন। এই হল বেণুগীত, গোপীদের মন শ্রীকৃষ্ণকে পাবার আকাঙ্খায়, শ্রীকৃষ্ণের ব্যাকুলতায় কীভাবে তাঁরা তন্ময় হয়ে যেত তারই বর্ণনা এই বেণুগীতে করা হয়েছে।

চীরহরণ লীলা

বেণুগীতের পরেই আসে চীরহরণ কাহিনী। রাসলীলার পাঁচটি অধ্যায় আর চীরহরণের দুটি অধ্যায়, এই সাতটি অধ্যায় ভাগবতের প্রাণ। রাসলীলার পাঁচটি অধ্যায়কে বলা হয় ভাগবতের পঞ্চপ্রাণ। ভারতে আগেকার দিনে গ্রামে গঞ্জে বেশীরভাগ লোকেরাই পুকুরে নদীতে বিনা বস্ত্রেই স্নান করত। এখনো গ্রাম দেশে দশ এগারো বছরের ছেলে মেয়েদের বিনা বস্ত্রেই স্নান করতে দেখা যায়, মেয়েরা কম, কিন্তু ছেলেরা এখনও করে। শ্রীকৃষ্ণের কাছে এই অভ্যাসটা খুবই অশালীন ও অভব্য বলে মনে হয়েছিল। নদীতে বা জলাশয় বিনা বস্ত্রে স্নান করাতে শ্রীকৃষ্ণের ঘোরতর আপত্তি ছিল।

এখানে বলছেন ***হেমন্তে প্রথমে মাসি নন্দব্রজকুমারিকাঃ। চেরুর্হবিষ্যং ভুঞ্জানাঃ কাত্যায়ন্যর্চনব্রতম্।।১০/২২/১।*** হেমন্ত ঋতুর প্রথম মাসে কার্তিকে বরুণ দেবতার নামে মেয়েরা একটা বিশেষ ব্রত করতেন। এই ব্রতে কুমারী মেয়েরা একমাস হবিষ্য করে খেতেন আর সূর্যোদয়ের আগে নদীতে গিয়ে স্নান করতেন। স্নান করার পর কাত্যায়নী মন্দিরে কাত্যায়নী দেবীর পূজো করে দেবীর কাছে প্রার্থনা করতেন আমরা যেন আমাদের মনের মত পতি পাই। গোপীরা কাত্যায়নী দেবীর কাছে এই মন্ত্রোচ্চারণ করে প্রার্থনা করতেন ***কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিন্যধীশ্বরি। নন্দগোপসুতং দেবি পতিং মে কুরু তে নমঃ। ইতি মন্ত্রং জপন্ত্যস্তাঃ পূজাং চক্রুঃ কুমারিকাঃ।।১০/২২/৪।*** হে কাত্যায়নী দেবী! নন্দগোপের পুত্র শ্রীকৃষ্ণকে যেন আমরা পতি রূপে পাই। ***এবং মাসং ব্রতং চেরুঃ কুমার্যঃ কৃষ্ণচেতসঃ। ভদ্রকালীং সমানর্চুর্ভূয়ান্নন্দসুতঃ পতিঃ।।১০/২২/৫।*** শ্রীকৃষ্ণে নিবেদিত চিত্তা গোপীরা এই ব্রত পুরো এক মাস পালন করতেন আর দেবী ভদ্রকালীকে একমাস ধরে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে বিধিবৎ অর্চনা করতেন। ***উষস্যুত্থায় গোত্রৈঃ স্বৈরন্যোন্যাবদ্ধবাহবঃ। কৃষ্ণমুচ্চৈর্জগুর্যান্ত্যঃ কালিন্দ্যাং স্নাতুমন্বহম্।।১০/২২/৬।।*** সূর্যোদয়ের অনেক আগে অন্ধকারে উঠে সবাই হাত ধরে উচ্চ কণ্ঠে শ্রীকৃষ্ণের নানা রকম লীলা কাহিনীর কীর্তন করতে করতে যমুনার জলে স্নান করতে যেতেন।

চীরহরণ লীলার একটাই মাহাত্ম্য, ভগবানের প্রতি ব্যাকুলতা এলেই সব কিছু হয় না, ব্যাকুলতার পর আর একটি ধাপ বাকি থেকে যায়, সেটা হল পূর্ণ সমর্পণ। সমর্পণ মানে, পুরনো সব কিছুকে ফেলে দেওয়া। গাছে ওঠার সময় একটা একটা ডাল ধরে ধরে উপরের দিকে উঠতে হয়, কিন্তু নীচের ডালকে যতক্ষণ না ছাড়া হয় ততক্ষণ উপরের দিকে ওঠা যাবে না। পুরনো জিনিষগুলো আমাদের বেঁধে রেখেছে। সেগুলো কি? লজ্জা, ঘৃণা, ভয়, জাতি, কুল, শীল, অভিমান, দম্ভাদি অষ্টপাশ। এই অষ্টপাশের দ্বারা আমরা আষ্টেপৃষ্টে বাঁধা হয়ে রয়েছি। ঠাকুর লজ্জা, ঘৃণা আর ভয়ের উপর বেশি জোর দিয়েছেন। ঠাকুর বলতেন 'লজ্জা ঘৃণা ভয় তিন থাকতে নয়', এই তিনটে থাকলে চলবে না। কী চলবে না? ঈশ্বরের নাম করা। ঈশ্বরের নাম করার সময় লজ্জা, ঘৃণা আর ভয় থাকলে চলবে না। কিন্তু জীবন চালাতে এই তিনটের খুব দরকার। ঠাকুর বলছেন ঈশ্বরের নাম করার সময় যেন এই তিনটে না থাকে। গোপীদের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তীব্র ব্যাকুলতা, যে ব্যাকুলতার নিদর্শন আমরা বেণুগীতে দেখলাম। শ্রীকৃষ্ণের ঠোঁটে বাঁশি, তাতেই গোপীদের বাঁশির প্রতি ঈর্ষা জাগছে। শুধু বাঁশির প্রতিই ঈর্ষা ভাব নেই, বৃন্দাবনের পশুপাখি, গাছপালা, নদী, গরু সবারই প্রতি গোপীদের ঈর্ষা ভাব, কারণ

আমাদের থেকে তারাই বেশি ভাগ্যবান। এরপর এসে গেছে কার্তিক মাস, কার্তিক মাসে হবিষ্য করে সূর্যোদয়ের আগে নদীতে স্নান করে কাত্যায়নী দেবীর পূজা করার ব্রত করছেন। গোপীরা সেখানে কাত্যায়নী দেবীর কাছে প্রার্থনা করছেন শ্রীকৃষ্ণকে যেন আমরা পতি রূপে পাই। গোপীরা সবাই কিন্তু মনে মনে প্রার্থনা করে যাচ্ছেন, প্রকাশ্যে কেউ বলছেন না। এখানে বলছেন ***ভগবাংস্তদভিপ্রেত্য কৃষ্ণো যোগেশ্বরেশ্বরঃ। বয়স্যৈরাবৃতস্তত্র গতস্তৎ কর্মসিদ্ধয়ে।। ১০/২২/৮।*** কারণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তিনি হলেন যোগেশ্বর, যোগেশ্বর সবার মনের কথা জানেন। তিনি গোপীদের মনের সব কথা জানতেন। তিনি জেনে গেছেন এঁরা কী চাইছে। তিনি ঠিক করলেন এবার গোপীদের সাথে একটু মজা করা যাক আর সাথে সাথে এঁদের যে সাধনা সেই সাধনাকেও সার্থক করে গোপীদের মানবজীবনকে কৃতকৃত্য করতে হবে। এবার তিনি বয়স্য পরিবৃত হয় যমুনাপুলিনের দিকে এগোচ্ছেন।

চীরহরণ প্রসঙ্গে আলোচনা করার আগে আমাদের কয়েকটি জিনিষ ভালো করে বোঝা দরকার। বৈধী ভক্তি করতে করতে সাধক যখন এগিয়ে যেতে থাকেন একটা অবস্থাতে এসে কীভাবে এই বৈধী ভক্তিই রাগাত্মিকা ভক্তিতে পাল্টে যায়। রাগাত্মিকা ভক্তিতে এসে সাধকের বোধ হয় আমি আর আমার ইষ্ট এক। এই এক হওয়াটা বোধের পর্যায়েই থাকে, বাস্তবে এখানে পুরোপুরি এক হচ্ছে না। বৈধী ভক্তি থেকে রাগাত্মিকা যাওয়ার পর এতদিনের যত চাহিদা ছিল সেগুলো ব্যাকুলতাতে পাল্টে যায়। ব্যাকুলতার পরের ধাপেই আসে সমর্পণের ভাব, আমি নিজেকে সম্পূর্ণ ভাবে তোমাকে দিলাম। ইষ্টের কাছে নিজেকে সমর্পণ করাটা এখানে সাধক নিজেই ঠিক করে নিয়েছে, কিন্তু যাঁর কাছে সমর্পণ করা হচ্ছে তিনি গ্রহণ করবেন কিনা সেটা তাঁর উপরই নির্ভর করে। একটা মজার গল্প আছে, একটি ছেলে তার বন্ধুদের বলছে 'জানিস আমার সিনেমার ওই হিরোইনিরে সাথে বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে'। বন্ধুরা জিজ্ঞেস করছে 'কি করে বিয়ে ঠিক করলি রে'? ছেলেটি বলছে 'ফিফটি পারসেন্ট ঠিক হয়ে গেছে'। 'ফিফটি পারসেন্ট ঠিক হয়েছে, সেটা আবার কি রকম'? 'না, আমার তরফ থেকে ঠিক হয়ে গেছে, ওর তরফ থেকে এখনও ঠিক হয়নি'।

এখানেও সাধক নিজের তরফ থেকে ফিফটি পারসেন্ট সমর্পণ করে দিল, কিন্তু তাতে তো কিছু হবে না। ওইদিক থেকেও ফিফটি পারসেন্ট হওয়া চাই। আত্মনিবেদন বা সমর্পণ আমি করে দিলেই হবে না। যাঁর কাছে সমর্পণ করছি তাঁকেও গ্রহণ করা চাই। আগেকার দিনে কোন রাজা যদি যুদ্ধ বা অন্য কোন ঝামেলায় পড়ে গেলে সেই রাজা অন্য কোন রাজার কাছে গিয়ে অস্ত্র-শস্ত্র দিয়ে বলত আমি আপনার শরণাপন্ন হলাম। ইতিহাসে এই ধরণের বহু ঘটনার বর্ণনা আছে, আমাদের শাস্ত্রেও এই ধরণের অনেক কাহিনী পাওয়া যাবে। রাজপুতদের মধ্যেও এই জিনিষ হত আর মুসলমানদের মধ্যেও নাকি এই প্রথা ছিল এবং বলে যার শরণাপন্ন হয় সে তাকে গ্রহণ করে। কিন্তু সব সময়ই যে গ্রহণ করবে তা নয়। কারণ যার কাছে যাওয়া হয়েছে সে হয়তো বলল 'তোমার সাথে যার শত্রুতা সে আমার বন্ধু, তোমাকে আশ্রয় দিলে আমার অনেক সমস্যা হয়ে যেতে পারে, কিন্তু তার বদলে আমি তোমাকে এই সুবিধাটুকু করে দিলাম'। কিংবা অনেক সময় বলে দেয় 'না বাবা, তোমাকে আশ্রয় দিলে অমুক আমাকে শেষই করে দেবে'। কিন্তু সাধারণত দেখা যায় যাদের আচরণ খুব উচ্চ আদর্শের তারা বলে দেন 'ঠিক আছে আমি তোমাকে গ্রহণ করলাম'। রাসলীলা 'আমি তোমাকে গ্রহণ করলাম' এই ভাবটাকে দেখায়। বৈধী ভক্তি ব্যাকুলতাতে পরিবর্তিত হয়ে গেছে, ব্যাকুলতা মানেই রাগাত্মিকা ভক্তি। এটা ঠিকই যে, রাগাত্মিকা ভক্তি না আসা পর্যন্ত ব্যাকুলতা দেখা যায় না। যদি কখন দেখা যায় ঈশ্বরের জন্য মন প্রাণ ব্যাকুল হয়ে গেছে, ঈশ্বরের একটু নাম শুনলে, কথা শুনলেই চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল পড়তে থাকে, ঠাকুর উপমা দিচ্ছেন যেন বিল্লী আঁচড়াচ্ছে, তখন বুঝতে হবে তার মধ্যে রাগাত্মিকা ভক্তি উদয় হয়ে গেছে। কিন্তু এই রাগাত্মিকা ভক্তিতেও পূর্ণাঙ্গ রূপে সব কিছু হয়ে যায় না। এবার ঈশ্বর তাঁকে কখন গ্রহণ করবেন, আদৌ গ্রহণ করবেন কিনা এই ব্যাপারে নিশ্চিত করে কেউ কিছু বলতে পারে না। খ্রীশ্চান পরম্পরায় সাধনার একটা অবস্থাকে বলা হয় Dark night of the Soul। ব্যাকুলতার এই অবস্থায় মনে হয় যেন আমার আর কিছুই হলো না, আমার সব কিছুই চলে গেল, তাঁকে হয়তো আমি আর পেলাম না, আমার এদিক ওদিক সব গেল। Dark night of the Soul যখন হয় এটাই ব্যাকুলতার পরাকাষ্ঠা। তখনই হঠাৎ দেখা

যায় দিশাটা ফেটে যেন আলাদা হয়ে যাচ্ছে আর ঈশ্বরের দিব্য আলো সামনে এসে যায়। চীরহরণে এই আলোর কথাই বলছেন, এখানে ঈশ্বর গোপীদের নিজের করে নিচ্ছেন।

আগেও আমরা বলেছি আর এখনও আরেকবার মনে করিয়ে দেওয়া হচ্ছে – যাদের মনে এখনও সামান্যতম কাম ভাব আছে, বিষয় ভাব আছে, সাংসারিক ভাব আছে তাদের বেণুগীত, চীরহরণ ও রাসলীলা শুনতেও নেই, শুনলে বরঞ্চ তাদেরই ক্ষতি হয়। যাঁদের মধ্যে খুব উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাব আছে, ভাগবতের এই তিনটে কাহিনী একমাত্র তাঁদেরই জন্য। আমরা সবাই এখন সাধকের একেবারে প্রথম অবস্থায় আছি, কিন্তু এখানে অত্যন্ত শ্রদ্ধা নিয়ে আমরা শাস্ত্র কথা শুনতে এসেছি, আমাদের পূর্বজরা এই সব ব্যাপারে কি বলে গেছেন খুব আগ্রহ ও ভক্তি নিয়ে জানতে চাইছি, তাই এই আলোচনা করতে হচ্ছে। কিন্তু এখানে এই কাহিনীগুলোর মধ্যে, শ্রীকৃষ্ণের ব্যাপারে বা গোপীদের ব্যাপারে সামান্যতম একটুও যদি সাংসারিক ভাব বা দৃষ্টি নিয়ে দেখা হয়, তাহলে এটাই আমাদের একটা মহাপাপ হয়ে যাবে, যে পাপে আমাদেরই সর্বনাশ হয়ে যাবে।

শ্রীকৃষ্ণ যোগীশ্বর তাই তিনি সবারই মনের অভিপ্রায় জানেন, যেটা আট নম্বর শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি জানেন গোপীরা মনে মনে তাঁকে পতি রূপে কামনা করছেন। শ্রীকৃষ্ণ একদিন এই অবস্থায় গোপীদের সব জামা কাপড়গুলো নিয়ে কদম্ব গাছে উঠে গেলেন। স্নান করে উঠে আসার সময় গোপীরা দেখলেন শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের বস্ত্রগুলিকে গাছের ডালে ঝুলিয়ে রেখে তিনিও গাছের ডালে বসে আছেন। শ্রীকৃষ্ণ তখন বলছেন 'তোমরা যদি তোমাদের বস্ত্র চাও তাহলে এসে নিয়ে যাও, আর তোমরা এক এক করে এসে নিয়ে যেতে পার আর ইচ্ছে করলে একত্রে এসেও নিয়ে যেতে পার'। যখন থেকে আমরা শ্রীকৃষ্ণের বাললীলা নিয়ে আলোচনা করে যাচ্ছি তখন থেকে আমরা বলে যাচ্ছি যে এই লীলা কাহিনীর অনেক জায়গায় আধ্যাত্মিক ভাব আছে, অনেক জায়গা শুধু একটা কাব্যিক রূপ দেওয়ার জন্য বলা হয়েছে আবার অনেক জায়গায় মনকে কল্পনার আকাশে পাখা মেলতে সাহায্য করছে। কিন্তু যাঁরা এগুলোকে সাধনা রূপে গ্রহণ করেছেন তাঁরা কিন্তু ভাগবতের প্রত্যেকটি শব্দের একটা বিশেষ অর্থ দেখেন এবং সেইভাবে সেই শ্লোকের ব্যাখ্যা করেন। আমরা অত বিস্তারিত ব্যাখ্যাতে যাবো না, মূল ভাবটাকেই আমরা গ্রহণ করছি। মূল ভাবটা কী? গোপীদের আধার করে ব্যাসদেব ঈশ্বরের প্রতি ভক্তির যে নানা রকম রূপ ও তার অভিব্যক্তি হতে পারে তারই বর্ণনা করেছেন। এই মূল ভাবটা সব সময় আমাদের মাথায় রাখতে হবে। যেমনি এগুলোকে কাহিনী রূপে নিয়ে যাব তক্ষুণি সর্বনাশ হয়ে যাবে। ভাগবত মূলতঃ ভক্তিগ্রন্থ, যত রকমের ভক্তি হতে পারে তার সবটাই ভাগবতে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে। মধুর ভাবের সাধনায় সাধক ঈশ্বরকে নিজের প্রেমিক রূপে দেখেন, তাতে কোন কামগন্ধ থাকে না, জাগতিক বা সাংসারিক কামনা তাতে থাকে না। কিন্তু সাধারণ মানুষকে বোঝানর জন্য গোপী আর শ্রীকৃষ্ণের প্রসঙ্গ আনা হয়েছে, ঈশ্বরের প্রতি প্রেম হলে তার গভীরতা কেমন হয়। শ্রীকৃষ্ণ যে বলছেন তোমরা এক এক করে আসতে পার আর চাইলে এক সাথেও আসতে পার, হতে পারি কাহিনী এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য বলছেন অথবা সাধারণ একটা কাব্যিক বর্ণনা। অথবা বলতে চাইছেন একাও যদি কেউ ঈশ্বরের দিকে এগোয় তাকেও তিনি পার করে দেন আবার সমষ্টি রূপে এগোলেও তিনি কৃপা করতে পারেন।

শ্রীকৃষ্ণ যে গোপীদের সবার পরিধেয় বস্ত্র কদম্ব গাছের ডালের উপর রেখে বসে আছেন, ব্যাপারটা গোপীদের কাছে মজাই লাগছে। শুধু যে মজা পেয়েছেন তাই নয়, ***তস্য তৎ ক্ষ্বেলিতং দৃষ্ট্বা গোপ্যঃ প্রেমপরিপ্লুতাঃ। ব্রীড়িতাঃ প্রেক্ষ্য চান্যোন্যং জাতহাসা ন নির্যযুঃ।।১০/২২/১২।*** যাঁকে পতি রূপে পাওয়ার কামনা করে গোপীরা একমাস ব্রত করছেন স্বয়ং তিনি নিজে এসে উপস্থিত হয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণের এই কৌতুকপূর্ণ লীলা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁদের প্রেমকে আরও টালমাটাল করে দিয়েছে। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গোপীদের প্রেম যেন এখন উপচে পড়ছে। যেখানে প্রেমের সম্পর্ক তৈরী হয়েছে, তা স্বামী-স্ত্রীর প্রেমই হোক বা প্রেমিক-প্রেমিকার প্রেমই হোক, তাদের মধ্যে তখন অনেক রকম লীলাখেলা শুরু হয়ে যায়। যদি একজন বলে আমি তোমাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছি তখনও তার প্রতি ভালোবাসা বেড়ে যায়, যখন কাছে আসছে তখনও বাড়ে, দুষ্টুমি করছে তখনও ভালোবাসা বাড়ে, আর ভালোবাসছে তখনও ভালোবাসা বাড়ে। ঈশ্বর আর ভক্তের ব্যাপারে ঠাকুর

বলছেন – কখনও ঈশ্বর চুম্বক হন ভক্ত লোহা আবার কখন এর উল্টোটাও হয়ে যায় ভক্ত চুম্বক ঈশ্বর লোহা হয়ে যান। এক অপরকে টানছে। এখানে বলতে চাইছেন শ্রীকৃষ্ণের এই রকম কাণ্ডজ্ঞানহীন আচরণে গোপীদের মনে শ্রীকৃষ্ণের উপর একটুও রাগ জন্মায়নি, উল্টে তাঁরা খুব মজা পেয়েছেন। ব্যাসদেব বলছেন গোপীরা *প্রেমপরিপ্লুতাঃ*, গোপীদের হৃদয় শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেমে একেবারে আপ্লুত হয়ে গেছে। অথচ শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের বিবস্ত্র অবস্থায় ছেড়ে দিয়ে মজা করছেন, কার্তিকের ভোরের ঠাণ্ডা জলে সব্বাইকে দাঁড় করিয়ে রেখেছেন। আবার অন্য দিকে তাঁদের লজ্জাবোধও করছে। সবাই একসাথে যমুনার জলে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে আছেন।

গোপীরা সবাই তখন শ্রীকৃষ্ণের কাছে খুব মিষ্টি ভাবে আকুতি-মিনতি করে প্রার্থনা করে যাচ্ছেন 'হে কৃষ্ণ! তুমি তো কখন এই রকম নীতিবিরুদ্ধ কাজ করতে পারো না, ব্রজবাসীরা সবাই তোমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ, তোমার চরিত্র অনিন্দনীয়। তুমি এই রকমটি করো না। আমরা ঠাণ্ডায় কাঁপছি, আমাদের কাপড়গুলো তুমি দিয়ে দাও'। ***শ্যামসুন্দর তে দাস্যঃ করবাম তবোদিতম্। দেহি বাসাংসি ধর্মজ্ঞ নো চেদ্ রাজ্ঞে ব্রুবামহে।।*** *১০/২২/১৫।* গোপীরা এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁদের খুব প্রীতি ও ভালোবাসার ভাব মিলিয়ে মিষ্টি করে বলছেন 'হে শ্যামসুন্দর! আমরা তোমার দাসী, তুমি যেমনটি বলবে আমরা তাই করতে প্রস্তুত'। গোপীদের মন এখন পুরোপুরি শ্রীকৃষ্ণে সমর্পিত। আমরা যদি জীবনে কাউকে ক্ষণিকের জন্যও ভালোবেসে থাকি তখন মনে হয় তার জন্য আমি সব কিছু করতে রাজী আছি। কিন্তু আমাদের ভালোবাসা কিছুক্ষণ পরেই কাটাকাটি হয়ে যায়। কিন্তু গোপীদের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভালোবাসা তা নয়, গোপীদের ভালোবাসা চিরজীবন চিরদিনের জন্য ভালোবাসা। শ্রীকৃষ্ণকে তাই গোপীরা বলছেন, আমরা তো তোমাকে সব কিছু দিয়ে তোমার দাসী হয়ে গেছি।

কিন্তু এখানে একটা জিনিষ বোঝার আছে, এখনও গোপীদের আর শ্রীকৃষ্ণের মাঝখানে একটা আবরণ রয়ে গেছে। গোপীদের প্রেম সর্বাঙ্গপূর্ণ ঠিকই কিন্তু একটা কোথাও যেন একটু আবরণ থেকে গেছে। গীতার তত্ত্ব দিয়ে এই সর্বাঙ্গপূর্ণতা আরও সহজে বোঝা যায়। প্রেমের পরাকাষ্ঠা হল সত্ত্বগুণের পরাকাষ্ঠা। যখন কারুর মধ্যে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তির উদয় হয় বুঝতে হবে তার মধ্যে সত্ত্বগুণের আধিক্য হয়েছে। কিংবা শুধু স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঠিক ঠিক ভালোবাসাটাও সত্ত্বগুণের পরাকাষ্ঠা। সতী শব্দটাও সৎ থেকে এসেছে, সত্ত্বগুণও সৎ থেকে আসে। যার মধ্যে যত পবিত্রতা তার মধ্যে তত সত্ত্বগুণ বেশী হবে। ঠিক তেমনি ভালোবাসা যত পবিত্র হবে সেখানে টান তত বেশী হবে। গোপীদের প্রেম সত্ত্বগুণের পরাকাষ্ঠাতে চলে গেছে। কিন্তু ঈশ্বর দর্শন এই তিনটে গুণ, সত্ত্ব, রজ ও তমের এলাকায় হয় না। প্রকৃতির এলাকাকে না ছাড়িয়ে যাওয়া পর্যন্ত ঈশ্বর দর্শন হবে না। সত্ত্বগুণ প্রকৃতির এলাকার, তাই প্রকৃতির এলাকাকেও ছাড়িয়ে না যাওয়া পর্যন্ত ঈশ্বর দর্শন কখনই হবে না। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ তাই বারবার 'ত্রিগুণাতীত' শব্দটা নিয়ে এসেছেন, ঈশ্বর দর্শনের জন্য সবাইকে আগে ত্রিগুণাতীত হতে হয়। হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন শাস্ত্রে ত্রিগুণাতীত অবস্থাকে বিভিন্ন ভাবে বলা হয়েছে। তমোগুণ খসে পড়ে যাবে রজোগুণের সাহায্যে, রজোগুণ খসে গেছে সত্ত্বগুণ দিয়ে। সত্ত্বগুণে এবার এগিয়ে এগিয়ে সে এখন সত্ত্বগুণের পরাকাষ্ঠায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে, এরপর আর কিছুই নেই – অপবিত্র বলে কিছু নেই, কামগন্ধ বলে কিছু নেই, জাগতিক চাহিদা বলে কিছু নেই, ঈশ্বরীয় ভাব, আধ্যাত্মিক ভাবে এখন পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। এবার কি তাহলে ঈশ্বর দর্শন বা আধ্যাত্মিক পূর্ণ জ্ঞানে তিনি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবেন? শাস্ত্রে এই কথা পরিষ্কার করে কোথাও বলা নেই। কঠোপনিষদে যেমন বলছেন *যমেবৈষবৃণুতে তেন লভ্যঃ*, আত্মা যাঁকে বরণ করেন সেইই শুধু আত্মাকে লাভ করতে পারে।

রমণ মহর্ষি ছিলেন ঘোর অদ্বৈতবাদী, তিনি বলতেন সাধক সাধনা করতে করতে সাধনার একটা স্তরে চলে যাওয়ার পর দেখে এরপর সে আর এগোতে পারছে না। ওই অবস্থায় তখন ভেতর থেকে কেউ যেন একটা হাত এগিয়ে দিয়ে সাধককে টেনে নেন। এগুলো উপমা, আমরা কোন দিন এগুলো বুঝতে পারবো না, কিন্তু এটাই বাস্তবিকতা। আমাদের সবার সব চেষ্টা মনের এলাকাতেই হচ্ছে, আমাদের সব কিছু মনকে নিয়েই চলে। আমাদের মন সব থেকে বেশী করতে পারে আমাকে শতকরা নিরানব্বুই পয়েন্ট নিরানব্বুই ভাগ সত্ত্বগুণে

নিয়ে চলে যেতে পারে। কিন্তু তারপরে ওই পয়েন্ট পাঁচকে ছেড়ে সত্ত্বগুণকে অতিক্রম করে যাবে সেটা আমাদের পক্ষে কখনই সম্ভব নয়। ঠাকুর কথামৃতে বারবার বলছেন – মানুষের কি ক্ষমতা! তিনি কৃপা না করলে কি কিছু হয়!

একটা ট্রেন রেল লাইনের উপর দিয়ে চারশ পাঁচশ কিলোমিটার বেগে ছুটে যাচ্ছে আর একটা ছোট্ট পাখির বাচ্চা সবে উড়তে শিখেছে, কিছুটা মাটির উপর দৌড়ে মাটিকে ছেড়ে আকাশে একটু একটু করে উড়তে শিখেছে। দেখে মনে হবে ট্রেনের ক্ষমতা পাখির শাবকের থেকে অনেক বেশী। কিন্তু তা নয়, পাখির শাবক সে মাটিটাই ছেড়ে দিয়েছে, গুণগত মানটাই এখন তার পাল্টে গেছে। কিছু দিন পর পাখিটির আর কোন সীমানা থাকবে না। মাটিকে যে ছেড়ে দিয়েছে সেতো অন্য শ্রেণীতে চলে গেল। সত্ত্বগুণকে অতিক্রম করা মানে মাটিকে ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়া। মাটিকে ছেড়ে দেওয়াটা সম্ভব হবে না যতক্ষণ তার শরীরের গঠনটাই অন্য রকম না হয়ে যাচ্ছে। এখানে পৃথিবীর মাটির কথা বলা হল। আর আধ্যাত্মিক জগতে মনের গঠনটা অন্য রকম হতে হবে। মনের গঠনকে পাল্টানো আমাদের দ্বারা সম্ভব নয়। ওই জায়গাতে কেউ এসে আমাদের ধরে ছোঁ মেরে বেরিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত হবে না। গোপীরা যখন এই প্রার্থনা করছেন *শ্যামসুন্দর তে দাস্যঃ করবাম তবোদিতম্*, তুমি যেমনটি বলবে আমরা করতে রাজী আছি। কারণ আমরা যে তোমাকে শুধু ভালোবেসেছি তাই নয়, আমরা তোমার দাসী, তোমাকে আমরা আমাদের সর্বস্ব দিয়ে দিয়েছি। ঠাকুর যখন মা কালীর কাছে প্রার্থনা করছেন 'মা! দেখা দে' বলে, তখন তিনি যখন আর পারছেন না তখন বলছেন আমার গলাটাই কেটে দেব। গলা কাটতে যাচ্ছেন তখন তাঁর দর্শন হল। আমি আপনি যদি গলা কাটতে যাই আমাদের কি দর্শন হবে? কোন দিনই হবে না। কারণ আমরা এখনও সত্ত্বগুণের পরাকাষ্ঠায় পৌঁছাতে পারিনি, সেই পবিত্রতা, যেখানে জগতের আর কোন কিছু নেই, পবিত্রতার সেই স্তরে না যাওয়া পর্যন্ত হবে না। আর গলা যদি কেটেও দিই তাতে কী হলো! গলা কেটে দেওয়ার পর যা থাকবে সেটাও ঈশ্বরেরই, পরের জন্মে হবে তা নাহলে অন্য লোকে হবে বা অন্য শরীরে হবে।

শ্লোকের পরের লাইনে বলছেন *দেহি বাসাংসি ধর্মজ্ঞ*, এখানে 'ধর্মজ্ঞ' শব্দটাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ধর্মজ্ঞ শব্দটি এই পুরো অধ্যায়ের মূল কেন্দ্রবিন্দু। ব্যাসদেব যেমন এর উপর জোর দিয়েছেন গোপীরাও এই ধর্মজ্ঞের উপর জোর দিচ্ছেন 'হে কৃষ্ণ! তুমি ধর্মজ্ঞ, ধর্মকে তুমি জানো, কোনটা ধর্ম আর কোনটা অধর্ম তোমার জানা আছে। সেইজন্য তুমি এই রকমটি করো না, তুমি যে এভাবে আমাদের কাপড় সরিয়ে রেখেছ এই কাজ করো না, আমাদের বিবস্ত্র হয়ে জল থেকে উঠে আসার জন্য বিবশ করো না। আমরা জানি অধর্মের কোন কাজ তুমি করবে না'। সেইজন্য আমাদের মনে যে নানা রকমের প্রশ্ন আসে শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের সঙ্গে যা করেছেন তাতে কোন দোষ হয় না, তখন সেটাই রাসলীলা হয়ে যায় আর আমরা করলে সেটা খারাপ, আমাদের চরিত্র নষ্ট হয়ে গেছে বলা হয়। না, ভগবান করলে রাসলীলা হবেই আর আমরা করলে সেটা আমাদের চরিত্র খারাপ বলা হবেই কারণ আমরা ধর্মজ্ঞ নই। শ্রীকৃষ্ণ ধর্মজ্ঞ, তিনি জানেন ধর্ম কি অধর্ম কি। আর শুধু তাই নয়, গোপীরা এর জন্য শ্রীকৃষ্ণকে কোন গালমন্দ করছেন না, তাঁকে নিন্দা বা তিরস্কার করছেন না। গোপীরা বলছেন 'আমরা জানি তুমি ধর্মজ্ঞ, তাই আমরা কখন কল্পনাই করতে পারি না যে তুমি অধর্ম আচরণ করবে'।

কিন্তু আমাদের মনে এখানে তাও একটা দ্বন্দ্ব থেকে যায় শ্রীকৃষ্ণ যেটা করছেন এটা যেন ধর্মের সাথে মিলছে না, যিনি ধর্মজ্ঞ তিনি অধর্ম আচরণ কি করে করছেন ইত্যাদি! আরও যেটা আশ্চর্যের গোপীদের মনে কিন্তু কোন লজ্জা সঙ্কোচ বলে কিছু নেই। গোপীদের সমস্ত লাজ লজ্জা যেন মিটে গেছে, গোপীদের ভাব আমরা তো সম্পূর্ণ তোমারই জন্য। বাংলায় প্রবাদ আছে তোমার ছাগল তুমি সামনে দিয়ে কাট আর পেছন দিয়ে কাট। তোমাকে আমরা ভালোবাসি, আমরা তোমার। এবার তুমি সবস্ত্র আমাকে গ্রহণ কর আর বস্ত্র ছাড়াই গ্রহণ কর সেটা তোমার ব্যাপার, আমাদের কাছে সবটাই সমান। গোপীদের মধ্যে সত্ত্বগুণের ব্যবধান তখনও ছিল, লজ্জার ভাব একটু হলেও থেকে গিয়েছিল। ঠাকুর বলছেন ঈশ্বর প্রেমে লজ্জা ঘৃণা ভয় তিন থাকতে নয়। গোপীদের ক্ষেত্রে এই লজ্জাটুকু হল সত্ত্বগুণের লজ্জা। গীতায় যে হ্রীর কথা বলা হয়েছে, যেটা মেয়েদের থাকতে হয়, সেই চক্ষুলজ্জাটা কোথাও গোপীদের মধ্যে থেকে গিয়েছিল। চক্ষুলজ্জা মানে আমি বোধ থেকে যাওয়া। আমি বোধ

মানে, আমি নারী তুমি পুরুষ এই ভেদ বোধটাও থেকে গেছে। এই 'আমি'টা যতক্ষণ পুরোপুরি না চলে যাবে ততক্ষণ তুমি কোথা থেকে আসবে! এক প্রেমিক প্রেমিকার কাছে এসেছে। দরজায় করাঘাত করতে ভেতর থেকে জিজ্ঞেস করছে 'কে?'। বাইরে থেকে উত্তর গেল 'আমি'। দরজা খুললো না। প্রেমিক ফিরে গেল। আবার একদিন এসে প্রেমিক দরজার বাইরে টোকা দিতে ভেতর থেকে জিজ্ঞেস করেছে 'কে?' বাইরে থেকে বলছে 'আমি', দরজা আবারও খুললো না। প্রেমিক ফিরে গেল। তৃতীয়বারও তাই হল। চতুর্থবার ভেতর থেকে বলেছে 'কে?' বাইরে থেকে বলছে 'তুমি'। দরজা খুলে গেল। কবির দাসের দোঁহাতে বলছেন *যব ম্যায় থা হরি নহি, যব হরি হ্যায় ম্যায় নহি*, যখন আমি ছিলাম তখন হরি ছিল না, যখন হরি আছেন তখন আমি আর নেই। *প্রেমগলি অতি সাঁকড়ি*, প্রেমের গলি অতি সংকীর্ণ *যাঁহা মে দো ন সমাহি*, প্রেমের গলি এতই সংকীর্ণ যে সেখানে দুই থাকতে পারে না একই শুধু থাকতে পারে। যিশুও একই কথা বলছেন এক খাপে দুটো তলোয়ার থাকতে পারে না। ঈশ্বর আর মানুষকে তুমি এক সঙ্গে সেবা করতে পারো না। ঈশ্বর দর্শনে আমিও থাকবো তুমিও থাকবে এটা হয় না।

গোপীরা তাই বলছেন, তুমি ধর্মজ্ঞ এভাবে তুমি আমাদের কষ্ট দিও না। শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের কথা শোনার পর খুব সুন্দর বলছেন ***ভবত্যো যদি মে দাস্যো ময়োক্তং বা করিষ্যথ। অত্রাগত্য স্ববাসাংসি প্রতীচ্ছন্তু শুচিস্মিতাঃ।।১০/২২/১৬।*** 'কুমারীরা! তোমরা যদি বল তোমরা আমার দাসী তাহলে আমি যেমনটি বলছি তেমনটি কর, এখানে এসে নিজেদের কাপড় নিয়ে যাও'। আমরা অনেক সময় আবেগবশতঃ অনেক কিছু বলে ফেলি, বলার পর দেখি আমি নিজেই আমার বাকজালে ফেঁসে গেছি। গোপীদের এটাই শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, তোমরাই তো বলছো তোমরা আমার দাসী, তাহলে চলে এসো, এসে কাপড় নিয়ে যাও। জলের মধ্যে তোমরা যে ঠাণ্ডায় কষ্ট পাচ্ছ এতে আমার তো কোন দোষ নেই, আমি তো বলছিই বস্ত্র নিয়ে যেতে। গোপীরা এখন নিজেদের কথাতেই ফেঁসে গেছেন। এদিকে ভোরের আলোয় চারিদিক ফর্সা হয়ে আসছে, ঠাণ্ডাতে কষ্টও পাচ্ছেন। কী আর করবেন শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনে গোপীরা তখন দুই হস্তে লজ্জাস্থান আবৃত করে এক এক করে জল থেকে উঠে এলেন।

তখন শ্রীকৃষ্ণ খুব মিষ্টি করে বলছেন ***যূয়ং বিবস্ত্রা যদপো ধৃতব্রতা ব্যগাহতৈতত্তদু দেবহেলনম্। বদ্ধাঞ্জলিং মূর্ধ্ন্যপনুত্তয়েংহসঃ কৃত্বা নমোঽধো বসনং প্রগৃহ্যতাম্।।১০/২২/১৯।*** 'তোমরা যে অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে ব্রত উদ্‌যাপন করছো এতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু নদীতে বিবস্ত্রা হয়ে স্নান করা তোমাদের কখনই উচিৎ কাজ হয়নি। এতে জলের দেবতা বরুণকে অসম্মান করা হয়েছে। এই পাপ বা দোষ নিবারণের জন্য এটাই তোমাদের প্রায়শ্চিত্ত, তোমরা এক এক করে মাথা নত করে দেবতার কাছে ক্ষমা চেয়ে বস্ত্র নিয়ে যাও'। এইভাবে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজাঙ্গনাদের মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে তাদের লজ্জা, সঙ্কোচ সব কাটিয়ে দিলেন। শ্রীকৃষ্ণের কথাতে তাঁরা কেউই রুষ্ট হননি। বরং এরপর থেকে গোপীরা কাপড় জামা পড়েই স্নান করতেন। শ্রীকৃষ্ণও জানতেন তাঁকে পাবার জন্যই ব্রজললনাগণ নিষ্ঠাভরে ব্রতপালন করছেন এবং সেই সঙ্কল্পে তাঁরা অবিচল। তাই গোপীদের সন্তুষ্ট করার জন্য বললেন 'তোমরা এখন ব্রজে ফিরে যাও। তোমাদের সাধনা সিদ্ধ হয়েছে আগামী শরৎকালের রাত্রিতে তোমরা আমার সাথে বিহার করবে, আর তোমরা তো এই উদ্দেশ্যেই ব্রত পালনে প্রবৃত্ত হয়েছিলে, তাই না'!

নদীতে বা জলাশয় বিবস্ত্র হয়ে স্নান করাকে মনুস্মৃতিতে খুব কঠোর ভাবে নিষেধ করা হয়েছে। নদী, পুকুর এগুলো কারুর নিজস্ব বাথরুম নয়, এগুলো বরাবরই ভারতে public place। বস্ত্রহীন অবস্থায় public placeএ স্নানাদি করাতে অনেক কিছু ব্যাপার জড়িয়ে যায়। কেন নিষেধ করা হয়েছে আমাদের সঠিক জানা নেই, তবে মনুস্মৃতিতেই প্রথম এই ব্যাপারে নিষেধ করা হয়েছে। মনুস্মৃতিতে যখন বিধান দেওয়া আছে, তার মানেই হল সমাজে ওই জিনিষ শত শত বছর ধরে চলে আসছিল। আর কোথাও সমাজে একটা দ্বন্দ্ব বা দ্বিধা ছিল কাপড় ছাড়া স্নান করা যায় কি যায় না। যখন বোঝা যাচ্ছে কাপড় ছাড়া উন্মুক্ত স্থানে স্নান করাটা কখনই শোভনীয় নয়, কারণ এতে অনেক কিছু ব্যাপার জড়িয়ে যায়। যখনই কোন ব্যাপারে সমাজের উপর একটা

বিধান তৈরী করে চাপিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন হয় তখন তার আগে ওনারা একটা সুন্দর কাহিনী বানিয়ে দেন। অথবা ওই কাহিনীকে আধার করে অন্য একটা জিনিষের দিকে নিয়ে বেরিয়ে যাবেন। যেমন বলা হয় রাত্রে ঘুমোতে যাওয়ার আগে পা ধুয়ে শুতে হয়। অনেকেই রাত্রে পা ধুয়ে বিছানায় শুতে যায় না। সরাসরি কাউকে পা ধুয়ে শুতে বললে কোন গুরুত্বই দিতে চাইবে না। তাই এই বিধান দেওয়ার আগে এর একটা কাহিনী তৈরী করে দিলেন। কি সেই কাহিনী?

দৈত্যদের জননী দিতি এক শক্তিশালী পুত্রের জন্ম দেওয়ার জন্য একটা ব্রত করছিলেন। এই পুত্র জন্ম নিলে ইন্দ্রকে কাবু করা যাবে। তাই দিতি বিরাট ব্রত পালন করছিলেন। এদিকে ইন্দ্র খুব দুশ্চিন্তায় পড়ে গেছেন, এই সন্তান জন্মালে হয়তো একদিন আমাকে মেরেই ফেলবে। তারপর থেকে ইন্দ্র তার সৎ মা দিতির ব্রত পালনের মধ্যে কোন দোষ পাওয়া যায় কিনা খুঁজতে শুরু করে দিলেন। একদিন দিতি সারাটা দিন উপবাস করে এবং নানা রকম ব্রত উদযাপন করে খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন, ক্লান্ত শরীরে সেদিন দিতি পা না ধুয়েই শুয়ে পড়েছেন। ব্যস্, ইন্দ্র সুযোগ পেয়ে গেছে। পায়ের ফাঁক দিয়ে ইন্দ্র দিতির গর্ভে প্রবেশ করে গর্ভস্থ সন্তানকে বধ করে দিয়েছেন। কিন্তু গর্ভ ছিল অমর, তাকে শেষ করে যাবে না। গর্ভকে ইন্দ্র সাতটা টুকরো করে দিলেন। সাতটা গর্ভ হয়ে গেছে, সাতটা বাচ্চা কাঁদতে কাঁদতে বলছে আমাদের মারছো কেন। ইন্দ্র বলছেন *মা রুদঃ*, তোমরা কেঁদো না আমি তোমাদের দাদা হই। সত্যিই তো দাদাই হয়, কারণ সৎ মায়ের সন্তান। তাতেও দেখছেন বাচ্চাগুলো খুব শক্তিশালী আছে। তখন ইন্দ্র সাতটা বাচ্চার প্রত্যেকটাকে সাতটা করে টুকরো করে দিয়েছেন। এবার যখন বাচ্চা জন্ম নিয়েছে তখন একটার জায়গায় ঊনপঞ্চাশটা বাচ্চা জন্মে নিয়েছে। ওখানেই সব শক্তি শেষ, যেখানে একটা বাচ্চা হওয়ার কথা ছিল সেখানে ঊনপঞ্চাশটা বাচ্চা জন্মেছে, একজনের একার শক্তি ঊনপঞ্চাশ জনে ভাগ হয়ে গেল। আর গর্ভেই ইন্দ্রিকে দাদা বলে মেনে নিয়েছে, শেষ পর্যন্ত সবাই ইন্দ্রের চেলা হয়ে গেল। পরে এরাই হয়ে গেল ঊনপঞ্চাশ মরুৎ, ঊনপঞ্চাশ রকমের বায়ু। বিদেশীরা এখন সবে সাইক্লোন, টর্নেডো করেই যাচ্ছে আর আমাদের পূর্বজরা আজ থেকে চার পাঁচ হাজার বছর আগে কত রকমের বাতাস হতে পারে বলে গেছেন। সেটাকে আবার তাঁরা কাহিনী রূপে দাঁড় করিয়ে গেছেন। কাহিনী রূপে কী করে দাঁড় করলেন? দিতি এত বড় কঠোর ব্রত করলেন, যে ব্রততে এক অমর শক্তিশালী সন্তানকে জন্ম দিতে যাচ্ছিল সেই ব্রতকেই ইন্দ্র নাশ করে দিলেন। কী করে? এই এক বছরের তপস্যাতে বেচারী একদিন মাত্র পা ধুয়ে রাত্রিবেলা বিছানায় শুতে যায়নি তাতেই ইন্দ্র সুযোগ পেয়ে দিতির গর্ভে ঢুকে গিয়ে একটি গর্ভস্থ সন্তানকে ঊনপঞ্চাশটি টুকরো করে দিলেন। এই গল্প এখন যারা শুনেছে তারা আর রাত্রে পা না ধুয়ে শুতে যাবে না।

এখানে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল শুচিতা। কিন্তু এমন এক কাহিনী বানিয়ে দেওয়া হল যাতে মানুষ আর ভুলে যেতে না পারে। এখন শ্রীকৃষ্ণ যমুনাতে গোপীদের কাপড় কেড়ে নিলেন এর অনেক রকম ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়ে দেওয়া যায়। কাপড় ছেড়ে স্নান করতে গেলে চোরে যদি কাপড় চুরি করে পালিয়ে যায় তখন তো এক মহা কেলেঙ্কারী হয়ে যাবে। বাড়িতে ফেরাই দায়। এটা হল প্রথম সমস্যা। দ্বিতীয় সমস্যা হল একজন খালি গায় জলে স্নান করে গেছে একই জলে স্নান করতে গেলে অন্যদের গা ঘিনঘিন করতে পারে। ব্যাসদেব যদিও গোপীদের পূর্ণ সমর্পণকে আধার করে কাহিনী এগিয়ে নিয়ে গেছেন কিন্তু তাঁর মনেও একটা দুশ্চিন্তা ছিল সাধারণ লোক এই কাহিনী পড়ার পর তাদের মনে অনেক রকম কুভাব জাগতে পারে। কোন রকম কুভাব যাতে মনে না আসে সেইজন্য তিনি এখানে বলছেন গোপীরা এভাবে বিবস্ত্র হয়ে স্নান করাতে বরুণ দেবতার প্রতি অসম্মান প্রদর্শিত হয়েছে, সেইজন্য শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের বরুণ দেবতার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিতে বলছেন, আর ভবিষ্যতেও এই রকমটি যেন আর না করে তার জন্য প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিচ্ছেন। সেই থেকে নিয়ম হয়ে গেল ভারতে মেয়েরা কোথাও কোন খোলা জলাশয়ে বিবস্ত্র হয়ে স্নান করবে না। যদিও তীর্থাদিতে ছেলেরা খালি গায়ে গামছা পড়েই স্নান করে কিন্তু মেয়েরা এখন আর ঐভাবে কখন স্নান করে না, সবস্ত্র স্নানই করে। এই অভ্যাস শুরু হয়েছে শ্রীকৃষ্ণের আগমনের পর থেকে। পরে মনুস্মৃতিতে আরও কঠোর ভাবে নিষেধ করা হয়েছে। অনেকে শ্রীকৃষ্ণের নিন্দা করে বলে যে তিনি নাকি গোপীদের বস্ত্র হরণ করেছিলেন। কিন্তু এদের এটা মাথায় আসেনা যে চীরহরণের মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণ মেয়েদের মধ্যে শালীনতার ব্যাপারে কত সচেতন করে

দিয়েছিলেন। চীরহরণের এটা একটা দিক, যেখানে একটা নতুন প্রথা শ্রীকৃষ্ণ নিয়ে এলেন – মেয়েরা যখনই কোন খোলা জায়গায় স্নানাদি করবে, নদীতে কিংবা পুকুরে, তখন তাদের সবাইকে সবস্ত্র স্নান করতে হবে।

ইত্যুচ্যুতেনাভিহিতং বজ্রাবলা মত্বা বিবস্ত্রাপ্লবনং ব্রতচ্যুতিম্। তৎপূর্তিকামাস্তদশেষকর্মণাং সাক্ষাৎকৃতং নেমুরবদ্যমৃগ্ যতঃ।।১০/২২/২০। শ্রীকৃষ্ণের কথায় গোপীদের হুঁশ হয়েছে, সত্যিই তো বস্ত্রহীন হয়ে স্নান করাতে আমাদের দোষ হয়ে গেছে, আমাদের ব্রত পালনে ত্রুটি হয়ে গেছে। তখন বলছেন প্রাণীদের সমস্ত কর্মের সাক্ষী স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীকৃষ্ণের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিলে তার কর্মের সব দোষ-ত্রুটি খণ্ডন হয়ে যায়। গীতাতেও ভগবান বলছেন আর পুরো হিন্দু ধর্মেই আছে যে, আমাদের প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয়ের একজন অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছেন। যদি কোন দেবতার প্রতি আপনার কোন দোষ হয়ে যায় আর সেই দেবতা যদি রুষ্ট হয়ে যান তাহলে সেই ইন্দ্রিয়টা দুর্বল হয়ে যায়, সেই ইন্দ্রিয় দিয়ে আর কোন কাজ করা যায় না। এখন যদি যাগ-যজ্ঞ করে, পূজা করে সেই দেবতাকে তুষ্ট করা যায় তাহলে ইন্দ্রিয়ের দোষটা কেটে যাবে। কিন্তু এখন আমরা এই রকম কত দেবতাকে খুঁজে বার করে পূজা অর্চনা করতে যাব! দেখা যাবে বাড়ির একজন দেবতা আছেন, বাড়ির ছাদের একজন দেবতা আছেন, মাটির দেবতা আছেন, খাটের দেবতা আছেন, বিছানার দেবতা আছেন, হিন্দুদের তেত্রিশ কোটি দেবতা। এই তেত্রিশ কোটি দেবতার কজনকে আমরা খুঁজে বেড়াব! এর থেকে বাঁচার একটাই পথ, সাক্ষাৎ ঈশ্বরের পূজা করলেই সব মিটে যাবে। তিনি হলে শেষ সাক্ষী, তিনি দেবতাদেরও সাক্ষী আবার আমার আপনার সবার সাক্ষী। আমাদের কাছে ঠাকুরই সব, তিনি সর্বদেবদেবীস্বরূপ, তাঁকে পূজা করলে সবারই পূজা হয়ে যাবে। আগে আমাদের ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, অগ্নি নানা রকম দেবতাদের পূজার প্রচলন ছিল, সেখান থেকে বিবর্তিত হয়ে হয়ে বিভিন্ন দেবতার পূজার ধারণাটা শ্রীকৃষ্ণের উপর চলে এসেছে। তবে ভাগবত গ্রন্থ পুরোপুরি ব্যাসদেবের সময়ই রচিত হয়েছে বলে মনে হয় না। পরের দিকে নিশ্চয়ই অনেক কিছুই এর মধ্যে সংযোজিত হয়েছে। যখন সংযোজিত হয়েছে তখন কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ পুরোপুরি ভগবান হয়ে গেছেন। সেইজন্য এখানে যে ধরণের বর্ণনা পাওয়া যাচ্ছে এগুলো পরের দিকের বর্ণনা বলে মনে করা হয়। কারণ ব্যাসদেবের সময়েও দেবতাদের মান, প্রতিপত্তি বেশী ছিল। আর কর্মসাক্ষী, শ্রীকৃষ্ণই কর্মসাক্ষী এই চিন্তা-ভাবনাগুলো আরও পরের দিকে হিন্দুদের মানসিকতায় পাকাপাকি ভাবে স্থান পেয়েছিল। যাই হোক গোপীরা এখানে শ্রীকৃষ্ণকেই নিখিল কর্মের সাক্ষীস্বরূপ রূপে দেখছেন এবং সমস্ত কর্মের সাক্ষী শ্রীকৃষ্ণকে গোপীরা প্রণাম করলেন। কারণ তাঁকে প্রণাম করলে তিনিই গোপীদের সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি, পাপ-দোষ, স্খলন-পতন থেকে উদ্ধার করবেন।

শ্রীকৃষ্ণ যখন দেখলেন আহা! এই সরলমতি গোপীরা আমার সব কথা মানল, যেমনটি তাদের করতে বললাম তেমনটি করল তখন তাঁর হৃদয়টা গোপীদের প্রতি করুণায় আর্দ্র হয়ে গেল। তখন তিনি গোপীদের সব বস্ত্র ফেরত দিলেন। ব্যাসদেব পরীক্ষিৎকে বলছেন ***দৃঢ়ং প্রলব্ধাস্ত্রপয়া চ হাপিতাঃ প্রস্তোভিতাঃ ক্রীড়নবচ্চ কারিতাঃ। বস্ত্রাণি চৈবাপহৃতান্যথাপ্যমুং তা নাভ্যসূয়ন্ প্রিয়সঙ্গনির্বৃতাঃ।।১০/২২/২২।।*** হে পরীক্ষিৎ! ঈশ্বরের প্রতি প্রেমাভক্তি গোপীদের মধ্যে কী অপরূপ ভাবে প্রকাশিত হয়েছে লক্ষ্য কর। শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের কত মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে কী না করলেন! কী নিষ্ঠুরের মত ছলনা করলেন, লজ্জা ত্যাগ করাতে বাধ্য করলেন, পরিহাসে বিদ্ধ করলেন এমনকি *ক্রীড়নবচ্চ কারিতাঃ*, পুতুল খেলার মত তাঁদের নাচালেন। কিন্তু গোপ ললনারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কোন দোষ খ্যাপন করলেন না বরঞ্চ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁদের ভালোবাসা যেন আরও বেড়ে গেল। হৃদয়ে ভগবৎপ্রেম উদয় হলে কী হতে পারে গোপীরাই তার জাজ্জ্বল্য দৃষ্টান্ত।

পরিধায় স্ববাসাংসি প্রেষ্ঠসঙ্গমসজ্জিতাঃ। গৃহীতচিত্তা নো চেলুস্তস্মিঁল্লজ্জায়িতেক্ষণাঃ।।১০/২২/২৩। এরপর গোপীরা শ্রীকৃষ্ণের সামনেই বস্ত্র দ্বারা তাঁদের অনাবৃত শরীরকে আচ্ছাদিত করে নিল। এই অবস্থায় যে কোন মেয়ের লজ্জায় পালিয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখ থেকে পালিয়ে যাওয়া দূরে থাক, এরপর গোপীরা এক পা চলতে পারলো না, সেখান থেকে চলে যাওয়ার ক্ষমতাটাই তাঁদের লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। জলের মধ্যে এতক্ষণ তাঁরা নিমজ্জ ছিলেন, সেখান থেকে বিনা বস্ত্রে তাঁরা উঠে এসেছেন, শ্রীকৃষ্ণ ওদের ক্ষমা চাওয়ালেন, ক্ষমা চাওয়ার পর কাপড় নিয়ে পরিধান করেছেন, কিন্তু তারপর আর তাঁরা সেখান থেকে নড়তে

পারছেন না। কারণ গোপীদের আর অবশিষ্ট বলে কিছুই ছিল না, সত্ত্বের আবরণ যেটা ছিল, যেটা মেয়েদের হ্রী, সেটাই চলে গেছে। এখন গোপী আর শ্রীকৃষ্ণ এক। রাগাত্মিকা ভক্তিতে ভক্ত আর ঈশ্বর এক হয়ে গেছেন। পরকীয়া প্রেমের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। যাদের এখনও শরীর বোধ আছে, যাদের অহং বোধ আছে তারা কী করে কাউকে ভালোবাসবে!

মানুষের ভালোবাসা হল ঘুড়ির লেজের মত। ঘুড়ি আর তার লেজ আলাদা, কিন্তু আঠা দিয়ে এঁটে দেওয়ার জন্য মনে হচ্ছে দুটো এক। একটা ছেলে আর মেয়ের মধ্যে যে ভালোবাসা হয় সেখানে এটাই হয়। দেখে মনে হয় দুজন এক, ঘুড়ি আর তার লেজের মত। কিন্তু দুটো আলাদা বস্তু। জাগতিক ভালোবাসা হল patch work। শাড়ি ছিড়ে গেছে, আরেকটা কাপড় এনে জুড়ে দিয়ে সেলাই করে দেওয়া হয়েছে। আমরা মনে করছি আমরা এক, কিন্তু কখনই এক নয়। ভালোবাসাটা আঠা, আঠা দিয়ে সেঁটে দেওয়া হয়েছে। কোন কারণে আঠা যদি ছেড়ে যায়, আঠা ছেড়ে যেতেই পারে, জল পড়লে, কোন কেমিক্যাল পড়লে, বেশী টানাটানি করলে আঠা খুলে যেতেই পারে। যতক্ষণ আঠা লেগে থাকবে ততক্ষণ মনে হবে আমি আর তুমি এক। জাগতিক ভালোবাসা আসলে আঠা ছাড়া কিছু না, আঠা দিয়ে জুড়ে রাখা হয়েছে, দুটো কখনই এক নয়। কিন্তু যেখানে শুদ্ধ ভালোবাসা, আত্মার ভালোবাসা সেখানে শুদ্ধ জলে যেন শুদ্ধ জল মিশিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এবার আলাদা করে দিলে কোনটা গেল আর কোনটা থাকল আর ধরা যাবে না। শ্রীকৃষ্ণ আর গোপীদের প্রেম শুদ্ধ জলে শুদ্ধ জল মিশে যাওয়ার মত। সতীর পতির উপর টান বা সন্তানের প্রতি মায়ের যে টান সেখানেও এই একই জিনিষ হয়, এখানে আধ্যাত্মিকতার ছোঁয়াটা পাওয়া যায় বলে এক মনে হয়। শ্লোকে একটা শব্দে বলছেন *গৃহীতাচিত্তা*, শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের মন এমন ভাবে টেনে নিয়েছেন যে, এখন গোপীদের মনে একটাই ইচ্ছা বাকী, কীভাবে সমাগম হতে পারে। প্রথম ধাপ বৈধী ভক্তি, বৈধী ভক্তি থেকে আসছে ব্যাকুলতা, ব্যাকুলতার পরে আসে সমর্পণের ভাব, সমর্পণের পরেই মিলন বা সমাগম, ভক্ত আর ইষ্টের এক হয়ে যাওয়া। গোপীরা এখন আর এই ইচ্ছা থেকে বেরিয়ে আসতে পারছেন না। গোপীদের এই অবস্থা দেখে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন ***সংকল্পো বিদিতঃ সাধ্ব্যো ভবতীনাং মদর্চনম্। ময়ানুমোদিতঃ সোহসৌ সত্যো ভবিতুমর্হতি।।১০/২২/২৫।*** হে সাধ্বী কুমারীগণ! তোমাদের মনে যে আমার সাথে মিলনের ইচ্ছা জেগেছে, আমার পূজা করাই যে তোমাদের সঙ্কল্প তা আমি জানি, আর আমি তা অনুমোদনও করছি। তোমাদের ইচ্ছা অবশ্যই পূর্ণ হবে।

পরের শ্লোকে চীরহরণ কাহিনীর অন্তর্নিহিত তাৎপর্যটা বলছেন ***ন ময্যাবেশিতধিয়াং কামঃ কামায় কল্পতে। ভর্জিতা ক্বথিতা ধানা প্রায়ো বীজায় নেষ্যতে।।১০/২২/২৬।*** এই শ্লোকেই পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে যে চীরহরণ কাহিনীতে কোন ধরণের সাংসারিক ভাব নেই। একেবারে বিশুদ্ধ ভক্তিকে চীরহরণ কাহিনীর মাধ্যমে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন 'যাঁরাই আমাকে পূর্ণ রূপে ভক্তি করেন, মন-প্রাণ যাঁর আমাতেই সমর্পিত তাঁর মন কোন অবস্থাতেই *কামঃ কামায় কল্পতে*, অর্থাৎ কোন কামনা-বাসনা তাঁর মনকে ভোগের দিকে কখনই আর নিয়ে যেতে পারবে না'। ঈশ্বরকে যে পূর্ণ রূপে ভালোবেসেছে তার মনের মধ্যে যে কামনা-বাসনাগুলো আছে সেগুলো কোন অবস্থায় আর ভোগের দিকে প্রেরিত করতে পারবে না। কামনা-বাসনা সবারই মধ্যে আছে, যাদের মধ্যে সংসারী ভাব রয়েছে এই কামনা তাদের নিয়ে যায় ভোগের দিকে। কিন্তু ঠাকুর বলছেন, এগুলো তো যাবার নয় এগুলোকে মোর ফিরিয়ে দাও। একমাত্র যাঁর ঈশ্বর দর্শন হয়েছে তাঁকে ছাড়া সবারই মধ্যে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ থাকবে। কাম আবার খুব সূক্ষ্ম ভাবে কাজ করে।

ঠাকুর বলছেন এগুলোকে মোর ফিরিয়ে দাও। এখন মোর ফেরাবে কী করে? ভাগবতে ব্যাসদেব বলছেন, যখন ভগবানের প্রতি মন প্রাণ সমর্পিত হয়ে যায় কাম তখনও থাকে, কিন্তু ভোগ্য বস্তুর দিকে তাকে আর নিয়ে যেতে পারে না। ধানের বীজ যদি সিদ্ধ করে দেওয়া হয় সেই ধান থেকে আর অঙ্কুরোদ্গম হবে না, গাছও হবে না। শাস্ত্রের ভাষায় একে বলে দগ্ধবীজ। বীজ আমার আপনার সবারই ভেতরে রয়েছে, সুযোগ পেলেই চাড়া মেরে বেরিয়ে আসবে। কিন্তু বীজটাকে সেদ্ধ করে দিলে ওর আকারটা থেকে যাবে কিন্তু ওই বীজ কোন কাজে আসবে না। ঠাকুরকে যখন হলধর বলছেন 'হ্যাঁরে গদাই! তোর সন্তানের উপনয়ন, বিয়ে কী করে

হবে’, শুনে তখন তিনি খুব অসন্তুষ্ট হয়ে গিয়েছিলেন। ঠাকুর বলছেন, এত শাস্ত্র পড়ে তোমার এই বুদ্ধি হল! আমার আবার সন্তান হবে! ঠাকুর আবার আরেকজনকে বলছেন আমার যে মাতৃযোনি। ঠাকুরের পুরুষ ভাবটাই পুরো নাশ হয়ে গিয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ এটাই বলছেন, যাঁর মন প্রাণ আমার প্রতি সমর্পিত সে কোন দিন আর সাংসারিক ভোগে লিপ্ত হতে পারবে না। সেইজন্য গোপীদের বলছেন ‘তোমাদের আর কোন চিন্তা নেই, তোমরা কোন দিন আর সংসারের ভোগের দিকে যাবে না, তোমরা চিরদিন আমারই হয়ে থাকবে’। শ্রীকৃষ্ণ এখানে ‘আমার’ কথাটা ব্যক্তি রূপে বলছেন না, ভগবান রূপে বলছেন। আর বলছেন ‘হে অবলাগণ! তোমরা এখন ব্রজে ফিরে যাও। তোমাদের সাধনা সিদ্ধ হয়েছে। আগামী শরৎ ঋতুর রাত্রে তোমরা আমার সঙ্গে বিহার করবে’। এটাই পরে গিয়ে রাসলীলা হয়েছে। রমণের যে আনন্দ তাকে বলছেন রস, সেই রস থেকেই হয় রাস। আবার ব্রহ্মের আরেক নাম রস, বেদে বলছেন *রসো বৈ সঃ*। ব্রহ্ম হলেন সচ্চিদানন্দ, আনন্দে পরিপূর্ণ। যেখানে পূর্ণ রসের আস্বাদন করা হয় সেটাকেই বলছেন রাস। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন শরৎ কালের রাত্রে রাস হবে, তোমাদের আমন্ত্রণ জানিয়ে রাখলাম। এই হল চীরহরণর প্রসঙ্গ।

চীরহরণ লীলার অন্তর্নিহিত ভাব

ভগবানের জন্ম ও কর্ম এই দুটোই দিব্য। ভগবানের সব লীলাই দিব্যলীলা। ব্রজলীলা, নিকুঞ্জলীলা, চীরহরণলীলা, রাসলীলা ইত্যাদি যত লীলা ভাগবতে বর্ণনা করা হয়েছে এর মধ্যে চীরহরণ আর রাসলীলা শুধু দিব্যলীলাই নয়, দিব্যাতিদিব্য লীলা। এই লীলা অত্যন্ত সংগোপনীয়, গুহ্যাতিগুহ্য। সর্বসাধারণের জন্য চীরহরণ আর রাসলীলা নয়। যাঁরা খুব অন্তরঙ্গ ভক্ত, চীরহরণ আর রাসলীলা শুধু তাঁদেরই জন্য। এই দুটি লীলাকে শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গলীলা বলা হয়। একটা বহিরঙ্গলীলা আরেকটি অন্তরঙ্গলীলা। যেমন মথুরা কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ যা করেছেন সেগুলি ছিল বহিরঙ্গলীলা, আর চীরহরণ ও রাসলীলা অন্তরঙ্গলীলা, অভক্তদের কাছে বা তাদের সামনে এগুলো নিয়ে আলোচনাও করতে নেই। স্বামীজী বলছেন যাদের মনে সামান্যতম কামগন্ধও আছে, যাদের মধ্যে এখনও দেহবোধ আছে তাদের জন্য এই গোপীকথা নয়, তারা কখনই যেন শ্রীকৃষ্ণ ও গোপীদের লীলার কথা শ্রবণ না করে।

সাধক সাধনা করতে করতে এমন একটা উচ্চ অবস্থা লাভ করে যখন সাধক ঈশ্বরের কাছে নিজেকে সম্পূর্ণ ভাবে সমর্পণ করে দেওয়ার জন্য উন্মুখ হয়ে ওঠে। সমর্পণ করাটা আবার ঈশ্বরের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। আমি ঈশ্বরের কাছে নিজেকে সমর্পণ করে দিতে পারি, কিন্তু ভগবান আমাকে গ্রহণ করবেন কিনা সেটা তাঁর উপর নির্ভর করে। গোপীরা শ্রীকৃষ্ণকে মন, প্রাণ সবই দিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু কোথাও একটা জায়গায় তাঁদের যেন একটু বাকি ছিল। চীরহরণে শ্রীকৃষ্ণ ওই বাঁধনটা খুলে দিলেন।

ঠাকুর প্রায়ই দুই ধরণের ভক্তির কথা বলতেন – বৈধি ভক্তি আর রাগাত্মিকা ভক্তি। বৈধি ভক্তি মানে বিধি, নিয়মানুসারে এত জপ করব, এত নৈবেদ্য দেব, এই অর্ঘ্য দেব ইত্যাদি। এইভাবে বৈধি ভক্তি করতে করতে ভক্তের হৃদয়ে রাগাত্মিকা ভক্তির উদয় হতে শুরু হয়। রাগাত্মিকা ভক্তি মানে ঈশ্বরের প্রতি গভীর অনুরাগ, প্রীতি। রাগাত্মিকা ভক্তির উদয় হলে তখন আর বিধি বৈধি থাকে না। তখন নিজের দেহবোধ তো থাকেই না আর ঈশ্বরের সঙ্গে তার পর অপর এই বোধটাও থাকে না। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গোপীদের যে অনুরাগ ও ভালোবাসা ছিল এটাই রাগাত্মিকা ভক্তির লক্ষণ। চীরহরণ কাহিনীর অন্তর্নিহিত ভাব হল, এই রাগাত্মিকা ভক্তির একটা গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণকে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর লীলার মধ্য দিয়ে ভাবী কালের আধ্যাত্মিক সাধকদের জন্য দেখিয়ে দিলেন। এভাবেই ভগবান যুগে যুগে তাঁর ভক্তকে কাছে টেনে নেন। চীরহরণ কাহিনীতে বৈধি ভক্তি আর রাগাত্মিকা ভক্তির মধ্যে যোগসূত্রটা কোথায় সেটাকেই স্পষ্ট রূপে তুলে আনা হয়েছে। বৈধি ভক্তিতে সব ফিটফাট্ কিন্তু রাগাত্মিকা ভক্তিতে কোন হুঁশ থাকে না – পূর্ণ আত্মনিবেদন। গোপীদের অতটুকু বাকী ছিল, চীরহরণ করে শ্রীকৃষ্ণ ঐটুকু উড়িয়ে দিলেন।

গোপীরা চাইছিলেন শ্রীকৃষ্ণে পূর্ণ আত্মনিবেদন। তাঁরা চাইছিলেন আমাদের শরীর, শরীরের প্রতিটি অঙ্গ, রোমকূপ যেন কৃষ্ণময় হয়ে যায়। আবার এক জায়গায় বলা হয়, যাঁরা ঋষি ছিলেন তাঁরাই গোপী হয়ে

ব্রজে জন্ম নিয়েছেন। তাঁরা সব সময় শ্রীকৃষ্ণের চিন্তা করে যাচ্ছেন, মুখে সর্বদা শুধু শ্রীকৃষ্ণের গুণকীর্তন আর শ্রীকৃষ্ণকেই তাঁরা তাঁদের স্বামী মনে করছেন, কৃষ্ণই আমার পতি। গোপীদের কারুর বিয়ে হয়েছে কারুর বিয়ে হয়নি, কিন্তু সবাই শ্রীকৃষ্ণকেই স্বামী রূপে মনে মনে বরণ করে রেখেছেন। লীলা দৃষ্টিতে যদি দেখা হয় তাহলে এই আত্মনিবেদনে কোথাও যেন একটু অভাব থেকে গেছে। কিসের অভাব? কোথাও যেন একটা আবরণের মত থেকে গেছে, যে আবরণের জন্য পূর্ণ আত্মনিবেদনটা হচ্ছিল না, হচ্ছিল না বলেই গোপীদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের সাথে একটা ভেদ ভাব থেকে গিয়েছিল। এই আবরণকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য শ্রীকৃষ্ণ চীরহরণ লীলার আশ্রয় নিয়েছিলেন। ঠাকুরের জীবনেও আমরা চীরহরণ লীলার সাযুজ্য পাই। নির্বিকল্প সমাধি লাভের পথে যখন মাকালীর মুর্তি ঠাকুরের সামনে এসে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছিল তখন তিনি জ্ঞানখড়্গ দিয়ে মাকালীর মুর্তিকে দ্বিখণ্ডিত করে দিলেন। নির্বিকল্প সমাধি লাভের পথে মাকালীর মুর্তি ঠাকুরের কাছে আবরণ হয়ে যাচ্ছিল। গোপীদের ক্ষেত্রেও তাঁরা যে কৃষ্ণময় হতে চাইছেন, শ্রীকৃষ্ণের সাথে এক হয়ে যেতে চাইছেন এই আবরণটা ছিল বলে কৃষ্ণময় হতে পারছিলেন না। তোতাপুরীকে যখন ঠাকুর বলছেন – আমি অখণ্ডে লীন হতে পারছি না, মাকালীর মুর্তি বারবার এসে যাচ্ছে। তোতাপুরী বলছেন – কেঁও নেই হোগা, আলবাৎ হোগা। তিনি একটা কাঁচের টুকরো দিয়ে ঠাকুরের কপালে জোরে আঘাত করে বললেন – ওই ব্যাথার মধ্যে মনকে কেন্দ্রীভূত কর আর জ্ঞানখড়্গ দিয়ে সব আবরণকে কেটে সরিয়ে দাও। দিতেই ঠাকুরের মন হু হু করে অখণ্ডের রাজ্যে বিলীন হয়ে গেল।

চীরহরণের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য এটাই, কাহিনীর মাধ্যমে শুধু উপস্থাপনা করা হয়েছে। এখানে ব্যাখ্যাকাররা খুব সুন্দর কথা বলছেন, সাধক নিজের সমস্ত শক্তি, সামর্থ, বল, সঙ্কল্প নিয়ে সব রকম সাধনা করে যাচ্ছে কিন্তু তাতেও পূর্ণ সমর্পণ হয় না। সমর্পণের ক্ষেত্রে শেষ একটা ব্যাপার থেকে যায়, যাঁর কাছে নিজেকে সমর্পণ করছে তিনি তাকে গ্রহণ করছেন কিনা। *যমেবৈষে বৃণুতে তেন্য লভ্যাঃ*, এটাই শেষ কথা। আমি সব কিছু দিয়ে নিজেকে পূর্ণ সমর্পণ করে দিয়েছি, কিন্তু এতেই সব হয়ে যাবে না। যাঁকে সমর্পণ করছি তিনি গ্রহণ করছেন কিনা দেখতে হবে। গোপীরা সব কিছু শ্রীকৃষ্ণকে সমর্পণ করে দিচ্ছেন, কিন্তু তাতেও আত্মসমর্পণ হচ্ছে না, কারণ শ্রীকৃষ্ণ তখনও তাঁদের গ্রহণ করছেন না, কারণ গোপীদের আর শ্রীকৃষ্ণের মাঝখানে একটা সংস্কারের আবরণ থেকে গেছে। তিনি নিজে এসে যখন এই সংস্কারের আবরণটা কেটে দেন তখনই পূর্ণ আত্মনিবেদন হয়। সাধকের কর্তব্য হল সমস্ত শক্তি, সামর্থ, বল, সঙ্কল্প নিয়ে সব রকম সাধনার দ্বারা প্রস্তুতি করে নিজেকে তৈরী রাখা। সমস্ত রকম প্রস্তুতি যখন নেওয়া হয়ে গেল, এরপর তিনি যখন ইচ্ছা করবেন তখন নিজে হাত বাড়িয়ে তাকে টেনে নেবেন। সাধক যখন নিজেকে অসহায় মনে করে, আমি তো আর পারছি না, তখনই তিনি এসে সাধকের হাতটা ধরে নেন। চীরহরণের এটা আধ্যাত্মিক দিক আর দ্বিতীয় দিক যেটা আমরা আগেই বলেছি – বস্ত্রহীন হয়ে প্রকাশ্য জলাশয়ে স্নান করাটা অত্যন্ত অশোভনীয় এবং স্মৃতিতেও নিষেধ করা হয়েছে। গোপীরা এই জিনিষটাই করে আসছিল বলে শ্রীকৃষ্ণ সেই কুপ্রথাটা বন্ধ করে দিয়ে নারীর শালীনতাকে রক্ষাকবচ দিয়ে লেন।

চীরহরণ লীলার তৃতীয় দিক হল – যত রকমের বৈধী ভক্তি হতে পারে তার সব কিছুর পরিসমাপ্তি হয় রাগাত্মিকা ভক্তিতে। রাগাত্মিকা ভক্তি মানে সমস্ত রকম বিধির পারে চলে যাওয়া। কিন্তু রাগাত্মিকা ভক্তিতেও শেষ হয় না, যতক্ষণ পূর্ণ সমর্পণ না হয় ততক্ষণ ফলটাও নাগালের বাইরে থাকে। বৈধী ভক্তির ফল রাগাত্মিকা ভক্তি, রাগাত্মিকা ভক্তির ফল আত্মসমর্পণ। সবাই বলছে ত্যাগ কর, ত্যাগ তো বাপু করে দেওয়া যাবে কিন্তু তাতে হবেটা কি? ত্যাগের তো একটা ফল চাই। ত্যাগ করলে কি জ্ঞান হবে? না, ত্যাগ করলে জ্ঞান কখনই হবে না। ত্যাগ হল একটা প্রস্তুতি, ত্যাগ আমাকে এক ধাপ এগিয়ে দেবে। যেমন জপ, ধ্যান করা মানে বৈধী ভক্তি। এই বৈধী ভক্তি করতে করতে একটা অবস্থায় তা রাগাত্মিকা ভক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে যাবে। রাগাত্মিকা ভক্তিও একটা ধাপ, এই ধাপে পৌঁছে সাধক নিজেকে প্রস্তুতি করবে। এরপরেই আসে আত্মসমর্পণ। আত্মসমর্পণে ভক্তের তুঁহু তুঁহু ছাড়া আর কিছু থাকে না, আর জ্ঞানী দেখেন আত্মা ছাড়া আর কিছু নেই।

ভাষ্যকাররা এই ধরণের নানা ব্যাখ্যা করার পর শেষে মূল কথা বলছেন – হিসাব করে যদি দেখা যায় তাহলে দেখা যাবে চীরহরণ লীলার সময় শ্রীকৃষ্ণের বয়স মাত্র আট বছর। একটি আট বছরের বাচ্চা ছেলে কাম-বাসনা প্রসূত হয়ে বস্ত্র হরণের মত একটা অশালীন কাজ করবে এটা কল্পনাই করা যায় না। কিন্তু যাঁরা খুব বড় মহাপুরুষ হয়েছেন, তাঁরা খুব কম বয়সেই শাস্ত্রের বিধান অনুযায়ী অনেক কিছু সমস্যার সমাধান করে দেওয়ার ক্ষমতা রাখতেন। চীরহরণ লীলাকে দুই ভাবে দেখা যায় – একটা হল লৌকিক দৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণ হলেন এমন একজন লোকত্তর মহাপুরুষ যিনি বাল্যাবস্থাতেই একটা সামাজিক কুপ্রথার বিলোপ করে দিচ্ছেন আর এমন ভাবে শিক্ষা দিলেন যাতে এই ভুলটি যেন আর কোন দিন তারা না করতে পারে। আরেকটি হল এর আধ্যাত্মিক দৃষ্টি। আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে গোপীদের মধ্যে পূর্ণ আত্মসমর্পণের পথে যে সংস্কার রূপ আবরণ ছিল সেগুলোকে সরিয়ে দিচ্ছেন। এই হল চীরহরণ লীলার মূল তাৎপর্য।

আত্মোৎসর্গে বৃক্ষের উপমা

এখানে অন্য একটা কথাপ্রসঙ্গে বৃক্ষ, গুল্ম, লতাদির বর্ণনা করতে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণ বন্ধুদের বলছেন ***পত্রপুষ্পফলচ্ছায়ামূলবল্কলদারুভিঃ। গন্ধনির্যাসভস্মাস্থিতোক্মৈঃ কামান্ বিতন্বতে।। এতাবজ্জন্মসাফল্যং দেহিনামিহ দেহিষু। প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়া বাচা শ্রেয় এবাচরেৎ সদা।।১০/২২/৩৪-৩৫।*** এই যে বৃক্ষলতাদি দেখছ এরা অপরের উপকার আর মঙ্গলের জন্যই দেহ ধারণ করে আছে। এদের সব কিছুই অন্য প্রাণীর উপকারে লাগে, এদের পাতা, ফুল, ফল, ছায়া, মূল, বল্কল, কাঠ, গন্ধ, নির্যাস, ভস্ম, অঙ্গার সব কিছু দিয়ে কোন না কোন ভাবে অপরের কামনা পূর্ণ করে। কত ঝড়, বৃষ্টি, রোদ উপেক্ষা করে শুধু অপরের সেবার জন্য সব কিছু দিয়ে যাচ্ছে। হে বন্ধুরা! তাঁদেরই জীবন ধন্য যাঁরা নিজেদের টাকা-পয়সা, কথাবার্তা, আচরণ সব কিছু দিয়ে সব সময় অপরের সেবা করে। স্বামীজী এটাই বলছেন They alone live who lives for others, rests are more dead than alive। এই যে গাছের একটা উপমা এনে ভাগবত বলছে অপরের জন্যই তোমার জীবনকে উৎসর্গ করবে। এই কথা অন্য প্রসঙ্গে নিয়ে আসা হয়েছে, এখানে চীরহরণের কোন ব্যাপার নেই। যেহেতু চীরহরণ অধ্যায়ে নিয়ে আসা হয়েছে সেইজন্য এই গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গটিকে এখানে উল্লেখ করা হল।

ইন্দ্রযজ্ঞ-নিবারণ

মুসলিম, বিশেষ করে সুফি সন্তদের জীবন আর হিন্দুদের মধ্যে যারা উচ্চ শ্রেণীর সন্ন্যাসী, তাঁদের সঙ্গে খুব একটা তফাৎ নেই। কিন্তু মুসলিমদের মধ্যে যারা খুব সাধারণ মানুষ, তাদেরকে পাঁচটা বিধি দিয়ে ধর্ম বেঁধে রেখেছে। তার মধ্যে একটা হল দিনে পাঁচ বার নমাজ পড়া। তুমি সন্ত মহাত্মা হবে কিনা, তুমি ভালো সাধু হবে কিনা এগুলোর কোন নিশ্চয়তা নেই, কিন্তু দেখতে হবে একটা স্তর থেকে তুমি যেন নীচে না পড়ে যাও। যেমন যারা ব্যবসা করে তারা টাটা বিড়লা নাও হতে পারে কিন্তু তারাও চেষ্টা করে দেউলিয়া যেন না হয়ে যাই। বৈধি ভক্তি এই কাজটাই করে। একটা ভালো অবস্থা থেকে কখনই আপনাকে খারাপ অবস্থাতে যেতে দেবে না। অনেকে রোজ মন্দিরে আসছে কিন্তু মন্দিরে এসে বসে বসে অনর্থক অন্য ধরণের চিন্তা করে। কিন্তু অনর্থক চিন্তা করুক, মন্দিরে নিয়মিত আসাটা তাকে ধরে রাখতে হবে। এই ভাবে ধরে রাখতে রাখতে কারুর কারুর রাগাত্মিকা ভক্তি এসেও যেতে পারে। রাগাত্মিকা ভক্তি না এলে প্রকৃত ভক্তি লাভ হবে না। আমরা আধ্যাত্মিকতা বলতে যেটা বুঝি, সেই আধ্যাত্মিকতা শুধু তাদেরই হয় যাদের হৃদয়ে ঈশ্বরের প্রতি রাগাত্মিকা ভক্তির উদয় হয়। কিন্তু বৈধি ভক্তি যদি আগে থেকে না করা থাকে তাহলে কোনদিনই রাগাত্মিকাতেও যেতে পারবে না। বৈধি ভক্তিতে আমি সব কিছু ঈশ্বরের চরণতলে দিয়ে যাচ্ছি কিন্তু প্রভু গ্রহণ করবেন কি করবেন না সেটা তাঁর উপর নির্ভর করে, কিন্তু রাগাত্মিকা তখনই হয় যখন তিনি সেটা গ্রহণ করে নেন। চীরহরণ কাহিনীতে ভক্তির এই দিকটা নিয়ে আলোচনা করা হল। ভক্তির আরেকটি রূপ কেমন হতে পারে সেই নিয়ে আমরা অন্য একটা কাহিনীকে আধার করে আলোচনা করছি – সেই কাহিনীটি হল শ্রীকৃষ্ণ একবার গোবর্ধন পর্বতকে নিজের কড়ে আঙ্গুলে তুলে নিয়েছিলেন।

চীরহরণের পর আসে ইন্দ্রযজ্ঞ নিবারণ লীলা। বৃন্দাবনের ব্রজবাসীদের পরম্পরাতে দেবতাদের রাজা ইন্দ্রের পূজা করা একটা বিশেষ প্রথা ছিল। বেদে দেবতাদের যখন স্তুতি করা হয় তখন দুটো রূপে তাঁদের স্তুতি করা হয়। কখন ব্রহ্ম রূপে স্তুতি করা হচ্ছে আবার কখন দেবতা রূপে স্তুতি করা হত। সেইজন্য এই সংশয় হওয়াটা স্বাভাবিক যে ব্রজবাসীরা ইন্দ্রকে কি ব্রহ্ম রূপে স্তুতি করতেন, নাকি একজন দেবতা রূপে স্তুতি করতেন? কিন্তু সাধারণ মানুষের কাছে ইন্দ্র একজন দেবতা রূপেই পূজিত হয়ে আসছিলেন। আমরা যে দেবতাদের কথা বলি, এই দেবতাদের একটা প্রকৃতি দ্বারা নির্মিত শরীর আছে, ভগবানের কিন্তু কোন শরীর হয় না। যজ্ঞে যখন কোন ইন্দ্রাদি দেবতাদের আহুতি দেওয়া হয় তখন সেই দেবতারা তাঁদের সেই প্রাকৃত শরীর নিয়ে সেখানে হাজির হন। যাই হোক, বৃন্দাবনবাসীরা বংশ পরম্পরায় ইন্দ্রের পূজা করে আসছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তখন নেহাৎই এক শিশু। সেই বাচ্চা ছেলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পালিত পিতা নন্দবাবার কাছে জানতে চাইছেন 'আমরা ইন্দ্রের পূজা কেন করি'?

মহম্মদের সময় মক্কাতে ৩৬৫ দেবী দেবতার মুর্তি ছিল। এক একটি দেবী দেবতারা যেন প্রকৃতির এক একটি জিনিষের বিগ্রহ স্বরূপ। সমস্ত লোকেরা ঘুরে ঘুরে প্রত্যেকটি দেবী দেবতার পূজা করত। মহম্মদ যখন হীরা পর্বতে সাধনা করে উপলব্ধি করলেন আল্লাই একমাত্র ঈশ্বর, আল্লা ছাড়া আর কোন দেবী বা দেবতা নেই তখন সমস্ত জনতা মহম্মদকে মারতে এসেছিল। মহম্মদকে তখন প্রাণ বাঁচাতে মক্কা থেকে মদিনা পালিয়ে যেতে হয়েছিল। কারণ মক্কার লোকেরা প্রস্তুত হয়েই ছিল সেদিন রাতেই মহম্মদকে মেরে ফেলা হবে। অনেক কায়দা করে কোন রকমে তিনি আর তাঁর দলের লোকেরা রাতের অন্ধকারে লুকিয়ে মদিনা পালিয়ে গিয়েছিলেন। মদিনাতে এসে তিনি তাঁর সাধনার দ্বারা উপলব্ধ দর্শনকে ধীরে ধীরে প্রচার করে একটা জায়গায় নিয়ে দাঁড় করাতে সক্ষম হলেন। এরপর মক্কা আর মদিনার মধ্যে হামেশাই লড়াই চলত। দু-একবার মহম্মদ হেরেও গিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত মক্কার অবস্থা সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়ে গেল তখন মক্কার লোকরাই মহম্মদকে এক প্রকার আমন্ত্রণ করে মদিনা থেকে নিয়ে এল। কোন লড়াই নেই, কোন রক্তপাত নেই, যারা মহম্মদকে প্রাণে মারতে চেয়েছিল তারাই এখন মহম্মদকে মক্কাতে নিয়ে আসতে চাইছে, তারা যেন মহম্মদের জন্যই অপেক্ষা করে আছে। মহম্মদ এসে প্রথমেই তাঁর বিশ্বস্ত শিষ্য আলিকে দিয়ে মক্কার একটা একটা করে পাথরের মুর্তিকে ধরছেন আর টেনে নামিয়ে ভেঙে চুরমার করে দিচ্ছেন। এই দেবতারা সব false gods. মিথ্যা দেবতা।

গীতাতেও ভগবান এই মিথ্যা দেবতাদের কথা বলছেন। কিন্তু হিন্দু আর ইসলামের মধ্যে এই জায়গাতেই তফাৎ হয়ে যায়। হিন্দুধর্মে বলে সাধারণ মানুষের বুদ্ধি এই রকমই হয়ে থাকে, বুদ্ধিভেদ করে প্রথমেই তাদের বিশ্বাসের জায়গাটাকে ধ্বংস করে দিতে নেই, এগুলোকে এভাবেই থাকতে দাও। মাঝে মাঝে অবতাররা এসে উচ্চ আদর্শ সামনে রেখে দিয়ে বলে দেন 'তোমরা যারা পারবে তারা এই উচ্চ আদর্শকে ধরে উপরে চলে এস'। যারা পারবে না তাদের জন্য তিনি আর কি করবেন! কিন্তু তাই বলে সব কিছু ভেঙ্গে দেবেন না। দেবী দেবতাদের মুর্তি ভাঙা দিয়েই পয়গম্বর মহম্মদের ধর্ম শুরু হয়েছিল বলে পরবর্তি কালে ইসলাম ধর্মে ধৈর্যের ব্যাপারটাই হারিয়ে গেল। কিন্তু সেই তুলনায় হিন্দু ধর্ম অনেক পুরনো ধর্ম, তাঁরা অনেক কিছু দেখেছেন। সাধারণ মানুষ বহুকাল ধরে যে বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরে সাধনা করে আছে, হুট্ করে একদিনেই গায়ের জোরে বিশ্বাসের জায়গাটা নাড়িয়ে দেওয়া উচিৎ নয়। কিন্তু পয়গম্বর বা অবতাররা তাঁদের আদর্শকে কখনই ছাড়বেন না। কখন-সখন তাঁরাও প্রয়োজনে মিথ্যাকে সরিয়ে একটা উচ্চ সত্যকে নিয়ে আসার জন্য কিছু কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকেন। ইন্দ্রযজ্ঞ নিবারণ লীলায় শ্রীকৃষ্ণ এটাই করেছেন যেটা পয়গম্বর মক্কাতে এসে করেছিলেন।

ইন্দ্র হলেন মিথ্যা দেবতা, এই দেবতার পূজা করার কোন দরকারই নেই। এই দর্শনকে ভিত্তি করেই শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রযজ্ঞ নিবারণ লীলা। সেইজন্য আমাদের দর্শন পড়া থাকলে বোঝা যায় মহম্মদ যে কাজটা করেছিলেন সেই কাজ করা যায় আর এতে অবাক হয়ে যাওয়ার মত মহম্মদ কিছু করেননি। নন্দবাবারা ইন্দ্র দেবতার পূজো করার জন্য নানা রকম উপকরণ সামগ্রী দিয়ে জোগাড়-যন্ত্র করেছেন। শ্রীকৃষ্ণ গিয়ে জিজ্ঞেস করেছেন 'বাবা! কার পূজার জন্য এত কিছুর আয়োজন করা হচ্ছে'? শ্রীকৃষ্ণকে নন্দবাবা বলছেন 'পুত্র! ইন্দ্র

দেবতা হলেন বৃষ্টির অধিপতি, আমরা তাঁর সন্তুষ্টির জন্যই এই পূজার আয়োজন করেছি। দীর্ঘকাল ধরে পরম্পরাক্রমে আমরা ইন্দ্রকে এইভাবে পূজা করে আসছি'। নন্দবাবার কথা শুনে শ্রীকৃষ্ণ তর্ক করতে শুরু করেছেন। 'বাবা! বৃষ্টির সঙ্গে ইন্দ্রের কি সম্পর্ক আছে, বৃষ্টি তো প্রকৃতির নিয়মে হয়'।

এই অধ্যায়টি ভাগবতের একটা বিশেষ অধ্যায়। ভারতবর্ষ এমন একটি দেশ যেখানে সব কিছুতে, এমন কি একটা হাঁচির পেছনেও একজন দেবতার কারণ অনুসন্ধান করে, সেখানে যখন ইন্দ্রের পূজোর আয়োজন করার উদ্যোগ চলছে আর শ্রীকৃষ্ণ এসে এই ধরণের একটা বিপ্লবাত্মক পদক্ষেপ নিয়ে ইন্দ্রের পূজো বন্ধ করে অন্য কিছু করতে বলছেন, তখনকার দিনে এ জিনিষ কল্পনাই করা যেতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণ নন্দবাবাকে বোঝাচ্ছেন, বৃষ্টি, রোদ, ঝড়, জল যা কিছু হচ্ছে সবই তো প্রকৃতির নিয়মেই হচ্ছে। প্রকৃতির ঘটনা হলেও প্রকৃতির পেছনেও একটা ঈশ্বরীয় শক্তি আছে, সেটাকে শ্রীকৃষ্ণ যুক্তিতর্ক দিয়ে নিয়ে আসছেন। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন ***কর্মনা জায়তে জন্তুঃ কর্মণৈব বিলীয়তে। সুখং দুঃখং ভয়ং ক্ষেমং কর্মণৈবাভিপদ্যতে*** *।।১০/২৪/১৩।* এই ব্যাপারে ভাগবত আর মহাভারতের এক মত। শ্রীকৃষ্ণ নন্দবাবাকে বলছেন 'প্রাণী মাত্রেই নিজের কর্মতেই জন্ম নেয় আর নিজের কর্মতেই মৃত্যুকে প্রাপ্ত করে। মানুষের সুখ, দুঃখ, ভয় আর ক্ষেম মানে মঙ্গল যেটা হয় সবটাই *কর্মণৈবাভিপদ্যতে*, নিজের কর্মের জন্যই পায়'। কারুর কিছু খারাপ হলে জ্যোতিষ শাস্ত্র বলবে আপনার এই গ্রহটা অত্যন্ত অশুভ থাকায় খারাপ সময় চলছে। জ্যোতিষীকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় এই গ্রহটা এলো কোত্থেকে? তখন জ্যোতিষী বলবে আপনি এমন সময় জন্মেছেন যে ঐ জন্মের হিসাবে গ্রহটা ঘুরে ঘুরে আপনার জন্মকুণ্ডলীতে ঐভাবে এসেছে। আমি এমন সময় জন্মালাম কেন? তার কারণ, আপনার আগের জন্মে যেমন কর্ম করা ছিল সেই অনুসারে ঐ সময়ে জন্ম নিয়েছেন। এই জন্মের তারিখটা শুধু আগের জন্মের সাথেই জুড়ে নেই, এর আগের আগের সব জন্মের সব কিছুকে হিসাবের মধ্যে ধরেই আপনার জন্মের ঐ মুহুর্তটা নির্ধারিত হয়ে আছে। আমরা কতকগুলো কর্মকে ঠেলে ঠেলে একটা জায়গায় নিয়ে দাঁড় করিয়েছি। এই মুহুর্তে আমার বর্তমানকে আমি কখনই পাল্টাতে পারব না। কিন্তু ভবিষ্যতটা আমার হাতে রয়েছে, ভবিষ্যতকে আমি পাল্টাতে পারি। সেইজন্যই বলা হয় শুভ কর্ম করে যেতে, দান, তীর্থ, সাধুসঙ্গ আর ঈশ্বরের নাম সব সময় করে যেতে হবে।

মহম্মদ মুসলমানদের জন্য খুব বাস্তব ও সহজ ধর্ম তৈরী করে দিয়ে গেছেন। তুমি তো কিছুই করতে পারবে না জানি, তাই তোমাকে দিনে পাঁচবার করে নমাজ পড়তে বলা হচ্ছে। এতে তোমার আল্লার নাম নেওয়া হয়ে গেল। জীবনে একবার হজ করে আসবে। তাতেই তোমার বিরাট বড় তীর্থ হয়ে গেল। তোমার বিশ্বাস যেন থাকে আল্লাই আছেন, আল্লা ছাড়া কিছু নেই। মহম্মদ সব থেকে বেশী জোর দিয়েছেন তোমার সারা মাসের উপার্জিত সম্পদের একটা অংশ যেন দীন, গরীব, দুখী মানুষের সেবায় যায়। এখানে কর্ম কীভাবে ভালো করতে বলছেন? এক, দানপূণ্য কর। দুই, সাধুসঙ্গ কর। আর তিন, ঈশ্বরের নাম করে যাও। এই তিনটে জিনিষ করতে থাকলে তোমার কর্ম পাল্টে যেতে শুরু হবে। যদি কারুর মনে হয় আমার দিনকাল খারাপ চলছে, আমাকে আরও উন্নতি করতে হবে। তাহলে তাকে এই কটি জিনিষ – দানপূণ্য, সাধুসঙ্গ ও সাধুসেবা আর ঈশ্বরের নাম করে যেতে হবে। মানুষ ভালো মতই জানে আমার জীবনে দুঃখ-কষ্ট আছে, এই দুঃখ-কষ্টকে দূর করার জন্য মানুষ একটা সীমা পর্যন্ত চেষ্টা করতে থাকে, কিন্তু সেই সীমার পর সে আর দুঃখ-কষ্টের বোঝা লাঘব করতে পারেনা।

সম্রাট হুমায়ুনের সন্তান হচ্ছিল না। সন্তানের আশায় সম্রাট এক মহাত্মার আশীর্বাদের জন্য যাবেন ঠিক করলেন। সেই মহাত্মার কাছে দেখা করতে হলে অনেক রাস্থা নগ্ন পদে বালির উপর দিয়ে হেঁটে যেতে হবে। সম্রাটও হাঁটছেন খালি পায়ে, তপ্ত বালিতে পা পুড়ে যাচ্ছে। কি করবে! তার সন্তান চাই। মানুষ যখন আর পারেনা, সব জাগতিক প্রচেষ্টা যখন নিঃশেষিত হয়ে যায় তখন গিয়ে সে ঈশ্বরকে ধরে। ঈশ্বরের কাছে পৌঁছানর সব থেকে সহজ পথ কি? সন্ত মহাত্মাদের খুঁজে বার কর। তিনি হলেন ঈশ্বরেরই জীবন্ত প্রতিমুর্তি, কারণ তাঁর সাথে ঈশ্বরের সরাসরি যোগ রয়েছে। সাধারণ মানুষ ঈশ্বর আর সন্ত মহাত্মাদের মধ্যে বেশী তফাৎ

বোঝে না। কারণ তারা তো ঈশ্বরকে দেখতে পায় না আর ঈশ্বর সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণাও নেই। আজমীর আর হজরত নিজামুদ্দিনে কত রকমের লোক যায় আর তাদের কত রকমের যে মানত কল্পনাই করা যায় না। তারা ভাবে আমি এখানে পৌঁছে গেছি, এখানে মাথা ঠুকছি, একটা দড়ি বেঁধে দিচ্ছ, একটা চাদর চড়িয়ে দিচ্ছি এতেই আমার সব কিছু সমস্যা দূর হয়ে যাবে। কারণ এখানে একজন পীরবাবা আছেন, ইনি কৃপা করলে আমার মানত পূর্ণ হবেই। কিন্তু ভাগবতে সাধুসঙ্গে এত সব কিছু হবার কথা বলা হচ্ছে না, বলছে যদি তুমি আধ্যাত্মিক উন্নতি চাও তবে সাধুসঙ্গ করতে হবে। তীর্থে যাওয়াটাও সাধুসঙ্গ। পয়গম্বর খুব সহজ সরল ভাষায় বলে দিলেন তোমরা এই পাঁচটি ধর্ম পালন করবে। যদি না পালন কর তাহলে তুমি ঠিক ঠিক মুসলমান নও। অন্য দিকে যেগুলো নিষেধ করা হচ্ছে তার তালিকা আবার বিরাট, তুমি মদ খাবে না, জুয়া খেলবে না, সুদ নেবে না ইত্যাদি। আমরা এগুলোও আলোচনা করছি না। আমরা এখানে মূল সিদ্ধান্তগুলো আলোচনা করছি, এই তিনটে জিনিষ, দান, সাধুসঙ্গ আর ঈশ্বরের নাম, এই তিনটে করলে জাগতিক কর্মগুলো পাল্টে যায় আর তার সঙ্গে ঈশ্বরের দিকে অগ্রগতির মাত্রাটা ত্বরান্বিত হয়। এখানে এটাই বলা হচ্ছে কর্মের দ্বারাই সব কিছু হয়।

আট ন বছরের বাচ্চা ছেলে নিজের বাবাকে বোঝাচ্ছেন ***অস্তি চেদীশ্বরঃ কশ্চিৎ ফলরূপ্যন্যকর্মণাম্। কর্তারং ভজতে সোঽপি ন হ্যকর্তুঃ প্রভুর্হি সঃ।।১০/২৪/১৪।*** বাবা! আপনি যদি মনে করেন এই কর্ম বাদে কোন স্বতন্ত্র ঈশ্বর আছেন *অস্তি চেদীশ্বরঃ কশ্চিৎ*, তাহলে সেই ঈশ্বরও কর্ম অনুসারেই ফল দেবেন, কর্মের বাইরে তো ফল দিতে পারবেন না। যারা কর্ম করছে না তাদের উপর তিনিও ডাণ্ডা ঘোরাতে পারবেন না। যেমন একজন কোন পাপ কর্ম করছে না, তখন যিনি ঈশ্বর আছেন তাকে তিনিও পাপের ফল দিতে পারবেন না। যখন মানুষ নিজের কর্মফল নিজেই ভোগ করছে তখন আমার ইন্দ্রে কিসের প্রয়োজন? আপনি যদি ভালো কর্ম করেন ঈশ্বর সেই কর্মের ফল আপনাকে দেবেনই দেবেন, এই নিয়ে আপনার চিন্তা করার কি আছে! কেন আপনি মিছিমিছি ইন্দ্রের পূজা করতে চাইছেন'? ***কিমিন্দ্রেণেহ ভূতানাং স্বস্বকর্মানুবর্তিনাম্। অনীশেনান্যথা কর্তুং স্বভাববিহিতং নৃণাম্।।১০/২২/১৫।*** জগতে যত প্রাণী আছে সবাই নিজের নিজের পূর্ব পূর্ব কর্মানুসারে সব কিছু করে যাচ্ছে। যার যেমন সংস্কার সেই সংস্কার অনুযায়ী সে কাজ করে যাচ্ছে। আমরাও যদি নিজের মত কাজ করে যাই তাহলে ইন্দ্রের আর কী ক্ষমতা আছে যে আমাদের কর্মের মধ্যে হস্তক্ষেপ করতে আসবে। আমি আমার সংস্কার অনুযায়ী কাজ করে যাচ্ছি, ভগবান তো তার ফল আমাকে দেবেনই। এমনকি তার জন্য ভগবানকেও যে আমাকে পূজা করতে হবে তার কোন মানে নেই।

এই জায়গাতে আমাদের কিছু জিনিষ বোঝার আছে। এখানে ইন্দ্রকে বোঝাচ্ছে anthropomorphic God অর্থাৎ দেবতা বা ঈশ্বরকে যখন মানুষ রূপে কল্পনা করা হয়। খ্রীশ্চান আর মুসলমানদের যে ঈশ্বর সম্বন্ধে অবধারণা, হিন্দুদের সাধারণ মানুষের যে ঈশ্বর সম্বন্ধে অবধারণা এটাই। দিল্লীতে যেমন একজন রাজা আছেন ঠিক তেমনি স্বর্গেও একজন রাজা আছেন। রাজা আবার দুই রকমের হয়, কোন রাজা খুবই দয়াময় বা কৃপাময় আবার কোন রাজা সব সময় তানাশাহী চালিয়ে যাচ্ছে। ঈশ্বরকেও আমরা কখন দেখি তিনি কৃপাময়, করুণাময় আবার কখন দেখি তিনি নির্দয়, কঠোর। তিনিই সব কিছু চালাচ্ছেন। আমরা কথায় কথায় বলি তাঁর ইচ্ছা, মানে ঐ রাজার ইচ্ছা ছাড়া কিছু হয় না। কিন্তু আদৌ ঈশ্বরের ইচ্ছা বলে কি কিছু হয়? মহম্মদ বলছেন লা ইলাহা ইল্লালাহা মহম্মদ রসুদুল্লাহা, মানে এক ঈশ্বর। ঠিক তেমনি হিন্দুরাও বলে তাঁর ইচ্ছা বিনা গাছের পাতাটিও নড়ে না। কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে? যখন আমরা বলি ঠাকুরের ইচ্ছাতেই হচ্ছে, সেখানে আমরা মনে করে নিচ্ছি আমার ইচ্ছা এক রকম ঠাকুরের ইচ্ছা আরেক রকম। আমরা মনে করছি আমি যেভাবে করতে চাইছি আর রাজা অন্য ভাবে করতে চাইছেন। মহম্মদ বিন তুঘলক যেমন দিল্লী থেকে রাজধানী দৌলতাবাদে নিয়ে যেতে চাইলেন, কিন্তু মানুষ থাকতে চাইছে দিল্লীতে। আমরাও ঠিক তাই মনে করি। আমি চাইছি এই রকম হোক কিন্তু জিনিষটা হয়ে যাচ্ছে অন্য রকম। তখন বলি ঈশ্বরের ইচ্ছা এই রকম। কিন্তু আসলে তা নয়। এই অর্থে কখনই ঈশ্বরের ইচ্ছাকে দেখা যায় না আর বোঝাও যায় না। আসলে সবটাই তাঁর ইচ্ছা। ঈশ্বর সম্বন্ধে এইসব ধারণা মুর্খদের। এগুলোর সঙ্গে ঈশ্বরের কোন সম্পর্ক নেই। হিন্দুদের ঈশ্বর সম্বন্ধে যে ঠিক ঠিক ধারণা তা হল সচ্চিদানন্দই আছেন, তিনি আছেন বলেই সব কিছু চলছে। কোন কিছুতেই তিনি

নিজেকে জড়ান না, তিনি যদি কোন কিছুতে নাই জড়ান তাহলে তাঁকে নিয়ে আমাদের এত লাফালাফি করার কি দরকার! স্বামীজী বলছেন খাটাখাটনি আমি করছি আর সব কিছুর কৃতিত্ব ভগাবান নিয়ে নেন, এটা কী ধরণের ন্যায়।

তাহলে কি ঈশ্বরের ইচ্ছায় কিছু হয় না? আসলে তা নয়, সব কিছু তাঁর ইচ্ছাতেই হয়। আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা বলে কিছু নেই। এই পাখা ঘুরছে তাঁর ইচ্ছাতেই, আলো জ্বলছে তাঁর ইচ্ছাতেই, আমি যে কথা বলছি তাঁর ইচ্ছাতেই। আমি যখন কোন কিছু চিন্তা করছি সেটাও তাঁর ইচ্ছাতে। আমি যদি ভুল কিছু চিন্তা করে থাকি সেটাও তাঁর ইচ্ছাতে, আমি যে কামনা-বাসনা করছি সেটাও তাঁর ইচ্ছাতে। তিনি হলেন বিশুদ্ধ আলো। এই বিশুদ্ধ আলোকে আমি দেখছি আমার বুদ্ধি যন্ত্র দ্বারা। কিন্তু বুদ্ধিটা হয়ে আছে কলুষিত। ঐ কলুষিত বুদ্ধির মাঝখান দিয়ে যখন শুদ্ধ আলোটা আসে তখন আলোটা পাল্টে যায়। সিনেমার প্রজেক্টর দিয়ে প্রথমে শুদ্ধ আলো আসে, ঐ প্রজেক্টরে যখন ফিল্মের রীল ঢুকিয়ে দেওয়া হয় তখন সেই আলোতেই দেখা যাচ্ছে একটা বাঘ ছাগলকে তাড়া করেছে। আমরা দেখছি একটা বাঘ ছাগলের পেছনে দৌড়াচ্ছে। ঐ শুদ্ধ আলোর সামনে একটা রঙিন ফ্রেম রাখা আছে। আমাদের বুদ্ধিটা হল রঙিন ফ্রেম। এই শুদ্ধ আলো যখন বুদ্ধির মাধ্যমে আমার কাছে আসছে তখন সেটা রঙিন হয়ে আসছে। আমি দেখছি বাঘ আর ছাগল। কিন্তু আসলে কি আছে? বিশুদ্ধ আলোই আছে। এবারে রীল ঘুরতে ঘুরতে যখন স্বচ্ছ ফিল্মটা এসে যায় তখন আমি কি দেখব? সেই শুদ্ধ আলোই দেখব। সাধনা করে করে মন যখন বিশুদ্ধ হয়ে যাবে তখন দেখব আমার ইচ্ছা আর ঈশ্বরের ইচ্ছা এক। তখন পরিষ্কার দেখতে পাব যাবতীয় যা কিছু হচ্ছে তাঁর ইচ্ছাতেই হচ্ছে। তার আগে মনে হবে কিছু জিনিষ তাঁর ইচ্ছাতে হচ্ছে, কিছু জিনিষ আমার ইচ্ছাতে হচ্ছে। কেউ দিল্লী থাকতে চাইছে আর রাজা দৌলতাবাদে নিয়ে যেতে চাইছে। আদপেই এই রকম হচ্ছে না। প্রায়ই ভক্তরা ঈশ্বরের ইচ্ছাকে ভুল বুঝে থাকেন। আমরা মনে করি আমরা এক রকম করছি আর তিনি আরেক রকম ভাবছেন। আদপেই তা নয়। আমাদের সামান্যতম ভাবনাটুকুও, আমাদের চোখের যে পাতাটা পড়ছে, চোখের এই পাতা পড়াটাও সেই বিশুদ্ধ চৈতন্য আছেন বলেই পড়ছে। তিনি না থাকলে জগৎটা শূন্য হয়ে যাবে। এই জগতে যা কিছু হচ্ছে সবই কর্মের দিক থেকে হচ্ছে। ঈশ্বর বলতে বোঝায় কর্ম নিয়ন্তা। গীতাতে তাই ভগবান বলছেন তিনি হলেন কর্মাধ্যক্ষ। তিনি কর্মাধ্যক্ষ আছেন বলে সবাই ঠিক ঠিক কাজ করছে। আর যে যেমন কর্ম করছে সেই অনুসারে সে সেই রকম ফলও পাচ্ছে। আমি কর্ম করলে আমার কর্মফল অন্যের কাছে চলে যাচ্ছে না কারণ তিনি উপরে কর্মাধ্যক্ষ রূপে বসে আছেন বলে।

এখানে এই ব্যাপারটাকে বলা হচ্ছে না। এখানে শ্রীকৃষ্ণ নন্দবাবাকে বোঝাচ্ছেন, উপরে ইন্দ্র নামে একজন ভগবান সুপার কম্প্যুটার নিয়ে বসে আছেন, তিনি সুপার কম্প্যুটারে হাত দিলেন সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি হতে শুরু করল, আবার হাত দিলেন সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি থেমে গেল। কিন্তু তা নয়, বৃষ্টি যেটা হচ্ছে সেটাও যেমন তাঁর ইচ্ছাতে হচ্ছে, বৃষ্টি থেমে যাওয়াটাও তাঁর ইচ্ছাতেই হচ্ছে। কারণ তিনি ছাড়া যে আর কিছু নেই। তিনি ছাড়া কিছু নেই বলে তাঁর ইচ্ছা ছাড়াও কিছু হয় না। তাহলে আমি কেন বলি আপনি কাজে ফাঁকি দিচ্ছেন। কেন বলি না তাঁর ইচ্ছাতেই আপনি কাজে ফাঁকি দিচ্ছেন। তার কারণ হল আমার মনও পরিষ্কার নয় আপনার মনও পরিষ্কার নয়। যদি আমার মন একেবারে বিশুদ্ধ হত তাহলে বলতে পারতাম তাঁর ইচ্ছাতেই আপনি কাজে ফাঁকি দিচ্ছেন। আপনারও যদি মন বিশুদ্ধ হত তাহলে বুঝতে পারতেন আপনি কেন কাজে ফাঁকি দিচ্ছেন। কাম ক্রোধের জন্য আমি বলছি আপনি ক্লাশ ফাঁকি দিয়ে চলে যাচ্ছেন। আমরা যা কিছু করছি তাঁর ইচ্ছাতেই করছি। কিন্তু যা কিছু হচ্ছে সব বুদ্ধি বৃত্তি দিয়ে হচ্ছে। বুদ্ধির দুটো কাজ, একটা চিন্তা ভাবনা করা আর দ্বিতীয় শরীরকে কাজে লাগান। বুদ্ধিটাই হল অশুদ্ধ। ফলে চিন্তা ভাবনা আর কর্মের যে ফসল সেটাও অশুদ্ধ। এই অশুদ্ধ ব্যাপারটা কীভাবে চলে? বলছেন কর্মের গতিতে চলে। এখানে ঈশ্বরের কোন হাত নেই।

শ্রীকৃষ্ণ বলছেন ***স্বভাবতন্ত্রো হি জনঃ স্বভাবমনুবর্ততে। স্বভাবস্থমিদং সর্বং সদেবাসুরমানুষম্।।*** *১০/২৪/১৬।* স্বভাব দুটো অর্থে হয়, স্বভাবের একটা অর্থ প্রকৃতি, আরেকটি অর্থ নিজের যে ভাব অর্থাৎ যার

যার নিজের পূর্বসংস্কার। গীতাতে যখন স্বভাবের কথা বলা হয় তখন তার অর্থ সব সময় হয় প্রকৃতি। যা কিছু চলছে সব প্রকৃতির নিয়মেই চলছে, আলো জ্বলছে প্রকৃতির নিয়মে, পাখা ঘুরছে সেও প্রকৃতি নিয়মানুসারেই ঘুরছে, আমি কথা বলছি, আপনারা শুনছেন তাও প্রকৃতির নিয়মে, সব কিছু স্বভাবেই চলে। এই প্রকৃতি দুই রকমের – বহিঃপ্রকৃতি ও অন্তঃপ্রকৃতি। বহিঃপ্রকৃতি হল প্রকৃতি, যেটা বাইরে দেখছি। অন্তঃপ্রকৃতি হল প্রাণীর সংস্কার। তাই যা কিছু হচ্ছে এর মধ্যে ঈশ্বর কোথাও জড়িয়ে নেই। হয় বহিঃপ্রকৃতি আমার উপর চাপ দিয়ে অনেক কিছু করাচ্ছে। আবার যদি চিন্তা ভাবনা করি আমি আজ কেন ভাগবত কথা শুনতে এখানে এসেছি, তাহলে দেখা যাবে এর আগের আগের জন্মে আমার এমন কিছু শুভ কর্ম করা আছে যে কর্ম আমাকে ধাক্কা দিয়ে এখানে ভাগবত কথা শোনার জন্য নিয়ে এসেছে। বাইরের প্রকৃতি দিয়ে আমাদের মধ্যে একটা শক্তি তৈরী হচ্ছে, সেই শক্তি দিয়ে আমরা অনেক কিছু করছি। আমাদের আবার অন্তঃপ্রকৃতির একটা শক্তি আছে। মুসলমানদের গরুর মাংস খেতে কোন অসুবিধা হবে না, কিন্তু হিন্দুরা পারবে না, এটাই অন্তঃপ্রকৃতি। এই অন্তঃপ্রকৃতি আবার বাইরে থেকে অনেক রকম প্রশিক্ষণ পেয়ে পেয়ে এই অবস্থায় নিয়ে এসেছে যে গরুর মাংস মুখে দিতে পারবে না। সব কিছুকে নিয়ে এনারা একটাই শব্দ ব্যবহার করেন তা হল 'স্বভাব'। এটাকে আমরা বহিঃপ্রকৃতি রূপেও নিতে পারি আবার অন্তঃপ্রকৃতি রূপেও নিতে পারি, কিন্তু এর মধ্যে শুদ্ধ চৈতন্যের কোথাও কোন ভূমিকা নেই। স্বভাব মানেই প্রকৃতি, বাহ্য ও অন্তঃ দুটোকে মিলিয়েই বলা হয়।

কেউ শুধু বাহ্যপ্রকৃতি নিয়ে বলবে আবার কেউ শুধু অন্তঃপ্রকৃতিকে নিয়ে বলবে, কেউ আবার দুটোকে মিলিয়ে বলবে। যেমন মানুষের ব্যক্তিত্বের ব্যাপারে বলে, একজন মানুষের ব্যক্তিত্ব কিসে হয়? প্রথম যখন জিনের ব্যাপার এল তখন সব কিছুতে বলা শুরু হল সব কিছু জিনের মধ্যে আছে, জিনই মানুষের ব্যক্তিত্ব তৈরী করে দিচ্ছে। তারপর দেখা গেল বাইরের পরিবেশ, তার ছোটবেলার শিক্ষা-দীক্ষা এগুলোও ব্যক্তিত্ব গঠনে বড়সড় ভূমিকা নিচ্ছে। আবার দেখা গেল সামাজিক প্রভাবও ব্যক্তিত্ব তৈরীর ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা নেয়। জন্মের সময় মা-বাবার কাছ থেকে কিছু জিনিষ এসেছে, তারপর আপনার প্রশিক্ষণ কেমন হয়েছে, আর কেমন ধরণের সমাজে আপনি বড় হয়েছেন, এই সব কিছু মিলিয়ে মানুষের ব্যক্তিত্ব তৈরী হয়। কিন্তু ঋষিরা সংক্ষেপে একটা শব্দ বলে দিলেন 'স্বভাব'। যা কিছু হচ্ছে স্বভাবে হচ্ছে। এরপর কেউ বাহ্যপ্রকৃতিই নিয়ে আসুক আর অন্তঃপ্রকৃতিই নিয়ে আসুক তাতে আমাদের কিছু আসে যায় না, আমাকে আমার পথে এগিয়ে চলতে হবে। ঝড় কেন হচ্ছে? স্বভাব। এখন আবহাওয়াবিদরা দেখতে থাকুন আরব সাগরে নিম্নচাপ হয়েছে নাকি বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ হয়েছে, এগুলো তাদের ব্যাপার। আমরা বলছি স্বভাব, প্রকৃতির নিয়মে ঝড় উঠেছে। এই লোকটি খুনোখুনি কেন করে? স্বভাব। তার মধ্যে এই রকম সংস্কার আছে। আপনি বলবেন, না না, আপনি জানেন ওর উপর কত অত্যাচার হয়েছিল! ওর পরিবেশ ও পরিস্থিতিই ওকে বাধ্য করেছে খুনোখুনি করতে। আরে ভাই সেটাও তো স্বভাবই। এখন আপনার বিশ্লেষণে যদি নেমে যাই, ওর জেনেটিকসে কি দোষ আছে, ওর নিউরোনে কি গোলমাল আছে, নাকি তার উপর সামাজিক কোন চাপ তৈরী হয়েছিল, কোন দিন এ সবের উত্তর পাওয়া যাবে না, বিজ্ঞানীরাই উত্তর খুঁজতে গিয়ে হিমশিম খাচ্ছে। এনার এটাই বলছেন স্বভাবে সব কিছু হচ্ছে। সবাই স্বভাবে আবদ্ধ হয়ে আছে।

শুধু মানুষই না, দেবতা আর অসুররাও সবাই নিজের নিজের পূর্ব পূর্ব সংস্কারের অধীন। নিজের স্বভাব, স্বভাব মানে প্রকৃতি, প্রকৃতি আর স্বভাব একই জিনিষ। স্বভাবটা কি? আমি যে কর্মগুলো করেছি, জন্ম জন্মান্তরে আমার বিভিন্ন যে কর্ম করা হয়েছে সেগুলো একদিকে নিয়ে যাচ্ছে আর কর্মফলের শক্তি আরেক দিকে নিয়ে যাচ্ছে। শ্রীকৃষ্ণ এটাই বলছেন দেবতা, অসুর, মানুষ সবাই স্বভাবেই স্থিত। বাবা! আপনাকে কি আর বলব! তবে জেনে রাখুন ***দেহানুচ্চাবচান্ জন্তুঃ প্রাপ্যোৎসৃজতি কর্মণা। শত্রুর্মিত্রমুদাসীনঃ কর্মৈব গুরুরীশ্বরঃ।।১০/২৪/১৭।*** কর্ম অনুসারেই জীব উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট শরীর পায়, আবার কর্মবশেই সে সেই শরীরকে ত্যাগও করে। কর্মের বিধান অনুযায়ীই জীব কারুর শত্রু, কারুর মিত্র, আবার কারুর সম্পর্কে উদাসীন হয়, আর সেই অনুসারে তাদের সাথে তার ব্যবহারও সেইরূপ হয়ে থাকে। কর্মই গুরু, কর্মই ঈশ্বর। সেইজন্য মানুষের উচিত সে যেন তার স্বাভাবিক কর্মকে কখন ত্যাগ না করে। স্বাভাবিক কর্ম ছাড়লে অনেক সমস্যার

উদয় হয়, কারণ মানুষ স্বাভাবিক কর্মে অবস্থিত থাকলে সুখে বাঁচে, জীবনযাত্রা সুখসাধ্য ও সুগম হয়, স্বাভাবিক কর্মই তার ইষ্টদেবতা। এমনকি শত্রু, মিত্র সব কর্মের দ্বারাই ঠিক হয়। স্বাভাবিক কর্ম মানে জন্মসূত্রে তুমি যে বর্ণে, যে আশ্রমে জন্ম নিয়েছ, সেই বর্ণ আর আশ্রমের ধর্ম পালন করা। তুমি তোমার স্বাভাবিক কর্ম করে যাও, কর্ম ছাড়া কিছু নেই। সেইজন্য বলছেন – ***তস্মাৎ সম্পূজয়েৎ কর্ম স্বভাবস্থঃ স্বকর্মকৃৎ। অঞ্জসা যেন বর্তেত তদেবাস্য হি দৈবতম্।।১০/২৪/১৮।*** মানুষ নিজের জীবিকা, যেটা দিয়ে খুব সহজে তার জীবনযাত্রা চালাতে পারে, সেটাই তার ইষ্ট দেবতা। আমরা প্রায়ই বলি ধর্ম কি, ধর্মের সংজ্ঞা কি? বর্ণাশ্রম ধর্মই ধর্ম, মনু স্মৃতিতে যেমন বলছে তোমার বর্ণের ধর্ম, আশ্রমের ধর্মটাই ধর্ম। কিন্তু এখানে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন যার জীবিকা সব থেকে সহজ ভাবে চলতে পারে সেটাই তার ধর্ম, সেটাই তার দেবতা। শ্রীকৃষ্ণের এই বক্তব্য কিন্তু বর্ণাশ্রম ধর্মের বিরুদ্ধে নয়।

একটা উপমার সাহায্যে বোঝা যাক। এক পরিবারে তিন ভাই আছে। এক ভাই বলছে আমার জ্ঞানার্জনের দিকে ঝোঁক, মানে পাণ্ডিত্যের দিকে মন। আরেক ভাই বলছে – আমার অত বিদ্যার দরকার নেই, আমি আমার শক্তি, ঐশ্বর্যকে দেখাতে চাই। তৃতীয় ভাই বলছে আমি এর কোন দিকেই যাবো না, আমি এমবিএ পড়ব, বিজনেসে টাকা ঢালব। তিন ভাইয়ের কি ধরণের জীবিকা হবে সেটা তাদের তিন রকম কথার দ্বারাই ঠিক হয়ে যাচ্ছে। যে ভাই বলছে আমার বেশী টাকা পয়সার দরকার নেই, আমি লেখাপড়া, বিদ্যার্জন নিয়ে থাকব, সে হয়ে গেল ব্রাহ্মণ বর্ণের। যে বলছে রাজনীতি করে আমার ক্ষমতা দেখাব সে হয়ে গেল একেবারে ক্ষত্রিয়। আর যে বলছে এমবিএ করবো সে পুরোপুরি বৈশ্য বর্ণের। এখানে এটা একবারে পরিষ্কার যে, বর্ণকে কিন্তু কোথাও কেউ অতিক্রম করে যাচ্ছে না। জন্মসূত্রে যে বর্ণে আমি রয়েছি সেটার বিরুদ্ধে হয়ত যাচ্ছে, কিন্তু ভারতে এটা কোন নতুন কিছু নয়। দ্রোণাচার্য নিজে ব্রাহ্মণ ছিলেন কিন্তু তাঁর মানসিকতার ঝোঁক যেদিকে ছিল সেই ঝোঁক তাঁকে নিয়ে গেল ক্ষত্রিয় কুলে। এই ধরণের জিনিষ নতুন কিছু নয় এগুলো আগে থেকেই আছে। কিন্তু তুমি যদি ঠিক করে থাক যে তুমি রাজনীতি নিয়ে থাকবে, যদি ভাব আমি রাজা হব, ঠিকে আছে তাই হবে, কিন্তু তোমার রাজধর্ম এই রকমের হবে। যদি তুমি অধ্যাপনা করতে চাও, খুব ভাল, কিন্তু অধ্যাপকের আচার আচরণের জন্য যে নুন্যতম বিধি নিষেধ আছে সেগুলিকে সঠিক ভাবে পালন করতে হবে। প্রথমেই প্রাইভেটে টিউশানি করার কথা ভাবা চলবে না। যখনই প্রাইভেট টিউশানি করছে তখন সে কিন্তু নিজেকে বৈশ্য বর্ণের মানসিকতার সঙ্গে যুক্ত করে ফেলল। আগেকার দিনে ব্রাহ্মণদের এত সম্মান কেন ছিল? তাঁরা অর্থের কথা চিন্তা করতেন না। এখনও যদি কোথাও দেখা যায় কোন শিক্ষক বা অধ্যাপক কোন প্রাইভেট টিউশানি করেন না, খুব ভালো পড়ান, সবার কাছে তাঁর কত সম্মান, সবার তিনি প্রিয় শিক্ষক হয়ে যান। ভারতে ব্রাহ্মণ মানেই হচ্ছে ত্যাগ। যিনি যত ত্যাগের পথ অবলম্বন করবেন তাঁকে সমাজ তত সম্মান করবে। রাজার একমাত্র কাজ শুধু প্রজার স্বার্থই দেখবে। যে এমপিরা নিজের লোকসভার মানুষের জন্য নিঃস্বার্থ ভাবে কাজ করে যান, তাঁরা কোন ভোটেই হারেন না। আবার যেসব ব্যবসায়ী প্রচুর টাকা মুনাফা করছে সাথে সাথে অনেক সেবামূলক, দাতব্যমুলক কাজে প্রচুর অর্থ সাহায্য করে যাচ্ছে তারা যে কত বড় হয়ে যেতে পারে কল্পনা করা যায় না। শূদ্র মানে, গীতাতে ভগবান বলছেন *পরিচর্যাত্মকং কর্ম*, বর্তমান কালে যত হোটেল ম্যানেজমেন্ট, রেলওয়ের ক্যাটারিং, এয়ারওয়েজ কোম্পানী যে যত আপনাকে সেবা করবে যত বেশী মনযোগ আপনার প্রতি দেবে তাদের তত বেশী কদর। এটাই স্বাভাবিক।

এক সাধুবাবা ছিলেন। তিনি ঈশ্বরের পরম ভক্ত। এক নির্জন প্রদেশে একটা মন্দিরে একাকী পড়ে থাকতেন। মন্দিরের পাশেই একটা বাড়িতে এক সুন্দরী স্ত্রী থাকত। সেই মহিলা একদিন রাত্রিবেলা এসে সেই সাধুবাবাকে বলছে 'বাবা! আমি তোমাকে ভালোবেসে ফেলেছি, তুমি আমায় গ্রহণ কর'। সাধুবাবা শুনে আঁৎকে উঠেছেন 'তুমি একি বলছ! তুমি বিবাহিতা। ঘরে তোমার স্বামী রয়েছে। এত রাত্রে এখানে কেন এসেছ! যাও বাড়ি যাও'। মহিলাটি বলছে 'ও! তুমি আমাকে এই কথা বলছ! ঠিক আছে'। মহিলাটি বাড়ি চলে গেল। কিছুক্ষণ পর সেই স্ত্রী একটা রক্ত মাখা খাঁড়া হাতে করে আবার এসেছে। 'আমার স্বামী আছে বলে তুমি আপত্তি করছিলে তো। আমার স্বামী আর নেই, আমার স্বামীর গলাটা কেটে চলে এসেছি, এবার তুমি আমায়

গ্রহণ কর’। সাধুবাবা তো চমকে গেছেন ‘তুমি এ কি কাণ্ড করেছ’! মেয়েটি এবার জোর চেঁচাতে শুরু করেছে। চেঁচিয়ে বলছে ‘কে আছ আমাকে বাঁচাও। এই সাধুবাবাটি সাধু সেজে বসে আছে আর আমাকে পাওয়ার লোভে আমার স্বামীকে খুন করেছে’। মাঝ রাতে সব লোক দৌড়ে এসেছে। মেয়েটির স্বামী মরে পড়ে আছে আর মেয়েটি চিৎকার করছে। সাধুবাবাকে রাজার কাছে ধরে নিয়ে যাওয়া হল। রাজা দেখছেন সাধু এই রকম গর্হিত কর্ম করেছে। রাজা বলছেন ‘সাধু বলে একে প্রাণদণ্ড দেওয়া ঠিক হবে না। কিন্তু এত ঘৃণ্য কাজ করেছে বলে এর দুটো হাতই কেটে দেওয়া হোক’। তারপর সাধুর দুটো হাত কেটে দেওয়া হল, অথচ বেচারার কোন দোষই নেই। সাধুবাবা গিয়ে এখন ঠাকুরের কাছে কান্নাকাটি করছে ‘হে ঠাকুর এটা কি হয়ে গেল’! তখন ঠাকুর সাধুবাবাকে দর্শন দিয়ে বলছেন ‘এই স্ত্রী গত জন্মে একটা গরু ছিল। তাকে একটা কষাই টেনে নিয়ে যাচ্ছিল বধ করবে বলে। গরুটা কোন রকমে কষাইর হাত ছেড়ে পালিয়ে গেছে। কষাই গরুর পেছনে দৌড়াচ্ছে। তখন রাস্তায় তোমার সাথে দেখা হলে তোমাকে কষাই জিজ্ঞেস করেছিল গরুটা কোন দিকে গেছে। তুমি দেখিয়ে দিলে ঐ দিকে গেছে। তারপর কষাই গরুটাকে ধরে নেওয়ার পর জবাই করেছে। এই জন্মে কষাইটা তার স্বামী হয়েছে আর গরুটা তার স্ত্রী হয়েছে। এই জন্মে পাল্টাপাল্টি হয়ে এক অপরকে মারল আর তুমি হাত দিয়ে গরুটাকে দেখিয়ে দিয়েছিলে বলে তোমার হাতটা কাটা গেছে। তবে তুমি চিন্তা করো না, আমি তোমার সঙ্গেই আছি’।

এগুলো কাহিনী, কিন্তু কর্মের ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য এই ধরণের কাহিনীকে দিয়ে সহজে বুঝিয়ে দেওয়া যায়। কেন এই রকম হল? কারণ গত জন্মে তুমি এই রকম করেছিলে। এখানে শ্রীকৃষ্ণ তাই বলছেন, মানুষ আগের আগের জন্ম যেমন কর্ম করে থাকে এই জন্মে তার সব কিছু ঠিক সেই ভাবেই চলে। এটা একটা দিক গেল। দ্বিতীয়তঃ মানুষ যেমনটি ধর্ম কর্ম করেছে তেমনটি তার জন্ম হয়। সেইজন্য তার সহজ পথ হল স্বধর্ম পালন করা। কার জন্য সহজ পথ? যে ঈশ্বরের পথে এগোতে চাইছে। তুমি যদি ঈশ্বরের পথে যেতে না চাও তাহলে তোমার জন্য এসব নয়। তুমি যদি ঈশ্বরের পথে যেতে চাও তাহলে ব্রাহ্মণ হলে তুমি ব্রাহ্মণের ধর্ম পালন করবে, যদি ক্ষত্রিয় হও তাহলে ক্ষত্রিয়ের ধর্ম পালন করবে। কিন্তু ভোগই যদি তোমার জীবনের উদ্দেশ্য হয় তাহলে বর্ণাশ্রম ধর্ম তোমার জন্য নয়। বর্ণাশ্রম ধর্ম তাদেরই জন্য যারা ধর্ম পালনের দ্বারা আধ্যাত্মিক বিকাশ পেতে চাইছে। গীতার ভাষ্যে আচার্য শঙ্করও এক জায়গায় বলছেন বর্ণাশ্রম ধর্ম তাদেরই জন্য যারা ধর্ম মানে। হিন্দুরা আবার সব কিছুকে বেঁধে রেখেছে, তুমি ধর্ম মান আর নাই মান তোমাকে এগুলো পালন করতে হবে। কারণ তাতে আমাদের সমাজে স্থিতি থাকবে।

শ্রীকৃষ্ণ তাই বলছেন যেটা তুমি সহজ ভাবে নিজের জীবন চালনার ক্ষেত্রে কাজে লাগাতে পারবে সেটাই তোমার ধর্ম, এটা গেল প্রথম। দ্বিতীয় হচ্ছে ওতেই লেগে থাক, নিজেকে উজাড় করে সেখানে মন প্রাণ ঢেলে দাও। তারপর ঐ কাজে যে ধর্ম অর্থাৎ বিধি-নিষেধ নির্দিষ্ট করা আছে সেগুলিকে ঠিক ঠিক ভাবে পালন করে যাও। সুতরাং বর্ণের কোন পরিবর্তন হচ্ছে না। একই বর্ণে শত শত জাতি থাকতে পারে। এখন একই বংশে তিন ভাই তিন বর্ণের হবে। এরপরে তাদের যে ছেলেমেয়েরা আসবে প্রথম চেষ্টা হবে বাবার জীবিকাকে ধরে রাখা, সেই দিকে যদি না যেতে চায় তাহলে তার মনের যে স্বাভাবিক ঝোঁক সেই দিকে এগিয়ে গিয়ে তাতেই জোর দিয়ে সেই বৃত্তির ধর্মকে ঠিক ঠিক ভাবে পালন করে যাওয়টাই হবে তার প্রধান কাজ।

সেইজন্য শ্রীকৃষ্ণ বলছেন – দেখুন বাবা, আমাদের কাজ হল পশু পালন, আর সামান্য চাষবাস। আমরা যে গরু মোষ পালন করে আসছি আমাদের উচিৎ কেবল মাত্র ওই দিকেই পুরো জোর দেওয়া। বাবা! আমাদের তো রাজ্য নেই, টাকা-পয়সাও নেই। আমাদের কাছে গোবর্ধন পর্বতই সব, আমরা গোবর্ধন পাহাড়ের পূজো করব। ইন্দ্রের পূজোর জন্য যা কিছু আয়োজন করেছেন, নানান রকমের খাওয়া দাওয়া আনুষাঙ্গিক যা কিছু আছে এগুলো সব গিরিরাজ গোবর্ধনের নামে অর্পণ করে দিয়ে সবার মধ্যে বিতরণ করে একটা বিরাট ভাণ্ডারা দিয়ে দিন। এখান থেকেই মেলার ধারণা জন্ম নিল। পাহাড়ের পূজা হয়ে গেল, আশেপাশের যত গ্রাম্য মহিলা পুরুষ ছেলে মেয়ে সব সুন্দর সুন্দর নতুন জামা কাপড়ে সেজেগুজে জড়ো হয়ে খাওয়া দাওয়া করে

আনন্দ করতে লাগল। শেষে গোবর্ধনের প্রদক্ষিণ করা হল, গোবর্ধনের পূজো করা হল। এখনও ভক্তরা গোবর্ধন পর্বতকে পরিক্রমা করে, পূজো করে। তখন গোবর্ধন নিজেই ব্রজের লোকদের সামনে প্রকট হয়ে সবার শুভ কামনা করলেন। এখানে খুব সুন্দর একটা শ্লোকে বলা হচ্ছে ***এষোঽবজানতো মর্ত্যান্ কামরূপী বনৌকসঃ। নন্তি হ্যস্মৈ নমস্যামঃ শর্মণে আত্মনো গবাম্।।১০/২৫/৩৭।*** যে বনবাসীরা গোবর্ধন পাহাড়ের নিরাদর করবে তারা বিনাশ হয়ে যাবে। এটাই হল পরিবেশ সচেতনতার বার্তা। এখন অনেকেই আলোচনা করতে শুরু করেছেন, হিন্দুদের যে পাহাড় পূজো, নদীর পূজো, বৃক্ষের পূজো, পুকুরের পূজো এই পূজোর সাথে পরিবেশ সচেতনতার একটা যোগ রয়েছে। মানুষ ও তার গৃহপালিত পশুরা সবাই এদের আশ্রিত, এরা আমাদের জীবন ধারণের উপকরণ সরবরাহ করছে তাই এদের অবহেলা করা ঠিক নয়। শ্রীকৃষ্ণও তখন গোবর্ধন পূজার প্রবর্তন করলেন। আর সেদিন ব্রজের গোপ ও গোপীরা যে গোবর্ধন প্রদক্ষিণ শুরু করলেন, আজও যাঁরা বৃন্দাবনে যান এখনও তাঁরা এই ভাবে গোবর্ধন পর্বতকে পরিক্রমা করেন।

এদিকে দেবরাজ ইন্দ্রের পূজা বন্ধ করে দেওয়াতে স্বাভাবিক ভাবেই তিনি এখন খুব কুপিত হয়ে গেছেন। রেগে গিয়ে ইন্দ্র বৃন্দাবনে প্রচণ্ড বর্ষণ শুরু করলেন। বৃষ্টির জলে সব কিছু জলমগ্ন হয়ে যেতে শুরু হল। ব্রজের সবাইকে আশ্রয় দেওয়ার জন্য শ্রীকৃষ্ণ তখন নিজের কড়ে আঙুলে গোবর্ধন পাহাড়কে তুলে ধরেছেন। সবাই সেই গোবর্ধন পাহাড়ের তলায় গিয়ে আশ্রয় নিল। আমাদের মনে রাখতে হবে এখানে কোন ইতিহাস লেখা হচ্ছে না। এখানে কাব্যের মাধ্যমে একটা জিনিষের স্তুতি করা হচ্ছে। পৌরানিক কথা যেমন ভাবে উপস্থাপনা করা হবে তাকে সেভাবে গ্রহণ করাটাই উচিৎ।

এই কাহিনী অনেকের অযৌক্তিক মনে হতে পারে, আবার অনেকের মনে সন্দেহ হতে পারে একটা বাচ্চা ছেলে কড়ে আঙুলে বিশাল একটা পাহাড়কে তুলে ধরবে, একি কখন সম্ভব! এর সহজ উত্তর একটাই – তিনি ভগবান, সর্বশক্তিমান, তাঁর কাছে অসম্ভব বলে কোন কিছুই নেই। আরেকটা সম্ভাবনা থাকতে পারে, যখন যোগীরা যোগ অভ্যাস করেন, তখন তাঁদের মধ্যে অনেক ধরণের যোগ শক্তি এসে যায়। শ্রীকৃষ্ণের নামই যোগীশ্বর, সুতরাং তাঁর এই শক্তি থাকা অস্বাভাবিক নয়। তৃতীয় একটা সম্ভবনা থাকতে পারে, শ্রীকৃষ্ণ যখন গোবর্ধন পাহাড়ে গরু চড়াতে যেতেন, ওখানে গোপ বালকদের সাথে খেলা করার সময় তাঁর সব নখদর্পণে থাকতে পারে পাহাড়ের কোথায় বড় বড় গুহা আছে, যখন ঘর বাড়ি ভেঙ্গে যাচ্ছে তখন সবাইকে নিয়ে ঐসব গুহাতে ঢুকিয়ে দিয়ে বললেন তোমরা এই প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় এই গুহাতেই থাক। এই কাহিনীটাই হয়তো পরবর্তি কালে বাড়তে বাড়তে এই ভাবে একটা আখ্যায়িকায় দাঁড়িয়ে গেল, যুক্তিবাদী মন এটাকেই বেশী পছন্দ করবে। তৃতীয় যুক্তিটাকে যদি মেনে নেওয়া যায় তাহলে এটাই শ্রীরামকৃষ্ণের ব্যক্তিত্বের সঙ্গে খাপ খেয়ে যাবে। ঠাকুরের কাছে এসে যদি কেউ বলে তুমুল বৃষ্টি হচ্ছে কোথায় যাব, কি করব বুঝতে পারছি না। ঠাকুর বলবেন – ঐ ঘর রয়েছে ওখানে ঢুকে পড়। বিভিন্ন অবতারে বিভিন্ন রকমের লীলা হয়। মূল কথা একটাই। আমরা এখানে ভক্তিশাস্ত্র পড়ছি। ভক্তিশাস্ত্রে তিনি যে শুধু পাহাড়কেই তুলে নেবেন তা নয়, তাঁর ইচ্ছা হলে তিনি সব কিছুই করতে পারেন।

রাসলীলা

রাসলীলার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

এরপর আসছে শ্রীমদ্ভাগবতের বিখ্যাত অধ্যায় 'রাসলীলা'। রাসলীলা সম্বন্ধে আলোচনা করার আগে আমাদের ভাগবত সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি কথা জেনে নেওয়া দরকার। ভাগবতের দশম স্কন্ধের পুরোটাই শ্রীকৃষ্ণলীলা। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অবতার রূপে কংসের কারাগারে জন্ম নেওয়া থেকে তাঁর পার্থিব লীলার শেষ দিন পর্যন্ত যা কিছু লীলাকথা সবই এই দশম স্কন্ধে বর্ণনা করা হয়েছে। ভাগবত যখন খুব সংক্ষেপে পাঠ করা হয় তখন এই দশম স্কন্ধই পাঠ করা হয়। আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে ভাগবতের দশম স্কন্ধ অত্যন্ত উচ্চমানের। প্রথম কথা ভাগবতের ভাষা অত্যন্ত কঠিন, বলাই হয় যে ভাগবতে এসে পণ্ডিতদের পাণ্ডিত্যের পরীক্ষা হয়ে যায়। দ্বিতীয় কথা ভাগবতের প্রত্যেকটি শ্লোককে এবং শ্লোকের কিছু কিছু শব্দকে অনেক ভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। তৃতীয় কথা ভাগবতের দশম স্কন্ধে ভাবেরাজ্যের যে বর্ণনা আমরা পাই, আমাদের মত সাধারণ মানুষের পক্ষে এই ভাব সমূহকে ধারণা করা তো দূরে, বুঝে নেওয়াটাই খুব কঠিন হয়ে যায়। প্রচুর জপ-ধ্যন ও তপস্যা করে করে চিত্তশুদ্ধির একটা বিশেষ স্তরে না পোঁছান পর্যন্ত দশম স্কন্ধের শ্লোকের ভাবগুলো বোঝা একেবারেই অসম্ভব। খুব উচ্চ ভাবরাজ্যের সাধক না হলে এর ভাবগুলিকে গ্রহণ বা ধারণ করা একেবারেই অসম্ভব। সেইজন্য প্রথম দিন থেকে আমাদের পরম্পরাতে নিষেধ করে দেওয়া হয়েছে ভাগবতের দশম স্কন্ধ বিশেষ করে চীরহরণ আর রাসলীলা সাধারণ মানুষের সামনে কোন ভাবেই আলোচনা করতে নেই। দেহবোধ সম্পন্ন সাধারণ মানুষের কাছে চীরহরণ আর রাসলীলা আলোচনা করলে এর আধ্যাত্মিক উচ্চ ভাবগুলি জাগতিক ভাবরসে বিকৃত হয়ে যাওয়াটা কোন অস্বাভাবিক নয়। দুর্ভাগ্যবশতঃ পণ্ডিতরা ভাগবতের এই চীরহরণ আর রাসলীলাকেই সবার সামনে খুব নাটকীয়তার সঙ্গে বেশী করে পরিবেশন করেন।

রাসলীলার সাথে দুটো ভাব একেবারে মিলে মিশে আছে। একদিকে এর মধ্যে পার্থিব অর্থাৎ সাংসারিক ভাব যেমন আছে আবার তার সঙ্গে মিশে আছে অত্যন্ত উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাব সমূহ। শরবতে যেমন জল, চিনি, লেবু মিশে থাকে, সেই রকম এই দুটো ভাব রাসলীলার মধ্যে মিশে আছে, দুটোকে আলাদা করা যায় না। যার জন্য যাদের ভেতর কামভাব আছে তারা রাসলীলার মধ্যে নারী-পুরুষের প্রেমকেই দেখতে পায়। আবার যাদের ভেতর ঠিক ঠিক আধ্যাত্মিক চেতনার উন্মেষ হয়েছে তারা রাসলীলাকে অন্য ভাবে দেখে।

কোন সাহিত্য বা চলচ্চিত্র কীভাবে অমর হয়? চারটে বর্ণ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র ভাব প্রত্যেক মানুষের ভেতরেই কম বেশী আছে। এই চারটের বর্ণের কোন একটা ভাব কখন উপরে চলে আসে আবার কখন অন্যটা উপরে চলে আসে। যখন কারুর মধ্যে ব্রাহ্মণ ভাবের প্রভাব বেশী থাকে তখন তার আধ্যাত্মিকতার প্রতি আগ্রহটা বেশী থাকে, আধ্যাত্মিক জ্ঞানার্জনের দিকে তার প্রবণতটা বেড়ে যায়। আধ্যাত্মিক বিষয়কে মন যখন গ্রহণ করতে চাইছে তখন ব্রাহ্মণদের তেজ ও শক্তি তার ভেতরে চলে আসে। আবার শৌর্য বীর্যের পূজার দিকে যাদের মন বেশী যায় তখন বুঝতে হবে তার মধ্যে ক্ষত্রিয়ের ভাবটা জোর প্রভাব বিস্তার করছে। যখন সুখ, সমৃদ্ধির সাম্রাজ্য বিস্তারের দিকে মন যায় তখন তার মনে বৈশ্য বর্ণের ভাবটা জেগে যায়। এই তিনটে ভাবের বাইরে যে কোন আবেগ বা ভাবকে চোখ কান বন্ধ করে বলে দেওয়া যায় তার মধ্যে শূদ্র ভাব কাজ করছে। যখন কেউ ভালোবাসার কথা বলছে, হাসি-মজার কথা বলছে তখন এগুলো সবই শূদ্র ভাবের মধ্যে চলে আসবে, চোখের জল ফেলাটাও শূদ্র ভাব। যাঁরা সাহিত্য রচনা করেন তাঁরা শূদ্র ভাব নিয়েই করে থাকেন। মানুষ মাত্রেই শূদ্র, তা যেখানেই তার জন্ম হয়ে থাকুক না কেন। শূদ্র হওয়ার জন্য, যেখানে তার যেমন ভাবই থাকুক না কেন সেগুলো শূদ্র ভাবই হয়। যে সাহিত্যিক যত এই ভাবগুলোকে সাহিত্যে ভালো ফুটিয়ে তুলতে পারবেন তত তাঁর সাহিত্য সাফল্যের মুখ দেখবে। শরৎচন্দ্রের দুঃখের কাহিনীগুলো আমাদের মনকে খুব গভীর ভাবে স্পর্শ করে, কারণ এই ধরণের রচনা শূদ্র রচনা। এখানে শূদ্র বলতে খারাপ কিছু বোঝাচ্ছে না, এগুলো type of emotion। আবার অনেক কাহিনী আছে যেমন, এক রাজা রানী ছিল, কিভাবে কিভাবে তারা খুব দুঃখে পড়ে গেল, সেখান থেকে তাদের আবার ভালো কিছু হয়ে গেল, যেমন নল-

দময়ন্তীর কাহিনী, সাবিত্রী-সত্যবানের কাহিনী এগুলোর মধ্যে বৈশ্য ভাব। ক্ষত্রিয় ভাব হল, শক্তির প্রকাশ, যেমন রাম রাবণকে মারছেন, শ্রীকৃষ্ণ যখন কংসকে মারছেন, মহাভারতে যেখানে যুদ্ধের বর্ণনা করা হচ্ছে, এই সাহিত্যগুলো সব ক্ষত্রিয় ভাবের প্রকাশ। আর ব্রাহ্মণ ভাব হল, আত্মজ্ঞান লাভের ইচ্ছা, পবিত্রতা লাভের ইচ্ছা যেখানে জাগিয়ে দিচ্ছে। শূদ্র ভাবের সাহিত্য বা সিনেমা খুব বেশি দিন চলে না। যার জন্য দেখা যায় অনেক লেখক নিজের সময়ে প্রচুর নাম পেয়েছেন, কিন্তু একটা সময়ের পর থেকে তাঁদের রচনা পাঠককুলকে বেশী টানতে পারে না। বৈশ্য ভাব তার থেকে আরেকটু বেশি দিন চলে, ক্ষত্রিয় ভাব তার থেকে আরেকটু বেশি দিন চলে আর ব্রাহ্মণ ভাব চিরন্তন। যে সাহিত্যে বা সিনেমায় এই চারটে বর্ণের ভাবকে যত বেশি দক্ষতার সাথে সমন্বয় করা হবে সেই সাহিত্য বা সিনেমা তত স্থায়ী হবে। যেমন মহাভারত, মহাভারতে চারটে ভাব এক সঙ্গেই পাওয়া যাবে। মহাভারতে শূদ্র ভাব, মানে আবেগ ধর্মী কাহিনীতে ঠাসা, বৈশ্য ভাব যেমন পাণ্ডবরা সাম্রাজ্য ফিরে পাচ্ছেন, নল-দময়ন্তী কাহিনীতে রাজা নল তাঁর হৃত সাম্রাজ্য ফিরে পাচ্ছেন, আর যেখানে ভীমের বর্ণনা, অর্জুনের শৌর্য বীর্যের বর্ণনা দেওয়া হচ্ছে সেখানে ক্ষত্রিয় ভাব নিয়ে আসা হয়েছে আর মহাভারতে ভগবদ্গীতার মত অনেক গীতা পাওয়া যাবে, নানা রকমের আধ্যাত্মিক দর্শনের সাথে সনৎ-সুজাতীয় সংবাদ, বিদুর সংবাদের মত ধর্মীয় তত্ত্ব ও উচ্চ আধ্যাত্মিক তত্ত্বও মহাভারতকে সমৃদ্ধ করেছে। চারটে জিনিষই সমান ভাবে থাকার জন্য মহাভারত এখনও নতুন ও চিরন্তন সাহিত্য রূপে সমাদৃত হয়ে আসছে। অন্য দিকে কালিদাসের মেঘদূতমের মধ্যে যে আবেগ ধর্মীতাকে একটা চরমে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, ওই আবেগের উপরে আর নিয়ে যাওয়া যায় না।

মনের আবেগ মানেই শূদ্র ভাব, সে যে আবেগই হোক না কেন, ভালোবাসার কাহিনীই হোক, দুঃখের কাহিনীই হোক সব শূদ্র ভাব। কাম, ক্রোধ, লোভ যে আবেগই নিয়ে আসা হোক না কেন, সব শূদ্র ভাব। আর positive emotion বলে কিছু হয় না, emotion মাত্রেই negative হয়। আর emotion মানেই শূদ্র ভাব। কিন্তু কোন ভাবে শূদ্র ভাবকে যদি ব্রাহ্মণ ভাবে রূপান্তরিত করে দেওয়া যায় বা বৈশ্য ভাবকে বা ক্ষত্রিয় ভাবকে যদি ব্রাহ্মণ ভাবে উত্তীর্ণ করে দেওয়া যায় তখন সেই সেই সাহিত্যই অমর হয়ে যাবে। মহাভারত বা রামায়ণের প্রধান বৈশিষ্ট্য এটাই। শ্রীরামচন্দ্রের যে ক্ষত্রিয় ভাব যেখানে তিনি রাবণকে বধ করছেন, বিভিন্ন অসুরদের বধ করছেন, এই বর্ণনাকেই একটা আধ্যাত্মিকতার প্রলেপ দিয়ে দেওয়া হচ্ছে বলে এই কাহিনী অমর হয়ে গেছে। আধ্যাত্মিকতার প্রলেপ দেওয়াটা ভালো বোঝা যায় লায়লা-মজনুর কাহিনীতে। লায়লা ও মজনুর যে প্রেম ও ভালোবাসা, এই ধরণের প্রেম ভালোবাসার তো অনেক কাহিনীই আছে, রোমিও-জুলিয়েতের মত প্রচুর কাহিনীতে এই ভালোবাসাকেই নিয়ে আসা হয়েছে। প্রত্যকে আঞ্চলিক সাহিত্যে এই ধরণের নিজস্ব কোন না কোন ভালোবাসার কাহিনী পাওয়া যাবে। কিন্তু এগুলো সবই শূদ্র emotion। রোমিও-জুলিয়েত সেক্সপীয়ারের জন্য এখনও দাঁড়িয়ে আছে, আর বাকি সব প্রেম-কাহিনী কোথায় হারিয়ে গেছে খুঁজেই পাওয়া যাবে না। অন্য দিকে লায়লা-মজনু অমর হয়ে গেছে। তার কারণ ওর শূদ্র emotionকে ব্রাহ্মণত্বে উত্তীর্ণ করে ওর মধ্যে আধ্যাত্মিকতার প্রলেপ দেওয়া হয়েছে।

রাসলীলার ক্ষেত্রে ঠিক এই ব্যাপারটাই ঘটেছে। রাসলীলার শূদ্র emotionকে অমরত্ব প্রদান করে দেওয়া হয়েছে ব্রাহ্মণত্ব ভাবকে নিয়ে আসার জন্য। আত্মার সাথে পরমাত্মার মিলন, একের সাথে বহুর মিলন, গোপীরা সবাই ঈশ্বরের সঙ্গে এক হয়ে যাচ্ছেন, তাঁরা কিন্তু সবাই আলাদা। মানব জীবনের উদ্দেশ্য তো তাই, একত্বকে লাভ করা। এই একত্বকে জ্ঞানের দিক দিয়েই দেখা হোক আর ভক্তির দিক দিয়েই দেখা হোক তাতে কিছু আসে যায় না। জ্ঞানী দেখেন আত্মাই আছেন, আর ভক্ত দেখেন ঈশ্বরই সব কিছু হয়েছেন। গোপীরা সবাই আলাদা আলাদা, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণে এসে সবাই এক হয়ে যাচ্ছেন। ঠাকুর খুব সুন্দর উপমা দিচ্ছেন – যখন বাজার করতে যাচ্ছে তখন গিন্নী এসে বলছে এটা হল শাকের পয়সা, এটা হল আলুর পয়সা, এটা হল মাছের পয়সা। সব আলাদা আলাদা পয়সা নিয়ে এবার রাস্তায় এসে সব কটা পয়সাকে মিশিয়ে দিয়ে পকেটে রেখে দিল। বাজারে গিয়ে কেনার সময় আবার একটা একটা হিসাব করে পয়সা বার করে জিনিষ কিনবে। জীবনেও

ঠিক তাই হয়। সৃষ্টি যখন হচ্ছে তখন সব আলাদা আলাদা হয়ে সৃষ্টিতে আসছে। পরে ভগবানে যখন মিলন হয়ে যাচ্ছে তখন আবার সব এক হয়ে যাচ্ছে। রাসলীলাতেও ঠিক তাই হচ্ছে।

জালালউদ্দিন, রুমি প্রভৃতি সুফি সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রায় আটশ কি তারও বেশী বছর ধরে একটা বিশেষ ভাবকে অবলম্বন করে ঈশ্বরের প্রতি গভীর প্রেম, অনুরাগ ও ভক্তি সাধনার প্রথা এখনও চলে আসছে, যদিও পাকিস্থান প্রভৃতি মুসলিম দেশে সুফিদেরকে সহ্য করা হয় না কিন্তু দিল্লীতে এখনও অনেক সুফি সাধকরা যে ভাবে সাধনা করে চলেছেন, তাদের সাথে আলাপ না করলে বোঝা যায় না ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা মানুষকে কোথায় নিয়ে যেতে পারে। অত দূর না গিয়েও যদি স্বামী সারদানন্দ রচিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গে ঠাকুরের মধুর ভাবে সাধনার অংশটুকুও যদি কেউ অধ্যয়ন করেন, তাতেই তাঁরা ধারণা করতে পারবেন ঈশ্বরের প্রতি মানুষের ভালোবাসা কত গভীর থেকে গভীরতর হতে পারে। সেখানে ঠাকুরও বারবার বলছেন ঈশ্বরের প্রতি গোপীদের ভাব বোঝা খুব কঠিন।

তিব্বতে এর আগে অনেক দালাই লামা হয়েছিলেন। অনেক আগের এক দালাই লামার বিবরণে যা বর্ণনা পাওয়া যায় যাতে বলা হচ্ছে যে তাঁর আধ্যাত্মিক ব্যাপারে একটুও নাকি মন ছিল না। তিনি শুধু প্রেমের কবিতাই লিখতেন। বর্ণনাতে যেটুকু জানা গেছে তাতে দেখা যায় ওই দালাই লামার সময় ধর্মের ব্যাপারে তীব্বতে কারুরই কোন আগ্রহ ছিল না। ধর্মের ব্যাপারে যত না আগ্রহ তার থেকে বেশী আগ্রহ ছিল দালাই লামার প্রেমের কবিতা মুখস্ত করা। সবারই মুখে মুখে তখন দালাই লামা রচিত প্রেমের কবিতার গান। কিন্তু কপাল এমনই যে সেই দালাই লামা অল্প বয়সেই মারা যান। বৌদ্ধধর্ম যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। কিন্তু তারপর থেকে সেই প্রেমের কবিতাগুলোকে তাঁরা ভগবান বুদ্ধের প্রতি ভালোবাসার কবিতা বলে ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চালিয়ে গেলেন। কিন্তু পরিষ্কার বোঝা যায় কবিতাগুলো কোন নারীকে উদ্দেশ্য করে লেখা হয়েছে। ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা আর একজন নারীর প্রতি ভালোবাসা এই দুটো এমন সমান্তরাল ভাবে চলে যে, খুব সহজে একটু এদিক ওদিক করে যে কোন দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া যায়। নারীর প্রতি যে ভালোবাসার বর্ণনা করা হয়, সেই ভালোবাসাকে কোন বৌদ্ধিক ভক্ত খুব সহজে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিতে পারবেন যে এই ভালোবাসাকে ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসার বর্ণনা করা হয়েছে। ঠিক এই একই সমস্যা হয় যাদের কলুষিত মন তারা খুব সহজে ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসাকে জাগতিক দৈহিক সম্পর্কে নামিয়ে নিয়ে আসতে পারে।

কবি জয়দেবের গীতগোবিন্দ খুব বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ। ভাগবতে রাসলীলাকে যে অবস্থায় গিয়ে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গোপীদের প্রগাঢ় ভক্তি ভাবকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, গীতগোবিন্দে কবি জয়দেব ভক্তিকে সেখান থেকে আরও কয়েক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গেছেন। মহাপণ্ডিত নিরোদ চৌধুরী তাঁর একটি প্রবন্ধমূলক বইতে বর্ণনা করছেন কীভাবে হিন্দু শাস্ত্র মানবিক কাম জিনিষটাকে খুব কৌশল করে ধর্মের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে নিজেদের অতৃপ্ত কামভাবকে ধর্মের নাম দিয়ে চরিতার্থ করার অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এই ধরণের আধ্যাত্মিক শাস্ত্রের আধ্যাত্মিক উচ্চ ভাব, ঈশ্বরের প্রতি ভক্তের ভালোবাসা কোন পর্যায়ে যেতে পারে বিশেষ করে মধুর ভাবের উপর আধারিত কোন শাস্ত্র যদি নীরোদ চৌধুরীর মত বৌদ্ধিক লোকেদের হাতে পড়ে যায় তখন তাঁরা তার ব্যাখ্যা করে এত নোংরা পর্যায়ে নামিয়ে দেবেন যে কল্পনা করা যায় না। আর যারা অতি সাধারণ লোক, যারা একেবারেই আধ্যাত্মিক ভাবশূন্য এই ভাবগুলি তাদের স্বাভাবিক চিন্তাধারাকে কলুষিত করে দেবে। সেইজন্য প্রথম থেকেই ভাগবতের গোপীদের প্রসঙ্গ সবার সামনে আলোচনা করতে নিষেধ করা হয়। আমাদের খুব ভালো করে মনে রাখতে হবে, আঠারোটি পুরাণের সব কটিই অত্যন্ত উচ্চ আধ্যাত্মিক গ্রন্থ, পুরাণ কখনই কাব্যগ্রন্থ নয়। অথচ বুদ্ধিজীবিরা পুরাণকে কাব্যগ্রন্থ রূপেই দেখেন। যখনই কোন ধর্মগ্রন্থকে সাহিত্য বা কাব্যগ্রন্থ রূপে বিচার করা হবে তখনই ধর্মীয় সংস্কৃতির সর্বনাশ হয়ে যেতে বাকি কিছু থাকবে না। যে কোন ধর্মগ্রন্থকে যখন কেউ বিচার করতে যাবে, বিচার করার সময় সেই গ্রন্থের প্রেক্ষাপট অনুসারেই তার মানসিকতার প্রশিক্ষণ হওয়া উচিৎ।

মূল আলোচনা থেকে সরে গিয়ে আমরা একটু অন্য প্রসঙ্গে যাচ্ছি। রাম জন্মভূমি নিয়ে হাইকোর্টে একটা মামলা হওয়ার পর কিছু দিন আগে মহামান্য হাইকোর্ট একটা রায় দিয়েছিলেন। সেই রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে যখন আপীল করা হল তখন সুপ্রীম কোর্টের বিচারকরা বলছেন হাইকোর্টের বিচারকরা কি করে এই রায় দিলেন সত্যিই অকল্পনীয়। সুপ্রীম কোর্ট এই ব্যাপারে কি রায় দেবে সেটা তাদের ব্যাপার। রামজন্মভূমির মূল ইস্যু ছিল এখানে আগে মন্দির ছিল কি ছিল না। এই ব্যাপারটা নির্ধারণের জন্য তিন জন ইতিহাসবিদের মত নেওয়া হয়েছিল। তিনজন ইতিহাসবিদই মত দিলেন এটা কখনই রামজন্মভূমি হতে পারে না। এরপর সুপ্রীম কোর্টের বিচারকরা যখন এই তিনজন ইতিহাসবিদকে জেরা করতে শুরু করেছেন তখন দেখা গেল এঁরা কেউই এই ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ নন। মজার ব্যাপার হল এক নম্বর ইতিহাসবিদ দুই নম্বরকে কোট করছেন, দুই নম্বর তিন নম্বরকে আর তিন নম্বর এক নম্বরকে কোট করছেন। তিনজন বিচারকই অবাক হয়ে এই তিন ইতিহাসবিদকে বলছেন আপনারা আদৌ কেউই পুরাতত্ত্ববিদ নন, মানে সেই সময়কার ঐতিহাসিক নন। আপনারা কি করে এই ধরণের প্রবন্ধ লিখছেন? বই লিখছেন? মতামত দিচ্ছেন? আপনাদের মতামত নিয়ে পুরো দেশের মানুষ সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। আর এখানে আপনারা এর ওর, সে তার মতামত নিয়ে এত বড় একটা ইস্যুতে মতামত দিয়ে দিচ্ছেন! এভাবে তো কোন সিদ্ধান্তে আসা যায় না। এই ইতিহাসবিদরা যে জিনিষটা উল্লেখ করেননি তা হল আর্কোলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়ার একটি গোপন নোট। পরে যখন গোপন নোটটা বার করা হল তখন সেখানে প্রত্নতাত্ত্বিকরা বলছেন, অযোধ্যার রামজন্মভূমিতে মন্দির ছিল কি ছিল না আমরা বলতে পারব না। কিন্তু এই জায়গাতে একটা কাঠামো পাওয়া গেছে যেটা মন্দিরের মত। এরপর থেকে রামজন্মভূমি নিয়ে বুদ্ধিজীবিদের চিৎকার চেঁচামেচি সব বন্ধ হয়ে গেছে। বুদ্ধিজীবিরা কি করতে পারেন আর কি করতে পারেন না চিন্তাই করা যায় না, পুরো দেশের প্রাচীন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে এরা সর্বনাশের দিকে ঠেলে দিয়েছেন। কিন্তু ভাগবতাদির মত উচ্চ ধরণের গ্রন্থ যেখানে অত্যন্ত উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাবকে সামনে নিয়ে আসা হয়েছে, যে ভাবকে বুদ্ধিজীবিরা যেভাবে বিকৃত করে সাধারণ মানুষের সামনে উপস্থাপিত করে তাদের মনকে খুব সহজে দৈহিক সম্পর্কের সাথে জুড়ে দিয়ে সর্বনাশের দিকে নিয়ে যাচ্ছে ভাবা যায় না। এগুলো নিয়ে আমরা কি কেউ চিন্তা ভাবনা করবো না? সাত-আট হাজার বছরের আমাদের সুমহান ঐতিহ্যকে বিকৃত করার অসৎ প্রচেষ্টাকে প্রতিহত করতে কী আমরা সচেতন হবো না?

ঈশ্বর প্রেমে মাতোয়ারা হয়ে উচ্চ ভাবাবস্থায় নৃত্য করতে করতে ঠাকুরের কোমর থেকে কাপড় খুলে যাচ্ছে কিন্তু তাতে তাঁর কোন হুঁশ নেই। সমাধি অবস্থায় তাঁর ধুতি বগলে চলে আসছে। কখনও ধুতি খুলে খালি গায়ে খেতে বসেছেন। এগুলোকে নিয়ে কিছু লেখক খুব আপত্তিজনক নোংরা নোংরা অর্থ করে ব্যাখ্যা করেছেন। ঈশ্বরীয় ভাবের অভিব্যক্তির বহিঃপ্রকাশকে নিয়ে এই ভাবে কুরুচীকর মন্তব্য করা বা লেখা খুবই বিপজ্জনক। যাঁরাই নিজেদের ভারতীয় আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের অংশীদার মনে করতে চাইছেন তাঁদের জেনে রাখা উচিৎ ভাগবতাদির মত গ্রন্থ যাঁরা রচনা করেছেন তাঁরা কেউই কবি নন, এনারা সবাই ঋষি, শুধু ঋষিই নন, অত্যন্ত উচ্চমানের ঋষি। জাগতিক বা দৈহিক সম্পর্কজনিত কোন কিছুই এনারা লিখবেন না, এঁদের একমাত্র উদ্দেশ্য মানুষকে শুদ্ধ আধ্যাত্মিক ভাবের অনুভূতির আস্বাদ লাভ কীভাবে করা যায় তার শিক্ষা দেওয়া, আধ্যাত্মিকতার বাইরে এনারা অন্য কিছু চিন্তাও করতেন না আর রচনা তো করতেই যাবেন না।

মধুর ভাব হল আধ্যাত্মিকতার উচ্চতম ভাব। একমাত্র গোপীদেরই ঠিক ঠিক এই মধুর ভাব ছিল, যেখানে ইষ্টকে নিজের স্বামী, প্রিয়তম, প্রেমিক ভাবে সাধনা করা হচ্ছে। মধুর ভাবের শেষ কথা গোপীরা। নারদীয় ভক্তিসূত্রে বলছে *সা তু পরমাপ্রেমস্বরূপা*। ভক্তির শেষ কথা প্রেমে। এই সূত্রকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে গোপীদের দৃষ্টান্ত টেনে নিয়ে বলা হয় *যথা ব্রজগোপীকানাম্*, ব্রজের গোপীদের দেখলে এই প্রেমকে জানা যায়। শ্রীরামকৃষ্ণ, চৈতন্য মহাপ্রভু, গোপীললনাদের দৃষ্টান্ত দিয়ে যদি ঈশ্বরীয় প্রেমকে বিচার করা না হয় তখন এটাই হয়ে যাবে *জারানামিব*, এই প্রেম তখন দৈহিক সম্বন্ধের হয়ে যাবে। ঈশ্বরের প্রতি গোপীদের ভালোবাসা হল উচ্চতম ভক্তির পরাকাষ্টা, যে পরমপ্রেম তার স্বরূপ।

আমরা যদি মেনে নিই মহাভারত আর পুরাণ ব্যাসদেবরই রচনা তাহলে মহাভারতে একটি শ্লোকও পাওয়া যাবে না যেখান শৃঙ্গার রসের কথা বলা হয়েছে। ভাগবতে চীরহরণ, রাসলীলাতে কোথাও গোপীদের শারীরিক সৌন্দর্যের বর্ণনা নেই কিন্তু ভাবের বর্ণনা আছে। ভাবের বর্ণনা করার জন্য যতটুকু প্রয়োজন তার বেশী কোথাও এতটুকু অন্য কোন ধরণের বর্ণনা করা হচ্ছে না। ভাগবত একেই ব্যাসদেবের রচনা, আর সেই রচনা পরীক্ষিৎকে শোনাচ্ছেন ব্যাসদেবের পুত্র শুকদেব। শুকদেবকে বলা হয় আদর্শ সন্ন্যাসী। শুকদেবের চরিত্রকে কারুর সাথে তুলনা করা যায় না, যদি তুলনা করতে হয় তাহলে শুকদেবকে সাক্ষাৎ শিবের সঙ্গেই তুলনা করতে হবে। সেই শুকদেব জনসমক্ষে রাজা পরীক্ষিৎকে চীরহরণের মত ভগবানের লীলাকথা বর্ণনা করছেন। এতেই বোঝা যায় এগুলো কত উচ্চতম আধ্যাত্মিক ভাব।

চীরহরণ লীলা কাহিনীর দুটো দিক, যা এর আগেও আমরা আলোচনা করেছি। প্রাসঙ্গিক বিষয়ের সাথে যোগসূত্র বজায় রাখার জন্য আলোচনার পুনরাবৃত্তি করাটা দোষের হবে না। ভাগবতের মতে চীরহরণের সময় শ্রীকৃষ্ণের বয়স সাত কি আট। চীরহরণকে যদি লৌকিক দৃষ্টিতে দেখা হয় তাহলেও এই আট বছরের বাচ্চার নারীদেহ সম্বন্ধে কৌতুহল থাকাটা একেবারেই অবাস্তব। আর যদি দিব্য দৃষ্টিতে দেখা হয় তখন সেখানে আবার কোন বিষয় পাওয়া যায় না। কার্তিক স্নান মেয়েদের খুব পুরনো ব্রত। এই এক মাস মেয়েদের সূর্যোদয়ের পূর্বে ভোরবেলা নদীতে স্নান করতে হয়। বৃন্দাবনে গোপীরাও যমুনায় কার্তিক স্নান করতেন। বস্ত্রহীন হয়ে নদী বা জলাশয়ে স্নান করাটা ভারতের খুব পুরনো প্রথা। মহাভারতে এই প্রথার নিন্দা করা হয়েছে আর মনুস্মৃতিতে খুব কঠোর ভাবে নিষেধ করে বলা হয়েছে, নদীতে যখন স্নান করবে তখন বস্ত্র পরিধান করেই স্নান করতে হবে। বৃন্দাবনে তখনও বস্ত্রহীন হয়ে স্নান করার প্রচলন ছিল, গোপকুমারী বালিকারা, রমণীরা সবাই বস্ত্রহীন হয়েই স্নান করতে যেতেন। শ্রীকৃষ্ণের নজরে এই ব্যাপারটা খুব দৃষ্টিকটু লেগেছিল। তিনি গোপীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন 'তোমরা যে এভাবে বস্ত্রহীন হয়ে নদীতে স্নান করতে যাচ্ছ এটা কিন্তু বরুণ দেবতার প্রতি অপরাধ করা হচ্ছে। বরুণ দেবতাদের কাছে তোমাদের সব্বাইকে ক্ষমা চাইতে হবে'। বস্ত্রগুলো গাছে ঝুলিয়ে শ্রীকৃষ্ণ বসে আছেন। কার্তিক স্নান সূর্যোদয়ের অনেক আগে অন্ধকার থাকতেই করতে হত। এখনও অন্ধকার, কিন্তু বেশীক্ষণ অপেক্ষা করলে সূর্যোদয় হয়ে যাবে, চারিদিক দিনের আলোতে ফর্সা হয়ে যাবে, তখন আরও কেলেঙ্কারী। গোপীরা এখন কি করবে!

তৃতীয় কথা, কুমারীরাই এই ব্রত বেশী পালন করত যাতে মনের মত স্বামী পায়। কুমারী গোপীদের মনের মত স্বামী হলেন শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণ হলেন সাক্ষাৎ ভগবান। সেইজন্য এই কাহিনীগুলোকে যখনই জাগতিক বা লৌকিক দৃষ্টিতে দেখা হবে তখনই অনেক রকম বিপর্যয় হয়ে যাবে। শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্যামী। ঠিক আছে তোমরা আমার মতই বর চাইছ কিন্তু তোমাদের মধ্যে এখনও অনেক অঙ্কট-বঙ্কট আছে। আমি এই অঙ্কট-বঙ্কট গুলো পরিষ্কার করে দিচ্ছি। তাই প্রথমে ইষ্টের প্রতি যে তোমার লজ্জা সঙ্কোচের ভাব সেটাকে সরিয়ে দিলাম। শ্রীশ্রীমা খুব সুন্দর বলছেন 'সন্তান যতই ময়লা মেখে আসুক, সন্তানের ময়লা পরিষ্কার করে তাকে কোলে তুলে নেওয়াটা মায়েরই কাজ'। মা আর শিশুর যা সম্পর্ক আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে ইষ্ট আর ভক্তের একই সম্পর্ক। ভক্তের মধ্যে যদি কোন গোলমাল থেকে থাকে তাহলে ভক্তের সাথে ইষ্টের কোন দিন মিলন হবে না। ঠাকুর উপমা দিয়ে বলছেন – ছুঁচে মাটি লেগে থাকলে চুম্বক ছুঁচকে টানতে পারে না। তার আগে ছুঁচের কাদামাটি ধুয়ে পরিষ্কার করতে হবে। ভক্তের হৃদয়ের নোংরা কীভাবে পরিষ্কার করবে? চোখের জল দিয়ে। ঈশ্বরের জন্য চোখের জল ফেলে কাদামাটি ধুয়ে ফেলতে হবে। এরপর চুম্বক তাকে টেনে নেবে। অন্য পথ হল জলে তাকে ডুবিয়ে দাও। আমার মধ্যে যে কাদামাটি সেটাকে ধোয়ার জন্য আমাকে আর ডোবাতে পারবো না, যিনি আমাকে টানবেন তাঁকেই এই কাজটা করতে হবে। টানার হলে তিনিই ডুবিয়ে আমার ভেতরের সব গোলমালগুলো পরিষ্কার করে দেবেন।

ভক্ত যেমন যেমন সাধনা করবে, সাধনা মানে সকাল সন্ধ্যা দিনে দুবার একশ আটবার জপ করা নয়। একটা উপাচারকে ধরে রাখার জন্য এরও দরকার আছে। উপাচার মূলক সাধনার কথা এখানে বলা হচ্ছে না, যখন সত্যিকারের সাধনা শুরু হয় তখন সেই ভক্তের উপর আর তার পারিপার্শ্বিকতার উপর এমন অনেক কিছু

ঘটনা ঘটতে শুরু হবে, তখন ভক্তের মনে হবে সত্যিই এগুলো আমি কি করছি! বড় বড় জ্যোতিষীরা মানুষের কোষ্ঠি বিচার করে বলে তার এই এই ক্ষেত্রে এই এই গ্রহ নক্ষত্রের প্রভাব থাকায় তার এই এই বিপদ বা ভালো হওয়ার সম্ভবনা আছে। গ্রহ নক্ষত্র অত্যন্ত সাধারণ জিনিষ, এরা সবাই প্রকৃতির এলাকার। কিন্তু এই গ্রহ নক্ষত্রের কাছেই যদি আমরা এত অসহায় তখন আমাদের সেখানে অহঙ্কার করার মত কি কিছু থাকতে পারে? যদি গ্রহ নক্ষত্রের প্রভাবেই আমাদের জীবনের সব ভালো মন্দ নির্ধারিত হয়ে থাকে তাহলে আমার আমি বোধ বা আমি কর্তা এই বোধের কোন দামই নেই। সাধনা করে করে মন যখন একটা স্তরে চলে যায়, তখন দেখে আমি ভাবছি আমি সব কিছু করছি কিন্তু সবই তো এই গ্রহ নক্ষত্রই করাচ্ছে। যে খুন করছে তার গ্রহগুলো এমন ভাবে রয়েছে যার জন্য তাকে দিয়ে খুন করাচ্ছে। কিন্তু এর পরেও সাধনা করে করে যখন প্রকৃতির এলাকাকে ছাড়িয়ে চলে যাচ্ছে, তখন দেখে আমরা পুতুল ছাড়া কিছুই নয়। গীতায় ভগবান বলছেন *ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেহর্জুন তিষ্ঠতি। ভ্রাময়নসর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়াণি মায়য়া।।* ঈশ্বর সমস্ত প্রাণীর হৃদয়ে অবস্থান করে আমাদের সবাইকে পুতুলের মত নাচাচ্ছেন, আমার আমি বলতে কিছু নেই, সবই তিনি। সমস্যা হল, আমরা এত নিম্নস্তরে পড়ে আছি যে এই বোধটুকু আসা অত্যন্ত কঠিন। আবার ঈশ্বরের প্রতি যখন ভক্তি জাগে, ঈশ্বরের প্রতি সমর্পণের ভাব উদয় হয় তখন ঠাকুর তাকে কীভাবে যে নিয়ে যান বোঝা খুব মুশকিল। যেটা ভালো মনে করছি সেটাকে তিনি মন্দ করিয়ে দেবেন, যেটাকে মন্দ বলছি সেটাকে ভালো করিয়ে দেবেন। ঠাকুর খুব সহজ ভাবে বলে দিলেন যখন সত্যিকারের শরণাগতির ভাব ভেতরে আসে তখন তার বেড়াল ছানার ভাব হয়। মা কখন তাকে হেঁসেলে রাখছে, কখন বিছানায় রাখছে কখন আবার ছাইয়ের গাদায় রাখছে। মা'ই জানে তার কিসে ভালো কিসে মন্দ, তাকে এলাকাটা ঘুরিয়ে পরিশ্রম করিয়ে নিচ্ছেন।

এক ধনীলোকের তিনটে সন্তান, আর তিনটে সন্তানই অকর্মা। বাবা মারা যাবার অনেক বছর পর তাদের বাড়িতে একজন সাধুবাবা এসেছেন। বাবার আমল থেকেই এই সাধুবাবা আসতেন আর তাঁকে খুব খাতির যত্ন করা হত। অনেক দিন পর সাধুবাবা এসে দেখেন এদের বাড়িটা সেই রকমই আছে আর বাবার আমলের সেই আম গাছটাও আছে। কিন্তু সব কিছুই শ্রীহীন হয়ে গেছে। এই তিনটে ছেলেরই মাথায় আছে বাবার সময়ে সাধুকে খুব খাতির যত্ন করা হত। সাধুবাবা এসে পড়েছেন। তাকে এখন খাতির যত্ন করতে হবে। কি ভাবে করা যায়? এরা তাড়াতাড়ি রাত্রিবেলা আম গাছ থেকে কিছু আম পেড়ে নিয়ে বাজারে বিক্রী করে একজনের মত কিছু চালডাল কিনে সাধুবাবার সেবা করেছে। সাধুবাবা জিজ্ঞেস করছে তোমরা খাবে না? প্রথম জন বললে আমি নিমন্ত্রণ খেয়ে এসেছি, দ্বিতীয় ভাই বলল আমার আজ অমুক উপোস আছে আর তৃতীয় জন বলল আমার শরীর খারাপ। আসলে ঘরে কিছুই খাবার নেই খাবে কি! সাধুবাবা সব বুঝতে পেরেছেন। উনি মাঝ রাত্রে ঘুম থেকে উঠে গিয়ে আম গাছটাতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছেন। এমন আগুন লাগিয়ে দিয়েছেন যে আম গাছটা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। সাধুবাবা ঘরে এসে আবার যথারীতি ঘুমিয়ে পড়েছেন। সকালবেলা সবাই ঘুম থেকে উঠে দেখে আম গাছটা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। ছেলেগুলো খুব কান্নাকাটি করেছে। সাধুবাবা কাউকে কিছু না বলে চলে গেছেন। কয়েক বছর পর সাধুবাবা আবার ঐ বাড়িতে এসেছেন। এসে দেখছেন ওদের অবস্থা আগের থেকে অনেকটাই ভালো হয়ে গেছে। এদের একটাই সম্বল ছিল, ঐ আম গাছটা। সাধুবাবা সেটাকেই পুড়িয়ে দিয়ে গেছেন। এখন বাধ্য হয়ে তারা কাজে কর্মে নেমে পড়েছে। কাজে কর্মে যখন নেমে পড়েছে তখন কাজ করে খেটেখুটে আবার তাদের আগের স্বচ্ছল অবস্থাটা ফিরে এসেছে। এবারও সাধুবাবাকে সম্মানের সাথে আপ্যায়ন করে নিজেরাও খেতে বসেছে। সাধুবাবা তখন তাদের বললেন 'আমিই ঐ আম গাছটাকে পুড়িয়ে দিয়েছিলাম, যাতে তোমরা নিষ্কর্মা অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে পার'।

আম গাছটা যে পোড়ান হল এতে ভালো হল কি মন্দ হল কে বলবে? এই কাহিনী সত্যি হতে পারে, মিথ্যে হতে পারে আবার কল্পনাও হতে পারে, কিন্তু যিনি এই কাহিনী তৈরী করেছেন, তাঁর চিন্তা-ভাবনা কি রকম সেটা আমরা ধারণা করতে পারি। যখনই কোন অঘটন ঘটে তখন সেই অঘটন থেকে ভালো মন্দ কি বেরিয়ে আসবে আমাদের পক্ষে বলা অসম্ভব। এই ধরণের ঘটনা দিয়েই বোঝা যায় ঈশ্বর কাকে দিয়ে কি করাতে চাইছেন। সাধক যখন জপ-ধ্যান করে, শাস্ত্রপাঠ করে, সাধনা করে তখন সে ঈশ্বরকে ধরার চেষ্টা করে

যাচ্ছে। কিন্তু একটা অবস্থায় যখন সাধক আধ্যাত্মিক রাজ্যে ঢুকে পড়ে তখন ঈশ্বর তাকে নিজে ধরে নেন। ধরে নেওয়ার পর এবার ঈশ্বর যে তাকে কত রকম জ্বালা যন্ত্রণা দিতে শুরু করবেন ধারণাই করা যাবে না। কিন্তু এই জ্বালা যন্ত্রণাটাই শুদ্ধিকরণের পথ। যতক্ষণ না মানুষ আধ্যাত্মিক জগতে প্রবেশ করছে ততক্ষণ এই জ্বালা যন্ত্রণা আসবে না। কারণ তিনি তখন তাকে শুদ্ধি করতে শুরু করেন, এই শুদ্ধিকরণ মানুষের পক্ষে করা সম্ভব নয়। সাধারণ মানুষের ভালো মন্দ যা কিছু হয় সেটা প্রকৃতির নিয়মনাসুরে হয়। মহাভারতে মাঙ্কি গীতাতে মাঙ্কি বলে একজন লোক অর্থ রোজগারের জন্য নানা রকমের পরিকল্পনা করে যাচ্ছে, যেটাই পরিকল্পনা করে সেটাই ব্যর্থ হয়ে প্রচুর অর্থের অপচয় হয়ে যায়। বিরক্ত হয়ে শেষে অবশিষ্ট যেটুকু টাকা-পয়সা যা সম্বল ছিল তাই দিয়ে দুটো বাছুর কিনল, সেই বাছুর দুটোকে আবার এক দৈব দুর্ঘটনায় একটা উট নিয়ে পালিয়ে গেছে। শেষে হতাশ হয়ে মাঙ্কী বলছে, জীবনে তৃষ্ণা ছাড়া আর কিছু নেই, আমি এবার ভগবানের পথে চললাম। এতক্ষণ তার যে একটার পর একটা মন্দ হয়েই চলেছিল, ভক্তরা বলবেন সব তাঁর ইচ্ছাতেই হয়েছে, এতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু এগুলো হয় প্রকৃতির নিয়মে। এরপর যখন ঈশ্বরের পথে ঢুকে পড়ল, বেড়ালের মা তার ছানাকে যেমন ঘাড়ে ধরে যেখানে খুশি রাখছে, এই প্রক্রিয়াটা তখন তার উপর শুরু হয়। এটাই ঠিক ঠিক শুদ্ধিকরণ প্রক্রিয়া। চীরহরণে ঠিক এই শুদ্ধিকরণ প্রক্রিয়াটাই গোপীদের উপর শ্রীকৃষ্ণ প্রয়োগ করেছেন।

ঠাকুর বলছেন 'লজ্জা, ঘৃণা, ভয় তিন থাকতে নয়'। এই তিনটে থাকলে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি হয় না। গোপীদের ঘৃণা বলে কিছু ছিল না, কারণ তাদের ঈশ্বরের প্রতি গভীর ভালোবাসা ছিল। বিষয়ী লোকেদের ঈশ্বরের প্রতি ঘৃণা থাকতে পারে, কিন্তু গোপীদের ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা ছিল বলে তাদের মধ্যে ঘৃণার ভাব ছিল না। কিন্তু ভালো করে যদি বিচার করা হয় তাহলে দেখা যাবে গোপীদের মধ্যে দুটো সমস্যা ছিল, লজ্জা আর ভয়। লজ্জা নিবারণ চীরহরণে করা হয়েছে আর ভয় নিবারণ রাসলীলাতে হয়েছে। ঈশ্বরের প্রতি গোপীদের ঘৃণার ভাব ছিল না, ঘৃণা ছিল শিশুপালের, জরাসন্ধের, কংসের। এরা কোন দিন শ্রীকৃষ্ণকে পাবে না। গোপীদের এই সমস্যাটা ছিল না। কিন্তু গোপীদের সমস্যা ছিল লজ্জা আর ভয়ে। শ্রীকৃষ্ণের সামনে আসার যে লজ্জা ভাব এটাকে চীরহরণে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমি ভগবানের সামনে বিবস্ত্র এসে দাঁড়িয়েছি, আমার তো সবই চলে গেছে, তুমিই একমাত্র আমার রইলে।

গোপীদের খুব ইচ্ছে ছিল শ্রীকৃষ্ণে যেন তাঁদের পূর্ণ আত্মসমর্পণ হয়, কিন্তু লজ্জা তাতে বাধা ছিল। শ্রীকৃষ্ণ সেটাকে সরিয়ে দিলেন। ঘোর অধ্যাত্মবাদীরা যখন যোগের দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা করবেন তখন তাঁরা বলবেন, শ্রীকৃষ্ণ হলেন আত্মস্বরূপ আর গোপীরা হলেন বুদ্ধিবৃত্তি। বৃত্তি হল, জলাশয়ের শান্ত জলে যখন কোন পাথর ছুঁড়ে দেওয়া হয় তখন জলে যে ঢেউ উঠতে থাকে, এই ঢেউটাই বৃত্তি। এই ঢেউয়ের জন্য জলাশয় বা হ্রদের তলদেশে কি আছে জানা যায় না। এই বৃত্তিগুলো যখন শান্ত হয়ে যায় তখন বলছেন *তদাদ্রুষ্টুঃ স্বরূপেহবস্থানম্*, যিনি দ্রষ্টা তিনি স্বরূপে অবস্থান করেন। যোগশাস্ত্রের মতে বৃত্তি পাঁচ রকমের আর বৃত্তি শান্ত হয়ে যাওয়া মানে আত্মদর্শন। গোপীদের বৃত্তি যেটা ছিল সেটাই হল তাঁদের আবরণ। ঐ আবরণটা শান্ত হয়ে গেল, এবার আত্মস্বরূপ যে শ্রীকৃষ্ণ আর যে বৃত্তি এই দুটো এক হয়ে গেছে। বৃত্তি নাশ মানে গোপী আর কৃষ্ণ এক হয়ে গেছে। শুদ্ধ আত্মাতে যখন রমণ করা হয় সেটাই তখন রাস হয়ে যায়। বৃত্তি মানে বুদ্ধিতে যখন ঢেউ উঠছে তখন জল আর ঢেউ আলাদা, জলের সঙ্গে এক হতে পারছে না। জল আর ঢেউ আলাদা বোধ হয়। ঢেউ শান্ত হয়ে যাওয়া মানে যারা গোপী তারা জলের সঙ্গে এক হয়ে গেল। এটাই রাস।

গোবর্ধন পর্বতধারণ পর্বের পরেই আসে রাসলীলা। পর পর পাঁচটি অধ্যায় নিয়ে রাসলীলা। রাসলীলার উপর বিভিন্ন ভাষ্যকাররা যে ভাষ্য দিয়েছেন তার উপর সংক্ষেপে একটু আলোচনা করে নেওয়া দরকার। রাসলীলার পাঁচটি অধ্যায়কে বলা হয় শ্রীমদ্ভাগবতের পাঁচটি প্রাণ। প্রত্যেক প্রাণীর শরীরে পাঁচটি প্রাণ চলে – প্রাণ, অপান, উদান, ব্যায়ান্ ও সমানা। আমাদের শরীরের যত রকমের প্রাণিক ক্রিয়া সংঘটিত হয়, নিঃশ্বাস নিচ্ছি, প্রশ্বাস ছাড়ছি, নিঃশ্বাস নেওয়ার পর সেই বায়ু শরীরের বিভিন্ন অংশে ঘুরে ঘুরে কাজ করছে, ঢেকুর তুলছি, হজম করছি ইত্যাদি যত রকমের ক্রিয়া হচ্ছে, বলা হয় পাঁচ রকমের উর্জা বা শক্তি দেহে কাজ করছে। আমাদের শরীরে মূল যে শক্তি যাচ্ছে সেটা নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে যায়। চার দিন না খেয়ে থাকলে, চার

দিন জল না খেয়ে থাকলে কেউ মরে যায় না। কিন্তু নিঃশ্বাস যদি কয়েক মিনিট বন্ধ থাকে আমরা মরে যাব। এই সিলিং পাখাটা ঘুরছে কারণ এর মধ্যে বিদ্যুৎ শক্তি প্রবাহিত হচ্ছে, শক্তি প্রবাহ বন্ধ হয়ে গেলে পাখা ঘোরাটা বন্ধ হয়ে যাবে। আমাদের শরীরে শক্তি প্রবাহিত হচ্ছে বলে শরীরটা কাজ করছে। আমাদের শরীরের পাঁচ রকমের শক্তি আছে। এই পাঁচ প্রকার শক্তির মূল উৎস হল বাতাস। এই বাতাস যখন নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস প্রণালীতে চলাচল করে তখন এই পাঁচটি শক্তির উপর খেলা করতে করতে কাজ করে। সব সময় যে বাতাস হিসাবে কাজ করছে তা নয়, পাঁচ রকম শক্তির মাধ্যমে কাজ করে। এই শক্তিকে বলা হয় প্রাণ। স্বামীজী যখন সৃষ্টি তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করছেন সেখানে তিনি বারবার আকাশ ও প্রাণ এই শব্দ দুটো বলছেন। স্বামীজী প্রাণকে অনুবাদ করছেন energy বলে। আমরা প্রাণকে সাধারণত বলি প্রাণবায়ু। কিন্তু প্রাণবায়ু আর প্রাণ দুটো আলাদা। পঞ্চপ্রাণ বলতে বোঝায়, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে যখন শক্তি শরীরের মধ্যে যাচ্ছে আর পাঁচটি প্রক্রিয়াতে কাজ করে তখন তাকে বলা হয় পঞ্চপ্রাণ। পঞ্চপ্রাণের যে কোন একটির যদি সাম্য ভাব নষ্ট হয়ে যায় তাহলে শরীরে নানান রকমের গণ্ডগোল দেখা দেবে। আর প্রাণবায়ুকে যদি টেনে বার করে নেওয়া হয় তাহলে সে মারা যাবে। মৃত্যু মানেই প্রাণবায়ু চলে যাওয়া।

রাসলীলার এই পাঁচটি অধ্যায় হল ভাগবতের পঞ্চপ্রাণ। মানুষের প্রাণটুকুই তো তার পরিচয় নয়, প্রাণ ছাড়াও তার অনেক কিছু আছে, মাথা আছে, হাত আছে, নাক-কান-চোখ আছে। ঠিক তেমনি ভাগবতে সব কিছুই আছে, তার দেহ আছে, ইন্দ্রিয় আছে কিন্তু এই পাঁচটি অধ্যায় পাঁচটি প্রাণ। ভাগবত থেকে এই পাঁচটি অধ্যায়কে যদি বার করে নেওয়া হয় তাহলে ভাগবতের সমস্ত তাৎপর্যই নষ্ট হয়ে যাবে। কারণ ভাগবতে বাকি যা কিছু আছে, সৃষ্টিতত্ত্ব, দর্শন তত্ত্ব এবং অন্যান্য বর্ণনা যা আছে এগুলো অন্য গ্রন্থেও আমরা পেয়ে যাব। কিন্তু রাসলীলা, যেটা এই পাঁচটি অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে, অন্য কোন শাস্ত্রে বা গ্রন্থে পাওয়া যাবে না।

রাসলীলায় কি কি আছে? শ্রীকৃষ্ণের পরম অন্তরঙ্গলীলার বর্ণনা আছে। যে কোন মানুষের লীলা দুই রকমের হয়, একটা হয় বহিরঙ্গ আরেকটি হয় অন্তরঙ্গ। আমরা প্রায়ই অপরকে বলি 'তুমি হলে একটি দুমুখো সাপ, তোমার বাইরে এক রকম ভেতরে অন্য রকম'। কিন্তু বাইরে আর ভেতরে কখন এক রকম হয় না। একই রকম থাকে একমাত্র পাগল আর মহামুর্খের। বাকী সবারই ব্যবহার দুই রকম থাকে। মহাপুরুষদের দুই রকম ব্যবহার অবশ্যই থাকবে। ঠাকুর নরেন রাখালকে যা বলতেন বাইরের লোকদের সেই কথা বলতেন না। অন্তরঙ্গ বহিরঙ্গ থাকবেই। সেইজন্য কেউ যদি বলে 'তুমি দুমুখো সাপ, তোমার বাহির আর ভেতর আলাদা'। তার মানে, সে স্বাভাবিক। যদি এক রকম হয় তাহলে বুঝতে হবে তার ভেতরে গোলমাল আছে। মহাপুরুষদের ঠিক ঠিক যে তাঁর ব্যক্তিত্ব, সেই ব্যক্তিত্বটা বেরোয় তাঁর অন্তরঙ্গদের সামনে। শ্রীকৃষ্ণের ঠিক ঠিক ব্যক্তিত্ব হল তাঁর পরম দিব্য ভাব। শ্রীকৃষ্ণের এই পরম দিব্য ভাব কোথায় গিয়ে বেরোচ্ছে? পরম অন্তরঙ্গ লীলাতে। পরম অন্তরঙ্গ মানে, যিনি অন্তরঙ্গেরও অন্তরঙ্গ। ঠাকুরের পরম অন্তরঙ্গ হলেন নরেন রাখাল। ঠাকুর নরেন নরেন করে যাচ্ছেন। কথামৃতে আর কারুর জন্য ঠাকুরের এই ছটফটানি দেখা যায় না। যেমন শ্রীকৃষ্ণের রাধা ঠিক তেমনি ঠাকুরের হল নরেন, নরেন ঠাকুরের অন্তরঙ্গেরও অন্তরঙ্গ। এই অন্তরঙ্গের তল আমরা খুঁজেই পাব না। ভগবান আর তাঁর অন্তরঙ্গের এই ভালোবাসা যে কোন স্তরের আমরা কল্পনাও করতে পারবো না।

রাসলীলাতে আর কি আছে? ভগবানের স্বরূপ প্রকাশ। কার কাছে এই স্বরূপ প্রকাশ হচ্ছে? যিনি শ্রীকৃষ্ণের পরম অন্তরঙ্গ। এই অন্তরঙ্গলীলার সাথে আর কি আছে? দিব্যাতিদিব্য ক্রীড়া। দিব্য থেকেও দিব্য ক্রীড়া। কার সঙ্গে? গোপীদের সাথে। গোপীরা কারা? ভাষ্যকাররা বলছেন, নিজ স্বরূপভূতা। 'নিজ স্বরূপভূতা' অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি শব্দ, তাঁর নিজেরই স্বরূপ। গোপীরা শ্রীকৃষ্ণের থেকে আলাদা নন। আমি একটা ঘরের মধ্যে আছি, সেই ঘরে বিভিন্ন ধরণের আয়না টাঙানো আছে, কোনটা ডিম্বাকৃতি, কোনটা গোলাকৃতি, কোনটা লম্বাকৃতি আবার সাধারণ প্লেন আয়নাও আছে। সব কটি আয়নাতে আমারই বিভিন্ন রকমের আকৃতি প্রতিবিম্বিত হচ্ছে। একটা প্রতিবিম্বের কাছে গিয়ে বলছি 'বাঃ আমাকে বেশ রোগা দেখাচ্ছে'। আবার একটাতে মোটা দেখাচ্ছে, কোনটাতে বেঁটে, কোনটাতে গোল দেখাচ্ছে। কিন্তু সেই একই লোক। আয়না এখানে একটা উপমা হিসাবে নেওয়া হল। কিন্তু এখানে নিজ স্বরূপভূতা। যেমন আমার নিজের প্রতিবিম্ব হাজারটা আয়নাতে দেখাচ্ছে,

ঠিক তেমনি হাজার জন গোপীরা হলেন শ্রীকৃষ্ণের প্রকৃত স্বরূপের প্রতিবিম্ব। উপমাতে একটা জিনিষের উপমা আরেকটা জিনিষে নিতে গেলে অনেক রকমের সমস্যা এসে যায়। মূল তত্ত্ব হল গোপীরা শ্রীকৃষ্ণ থেকে ভিন্ন নন, তিনিই নানান রকমের শরীর ধারণ করেছেন, তিনিই তাঁর নিজের সাথে ক্রীড়া করছেন। সাধক কবি বলছেন 'আপনি করিলে আপনার পূজা আপনার স্তুতি গান'। শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলাতে এই একই জিনিষ হচ্ছে, তবে এখানে একটু অন্য ভাবে বলতে হবে 'আপনি করিলে আপনারে প্রেম'। গোপী আর শ্রীকৃষ্ণ আলাদা নন। শ্রীকৃষ্ণ নিজেই নিজেকে ভালোবাসছেন।

আজ পর্যন্ত কেউ কাউকে ভালোবাসতে পারেনি, ভালোবাসতে পারেই না, সম্ভবই নয়। নিজেকে ছাড়া মানুষ কক্ষণই অপরকে ভালোবাসতে পারে না। বৃহদারণ্যক উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্যকে মৈত্রেয়ী জিজ্ঞেস করছেন মানুষ স্ত্রী, পুত্র, ধন সম্পদকে কেন ভালোবাসে? যাজ্ঞবল্ক্য বলছেন 'সেখানে মানুষ নিজেকে দেখে, আত্মার প্রকাশকে সে দেখে'। মানুষের কথা বাদ দিন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলছেন 'ভক্তকে আমি ভালোবাসি'। কেন? *জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্*, জ্ঞানী হল আমার আত্মা। এখানেও আচার্য শঙ্কর তাঁর ভাষ্যে বলছেন মানুষ একমাত্র তার আত্মাকেই ভালোবাসে। যতক্ষণ মনে করবে ইনি আর আমি এক ততক্ষণই ভালোবাসা। স্বামীজী সুফি কবির কবিতা থেকে বলছেন প্রেমিক প্রেমিকার দরজায় করাঘাত করছে। ভেতর থেকে জিজ্ঞেস করছে 'কে'? বাইরে থেকে উত্তর আসছে 'আমি'। দরজা খুলল না। আবার দরজায় করাঘাত। আবার প্রশ্ন 'কে'? কিছুক্ষণ পরে বাইরে থেকে সাড়া এল 'আমি'। দরজা খুলল না। আবার দরজায় করাঘাত। 'কে'? এবার বলছে 'তুমি'। দরজা খুলে গেল। যেখানে আমি তুমি আছে সেখানে ভালোবাসা হতে পারেনা। ভালোবাসা একমাত্র সেখানেই যেখানে শুধু 'আমি' 'আমি' আছে বা শুধু 'তুমি' 'তুমি'। যে 'আমি', একমাত্র আমিই আছি বলছে সে জ্ঞানী। যখন বলে 'তুমি' 'তুমি', তুমিই আছ তখন সে ভক্ত। জ্ঞানীর ক্ষেত্রেও আমি তুমির ভেদ মিটে গিয়ে শুধু আমি থাকে *'অহং ব্রহ্মাস্মি'*। ভক্তের ক্ষেত্রে সেটাই তুমি তুমি তুঁহু তুঁহু হয়ে যায়, ঈশ্বর ছাড়া আর কেউই নেই। এই আমি তুমি ভেদ যেটা আচার্য ব্রহ্মসূত্রে বলছে যুস্মদ্ অস্মদ্ প্রত্যয়, আমি আছি আর এই বই আছে, আমি আর তুমি আলাদা পরিষ্কার দেখছি, এই ভেদ দৃষ্টি যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ কখনই ভালোবাসা যায় না।

ঠাকুর বলছেন যতক্ষণ আমি বোধ থাকবে ততক্ষণ তুমি বোধও থাকবে। যখন তুমি বোধ আছে তখন আমি আর তুমি সমান নয় এই বোধটাও থাকতে বাধ্য। সমান না হলে একজন বড় একজন ছোট হবেই। এগুলো জানার জন্য খুব বিরাট কিছু পাণ্ডিত্যের দরকার হয় না। একটা গরুও জানে সে আর ঘাস আলাদা। মাধ্বাচার্য যখন বলছেন, ভগবান আছেন আর তাঁর সৃষ্টি আছে, ভগবান আর জীব কখন এক হন না। এটা বোঝার জন্য এত দর্শন পড়ার কী দরকার! অথচ এই দ্বৈতবোধকে বদ্ধমূল ধারণা করার জন্য তিনি কত অকাট্য যুক্তি দিয়ে দ্বৈতবাদ দর্শন দাঁড় করিয়েছেন। তাঁর যুক্তির কাছে বড় বড় পণ্ডিতরাও দাঁড়াতে পারছেন না। কিন্তু অন্য দিকে সহজাত ধারণা থেকে বোঝা যাচ্ছে কোথাও একটা গোল আছে। কারণ যে শাস্ত্র আধার করে মাধ্বাচার্য বলছেন ভগবান আর জীব কোন দিন এক হবে না, সেই শাস্ত্রই আবার অন্য রকম কথা বলছে। যেমন এখানে বলছে নিজ স্বরূপভূতা। বিষয়ী লোক যখন দেখছে শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের সাথে লীলা করছেন তখন সে যুস্মদ্ অস্মদ্ প্রত্যয় নিয়ে দেখছে, তার আমি তুমি ভেদ আছে, গোপী আলাদা শ্রীকৃষ্ণ আলাদা। কিন্তু ভাগবত যখন বলছেন নিজ স্বরূপভূতা, তখন কে কার সঙ্গে লীলা করছে? হয় আমি আমি খেলা চলছে আর তা নাহলে তুমি তুমি খেলা চলছে। তাহলে এখানে ভেদ দৃষ্টি বা দ্বৈতবাদ কোথা থেকে আসছে? সেইজন্য ঠাকুর খুব সহজ করে বলে দিলেন যতক্ষণ দেহবুদ্ধি আছে ততক্ষণ আমি বোধ থাকবে, আমি বোধ মানেই তুমি বোধ আসবে, আমি তুমি বোধ মানেই অসমান বোধ, অসমান বোধ মানে একটা বড় একটা ছোট বোধ। ঈশ্বর থাকলে তার ভক্ত থাকবে। কিন্তু দেহবোধ যদি চলে যায়? মানুষ যখন খুব প্রিয় খাবার পেয়ে খেতে থাকে তখন তার দেহবোধ চলে যায়। এই খাবার খেয়ে আগে আমার শরীর খারাপ করেছিল তখন সেই কথাও মনে থাকে না। ঠিক তেমনি নিজের অত্যন্ত প্রিয়তমকে যখন কাছে পায় তখনও তার দেহবোধ চলে যায়। দেহবোধ যখন চলে গেল তখন মূল আমি বোধ সেটাই উড়ে গেল। আমি তুমি ভেদ না থাকাটাই অদ্বৈত। অত অদ্বৈতের কথা

না বলে সোজা বলে দেওয়া হচ্ছে নিজ স্বরূপভূতা। এখানে আমি তুমি নেই এখানে নিজ স্বরূপভূতা, নিজের স্বরূপের বাইরে কিছু নেই।

শুধু তাই নয়, হ্লাদিনী শক্তি, আনন্দের স্রোত আর তার সাথে চলছে দিব্যাতিদিব্য ক্রীড়া। শ্রীরাধিকাও আছেন আর গোপীরাও আছেন। ভক্তরা বলে বৃন্দাবনের নিধুবনে নিশীথ রাতে এখনও নাকি নিত্য রাস অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে। এই নিত্য রাসের ব্যাপারে লোকেরা বলে আগেকার দিনে রাত্রে মানুষ নিধুবনের দিকে তাকাত না। বিষয়ীরা যদি তাকায় তাহলে সে অন্ধ হয়ে যাবে। নিধুবনে যারাই পরিক্রমা করে তাদের এই ভাব – এখানে নিত্য রাস হয়ে থাকে।

রাস শব্দের অর্থ এসেছে রস থেকে। শ্রীকৃষ্ণই রস। উপনিষদেই বলা হয় ***রসো বৈ সঃ***, ভগবান তিনি হচ্ছেন রস, রসস্বরূপ। আনন্দই সব কিছুর মূল। মানুষ যা কিছু করে আনন্দ পাওয়ার জন্যই করে। মানুষ এত গরু খাটার মত পরিশ্রম করে, ঠাকুর বলছেন সাহেবের বুটের গোঁতা খেতেই থাকে। কেন করছে? আনন্দের জন্যই খেটে মরে। আনন্দের জন্য চারিদিকে ছুটে বেড়াচ্ছে। একদিকে দেখা যায় মানুষ চাঁদে চলে যাচ্ছে, মঙ্গল গ্রহে উপগ্রহ পাঠাচ্ছে আবার অন্য দিকে একটা পাগল লাঠি নিয়ে সারাদিন ধরে সারা শহরের মাটির ভাঁড় ভেঙে বেড়াচ্ছে। কেন? শুধু আনন্দের সন্ধানে। যখন বুঝে নেয় কোন কিছু থেকে আমি আর আনন্দ পাবো না, তখনই মানুষ আত্মহত্যা করে। পরিসংখ্যানে বলছে ভারতে গড়ে প্রত্যেক আট মিনিটে একজন করে আত্মহত্যা করে। যারা আত্মহত্যা করছে তারা ভাবছে এই জীবনে আমি আর আনন্দ পাবো না, তারাও তখন ভাবছে আমার মৃত্যুতেই আমার আনন্দ। কেন আনন্দের সন্ধানে মানুষ ছুটে বেড়াচ্ছে? *রসো বৈ সঃ*। আমার ভেতরে যিনি ঈশ্বর আছেন তিনি রসস্বরূপ, তিনি আনন্দস্বরূপ। যেখানেই আনন্দ সেখানেই ঈশ্বরের প্রকাশ। রামপ্রসাদ বলছেন 'মা! গো! আনন্দময়ী নিরানন্দ করো না'। আনন্দময়ী মা যদি ভেতরে বিরাজ করেন তখন নিরানন্দ থাকবে না। স্বামীজী বলছেন – আধ্যাত্মিক পুরুষ যাঁরা হন তাঁদের কখন গোমড়া মুখ থাকে না।

যখন এই রস সমূহ, যত রকমের রস হতে পারে সব রসকে যখন এক জায়গাতে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে আর তার সাথে ভগবান নিজেই যখন *আস্বাদীয়াত্তাস্বাদৎ*, সেটাই তখন রাস হয়ে যায়। রাসের উৎস হচ্ছে রস, রস মানে ভগবান। তারপর যত রকমের রস হতে পারে সব রস যখন এক জায়গাতেই জমা হয় তখন তাকে বলা হয় রাস। একটা যুবক ছেলে একটি যুবতী মেয়ের হাত ধরে পার্কে ঘুরছে। এটা কি তখন রাস হবে? কখনই হবে না। কেন হবে না? এই যে এখানে প্রেমরস সঞ্চারিত হচ্ছে, যখন ভগবান নিজে এই রসের আস্বাদক হবেন তখনই সেটা রাস হবে। এর সঙ্গে আর কি বৈশিষ্ট্য? যেটাকে আস্বাদ করা হচ্ছে সেটাও তিনি নিজে। আমি যখন ভোজন করি তখন আমি আর আমার খাদ্য বস্তু পুরো আলাদা অর্থাৎ আস্বাদক আর আস্বাদ এই দুটো সম্পূর্ণ আলাদা। কিন্তু রাসে যে রস আস্বাদ করা হচ্ছে তাতে ভগবান নিজেই আস্বাদক মানে যিনি জিনিষটাকে আস্বাদ করছেন আর যে জিনিষটাকে আস্বাদ করা হচ্ছে সেটাও তিনি। মানে গোপীরাও তিনি আর যিনি লীলা করছেন সেটাও তিনি এবং যে লীলাটি হচ্ছে সেটাও তিনি। কর্তা, কর্ম ও ক্রিয়া তিনটেই এক। যে কোন কাজের জন্য এই তিনটি দরকার, কর্ম তিনি, কর্তা তিনি আর যে ক্রিয়া হচ্ছে সেটাও তিনি আর পুরোটাই রস। সেইজন্য একে বলা হচ্ছে রাস। তার সাথে যে লীলা হচ্ছে, যে স্থানে হচ্ছে আর নানা রকমের যে আলম্বন এবং তার সঙ্গে যে উদ্দীপন হচ্ছে সবটাই তিনি। শ্রীকৃষ্ণ যখন গোপীদের সঙ্গে রাস করছেন তখন তাতে আলম্বন আর উদ্দীপন দুটোরই দরকার, এই দুটোর যা কিছু হচ্ছে এগুলো সবই রসের ক্রীড়া। এর সবটাই একত্রে রাসলীলার মধ্যে সঞ্চারিত করা হয়েছে। রসের যে পরাকাষ্টা তার সবটাই এই রাসলীলার মধ্যে ঢালা আছে। ঢেলে সবটাই এক হয়ে গেছে। কোথাও কোন ভেদ বুদ্ধি নেই।

কথামৃতে ঠাকুর ভাগবতের কথাই উল্লেখ করে বলছেন – কৃষ্ণ অন্তর্ধান হয়ে গেছেন। গোপীরা তখন কৃষ্ণকেই নকল করছেন 'আমি কৃষ্ণ হয়েছি'। গোপীরা কৃষ্ণপ্রেমে এমন তন্ময় হয়ে গেছেন যে বলছেন আমি কৃষ্ণ হয়েছি। কৃষ্ণের প্রতি এমন ভালোবাসা যে তাঁদের কোন হুঁশ নেই। ভগবানের এই দিব্যলীলা প্রতি মুহূর্তেই হয়ে চলেছে। কারণ আমরা তো ভগবান থেকে আলাদা নই। আমাদের যা কিছু হচ্ছে তিনিই সব কিছুকে

আস্বাদ করছেন। অনন্ত যিনি তিনিই সান্ত রূপের মাধ্যমে সেই অনন্তকেই আস্বাদ করছেন। যদিও এই আস্বাদন নিরন্তর হয়ে চলেছে তবু মাঝে মাঝে তাঁর বিশেষ দিব্যলীলা সংঘটিত হয়। এই বিশেষ দিব্যলীলায় বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত অত্যন্ত সৌভাগ্যবান ভক্তের সাথে এবং বিশেষ ক্ষেত্রে যে লীলা হয়, সেটাই তখন রাসলীলা হয়ে যায়।

বক্তা ভাষণ দিচ্ছেন শ্রোতারা শুনছেন। বক্তা যখন ভাষণ দিচ্ছেন তখন তিনি একটা আনন্দের অনুভূতি পাচ্ছেন, শ্রোতারা শুনছেন তাঁদেরও একটা আনন্দের অনুভূতি হচ্ছে। আনন্দের অনুভূতি তো একই জিনিষ, আনন্দ মানে রস, রস মানে *রসো বৈ সঃ*। যেখানে এইভাবে ঈশ্বরের লীলা হয় সেটাই রাস। ঈশ্বরের লীলা নিরন্তর হয়ে চলেছে। কখনই এমন অবস্থা হয় না যে ঈশ্বরের লীলা হচ্ছে না। কারণ মানুষ যা কিছু করছে, পশুপাখি যা কিছু করছে সবাই আনন্দের জন্যই সব কিছু করছে। গরু সবুজ কচি কচি ঘাস খাচ্ছে আনন্দের জন্যই, উট কাঁটা ঘাস খাচ্ছে আনন্দের জন্যই। মানুষ বিয়েথা করে সংসার করছে আনন্দের জন্য, সেই মানুষই গলায় দড়ি দিচ্ছে আনন্দের জন্যই। যখন রসগোল্লা খাচ্ছে তখনও আনন্দের জন্য আবার মদ খেয়ে যখন নেশাগ্রস্ত হচ্ছে তখন সেটাও আনন্দের জন্য। তাই লীলা নিরন্তর হয়ে চলেছে। সবটাই ঈশ্বরের লীলা। কিন্তু কিছু কিছু বিশেষ লীলা হয় যেটা বিশেষ ক্ষেত্রে, বিশেষ জায়গায়, বিশেষ কালে, বিশেষ লোকের সঙ্গে হয়, সেটাকে তখন বলা হয় রাসলীলা।

জগতের সব কিছুকে নাম ও রূপ দিয়ে জানা হয়। ওই নাম রূপটাও ঈশ্বরেরই নাম ও রূপ। কিন্তু কখন সখন ভগবান সাক্ষাৎ দিব্যধাম থেকে নেমে এসে শরীর ধারণ করে কিছু এমন লীলা করেন, যে লীলাকে স্মরণ করে, মনন করে উচ্চ আধ্যাত্মিক অধিকারী পুরুষরা তাঁদের আধ্যাত্মিক চেতনার স্তরকে আরও উপরের দিকে নিয়ে চলে যান। এর খুব সুন্দর নিদর্শন আমরা কথামৃতে পাই। ঠাকুর গোপীদের কথা বলছেন, গোপীদের কথা বলতে বলতে তাঁর চোখ দিয়ে অবিরল ধারায় প্রেমাশ্রু নির্গত হচ্ছে। আবার কখন ঠাকুর উদ্দাম নৃত্য করতে করতে সমাধিতে চলে যাচ্ছেন, সমাধি থেকে বাহ্যজগতে যখন ফিরে আসছেন তখন ঠাকুরের সেই মর্মস্পর্শী কণ্ঠস্বর 'হে কৃষ্ণ! হে প্রাণবল্লভ! দেখা দাও', যা কিনা পাষাণ হৃদয়কেও বিগলিত করে দেয়। গভীর ভাবে দুই এক ঘন্টা জপ করার পর যদি কেউ কথামৃতের এই দৃশ্যগুলিকে স্মৃতিপটে মনন করেন তখন তাঁর একটা আলাদা অনুভূতি হবে। রাসলীলাকে উল্লেখ করে ঠাকুর নিজের অনুভূতিকে সেই অবস্থায় নিয়ে যাচ্ছেন যে অবস্থায় গোপীরা কৃষ্ণপ্রেমে গিয়েছিলেন। ভাগবতের ভাষ্যকারদের ঠাকুরের কথা জানার কথা নয়, কিন্তু বলছেন যাঁরা উচ্চ আধ্যাত্মিক অধিকারী অর্থাৎ যাঁরা জ্ঞান ভক্তির উচ্চ অবস্থায় চলে গেছেন, তাঁরা এই রাসলীলার মত দিব্য ঘটনাকে যখন স্মরণ করেন তখন তাঁর চেতনার অবস্থাটা অনেক উপরে চলে যায়।

রাসলীলা মুষ্টিমেয় কয়েকজন উচ্চ আধ্যাত্মিক সম্পন্ন ব্যক্তির জন্য। রাসলীলার মত ঈশ্বরীয় দিব্যলীলা জনসাধারণের জন্য নয়। সুফিরাও নিজদের বলে আমরা হলাম chosen few, যাদের সিলসিলা অর্থাৎ পরম্পরা আছে তারাই হল সুফি দরবেশ। ঠিক তেমনি রাসলীলা মুষ্টিমেয় কয়েকজন নির্বাচিত ভক্তের জন্য। সাধারণ মানুষ অশুদ্ধ মন দিয়ে রাসলীলাকে ভৌতিক দৃষ্টিতে দেখবে। অথচ রাসলীলা স্মরণ করে যখন ঠাকুরের নৃত্য স্বামীজীর মত লোক দেখছেন তখন তিনি মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছেন। সেই স্বামীজীর মত লোক চিকাগোতে ভাষণ দিচ্ছেন, উচ্চ দর্শনের তত্ত্ব দিচ্ছেন, রচনাবলীতে স্বামীজীর সেই ভাষণ পাঠ করে আমরা আবার নিজেদের বর্তমান অবস্থাকে উন্নীত করছি। এইভাবে রাসলীলার আনন্দ ঠাকুর স্বামীজীর মাধ্যমে ঘুরে ঘুরে আমাদের মত স্তরের মানুষের কাছে চলে আসছে। সেইজন্য বলছেন মানুষ যখন আধ্যাত্মিক জীবনে কৃতকৃত্য হতে চায় তখন ঈশ্বরকে কি রকম ভালোবাসতে হবে, ঈশ্বরের সাথে রমণ কি রকম হয়, এই আধ্যাত্মিক অনুভূতির স্তরকে ধারণা করে তাকে আস্বাদন করার জন্যই রাসলীলা বর্ণনা। জ্ঞান আর ভক্তিতে কোন তফাৎ নেই, তুমি যে পথেই যাও না কেন, গোপীরা তাঁদের প্রিয়তম ইষ্ট শ্রীকৃষ্ণকে কি রকম পাগলের মত ভালোবাসত, গোপীরা ঈশ্বরের সাথে কেমন রমণ করেছিলেন, সেই রমণে তাঁদের কি কি দিব্য অনুভূতি হয়েছিল, সব পথের সাধককে এভাবেই ঈশ্বরকে ভালোবাসতে হবে, এভাবেই তাদের ঈশ্বরের সাথে রমন হবে, গোপীদের যা যা অনুভূতি হয়েছিল তাদেরও এই একই অনুভূতি হবে। রাসলীলা বর্ণনার মুখ্য উদ্দেশ্য এটাই, তুমিও এই আধ্যাত্মিক অনুভূতির স্তরকে ধারণা করে তাঁকে আস্বাদন করার জন্য প্রয়াসী হও।

এই পাঁচটি অধ্যায়ে কি কি আছে? এতে শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বণি, অভিসার, মিলন, দর্প, রমণ, অন্তর্ধান, পুনঃ প্রাকট্য এই ধরণের নানা জিনিষের সাথে গোপীদের নানা রকমের প্রশ্ন, নৃত্য, ক্রীড়া ইত্যাদির বর্ণনা পাওয়া যাবে। রাসলীলাতে যা কিছু হচ্ছে তার বর্ণনা করা হচ্ছে আমাদের ভাষায়, বর্ণনার ভাষাটা আমাদের কিন্তু ঘটনার সবটাই দিব্য। একটা দিব্য জিনিষকে বোঝাতে হলে আমাদের ভাষাতেই বোঝাতে হবে। ঠাকুর বলছেন – কাকেই বা বলব কেই বা বুঝবে। ভাষাটা মাধ্যম কিন্তু ভাষা যদি সীমিত হয় তখন নতুন ভাষার সৃষ্টি করতে হয়। যেমন গণিত শাস্ত্রে সাহিত্যের ভাষা চলে না বলে সেখানে নতুন ভাষা ব্যবহার করতে হয়। বিজ্ঞানও নিজের জন্য নতুন পরিভাষা সৃষ্টি করে। কিন্তু এখানে যে দিব্যলীলা সংঘটিতে হচ্ছে তা তো জনগণের, জনগণের জন্য হওয়াতে সাধারণ ভাষাকে ব্যবহার করা হয়েছে। তার ফলে আমরা ভুলবশাৎ এগুলোকে মানবীয় দৃষ্টিতে দেখে থাকি বলে আমাদের অনেক গোলমাল হয়ে যায়। প্রকৃতি আর চৈতন্য এই দুটি জগৎ, প্রকৃতিটাও তাঁরই। কিন্তু এখানে প্রকৃতি আর চৈতন্য জগৎ যুগপৎ আমাদের কাছে স্পষ্ট রূপে প্রতীয়মান হয়ে আছে। আমরা হলাম জড় সাম্রাজ্যের বাসিন্দা, আমাদের মস্তিষ্কের সব কিছুই জড় পদার্থ দ্বারা নির্মিত। ফলে মস্তিষ্ক যখন চৈতন্য রাজ্যের কিছুকে ধরে তখন সেটাকে সে তার জড় রাজ্যের মত করেই দেখে। সেইজন্য বলা হয় এই রাসলীলার রস আর তার ঠিক ঠিক যে প্রভাব, তাকে ধারণা করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়।

ভগবানকে উপনিষদে বলা হচ্ছে *রসো বৈ সঃ*, তিনি রসস্বরূপ। শাস্ত্র জানা না থাকলে কি রকম গোলমাল হয় তার খুব সুন্দর বর্ণনা কথামৃতে ঠাকুর ব্যঙ্গ করে বলছেন। অনেকে ঠাকুরকে বলত আপনি তো কিছু পড়াশোনা করেননি, শুনে ঠাকুর বলতেন 'আমি শুনেছি কত'। সেইজন্য কথামৃত পড়ার সময় আমরা অবাক হয়ে যাই, যিনি কোন শাস্ত্র, কোন গ্রন্থ পড়েননি কিন্তু যেখানে শাস্ত্রের মূল কথাগুলো বলছেন সেখানে কোথাও এতটুকুও কোন গোলমাল নেই। ব্রাহ্ম সমাজের একজন বক্তা উপাসনার সময় তাঁর বক্তৃতায় বলছেন ভগবান হলেন নিরস, আমাদের ভক্তি রস দিয়ে তাঁকে রসে পূর্ণ করতে হবে। আসলে ব্রাহ্ম সমাজের লোকেরা ঈশ্বরকে নিরাকার বলত, সেখান থেকে যিনি নিরাকার তিনি নিরস এই ভাবটা বক্তার মাথায় কোন ভাবে এসে থাকতে পারে। ঠাকুর দুঃখেই হোক আর ব্যঙ্গ করেই হোক বলছেন 'বেদে যাঁকে রসস্বরূপ বলা হয়েছে তাঁকে বলছে কিনা নিরস'। সেইজন্য আধ্যাত্মিক জীবনে যিনিই এগোতে চাইছেন প্রথমে তাঁকে শাস্ত্রটা ভালো করে বুঝতে হবে। শাস্ত্র না জানা থাকলে আধ্যাত্মিক জীবনে অনেক গোলমাল হয়ে যাবে। শাস্ত্রের কথা না জেনে ধ্যান ধারণা করতে গিয়ে মাথায় কোন চিন্তা উঠলে মনে হবে এটাই যেন ঠিক। আমাদের তাই বারবার বলা হয় আধ্যাত্মিক সত্যের মাপকাঠি হল শ্রুতি, যুক্তি ও অনুভূতি। এই তিনটে এক না হলে কখনই আমার চিন্তা বা অনুভূতিকে সত্য বলে মান্যতা দেওয়া হবে না। প্রথমে তাকে শ্রুতির সাথে মিল থাকতে হবে। যদি শ্রুতির সাথে সরাসরি মিল না থাকে, যেখানে মনে হচ্ছে আমি নতুন চিন্তা ভাবনা পেয়েছি, তখন দেখতে হবে আগে যেখানে শ্রুতিতে বলা হয়েছে সেটাকে কোথাও খণ্ডন করা হচ্ছে কিনা। যেমন শাস্ত্রে ঈশ্বরকে কোথাও নিরস বলা হচ্ছে না। আমি এখন বললাম ঈশ্বর নিরস। তাহলে আগে দেখ শ্রুতিতে ঈশ্বরকে রসের ব্যাপারে কি বলছে। শ্রুতিতে বলছে ঈশ্বর রসস্বরূপ। তাহলে আমার কথা নেওয়া যাবে না। এই ব্যাপারে শ্রুতিতে আগেই বলে দেওয়া হয়েছে। আমি যেটা বলছি সেটা শ্রুতির বিরুদ্ধে যাচ্ছে। এছাড়াও দেখতে হবে যুক্তিতে দাঁড়াচ্ছে কিনা বা আমি যা অনুভূতি পেয়েছি সেটা ভবিষ্যতে অপরেও লাভ করতে পারবে কিনা।

তিনি হলেন রসস্বরূপ। যত রকমের রস আছে সব রকমের রসকে যখন এক জায়গায় ঢেলে দেওয়া হচ্ছে আমাদের সাধারণ লৌকিক দৃষ্টিতে সেটাকেই বলা হচ্ছে রাস। রাস হল আনন্দের পরাকাষ্টা। ঠাকুর বলছেন নারী সঙ্গে আনন্দ কতটুকু, ব্রহ্মানন্দের আনন্দ তার থেকে শত কোটি গুণ বেশী। এই আনন্দের অনুভূতি মানুষকে কখনই বোঝান যাবে না। কিন্তু ঈশ্বরের সাক্ষাৎ করার যে আনন্দ, ঈশ্বরের সাথে রমণ করার যে আনন্দ সেই আনন্দটা কি রকম তারই বর্ণনা এই রাসলীলাতে করা হয়েছে। সেইজন্য বলা হয়, রাসলীলা এত উচ্চ অবস্থার বর্ণনা যে, সাধারণ লোক ধারণা করা দূরে থাক, বুঝতেই পারবে না। তাই সর্বসাধারণের সামনে রাসলীলার বর্ণনা করতে নিষেধ করা হয়।

যারা জড় রাজ্যের বাসিন্দা এখানে তাদের কথা প্রথমে বলা হচ্ছে, জড় রাজ্যে বাস করা মানে বুদ্ধি বৃত্তিকে নিয়ে যারা চলে, যদিও বেশীর ভাগ লোক ইন্দ্রিয় রাজ্যেই বাস করে। বুদ্ধি বৃত্তি বলেও এদের কিছু নেই, বুদ্ধির এলাকাতেও থাকে না। যাঁরা বড় চিন্তাবিদ তাঁরা বুদ্ধির এলাকায় থাকেন। বাকি সবাই ইন্দ্রিয় রাজ্যেই বাস করে, ইন্দ্রিয় রাজ্য মানে আহার, নিদ্রা আর মৈথুন, এই তিনটে ছাড়া আর কিছুর চাহিদা নেই। যারা জড় রাজ্যের বাসিন্দা, তাদের যত রকমের কামনা-বাসনা, মনের মধ্যে যে চিন্তা বা কল্পনা গিজ্‌গিজ্‌ করছে, সেই কল্পনা দিয়েই তারা জগৎকে দেখে। মন হল রঙিন কাঁচের মত। মন যে রঙে রাঙানো থাকবে সেই রঙেই সে জগৎকে দেখবে। যখন সে ঈশ্বরের কথা শোনে বা কোন উচ্চ আধ্যাত্মিক মানুষের আচরণকে দেখে তখনও সেই ওই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই দেখে। ঠাকুর সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপধ্যায়কে বলছেন মূলো খেলে মূলোর ঢেকুর ওঠে। তার মানে, তোমার মনে যে ধরণের বৃত্তি ও সংস্কার আছে, তুমি যখন যা কিছু দেখবে বা বিচার করবে তখন সেই বৃত্তি ও সংস্কার অনুযায়ীই করবে বা দেখবে। যে আহার, নিদ্রা আর মৈথুন নিয়েই আছে তাকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় জীবনের উদ্দেশ্য কি, তখন সে বঙ্কিমবাবুর মতই বলবে জীবনের উদ্দেশ্য আহার, নিদ্রা আর মৈথুন। কিন্তু যাঁরা আধ্যাত্মিক রাজ্যে প্রবেশ করে গেছেন প্রথমেই তাঁদের এই তিনটে জিনিষ খসে যায়।

স্থূল, সূক্ষ্ম আর কারণ এই তিন রকম দেহের সংযোগে আমাদের প্রাকৃত শরীর নির্মিত। এই তিনটের মধ্যে স্থূল শরীরের কোন মূল্যই নেই। সুস্থ শরীর, অসুস্থ শরীর, সুন্দর শরীর, কুৎসিৎ শরীর আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে এগুলোর বিন্দুমাত্র তাৎপর্য নেই। অন্য দিকে সূক্ষ্ম শরীরের কিন্তু বিরাট গুরুত্ব আছে। সুক্ষ্ম শরীর দিয়েই সব কিছু চলছে। সূক্ষ্ম শরীরের পেছনে থাকে কারণ শরীর, যে শরীর দিয়ে সব কিছু নির্মাণ করা হচ্ছে। সূক্ষ্ম শরীরের থেকে আবার কারণ শরীরের গুরুত্ব অনেক বেশী। যতক্ষণ কারণ শরীরটা থাকবে ততক্ষণ মুক্তি হবে না। স্থূল শরীর থেকে যখন খুশি আমরা মুক্তি পেতে পারি, আত্মহত্যা করে দিলেই এই স্থূল শরীর থেকে মুক্তি হয়ে যাবে। যে আত্মহত্যা করছে সে মনে করছে আমার মুক্তি হয়ে গেল। কিন্তু সূক্ষ্ম শরীরটা তো তার থেকে গেছে। আত্মহত্যা করার জন্য এই সূক্ষ্ম শরীরটা প্রেতযোনীতে গিয়ে পড়ে থাকবে। কোন রকমে যদি সূক্ষ্ম শরীর থেকে মুক্তি হয়ে যায়, তখনও কিন্তু তার মুক্তি হবে না। কারণ তার কারণ শরীরটা থেকে গেছে। সূক্ষ্ম শরীর থেকে মুক্তি হয়ে গেলে যে কারণ শরীর পড়ে থাকছে, এই শরীর সাধারণ জগতে থাকে না, খুব উচ্চ জগতে চলে যায়।

প্রকৃতির রাজ্যে কোন শরীরের জন্ম হতে গেলে দুটো জিনিষের মিলন হওয়া চাই। সচরাচর বলা হয় নারী-পুরুষ সংযোগেই শরীরের জন্ম হয়। কিন্তু আমাদের ঋষি-মুনিরা নারী-পুরুষের সংযোগ ছাড়াও শরীরের জন্ম দেওয়ার জন্য বা সৃষ্টির ব্যাপারে আরও কিছু অন্য ধরণের পদ্ধতির কথা বলে গেছেন। যেমন বলে থাকেন যাঁরা উচ্চ কোটির ঋষি তাঁরা সঙ্কল্প মাত্রই যে কোন কিছুর সৃষ্টি করে দিতে পারেন। এখানে কিন্তু ব্রহ্মা বা প্রজাপতির কথা বলা হচ্ছে না। মহাভারতেও আছে, যাঁর লোকসিদ্ধি হয়ে গেছে অর্থাৎ যিনি পৃথিবী তত্ত্বকে জয় করে নিয়েছেন, তিনি ইচ্ছে করলেই যে কোন জিনিষকে সৃষ্টি করে দিতে পারেন। শাস্ত্রে এই ধরণের কিছু কিছু বর্ণনা পাওয়া যায়, যেগুলো এনারা সবাই মানেন, সেখানে বলা হচ্ছে কোন মহাপুরুষ যদি হৃদয়, কর্ণ, নেত্র, মস্তক ইত্যাদি যে কোন অংশে শুধু মাত্র স্পর্শ করে দেন সেখান থেকেই একটা শরীরের জন্ম হয়ে যেতে পারে। কিন্তু সেখানেও একটা সংযোগের ব্যাপার আছে, একটা নারী শরীর আছে আর একজন মহাপুরুষ আছেন। যদিও স্বাভাবিক কামজনিত কারণে যেভাবে শরীর হয় এখানে সেভাবে হচ্ছে না কিন্তু অন্য প্রক্রিয়ায় হয়। আবার কখন সখন এমনও হয় এই সংযোগেরও দরকার হয় না। তখন সেই শরীরটাই হয়ে যায় অমৈথুনী শরীর। অমৈথুনী শরীর মানে যে শরীরের জন্মের জন্য দুটো শরীরের সংযোগের দরকার পড়ে না। একা একাই সৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে, যেমন ব্রহ্মা সৃষ্টি করেন। ব্রহ্মা একাই সঙ্কল্প করলেন সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টি হয়ে গেল। আরেক ধরণের সৃষ্টির প্রক্রিয়া আছে যেটাকে বলা হয় নির্মাণকায়। নির্মাণকায়ের মত আরেক ধরণের প্রক্রিয়াকে বলা হয় ব্যূহকায়। ব্যূহকায় যেন নির্মাণকায়েরই ভাই। যোগীরা সাধনা করতে করতে একটা উচ্চ অবস্থায় পৌঁছে তাঁরা যোগদৃষ্টিতে দেখতে পান তাঁর অনেক কর্ম এখনও ফলবতী হতে বাকি আছে। এই কর্মগুলোকে কাটাতে

যোগীর হয়ত দশটা জন্ম লেগে যাবে। তখন তিনি তাঁর যোগশক্তিকে প্রয়োগ করে এক সঙ্গে নিজেরই দশটা শরীর তৈরী করে নেন। এবার ঐ দশটা শরীর দিয়ে দশ রকমের দশটা জন্মের কর্ম পার করতে শুরু করে দেন। তাতে এই এক জন্মেই তাঁর কর্মগুলো ক্ষয় হয়ে যায়। যদিও এই শরীরগুলো অত্যন্ত শুদ্ধ হয়, কারণ যোগী নির্মাণকায়ে তাঁর নিজের যোগশক্তিতে এই শরীরকে দাঁড় করিয়েছেন, সেখানে কোন ধরণের মৈথুন, কোন ধরণের স্পর্শ কিছুই নেই। এই শরীরগুলো করা হয়েছে কিসের জন্য? যোগ, ধ্যান, তপস্যা করে দশ জন্মের কর্মকে এক জন্মে কাটাতে হবে, তার জন্য দশটা শরীর দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। এই নির্মাণকায় বা ব্যূহকায় যাই হোক এই শরীরগুলো তৈরী করা হয়েছে প্রকৃতির এলাকাতেই। কারণ প্রকৃতির উপাদান নিয়েই এই শরীরগুলো নির্মিত হয়েছে। এমন কি দেবতাদের যে দিব্য শরীর সেটাও এই প্রকৃতির উপকরণ দিয়েই নির্মিত। দেবতাদের শরীরে তেজ তত্ত্ব বেশী থাকে এবং এই তেজ তত্ত্ব প্রকৃতিরই একটা উপাদান। এর বাইরে যে শরীর তৈরী হয় সেটাই অপ্রাকৃত শরীর, যেটা প্রকৃতির বাইরে। অপ্রাকৃত শরীর সব সময় চিদানন্দময়, কারণ এই শরীর প্রকৃতির রাজ্যে তৈরী হয় না। এখানে ব্যাসদেব বলছেন শ্রীকৃষ্ণের শরীর অপ্রাকৃত শরীর, শুধু আনন্দ দিয়ে এই চিদানন্দময় শরীর তৈরী। চিদানন্দময় শরীরে দেহ দেহী, আমি ও আমার এই শরীর আর আমি এই শরীরে বাস করছি এই ভাব কখন আসে না। কারণ এটা অপ্রাকৃত শরীর। ঠিক তেমনি গুণ-গুণী, রূপ-রূপী, নাম-নামী, লীলা আর লীলা পুরুষোত্তমের কোন তফাৎ থাকে না।

এখানে খুব সুন্দর একটি কথা বলা হচ্ছে, শ্রীকৃষ্ণের এক একটি অঙ্গ শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ রূপ। এটি একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ ধারণা। শ্রীকৃষ্ণের যে মুখাবয়ব সেটি যেমন পূর্ণ শ্রীকৃষ্ণ ঠিক তেমনি তাঁর শ্রীপদের নখ সেটিও শ্রীকৃষ্ণ। ফলে তাঁর প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয় প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয়ের কাজ করে দিতে পারে। শ্রীকৃষ্ণের এই ধরণের ছবি যদি সহজে বুঝতে হয় তাহলে শ্রীকৃষ্ণের একটা কোলাজ্ তৈরী করা দরকার। কোলাজটাও শ্রীকৃষ্ণ, কিন্তু যত বিন্দু দিয়ে শ্রীকৃষ্ণের কোলাজ্ তৈরী করা হয়েছে, সেই বিন্দুগুলিও শ্রীকৃষ্ণ। যখন নাককে ম্যাগনিফাই করছি তখন দেখছি নাকটাও শ্রীকৃষ্ণ, এরপর নাকের ছোট্ট একটা অংশকে বড় করলাম তখন দেখছি সেটাও শ্রীকৃষ্ণ। এইভাবে শরীরের প্রত্যেকটি অনু শ্রীকৃষ্ণ। এই ভাবটা আসলে আর কিছুই নয়, শ্রীকৃষ্ণ ভগবান, তাঁর শরীর প্রাকৃত নয়। প্রাকৃতিক শরীরে যে কান, নাক, চোখ আছে এগুলো সবই প্রকৃতির নিয়মানুযায়ী কাজ করবে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের শরীর সেই রকম প্রাকৃত শরীর নয়। ফলে তিনি তাঁর কান দিয়ে চোখের কাজও করতে পারবেন আবার চোখ দিয়ে কানের কাজও করতে পারবেন। শ্রীকৃষ্ণ তাই প্রকৃতির সব নিয়মের বাইরে। এর ফলস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের শরীর পূর্ণতম। শ্রীকৃষ্ণের এই অঙ্গটা শ্রেষ্ঠ আর এই অঙ্গটা নিকৃষ্ট এই নিয়ম চলবে না। বেদের পুরুষসূক্তমে বলছে পুরুষের পা থেকে শূদ্রের জন্ম। এই নিয়ে আমাদের দেশে অনেক বিতর্কমূলক কথাবার্তা হয়। ভগবানের পা কি কোন নিকৃষ্ট বস্তু? এখানে বলছেন শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যেকটি অঙ্গই শ্রীকৃষ্ণ। ভগবানের মুখের যে মূল্য তাঁর পায়ের সেই একই মূল্য। দ্বিতীয় কথা, ভগবানের যখন বন্দনা করা হয় তখন তাঁর শ্রীচরণের বন্দনাই করা হয়, তাঁর মুখমণ্ডলের যদিও বর্ণনা করা হয় কিন্তু বন্দনা করা হয় শ্রীচরণের।

সেইজন্য বলা হয় শ্রীকৃষ্ণের রূপ মাধুরী নিত্য শোভনশীল। এই রূপের কোন ক্ষয় হয় না। দিনে দিনে তাঁর রূপ যেন বৃদ্ধি পেতে থাকে। আসলে বৃদ্ধি পেতে থাকে যে বলা হচ্ছে তাতে এটাই সিদ্ধ করতে চাইছেন যে, এই রূপের কখন হ্রাস প্রাপ্তি হয় না। একই রূপ আর সৌন্দর্য দেখে দেখে মানুষের মনে একঘেঁয়েমি আসতে পারে কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের রূপের নিত্য নবীন সৌন্দর্যময়তায় মানুষের মনে কখনই বিরক্তি ভাব আসবে না। এর ফলস্বরূপ তাঁর সৌন্দর্য সমস্ত প্রাণীকে আকর্ষণ করে তাঁর দিকে টানতে থাকে। ঈশ্বরীয় রূপের এটাই বৈশিষ্ট্য, মানুষের হৃদয়কে অতি সহজে টেনে নেয়। বাল্মীকি রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্রের খুব সুন্দর বর্ণনা করে বলছেন শ্রীরামচন্দ্র যখন সভায় প্রবেশ করলেন তখন যেন হাজারটা সূর্য জ্বলে উঠল। সেই আলোতে বাকি সবার তেজ নিষ্প্রভ হয়ে গেল। শ্রীরামচন্দ্র আবার যখন সভা ত্যাগ করে চলে গেলেন তখন রাজসভা যেন বিবর্ণ হয়ে গেল। চৈতন্য সত্তার প্রকাশ যাঁর মধ্যে যত বেশী প্রকাশিত, তাঁর রূপ তত বেশী মানুষকে আকর্ষণ করে আর তাঁর ব্যক্তিত্বের তেজ সেই জায়গার সমস্ত পরিমণ্ডলকে সৌন্দর্য মণ্ডিত করে তোলে। সেইজন্য শ্রীকৃষ্ণ যখন গোচারণ করতেন, বনের মধ্যে বিচরণ করতেন তখন তাঁর অতুলনীয় সৌন্দর্যে বন্য পশু, গাভী, পাখি, বৃক্ষ,

লতা, নদী, পাহাড় সবার হৃদয় পুলকিত হয়ে উঠত, তাদের বাহ্যক্রিয়াদি সব রহিত হয়ে গিয়ে নিমিলেষ নয়নে শুধু শ্রীকৃষ্ণের রূপমাধুর্যের অমৃত সুধা পান করতে থাকত।

শ্রীকৃষ্ণের এটা একটা দিক। অন্য দিকে গোপীদের ব্যাপার যখন আসে তখন তাঁদের সাধনার কথা আসে। সাধনা দুই প্রকার – একটা সাধনা হল বৈধী ভক্তি। বৈধী ভক্তি বলতে বোঝায় বিধি-বাদীয় ভক্তি, অর্থাৎ ধর্মীয় নীতি ও শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে পূজো, পাঠ, জপ-ধ্যান ইত্যাদি করা। সূর্যোদয়ের আগে উঠতে হবে, জপ-ধ্যান করতে হবে, পঞ্চ মহাযজ্ঞ করতে হবে, তীর্থ করতে হবে এগুলো সবই বৈধী ভক্তি। তীর্থ করা মানে কাজিরাঙা ফরেস্ট, দার্জিলিং, কালিম্পং বেড়াতে যাওয়া নয়। আধ্যাত্মিক ও দৈবী শক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিরা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখতে কখনই ভ্রমণপিপাসুদের মত পাহাড়ে, জঙ্গলে, সমুদ্রে ঘুরতে যাবেন না। যাদেরই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখতে এখনও ভালো লাগছে, চাঁদ দেখতে ভালো লাগছে, নদীর ঢেউ শুনতে ভালো লাগছে, মনের মধ্যে যেখানেই প্রকৃতিকে নিয়ে কোন কিছু চলছে বুঝতে হবে তার মধ্যে এখনও আধ্যাত্মিক সত্তা নিষ্প্রভ হয়ে আছে। কথামৃত, স্বামীজীর রচনাবলী, পুরো বেদ উপনিষদে কোথাও প্রকৃতিকে নিয়ে একটি শব্দ নেই, কোথাও চাঁদের বর্ণনা, নদীর বর্ণনা পাওয়া যাবে না। যারা এগুলোর বর্ণনা করতে ভালোবাসে, দেখতে ভালোবাসে তারা এখনও আসুরিক শক্তিতে পরিপূর্ণ। কালিদাসের কবিত্বের প্রতিভা ব্যাসদেব থেকেও অনেক উচ্চমানের কিন্তু ব্যাসদেবকেই সারা ভারত গুরু রূপে দেখে এবং তাঁর চরণে সবাই মাথা নত করছে, ব্যাসদেবের জন্মদিনেই গুরুপূর্ণিমা রূপে পালিত হচ্ছে। বাল্মিকীর কবি প্রতিভার সাথে কালিদাসের কিছুটা তুলনা করা যেতে পারে, কিন্তু সেখানেও বাল্মীকিকে ভারতবাসী যেভাবে মনে রেখেছে সেইভাবে কালিদাস অতটা ভারতবাসীর হৃদয়ে জায়গা করে নিতে পারেনি। কালিদাস ছিলেন প্রকৃতির পূজারী। মনে মনে আমরা সবাই সৌন্দর্যের পূজারী। এখানে সৌন্দর্যের পূজারী মানেই প্রকৃতির পূজারী। প্রকৃতির পূজারী মানে আধ্যাত্মিক রাজ্যে প্রবেশের অনেক দেরী আছে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে যারা উপভোগ করতে চাইছে তাদের তাড়াহুড়ো করার কিছু নেই, এদের এখনও অনেক সময় লাগবে। তাড়াহুড়ো করারও দরকার নেই, কারণ প্রকৃতি তো অনিত্য আর ঈশ্বর নিত্য। যেটা অনিত্য সেটাকেই আগে ধরতে হবে, নিত্য তো আর কোথাও যাবে না, সেতো থাকবেই। এই জন্মে না হলে পরের জন্মে হবে, পরের জন্মে না হলে তার পরের জন্মে হবে। যারা বৈধী ভক্তি করতে চাইছে তাদের এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের ভোগও বন্ধ করে দিতে হবে। এটাকে বন্ধ করে তাদের হয় ঘরে বসে জপ-ধ্যান করে যেতে হবে তা নাহলে তীর্থ দর্শনে যেতে হবে। তবে এগুলো সবই বৈধী ভক্তি।

বৈধী ভক্তি করতে করতে সাধকের একটা অবস্থা আসে যখন এই বৈধী ভক্তিকেও সে অতিক্রম করে চলে যায়। তখন আসে প্রেমাভক্তি বা রাগাত্মিকা ভক্তি। শাস্ত্রে এর অনেক রকম পরিভাষা ব্যবহার করা হয়। ঠাকুরও এই প্রেমাভক্তিকে কখন বলছেন রাগাত্মিকা ভক্তি। অনেক সময় এই প্রেমাভক্তিকে মর্যাদারহিত বলা হয়। মর্যাদরহিত মানে মর্যাদাকে ভঙ্গ করে দেয়। মর্যাদাকে যখন অতিক্রম করে যায় তখন তাকে অনেক সময় অবৈধ ভক্তি বলে। অবৈধ মানে কোন বিধিকে সে আর মানছে না। আমরা যখনই গোপী, কৃষ্ণ আর রাসলীলার কথা স্মরণ করি তখন আমরা ভুলে যাই যে, গোপীরা যা কিছু করেছিলেন তার তুলনায় ঠাকুর অনেক গুণ বেশী বিধিকে উল্লঙ্ঘন করেছেন। মা ভবতারিণীর পূজো করছেন, ঠাকুর দেখছেন চারিদিকে চিন্ময়ী মা বিরাজমানা, চারিদিকে ফুল ছুঁড়ছেন। এটাই অবৈধ ভক্তি হয়ে গেল, বিধি আর পালিত হচ্ছে না। বিধি কি করতে বলছে? বিগ্রহের চরণে ফুল দিতে হবে। আমরা যদি ঠাকুরের মত করতে যাই আমাদের পাগলা গারদে পুরে দেবে। ঠাকুরকেও পাগল বলে প্রচার করার চেষ্টা হয়েছিল। আর এই পাগলের চিকিৎসার জন্যই তাঁকে বিয়ে দিয়ে দেওয়া হল। কিন্তু এই বৈধী ভক্তি যখন সাধককে তুঙ্গে নিয়ে চলে যায় তখন একটা অবস্থার পর যিনি আধ্যাত্মিক সত্তা তিনি নিজে সাধকের সব ভার নিয়ে নেন। তখন আমি তুমি ভেদটা মুছে যায়। অবৈধ ভক্তি বা প্রেমাভক্তি বা রাগাত্মিকা ভক্তি যখন হয় তখন আমি তুমির স্থান, কালের ভেদাভেদটা মুছে গিয়ে আমি তুমিটা এক হয়ে যায়। তখন যা কিছু হয় সবটাই বিধি নিষেধকে পার করে যায়। বিধি নিষেধ পার করে যাওয়ার পর জিনিষটা কি রকম দাঁড়ায় বোঝার জন্য ঠাকুরের মায়ের প্রথম দর্শনের পর তিনি মন্দিরে যে ভাবে মা ভবতারিণীর পূজাদি করছেন সেই দৃশ্যকে আমাদের মানসপটে নিয়ে আসতে হবে। মাকে ভোগ নিবেদন

করেছেন, দেখছেন বেড়াল। ঠাকুর দেখছেন মা ঐ বেড়াল রূপেই এসেছেন, বেড়ালকেই ভোগ খাইয়ে দিচ্ছেন। এ যে কত উচ্চ অবস্থায় হতে পারে আমাদের কল্পনার বাইরে। এই ঘটনাকে যদি আমরা নিয়মানুসারে বিচার করি তাহলে গোপীদের রাসলীলা আর ঠাকুর যে বেড়ালকে মা কালীকে ভোগ নিবেদন করার আগে সেই ভোগ খাইয়ে দিচ্ছেন এই দুটোর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। দুটোতেই বিধিকে লঙ্ঘন করা হচ্ছে।

বিধি নিষেধের সাথে সাথে আমাদের অনেক কর্ম ও ধর্ম পালন করতে হবে। স্মৃতি ও অন্যান্য শাস্ত্রের মতে এগুলো না করাটা অত্যন্ত পাপ। কিন্তু যখন ভক্তির উদ্দাম তরঙ্গের ঢেউ আছড়ে পড়ে তখন সব কর্ম, ধর্ম ছিটকে বেরিয়ে যায় আর প্রেমটা অবৈধ অবস্থায় চলে যায়। প্রেম অবৈধ হয়ে গেলে যে জিনিষগুলো করার জন্য আগে প্রশংসা করা হত, সেগুলো করাটাই তখন পাপ বলা হয়। যার মধ্যে ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা জেগে গেছে, যার মন প্রাণ ঈশ্বরের প্রেমে ডুবে গেছে, সে যদি তখন কোন বিধি নিষেধ পালন করে সেটাই তার কাছে কলঙ্ক। আগে বিধি নিষেধ পালন না করাটা ছিল কলঙ্ক, ঈশ্বরের প্রেমের রাজ্যে প্রবেশ করার পর এই বিধি নিষিধটাই হয়ে যায় বন্ধন। তখন তিনি আর কিছুই পালন করেন না, তিনি যে আগে থেকে ঠিক করে নিয়ে পালন করছেন না, তা নয়। এগুলো আপনা থেকেই খসে যায়। গীতায় ভগবান বলছেন *সর্বধর্মান্ পরিত্যাজ্য*, *সর্বধর্মান্* মানে যত রকমের বিধি নিষিধ আছে সব কিছুকে পার করে যেতে হবে। যদি বলে আমাকে বিধি নিষেধ পার করত হবে, তখন এটাও একটা ধর্মের মধ্যে পড়ে যাচ্ছে। কিন্তু এখানে চিন্তা করে, বুদ্ধি খাটিয়ে পার করতে হচ্ছে না, তাঁর মস্তিষ্কই ঈশ্বর প্রেমে এমন আবিষ্ট হয়ে গেছে, ঈশ্বরে প্রতি এত একাগ্রতা হয়ে গেছে যে কোন হুঁশ নেই।

পূর্ণিমার জ্যোৎস্নার স্নিগ্ধ কোমল আলোকে প্লাবিত রাতে শ্রীকৃষ্ণের কাছে গোপীদের অভিসারে আগমন, এটাই ঠিক ঠিক অবৈধ ভক্তির প্রকাশ। যত রকমের বন্ধন হতে পারে, যত রকমের বিধি নিষেধ হতে পারে সব কিছুকে পার করে গোপীরা শ্রীকৃষ্ণের কাছে অভিসারে চলে এসেছেন। গীতায় অর্জুনকে যে *সর্বধর্মান্ পরিত্যাজের* কথা বলা হয়েছে ঠিক এই জিনিষটাই রাসলীলাতে গোপীরা করে দেখালেন। রাসলীলাতে যা কিছু বর্ণনা করা হয়েছে তা শুধু এই ধারণাটুকু করার জন্য যে, প্রেমাভক্তিতে কি কি হতে পারে। প্রেমাভক্তিকে কোন ভাবে জাগতিক স্তরে অনুকরণ করা একেবারে নিষিদ্ধ। অবৈধ ভক্তি একমাত্র ভগবানই করতে পারেন, ভগবান ছাড়া আর কারুর পক্ষে অবৈধ ভক্তি করা সম্ভবই নয়। যিনি এই অবৈধ ভক্তিতে যেতে চাইছেন তাঁকে ঐ স্তরে যেতে হবে, ঈশ্বরের ভালোবাসার জন্য আমাকে সব কিছু ছেড়ে দিতে হবে। তাঁর প্রতি এমন তীব্র ভালোবাসা আসবে যে জাগতিক সমস্ত কিছু খড়কূটোর মত উড়ে যাবে, এই না হলে অবৈধ ভক্তি হয় না।

রাসলীলা আলোচনা শুরু করার আগে এই কয়েকটি মূল জিনিষকে আমাদের খুব ভালো করে বোঝা দরকার। প্রথম হল, তিনি হলেন রসস্বরূপ। যখন নানান রকমের রস এক জায়গাতে সম্মিলিত হচ্ছে সেটাই হল রাস। দ্বিতীয় হল, ভগবানের শরীর নিত্য চিদানন্দময়। তাঁর শরীর ধারণটাই মায়া। *জন্ম কর্ম চ মে দিব্যং*, আমার জন্ম, আমার কর্ম সবটাই দিব্য। এই দিব্য ভাবকে না বুঝতে পারলে প্রকৃতির এলাকাকে ছাড়িয়ে প্রকৃতির পারে যাওয়া যাবে না। আমাকে পাওয়ার শেষ কথা *সর্বধর্মান্ পরিত্যাজ্য*, যত রকমের বিধি নিষেধ আছে সব কিছুকে লঙ্ঘন করে বেরিয়ে এস। গোপীরা দেখাচ্ছেন কি ভাবে সব বিধি নিষেধ লঙ্ঘন করে ঈশ্বরের জন্য বেরিয়ে আসতে হয়। এই বিধি নিষেধকে লঙ্ঘন করা সন্ন্যাস আদর্শের মধ্যে একটা। কিন্তু সন্ন্যাসীর আদর্শকে গ্রহণ করার সময় যখন সর্বধর্ম পরিত্যাগ করা হয় তখন এই পরিত্যাগটা আনুষ্ঠানিক ভাবে করা হয়, যদিও স্বাভাবিক ভাবে পরিত্যাগ করা হয় না। সর্বধর্ম স্বাভাবিক ভাবে তখনই পরিত্যাগ হয় যখন মানুষ খুব উচ্চস্তরে চলে যায়। সন্ন্যাস বলতেই বোঝায় সব রকমের বিধি নিষেধকে ত্যাগ করে দেওয়া। কিন্তু লোকশিক্ষার জন্য, যাতে সাধারণ মানুষের মধ্যে বুদ্ধিভেদ না হয় সেইজন্য সন্ন্যাসীদেরও কিছু কিছু আচরণ পালন করতে হয়। সন্ন্যাসী লোকশিক্ষার জন্য কোন নিষিদ্ধ কর্ম করবেন না। ঠাকুর বলছেন যে নাচতে পারে তার কখন বেতালা পা পড়ে না। ঐ উচ্চ অবস্থায় তাঁর এমন অবস্থা হয় যে তাঁর শরীর বোধই থাকে না, যার শরীর বোধ চলে যায় তাঁর কাছে বিধিই কি আর নিষেধই বা কি। আমরা এখন রাসলীলার মূল আলোচনায় যাচ্ছি।

রাসলীলার প্রারম্ভিক প্রেক্ষাপট

শরৎকালে এই রাসলীলা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। চীরহরণের সময় ভগবান গোপীদের সংকেত দিয়েছিলেন শরতের রাতে তোমাদের সবার সঙ্গে একদিন আমি রাস করব। ভগবান সঙ্কল্প করলেন তিনি তাঁর যোগমায়ার সাহায্যে রসময়ী রাসলীলা করবেন। এখানে এসে সেই মুহুর্তের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বর্ণনা করা হচ্ছে – ***ভগবানপি ত রাত্রীঃ শরদোৎফুল্লমল্লিকাঃ। বীক্ষ্য রন্তুং মনশ্চক্রে যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ।।১০/২৯/১।।*** শরতের নির্মলাকাশে সমস্ত তারারা পুঞ্জীভূত হয়ে রাত্রির রূপ ধারণ করে উল্লসিত হয়ে উঠেছে। শরৎ ঋতুর সুগন্ধী কুসুমরাশির দিব্য সৌরভে বাতাস সুরভিত। রাসলীলার উচ্চ ভাবকে ধারণা করার জন্য এখানে জাগতিক ভাবকে অবলম্বন করা হয়েছে।

ভারতের দুটি ঋতু শরৎকাল আর বসন্তকাল মনকে চঞ্চল করে দেওয়ার জন্য খুবই অনুকূল। যদিও বসন্ত ঋতুর উপর অনেক কবি প্রচুর কবিতা রচনা করেছেন, কিন্তু আমাদের কাছে শরৎ ঋতু বেশী মাধুর্য মণ্ডিত। বাঙ্গালীরা বলবে শরৎকালে দূর্গোৎসব হয় তাই শরৎ ঋতু আমাদের কাছে বেশী গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু সারা ভারতে সব জায়গায় বাংলার মত দূর্গা পূজা হয় না, কিন্তু তবুও সমস্ত ভারতবাসীর কাছে শরৎ ঋতুর আদর অন্য ঋতুর থেকে অনেক বেশী। তার কারণ বর্ষা ঋতুতে বৃষ্টির পর সব কিছু পূর্ণ রূপ ধারণ করে, আর তারপরেই আসে শরৎকাল। বসন্তকালে জল কমতে কমতে চারিদিকে শুষ্কতার প্রভাব বাড়তে থাকে। শরৎকাল যেন প্রাণদায়ী শক্তির প্রকাশ, জীবন যেন সজীব হয়ে ওঠে। বসন্তকালেও অবশ্য গাছপালা ফল ফুলে ভরে যায়। শরতের পরেই শীতের আগমন। ভারতের মানুষ আগে শীতকে খুব ভয় করত। বসন্তকালে শীত চলে যাচ্ছে বলে মানুষ মনে করত শীতের প্রকোপ থেকে আমরা এবার বেরিয়ে আসব। এত কিছুর পরেও মানুষ শরৎকালকে খুব শুভ মনে করে। শরতে ভারতে যত উৎসব হয় আর কোন ঋতুতে এত উৎসব হয় না। বসন্তকালে শুধু দোল উৎসবই একমাত্র আকর্ষণীয়।

যাই হোক, শুকদেব বলছেন *বীক্ষ্য রন্তুং মনশ্চক্রে যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ*, শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের চীরহরণের সময় কথা দিয়েছিলেন তিনি তাঁর অচিন্ত্য মহাশক্তি যোগমায়াকে আশ্রয় করে, শ্রীকৃষ্ণ নিজেকেই নিমিত্ত করে গোপীদের সাথে রাসলীলা করবেন। যেহেতু ভগবান নিজের যোগমায়ার সাহায্যে গোপীদের সাথে রাসলীলা করবেন, যেহেতু রস শব্দটি পূর্ণ ব্রহ্মেরই একটি নাম, তিনি রসময় কারণ তিনি আনন্দময়, তাই বিভিন্ন যে রাস হয়, সব রাসের যে সৌন্দর্য এই একটি রাসলীলার একটি রাতে সব সৌন্দর্য এসে প্রকৃতিতে যেন জড়ো হয়েছে। ভক্তির দিক থেকে দেখলে এই রকমই দেখাবে, আর কবিত্বের দিক থেকে দেখলে বলতে হয় এগুলো কবিরই কল্পনা। সেই রাত কত সুন্দর ছিল কবি যেন তারই বর্ণনা দিচ্ছেন।

সেই সৌন্দর্যের কথাই শুকদেব বর্ণনা করে আবার বলছেন ***তদোডুরাজঃ ককুভঃ করৈর্মুখং প্রাচ্যা বিলিম্পন্নরুণেন শন্তমৈঃ। স চর্ষণীনামুদগাচ্ছুচো মৃজন্ প্রিয়ঃ প্রিয়ায়া ইব দীর্ঘদর্শনঃ।।১০/২৯/২।।*** দিনের বেলা শরৎকালের রোদের তাপ প্রখর, কিন্তু সূর্যাস্তের পরে যখন রাত নেমে আসে তখন সেই রাত যেন দিনের তাপকে হরণ করে প্রকৃতিকে শীতলতায় মুড়ে দিচ্ছে। পূর্ণিমার রাত, তাই চাঁদকে এখন লাল দেখাচ্ছে। চন্দ্রমার এক স্ত্রীর নাম প্রাচী, বলছেন *প্রাচ্যা বিলিম্পন্নরুণেন শন্তমৈঃ*, শরৎ ঋতুর পূর্ণিমার চাঁদের আলো কেমন যেন লালচে দেখাচ্ছে, কবি পূর্ণিমার এই রক্তাভ ভাবকে উপমার সাহায্যে বলছেন সুধামাখা কিরণে চন্দ্রমার স্ত্রী প্রাচীর মুখখানি যেন রঞ্জিত হয়ে উঠল, প্রাচী যেন দীর্ঘ অদর্শনের পর তার প্রিয়ের সাথে মিলনের আনন্দে আরক্তিম হয়ে উঠল, মনে হয় কেউ যেন তার মুখে কেশর মাখিয়ে দিয়েছে। শুকদেব বলছেন ***দৃষ্ট্বা কুমুদ্বন্তমখণ্ডমণ্ডলং রমাননাভং নবকুঙ্কুমারুণম্। বনং চ তৎ কোমলগোভিরঞ্জিতং জগৌ কলং বামদৃশাং মনোহরম্।।১০/২৯/৩।।*** চাঁদের মুখেও কেমন যেন লজ্জা লজ্জা ভাব। শরৎ ঋতুতে ষোড়শ কলায় পূর্ণ চাঁদের স্নিগ্ধ সুধামাখা কোমল সৌন্দর্যকে তুলনা করে বোঝানোর জন্য বলছেন পূর্ণবিকশিত চন্দ্রমা যেন লক্ষ্মীদেবীর অপরূপ সুন্দর মুখ। সাধারণতঃ কারুর মুখের সৌন্দর্যকে চাঁদের সঙ্গে তুলনা করে বলা হয় তার মুখ চাঁদের মত সুন্দর। কিন্তু এখানে উল্টো, চাঁদকে লক্ষ্মীর মুখের সঙ্গে তুলনা করে বলা হচ্ছে চাঁদের মুখ কত সুন্দর,

লক্ষ্মীদেবীর অপরূপ সুন্দর মুখটির মত আকাশে শোভা বর্ধন করছে। শরৎ ঋতুতে চাঁদের উদ্ভাসিত আলোর বর্ণনা করার পর বলছেন সেই চাঁদের কোমল স্নিগ্ধ কিরণে যখন প্রকৃতি প্লাবিত হয়ে গেছে, চাঁদ যেন আকাশ থেকে তার স্নিগ্ধ আভা প্রকৃতির উপর অকাতরে ঢেলে দিয়ে বৃন্দাবনের সমগ্র পরিমণ্ডলকে সুস্নিগ্ধ শোভায় মুড়ে দিয়েছে। সেই সময় সমগ্র পরিবেশটি নিজ দিব্য রসের বিস্তারের অনুকূল বুঝে নিয়ে শ্রীকৃষ্ণ বাঁশিতে ব্রজসুন্দরীদের মনোহারী মধুর তান তুললেন।

এখানে ব্যাখ্যাকাররা বলছেন এই যে শ্রীকৃষ্ণ বাঁশিতে মধুর সুর তুললেন এতে ক্লীং ধ্বণি অনুরণিত হচ্ছে। ক্লীং যেমন শক্তির বীজমন্ত্র, ঠিক তেমনি ক্লীং শ্রীকৃষ্ণেরও বীজমন্ত্র। ক্লীং বীজমন্ত্র আবার পূর্ণ প্রেম শক্তির অভিব্যক্তি, ক্লীং বীজমন্ত্রে পূর্ণ প্রেমের শক্তিও জাগ্রত হয়। কেউ যদি কারুর মাথায় হাত রেখে অনেক দিন ক্লীং বীজমন্ত্র জপ করে তখন সেই ব্যক্তির মধ্যে তার প্রতি একটা আকর্ষণ এসে যাবে। কারণ ক্লীং আবার আকর্ষণেরও বীজমন্ত্র। ***নিশম্য গীতং তদনঙ্গবর্ধনং ব্রজস্ত্রিয়ঃ কৃষ্ণগৃহীতমানসাঃ। আজগ্মুরন্যোন্যম-লক্ষিতোদ্যমাঃ স যত্র কান্তো জবলোলকুণ্ডলাঃ।।১০/২৯/৪।।*** শ্রীকৃষ্ণের বাঁশির লম্বা তান যুক্ত ক্লীং বীজের এমনই প্রভাব যে, একবার শ্রবণ করলে ভগবানের সাথে মিলনের আকাঙ্খাকে আর অবদমিত করে রাখা যায় না। শ্রীকৃষ্ণের বাঁশি থেকে উদ্গাত ক্লীং বীজমন্ত্রের ধ্বণি অনুরণিত হয়ে সেই তরঙ্গ গোপীদের কর্ণ কুহরে প্রবেশ করার পর গোপীদের মনটাও তাই চঞ্চল হয়ে উঠেছে, শ্রীকৃষ্ণের সাথে গোপীদের মিলনের ইচ্ছাকে প্রচণ্ড ভাবে উদ্বেলিত করে দিয়েছে, আর কোন কিছুই তাঁদের মিলনের ইচ্ছাকে প্রশমিত করতে পারছে না। দক্ষিণেশ্বরে একদিন গভীর নিশায় গঙ্গার বুকে একটি নৌকা থেকে মাঝি বাঁশি বাজাচ্ছিল, সেই বাঁশির সুর ঠাকুরের কানে যেতেই তিনি সমাধিস্থ হয়ে গিয়েছিলেন।

যদিও গোপীদের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভালোবাসা ছিল কিন্তু বংশীধ্বণি গোপীদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করার পর গোপীদের মনের যত রকমের বৃত্তি ছিল, যে বৃত্তিগুলি প্রেমাভক্তির ক্ষেত্রে বাধা স্বরূপ, যেমন ভয়, সঙ্কোচ, ধৈর্য, মর্যাদা ইত্যাদি, এই বৃত্তি গুলির নাশ হয়ে গেল। এই বৃত্তিগুলিই জীবকে জাগতিক জীবনের বন্ধনে ফেলে রাখে। সাংসারিক জীবন চালাতে এই বৃত্তিগুলির প্রয়োজন আছে, যেমন মেয়েদের যদি ভয়ডর না থাকে তাহলে সংসারে অনেক গোলমাল হয়ে যেতে পারে, তেমনি সঙ্কোচ, লজ্জা এগুলো নারীর আভূষণ। এই আভূষণ গুলিই একদিকে যেমন পরমাত্মার সাথে মিলনের ক্ষেত্রে বন্ধন কারক, অন্য দিকে লজ্জা সঙ্কোচ না থাকলে সাংসারিক জীবন বিপর্যস্ত হয়ে ভেসে যাবে। শ্রীকৃষ্ণ বংশীধ্বণি দিয়ে প্রথমে এই বৃত্তিগুলি নাশ করে দিলেন। গোপীদের যত রকমের বন্ধন ছিল সব খুলে গেছে। সব বন্ধন খুলে যেতেই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আকর্ষণে এমন ভাবে তাঁরা দৌড়োচ্ছেন যে তাঁদের কানের দুল দুলছিল।

বর্তমান প্রজন্মের মেয়েরাও ছেলেদের পেছনে দৌড়াচ্ছে আর গোপীরাও শ্রীকৃষ্ণের দিকে সব কিছু ছেড়ে রাত্রিবেলা বাড়ি থেকে বেরিয়ে ছুটে যাচ্ছে, এই দুটোর মধ্যে তফাৎ কোথায়? দুটো ক্ষেত্রেই কিন্তু মর্যাদা সীমাকে লঙ্ঘন করা হচ্ছে। মর্যাদার সীমা নির্ধারিত হয় ভয়, সঙ্কোচ ও লজ্জা দিয়ে। এখনকার দিনে ফোনে একটা এসএমএস বা ফোন বাজলেই মেয়েরা দৌড়ে যাচ্ছে, আর এখানে শ্রীকৃষ্ণের বাঁশী বাজা মাত্র গোপীরাও বেরিয়ে পড়েছেন। এই দুটো মধ্যে তফাৎ কোথায়? তফাৎটা হল, বর্তমান মেয়েদের মধ্যে অপূর্ণতার ভাব রয়েছে, সে চাইছে আমার একটি ছেলে দরকার যাকে আমি বুকে জড়িয়ে ধরতে পারি। গোপীরা কিন্তু কেউই অপূর্ণ নয়, সবাই তাঁরা পূর্ণ। কেন পূর্ণ? গোপীদের স্বামী, পুত্র সব আছে আর সব্বাইকে নিয়ে তাঁরা অত্যন্ত সুখী জীবন যাপন করছেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গোপীদের টানটুকু সরিয়ে দিলে গোপীরা জাগতিক ক্ষেত্রে সবাই সুখী, জাগতিক কোন চাহিদাতে তাঁরা কেউ অপূর্ণ নয়। কিন্তু বর্তমান মেয়েদের চাহিদার শেষ নেই, সব সময় তাদের মনে দুঃখ, আমার এই হল না, আমার এই নেই, সেই নেই ইত্যাদি। এদের যদি ছেলেদের সঙ্গ না করতে দেওয়া হয় তাহলে এরা সবাই হয় depressionএর রোগী হয়ে যাবে নয়তো আত্মহত্যা করে বসবে। গোপীদের কিন্তু এই জিনিষ কক্ষণই হবে না, কারণ এঁরা সবাই নিজের জগতে সুখী। গোপীরাও দৌড়াচ্ছে, অপূর্ণতার জন্যই দৌড়াচ্ছে। কিন্তু এই অপূর্ণতা জাগতিক অপূর্ণতা নয়। সম্পূর্ণ জাগতিক দৃষ্টিতে যদি দেখা হয়

গোপীরা কিন্তু কেউই অপূর্ণ নন। আপনাদের পাড়ায় যদি অমিতাভ বচ্চন আসেন তখন পাড়ার সবাই অমিতাভ বচ্চনকে দেখার জন্য ছুটে যাবে। সবাই যে অপূর্ণতার জন্য ছুটে যাচ্ছে ঠিক তা নয়। প্রধানমন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতিরা যখন বেলুড়ে আসেন তখন অনেক সন্ন্যাসীই দেখার জন্য ছুটে যান, সন্ন্যাসী কি অপূর্ণতার জন্য ছুটে যাচ্ছেন? কখনই নয়। এই দৃষ্টিতে যদি আমরা দেখি তখন ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। ছেলে আর মেয়ের প্রেম সব সময়ই অপূর্ণতার প্রেম। গোপীরা শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া আগেই পূর্ণ। যখন রাসলীলা চলছে তখন গোপীরা শ্রীকৃষ্ণকে নানা রকম কথা বলছেন, তোমাকে ছাড়া আমরা থাকতে পারছি না ইত্যাদি। ঠিকই বলছেন, এটা ঠিক একটা পূর্ণ দুধের কুম্ভে চিনি দেওয়ার মত। বর্তমান যুগের মেয়েদের পুরোটাই ফাঁকা, ভেতরে কিছু নেই। সেইজন্য এদের চাহিদারও শেষ নেই। এই চাহিদা পূরণের জন্যই এরা দৌড়াচ্ছে। গোপীদের কোন অপূর্ণতা নেই, তাঁরা শুধু শ্রীকৃষ্ণকে ভালোবাসেন। স্বামীজী এক জায়গায় প্রেমকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলছেন – আমাদের জাগতিক ভালোবাসায় বলে আমি তোমাকে ভালোবাসি তুমিও আমাকে ভালোবাসা দাও। আমি তোমাকে ফোন করলাম তুমি ফোনের কোন উত্তর দিলে না, আমি তোমাকে মেসেজ পাঠালাম, তুমি কোন মেসেজ দিলে না। জাগতিক ভালোবাসায় সব ক্ষেত্রে শুধু লেনা দেনা। গোপীদের ক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণকে তাঁরা শুধু ভালোবাসেন, শ্রীকৃষ্ণ কি করছেন তাঁদের সেদিকে কোন দৃষ্টি নেই। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গোপীদের ভালোবাসা আর আধুনিক ছেলে আর মেয়ের ভালোবাসার পার্থক্য শুধু পূর্ণতা আর অপূর্ণতায়। ব্রহ্মচর্যে দীক্ষার একটা মন্ত্রই আছে যে মন্ত্রে বলা হচ্ছে আমি পূর্ণকাম, আমি যা কিছু কাজ করব অপরের অপূর্ণতাকে পূর্ণ করার জন্যই কাজ করব, এছাড়া কোন কাজে আমার আর কোন স্বার্থ নেই, আমার এতে কোন চাহিদা নেই। জাগতিক দিক থেকে গোপীরা সবাই পূর্ণ, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে যখন ভালোবাসছেন তখন এটা তাঁদের শুদ্ধ ভালোবাসা, গোপীদের ভালোবাসা সত্ত্বগুণে প্রতিষ্ঠিত। ছেলে আর মেয়ের ভালোবাসা হয় তমোগুণে প্রতিষ্ঠিত আর তা নাহলে রজোগুণে প্রতিষ্ঠিত।

সব বন্ধন খুলে যেতেই ব্রজের সমস্ত গোপীরা নিজ নিজ গৃহ থেকে শ্রীকৃষ্ণের আকর্ষণে বেরিয়ে পড়েছেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁদের এমনই ভালোবাসা যে একে অপরকে যে বলবে চল যাই, সেটাও কাউকে বলতে চাইছেন না। মা কাত্যায়নীর পূজা গোপীরা সবাই একসাথেই সম্পন্ন করেছিলেন। চীরহরণে শ্রীকৃষ্ণ এক সঙ্গেই সব গোপীদের বস্ত্র ফেরত দিয়েছিলেন। কিন্তু এখন শ্রীকৃষ্ণের বাঁশির ডাক শোনার পর এক অপরকে জানতে দিচ্ছেন না। সবাই চাইছেন আমি যেন একাই শ্রীকৃষ্ণকে কাছে পাই। শ্রীকৃষ্ণকে কাছে পাওয়ার তীব্র আকর্ষণে কোন কিছুর হুঁশ তাঁদের নেই। আমার লাগবে, আমি শ্রীকৃষ্ণকে কাছে পেতে চাই। এবার কেউ আর কারুর দিকে তাকাচ্ছেন না। শ্রীকৃষ্ণকে একা পাওয়ার তীব্র আকাঙ্খায় এক গোপী অন্য গোপীদের থেকে আড়ালে লুকিয়ে অভিসারে চলেছেন। এক গোপীর সাথে অন্য গোপীর যদি দেখা হয় তখন একজন জিজ্ঞেস করবে 'তুমি কোথায় চলেছ'? অন্য গোপী তখন বলবে 'এই আমি একটু বাজারের দিকে যাচ্ছি'। 'তুমি কোথায় যাচ্ছ'? 'এই আমি একটু নদীর ধারে যাচ্ছি'। তারপর দেখা যাবে দুজনে এক জায়গাতেই পৌঁছেছে। রাসলীলার এই অংশটুকু খুব তাৎপর্যপূর্ণ। শুধু যে বাড়ির লোকদের গোপন করছেন তা নয়, যারা সখী যারা নিজদের সব সুখ-দুঃখের অংশীদার, এই জায়গাতে এসে তাঁরা কিন্তু আর কারুকে অংশীদারী করবেন না, আমার নিজের জন্যই শ্রীকৃষ্ণকে চাই। এখানে গোপীরা এক অপরের থেকে লুকিয়ে ঘর থেকে অভিসারে বেরিয়ে পড়েছেন।

খুব সুন্দর বর্ণনা করে বলছেন ***দুহন্ত্যোহভিযযুঃ কাশ্চিদ্ দোহং হিত্বা সমুৎসুকাঃ। পয়োঽধিশ্রিত্য সংযাবমনুদ্বাস্যাপরা যযুঃ।।১০/২৯/৫।*** গোপীরা তখন সবাই নানা কাজে ব্যপ্ত ছিল। সন্ধ্যে বেলায় কিছু গোপী গরুর দুগ্ধ দোহন করছিল। আগেকার দিনে মেয়েরাই গরুর দুধ দোহন করত, সেই থেকে মেয়েদের বলা হত দুহিতা। দুহিতা থেকে কন্যাকে দুহিতা বলা হয়। এখানে বলছেন যে গোপী দুধ দোহন করছিলেন তিনি দুধ দোহন বন্ধ করে বেরিয়ে পড়লেন। কেউ আবার দুধ গরম করছিলেন, সেই গোপী তাড়াতাড়ি দুধ গরম না হতেই নামিয়ে রেখে চলে গেলেন। যে গোপী রান্না করছিলেন, রান্না যে অবস্থায় ছিল সেই অবস্থায় ফেলে দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। গোপীরা যে সবাই কুমারী তা নয়, বেশীর ভাগই বিবাহিতা। নিজের শিশুকে স্তন্য পান করাচ্ছিলেন, সেই অবস্থাতে শিশুকে কোল থেকে নামিয়ে রেখে বেরিয়ে গেলেন। শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বণির এমনই

টান, যাঁর কানে সেই ধ্বণি পৌঁছেছে তিনি যে অবস্থায় আছেন সেই অবস্থাতেই বেরিয়ে এসেছেন। কেউ নিজেদের স্বামীর সেবা করছিলেন, কেউ অঙ্গরাগ দিয়ে প্রসাধন করছিলেন। কোন গোপী নিজে খাচ্ছিলেন, কেউ পরিবারের লোকদের খাবার পরিবেশন করছিলেন। যে যা কাজ করছিল সেই কাজ সেখানেই অসমাপ্ত রেখে সেই বেশে, সেই অবস্থায় বেরিয়ে পড়েছেন। ইংরাজীতে পাইপ পাইপার অফ হ্যামিল্টন নামে একটা খুব বিখ্যাত কবিতা আছে। এক শহরে ইঁদুরের খুব উৎপাত হচ্ছিল। ইঁদুরকে কিছুতেই বশ করা যাচ্ছে না। তখন পাইপ পাইপার এসে বলল আমি শহরের সব ইঁদুরকে টেনে সরিয়ে দেব। সে বাঁশি বাজাতে শুরু করতেই ইঁদুর গুলো তার পেছনে পেছনে চলতে শুরু করেছে। সেও নদীতে নেমেছে ইঁদুর গুলোও নদীতে ডুবে মরে গেল। পাইপ পাইপার এসে এবার বলছে 'আমার এত মজুরি হয়েছে, মজুরি দাও'। সবাই বলছে 'এই একটু বাঁশি বাজালে তার জন্য এত পয়সা চাইছ'! পাইপার বলল 'ঠিক আছে তোমাদের কোন পয়সা দিতে হবে না'। এবার সে আবার বাঁশি বাজাতে শুরু করেছে, এবার বাঁশির আওয়াজে শহরের সব বাচ্চাগুলো তার পেছনে পেছনে বেরিয়ে চলে গেল। তারপর সব বাচ্চাকে একটা গুহার মধ্যে বন্দী করে রাখল। মা-বাবা নিজের বাচ্চাদের ধরার চেষ্টা করেও ধরে রাখতে পারল না। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের বাঁশির সুর এমনই যে একমাত্র ব্রজের গোপীদেরই আকর্ষিত করে টেনে নিয়ে আসছে, তাঁদের স্বামী, সন্তানরা কেউ দৌড়াচ্ছে না।

এমনকি তাঁদের অনেককে আটকাবার জন্য অনেক চেষ্টা করছিলেন। কারা গোপীদের প্রেমাভিসারের পথে বাধা দিচ্ছিলেন? ***তা বার্যমাণাঃ পতিভিঃ পিতৃভির্ভ্রাতৃবন্ধুভিঃ। গোবিন্দাপহৃতাত্মানো ন ন্যবর্তন্ত মোহিতাঃ।।১০/২৯/৮।*** গোপীরা যে লুকিয়ে চুরিয়ে, কেউ যাতে টের না পায় সেইভাবে শ্রীকৃষ্ণের কাছে ছুটে এসেছিলেন তা নয়, এখানে সবাই গোপীদের আটকাবার জন্য সব রকম চেষ্টা করছিলেন। সবার সামনে দিয়েই গোপীরা পালিয়ে আসছিলেন, সেই সময় কোন গোপীর বাবা আটকাচ্ছেন, কারুর স্বামী তাঁকে আটকাচ্ছেন, কোন গোপীর দাদা কিংবা ভাইরা এসে আটকাচ্ছেন আর তাঁদের সম্বন্ধী ভাইরাও এসে আটকাচ্ছেন। কিন্তু গোপীদের আটকে রাখতে পারছে না। প্রেমের উন্মাদনা এমন হয়, ছেলেই হোক আর মেয়েই হোক, কাউকে আটকানো যায় না। কিন্তু গোপীদের কী করে আটকাবে? কারণ *গোবিন্দাপহৃতাত্মানো ন ন্যবর্তন্ত মোহিতাঃ*, স্বয়ং ভগবান গোবিন্দ যখন গোপীদের মন, প্রাণ আত্মা সব কিছুকে এমন আকর্ষিত করে দিয়েছেন, এখন আর তাঁদের কে আটকে রাখতে পারবে।

ডাইনী, ভূত প্রেতকে নিয়ে যখন সাহিত্য রচনা করা হয় তখনও এই ধরণের দৃশ্য দেখানোর চেষ্টা করা হয়। ডাইনী বা কোন প্রেতাত্মা যখন কারুর মন, প্রাণকে অধিকার করে নেয় তখন তাদেরও আর কিছু করার থাকে না। এখানে স্বয়ং ভগবান নিজেই গোপীদের সব কিছু অধিকার করে নিয়েছেন। এখানে শুকদেব বলছেন কিছু কিছু গোপীরা ভগবানের এই আকর্ষণের টান হৃদয়ে অনুভব করার পরেও বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতে পারলেন না। বাড়ির লোকরা হয়তো দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল। আর সত্যিই তাই হয়েছিল। এগুলোকে আধার করে অনেক পরে পরে যেসব কাব্যগীতি রচনা হয়েছে, তখন কবিরা এই জিনিষগুলোকে খুব বেশি মাত্রায় কাজে লাগিয়েছেন। গোপীদের মধ্যে তো আসুরিক শক্তি ছিল না যে, দরজা ভেঙে বেরিয়ে যাবে। দরজা বন্ধ করে দেওয়াতে যে সকল গোপীরা বেরোতে পারলেন না, তাঁরা চোখ বন্ধ করে শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানে এমন লীন হয়ে গেলেন যে তাঁরাও দেখছেন আমরা শ্রীকৃষ্ণের কাছেই পৌঁছে গেছি। ঘরে বসেই তাঁরা রাসলীলার সব কিছু দেখতে পাচ্ছেন। শ্রীকৃষ্ণের লীলার ধ্যান করে করে তাঁদের শরীর মন খসে গেছে।

শুকদেব বলছেন ***দুঃসহপ্রেষ্ঠবিরহতীব্রতাপধুতাশুভাঃ। ধ্যানপ্রাপ্তাচ্যুতাশেষনির্বৃত্যা ক্ষীণমঙ্গলা।। ১০/২৯/১০।*** প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের দুঃসহ বিরহের তীব্র তাপে গোপীদের হৃদয়ে যে কষ্ট ও যন্ত্রণ হয়েছিল তাতে তাঁদের যত অশুভ কর্মফল সঞ্চিত ছিল সব ভস্মীভূত হয়ে গেল। আমাদের শরীরে যে জ্বর হয়, এই জ্বরটা আসলে শরীরেরই একটা যান্ত্রিক প্রক্রিয়া। কিসের প্রক্রিয়া? শরীরের ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস গুলোকে মারার প্রক্রিয়া। ধরুন আমার শরীরে কোন ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ হয়ে গেছে। এখন শরীর এই ভাইরাসকে মারবে কীভাবে? এগুলোকে তো মারতে হবে। এগুলোকে মারার জন্য শরীরের কাছে একটাই পথ।

শরীর নিজের তাপমাত্রা বাড়িয়ে দেয়। আমাদের শরীরের স্বাভাবিক তাপ হয়তো ধরুন ৯৭ ডিগ্রী। এই স্বাভাবিক তাপকে শরীর সাত ডিগ্রী বাড়িয়ে দিয়ে ১০৭ ডিগ্রী পর্যন্ত নিয়ে চলে যাওয়ার ক্ষমতা রাখে। ভাইরাসগুলো খুব বেশী তাপমাত্রায় থাকতে পারে না। যার ফলে সাত ডিগ্রী তাপমাত্রা বাড়িয়ে দিতেই ব্যাকটেরিয়া গুলো মরে যায়। যখন মরে গেল, শরীর দেখল লড়াই শেষ তখন আস্তে আস্তে শরীরের তাপমাত্রা নিজে থেকেই নেমে যাবে। সেইজন্য বলে জ্বর এলে প্রথমেই জ্বরটা কমাতে নেই। শরীর তখন লড়াই করছে, জ্বরকে যদি ক্যালপল দিয়ে কমিয়ে দেওয়া হয় তাহলে লড়াই আরও দীর্ঘস্থায়ী হবে। কিন্তু সমস্যা হল শরীরের তাপমাত্রা বাড়ার সাথে সাথে রক্তও গরম হয়ে যায়, তখন এই গরম রক্ত মাথায় গিয়ে মস্তিষ্কেরও ক্ষতি করে দেয়। তখন আবার তাই মাথায় জলপট্টি দিয়ে মাথাটা ঠাণ্ডা রাখতে হয়। শরীরের তাপ যেমন ব্যাকটেরিয়াক পুড়িয়ে মেরে দিচ্ছে, এখানেও ঠিক তাই হচ্ছে। ঈশ্বরের বিরহে মনে যে তাপ সৃষ্টি হচ্ছে সেই তাপে মনের সব অশুভ সংস্কারগুলো ভস্মীভূত হয়ে যাচ্ছে। ঠাকুরও বলছেন, ঈশ্বরের যে নাম নিয়েছে, ঈশ্বরকে যে ভালোবাসে তার আবার কিসের পাপ! এবার সেই গোপীরা গভীর ধ্যানে হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণকে নিবিড় ভাবে আবদ্ধ করে নিয়ে তাঁকে আলিঙ্গন করছেন। ওই আলিঙ্গন করার পর তাঁদের মন শান্ত রূপ ধারণ করল।

এগুলো কোন কল্পনা নয়, আমাদের কাছে এই কথাগুলো অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে। কিন্তু শুনতে শুনতে এই জিনিষগুলো স্পষ্ট হয়। এখানে গোপীরা শ্রীকৃষ্ণকে প্রত্যক্ষই দেখছেন, স্পর্শ করছেন আর আলিঙ্গনও করছেন। এখানে আমাদের কয়েকটি জিনিষ বোঝার আছে। প্রথমেই মনে রাখতে হবে গোপীদের এগুলো কোন কল্পনা নয়। আমরাও যখন কোন কিছু কল্পনা করি, একটা সময় কল্পনা করতে করতে সেই জিনিষটার অস্তিত্ব বাস্তবিক মনে হতে শুরু হয়। কিন্ত এই বাস্তবিক মনে হওয়া আর দিব্য দর্শনের মধ্যে অনেক পার্থক্য থাকবে। এই দুটোর তফাৎ অনেক রকম হতে পারে আর এই নিয়ে অনেক লেখালেখিও হয়েছে। ঠাকুরের যত দিব্য দর্শন হয়েছিল সেখানে কোন কল্পনা করে করে তিনি কোন কিছুকে প্রত্যক্ষ করছেন না, তার মানে চিন্তা করে করে এমন একটা অবস্থায় চলে গেছেন যেখানে তিনি সব কিছুকে কল্পনার জগতে দেখছেন। যাদের মাথা খারাপ হয়ে যায় তারাও এভাবেই সব কিছু দেখে। যাদের মাথায় গণ্ডগোল আছে আর যারা সব কিছু কল্পনা করে করে কোন কিছুকে প্রত্যক্ষ করে, তখন এই প্রত্যক্ষ করার ফল তাদের চরিত্রে প্রভাব ফেলতে দেখা যায় না। যখন কারুর দিব্য দর্শন হচ্ছে তখন সেটা আদৌ ঈশ্বরীয় দর্শন নাকি কল্পনার জগতে দেখছে, এই জিনিষটা বোঝার জন্য আরও অনেক লক্ষণ থাকে। অনেকে আছেন যাঁরা দীক্ষা নেওয়ার পরেই এসে তাঁদের দিব্য দর্শনের কথা বলতে শুরু করেন। এগুলো কিছুই না, এদের কোন মানসিক চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া দরকার। আপনি যদি বলেন আমি কোটিপতি, যে কোন লোকই এসে বলতে পারে আমি কোটিপতি।

কিছু দিন আগে হরিয়ানাতে একটা খুব মজার ঘটনা ঘটেছে। ওখানকার পুলিশের এক কনস্টেবেলের ফোনের লাইন থেকে পয়সা বেশী কেটে নেওয়া হয়েছিল। সেই পুলিশের ভদ্রলোক ফোনের সার্ভিস সেন্টারে ফোন করেছে। সার্ভিস সেন্টারের যে নাম্বারে ফোন করেছেন সেটা কি করে ভুলে হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রীর ফোনে চলে গেছে। পুলিশটি বলছে 'হ্যালো! ইয়ে সার্ভিস সেন্টার'? অন্য দিক থেকে বলছে 'নেই, ম্যায় হরিয়ানা কা চিফ মিনিস্টার হুদা বোল রহা হুঁ'। পুলিশটি ফোনের জ্বালায় এত বিরক্ত হয়ে গেছে যে বলতে শুরু করে দিল 'জব্‌সে হুদা চিফ্ মিনিস্টার বনা হ্যায় তব্‌সে সব শালে হুদা আপনে কো চিফ্ মিনিস্টার সমঝ্‌তে হ্যায়'। শোনার পর হুদা ফোনটা কেটে দিয়েছেন। ফোনটা সত্যিই চিফ্ মিনিস্টারেরই ছিল। ফোন কেটে দিয়ে নিজের সিকিউরিটিদের বললেন কে ফোন করেছিল খোঁজ নিতে। ব্যস্, খোঁজ নিতেই সব জানা গেল, আর বেচারিকে সঙ্গে সঙ্গে সাসপেণ্ড করে দেওয়া হল। পুলিশটি আবার কোর্টে গেল কেস করতে 'আমি থোরাই জানতাম উনি চিফ্ মিনিস্টার বলছেন, তাতে একটা কথা বলে ফেলেছি বলে আমাকে সাসপেণ্ড করার কি আছে!' অন্য দিকে কয়েক দিন আগে আরেকটি মেয়ে সোনিয়ার গান্ধীর নাম করে এ্যটর্নি জেনারেলকে ফোন করে দিয়েছিল। মেয়েটি সোনিয়া গান্ধীর নাম করে ধাপ্পা মারছে। আর পুলিশের লোকটির ক্ষেত্রে সেখানে সত্যিই চিফ্ মিনিস্টার ছিলেন। আমরা কি করে বুঝবে কোনটা সত্যি আর কোনটা মিথ্যা? কার্যে বোঝা যাবে। আসল চিফ্ মিনিস্টার দিল সাসপেণ্ড করে। এটাই পরীক্ষা, যখন বলছে আমি চিফ্ মিনিস্টার বলছি, তখন কয়েকটা জায়গায় তার

পরীক্ষাতেই বোঝা যাবে। তুমি তোমার ক্ষমতা দেখাতে পারছো কিনা। আর মেয়েটি যখন বলছে আমি সোনিয়া গান্ধী বলছি, পরীক্ষা করতেই মেয়েটি ধরা পড়ে যাচ্ছে। কোথায় ধরা পড়ছে? যখন খোঁজ নেওয়া শুরু হল তখন মেয়েটি উধাও হয়ে যাচ্ছে।

আধ্যাত্মিক জীবনে যে কোন দিব্য দর্শনে ঠিক তাই হয়। যখন কেউ বলে দিল আমি ঈশ্বর দর্শন করেছি বা ঈশ্বরকে আমি জানি, তখন দেখতে হবে অন্যান্য লক্ষণগুলো মিলছে কিনা। যে বলছে আমি ঈশ্বর দর্শন করেছি বা আমার দিব্য দর্শন হয়েছে এর অনেকগুলো লক্ষণ আছে। যাঁরা প্রথম এই ধরণের শাস্ত্রের কথা শুনছেন তাঁদের ঈশ্বর দর্শনের ব্যাপারে অনেক রকম বিচিত্র ধারণা থাকে। ঈশ্বর দর্শন মানে ভগবান হঠাৎ আমার সামনে দাঁড়িয়ে যাবেন। কিন্তু ব্যাপারটা তো তা নয়। ঈশ্বর দর্শন মানে একটা বিশেষ আধ্যাত্মিক জ্ঞান, যেটা অতিন্দ্রীয় জ্ঞান, মানে ইন্দ্রিয়ের মাপকাঠির বাইরের জ্ঞান। তার ফলে দেখা যায় যখনই ঈশ্বরীয় জ্ঞান বা শুদ্ধ চৈতন্যের জ্ঞান হয় তখন তাঁর শরীর মনে কিছু কিছু পরিবর্তন ধরা পড়ে। এর যত রকম পরীক্ষা আছে, তার মধ্যে একটা হল সব জীবের প্রতি তাঁর অহেতুক ভালোবাসা এসে যাবে। আর এই জ্ঞানের ব্যাপারে তাঁর নিজের কোন সন্দেহ থাকবে না এবং চব্বিশ ঘন্টাই এই জ্ঞানে তিনি সজাগ থাকবেন। অর্থাৎ একত্বের দিব্য অনুভূতির ব্যাপারে তাঁর কোন সন্দেহ থাকবে না। কিন্তু কল্পনা করে করে যখন নিজে মনে করছে আমার ঈশ্বর দর্শন হয়ে গেছে তখন হয়তো নিজেকেই বলতে শুরু করবে আমি ভগবান। এরকম যে কোন পাগল এসে বলতে পারে আমি ভগবান। এখন দেখতে হবে চব্বিশ ঘন্টা সে এইভাবে নিজেকে ভগবান বলে কল্পনা করছে নাকি কিছুক্ষণের জন্য করছে।

শিজোফ্রেনিয়া বা স্প্লিট পার্সোনালিটির রোগীরা কিছুক্ষণের জন্যে মনে করে আমি রানী কিংবা আমি মহা ক্ষমতাবান লোক। তখন কিন্তু সে সত্যিই তাই মনে করছে, কেউ যদি আপত্তি করতে যায় তাকে মারতে আসবে। সন্ত্রাসবাদীদের যত বড় বড় নেতা আছে এরা সবাই স্প্লিট পার্সোনালিটির লোক। এরা নিজেরা মনে করছে জগতকে পরিবর্তন করার জন্য, জগতের ভালোর জন্যই তারা এসেছে। এদের থেকে নীচে যারা আছে যাদের কোন ক্ষমতাই নেই তারা মনে করছে আমি বিরাট কিছু। এখন কেউ যদি বলে আমি অবতার আর ঠাকুরও নরেনকে বলছেন – যে রাম সেই কৃষ্ণ সেই এই দেহে রামাকৃষ্ণ, এই দুটোর তফাৎটা আমরা কি করে বুঝবো? আসলে তফাৎটা ধরা যায় না। যাঁর আধ্যাত্মিক জ্ঞান হয়ে গেছে তিনিই একমাত্র জানেনে তাঁর জ্ঞান হয়ে গেছে, তিনি ছাড়া বাইরের আর কেউ জানতে পারার কথা নয়। কিন্তু এমন কিছু কিছু লক্ষণ আছে, কিছু কিছু পরীক্ষা আছে যার সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে গেলে দুটোর তফাৎ বোঝা যায়। প্রথম লক্ষণ হল তাঁর কামিনী-কাঞ্চন থেকে মন পুরোপুরি সরে আসবে। কামিনী-কাঞ্চন, নাম-যশ, টাকা-পয়সা, শরীরের সুখের দিকে মন আর কখনই যাবে না। দ্বিতীয়, আধ্যাত্মিক জ্ঞানে কোন সন্দেহ আসবে না। জিনিষটা আমি ভুল দেখেছি কি ঠিক দেখেছি এই ব্যাপারে কোন সন্দেহই হবে না। সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু আছে সব সেই একেরই বিভিন্ন রূপ, এই বোধটা আর কক্ষণ চলে যাবে না। যে ধর্মে বলা হয় বিধর্মীদের গলা কেটে দাও, তার মানে এদের জ্ঞানে কিছু গোলমাল আছে, এদের আধ্যাত্মিক জ্ঞান অসম্পূর্ণ।

হিন্দুদের শাস্ত্র বলছে আমরা সবাই সেই পূর্ণ সচ্চিদানন্দ। তাহলে আমরা নিজেদের জানতে পারছি না কেন? তার কারণ যে জিনিষের দ্বারা জানা হয়, তার উপর মনের আবরণ আছে। মনের আবরণ হল, ধর্ম-অধর্ম, পাপ-পূণ্য, শুভ-অশুভ কর্ম। চোখে রঙিন চশমা দিলে জগৎটা যেমন অন্য রকম দেখায়, ঠিক তেমনি শুদ্ধ সচ্চিদানন্দকে যখন মনের আবরণ দিয়ে দেখা হয় তখন জগৎকে কখন শুভ দেখে কখন অশুভ দেখে, কখন মনে হয় এর কাছ থেকে পালিয়ে যাই, কখন মনে হয় এর দিকে দৌড়ে যাই। সেখান থেকেই জন্ম হয় ইচ্ছা, রাগ-দ্বেষাদি। সেই ইচ্ছা রাগ-দ্বেষ থেকে আমাদের কাজ করার প্রবৃত্তি আসে, কিছু পাওয়ার ইচ্ছা আসে। কিন্তু গোপীদের এমন বিরহের জ্বালা সেই জ্বালাতে তাঁদের কর্মগুলো পুড়ে ভস্মীভূত হয়ে গেল। আবরণ রূপী মনটা তো পুড়ে ছাই হয়ে গেল, তার মানে আবরণ সরে যাওয়াতে পুরো জিনিষটা স্বচ্ছতায় চলে এল। স্বচ্ছ হয়ে গেলে জিনিষটা যেমন তেমনই দেখাবে। গোপীদের ঈশ্বরের বিরহ জ্বালায় আবরণ পুড়ে গেছে। এখন সব কিছু স্বচ্ছ হয়ে যাওয়াতে তাঁরা সেই শ্রীকৃষ্ণকে শুদ্ধ সচ্চিদানন্দই দেখেছেন। যিনি শ্রীকৃষ্ণ তিনিই পরমাত্মা, যিনি

পরমাত্মা তিনিই শুদ্ধ সচ্চিদানন্দ, গোপীরা তাঁকেই দেখছেন। এখন গোপীরা যে তাঁকে আলিঙ্গন করছেন, এটা কোন কল্পনার বাস্তবিকতা নয়, যেটা বাস্তবিক সেটাই বাস্তবে দেখছেন।

আমি আপনাকে দেখছি বা আপনি আমাকে দেখছেন, এই দেখাটা কী বাস্তবিক দেখছি না কল্পনায় দেখছি? এই প্রশ্ন দর্শনের কাছে বিরাট বড় সমস্যা। আমি যদি মনে করি আপনাকে আমি বাস্তবিক দেখছি তাহলে আপনার যে শুদ্ধ সচ্চিদানন্দ স্বরূপ সেটা আমার কাছে কাল্পনিক হয়ে যাবে। কিন্তু বেদান্তের দৃষ্টিতে আমি আপনাকে যেটা দেখছি সেটা কল্পনা। তাহলে বাস্তবিকটা কী? শুদ্ধ সচ্চিদানন্দটাই বাস্তবিক। যদি আপনাকে আমি শুদ্ধ সচ্চিদানন্দ দেখি তাহলে আপনার শরীর, মনটা কাল্পনিক হবে। কিন্তু যুক্তিবাদীরা, যাদের সাংসারিক বুদ্ধি তারা ঠিক উল্টো দেখে। তারা এই দেহ মনকেই আসল দেখে আর শুদ্ধ সচ্চিদানন্দকে দেখে কাল্পনিক। এই কাল্পনিককে বাস্তবিক আর বাস্তবিককে কাল্পনিক করাটাই আধ্যাত্মিক সাধনা। আধ্যাত্মিক সাধনার উদ্দেশ্য হল রঙিন চশমাটাকে পুড়িয়ে দেওয়া। গোপীদের ওই চশমাটা পুড়ে গেল ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসার বিরহের জ্বালায়। আমরা জানি সাধনা মূলতঃ দুই প্রকার – জ্ঞানমার্গের সাধনা আর ভক্তিমার্গের সাধনা। জ্ঞানমার্গ সাধনা নেতি নেতি, এটা ব্রহ্ম নয়, এটা আত্মা নয় এইভাবে নেতি নেতি কর সমস্ত কিছুকে ছেড়ে দেওয়া হয়। ছেড়ে দিতে দিতে জ্ঞানমার্গের সাধক এমন এক উচ্চাবস্থায় চলে যান যে, সেখানে তাঁদের ধর্ম-অধর্মের বন্ধন, পাপ-পূণ্যের বন্ধন খসে পড়ে যায়। ভক্তিমার্গের পথে সাধকের ঈশ্বরের প্রতি বিরহ জ্বালা আসতেই হবে। খ্রীশ্চান মরমীয়া সাধকদেরও এই অবস্থার মধ্যে দিয়েই যেতে হয়, খ্রীশ্চান পরম্পরায় সাধকের এই অবস্থাকে বলে Dark night of the Soul। সাধকের এমন একটা অবস্থা আসে যে সেই অবস্থায় মনে হয় ঈশ্বর বলে কিছু নেই। ঠাকুর যখন সাধনা করছিলেন, তখন ঈশ্বর দর্শন হচ্ছিল না বলে তিনি অহর্নিশি পাগলের মত মা মা বলে কাঁদছেন। সেই সময় ঈশ্বরের বিরহে ঠাকুরের এমন গাত্রদাহ হত যে তিনি গঙ্গায় ভেজা মাটিতে শুয়ে থাকতেন। ঠাকুরের শরীরে তখন এত প্রচণ্ড তাপ যে শরীরের সংস্পর্শে এসে ভেজা কাদা মাটি শুকিয়ে লালচে হয়ে যেত। জাগতিক ক্ষেত্রে বাচ্চাদের এই ধরণের বিরহের কিছুটা পাওয়া যায়। মাকে যদি না দেখতে পায় তখন বাচ্চা চেঁচাতে শুরু করে দেবে। ঠাকুরও বলছেন সেই সময় তাকে যদি কোন চুষনি দেওয়া হয় সে ছুঁড়ে ফেলে দেবে। মা তখন যাই করতে থাকুক বাচ্চার কান্না শুনতে পেয়ে দৌড়ে আসে। ঈশ্বরের বিরহ জ্বালা বা ব্যাকুলতার উপমার জন্য ঠাকুর খুব সহজ ভাবে এই উপমাগুলো ব্যবহার করেছেন। ভাগবতকারও উপমা নিয়েছেন, কিন্তু এখানে জারের বা প্রেমের উপমা নেওয়া হয়েছে। কিন্তু ঈশ্বরের বিরহ কোন পর্যায়ে যেতে পারে উপমা দিয়েও তা ধারণা করানো যাবে না।

কেউ যদি লীলাপ্রসঙ্গে ঠাকুরের সাধনার ইতিহাস পড়েন, পড়লেই তাঁর মনে হবে – এই জীবনে আমার দ্বারা এই সাধনা করা অসম্ভব। ঠাকুরও জানতেন সাধারণ মানুষ দূরে থাক, বড় বড় আধ্যাত্মিক পুরুষরাও ঠাকুরের মত সাধনা করতে পারবেন না। তাই তিনি বলছেন – আমি ষোল আনা করেছি তোরা এক আনা কর। অথচ ঠাকুরও তখনকার সময়ে যাঁরা বড় বড় পরমহংসরা দক্ষিণেশ্বরে আসতেন তাঁদের আচার ব্যবহার দেখে ভয় পাচ্ছেন। ভাগ্নে হৃদয়কে বলছেন 'ওরে হৃদু! আমারও কি এই অবস্থা হবে'? শেষ পর্যন্ত ঠাকুরেরও একই জিনিষ হয়েছে। একজন পরমহংস দক্ষিণেশ্বরে এসেছেন। যেখানে এঁঠো পাতা ফেলা হয়েছে সেখানে গিয়ে তিনি কুকুরের সঙ্গে এক সঙ্গে খাবার খাচ্ছেন। ঠাকুরও এমন পরমহংস অবস্থায় নিজের বিষ্ঠা খাচ্ছেন। তখন আবার তাঁকে বলা হল – ওতো নিজের বিষ্ঠা, অপরের বিষ্ঠা খাও। সেখানেও ঠাকুর অপরের বিষ্ঠা নিজের জিহ্বা দিয়ে স্পর্শ করছেন। এবার যদি আমাদের কাউকে বলা হয় – সাধনা মানে এই ভয়ঙ্কর অবস্থার মাঝখান দিয়ে যেতে হবে। আমরা সবাই বলব – আমার সাধনা লাগবে না, আমাকে ছেড়ে দিন। এখানে বিরহের যে গভীরতার কথা বলা হয়েছে, ঠাকুরের সাধনার জীবনের ইতিহাস পড়লে এই গভীরতা ঠিক ঠিক বোঝা যায়। ঈশ্বর বিরহে গাত্রদাহ কী পর্যায়ে হতে পারে ঠাকুর গঙ্গার মাটিতে যেখানে শুয়ে আছেন, সেখানকার মাটি পুড়ে লাল হয়ে যাচ্ছে। গোপীদের বিরহ জ্বালা ঠিক এই পর্যায়ে হয়েছিল। বাচ্চা ছেলে যেমন চুষনি ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে, গোপীরাও বলছেন আমার কৃষ্ণ ছাড়া আর কিছু লাগবে না।

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভালোবাসায় গোপীদের মন এত একাগ্র হয়ে গেছে যে তাতে তাঁদের অন্য যত রকমের ভাব আছে সব খসে পড়ে যাচ্ছে। পাপ-পূণ্য কখন হবে? যখন আমরা কাউকে বেশী ভালোবাসছি আর কাউকে কম ভালোবাসছি বা কাউকে অপছন্দ করছি তখনই পাপ-পূণ্যের কথা আসবে। যাকে আপনি পছন্দ করেন না তার প্রতি আপনি অবিচার করবেন, যাকে ভালোবাসেন তার প্রতি আপনি পক্ষপাতিত্ব করবেন। শোক আর মোহ থেকেই বন্ধন তৈরী হয়। যাকে ভালোবাসছি সে কাছে এলে আমি চাইছি আরও কিছুক্ষণ সে আমার কাছে থাকুক, এটাই মোহ। আর যাকে অপছন্দ করছি সে কাছে এসে পড়লে ভাবছি কখন আমার কাছে থেকে বিদায় নেবে, এটাই দ্বেষ। যখন আপনার পছন্দ অপছন্দের কেউ নেই তখন কারুর জন্যই শোক, মোহ, রাগ, দ্বেষ এগুলো হবে না। তার মানে জাগতিক বা সাংসারিক ভাবটা আপনার মিটে গেছে। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গোপীদের এমন ভাব জাগ্রত হয়েছে, যে ভাবের তাপের প্রভাবে বাকি সব ভাব পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। বাচ্চা ছেলে যখন মায়ের কাছে যাবার জন্য কাঁদে তখন অচেনা কেউ এসে যদি তাকে বলে 'এসো, আমি তোমাকে মায়ের কাছে নিয়ে যাচ্ছি', বাচ্চা তখন চেনা অচেনার কোন বিচার না করে সবার কাছে চলে যাবে। কারণ বাচ্চার ভাব অভাব মিটে গেছে। তার যে কাউকে ভালো লাগা আর ভালো না লাগা, চেনা-অচেনা, বন্ধু-শত্রু সব ভাব মিটে গেছে। আমাকে মায়ের কাছে যেতে হবে। আপনি মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিয়েই কোলে নিন তাতেই আপনার কাছে চলে আসবে। আসলে জগতের প্রতি ওর ভাবটা খসে পড়ে যাচ্ছে। কিন্তু বাচ্চার ক্ষেত্রে এটা সাময়িক। এখানে শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে গোপীদের যা কিছু হচ্ছে তার সবটাই পুরো আধ্যাত্মিক জিনিষকে নিয়ে হচ্ছে বলে সব কিছু খসে পড়ে যাচ্ছে। গোপীদের কাউকে বেশী ভালোবাসা আর কাউকে অপছন্দ করা এই ভাবগুলো মিটে গেছে। বিরহের আগুনে যে সব কিছু পুড়ে যাওয়ার কথা বলা হচ্ছে, সত্যি সত্যিই পুড়ে ভস্ম হয়ে যায়। এটা যে কোন কাব্যিক বর্ণনা করা হচ্ছে তা নয়, সত্যিকারের এই রকমই হয়। ঈশ্বরের প্রতি যে ভালোবাসা, এই ভালোবাসা এত একাঙ্গী যে এর কাছে জাগতিক সমস্ত ভাব, সম্পর্ক খসে পড়ে যায়। জাগতিক ভাব খসে পড়ে যাওয়া, এটাই তো জ্ঞান। গোপীদের এই জ্ঞানটাই হয়েছিল।

সচ্চিদানন্দ শুদ্ধ ব্রহ্ম তাঁকে যে শ্রীকৃষ্ণ রূপে দেখছেন, এরপর শ্রীকৃষ্ণকে যে আলিঙ্গন করছেন, এখানে এসে জ্ঞান আর ভক্তিতে তফাৎ হয়ে যায়। জ্ঞানের ক্ষেত্রে আলিঙ্গন বলে কিছু থাকে না, কিন্তু ভক্তির ক্ষেত্রে থাকতেই পারে। কারণ ভক্তিতে ঈশ্বর আর ভক্তের মধ্যে একটা ক্ষীণ মায়ার আবরণ থাকে, যে আবরণের জন্য যিনি পরমাত্মা ব্রহ্ম তাঁকেই ঈশ্বর রূপে দেখায়, তখন তাঁকে স্পর্শ করা যায়, আলিঙ্গন করা যায়। সেইজন্য ভক্ত কখন চরম জ্ঞানের কথা বলে না, আমার জ্ঞান চাই এই প্রার্থনাও তারা করে না। যাঁদের মন খুব আবেগপ্রবণ ভক্তি তাঁরাই করেন। ভক্ত তাই বলে আমি চিনি হয়ে কী করবো? আমি চিনি আস্বাদ করতে চাই, ঈশ্বরকে আমি আলিঙ্গন করতে চাই। এই গোপীরা তাঁদের স্থূল শরীর নিয়ে শ্রীকৃষ্ণের কাছে হাজির হতে পারছেন না, তাঁদের ঘরে আবদ্ধ করে রাখা হয়েছে। কিন্তু সেখানেই তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে এত একাত্ম হয়ে গেছেন যে, ঘরে বসেই সেই গোপীরা শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করছেন।

পরের শ্লোকে শুকদেব পরীক্ষিৎকে বলছেন ***তমেব পরমাত্মানং জারবুদ্ধ্যাপি সঙ্গতাঃ। জহুর্গুণময়ং দেহং সদ্যঃ প্রক্ষীণবন্ধনাঃ।।১০/২৯/১১।*** গোপীদের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি জার ভাব ছিল। জার ভাব মানে দৈহিক সম্পর্কে প্রেম। এই জার ভাব নিয়েই তাঁরা ভগবানকে আলিঙ্গন করেছেন, যিনি নিত্য সত্য তাঁকে আলিঙ্গন করতে তৎক্ষণাৎ তাঁদের সমস্ত বন্ধন খসে গেছে। কারণ শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মা কিনা। ঠাকুর বলছেন, মিছরির রুটি সিধে করেই খাও আর আড় করেই খাও মিষ্টিই লাগবে। শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করার ফলে গোপীদের গুণময় পার্থিব শরীরটা নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে রইল আর তাদের অপ্রাকৃত শরীরটা সামনে চলে এল। অপ্রাকৃত শরীর গুণময় হয় না, সেইজন্য এই অপ্রাকৃত শরীর স্থূল, সুক্ষ্ম ও কারণ এই তিনটে শরীরের বাইরে, এই শরীরটাই একমাত্র শুদ্ধ চৈতন্য শরীর। এখন শ্রীকৃষ্ণ আর গোপীদের যে মিলন হচ্ছে এই মিলন আর পার্থিব শরীরে হচ্ছে না। পার্থিব শরীরটা পড়ে রয়েছে, কিন্তু আসল শরীরটা হল অপ্রাকৃত।

শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানে একেবারে তন্ময় হয়ে যাওয়াতে গোপীদের কর্ম বন্ধন, যে বন্ধন আত্মাকে শরীরের সাথে বেঁধে রাখে সেই বন্ধন এখন ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। পরমাত্মাকে যিনি আলিঙ্গন করেছেন, তিনি এখন মধুর

ভাবেই করুন আর সন্তান ভাবেই করুন, যেভাবেই করুন, ঈশ্বরকে তিনি ভালোবেসেছেন এরপর আর কিছু বলার থাকে না। যার জন্য আমাদের যে চারটে পুরুষার্থ ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের কথা বলা হয়, সেখানে মোক্ষই যে একমাত্র জীবনের উদ্দেশ্য হবে তা নয়, ধর্ম, অর্থ আর কামও উদ্দেশ্য হতে পারে। তোমার ইচ্ছা অন্য রকম থাকতে পারে কিন্তু তুমি ভগবানকেই তো ভালোবাসছ। আর্ত, অর্থার্থি ও জিজ্ঞাসু এই তিনজন তো ঈশ্বরকে ভালোবেসেই তাঁর কাছে কিছু চাইছে। যে আর্ত সে কষ্টে আছে, কষ্ট থেকে বাঁচার জন্য সে ভগবানকেই ডাকছে, যার অর্থ নেই সে ভগবানের কাছেই অর্থ চাইছে। সমগ্র বেদ এই কথাই বলছে, তোমার যদি কোন চাহিদা থাকে তুমি সেই চাহিদার পুর্তির জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে যজ্ঞ কর, তাতেই তোমার সব চাহিদা পূরণ হয়ে যাবে। চাহিদা পূরণ না হলে তোমার মনে নানা রকমের বৃত্তি তৈরী হবে, বৃত্তি যত তৈরী হবে তোমার মন তত চঞ্চল হয়ে উঠবে, চঞ্চল মন দিয়ে ভালো কোন কাজ আর তোমার দ্বারা হবে না। তার থেকে ভালো হবে তুমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা কর আর যজ্ঞ কর। যেভাবেই তুমি ঈশ্বরের কাছে যাও, সেখান থেকে ধীরে ধীরে ঈশ্বর তোমাকে টেনে উপরের দিকে নিয়ে চলে যাবেন। ঠাকুর বলছেন – যদি কেউ ভালো লোককে অছি করে তিনি কখন তার ক্ষতি হতে দেবেন না। ভগবান হলেন ভালো লোক, তাঁকে আপনি Power of Attorney দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে যান।

মুষ্টিমেয় কয়েকজন গোপী সরাসরি রাসলীলাতে স্থূল শরীরে উপস্থিত হতে পারেননি। আর বাকি যত গোপীরা ছিলেন, সংখ্যা যদিও বলা নেই কিন্তু বোঝা যায় শত শত গোপীরা শ্রীকৃষ্ণের বংশী ধ্বণিতে আকর্ষিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণের কাছে ছুটে গেছেন। এই গোপীরা সবাই বিভিন্ন বয়সের হওয়ার কথা, কারণ ভাগবতেই বর্ণনা আছে অনেকে নিজের বাচ্চাকে ছেড়ে দিয়ে এসেছে, অনেকের স্বামী আছে। সবাই যে কুমারী তা নয়, বিবাহিতা গোপীদের সংখ্যাও নেহাত কম ছিল না। যাই হোক এই জিনিষগুলো আমরা আগে আলোচনা করে নিয়েছি।

পরীক্ষিতের সংশয় ও ব্যাসদেব কর্তৃক সংশয়ের অবসান

শুকদেবের কাছে সব শোনার পর রাজা পরীক্ষিতের ব্যাপারটা ঠিক পছন্দের হচ্ছে না। পরীক্ষিতের যিনি ইষ্টদেবতা, যিনি আবার সম্পর্কে তাঁর ঠাকুর্দাও, তাঁর নামে এই সব কথা শুনে পরীক্ষিৎ রীতিমত চমকে উঠেছেন – শ্রীকৃষ্ণ একজন ঈশ্বরের অবতার হয়ে এই ধরণের কাজ কি করে করতে পারলেন! সমাজে কোন পুরুষ যদি অপরের স্ত্রীর প্রতি দৃষ্টি দেয় তাতেই কত দুর্নাম হয়ে যায়, আর এখানে শ্রীকৃষ্ণ রাত্রিবেলা ব্রজের সব ললনাদের নিয়ে বেরিয়ে গেলেন! পরীক্ষিৎ তাই শুকদেবকে প্রশ্ন করছেন ***কৃষ্ণং বিদুঃ পরং কান্তং ন তু ব্রহ্মতয়া মুনে। গুণপ্রবাহোপরমস্তাসাং গুণধিয়াং কথম্।।*১০/২৯/১২। রাজা পরীক্ষিৎ খুব তাত্ত্বিক প্রশ্ন করেছেন। 'হে মুনিবর! আপনি যে বলছেন গোপীরা যাঁরা শ্রীকৃষ্ণকে ভালোবেসে প্রেমিক রূপে কামনা করেছিলেন, মনে মনে কেউ শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করেছেন, শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করার জন্য তাঁদের সমস্ত কর্মের বন্ধন, ধর্ম-অধর্মের যত বন্ধন, পাপ-পূণ্যের যত বন্ধন সব ক্ষয় হয়ে গেল। কিন্তু গোপীদের ক্ষেত্রে কী করে তাঁদের গুণপ্রবাহ থেকে নিবৃত্তি হয়ে যেতে পারে? গুণের প্রবাহ থেকে নিবৃত্তি হয়ে যাওয়া তো একমাত্র জ্ঞানীদেরই হয়, যাঁরা ঘোর তপস্যা করেছেন একমাত্র তাঁদেরই এই অবস্থা প্রাপ্ত হয়। আপনি বলছেন সেই সময় গোপীরা অপ্রাকৃত শরীর লাভ করেছিলেন, কিন্তু এটাও কি করে সম্ভব! কারণ *কৃষ্ণং বিদুঃ পরং কান্তং*, শ্রীকৃষ্ণ দেখতে এত রূপবান ছিলেন আর তাঁর প্রতি ব্রজললনাদের এত ভালোবাসা যে তাঁরা শ্রীকৃষ্ণকে দেখছেন *পরং কান্তং*, পরম প্রিয়তম রূপে। তাঁদের সবার স্বামী থাকতে পারে, তাঁদের কারুর বিয়ে ঠিক হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু সবাই শ্রীকৃষ্ণকে দেখছেন তাঁদের প্রিয়তম রূপে, পতি রূপে তাঁরা শ্রীকৃষ্ণকে কামনা করেছিলেন, ব্রহ্ম ভাবে তো তাঁরা শ্রীকৃষ্ণকে ধারণা করেননি, তাঁরা শ্রীকৃষ্ণকে তো ব্রহ্ম ভাবে দেখতেন না। তাই প্রিয়তম রূপে দেখে তাঁদের কি করে অপ্রাকৃত শরীর হবে? কারণ অপ্রাকৃত শরীরের জন্য দরকার ব্রহ্মভাব'।

এই প্রশ্নগুলো প্রায়ই ওঠে। শুধু যে পরীক্ষিৎই প্রশ্ন করেছেন তাই নয়, যুগে যুগে সাধকদের মনে এই সব প্রশ্ন উঠেছে। যাঁরা ঠাকুরকে ইষ্ট রূপে সাধনা করছেন তাঁরা কি কখন ভেবে দেখছেন ঠাকুরকে তাঁরা কীভাবে দেখছেন? যদি মনে হয় ঠাকুর কামারপুকুরে জন্ম নিলেন আর কাশীপুরে শরীর ত্যাগ করলেন তাহলে

বুঝতে হবে সেখানে আমাদের ব্রহ্মভাব নেই। আর যদি ব্রহ্ম ভাবও থাকে তাহলে তাঁর জন্মই কোথায় আর মৃত্যুই বা কি! ঈশ্বরের আবার কিসের জন্ম আর কিসের মৃত্যু! আবির্ভাব বা তিরোভাব হতে পারে কিন্তু জন্ম-মৃত্যু তো হবে না। যদি ব্রহ্ম ভাব থাকে তখন বলবে যিনি নির্গুণ নিরাকার তিনিই সগুণ সাকার হয়েছেন। কীভাবে হয়েছেন? তাঁর নিজের যোগমায়াকে আলম্বন করে। আবার মজার ব্যাপার হল সেই মায়া তাঁতে আশ্রিত, তিনিই আবার মায়াকে আশ্রয় করছেন। যেমন মাকড়সা আর তার জাল। মাকড়সার ভেতর থেকেই জালটা বেরিয়েছে আবার সেই জালের উপরই মাকড়সা বিচরণ করছে। ঐ মাকড়সাই আবার জালটা টেনে গিলে নেবে। এগুলো সব উপমা, ভাবটা ধারণা করবার জন্য উপমা দেওয়া হয়। তিনি একটা মায়া সৃষ্টি করেছেন, সেই মায়ার মধ্যে তিনি নিজে প্রবেশ করে এই খেলা করছেন। এটাকেই যিনি ব্রহ্ম ভাবে গ্রহণ করেন তাঁরই ব্রহ্মজ্ঞান হবে তাছাড়া হবে না। আমি সারা জীবন ঠাকুরের চরণে মাথা ঠুকে যেতে পারি, সারা জীবন ধূপধুনো দিয়ে যেতে পারি কিন্তু ওতে কিছুই হবে না। তাহলে কখন হবে? যখন ঠাকুরের সব কিছুকে ব্রহ্মভাবে দেখা হবে। এর আগে পর্যন্ত আমি প্রকৃতিরই উপকরণ দিয়ে প্রকৃতিরই পূজো করে যাচ্ছি। ফুল, চন্দন এগুলো প্রকৃতিরই উপকরণ, যত প্রণাম মন্ত্র আমার স্মৃতিতে আছে সব প্রকৃতির এলাকা। এইভাবে পূজো করতে থাকলে প্রকৃতির মধ্যেই ঘুরতে থাকব। কখন ভালো স্বর্গে যাব কখন পৃথিবীতে ভালো পরিবারে জন্ম নেব, আবার মরে স্বর্গে যাব। এর বাইরে আর যাওয়া যাবে না। ব্রহ্মভাব না আসা পর্যন্ত এর বাইরে যাওয়া যাবে না।

পরীক্ষিৎএর মনেও এই প্রশ্ন এসেছে। 'গোপীরা শ্রীকৃষ্ণকে প্রেম করত, একটা মেয়ে একটা ছেলেকে যেভাবে ভালোবেসে থাকে। তাদের তো ব্রহ্মভাব নেই, তাহলে অপ্রাকৃত শরীর, যেটা আপনি বলছেন গুণপ্রবাহ শরীর, যেমন আমাদের শরীর গুণপ্রবাহের শরীর, সত্ত্ব, রজ ও তমো দিয়ে এই শরীর তৈরী হয়েছে, পুরো জগৎ এই তিনটে গুণ দিয়ে নির্মিত। আর আপনি বলছেন অপ্রাকৃত শরীর, তাদের দিব্য শরীর বেরিয়ে এসেছে'। দিব্য শরীর মানে দেবতাদের শরীর নয়, দিব্য শরীর হল অপ্রাকৃত শরীর, যে শরীর স্থুল, সূক্ষ্ম ও কারণ শরীরের বাইরে। শ্রীকৃষ্ণ কি এতই বোকা ছিলেন, যিনি ভগবান, যিনি এত সুন্দর দেখতে, যিনি পরে সত্যভামা, রুক্মিনীর মত রাজ পরিবারের মেয়েদের বিয়ে করছেন তিনি কিনা গ্রামের যে মেয়েরা দুধ দুইত তাদের সাথে লীলা খেলার নামে পাগলামি করতে গেছেন! কিন্তু চিদানন্দময়ী শরীরের সৌন্দর্য অন্য রকম, সেই সৌন্দর্য আর পার্থিব সৌন্দর্যের মধ্যে থাকবে না, নৈসর্গিক হয়ে যাবে। কিন্তু পরীক্ষিতের মনে এই প্রশ্নটা এসেছে, গোপীদের ক্ষেত্রে কি করে এটা সম্ভব হল।

ঠাকুর বলছেন ঈশ্বরের সঙ্গে একটা সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করা নিয়ে ঠাকুর অনেকগুলো ভাবের কথা বলছেন, যেমন সখ্যভাব, দাস্যভাব, সন্তানভাব আর এইসব ভাবের সাথে তিনি প্রেমের ভাব অর্থাৎ মধুরভাবের কথাও বলছেন। অধ্যাত্ম রামায়ণে আরেক ধাপ এগিয়ে বৈরভাব নিয়ে আসা হয়েছে, যেখানে দেখানো হয়েছে রাবণ শত্রুভাবে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের সাধনা করছেন। কিন্তু হনুমান বৈর ভাবে সাধনার নিন্দা করে রাবণকে বৈর ভাবে সাধনা করা থেকে বিরত করতে চাইছেন। আমাদের ভক্তিশাস্ত্র বলবে, আপনি যে কোন ভাবকে ঠাকুরের কাছে রাখবেন তাতেই আপনার সব হয়ে যাবে। আধ্যাত্মিক সাধনার পথ মূলতঃ দুটি, জ্ঞানমার্গ ও ভক্তিমার্গ। জ্ঞানমার্গে জ্ঞানীদের জন্য একটাই পথ, নেতি নেতির পথ। এই শরীর কি ব্রহ্ম? না, শরীর ব্রহ্ম কখনই নয়। তাহলে শরীরের প্রতি বেশী আসক্ত হয়ো না। খাওয়া-দাওয়া কী ব্রহ্ম? অবশ্যই নয়, খাওয়া-দাওয়া শুধুমাত্র অন্নময়কোষের জন্য। তাই শরীর ধারণের জন্য যতটুকু খাওয়া-দাওয়া করা দরকার তার বাইরে মন দিও না। এই ভাবে নেতি নেতি করে সব কিছু ফেলে দিয়ে শুদ্ধ পরমাত্মা ব্রহ্মে স্থিত হয়ে যাচ্ছেন। ভক্তিমার্গের সাধকের কাছে একটি মাত্র পথ নেই, তার কাছে অনেক পথ আছে। এর যে কোন একটা পথ দিয়ে ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করলেই হল। ঈশ্বরের চিন্তন করার জন্য, ঈশ্বরকে ভালোবাসার জন্য যে কোন পথ ও যে কোন ভাব অবলম্বন করলেই হল। **আধ্যাত্মিক জগতে ভক্তি সাধনা মানে = ভাব পাকা করা**। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বারবার বলছেন ভাব পাকা করতে। জ্ঞানের পথে সাধক আত্মার স্বরূপের বিচার করতে করতে এগোয় আর ভক্তিতে ঈশ্বরের স্বরূপের বিচার করতে করতে সাধক এগোয়। জ্ঞানমার্গে একটাই উপায় নেতি নেতি বিচার। আত্মা ছাড়া যাবতীয় সব কিছুকে বিচার করে ছেড়ে দেওয়া।

কিন্তু ভক্তি পথে সাধককে যে কোন একটা ভাব অবলম্বন করতে হয়। সাধক যখন কোন একটা ভাবকে অবলম্বন করে নিল, তখন ঠাকুর তাকে বলছেন এই ভাবটাকে এবার পাকা কর। তার মানে, ভক্তি সাধনা হল ভাব পাকা করা। গোপীরা ছিলেন অতি সাধারণ গ্রাম্য মহিলা, তাঁদের মধুর ভাব ছাড়া আর কোন ভাব জানার কথা নয়। তাই তাঁরা যদি বলন আমার কাছে মধুর ভাব আছে, আমি এই ভাব দিয়েই তোমার সাধনা করছি, এতে তো ভুল কিছু নেই। এখন সবাই যদি বলতে শুরু করে গোপীরা মধুর ভাবে সাধনা করে শ্রীকৃষ্ণকে পেয়েছিলেন, আমরাও মধুর ভাবে সাধনা করব। কিন্তু সবার পক্ষে মধুর ভাব নিয়ে সাধনা করা সম্ভব নয়। কারণ মধুর ভাবে সাধনার জন্য একটা যে প্রাথমিক প্রস্তুতি দরকার, সেই প্রস্তুতি সবার নেই। একটু পরেই আমরা দেখব মধুর ভাব, প্রেমের ভাব বা কাম ভাব নিয়ে সাধনা করার ফলে ভক্তিতে কত পরিবর্তন আসছে। কিন্তু যেখানে দুটো শরীরের পরস্পরের প্রতি কাম ভাব আছে সেখানে ভক্তি সেই পর্যায়ে যাবে না, যে পর্যায়ে গোপীরা ভক্তিকে নিয়ে গেছেন। এই যে ঠাকুর বলছেন যে কোন একটা ভাবকে পাকা করতে, কেন বলছেন? বাৎসল্য, মধুর, বন্ধু, দাস্য, শান্ত যে কোন ভাবই আপনি অবলম্বন করতে পারেন, অর্থাৎ ভগবানকে আপনি কী ভাব নিয়ে দেখছেন সেটার কোন গুরুত্ব নয়, গুরুত্ব হল আপনি সেই ভাবকে কতটা পাকা করেছেন। যেমন ধরুন আপনি দাস্য ভাব নিয়ে সাধনা করছেন, এবার আপনি যা কিছু কর্ম করছেন মনে মনে জানছেন আমি ঈশ্বরের সেবা ভাব নিয়ে সব কিছু করছি। এই ভাব পাকা করার মধ্যে কোথাও কোন তফাৎ হয় না, তা আপনি মাতৃভাবেই সাধনা করুন বা পিতৃভাবেই সাধন করুন কিংবা বাৎসল্য ভাবে সাধন করুন বা সখ্য, মধুর যে ভাব নিয়েই সাধনা করুন কেন, এগুলোর আলাদা কোন দাম থাকে না। যে ভাব আপনি নিয়েছেন আপনার প্রথম কাজ হল ওই ভাবটা পাকা করা।

পরীক্ষিৎ যে প্রশ্ন করছেন গোপীদের তো শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কাম ভাব ছিল। শুকদেব পরীক্ষিতের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে ঠিক এই কথাই বলছেন। ***উক্তং পুরস্তাদেতত্তে চৈদ্যঃ সিদ্ধিং যথা গতঃ। দ্বিষন্নপি হৃষীকেশং কিমুতাধোক্ষজপ্রিয়াঃ।।১০/২৯/১৩।*** ‘হে পরীক্ষিৎ! তোমাকে এর আগেও বলেছি শিশুপাল হৃষীকেশের প্রতি সর্বদা দ্বেষ ভাব রাখত, তা সত্ত্বেও শিশুপালের শরীর যখন চলে গেল তখন তার অন্তরতম শরীরটা শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে মিলে গেল’। মহাভারতে এর খুব সুন্দর ও আরও বিশদ ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, শিশুপালের শরীর চলে যেতেই সেই শরীর থেকে একটা তেজ বেরিয়ে এসে শ্রীকৃষ্ণের শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে গেল। শুকদেব বলছেন ‘শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দ্বেষ করে শিশুপালেরই যদি এই রকম হয়ে থাকে আর গোপীরা যারা শ্রীকৃষ্ণকে এত ভালোবাসত, তাদের কেন কৃষ্ণময় শরীর হতে পারবে না!’ শিশুপাল শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শুধু দ্বেষ ভাব করে করেই তার শরীরের তেজ অংশ শ্রীকৃষ্ণে লীন হয়ে গেল, তাহলে মধুরভাবে না হওয়ার তো কোন কারণ থাকতে পারে না। এখানে শুকদেব ভাব পাকা করার কথাই বলছেন। ঠাকুরের কাছে এক সময় একটি পাগলী প্রায়ই আসত। পাগলীর ইচ্ছে হয়েছিল ঠাকুরের কাছে এসে সে মধুর ভাবে সাধন করবে। পাগলী এসেই ঠাকুরকে বলতো ‘তুমি আমাকে মন থেকে ঠেলে দিচ্ছ কেন গো’? ঠাকুর শুনে রামলালকে বলছেন ‘ওরে রামলাল! এ যে দেখছি ঠেলাঠেলির ব্যাপার চলছে’। পরে ঠাকুর পাগলীকে খুব গালাগালি দিয়ে ভাগিয়ে দিয়েছেন। কারণ পাগলী যে ভাব নিয়ে ঠাকুরের কাছে যেত সেই ভাবে গোপীদের ওই পবিত্রতা আর ভালোবাসার সেই তীব্রত ছিল না। গোপীরা শ্রীকৃষ্ণকে জন্ম থেকে তিল তিল করে বড় হতে দেখছেন। শ্রীকৃষ্ণ যত বড় হচ্ছেন গোপীদের তাঁর প্রতি ভালোবাসাটাও দিনে দিনে বাড়তে থেকেছে। আমরা এখানে কাম ভাব বা জার ভাব যাই বলি না কেন, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গোপীদের এই ভালোবাসা ভক্তিমার্গেরই অন্যতম একটি ভাব মধুরভাবের অন্তর্গত। আর গোপীদের ভাব পুরোপুরি পাকা ছিল। কোন মেয়ে একটি ছেলেকে একবার দেখে তার ব্যক্তিত্ব ও চেহারা দেখে পছন্দ হয়ে গেল এখানে তার কোন মূল্য নেই। ঠাকুর বলছেন ভাব পাকা করতে। ঈশ্বরের প্রতি আপনার ভাব যদি পাকা হয়ে যায় তাহলে আপনার বস্তু লাভ হবেই হবে।

শুকদেব এরপর কয়েকটি খুব জটিল শ্লোকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু দার্শনিক তত্ত্ব বলছেন ***নৃণাং নিঃশ্রেয়সার্থায় ব্যক্তির্ভগবতো নৃপ। অব্যয়স্যাপ্রমেয়স্য নির্গুণস্য গুণাত্মনঃ।।১০/২৯/১৪।*** ‘প্রকৃতি সম্বন্ধিত যা কিছু আছে, বৃদ্ধি, বিনাশ, প্রমাণ, প্রমেয় আর গুণ-গুণী এই ভাবগুলো ভগবানের মধ্যে থাকে না। আবার

অপর দিকে তিনি অচিন্ত্য তিনটে গুণের আশ্রয় হয়েও নির্গুণ’। ভালো খাওয়া-দাওয়া করলে শরীর মোটা হবে, ভালো খাওয়া-দাওয়া না করলে শরীর শীর্ণকায় হতে থাকবে। এই শরীর দিয়ে আমি জগতকে জানতে পারছি, আমি জ্ঞাতা আর জগৎ জ্ঞেয়। জ্ঞাতা-জ্ঞেয়, গুণ-গুণী এই সম্পর্কগুলি ভগবানের সাথে থাকে না। তিনিই সব কিছুর আশ্রয়। অপরপক্ষে তিনি নির্গুণ, স্বামীজী ঠাকুরের আরাত্রিক স্তবে বলছেন *নির্গুণগুণময়*, তিনি নির্গুণ আবার তিনি গুণময়। *অব্যয়স্যাপ্রমেয়স্য*, অব্যয় মানে যার কখন কোন ক্ষয় হয় না, সেইজন্য তিনি অনন্ত। যে কোন জিনিষ, যেটা টুকরো দিয়ে তৈরী, যেমন আমাদের শরীর নানা রকম জিনিষ দিয়ে তৈরী, সেই জিনিষের ক্ষয় হবেই। কিন্তু যেটা সার পদার্থ সেটা কখন ক্ষয় হবে না, ক্ষয় হে যাবেটা কোথায়! আমাদের মাথার উপর পাখা ঘুরছে, পাখা অনেকগুলো জিনিষ দিয়ে তৈরী হয়েছে, এর মধ্যে ধাতু আছে, প্লাস্টিক আছে, বিদ্যুৎ আছে। পাখার ধাতুটাকে যদি আলাদা করে দেখি তখন সেটাও একটা যৌগিক পদার্থ। ধাতুটাকে বিশ্লেষণ করতে করতে লোহা পেয়ে যাব। লোহাও একটা যৌগিক পদার্থ। এইভাবে করে করে যখন হাইড্রোজেনে নিয়ে যাওয়া হল তখন একটা মৌলিক অনু পাওয়া গেলে। পরে দেখা গেল সেটাও একটা যৌগিক পদার্থ। কারণ তার মধ্যে ইলেক্ট্রন প্রোটন আছে। ইলেক্ট্রন প্রোটনকেও যদি ভেঙে দেওয়া হয় তখন শেষ গিয়ে দাঁড়াবে শক্তি বা এনার্জীতে। এনার্জী যখন পৌঁছে গেল তখন সেখান থেকে আরে নীচে যাওয়া যাবে না। বিজ্ঞান এখানে এসে থেমে যায়। বিজ্ঞানীরা বলে এনার্জী আমাদের কাছে simplest। আমরা বলি, এনার্জীতেও তিনটে জিনিষ সত্ত্ব, রজো আর তমো এই তিনটে গুণ আছে। সত্ত্ব, রজো আর তমের নীচে সেও অখণ্ড সচ্চিদানন্দ।

আর *অপ্রমেয়* মানে যাকে মাপা যায় না। জগতে যা কিছু আছে সব কিছু ইন্দ্রিয় দিয়ে মেপে নেওয়া যায়, কিন্তু যিনি পরমাত্মা তিনি অপ্রমেয়, কারণ ইন্দ্রিয় দিয়ে তাঁকে জানা জায় না। যেখানে মাপামাপির ব্যাপার আছে সেখানে যৌগিক পদার্থ থাকতে হবে। Complexকে সব সময় মাপা হয় simpleকে দিয়ে। যেমন ধরুন এক, এক হল simple। যখন দুইকে মাপতে হয় তখন এক দিয়েই মাপা হয়। কিন্তু যদি এক মাপতে হয় তখন মাপার কোন পথ থাকে না। প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা, সচ্চিদানন্দ প্রকৃতির বাইরে, তাই প্রকৃতি দিয়ে সচ্চিদানন্দ বা পুরুষকে মাপা সম্ভবই নয়। প্রকৃতির দুটো তিনটে ধাপের নীচে বুদ্ধি আসছে। তার আরও দু ধাপ নীচে মন ইন্দ্রিয়াদি আসছে। এই মন ইন্দ্রিয়াদি তো অনেক বেশী compound হয়ে গেল। মন, ইন্দ্রিয় এগুলো এত বেশী compound হয়ে যাচ্ছে যে এই দিয়ে আপনি simpleকে জানবেন কি করে! ঠাকুর বলছেন সহজ না হলে সহজকে জানা যায় না। আমরা হলাম complex। আমাদের মনে অনেক complexity আছে বলে আমরা ঠাকুরকে কোন দিন বুঝতেই পারবো না। সেইজন্য বলছেন *অপ্রমেয়ম্*, ইন্দ্রিয় দিয়ে তাঁকে মাপা যাবে না। দুদিক থেকে মাপা যাবে না, প্রথম বড় দিয়ে ছোটকে মাপা যায় না। আপনার কাছে এক মিটার একটা রড আছে, যদি বলা হয় এই রড দিয়ে এই পাঁচ টাকার কয়েনটাকে মাপতো। আপনি মাপতে পারবেন না। অন্য দিকে ছোট দিয়ে বড়কে মাপা যায় না। আপনাকে যদি বলা হয় এই এক ফুট দড়ি আছে এই দড়ি দিয়ে আপনি বিশাল বটবৃক্ষকে বেঁধে রাখুন। এক মিটার দড়ি দিয়ে বিশাল বট গাছকে কোন ভাবেই বাঁধা যাবে না। আত্মা হলেন সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর সেইজন্য আমাদের মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় দিয়ে মাপা যাবে না। আত্মা আবার বড় থেকেও বড় *অণোরণিয়াম মহতোমহীয়ান*। আমি যদি আমার দুটো হাত দিয়ে ইউনিভার্সিটির পুরো বিল্ডিংটা ধরতে চাই, কোন দিন ধরতে পারবো না, কারণ বিল্ডিংটা আমার হাতের তুলনায় বিশাল, তিনি আবার সূক্ষ্ম থেকেও সূক্ষ্মতর, কোন দিক দিয়েই তাঁকে মাপা যাচ্ছে না। সেইজন্য তিনি হলেন *অপ্রমেয়*।

আবার তিনি নির্গুণ। নির্গুণ মানে ঈশ্বর কী হাইড্রোজেন গ্যাসের মত কোন রঙ নেই, কোন স্বাদ নেই colourless, tasteless। ভগবান হাইড্রোজেন গ্যাসের মত নন। ঠাকুর বলছেন দূর থেকে সমুদ্রের জল নীল রঙ দেখায়, কাছে গিয়ে হাতে জল নিলে দেখে কোন রঙ নেই। আসলে মূল কথা হল ভগবানকে কোন ভাবেই ব্যাখ্যা করা যায় না, সৎ, চিৎ ও আনন্দ এই তিনটে ছাড়া ভগবানকে ব্যাখ্যা করা যায় না। আমরা বলতে পারবো না যে তিনি নেই, তিনি অবশ্যই সব সময়ই আছেন, আর এটা বলা যাবে না যে তাঁর চেতনা নেই, এটা বলা যাবে না যে তিনি নিরানন্দ। একমাত্র বিপরীতার্থ কতকগুলি গুণ দিয়ে তাঁকে বোঝান যায়, তাছাড়া

আর কোন কিছু দিয়ে তাঁকে বোঝানো যায় না। বোঝানো গেলে তো তাঁকে ব্যাখ্যা করা হয়ে যাবে। ঈশ্বরকে যেই মুহুর্তে ব্যাখ্যা করে দেওয়া হবে তখনই তিনি প্রমেয় হয়ে যাবেন।

শ্লোকের প্রথম লাইনে বলছেন *নৃণাং নিঃশ্রেয়সার্থায়*, ভগবান যখন অবতার হয়ে আসেন তখন তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য জীবের পরমকল্যাণ সাধিত করা। ঈশ্বরের প্রতি মানুষের ভক্তি কি করে হবে, মুক্তি কীভাবে হবে এ ছাড়া ভগবানের আর কোন উদ্দেশ্য থাকে না। ভগবানের একমাত্র কাজ হল মানুষকে নিঃশ্রেয়সের দিকে নিয়ে যাওয়া। রাসলীলাতে যা কিছু হয়েছে তিনি নিজেই এগুলোকে তাঁর দিব্য শক্তি দিয়ে সামনে নিয়ে এসেছেন। কেন নিয়ে এসেছেন? যাতে রাসলীলার অন্তর্নিহিত ভাবকে অবলম্বন করে জীব তার পরম কল্যাণ সাধন করতে পারে। হে পরীক্ষিৎ! তুমি যদি পুরো রাসলীলাকে সাধারণ দৃষ্টিতে দেখ তাহলে তুমি সব কিছু গুলিয়ে ফেলবে। গীতার উপদেশ যেমন ভগবান মানবজাতির কল্যাণের উদ্দেশ্যে অর্জুনকে দিয়েছিলেন, ঠিক তেমনি ঈশ্বরের প্রতি পরমভক্তি, প্রেমাভক্তি, অবৈধ ভক্তি কেমন হতে পারে, ভাবীকালের আধ্যাত্মিক সাধক যাতে এই প্রেমাভক্তির ধারণা করতে পারে সেই উদ্দেশ্যে এবং মানবজাতির কল্যাণার্থে শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের নিয়ে এই রাসলীলার মাধ্যমে দেখিয়ে দিলেন ঈশ্বরের প্রতি পরাভক্তি বা প্রেমাভক্তি কোন উচ্চ পর্যায়ে পৌঁছতে পারে এবং মানুষ তার মুক্তির সন্ধান পেতে পারে। এখানে গোপীদের ভালোবাসা বা গোপীদের সন্তুষ্ট করা শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্য নয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গোপীদের যে ভালোবাসা, সেই ভালোবাসাকে অবলম্বন করে তিনি নিজের দিব্যলীলা প্রকট করলেন। গোপীদের আকর্ষণ করে শ্রীকৃষ্ণ দেখালেন ভগবানের প্রতি প্রেমাভক্তি যখন হয় তখন সেটা কি রকম হতে পারে। পরের শ্লোকে শুকদেব আবার যে কোন একটা ভাবকে আশ্রয় করার কথা বলছেন।

***কামং ক্রোধং ভয়ং স্নেহমৈক্যং সৌহৃদমেব চ। নিত্যং হরৌ বিদধতো যান্তি তন্ময়তাং হি তে।।*১০/২৯/১৫**। ভাগবতের এটি একটি খুব উল্লেখযোগ্য শ্লোক। আমরা ধরে নিচ্ছি ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ ভাগবতের পরে রচিত, আর ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের একটি অংশ হল অধ্যাত্ম রামায়ণ। অধ্যাত্ম রামায়ণে হনুমান রাবণকে বারবার বৈরী ভাবে সাধন করতে নিষেধ করছেন। অধ্যাত্ম রামায়ণ খুব উচ্চাঙ্গের শাস্ত্র, এর মধ্যে নেতিমূলক কোন ভাব নেই, সবটাই খুব ইতিবাচক। বাল্মীকি রামায়ণ বা তুলসীদাসের রামচরিতমানসে নেতিবাচক অনেক কিছু আছে কিন্তু অধ্যাত্ম রামায়ণে খারাপ বলে কিছু নেই। এমনকি রাবণের চরিত্রকে একজন সাধকের চরিত্র রূপে দেখান হচ্ছে যেখানে রাবণ বৈরী ভাবে সাধন করছে। অধ্যাত্ম রামায়ণের রাবণের বৈরভাবের যে সাধনা তারই মন্ত্র প্রথম ভাগবতেই এখানে এসে গেছে। ঈশ্বরের প্রতি কোন একটা ভাব অবলম্বন কর। ঠাকুরও বলছেন একটা ভাবকে আশ্রয় করে ভাবকে পাকা কর। এখানে কি কি ভাবের কথা বলা হচ্ছে? কাম বা ক্রোধ বা ভয়। কিন্তু এই কাম, ক্রোধ ও ভয়ের ভাব ভালো নয়। ঠাকুর বলছেন বাড়িতে সদর দরজা দিয়েও প্রবেশ করা যায় আবার পেছনের আস্তাকুঁড়ের রাস্থা দিয়েও ঢোকা যায়। এই ভাবগুলো পেছনের রাস্থা। হনুমান তাই বারংবার রাবণকে বৈরভাবে সাধন করতে নিষেধ করছেন। কিন্তু ঈশ্বরের সঙ্গে আগে একটা সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। এই কথা শুকদেব পরীক্ষিৎকে বলছেন। যদি বৈরভাবেও সাধন কর তাহলেও তুমি সব সময় কৃষ্ণ কৃষ্ণই দেখবে আর মৃত্যুর পরও কৃষ্ণই দেখবে। কিন্তু এই পথটা ভালো পথ নয় এবং কাউকে এই পথ অবলম্বন করার জন্য কখন উপদেশও দেওয়া হয় না। উচ্চ আদর্শের যখন পতন হয় তখন তার পরিণামে যে খারাপটা হয় সেটা খুব মারাত্মক হয়ে যেতে পারে। সেইজন্য এমন আদর্শ মানুষের সামনে রাখা হয় যেটাতে পতন হয়ে সমাজে যাতে কোন গোলমাল না হয়ে যায়। কারণ সমাজে অতি সাধারণ বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষও আছে।

আমরা বলি বটে সব কিছু ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই হয়, কিন্তু আমি যখন কোন জিনিষ অনুভব করছি, চিন্তা করছি, সবটাই বুদ্ধি দিয়ে করছি। আমার মন যেটা বুদ্ধি দিয়ে চলে, সেই মন একটা রঙিন চশমার মত। চৈতন্য সত্তার যে শুদ্ধ আলো আসে সেটা ঐ রঙিন কাঁচের মধ্যে দিয়ে আসছে। সিনেমার প্রজেক্টরের মধ্যে ফিল্মের রীল ভরা আছে, এখন প্রজেক্টরে যখন শুদ্ধ আলোটা এসে পড়ে তখন সেই আলোটা আবার রীলের মধ্যে দিয়ে স্ক্রীনে পড়ছে তখন পর্দার উপর প্রতিফলিত আলোটা অন্য রকম দেখাচ্ছে। যে ছবিটা এখন স্ক্রীনে দেখাচ্ছে এটাই হল আমার কোন জিনিষের প্রতি আমার দৃষ্টিভঙ্গি। ঠাকুর বলছেন মূলো খেলে মূলোর ঢেকুর

ওঠে। কেন মূলো খেলে মূলোর ঢেকুর ওঠে? আমি যে রকম আহরণ করব সেটাই তো বেরোবে। আমি যে রকম চিন্তা ভাবনা করেছি, মনকে যে রঙে ছুপিয়ে রেখেছি আলোটাও সেই রকম দেখাবে। রোজ সকাল সাতটায় আমার চা খাওয়ার অভ্যাস। ঠিক সাতটায় কাজের লোকটি আমাকে চা দিয়ে যায়। একদিন সাতটা দশ হয়ে গেছে কিন্তু এখনও চা দিয়ে যায়নি। আমি অস্থির হয়ে উঠেছি। সাতটা পনেরোতে চা নিয়ে আসতেই কাজের লোকটিকে আমি দুটো কথা শুনিয়ে দিলাম। পরে জানা গেলে কি একটা জরুরি কাজে আমার বাবা লোকটিকে বাইরে পাঠিয়েছিলেন। তারও পরিস্থিতিটা অন্য রকম হয়ে গিয়েছিল, যার জন্য সাতটায় চা দিয়ে যেতে পারেনি। আমি কেন প্রথমেই এই দেরী করাটাকে মানতে পারলাম না? কারণ আমার মানসিক প্রস্তুতি যে ভাবে হয়ে আছে সেই অনুসারে সাতটা বেজে গেছে কাজের লোক এখন আমার জন্য চা নিয়ে আসবে। এই পরিস্থিতির রঙে আমার মনটা ছোপান হয়ে আছে। কারুর বাড়িতে কেউ মারা গেছে, চুরি হয়ে গেছে, ব্যবসায় ক্ষতি হয়ে গেছে, চাকরি চলে গেছে এই সব পরিস্থিতিতে মন বুদ্ধি যদি একেবারে পরিষ্কার থাকে তখন প্রথম থেকেই মনে হবে সব তাঁর ইচ্ছা তাই এই রকম হয়েছে। কিন্তু প্রজেক্টরের আলোর সামনে রীল চলে আসছে তখন আলোটা অন্য রকম হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু পরে দেখছি আসলে যে রকম আসার কথা সেই রকম আসছে না, আমার মনের রঙের সাথে মিল খাচ্ছে না। সেইজন্য বলছেন যে ভাবেই পার ভগবানের সঙ্গে একটা সম্পর্ক করে নাও। যদিও এখানে কাম, ক্রোধ, ভয় ইত্যাদি সব কিছু দিয়েই ভগবানের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করার কথা বলা হচ্ছে কিন্তু এগুলোকে নিন্দা করা হয়। সমাজের সাধারণ মানুষের সামনে এগুলোকে দেওয়া যায় না, কারণ সাধারণ মানুষের নিজের যেরকম বুদ্ধি সেই রকমই দেখছে, এই সম্পর্কগুলো মিলবে না বলে একটু উচ্চ ভাবের সম্পর্ক তৈরীর কথা বলা হয়। যেমন তুমি সত্য অনুশীলন কর। কেন সত্য অনুশীলন করবে? ঈশ্বর সত্যস্বরূপ। তাই তুমি সত্যে প্রতিষ্ঠিত থাক। এতে কি হবে? তোমার ঈশ্বর লাভ তো হবেই সাথে সাথে সমাজ ও দেশেরও মঙ্গল। ঈশ্বরের জন্য তুমি সব ত্যাগ কর। এতে কি হবে? এখানেও ঈশ্বরকে সে পাবে আর তার সাথে সমাজেরও উন্নতি হবে। তাই এমন আদর্শ তুলে ধরতে হয় যাতে সমাজের সাধারণ মানুষেরও মঙ্গল হয়।

মনের মধ্যে যে বৃত্তিগুলো আছে এই বৃত্তিগুলোকে যখন ভগবানের সঙ্গে এক করে দেওয়া হয়, যেমন গীতায় ভগবান বলছেন *যৎকরোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ* - যা কিছু করছ, যা কিছু খাওয়া-দাওয়া করছ, যা যজ্ঞ করছ, যা দান করছ তার ফল সব আমাকে দিয়ে দাও। তার মানে মনে যত রকমের বৃত্তি আছে সব বৃত্তি ঈশ্বরের সাথে জুড়ে দেওয়ার কথা বলা হচ্ছে। ভগবানের সঙ্গে এই বৃত্তিগুলো জুড়ে দিলে এই বৃত্তিগুলোই ভগবন্নময় হয়ে যায়, কৃষ্ণময় হয়ে যায়। কৃষ্ণময় যখন হয়ে যায় তখনই ঈশ্বর প্রাপ্তি হয়। যোগের দৃষ্টিতে দুই রকমের চৈতন্য লাভ হয় – একটা হল সগুণ সাকার বৃত্তি। যখন ঠাকুর মা কালীর ধ্যান করছেন তখন তিনি সব কিছুতেই মা কালীকেই দেখছেন। এটা হল শেষ বৃত্তি, একটাই বৃত্তি থেকে যাচ্ছে, কৃষ্ণময়। ঠাকুরের মন্ত্র নিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের মন্ত্র জপ করে করে যখন তাঁর পুরো মনটা রামকৃষ্ণময় হয়ে যাচ্ছে তখন শ্রীরামকৃষ্ণের বাইরে তিনি আর কিছু দেখছেন না। তার মানে, প্রজেক্টর দিয়ে যে আলো আসছে সেখানে শুধু শ্রীরামকৃষ্ণের ছবি রাখা আছে, শ্রীরামকৃষ্ণের ছবি ছাড়া আর কিছুই আসছে না। তখন দেখে এই পাখা কেন ঘুরছে? ঠাকুরই ঘোরাচ্ছেন। এরা কারা? শ্রীরামকৃষ্ণ। সব কিছু শ্রীরামকৃষ্ণময়। এর আরেক ধাপ উপরে যদি চলে যেতে চায় তখন এই শ্রীরামকৃষ্ণময়তা বৃত্তি যেটা আছে, সেটাকেও শান্ত করে দিতে হবে। যখন শ্রীকৃষ্ণ বৃত্তিটাকেও প্রশমিত করে দেবে তখনই শুদ্ধ নিরাকার ভাব চলে আসে। তখন কি থাকে সেটা আর মুখে বলা যায় না। কারণ বৃত্তিই নেই, ঢেউ আর জল এক হয়ে গেছে। সেইজন্য এই অবস্থাটাকে বোঝাবার জন্য শব্দ দিয়ে বলা হয় নিরাকার। গোপীদের যে কৃষ্ণের প্রতি ভালোবাসা তাতে তারা কৃষ্ণময় হয়ে গেছেন। সুতরাং গোপীদের যে ঈশ্বর দর্শন হবে এতে সন্দেহের কিছু নেই।

শুকদেব খুব সুন্দর কথা বলছেন ***ন চৈবং বিস্ময়ঃ কার্যো ভবতা ভগবত্যজে। যোগেশ্বরেশ্বরে কৃষ্ণে যত এতদ্ বিমুচ্যতে।।***১০/২৯/১৬। ‘পরীক্ষিৎ! তুমি তো সাধারণ লোক নও, পরম ভাগবত্তত্ত্বের রহস্য সম্পর্কে তুমি অনভিজ্ঞ নও। তাহলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই বিষয়ে তুমি কেন বিস্মিত হচ্ছ! যোগীরাই কত কিছু করে দিতে পারেন আর তিনি হলেন যোগেশ্বরেরও যোগেশ্বর, তিনি অজর, তাঁর জন্মই হয়নি, তিনি এই ধরণের

জিনিষ করে দেবেন এতে আশ্চর্য হওয়ার কি আছে। কাঁচা গেঁয়ো লোক যদি প্রশ্ন করে শ্রীকৃষ্ণ এটা কি করে করলেন, বাঁশিতে একটা ধ্বণি দিতেই ব্রজের সব মেয়েরা শ্রীকৃষ্ণের কাছে ছুটে চলে গেল, তাহলে মানা যায়। কিন্তু তুমি কি করে এই প্রশ্ন করছ! তোমার মন বিকশিত, তুমি জান শ্রীকৃষ্ণ শুধু যোগেশ্বরই নন, তিনি যোগেশ্বরেরও ঈশ্বর, তাঁর পক্ষে সব কিছুই সম্ভব। কি সম্ভব? সাধারণ মানুষের যে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভালোবাসা সেই ভালোবাসাকে তিনি করে দিলেন কৃষ্ণময়। কৃষ্ণময় বৃত্তি যখন হয়ে গেল তখন তার স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরটা খসে গিয়ে বেরিয়ে এল চিদানন্দময় শরীর। তারপর শুরু হল রাস'। এই জায়গাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তার মানে, শ্রীকৃষ্ণের স্থূল শরীর আর গোপীদের স্থূল শরীরে কোন লীলাখেলা হচ্ছে না। শ্রীকৃষ্ণ চিদানন্দময় শরীর আর গোপীরা শুদ্ধ চৈতন্যময় চিদানন্দময়ী শরীর ধারণ করে এখন রাসলীলা করবেন। এর বাইরে বাকী যা কিছু আছে সেগুলো সবই মানবীয় কিন্তু শরীর শুদ্ধ চৈতন্যময়। এই ব্যাখ্যা ভাষ্যকাররা দিচ্ছেন না, মূল ভাগবতেরই এই ব্যাখ্যা। দক্ষিণেশ্বরে মা ভবতারিণীর মন্দিরে পূজো করার সময় ঠাকুর দেখছেন কোশাকুশিও চিন্ময়। ঠিক তেমনি গোপীরা যে শরীরে রাসলীলা করেছেন এই শরীর মানবীয় শরীর নয়, চিন্ময় শরীর। পরীক্ষিৎকে শুকদেব এই সব বলে বলছেন 'পরীক্ষিৎ তোমার এই প্রশ্ন করা ঠিক নয়। তাঁর চোখের চাহনিতেই জগতের কল্যাণ হয়ে যায়, সেখানে গোপীদের মনের বৃত্তিটাই যে পুরো পাল্টে যেতে পারবে এতে আশ্চর্যের কিছু নেই।

গোপীদের সাথে শ্রীকৃষ্ণের প্রণয় পরিহাস

এইসব বলার পর শুকদেব আবার শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের কীভাবে সম্ভাষণ করছেন তার বর্ণনা করে বলছেন ***স্বাগতং বো মহাভাগা প্রিয়ং কিং করবাণি বঃ। ব্রজস্যানাময়ং কচ্চিদ্ ব্রূতাগমনকারণম্।।*** ১০/২৯/১৮। গোপীদের শ্রীকৃষ্ণ স্বাগত করছেন। স্বাগত করে ভগবান বলছেন 'তোমরা মহাভাগ্যবতী, তোমাদের প্রসন্ন করার জন্য আমি তোমাদের কোন্ প্রিয় কাজ করব বল। তোমাদের সবার কুশল তো? আমি এখানে নির্জনে বসে নিজের মনের মত বাঁশি বাজাচ্ছি কিন্তু হঠাৎ করে রাত্রিবেলা তোমাদের এখানে আগমনের হেতু কী? ব্রজে সব কিছু ঠিক আছে তো? তবে কি জান – ***রজন্যেষা ঘোররূপা ঘোরসত্ত্বনিষেবিতা। প্রতিযাত ব্রজং নেহ স্থেয়ং স্ত্রীভিঃ সুমধ্যমাঃ।।*** ১০/২৯/১৯। এই নিশুতি গভীর রাত এমনিতেই ভয়ের সময়, তাছাড়া হিংস্র জন্তুরাও খাদ্যের অন্বেষণে বিচরণ করছে, এই সময় তোমাদের মত সুন্দরী ললনাদের এখানে অবস্থান করা একেবারেই নিরাপদ নয়। যদি তোমাদের কোন প্রিয় কাজ করার কথা বলার জন্য এসে থাক তাহলে বল আমি করে দিচ্ছি। আর ব্রজে যদি কিছু গোলমাল হয়ে থাকে তাও বল আমি সেটাও মিটিয়ে দিচ্ছি। আর এমনিই বেড়ানোর উপলক্ষে যদি এসে থাক তাহলে বলছি এই সময়টা কোন নারীর পক্ষেই মঙ্গল নয়, তাই তোমরা সত্বর ব্রজে ফিরে যাও। শুধু তাই নয়, ***মাতরঃ পিতরঃ পুত্রা ভ্রাতরঃ পতয়শ্চ বঃ। বিচিন্বন্তি হ্যপশ্যন্তো মা কৃঢ্বং বন্ধুসাধ্বসম্।।*** ১০/২৯/২০। এই সময় তোমাদের গৃহে না দেখতে পেয়ে তোমাদের মা, বাবা, সন্তান, স্বামী, ভ্রাতা, বন্ধু প্রভৃতি স্বজন পরিজনরা নিশ্চয়ই তোমাদের অনুসন্ধানে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। তোমাদের দেখতে না পেয়ে পরিবারের স্বজনরা চিন্তিত হয়ে পড়বেন। সেইজন্য তোমরা এক্ষুণি সবাই ব্রজে ফিরে যাও।

এখানে শুধু যে কুমারী মেয়েরাই এসেছেন তা নয়, স্ত্রীরা, মায়েরাও এসেছেন। একদিকে শ্রীকৃষ্ণ এখানে গোপীদের সাথে মজা করার ছলে সাধারণ মানুষের জন্য একটা শিক্ষা দিচ্ছেন। যেখানে ভালোবাসার সম্পর্ক থাকে সেখানে এক অপরের সাথে মজা করতে ভালোবাসে। মা ও ছেলে এক অপরের সাথে মজা করে, প্রেমিক প্রেমিকা এক অপরের সাথে মজা করে, স্বামী স্ত্রী এক অপরের সাথে মজা করে। এগুলোকে বলে পরিহাস। পরিহাসের ছলে মিথ্যা কথা বলা বা এক অপরকে টিপ্পণি করা মানে প্রণয়কে আরও নিবিড় করা। সেইজন্য আমাদের শাস্ত্রে বলে রতিকালে অর্থাৎ প্রেমিক প্রেমিকার প্রণয়কালে বা স্বামী স্ত্রীর প্রণয়কালে যদি মিথ্যা কথা বলা হয় সেই মিথ্যাকে মিথ্যার মধ্যে গণ্য করা হয় না।

এত কথা বলার পরেই শ্রীকৃষ্ণ বলছেন ***দৃষ্টং বনং কুসুমিতং রাকেশকররঞ্জিতম্। যমুনানিললীলৈজত্তরুপল্লবশোভিতম্।।*** ১০/২৯/২১। অবশ্য আজকের রাতে এই বনের শোভা অপূর্ব এবং

শোভনীয় তাতে সন্দেহ নেই। চারিদিকে গাছে গাছে পল্লবে পল্লবে ফুল প্রস্ফুটিত। পূর্ণিমার স্নিগ্ধ কিরণে বনভূমি প্লাবিত, যমুনার জল স্পর্শ করে সমীরণ ধীর গতিতে প্রবাহিত হচ্ছে। এই অলৌকিক দৃশ্য দেখে সত্যিই যেন আশ মিটতে চায় না। তবুও বলি এই দৃশ্য তোমাদের সব দেখা হয়ে গেল এবার সবাই ব্রজে ফিরে যাও। তোমরা সবাই ভালো বংশের মেয়ে, তোমরা সবাই সতী সাধ্বী রমণী, গৃহে ফিরে গিয়ে নিজের স্বামী, শ্বশুর শাশুড়ি, বাবা-মা, ভাই-বোনদের সেবা কর। তবে আমার প্রতি অনুরাগ আর ভালোবাসার টানে যদি এখানে এসে থাক তাতেও তোমরা অনুচিত কিছু করোনি। কারণ জঙ্গলের পশুপাখিরাও আমাকে ভালোবাসে। কিন্তু তবে কি জান, ***ভর্তুঃ শুশ্রূষণং স্ত্রীণাং পরো ধর্মো হ্যমায়য়া। তদ্বন্ধূনাং চ কল্যাণ্যঃ প্রজানাং চানুপোষণম্।।***১০/২৯/২৪। হে কল্যাণী গোপীগণ! স্বামী এবং তাঁর আত্মীয়স্বজনদের আন্তরিক ভাবে অকপটে সেবা করা এবং সন্তানদের পালন পোষণ করাই স্ত্রীদের পরম ধর্ম। সেইজন্য তোমরা তাড়াতাড়ি ফিরে যাও। কুলস্ত্রীর পক্ষে উপপতির সেবা করা সর্ব প্রকারে অত্যন্ত নিন্দনীয়, এর থেকে নিন্দার আর কিছু হতে পারে না। এতে তাদের পরলোক নষ্ট হয়, স্বর্গপ্রাপ্তি হয় না আর এই লোকে চরম অপযশ পায়। একেই এই কুকর্মের সুখ ক্ষণিক, অথচ এই কর্ম করতে একদিকে কত রকম কষ্ট সহ্য করতে হয় আবার অন্য দিকে কত ধরণের বিপদের আশঙ্কা থাকে। যারা নিজের স্বামীকে ছেড়ে অপরকে ভালোবাসে তাদের কত লুকিয়ে চুরিয়ে চলতে হয়, মনের মধ্যে ধরা পড়ার ভয়, আর ধরা পড়লে কলঙ্ক হবে এই আশঙ্কা নিয়ে উপপতির সাথে প্রেম করতে হয়। তাই বলছি তোমরা সবাই ব্রজে নিজের নিজের গৃহে ফিরে যাও। ***দুঃশীলো দুর্ভগো বৃদ্ধো জড়ো রোগ্যধনোঽপি বা। পতিঃ স্ত্রীভির্ন হাতব্যো লোকেপ্সুভিরপাতকী।।১০/২৯/২৫।*** আর দেখো, স্বামী যদি রোগগ্রস্থ হয়, ভাগ্যহীন হয়, বৃদ্ধ হয়, মুর্খ হয়, নির্ধন হয় তাও সেই স্বামীকে সর্বতো ভাবে মন প্রাণ দিয়ে সেবা করতে হয়। এই ধরণের স্বামীর সেবা করলে তোমাদের অবশ্যই উত্তমলোক প্রাপ্ত হবে। শ্রীকৃষ্ণ এখানে নারীদের ধর্ম সম্বন্ধে বলে যাচ্ছেন।

অস্বর্গ্যমযশস্যং চ ফল্গু কৃচ্ছ্রং ভয়াবহম্। জুগুপ্সিতং চ সর্বত্র ঔপপত্যং কুলস্ত্রিয়াঃ।।১০/২৯/২৬। কুলস্ত্রীর পক্ষে উপপতির সেবা করা অত্যন্ত নিন্দনীয় কাজ। এই ভালোবাসা ফল্গু নদীর মত। ফল্গু নদীতে জল ঢাললে সঙ্গে সঙ্গে বালির ভেতরে জল চলে যাবে। এই ভালোবাসা ক্ষণিক, এক্ষুণি নাশ হয়ে যায়, এই আছে এই নেই। এই কাজ তোমাদের কাউকে স্বর্গে নিয়ে যাবে না, তোমাদের অপযশ হয়ে যাবে। সুতরাং পর পুরুষকে ভালোবেসে তোমাদের ইহকাল পরকাল দুটোই নাশ হয়ে যাবে। ***শ্রবণাদ্ দর্শনাদ্ ধ্যানান্ময়ি ভাবোঽনুকীর্তনাৎ। ন তথা সন্নিকর্ষেণ প্রতিযাত ততো গৃহান্।।***১০/২৯/২৭। আরও বিশেষ কথা এই যে, আমার রূপ, আমার গুণ-লীলার দর্শন করে, শ্রবণ করে, কীর্তন করে এবং আমার ধ্যানের দ্বারা আমার প্রতি যে অনুরাগ ভক্তি জন্মায় আমার সান্নিধ্যে তা হয় না। কথায় বলে যত দূর তত মধুর যত কাছাকাছি তত অশান্তি। শ্রীকৃষ্ণ এই কথাই বলছেন, তোমরা আমার থেকে যত দূরে থাকবে ততো তোমাদের ভক্তি বাড়বে। কাছে এলে তোমাদের ভক্তি তত কমে যাবে। সুতরাং তোমরা এখন নিজ নিজ গৃহে ফিরে যাও। এইসব কথা বলে শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের উপেক্ষা করে এড়িয়ে যেতে চাইছেন। এগুলো হল প্রণয় পরিহাস। ঠাকুর রাখালকে বলছেন ‘জানিস্ তোকে কেন রাগালুম? ওষুধ ঠিক ঠিক পড়বে বলে’। কিছু কবিরাজী ওষুধ আছে রোগীকে সেবন করালে জ্বর ও রোগের অন্যান্য উপসর্গগুলো বেড়ে যায়। তখন ওষুধ ঠিক ঠিক কাজ করে। প্রণয় পরিহাস মানে, এই যে মিষ্টি মিষ্টি করে শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের বলছেন কিন্তু তিনিও জানেন গোপীরাও কেউ ফিরে যাবে না আর তিনিও গোপীদের কাছে নিয়ে আসার জন্য বাঁশীতে ক্লীং ধ্বণি তুলেছেন। এখন যদি ব্রজের সব মেয়েরা ব্রজে ফিরে যায় তখন আরেক ঝামেলার উদ্ভব হবে। শ্রীকৃষ্ণ এখানে তাই করছেন, একটু ঠেলেও দিচ্ছেন আবার ধরেও রাখছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ-অবতারত্বের বিশেষত্ব

ভক্ত যখন তাঁর ইষ্টের পূজো করেন তখন তিনি ইষ্টের কোন একটা জিনিষকে বিশেষ ভাবে দেখেন। যাঁরা ঠাকুরের ভক্ত তাঁদের যদি জিজ্ঞেস করা হয় ঠাকুরের বিশেষত্ব কী? ঠাকুরের মধ্যে এমন বিশেষত্ব কী

আছে যেটা আমরা আমাদের ছোট ছেলেমেয়েদের বা কোন অজ্ঞ লোককে বলে মুগ্ধ করতে পারি বা ঠাকুরের সম্বন্ধে একটা উচ্চ ধারণা দিতে পারি? বেশীর ভাগ ভক্তই এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারবেন না। ঠাকুরের যে কোন একটা দিক এমন হতে হবে যেটা সাধারণ মানুষের থেকে আলাদা। অনেকে বলতে পারেন তিনি সত্যে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। গান্ধীজীও তো সত্যে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। আর গান্ধীজীর উপর ইংরেজ শাসকদের যে অত্যাচার হয়েছে ঠাকুরের উপর সেই অত্যাচারের এক কণাও হয়নি। অনেকে হয়তো বলবেন ঠাকুর মুহুর্মুহু নির্বিকল্প সমাধিতে চলে যেতেন, এটা ঠাকুরের একটা বিশেষ দিক কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু একটা বাচ্চা বা সাধারণ মানুষ জানেই না নির্বিকল্প সমাধিটা কি জিনিষ, তাদের বোঝালেও তারা বুঝতে পারবে না। তাই নির্বিকল্প সমাধি দিয়ে তাদের কাছে ঠাকুরের বিশেষত্বকে বোঝান যাবে না। ঠাকুর সব কিছুতে ঈশ্বর দর্শন করতেন, ঠাকুরের এই বিশেষত্বকে সাধারণ মানুষকে কিছুটা ধারণা করানো যায়। ঠাকুরের যত আধ্যাত্মিক অনুভূতির কথা আমরা কথামৃতে পাই, ঠাকুরের সমস্ত অনুভূতি আমাদের শাস্ত্রে যত রকম অনুভূতির কথা পাই সবটাকেই ছাড়িয়ে গেছে। আপনি আপনার নাতি বা ছোট বাচ্চাকে আধ্যাত্মিক অনুভূতি জিনিষটা কী কি করে বোঝাবেন? এখানেও বোঝাবার কোন পথ নেই। আমাদের পরম্পরাতে যত অবতার এসেছেন, এঁদের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের অবতারত্বের বিশেষত্বকে বোঝান সব থেকে কঠিন। কারণ যে জায়গাতে ঠাকুরের বিশেষত্ব, সেই জায়গাটাকে কেউ ধারণাই করতে পারে না।

ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারকে ঠাকুর একটা জিনিষ খুব সুন্দর করে ব্যাখ্যা করে বোঝাবার পর ডাঃ সরকার বলছেন 'বাঃ! ব্যাপারটা তো খুব সুন্দর'! ঠাকুর তখন বলছেন 'একটা থ্যাঙ্ক্যু দাও'! ডাঃ সরকার বলছেন 'থ্যাঙ্ক্যু দিলেই কি হয়ে যায়'? ঠাকুর বলছেন 'মুর্খদের জন্য এটা দরকার'। ঠাকুর তখন আবার রামায়ণ থেকে উদাহরণ টেনে বলছেন, শ্রীরামচন্দ্র যখন লঙ্কায় রাবণ বধ করে লঙ্কা জয় করার পর বিভীষণকে লঙ্কার রাজা করতে গেলেন, বিভীষণ তখন বলছেন 'আমার রাজ্য লাগবে না, আপনার শ্রীচরণে আমার ভক্তিটুকুই দরকার'। তখন শ্রীরামচন্দ্র বলছেন 'না, মুর্খদের জন্য তোমাকে রাজ্য গ্রহণ করতে হবে। তা নাহলে যারা মুর্খ তারা বলবে বিভীষণ শ্রীরামচন্দ্রের জন্য এত কিছু করে পেল কী? সেইজন্য তোমাকে লঙ্কার রাজা হতে হবে'। কারণ সমাজটা হল মুর্খদের। আমরা সবাই মুর্খ, এতে সন্দেহ করার কিছু নেই। আমরা কেউই বিশেষ কিছু নয়। মুর্খদের সব সময় বেনে বুদ্ধি, ঠাকুরকে এতটুকু দিলাম তার বদলে এটুকু পেলাম। প্রত্যেক মাসে এসে আমি ঠাকুরকে প্রণাম করে দশটা টাকা প্রণামি দিয়ে যাচ্ছি আর তার বদলে আমি লক্ষ্য রাখছি আমার কি কি হল, মেয়ের পাত্র জুটলো কিনা, ছেলের চাকরি হলো কিনা, রোগ সারলো কিনা ইত্যাদি। আমাদের মত মুর্খদের অবতার কি, অবতারত্ব কি বোঝাবে কার সাধ্য? কবিদের কাছে ঠিক এই সমস্যাই ছিল। কবিরাই অবতারের লীলা কাহিনী নিয়ে পুরাণ রচনা করেন। ঠাকুরের অবতার লীলা নিয়ে সেই পুরাণ এখনও রচিত হয়নি, আর ঠাকুরের অবতারত্ব ও লীলা নিয়ে যত দিন পুরাণ না রচিত হচ্ছে তত দিন ঠাকুর ঘরে ঘরে ঢুকতে পারবেন না। কথামৃতকেও ঘরে ঘরে যেতে হবে তার সাথে পুরাণও যাবে।

যিনি শুদ্ধ সত্ত্ব, যিনি ত্রিগুণাতীত, পুরাণ সেই ত্রিগুণাতীতকে কাব্যে ছয়টি রসের মাধ্যমে নামিয়ে নিয়ে আসে। বাল্মীকি রামায়ণে কাব্যের ছয় প্রকার রসের কথা বলা হয়েছে, পরের দিকে নয় প্রকার কাব্যরসের কথা বেশী প্রচলিত হয়ে গেছে। কিন্তু এই নয়টি রসকেও ছয়টি কাব্যরসে নামিয়ে দেওয়া যায়। যার মধ্যে কয়েকটি হল শৃঙ্গার রস, বীর রস, বীভৎস রস, করুণ রস ইত্যাদি। এর মধ্যে শৃঙ্গার আর বীর রস এই দুটো কাব্যরস মানুষকে সব থেকে বেশী আকর্ষিত করে। সারা জগতের মানুষ তিনটে জিনিষকেই ঠিক ঠিক বোঝে – কাম, টাকা আর ক্ষমতা। যখন অবতারত্ব দেখাতে হবে তখন এই তিনটে জিনিষকেই দেখাতে হবে। রাজা শ্রীরামচন্দ্র এমন ক্ষমতা নিয়ে সাম্রাজ্য চালাচ্ছেন তাঁর ধারে কাছে কেউ দাঁড়াতে পারছে না। তার উপর আবার বীর রস দেখাতে হবে, তাই যে রাবণের ভয়ে দেবতারাও কাঁপতে থাকে, সেই রাবণকে শ্রীরামচন্দ্র এমন মার মারলেন যে তাঁর মুণ্ডুটা তীর শুদ্ধু কয়েক মাইল দূরে ছিটকে পড়ল। এর সাথে তৃতীয় আরেকটি রস নিয়ে আসতে হবে, সেটি হল শৃঙ্গার রস। রাসলীলা সেই শৃঙ্গার রসের মধ্যে পড়ছে। যখন কবিকে অবতারের অবতারত্বকে কাব্যিক শৈলীতে পুরাণ ধর্মী সাহিত্য রচনা করতে হবে তখন তাঁকে এই নয়টি রসের কোন একটা রসকে অবলম্বন

করতে হবে। শ্রীরামচন্দ্রের ক্ষেত্রে বীর রসকে নিয়ে আসা হয়েছে আর শ্রীকৃষ্ণে এসে বীর রস আর শৃঙ্গার রস এই দুটো রসকেই নিয়ে আসা হয়েছে। ভাগবতে আবার শৃঙ্গার রসে যেন একটু বেশী জোর দেওয়া হয়েছে। এই শৃঙ্গার রসের আবার দুটো রূপ – বিরহ আর মিলন। ভাগবতে এই দুটোকেই নিয়ে আসা হয়েছে, তার সাথে বাৎসল্য রসেরও আস্বাদ করিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমাদের সংস্কার এমন ভাবে তৈরী হয়ে আছে যে, যখনই ভগবানের কথা আসবে তখনই শক্তিকে যেন মনে করিয়ে দেয়। হিন্দী সিনেমার নায়ক যেমন ভিলেন আর তার সাকরেদদের দশ জনকে একাই পিটিয়ে কাবু করে দিচ্ছে। শ্রীরামচন্দ্রের যখন কেউ পূজো করছে তখনও তার মন শ্রীরামচন্দ্রের এই শক্তির কথা চিন্তা করতে থাকে, এর বেশী কিছু সে আর চিন্তা করতে পারবে না। ব্রুস লী মারা গেছে চল্লিশ বছর হয়ে গেল কিন্তু এখনও বর্তমান প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা ঘরের দেওয়ালে তার ছবি টাঙিয়ে রাখছে। যেভাবে ছেলেমেয়েরা না বুঝে শক্তির পূজো করে, আমরাও ঠিক সেই ভাবে না বুঝে শ্রীরামচন্দ্রের, শ্রীকৃষ্ণের পূজো করি। সবাই বীর রসেরই পূজো করছে। বীর রসে আমি চাইলেও শ্রীরামচন্দ্রের কাছাকাছি পৌঁছাতে পারবো না। যে অশ্বত্থামা, যাঁর কাছে ব্রহ্মাস্ত্র ছিল, সেই অশ্বত্থামা সুদর্শন চক্রকে হাঁটু গেড়ে দু হাত দিয়েও তুলতে পারছে না, সেই সুদর্শন চক্রকে শ্রীকৃষ্ণ আঙ্গুলের ডগায় নিয়ে নাচাতেন, শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে এত শক্তি ছিল! এগুলো সত্যি কি মিথ্যে আমাদের জানার কথা নয়। এই কাহিনীকে না মানলে আবার বীর রস পাওয়া যাবে না। বীর রস দিয়ে যেমন শ্রীকৃষ্ণের অবতারত্বকে নিয়ে আসা হচ্ছে, ঠিক তেমনি শৃঙ্গার রস দিয়েও অবতারত্ব নিয়ে আসা হয়েছে।

ঠাকুরের অবতারত্ব যে ধরণের সেখানে আধ্যাত্মিক গুণটাই সব, সেইজন্য ঠাকুরের অবতারত্ব বোঝা এত কঠিন হয়ে যায় যে, ঠাকুরের ভক্তরাই বুঝতে পারেন না অন্যদের আর কি কথা। ঠাকুরের অবতারত্বকে সাধারণ মানুষকে বোঝান অত্যন্ত কঠিন, কিছুই বোঝাতে পারা যাবে না। আপনি বলবেন ঠাকুরের মা কালীর দর্শন হয়। এই রকম দর্শন তো অনেকেরই হয়ে থাকে, তাতে হলোটা কী! ভবিষ্যতে যখন ঠাকুরকে নিয়ে পুরাণ লেখা হবে তখনও এই জিনিষগুলোকে বোঝান যাবে না, সেখানে শৃঙ্গার রস, বীর রস এই জিনিষগুলো আনা যাবে না। কারণ ঠাকুরের অবতারত্বের বৈশিষ্ট্যই হল আধ্যাত্মিক জ্ঞানের বৈশিষ্ট্য। শ্রীকৃষ্ণের ক্ষেত্রে রাসলীলায় শৃঙ্গার রসের মাধ্যমে তাঁর অবতারত্বকে বোঝান হচ্ছে। গীতগোবিন্দ কাব্য গ্রন্থের একটা জায়গায় খুব সুন্দর বর্ণনা আছে যেখানে কবি জয়দেব দেখাচ্ছেন গোপীদের মাঝখানে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর মোহনমুরলী অধরে নিয়ে দিব্যকান্ত শরীরে সমস্ত গোপীদের মধ্যমণি হয়ে দণ্ডয়মান। শ্রীরাধা তারই মাঝখানে শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করে চুম্বন করছেন। সাধারণ মানুষের মনে প্রশ্ন আসবে শ্রীরাধা সবার সামনে কী করে শ্রীকৃষ্ণকে চুম্বন করতে পারলেন। কারণ শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের বিবাহিতা নন আর বিবাহিতও যদি হন কিন্তু সবার সামনে নিজের স্বামীকে একজন স্ত্রী কি করে চুম্বন করতে পারবে! কিন্তু ব্যাপারটা তা নয়, শ্রীরাধা এমনই কৃষ্ণময় হয়ে গেছেন যে, তিনি কৃষ্ণ ছাড়া আর কিছু দেখছেন না। গোপীদেরও তিনি কৃষ্ণই দেখছেন। শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া তো তিনি আর কিছু দেখছেন না, তখন তিনি আর কাকে লজ্জা করবেন আর কিসের থেকেই বা তাঁর লজ্জার ভাব আসবে। এই যে উচ্চ ভাব যেখানে সব কিছুকে কৃষ্ণ দেখছেন এটা হল আধ্যাত্মিক জগতের অনেক উচ্চ ভাব, এই উচ্চ ভাবকে ধারণা করা আর সেখানে পৌঁছান আমাদের মত সাধারণ মানুষের পক্ষে কখনই সম্ভব নয়। আধ্যাত্মিক জগতের এই উচ্চ ভাবকে নিয়েই গীতগোবিন্দের মত কাব্যগ্রন্থ রচিত হয়েছে। রাসলীলা অধ্যয়ন করার সময় আমাদের এই জিনিষগুলোকে মাথার মধ্যে রাখতে হবে, তা নাহলে রাসলীলা পুরো জাগতিক স্তরে নেমে আসবে।

আমরা এখানে আধ্যাত্মিক জগতের খুব কঠিন এক বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি। আমরা প্রথম থেকে বলে আসছি মানুষের মনে নানা রকমের আবেগ আছে, এই আবেগধর্মী মন দিয়ে কীভাবে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় তারই একটা দিককে রাসলীলার মাধ্যমে নিয়ে আসা হয়েছে। হিন্দুদের একটি মৌলিক তত্ত্ব হল জগতে যা কিছু আছে সব ভগবানরই সৃষ্টি, তিনিই সব কিছু নিজে হয়েছেন। কিন্তু খ্রীশ্চান ধর্মের প্রভাবে আমাদের সাধারণ মনে একটা ধারণা তৈরী হয়ে গেছে, যে ধারণায় আমরা কিছু জিনিষকে ভালো আর কিছু জিনিষকে মন্দের মধ্যে গণ্য করে ভালোর থাক আর মন্দের থাক এই দুটো থাক বানিয়ে নিয়ে সব কিছুর বিচার করি। হিন্দু ধর্মে ভালো আর মন্দ বলে কিছু নেই। যেটা আমাদের কাজে লাগে সেটা ভালো, যেটা কাজে

লাগে না সেটা মন্দ। সাধারণ মানুষের বুদ্ধি তো এতটুকুন, তাদের তো এতো বোঝার ক্ষমতা নেই। সাধারণ লোককে বুঝিয়ে দেওয়া হয় তোমার জন্য এটা ভালো, আর এটা তোমার পক্ষে মন্দ। কিন্তু যে ব্যক্তি ভক্তি পথে নিজের স্বরূপের দিকে এগোতে চাইছে, সেই ব্যক্তিকে তখন দেখতে হবে তার ভেতরে যে জিনিষের উপর বেশী ক্ষমতা বা শক্তি বা তার যে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে, সেটাকে কাজে লাগিয়ে লক্ষ্যের দিকে কীভাবে এগিয়ে যাবে। বাচ্চাদের বা অপরকে বা যাকে খুব বেশী ভালোবাসি বা কম ভালোবাসি তাদের উপদেশ দেওয়ার সময় আমরা প্রায়ই এই উপদেশ দিই যে, তোমার মধ্যে এই দুর্বলতা আছে, এই দুর্বলতা থেকে তুমি বেরিয়ে এসো। আসলে আধ্যাত্মিক জীবনে এই উপদেশের কোন দাম নেই, আর আধ্যাত্মিক জীবন কখনই এভাবে হয় না। হিন্দু ধর্ম প্রথমে বাজিয়ে দেখবে আমার আপনার মধ্যে কি বৈশিষ্ট্য আছে, কি শক্তি আছে। ওই শক্তিটাকে দাঁড় করিয়ে তোমার জীবনে এগিয়ে চলার ক্ষেত্রে কাজে লাগাও। তাহলে দুর্বলতাগুলো কোথায় যাবে? কোথাও যাবে না, ওগুলো যেমন ছিল তেমনই পড়ে থাকবে। যেমন বিশ্বামিত্র, তাঁর কামনা-বাসনাগুলো শেষ দিন পর্যন্ত থেকে গিয়েছিল যতক্ষণ না তাঁর আত্মজ্ঞান লাভ হয়েছে। দুর্বাসা মুনিরও ক্রোধ কোন দিন গেল না, ক্রোধ বরাবরের জন্য থেকেই গিয়েছিল। এগুলো থাকবে, জ্ঞান ভক্তির সঙ্গে এগুলোর কোন সম্পর্কে নেই। কিন্তু আপনাকে দেখতে হবে আপনার মধ্যে কি বিশেষত্ব আছে। আপনার মন যুদি খুব যুক্তিবাদী হয়, সব কিছুই আপনি বিচার করে, তখন বলবে তাহলে আপনার জন্য জ্ঞানমার্গ। আবার কারুর মন স্বাভাবিক ভাবেই একাগ্র হয়ে যায়, যে কাজই করে, পড়াশোনা হোক বা অন্য কিছু, সেটাতেই মন খুব একাগ্র থাকে। তাকে বলে দেবে তুমি যোগ পথে যাও। আর যার মনে নানা রকমের আবেগের খেলা চলে, তখন তাকে ভক্তিমার্গের দিকে ঠেলে দেওয়া হয়। মনের ওই আবেগকে নিয়েই তুমি এগোও।

জীবনে শক্তি আর দুর্বলতা বলে কিছু হয় না। যেটাই শক্তি সেটাই অনেক সময় দুর্বলতা হয়ে যায়, আবার যেটাই দুর্বলতা সেটাই শক্তি হয়ে যায়। দেখতে হবে কাজে আপনি এগুলোকে কীভাবে লাগাচ্ছেন। যেমন হাতি কত বড় জন্তু। আগেকার দিনে রাজারা হাতিকে যুদ্ধের সময় কাজে লাগাতেন। চাণক্যও বলছেন যে রাজার হস্তিবাহিনী নেই সেই রাজাকে রাজা মানতে নেই। অথচ যুদ্ধের সময় হাতির এই বিশাল শরীরই যুদ্ধে পরাজয়ের প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়ায়। মুসলমানরা যখন ভারতের রাজাদের উপর প্রথম আক্রমণ করতে শুরু করলেন তখন এই হাতিই হয়ে গেলে দেশের কাল। মুসলমানরা ন্যাপথা ছুঁড়ে মারত, তাতে হাতির গায়ে আগুন লেগে যেত। তখন হাতিগুলো প্রাণপনে পেছনের দিকে পালাতে শুরু করত। পালাবার সময় নিজের লোককেই পিষে দিয়ে চলে যেত। যেটাই হাতির শক্তি ছিল সেটাই তার কাল হয়ে দাঁড়াল। ডায়নোসাররা বিরাট প্রাণী ছিল। বিশাল শরীরকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য শেষে তারা খাবার জোটাতেই পারছিল না। তাতেই পৃথিবী থেকে ডায়নোসার প্রজাতি বিলুপ্ত হয়ে গেল। যেটাই শক্তি সেটাই তার দুর্বলতার কারণ হয়ে গেল। আবার যেটাই তার দুর্বলতা সেটাই তার শক্তির কারণ হয়ে যায়। এক বিধবা ভদ্রমহিলার তার ভাইপোর প্রতি দুর্বলতা ছিল। ঠাকুরের কাছে সেই মহিলা গিয়ে নিজের দুর্বলতার কথা বলেছেন। ঠাকুর তাকে বললেন 'তুমি ওকেই নারায়ণ রূপে সেবা কর তাতেই তোমার হয়ে যাবে'। তখন সেই মহিলা তাই করতে শুরু করে দিলেন।

কোন মানুষের মধ্যে যদি কোন একটা জিনিষের প্রতি তীব্র আকর্ষণ, কারুর প্রতি তীব্র ভালোবাসা থেকে থাকে, তখন ওখান থেকেই তাকে মোর ঘুরিয়ে অন্য দিকে নিয়ে যাওয়া যাবে। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের যে আমাদের মধ্যে কোন কিছুর প্রতি এই ধরণের কোন তীব্র আকর্ষণ, গভীর ভালোবাসাই নেই। আমাদের মধ্যে একটা কিছু করার ক্ষমতাই নেই, তাই কিছু ধারণাও করতে পারি না। ভাগবতে যে আবেগের বর্ণনা করা হচ্ছে এই আবেগকে ধারণা করার জন্য যে ক্ষমতা থাকা দরকার বা আধ্যাত্মিক জীবনে এগোনর জন্য যে ক্ষমতার দরকার কিংবা একটি বিশেষ গুণ থাকার দরকার, যে গুণ দিয়ে আমাকে সবার থেকে আলাদা করে দেওয়া যায়, সেই রকম ক্ষমতা বা গুণ কোনটাই আমাদের মধ্যে নেই। দুর্গুণই হোক না, তাতে কিছু আসে যায় না। দুর্গুণ বলে কিছু হয় না। কারণ আপনার লক্ষ্য দেখে বোঝা যায় আপনি ভুল পথে চলেছেন কিনা। তখন লক্ষ্যটাকে একটু পাল্টে দিয়ে সেই দুর্গুণটাই সুগুণ হয়ে যাবে। এখানে এই জিনিষটাই আলোচনা করা হচ্ছে। পুরাণের এটাই বৈশিষ্ট্য, কোন একজন পুরুষ বা কোন একজন মেয়ের মধ্যে কামভাব বা লোভ বা

ঈর্ষাভাব প্রচণ্ড আকারে রয়েছে, এই ধরণের এক একটা তীব্র আবেগকে ধরে সেটার সাহায্যে কীভাবে ঈশ্বরের দিকে ঠেলে দেওয়া যেতে পারে, সেটাই পুরাণ দেখিয়ে দিচ্ছে। হিন্দুদেরও এটাই বৈশিষ্ট্য হয়ে গেছে। হিন্দুরা তাই দুর্বলতা বলে কিছু মানে না। কোন স্ত্রী যদি পতিব্রতা ধর্মকে অবলম্বন করে নেয়, তাকেও পুরাণ দেখিয়ে দেবে সেই স্ত্রী কীভাবে আধ্যাত্মিকতার চরম অবস্থায় চলে যাবে। আবার যদি কেউ পরকীয়া প্রেমে থাকে, তাকেও দেখিয়ে দেবে সে কীভাবে চরম অবস্থায় যাবে। যার মধ্যে ক্রোধাদি রিপুগুলো প্রচণ্ড শক্তিশালী হয়ে থাকে, তাকেও দেখিয়ে দেবে সে কীভাবে উন্নতির চরম পর্যায়ে চলে যেতে পারবে। মূল কথা হল, তোমার মধ্যে কোন ক্ষমতা আছে কিনা। কিন্তু আমরা হলাম ভ্যাদভ্যাদে চিড়া, একটু জল দিলেই পাঁক হয়ে যায় বা ঠাকুরের কথায় আমরা হলাম সেই রকম গরু যে গরুর ল্যাজে হাত দিলে শুয়ে পড়ে।

স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী তাঁর নিজের জীবনের একটা ঘটনা প্রায়ই বলতেন। উনি যখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে প্রথম রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেন তখন তিনি দেখেন ওখানকার সবাই কি সুন্দর ইংরাজী বলে, সংস্কৃত জানে, আর ওনার গ্রামের স্কুলে সামান্য পড়াশোনা, না জানেন ভালো ইংরাজী, না জানেন সংস্কৃত। কিছু দিন পর থেকে ওনার মনে অবসাদ আসতে শুরু করল, আমি তো এদের কাছে কিছুই নই। তখন হঠাৎ তাঁর মনে হতে লাগল আমি নারকেল গাছের মাথায় যে রকম তড়তড় উঠতে ওস্তাদ ওই রকম তো এরা কেউই পারেনা। স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী বলতেন শুধু এটাকেই সম্বল করে নিজেকে আস্তে আস্তে এই অবসাদের অবস্থা থেকে টেনে তুললাম। সেখান থেকে স্বামী রঙ্গনাথানন্দ আজ কোথায় চলে গেলেন। বলা হয় স্বামীজীর পরে এ রকম শ্রেষ্ঠ বক্তা সারা বিশ্বে আসেননি।

আমি যখন নিজেকে জানবো এই কাজের ব্যাপারে আমি একজন শ্রেষ্ঠ পারদর্শি, এই কাজে আমার মত কেউ দক্ষ ও কুশলী নয়, তখন কিন্তু আমার এই দ্রোহের ভাব থাকবে না। তার জন্য আমাকে আগে কি করতে হবে? যে কোন একটা ক্ষেত্রে আমাকে শ্রেষ্ঠত্ব পাওয়ার ক্ষমতা অর্জন করতে হবে। যতক্ষণ আমার একটা বিশেষ কোন ক্ষমতা অর্জন না করছি ততক্ষণ শাস্ত্রাদির কথা ধারণা করা খুব কঠিন। সেইজন্য সব সময় নিজেকে নিয়ে বিচার করতে হয়। তাই বলে নিজের দোষ, দুর্বলতার কথা কাউকে বলতে নেই। মল-মূত্র সবাই বিসর্জন করে কিন্তু কক্ষণ ওইদিকে তাকাতে নেই। নিজের দিনলিপিতে কখনই নিজের দোষের কথা লিখতে নেই, লিখেতে হয় সেটাই আজকে আমার কোন গুণটা প্রকাশ করতে পেরেছি, কোন কাজে আমার শক্তি দেখা গেছে। নিজের গুণ আর শক্তিকে আধার করে জীবনে এগোতে পারলে এই জিনিষগুলো ধারণা করতে পারা যায়। ভাগবতের রাসলীলা অত্যন্ত উচ্চমানের একটি তত্ত্বকে আমাদের সামনে নিয়ে আসছে। আমাদের মত মানুষের পক্ষে একবার দুবার পড়ে রাসলীলার অন্তর্নিহিত ভাবকে ধারণা করা একেবারেই অসম্ভব। স্বামীজী তাই রাসলীলার এই তত্ত্বগুলোকে নিয়ে কখন আলোচনা করতেন না। কারণ তিনি মনে করতেন, আমাদের দেশে এই জিনিষগুলোকে নিয়ে এত বেশী মাতামাতি করা হয়েছে যে যার ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে পৌরুষত্বের বদলে মেয়েলী ভাব ঢুকে গেছে। কিন্তু এক আধবার যখন স্বামীজী এগুলোর উপর আলোচনা করেছেন তখন দেখা যেত গভীর ভাবরাজ্যে তিনি হারিয়ে যেতেন। স্বামীজী কখন নিজের ভাবকে বাইরে প্রকাশ হতে দিতেন না। কিন্তু কদাচিৎ তিনি কখন সখন শ্রীকৃষ্ণের নামে কিছু বলতে গিয়ে বলে ফেলছেন –শ্রীকৃষ্ণের দিব্য ঠোঁটের চুম্বন আমি যদি পেতাম। ঠাকুর যখন শ্রীকৃষ্ণ ও গোপীদের নিয়ে কিছু বলতেন তখন তিনি সম্পূর্ণ গোপীদের ভাবরাজ্যে হারিয়ে যেতেন।

এখানে ব্যাপারটা হচ্ছে একজনের ভেতরে প্রচুর কামভাব রয়েছে, সেই এই কামভাব থেকে বেরিয়ে কীভাবে এই কামভাবকেই অবলম্বন করে এগোবে। এই ভাবটাই ব্যাসদেব গোপী আর শ্রীকৃষ্ণের উপর রেখে দিলেন। আমরা দেখলাম শ্রীকৃষ্ণের বাঁশির আরোহ অবরোহের তান শুনে গোপীরা অন্ধকারে শ্রীকৃষ্ণের কাছে দৌড়ে এসেছেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দুর্বার আকর্ষণ থাকা সত্ত্বে যে গোপীরা কোন কারণে রাসলীলায় অংশ নিতে পারেননি, তাঁরা ঘরের মধ্যেই শ্রীকৃষ্ণের ভাবে তন্ময় হয়ে গেছেন আর তাঁদের সূক্ষ্ম শরীরটা বেরিয়ে এসেছে। তাঁরাও ঠিক একই ভাবে রমণ করছেন। এখন বেশীর ভাগ গোপীরা স্থূল শরীরেই আছেন, অল্প কয়েকজন সূক্ষ্ম শরীরে আছেন। সূক্ষ্ম শরীরেও তাঁরা একই দৃশ্য দেখছেন আর একই ভাবে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে রমণ করছেন।

গোপীদের এই ব্যাকুলতা দেখে এখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের সাথে মজা করে বলছেন 'তোমরা এই অন্ধকারে কীভাবে চলে এসেছ? বন্য পশুরা এখন তাদের আহারের সন্ধানে বেরিয়ে পড়েছে, বাড়ির লোকেরা তোমাদের খোঁজ করতে শুরু করে দিয়েছে। আর নিজের স্বামী, পুত্র, পরিজনদের সেবা করা স্ত্রী বা নারীর পরম ধর্ম। তাই তোমরা এবার বাড়ি ফিরে যাও'। এই ধরণের রচনাতে কিছুটা বাস্তবিক জগৎ থেকে নেওয়া হয় আর কিছুটা ভাবরাজ্য থেকে নেওয়া হয়। সেইজন্য এগুলোর যদিও অনেক রকম ব্যাখ্যা দেওয়া যায় কিন্তু তা সত্ত্বেও আমাদের বেশী ব্যাখ্যাতে যাওয়া উচিৎ নয়। কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে দেখা যাবে বাস্তব জগৎকে আমরা ভাব জগতে নামিয়ে আনছি আবার ভাব জগৎকে বাস্তব জগৎ রূপে ব্যাখ্যা করে দিচ্ছি। তারপর যাঁর যেমন পাণ্ডিত্য আছে তিনি সেইভাবে ব্যাখ্যা দিয়ে যাবেন।

রাসলীলার মূল ব্যাপার হল ঈশ্বরীয় প্রেম কী রকম হতে পারে, আর ঈশ্বরীয় প্রেম ভক্তকে পরাভক্তির কোন পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারে দেখানো। কিন্তু গোপীদের প্রেম তো পূর্ণ, এখানে শুধু একটু বাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। আগুনের উপর যেমন লবণ ছিটিয়ে দিলে আগুনের শিখা বড় হয়ে বেরিয়ে আসে। দুধ যদি উথলে না ওঠে মনে হবে সেই দুধ এখনও ঠিক ঠিক জাল দেওয়া হয়নি। আপনার ভাব যদি বেরিয়েই না আসে তাহলে আমরা বুঝবো কী করে! ঠাকুরও বলছেন 'এখানে হেউঢেউ ব্যাপার'। নিমন্ত্রণ বাড়িতে গিয়ে কেউ পেট ভরে খায়, কেউ কম খায়। কিন্তু ঠাকুরের কাছে হেউঢেউ ব্যাপার। আধ্যাত্মিক ভাবের ক্ষেত্রে ঠিক তাই। শ্রীকৃষ্ণ একটু কিছু মিষ্টি করে বলছেন তাতেই গোপীদের ভালোবাসা উথলে পড়ছে।

শ্রীকৃষ্ণের কাছে গোপীদের আর্তি

যাই হোক এখানে ভগবান গোবিন্দের এই মর্মভেদী অপ্রিয় কথা শুনে গোপীদের কি অবস্থা হল ব্যাসদেব খুব সুন্দর কাব্যিক বর্ণনা দিচ্ছেন। শুকদেব বলছেন 'শ্রীকৃষ্ণের এই মর্ম বিদীর্ণ অপ্রিয় বাক্য শুনে গোপীদের বিষাদের আর সীমা পরিসীমা রইল না। দুঃখ আর হতাশায় গোপীদের নিঃশ্বাস এত উষ্ণ হয়ে গেছে যে তাঁদের ওষ্ঠদ্বয় শুষ্ক হয়ে গেছে। কাজল মিশ্রিত অশ্রুজল বিগলিত ধারায় অঝোরে ঝরে পড়ছে যে তাঁদের গালে কালো দাগ হয়ে গেছে। পায়ের নখ দিয়ে মাটিতে আঁচড় কাটছেন। কণ্ঠ দিয়ে স্বর বেরোচ্ছে না। এত কষ্ট করে যাঁর জন্য সব কিছু ছেড়ে ছুটে এসেছি তিনিই আমাদের উপেক্ষা করে এই ধরণের অপ্রিয় বাক্য বলে আমাদের ফিরে যেতে বলছেন! এভাবে কিছুক্ষণ বিমূঢ় হয়ে থাকার পর গোপীরা ভগবান গোবিন্দকে বলছেন ***মৈবং বিভোঽর্হতি ভবান্ গদিতুং নৃশংসং সন্ত্যজ্য সর্ববিষয়াংস্তব পাদমূলম্। ভক্তা ভজস্ব দুরবগ্রহ মা ত্যজাস্মান্ দেবো যথাঽঽদিপুরুষো ভজতে মুমুক্ষূন্।*** ।১০/২৯/৩১। 'হে বিভু! তোমার এই কথাগুলো অত্যন্ত হৃদয়বিদারক। তুমি সর্বব্যাপী, সব কিছুতে তুমিই ব্যপ্ত হয়ে আছ, তুমি নিখিলজীবের অন্তর্যামী ভগবান। জগতে এমন কোন জায়গা নেই যেখানে তুমি বিদ্যমান নও'।

ভগবান সূক্ষ্ম থেকেও সূক্ষ্মে আছেন। আত্মতত্ত্ব এত সূক্ষ্ম যে আমরা কল্পনাই করতে পারবো না। বলা হয় এই সৃষ্টি পঞ্চভূত দিয়ে তৈরী। সব থেকে স্থূল হল পৃথিবী তত্ত্ব, পৃথিবী তত্ত্বের পেছনে আরেকটু সূক্ষ্ম হল জল তত্ত্ব। জল তত্ত্বের পেছনে আছে অগ্নি, অগ্নির পেছনে আছে বায়ু আর বায়ুর পেছনে আকাশ। আকাশ তত্ত্ব হল সব থেকে সূক্ষ্মতত্ত্ব, আকাশ পার্টিকেলস্ই আরও বড় হতে হতে বিবর্ত হতে থাকে। তাই জগতের যে কোন জিনিষকে যদি আমরা কল্পনা করি সেখানে আকাশ পার্টিকেলস্ থাকবেই। কিন্তু আত্মতত্ত্ব আকাশতত্ত্ব থেকেও সূক্ষ্ম। আকাশের মধ্যেও তিনি বিদ্যমান। তিনি চৈতন্য, চৈতন্যের কোন ভৌতিক রূপ হয় না। ভৌতিক কোন রূপ না হওয়ার জন্য তিনি সর্বত্র বিদ্যমান। সুতরাং চৈতন্য সব কিছুই জানবেন। একটা ইলেক্ট্রন কোন দিকে যাবে বিজ্ঞানীরা ঠিক ভাবে বলতে পারবে না। কিন্তু যিনি চৈতন্য তিনি জানবেন। কারণ চৈতন্যের বাইরে কোন কিছু নেই। এই কথা গোপীরা শ্রীকৃষ্ণকে বলছেন 'হে কৃষ্ণ! তুমি সেই নিখিল জীবের অন্তর্যামী, কারণ তুমি সর্বব্যাপী। তাই আমাদের হৃদয়ের কি ভাব সেটা তুমি ভালো ভাবেই জান। সেইজন্য এমন হৃদয়হীন কঠোর ব্যবহার করা তোমার পক্ষে অনুচিত। জগতের সব রকম সুখ, স্বামী সুখ, পুত্র সুখ, যত রকমের বিষয়ের সুখ আছে সব সুখ ত্যাগ করে, ঘর-বাড়ি ছেড়ে তোমার চরণমূলে শরণ নিতে এসেছি। ভালোবেসে আমরা

তোমাকেই বরণ করেছি। তবু এও জানি যে তোমার ওপর আমাদের কোন দাবীই চলবে না, তুমি সমস্ত সাধনারও দুর্লভ, তুমি স্বতন্ত্র, কোন বাঁধনেই তোমাকে বাঁধা যায় না। তোমার অহেতুক কৃপাই আমাদের একমাত্র ভরসা। যেমন আদিপুরুষ ভগবান তাঁর কৃপা দ্বারা মুমুক্ষুগণকে গ্রহণ করেন তেমনি তুমি আমাদের ছেড়ো না এই প্রার্থনাটা টুকু তুমি রাখ'।

মানুষ দুটো কারণে ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে আসে। মনের আবেগ একটা সীমাকে অতিক্রম করে গেলে, সেটা কোন কিছুর প্রতি আকর্ষণের জন্যই হোক বা কোন দুঃখের কারণেই হোক, তবেই মানুষ নিজের ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে আসে। ওরহান পামুক খুব নামকরা লেখক, ওনার একটা উপন্যাস আছে যার নাম 'The Black Book'। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা, বাইরে বরফ পড়ছে তার মধ্যে উপন্যাসের নায়িকা বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছে। সেখানে লেখক খুব সুন্দর করে লিখছেন – এই দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়াতে যে নিজের বাড়ি ছেড়ে বাইরে যায়, সে নিশ্চয় অত্যন্ত দুঃখী মানুষ। অত্যন্ত দুঃখী না হলে কেউ বাড়ির বাইরে যাবে না। আর অন্য একটা কারণ হতে পারে কোন কিছুর প্রতি তার বিরাট আকর্ষণ আছে। পরে দেখা গেছে মেয়েটির বিরাট এক আকর্ষণ ছিল। নিজের স্বামীকে ছেড়ে বিয়ের আগে ও যাকে ভালোবাসতো তার কাছে চলে গেছে। কোন একটা গভীর এমন আকর্ষণ আছে যে আকর্ষণ মানুষকে ওই পরিস্থিতিতে বাড়ি থেকে টেনে বার করে নিয়ে আসছে। দুঃখের ক্ষেত্রেও এই একই জিনিষ হয়। সেখানে মানুষ সুখের আশায় বেরিয়ে আসে। আমি অমুক জায়গায় চলে গেলে এই দুঃখ থেকে নিস্তার পাবো এই ভাবনাই মানুষকে ঘর থেকে বাইরে নিয়ে আসে। কিন্তু যাই হোক আমরা মেনেই নিচ্ছি এই দুটো আলাদা জিনিষ। এখানে সেইজন্য বলে দিচ্ছেন *সন্ত্যজ্য সর্ববিষয়াংস্তব পাদমূলম্*, জগতে যত রকমের বিষয় সুখ থাকতে পার, শুধু তোমার চরণকমলে আশ্রয় নেব বলে আমরা সব সুখ বিসর্জন দিয়ে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে এসেছি।

নচিকেতাকে যমরাজ বলছেন *যদচ্ছিন্তো ব্রহ্মচর্যং চরন্তি*, যে জিনিষকে পাওয়ার জন্য মানুষ ব্রহ্মচারী হয়ে যায়, তারা বিয়েথা করে না, ঘর-সংসার করে না। পুত্রৈষণা মানুষের মনের একটা প্রবল এষণা, পুত্রৈষণা হল আমার একটি পুত্র হোক। যারা বিয়ে করে না, সারা জীবন অকৃতদার হয়ে থাকল কিন্তু পরে একটা বয়স পেরিয়ে যেতেই ভাইপো, ভাইঝি কিংবা ভাইয়ের নাতি নাতনীর প্রতি তাদের কী মায়া এসে যায় কল্পনা করা যায় না। তাহলে এমন কী সাংঘাতিক জিনিষ থাকতে পারে যাকে পাওয়ার জন্য মানুষ ব্রহ্মচারী হয়ে যায়, বলতে পারে আমি বিয়ে করবো না, সব সুখ ছেড়ে সন্ন্যাসী হয়ে যায়? একটা ভিক্ষুক পর্যন্ত তার ভিক্ষাপাত্রকে ছাড়তে পারে না, এমনই মায়া! বাইরের লোকেরা সন্ন্যাসী দেখলে বলে পেটের দায়ে এরা সন্ন্যাসী হয়েছে। কোন সন্দেহ নেই, পেটের দায় সবারই আছে। কুকুর বেড়ালেরও পেটের দায় আছে আবার প্রাইম মিনিস্টারেরও পেটের দায় আছে। সাধুরাও খাওয়া-দাওয়া করে চোরেরাও খাওয়া-দাওয়া করে, এগুলো কোন ব্যাপার নয়। কিন্তু খাওয়া-দাওয়ার পরেও তো কিছু আছে। নিজের ঘর সংসারে সবারই কিছু না কিছু সুখ আছে। যার একটা সামান্য কুঁড়ে ঘর আছে বা স্টেশনে যে ভিক্ষা করে তারও একটা শোয়ার জায়গা আছে আর তার একটা ভিক্ষাপাত্র আছে তাতে তার আসক্তিও আছে। সেই ভিখারী আসক্তিকে ত্যাগ করতে পারে না। কিন্তু এখানে গোপীরা সব সুখ ত্যাগ করে বেরিয়ে এসেছেন।

বলছেন *ভক্তা ভজস্ব দুরবগ্রহ মা ত্যজাস্মান্ দেবো যথাহহদিপুরুষো ভজতে মুমুক্ষূন্*, গোপীরা শ্রীকৃষ্ণকে বলছেন 'আপনি স্বাধীন, কারণ আপনিই নারায়ণ, আপনি মুমুক্ষু পুরুষদের গ্রহণ করে কৃপা করে থাকেন, আমরাও শুধু আপনাকে পাবো বলে সব কিছু ত্যাগ করে এসেছি, তাই আপনি আমাদের কৃপা করুন'। গোপীদের মুখ দিয়ে বার বার এই কথাগুলো বলানো হচ্ছে, যদিও গোপীদের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণকে সাক্ষাৎ নারায়ণ রূপে দেখা সম্ভব নয়। কারণ গোপীদের এই বোধ যদি থাকতো যে, শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ ভগবান, তাহলে গোপীদের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কাম ভাব আসতো না। গোপীদের মুখে ব্যাসদেব বসিয়ে দিচ্ছেন যাতে সাধারণ মানুষ গোপীদের মধুরভাবকে অন্যথা না নিয়ে নেয়।

যে স্ত্রী পঁচিশ-তিরিশ বছর নিষ্ঠার সাথে স্বামীর সেবা করেছে সেই স্ত্রী একটা সময় কোন মনোমালিন্য বা অশান্তি হলে বলে আমার তো আর কোথাও যাবার জায়গা নেই। মার্কেট ইকনমিতে বলা হয় সেলার্স মারকেট আর বায়ারস্ মার্কেট। যখন কেউ বিজনেস করতে যাবে আগে তাকে দেখতে হবে এটা সেলার্স মারকেট নাকি বায়ারস্ মার্কেট, লোকে এই আইটেমটা প্রচুর কিনতে চাইছে নাকি প্রচুর বিক্রী করতে চাইছে। যদি বিক্রী করতে চায় তখন বিক্রেতা দাম বাড়িয়ে দেয়, ক্রেতার বাজার যখন তখন অন্য রকম হয়। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে ঠিক তাই হয়। এখানে গোপীদের হয়ে গেছে বায়ারস্ মারকেট কারণ গোপীরা নিজেদের দিচ্ছে, শ্রীকৃষ্ণের কোন আগ্রহ নেই। শ্রীকৃষ্ণ হলেন ক্রেতা। স্টক ক্লিয়ারেন্স করার জন্য বিভিন্ন সময়ে বলে একটা শাড়ী কিনলে দুটো শাড়ী ফ্রী, গোপীদের এখন এই দুরবস্থা হয়ে গেছে। সেইজন্য গোপীরা বলছেন – আপনি তো সেই ঘট ঘট ব্যাপী বিষ্ণু আদিপুরুষ, যেভাবে আপনি মুমুক্ষুদের উপর কৃপা করেন। কারণ মুমুক্ষুরাও আপনাকেই চায় আর আপনিই তো তাদের জ্ঞান দেন, দর্শন দেন। আমরাও তো আপনাকেই চাইছি, আপনিও আমাদের সেই ভাবে কৃপা করুন যেভাবে আপনি মুমুক্ষুদের কৃপা করেন। গোপীরা নিজেদের মুমুক্ষুদের সাথে তুলনা করছেন।

কিন্তু তার আগে জানতে হবে মুমুক্ষু আর গোপীদের মধ্যে এখানে মিল কোথায়? মুমুক্ষুরা সব কিছু ছেড়ে ব্রহ্মচারী হয়ে যায়, *যদচ্ছিন্তো ব্রহ্মচর্যং চরন্তি*, গোপীরাও তাই বলছেন *সন্ত্যজ্য সর্ববিষাংস্তব পাদমূলম্*। মুমুক্ষুরা যেমন আদিপুরুষ নারায়ণের প্রতি সমর্পিত, জগতের কোন কিছুর দিকে তার দৃষ্টি নেই, আমরাও মুমুক্ষুদের মত সব কিছু বিষয় সুখ ছেড়ে এই রাতের অন্ধকারে তোমার পাদমূলে দৌড়ে এসেছি। এর আগে গীতগোবিন্দের আলোচনা করার সময় শ্রীরাধার যে কথা বলা হয়েছিল, সেখানে তখন অন্য গোপীরাও আছেন। কিন্তু সেখানে শ্রীরাধা কাউকে গোপী দেখছেন না, কৃষ্ণই দেখছেন সবাইকে। ফলে শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন চুম্বন করতে শ্রীরাধার কোন সমস্যা হয়নি। আমরা যখন প্রেম করি তখন আমরা সামনের নারী বা পুরুষকেই শুধু জানছি বাকিদের আলাদা দেখছি। আজকাল তো রাস্তাঘাটে, পার্কে যুবক-যুবতীরা দিবালোকে প্রকাশ্যে নির্লজ্জের মত প্রেম নিবেদন করে চলছে। কিন্তু শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন আর ইদানিং কালের যুবক-যুবতীদের আলিঙ্গনের মধ্যে বিরাট তফাৎ আছে। সব থেকে বড় তফাৎ হল, এরা সচেতন ভাবে নির্লজ্জ, এরা জানে আমার আশেপাশে লোকজন আছে, পাহারাদার আছে, পুলিশ আছে কিন্তু ওরই মধ্যে খুব সতর্ক ভাবে একটা মুহুর্ত বার করে চুম্বন করে নেবে। ভালোমতই জানে ধরা পড়লে সমস্যা হয়ে যাবে। শ্রীরাধার মধ্যে এই নির্লজ্জের ভাবটাই নেই, ভয়ও নেই, কারণ তিনি কাউকেই তো দেখতে পাচ্ছেন না। গোপীদেরও শ্রীরাধা কৃষ্ণ দেখছেন, গাছপালাকেও কৃষ্ণ দেখছেন আবার শ্রীকৃষ্ণকেও কৃষ্ণ দেখছেন। সেইজন্য আলিঙ্গন করতে তার কোন লজ্জা বোধ আসছে না। এটাই ভক্তির পরাকাষ্ঠা। জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা হয় তখনই যখন সাধকের সব বিষয় খসে পড়ে যায়। জ্ঞানী নেতি নেতি করে সব কিছু এমন কি নিজের দেহ যে এত প্রিয় সেটাকেও ত্যাগ করে দিয়ে পরমাত্মাকে পাওয়ার জন্য এগিয়ে যায়। কিন্তু ইতি ইতিতে সব কিছুকে ঈশ্বর রূপেই গ্রহণ করা হয়। গোপীরা এখানে নেতি নেতির কথা বলছেন, কিন্তু একটু পরেই ইতি ইতি করবেন।

রাসলীলার অনুধ্যানের সময় আমাদের একটা ব্যাপার মাথায় রাখতে হবে। পুরাণের উদ্দেশ্য হল বেদের বক্তব্যকে ব্যাখ্যা করা। সৌন্দর্যের বা অন্য কিছুর ব্যাখ্যা করা পুরাণের কাজ নয়। জয়দেবের গীতগোবিন্দ যদিও শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার লীলা আধারিত, কিন্তু ভারতের আধ্যাত্মিক সাম্রাজ্যে গীতগোবিন্দের সেই স্থান নেই যে স্থান ভাগবতের রাসলীলা পেয়েছে। ভাগবতের রাসলীলাতে সাধারণ জাগতিক ব্যাপারগুলোও নিয়ে আসা হয়েছে কিন্তু সেটাকেও আধ্যাত্মিকতার দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। রাসলীলাতে গোপীদের প্রারম্ভিক অভিব্যক্তিকে মনে হবে যেন জার প্রেম, নিজের স্বামীকে ছেড়ে অন্য পুরুষের আকর্ষণে ছুটে এসেছে। কিন্তু সেই জারপ্রেমকে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আধ্যাত্মিকতার দিকে।

এখানে গোপীরা কি বলছেন? *সন্ত্যজ্য সর্ববিষয়াংস্তব পাদমূলম্*, সব কিছু, সমস্ত বিষয় পরিত্যাগ করে আমরা আপনার চরণমূলে আশ্রয় নিয়েছি। জগতে বিষয় ছাড়া তো কিছু নেই। আমাদের মন যেটাকে চিন্তা

করতে পারবে সেটাই বিষয়। এমনকি ভগবানকেও যদি মানুষ রূপে চিন্তন করে, সেটাও বিষয়। ভগবানই বুদ্ধির বিষয় হয়ে যাচ্ছেন। ভগবান কিন্তু বিষয় নন, বুদ্ধির বাইরে ভগবানের যে ব্যাপার সেটাই আসল, সেখানে আবার তাঁকে বিষয় করা যায় না। কিন্তু আমরা যেভাবে ভগবানকে চিন্তা করি সেটাও বিষয়। অন্য দিকে স্ত্রী, পুত্র, স্বামী, টাকা-পয়সা, বাড়ি সবটাই বিষয়। গোপীরা বলছেন আমরা সব বিষয় ছেড়ে দিয়ে তোমার পাদমূলে আশ্রয় চাইছি। এই ব্যাপারটা ধারণা করা খুব কঠিন। কারণ সমাজেও আমরা দেখি মেয়ে কখন সব কিছু ফেলে কোন ছেলের কাছে পালিয়ে আসছে। মেয়েটি বলছে আমার আর কোথাও যাবার জায়গা নেই। এই জাগতিক ভালোবাসাতে ইন্দ্রিয়ের একটা খেলা চলে। কিন্তু ইন্দ্রিয়ের খেলার ভালোবাসার সাথে শুদ্ধ ভালোবাসার একটা তফাৎ আছে। সাধন-ভজন, তপস্যা না করা থাকলে এই তফাৎটা বোঝা যাবে না, কোথায় ওটা ইন্দ্রিয়ের ডাক আর কোথায় আত্মার ডাক বোঝা অসম্ভব। যদি আত্মার ডাক হয়ে থাকে তখন ওই ডাককে কখন উপেক্ষা করা যায় না। ইন্দ্রিয়ের ডাক হলে আজকে একজনকে ভালোবাসছে, আগামীকাল তার থেকে ভালো কাউকে দেখলে তার প্রতি ভালোবাসাটা ঘুরে যাবে। ছেলে আর মেয়ে উভয়ের ক্ষেত্রে একই জিনিষ হবে। যেখানেই ইন্দ্রিয়ের খেলা সেখানেই এই জিনিষ চলবে। যেখানে আত্মার আহ্বাণ থাকে সেই ভালোবাসার মাঝখানে কেউ ঢুকতে পারবে না। ঈশ্বর প্রেমিক ভক্ত এটাই চায় আর ভালোবাসার ক্ষেত্রেও এই একই জিনিষ হয়।

গোপীরা বলছেন 'হে কৃষ্ণ! তুমি স্বতন্ত্র, তুমি দুরবগ্রহ অর্থাৎ তুমি যেটা করবে বলে ঠিক কর সেটাই তুমি কর। তোমার এই স্বভাব আমরা তোমার শৈশব থেকেই দেখে এসেছি, আর এত দিনে দেখে নিয়েছি যে তোমার উপর আমাদের কোন কিছুই চলে না'। সমুদ্র মন্থনের সময় ঠিক এই ব্যাপারটাই হয়েছিল। সমুদ্র মন্থনে প্রথমে হলাহল তারপর এক এক করে উচ্চৈঃশ্রবা, ঐরাবত ইত্যাদি বেরিয়ে আসার পর লক্ষ্মীদেবী বেরিয়ে এলেন। লক্ষ্মীদেবী বেরিয়ে এসেছেন। এখন তাঁর একজন পতির আবশ্যক। তিনি বিষ্ণুকে পতি রূপে বরণ করে নিলেন। সেখানে অত দেবতা আর বলশালী অসুররা থাকতে লক্ষ্মীদেবী কেন বিষ্ণুকেই বরণ করলেন? বলছেন লক্ষ্মীদেবীর আবির্ভাবের পর একমাত্র বিষ্ণুই লক্ষ্মীদেবীর ব্যাপারে কোন আগ্রহ দেখাননি। লক্ষ্মীদেবীর ব্যাপারে তিনি সম্পূর্ণ উদাসীন। এটা দেখা যায় মেয়েরা চায় পুরুষ সব সময় তার কথা মত চলুক। কিন্তু এটাও আশ্চর্যের, যে পুরুষ মেয়ের কথা মত চলে সেই পুরুষকে মেয়েররা একেবারেই পছন্দ করবে না। গোপীরা ঠিক এই কথাই বলছেন 'হে পরমপ্রিয় প্রাণবল্লভ! তুমি তো কোন দিন আমাদের কথা মত চললে না, আর চলবেও না। কারণ তুমি এই রকমই'। এগুলো কোন জাগতিক কথা নয়, এটাই বাস্তব। পুরুষের ঠিক ঠিক ব্যক্তিত্ব হল সে নিজের মত চলবে, কারুর কথায় সে ওঠা বসা করবে না। অহঙ্কার তারই হবে যার পেছনে সবাই দৌড়াবে। গোপীরা শ্রীকৃষ্ণের পেছনে দৌড়াচ্ছে। শ্রীকৃষ্ণকেও গোপীরা এই কথাই বলছেন। কিন্তু এখানে ব্যাপারটা অন্য, পুরুষ মাত্রই কোন নারীর কথায় চলবে না, আর তুমি হলে সেই আদিপুরুষ, সুতরাং কারুর কথায় চলার কোন প্রশ্নই নেই।

কিন্তু আদিপুরুষের একটা বৈশিষ্ট্য আছে, তিনি হলেন *ভক্তা ভজস্ব*। গোপীরা তাই বলছেন 'তুমি আদিপুরুষ হতে পার কিন্তু যে তোমার ভক্ত তার প্রতি তো তুমি কৃপা কর। তোমার ভক্তের প্রতি তুমি যেভাবে কৃপা কর ঠিক সেই ভাবে তুমি আমাদের প্রতি কৃপা কর'। এই শ্লোকটা আমাদের মাথায় খুব ভালো করে বসিয়ে না নিলে রাসলীলার পুরো ভাবটা হারিয়ে যাবে। গোপীরা শ্রীকৃষ্ণের কাছে প্রথমে প্রিয়া প্রিয়তমের ভাব নিয়েই এসেছেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের সমস্ত রকমের বৃত্তিকে নিবৃত্ত করে দিচ্ছেন, যদি কোথাও গোপীদের মধ্যে সামান্যতম কাম ভাব, চঞ্চলতার ভাব থেকে থাকে তাই আগেই এই ভাবের বৃত্তিগুলোকে নাশ করে দিচ্ছেন। কীভাবে? *দেবো যথাহহদিপুরুষো ভজতে মুমুক্ষূন্*, মুমুক্ষু পুরুষরা আদিপুরুষ নারায়ণকে সব কিছু ছেড়ে দিয়ে যে ভাবে ভজনা করেন এবং তুমি সেই আদিপুরুষ নারায়ণ মুমুক্ষুদের প্রতি যেমনটি কৃপা করো, ঠিক সেইভাবে তুমিও আমাদের কৃপা কর, কারণ তুমিই সেই আদিপুরুষ। এখানেই বোঝা যাচ্ছে যে গোপীদের এই বোধ আছে যিনি আদিপুরুষ তিনিই শ্রীকৃষ্ণ হয়েছেন। রাসলীলার প্রারম্ভিক পর্যায়েই এই কথা গোপীরা বলছেন। এখানে দেখুন ভাগবত আমাদের কোথায় নিয়ে এনে ফেলছে। রাসলীলা পড়ার সময় বোঝা যায় না কোন জায়গাতে কাম ভাবকে নিয়ে আসছেন আবার কোন জায়গাতে শুদ্ধা ভক্তিকে নিয়ে আসছেন। শ্রীকৃষ্ণের

সাথে গোপীরা কাম ক্রীড়া করতে এসেছেন। কিন্তু এখানে বলছেন, তুমি আমাদের সেই ভাবেই গ্রহণ কর, যেভাবে আদিপুরুষ নারায়ণ মুমুক্ষদের গ্রহণ করেন।

এই মুমুক্ষুদের বৈশিষ্ট্য কী? তাঁরা জগতের সব কিছু ত্যাগ করে দিচ্ছেন। জগতের কোন কিছুর প্রতি তাঁদের লেশ মাত্র আসক্তি নেই। ঠাকুর বলছেন, ছুঁচে সুতো ঢোকানোর সময় সুতোয় একটু যদি আঁশ থাকে ছুঁচে সুতো ঢুকবে না। গোপীরা এটাই বলছেন আমরা সমস্ত বিষয় ত্যাগ করে এসেছি আপনিও আমাদের সেইভাবে গ্রহণ করুন যেভাবে আদিপুরুষ নারায়ণ মুমুক্ষুদের কৃপা করেন। আর শুধু তাই না, আমরা জানি এই সব নিয়ম আপনার ক্ষেত্রে খাটে না, আমরা ত্যাগ করেছি বলেই যে আপনি আমাদের গ্রহণ করবেন তা কখন হয় না। ঠাকুর গল্প করছেন, নারদ একদিন বৈকুণ্ঠ ধামে যাচ্ছিলেন সেই সময় একজন যোগী বিরাট তপস্যা করছিলেন, তিনি নারদকে বলছেন 'আপনি তো ভগবানের কাছে যাচ্ছেন, একবার তাঁকে জিজ্ঞেস করবেন আমার কত দিন লাগবে মুক্তি পেতে'। তার পাশেই আরেকজন সাধু গাছের তলায় তপস্যা করছিল সেও নারদকে বলছে 'আমারটাও ভগবানকে জিজ্ঞেস করবেন কবে আমার ঈশ্বর দর্শন হবে'। ফিরে এসে নারদ প্রথম জনকে বলছেন 'তোমার দশ জন্ম লাগবে'। যোগী শুনে বলছে 'হে ভগবান! আরও দশ জন্ম!' আর দ্বিতীয় জনকে বলছেন 'এই তেঁতুল গাছে যত পাতা আছে তোমার তত জন্ম লাগবে'। শুনে সে তো আনন্দে নৃত্য করতে শুরু করে দিয়েছে। 'আমারও তাহলে মুক্তি হবে!' তখন ভগবান সঙ্গে সঙ্গে তাকে দিব্য দর্শন দিয়ে দিলেন। এখানে ভগবানের নিয়ম কোথায় গেল! ভগবানের কাছে কোন নিয়ম থাকে না, তিনি নিয়মের বাইরে। কারণ যত নিয়ম কানুন সব দেশ, কাল ও নিমিত্তের মধ্যেই চলে।

মায়াকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে স্বামীজী এই কথা বার বার বলছেন Maya is the line diffentiating the absolute and the world, এই লাইনটাকে বলছেন দেশ, কাল ও নিমিত্ত। যেখান নিমিত্ত এসে যায় সেখানে কার্য কারণ সম্পর্কও এসে যাবে, এটা করলে সেটা হবে, সেটা করলে এটা হবে। নিউটনের ল কোথায় কাজ করবে? যেখানে কার্য কারণ সম্পর্ক আছে। দেশ, কাল ও নিমিত্ত কোথায়? যেখানে সৃষ্টি আছে, যেখানে মায়ার লাইনটা টেনে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু মায়ার রেখার অন্য দিকে দেশ, কাল ও নিমিত্তের কোন নিয়ম খাটবে না। মূল কথা হল, যেখান থেকে প্রকৃতির এলাকা শুরু হয়ে গেল সেখান থেকে আমরা দেশ, কাল সব কিছুকে মাপতে পারবো, কার্য ও কারণকে ব্যাখ্যা করতে পারবো। কিন্তু ভগবানকে কখনই মাপা যাবে না আর ব্যাখ্যাও করা যাবে না। কিন্তু তিনি যখন অবতার হয়ে আসেন তখন তিনিও প্রকৃতির এই নিয়মে বাঁধা পড়ে যান। সেইজন্য ঠাকুর বলছেন অবতারও শক্তির অণ্ডারে। অবতারকেও শক্তির নিয়ম মানতে হবে, প্রকৃতির নিয়মে তাঁকে চলতে হবে। আমরা যদি ঠাকুরকে বলি 'আপনি তো ভগবান, আপনি ভগবানের বিশ্বরূপটা দেখিয়ে দিন তো'। ঠাকুর কখনই দেখাতে পারবেন না। কারণ ঠাকুর প্রকৃতির নিয়মে বাধিত হয়ে যাচ্ছেন। তাহলে শ্রীকৃষ্ণ কি করে অর্জুনকে বিশ্বরূপ দেখালেন? না শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বিশ্বরূপ দেখাননি, তিনি অর্জুনকে বললেন 'এসো! তোমাকে দিব্য চক্ষু দিয়ে দিচ্ছি সেই দিব্য চক্ষু দিয়ে তুমি ভগবানের বিশ্বরূপ দেখে নাও'। দিব্য চক্ষু দেওয়া মানে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের সামনে তাঁর সূক্ষ্ম জগৎটা খুলে দিলেন। তাই ভগবানের যা কিছু তার সব কিছু প্রকৃতির রেখার ওপারে। প্রকৃতি মানে, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, পৃথিবী ও জল এদের মধ্যে দেশ কাল ও কার্য কারণ সম্পর্কের খেলা চলবে। শুধু এই পাঁচটা তত্ত্বেই নয়, এদের পেছনে যে মহৎ তত্ত্ব রয়েছে সেখানেও চলবে, মহতের পেছন যে তিনটে গুণ রয়েছে সেখানেও চলবে। এরপর আর কোন নিয়ম চলবে না। কিন্তু যিনি শুদ্ধ চৈতন্য তিনি তো সব কিছুতেই বিদ্যমান। চৈতন্যের ওই জায়গাতেও প্রকৃতির কোন কিছু খাটবে না। তাই তিনি চাইলে হাজার জন্ম পাল্টে এক জন্মে করে দিতে পারেন। আবার নাও পাল্টাতে পারেন। দেবতারা ভগবানের কাছে গিয়ে প্রার্থনা করছেন, তিনি কখন তাঁদের প্রার্থনা শুনছেন কখন শুনছেন না, কখন বলছেন তোমরা তপস্যা কর, কখন বলছেন তোমরা এটা কর, সেটা কর। অসুরদের ক্ষেত্রেও তিনি একই জিনিষ করছেন। সেইজন্য আমরা ভগবানের ব্যাপারে কিছুই জানি না।

অন্য দিকে আরেকটা সমস্যা হয়ে যায়, ভগবান মাঝে মাঝেই জগতে সব কিছুর ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য হস্তক্ষেপ করেন বলে আমরা কখনই বলতে পারবো না যে মায়ার রাজ্যে এটা থেকে সেটা হয়। একদিকে

মায়ার রাজ্যে এটা থেকে এটা হয় অন্য দিকে নিশ্চিত করা বলা যাবে না যে এটা থেকে এটাই হবে। এখানে শ্রীকৃষ্ণকে বলা হচ্ছে দুরবগ্রহ, গোপীরা বলছেন তুমি তো কারুর কথা মানবে না। আমরা যে অর্থে কাউকে অহঙ্কারী, জেদী বলে থাকি সেই অর্থে গোপীরা ভগবানকে দুরবগ্রহ বলছেন না। তিনি সব কিছুর পারে, শ্রীকৃষ্ণ তিনটে গুণের পারে ত্রিগুণাতীত। সেইজন্য প্রার্থনা করলেই যে তিনি শুনবেন তার কোন নিশ্চয়তা নেই। কিন্তু সাধারণ ক্ষেত্রে দেখা যায় যাঁরা সর্ববিষয় ত্যাগ করে ঈশ্বরে পূর্ণ সমর্পিত হওয়ার জন্য যদি প্রার্থনা করেন তিনি শুনবেনই শুনবেন। কারণ এটা তো কোন বৈষয়িক প্রার্থনা নয়। আপনি বলতে পারেন, গোপীদের তো কাম ভাব ছিল। কিন্তু ভাগবতের রাসলীলাতে কাম আর ভক্তি দুটোর মধ্যে বাচ খেলা চলছে বলে শুধু কাম ভাব বলে দিলেই হয়ে যাবে না। আমরা এখানে ভক্তির দৃষ্টি নিয়েই চলছি। খ্রীশ্চানদের মধ্যেও আছে যেখানে বলা হয় Dark night of the Soul। যাঁরা প্রচুর তপস্যা করে সাধনা করে একটা কিছু দিব্য দর্শন পাওয়ার পর মনে হয় তাঁর ইষ্ট দেবতা যেন তাঁকে ছেড়ে দিয়ে চলে গেছেন। তারপরেই কিছু দিন পর দেখা যায় ভক্তির তোড় যেন বন্যার মত প্রবাহিত হচ্ছে। গোপীদের রাসলীলাও অনেকটা সেই রকম। গোপীরাও মনে করছেন শ্রীকৃষ্ণ যেন তাঁদের ছেড়ে দিয়েছেন। ছাড়ছেন ঠিকই, কিন্তু তারপরেই তিনি তাঁদের পূর্ণ রূপে গ্রহণ করবেন।

গোপীরা শ্রীকৃষ্ণকে কেন ধর্মজ্ঞ বলছেন?

গোপীরা শ্রীকৃষ্ণকে বলছেন ***যৎপত্যপত্যসুহৃদামনুবৃত্তিরঙ্গ স্ত্রীণাং স্বধর্ম ইতি ধর্মবিদা ত্বয়োক্তম্। অস্ত্বেবমেতদুপদেশপদে ত্বয়ীশে প্রেষ্ঠো ভবাংস্তনুভৃতাং কিল বন্ধুরাত্মা।।১০/২৯/৩২।।*** ‘হে প্রিয়তম শ্যামসুন্দর! তুমি যে বলছ নিজের স্বামী, পুত্র, ভাই, ভ্রাতা, বন্ধু এদের সেবা করাই আমাদের পরম ধর্ম ও আদর্শ, তোমার এই কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। তুমিই তো ধর্মের রহস্য জান। কারণ তোমার থেকেই তো ধর্ম বেরিয়েছে। সেইজন্য এটা কখনই বলা যাবে না যে তুমি ধর্ম জানো না’। এখানে শ্রীকৃষ্ণকে গোপীরা বলছেন ধর্মজ্ঞ। মহাভারতে যেখানে যুধিষ্ঠিরকে ধর্মরাজ নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে সেখানেও অনেক ধর্ম সঙ্কট মুহূর্তে শ্রীকৃষ্ণ এসে বিধান দিচ্ছেন। শ্রীকৃষ্ণই ঠিক ঠিক ধর্মজ্ঞ, ধর্ম সঙ্কট বলে তাঁর কাছে কিছু ছিল না। শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রের এটি একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ দিক। শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র সম্বন্ধে আমাদের সবার একটা ভাসা ভাসা ধারণা। সেই রকম গভীর ভাবে আমরা কখনই শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র নিয়ে অনুধ্যান করি না। শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে গোপীদের সাথে লীলা করেছেন, কংসকে বধ করেছেন আর কুরুক্ষেত্রে অর্জুনের সারথি হয়ে পরামর্শ দিয়েছেন। এটুকুতেই শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র শেষ হয়ে যায় না। তিনি ছিলেন ধর্মজ্ঞ, ধর্ম সঙ্কট বলে তাঁর কিছুই ছিল না, সর্বদা তিনি ধর্মে প্রতিষ্ঠিত। তিনি জানেন কোনটা ঠিক, কোনটা ঠিক নয়। কিংকর্তব্যবিমূঢ়, কোনটা করা ঠিক, কোনটা করা ঠিক নয় এই সংশয় তাঁর কখনই ছিল না। কারণ তিনি ছিলেন ধর্মজ্ঞাতা।

আমাদের ঐতিহ্যে অনেক নীতিশাস্ত্র আগে থেকেই আছে। যুধিষ্ঠিরের সময়েও অনেক নীতিশাস্ত্র ছিল। এখানে এই ধর্মবিদা, অর্থাৎ ধর্মজ্ঞ এই কথাটা খুব ভালো করে বোঝার দরকার আছে। উপনিষদের শেষ কথা ব্রহ্মই আছেন, গীতার শেষ কথা ঈশ্বর ছাড়া কিছু নেই। কিন্তু যখন জাগতিক স্তরে আমরা বিচরণ করছি তখন অনেক কিছুই দেখছি আর সব আলাদা আলাদা দেখছি, আবার এক অপরকে contradict করে। যেমন আমার মধ্যে ভালোবাসা আছে, কিন্তু স্বধর্ম অন্য দিকে নিয়ে যায়। এই যে দ্বন্দ্ব, জীবন মানেই দ্বন্দ্ব, দ্বন্দ্বের নিষ্পত্তি একমাত্র চিতায় উঠে হয়। কারুর জীবনে দ্বন্দ্ব যদি না থাকে তাহলে সে তো একটা জড় পদার্থ। জীবনের প্রত্যেক পরিস্থিতিতে বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন রকমের দ্বন্দ্ব আসবে। কিন্তু এই দ্বন্দ্বের একটা সমাধান বার করে সবাইকে লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। মহাভারত আর রামায়ণ প্রত্যেক পদে পদে জীবনের দ্বন্দ্বকে দেখাচ্ছেন, এটা করবো কি করবো না, কোনটা ঠিক কোনটা ঠিক নয়। দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে আবার তার মধ্য থেকে একটা সমাধানের রাস্থা বের করে বেরিয়ে এসে এগিয়ে যাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে কী করলে ঠিক হবে, কোনটা করবো না এগুলো আমরা কীভাবে ঠিক করব? কী করে দ্বন্দ্ব থেকে বেরিয়ে আসব? এখানেই নীতিশাস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা। নীতিশাস্ত্র দিয়েই ঠিক হয় কোন কাজ করতে হবে, কোন কাজটা করা ঠিক হবে না। খুব নামকরা নীতিশাস্ত্র হল বিদুর নীতি। বিদুর নীতি, চাণক্য নীতি এই নীতিশাস্ত্র গুলি অনেক পরের দিকে রচিত হয়েছে। কিন্তু প্রাচীন কালে মুনি-ঋষিদের সময় থেকে এই ধরণের অনেক নীতিশাস্ত্র চলে আসছিল। যিনি এই

শাস্ত্রগুলোকে খুব মনযোগ দিয়ে অধ্যয়ন করেছেন, অধ্যয়ন করার পর নিজে অবধারণা করেছেন তিনি জানেন বিষম পরিস্থতিতে, যেখানে এটাও করা যেতে পারে ওটাও করা যেতে পারে, সেখানে কোনটা করলে ঠিক হবে। যেমন শ্রীরামচন্দ্র রাবণ সীতাকে অপহরণ করে নেওয়ার পর চোখের জল ফেলছেন আবার অযোধ্যার প্রজারা যখন বলতে শুরু করল লঙ্কায় সীতা রাবণের গৃহে রাত কাটিয়েছে তাকে কী করে রাজরানী করে রেখেছেন, তখন আবার তিনি সীতাকে বনবাসে পাঠিয়ে দিচ্ছেন। এটাই দ্বন্দ্ব, একদিকে সীতার প্রতি শ্রীরামচন্দ্রের ভালোবাসা আবার অন্য দিকে প্রজার প্রতি রাজার কর্তব্য, এই দুটো পরিস্থিতি দ্বন্দ্ব তৈরী করে দিচ্ছে। কোনটা করবেন? যেটাই করবেন সেটাতেই নিন্দা হবে। প্রজাদের অগ্রাহ্য করে সীতাকে রেখে দিলে সবাই বলতো শ্রীরামচন্দ্র একজন কামুক পুরুষ। সমালোচনা করতে কেউ ছাড়বে না। বিষম পরিস্থিতিতে মানুষ তাঁর কাছে সমাধান খুঁজতে যায় যিনি এই নীতিশাস্ত্রগুলো খুব ভালো করে জানেন। তখনকার দিনে যুধিষ্ঠির যত রকম নীতিশাস্ত্র ছিল তার পণ্ডিত ছিলেন। মজার ব্যাপার হল মানুষ ততক্ষণ কোন একজনকে সম্মান দেবে না যতক্ষণ না তিনি ধর্ম জানেন। ঠাকুর বলছেন গ্রামে বড় বড় মোচওয়ালা পালোয়ান থাকতে ঝগড়া-বিবাদ মেটাবার সময় বিশ ক্রোশ দূর থেকে পাল্কী করে রোগা-প্যাটকা ব্রাহ্মণকে ডেকে নিয়ে আসে। গোপীরা শ্রীকৃষ্ণকে বলছেন আপনি ধর্ম জানেন, আপনি ধর্মবিদা। দ্রৌপদীর সাথে যখন পাঁচ ভাইয়ের বিয়ের কথা উঠেছে তখন অনেকে আপত্তি করে বলছেন এটা কী করে ধর্ম হয়, পাঁচ ভাই মিলে একটি মেয়েকে বিয়ে করবে! যুধিষ্ঠির তখনই নীতিশাস্ত্রে পণ্ডিত হয়ে গেছেন। সবাই তাঁকে বলছেন আপনি হলেন ধর্মরাজ, আপনি কী করে এই অধর্ম করছেন? তখন যুধিষ্ঠির একটাই কথা বলছেন – আমার মুখ থেকে কখন অধর্মের কথা বেরোয় না, আর এই কাজের জন্য আমার মনে কোন বিভ্রান্তি ও গ্লানি আসছে না, সেইজন্য এই বিয়ে ধর্ম সম্মত। যুধিষ্ঠির এখানে নীতিতে যাচ্ছেন না, অবশ্য এর আগে তিনি পরম্পরা থেকে দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে বলছেন এর আগে আগে প্রচেতারা সাতজন মিলে একটি মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন। কিন্তু যুধিষ্ঠিরের অকাট্য যুক্তি হল, এই ব্যাপারে আমার মনে কোন দ্বন্দ্ব আসছে না।

ঠিক একই জিনিষ আমরা বাল্মীকি রামায়ণেও পাই, যেখানে হনুমান সীতার খোঁজে লঙ্কায় প্রবেশ করেছেন। সীতার খোঁজ করার জন্য হনুমান মাঝ রাতে রাবণের রাজমহলে ঢুকে পড়েছেন। সেখানে রাবণের স্ত্রীরা সবাই নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে। বাল্মীকি তাঁর স্বভাব সিদ্ধ কবিত্ব দিয়ে রাবণের স্ত্রীদের সব দুর্ধর্শ বর্ণনা দিয়ে যাচ্ছেন। মেয়েগুলো ঘুমের মধ্যে অশালীন অবস্থায় পড়ে আছে। বাল্মীকি বর্ণনা করছেন, কারুর কাপড় কোন দিকে সরে গেছে, কারুর শরীরের বস্ত্র স্খলিত হয়ে আছে, রাবণকে না পেয়ে এক অপরকে জড়িয়ে শুয়ে আছে, সাথে সাথে তাদের সবার রূপের অসাধারণ বর্ণনা। এই দৃশ্য দেখে হনুমানের মনে হঠাৎ এক দুশ্চিন্তা উদয় হল। একে পরস্ত্রী, তার উপর আবার নিদ্রায় অবশ হয়ে পড়ে আছে, এদের সবারই বস্ত্র বিভিন্ন ভাবে স্খলিত হয়ে আছে। এই অবস্থায় নারী দর্শন অত্যন্ত অন্যায় কর্ম। হনুমানের অনুশোচনা জেগে গেল, আমি ব্রহ্মচারী হয়ে এ কী করলাম! তারপরেই হনুমান বলছেন – আমি কেন অনুশোচনা করতে যাব! এদের দেখে তো আমার মনে কোন বিকার আসেনি, তাই আমি অধর্ম কিছু করিনি। আসলে শেষে এটাই মাপকাঠি হয়ে দাঁড়ায়, ধর্মের পরিভাষা একটাই। আমরা যা কিছু অধ্যয়ন করেছি, বড়দের কাছে যা কিছু শুনেছি, এগুলো সব মিলিয়ে যখন কোন পরিস্থিতিতে আমাদের মন খুঁত খুঁত করে তখন সেটাই অধর্ম। ঠাকুরও পাপের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলছেন যেটা করলে মন খুঁত খুঁত করে সেটাই পাপ কাজ, সেটাই অধর্ম। যদি খুঁত খুঁত না করে তাহলে সেটাই ধর্ম।

অন্য দিকে ধর্ম পুরোপুরি ব্যক্তিকেন্দ্রিক, ধর্ম কখনই সার্বজনীন হতে পারে না। মূল্যবোধ, ধর্ম ইত্যাদির উপর বড় বড় বক্তারা ভাষণ দিতে গিয়ে বলেন আমাদের সত্যে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। কিন্তু সত্যে কেউই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। বিশেষ পরিস্থিতিতে এক সময় সে বাধ্য হবে সত্য থেকে সরে আসতে। আমরা বলি ঠাকুর সত্যে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি ছিলেন অবতার, অবতারের উপর সব নিয়ম খাটে না। ঠাকুর কলকাতায় যাবেন ঠিক হয়ে আছে, নির্দিষ্ট সময় গাড়ীও এসে গেছে। সেই সময় দক্ষিণেশ্বরে নরেন এসে উপস্থিত হয়েছে। ঠাকুর বলছেন 'নরেন এসেছে, আর কি কলকাতায় যাওয়া যায়'? রামলাল দাদা বলছেন

'আপনার আর গিয়ে কাজ নেই'। ঠাকুরেরও মনটা খুঁত খুঁত করছে, নরেন এসে পড়েছে, নরেনকে ছেড়ে যাওয়া যাবে না। আবার বলে রেখেছেন যেতে হবে। এখন কেউ যদি অন্য কিছু বলে দেয় তাহলে সেটাই শুনতে হবে। সেইজন্য রামলাল দাদাকে জিজ্ঞেস করাতে রামলাল দাদা যখন বললেন 'আপনার আর গিয়ে কাজ নেই'। তখন ঠিক আছে। আমাদের সবারই বিশেষ একটা ক্ষেত্র আছে যেখানে এই নিয়ম চলে না। আপনি আপনার ছেলের ভালোর জন্য দশটা মিথ্যে কথা বলে দিলে কোন মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায় না। যে যাকে ভালোবাসে তার জন্য সে যদি দশটা মিথ্যে কথা না বলতে পারেন তাহলে বুঝতে হবে তার কিছু গোলমাল আছে। তাহলে কোনটা ঠিক? ভালোবাসাটা ঠিক নাকি সত্য কথা বলাটা ঠিক? কোনটাই ঠিক নয়। কারণ মূল্যবোধ সব সময় ব্যক্তি কেন্দ্রিক হয়। এখানে গোপীরা যে শ্রীকৃষ্ণকে ধর্মজ্ঞ বলছেন, তার মানে শ্রীকৃষ্ণের হৃদয় এমন পরিষ্কার যে, যেটা করার নয় সেই জিনিষটা তাঁর মনে একবারের জন্যও উঁকি দেবে না। যে কোন ধর্মের এটাই শেষ পরীক্ষা। শ্রীকৃষ্ণের মনে কোথাও কোন ক্ষোভ নেই, তখনও ছিল না পরেও ছিল না। গোপীদেরও মনে কোন অপরাধ বোধ ছিল না, পরেও কোন অপরাধ বোধ আসেনি। কথামৃতেও ঠাকুর ভাগবতের কথা উল্লেখ করে বলছেন – পরে গোপীরা দ্বারকায় গেলেন শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে দেখা করতে। সেখানে দেখেন শ্রীকৃষ্ণ রাজার বেশে বসে আছেন। দেখা মাত্রই সঙ্গে সঙ্গে গোপীরা ঘোমটা টেনে বলছেন 'আমরা এখন পর পুরুষের মুখ দেখে নষ্টা মেয়ে হয়ে পতিতা হব নাকি! আমরা জানি মাথায় ময়ূরের পালক দেওয়া মোহনচূড়া কৃষ্ণকে'! এই হল নিষ্ঠা, শ্রীকৃষ্ণের ব্যক্তি সত্তাকে গোপীরা ভালোবাসছেন, তাঁর শরীরকে কখনই তাঁরা ভালোবাসছেন না। শ্রীকৃষ্ণের ওই বিশেষ রূপকেই তাঁরা ভালোবাসছেন।

গোপীরা এটাই বলছেন 'তুমি হলে *ধর্মবিদা*, মানে ধর্মজ্ঞ। সেই অনুসারে তুমি বলছ *স্ত্রীণাং স্বধর্ম* হল স্বামী, পুত্র, ভাই, পিতা-মাতার সেবা করা। তা তুমিতো ঠিকই বলেছ। স্ত্রীধর্ম পালন করার তোমার এই কথাকে যদি আমাদের পালন করতেই হয় তাহলেও কিন্তু আমাদের তোমার কাছেই আসতে হবে। আর এটাই ঠিক ঠিক স্ত্রীর স্বধর্ম পালন করা হবে। কারণ *প্রেষ্ঠো ভবাংস্তনুভৃতাং কিল বন্ধুরাত্মা*, যত শাস্ত্র আছে, যত উপদেশ আছে তার শেষ কথা তুমি, যেহেতু তুমি সাক্ষাৎ ভগবান। আর জগতের সমস্ত দেহধারীর তুমিই সুহৃৎ, তুমিই আত্মা, তুমিই সবার পরমপ্রিয়'। সংস্কৃতে খুব সুন্দর একটা প্রার্থনা আমরা ছোটবেলা থেকে শুনে আসছি *ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব*, হে ভগবান! তুমিই মাতা, তুমিই পিতা, তুমিই বন্ধু তুমিই ভ্রাতা, তুমিই সব কিছু আমার। গোপীরা বলছে 'তুমি আমাদের যে উপদেশ দিয়েছ আমরা তোমার সেই উপদেশই পালন করছি। তুমি আমাদের স্ত্রীধর্ম পালন করতে উপদেশ দিচ্ছ, স্ত্রীধর্ম পালন করতে গিয়ে তুমি স্বামী, পুত্র, ভাই, পিতা-মাতার সেবা করতে বলছ। কিন্তু তুমিই সেই আদিপুরুষ, তুমিই স্বামী, তুমিই ভ্রাতা, তুমিই আমাদের মা-বাবা, এইভাবেই তো আমরা তোমাকে দেখে এসেছি। সেইজন্য তুমি বল তোমাকে ছাড়া আমরা কার সেবা করব! তাই তোমাকে সেবা করেই আমরা আমাদের স্বধর্ম পালন করছি। কারণ তুমি ভগবান, তুমিই শেষ কথা তাই তোমার সেবাই আমাদের পরম ধর্ম। সেইজন্য আমরা অধর্ম কিছু করছি না'।

গোপীরাও বুদ্ধিমতি ছিলেন, শ্রীকৃষ্ণের কথাকেই ঘুরিয়ে শ্রীকৃষ্ণের উপর চাপিয়ে দিয়েছেন। কীভাবে চাপিয়ে দিচ্ছেন? এই যে বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে, নীতির মধ্যে যত রকম দ্বন্দ্ব আছে আর তার যে সমাধান নীতিশাস্ত্র দিয়ে রেখেছে, এগুলোকে যদি পিছিয় নিয়ে যেতে থাকি শেষে ভগবানে এসে দাঁড়িয়ে যাবে। শাস্ত্র থেকে যেমন এই নির্দেশ গুলো বেরিয়েছে, ঠিক তেমনি এই শাস্ত্রগুলো আবার ভগবান থেকে বেরিয়েছে। সেই ভগবানই যদি সামনে হাজির হয়ে যান তখন কিসের আর ধর্ম আসবে, তখন কিসের ধর্ম পালন করতে যাবে! দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের ঘরে ঠাকুরের সামনে বসে জপ করার কি কোন অর্থ হয়? যাঁর জন্য জপ করা তিনি স্বয়ং সামনে বসে আছেন, তখন আর কিসের জপ! শ্রীমা নহবতে বসে আটা ঠাসছেন। লাটু তখন ধ্যান করছিলেন। ঠাকুর গিয়ে লাটুকে বলছেন 'ওরে তুই যাঁর ধ্যান করছিস তিনি ওখানে আটা ঠাসছেন'। আমাদের পক্ষে এই জিনিষগুলো ধারণা কর অত্যন্ত কঠিন। শ্রীমার কাছে একজন ভক্ত এসেছে। পুরুষ ভক্তদের কাছে শ্রীমা চাদর মুরি দিয়ে সারা শরীর ঢেকে বসতেন। ভক্তটি এসে মায়ের সামনেই বসে অঙ্গন্যাস, করন্যাসাদি করতে শুরু করে দিয়েছে। এদিকে মা চাদরের তলায় ঘামতে শুরু করে দিয়েছেন। গোলাপ মা এসে দেখছেন তখনও

ভক্তটি বসে এইসব নানা রকম ক্রিয়া করে যাচ্ছে। গোলাপ মা দেখে রীতিমত রেগে গিয়ে ভক্তটিকে প্রচণ্ড জোরে ধমক দিয়ে বলছেন 'আমাদের মা কি কোন মুর্তি নাকি যে, তুমি এইসব ক্রিয়া করে মায়ের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করছ'! মা হলেন সাক্ষাৎ ভগবতী। এই যে বোধ ইনি সাক্ষাৎ নারায়ণ কিংবা সাক্ষাৎ ভগবতী, এই বোধটাই একটা বিরাট সাধনা। যে কোন ব্যক্তি যদি জীবনে কাউকে, তা সে যেই হোক না কেন, নাতি, পুত্র, কন্যা, স্ত্রী, মা, বাবা, সন্ন্যাসি হন কিংবা গুরুই হন, ইনি আমার সাক্ষাৎ জীবন্ত নারায়ণ কিংবা ভগবতী, রাতারাতি তার জীবন পাল্টে যাবে, পাল্টে যেতে বাধ্য। আগেকার দিনে মেয়েদের বলত তোমার পতি পরমেশ্বর। এগুলো তাদেরকেই বলা হত যাদের জন্য এটা সাধনা, যারা সাধনা করতে চাইছে তাদের জন্য বলা হচ্ছে। ইদানিং যে সমালোচনার ঝড় তোলা হচ্ছে, এভাবে স্বামীদের দেখা মানে মেয়েদের ছোট করা। মেয়েদের ছোট কেন করা হবে! আপনি পতি পরমেশ্বর ভাব নিয়ে স্বামীর সেবা করে একবার দেখুন, আপনার ভেতরে আধ্যাত্মিকতার উন্মেষ হয় কিনা, আপনার জীবন পাল্টে যায় কিনা! আপনি বলতে পারেন আধ্যাত্মিক উন্মেষে আমার কোন প্রয়োজন নেই। ঠিক আছে, আপনার কোন প্রয়োজন না থাকতে পারে, কিন্তু আপনার জীবনটাই অন্য রকম হয়ে যাবে। যেমন ভারত এখন ক্রমশ আধ্যাত্মিক আদর্শ থেকে সরে আসছে। আপনি বলতে পারে শুধু স্বামীই কেন পতি পরমেশ্বর হবে, স্বামীও স্ত্রীকে ভগবতী রূপে দেখুক। কে বলেছে স্ত্রীকে স্বামীরা ভগবতী রূপে দেখে না! খোঁজ নিয়ে দেখুন এই ধরণের প্রচুর দৃষ্টান্ত আমাদের পরম্পরাতে পেয়ে যাবেন। জয়দেব যিনি গীতগোবিন্দ রচনা করেছেন, তিনি একজন বড় সাধক ছিলেন। তারপর তিনি গীতগোবিন্দ রচনা শুরু করলেন। গীতগোবিন্দে প্রণয় ছাড়া কিছু নেই। যাদের মধ্যে শ্রদ্ধা ভক্তি নেই, তারা গীতগোবিন্দ পড়লে কাম বাসনার গন্ধ ছাড়া কিছুই পাবে না। অথচ দেখুন দশাবতার চরিতমের 'জয় জগদীশ হরে' গানগুলো দিয়েই গীতগোবিন্দ শুরু হচ্ছে বা 'চন্দনচর্চিত নীল কলেবর' গীতগোবিন্দ প্রথমেই এই স্তোত্র দিয়ে শুরু হয়। গীতগোবিন্দে খুব উচ্চমানের ভক্তিকে নিয়ে আসা হয়েছে। গীতগোবিন্দ রচনা শেষ হয়ে যাওয়ার পর, জয়দেব আর তাঁর স্ত্রী সারা দিন আর সারা রাত শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহের সামনে গীতগোবিন্দের গান গেয়ে নৃত্য করতেন। নিজেদের মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর কোন ভেদ বুদ্ধি নেই, কারণ তখন দুজনেই শ্রীকৃষ্ণের সখী। স্ত্রীকে ভগবতী রূপে দেখার ব্যাপারটা যে ছিল না তা নয়। আমাদের ঋষিরাও ওই ভাব নিয়েই নিজের স্ত্রীকে দেখতেন, স্ত্রীকে তাঁরা কখন ভোগ্য বস্তু রূপে দেখতেন না। নির্ভর করে আপনি এই ব্যাপারটাকে কীভাবে নিয়ে যেতে চাইছেন। আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে আমার যে উন্নতি হচ্ছে, আধ্যাত্মিক জীবনে এটাই দামী।

গোপীরাও শ্রীকৃষ্ণকে বলছেন তুমি যে স্বামী, পুত্র, বন্ধু-বান্ধবদের সেবা করার কথা বলছ, এই কথা তো শাস্ত্র বলছে, এই শাস্ত্র আবার ভগবান মানে তোমার থেকে বেরিয়েছে। এখানে শ্রীকৃষ্ণ যোগীদের দৃষ্টিতে ভগবান বা তাঁদের দৃষ্টিতে ভগবান তাতে কিছু আস যায় না। কিন্তু তার আগে গোপীরা বলে দিয়েছেন আপনি ঘট ঘট ব্যাপি বিভু। আমরাও মেনে চলছি তাঁরা শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান বলে মানছেন। কিন্তু এখানে তারও কোন দরকার নেই। কারণ কোন কিছুকে যদি কেউ ভগবান মনে করে সাধনা করে তাতেই তার জ্ঞান লাভ হয়ে যাবে। কথামৃতে আছে, গুরু শিষ্যকে একটা ভেড়া দেখিয়ে বললেন 'এই ভেড়াই তোর ইষ্ট'। শিষ্য ঐ ভেড়াকেই ইষ্ট ভেবে সাধনা করে জ্ঞান লাভ করে নিল। আসলে সব কিছু আমাদের মনকে নিয়েই চলে। এই মনকে গুটিয়ে গুটিয়ে একটা জায়গায় নিয়ে আসতে হবে। এটাকে যোগশাস্ত্র বলছে *যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ*, এক বৃত্তিতে যদি মনকে নিয়ে আসা যায় তাতেই সম্প্রজ্ঞাত সমাধি লাভ হয়ে যাবে। ওই একটি বৃত্তিরও নাশ হয়ে গেলে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি হয়ে যাবে। সম্প্রজ্ঞাত আর অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে বিশেষ কোন তফাৎ নেই, ঈশ্বর দর্শন আর ব্রহ্মজ্ঞানেও কোন তফাৎ নেই। শ্রীকৃষ্ণকে এখানে ধর্মজ্ঞ বলছেন, ধর্মের সব কিছু শ্রীকৃষ্ণ জানেন। কিন্তু তারও আগে বলছেন আপনি ভগবান, আপনার সেবা করাই স্বধর্ম। পাষাণ প্রতিমাকে ঈশ্বর বলে মেনে নেওয়া অতি সহজ, কারণ প্রতিমা আমাদের কিছু বলে না।

স্বধর্ম সম্বন্ধে মহাভারত, মনুস্মৃতিতে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হয়েছে। সমাজের প্রতি, নিজের কর্মস্থলে, সংসারে মা-বাবার প্রতি, সন্তান, স্ত্রী, স্বামী, বন্ধু, জাতি, বর্ণ সবার প্রতি এমনকি নিজের প্রতি আমাদের কিছু কর্তব্য কর্ম পূর্ব থেকেই শাস্ত্র দ্বারা নির্ধারিত হয়ে আছে, এই কর্মগুলোকে পালন করাই স্বধর্ম।

সন্ন্যাসীর কাছে ভগবানই সব কিছু, তাঁর আত্মাও ভগবান আর তাঁর সম্বন্ধীও ভগবান, প্রিয়জনও ভগবান, ভগবান ছাড়া আর কিছু নেই। সেইজন্য সন্ন্যাসীর একটাই কর্তব্য ভগবানের নাম করা। ভগবানের নাম করা ছাড়া সন্ন্যাসীর আর কোন কর্তব্য নেই। গোপীরা তাই বলছেন 'তোমার কথা মতই আমরা চলছি, তুমি সবারই সুহৃৎ, ভালোবাসার শেষ কথা তুমি, আর আমরা তোমারই সেবা করছি'।

গোপীরা বলছেন *ভগবাংস্তনুভৃতাং কিল বন্ধুরাত্মা*, সমস্ত দেহধারী প্রাণীর আপনি সাক্ষাৎ ভগবান, আপনি সবারই সুহৃৎ, আপনি সবারই স্বামী, আপনি সবারই আত্মা আর পরমপ্রিয়তম। আমাদের উপনিষদ ও অন্যান্য বেদান্ত শাস্ত্র এই জিনিষটাকে নিয়েই এগিয়ে গেছে। মানুষ কাকে সব থেকে বেশী ভালোবাসে? সহজ ও সঠিক উত্তর হল নিজেকে বেশী ভালোবাসে। নিজেকে যে অর্থে আমরা বলি আমাদের শাস্ত্র ওই ভাবে বলে না, নিজেকে না বলে বলে আত্মাকে বেশী ভালোবাসে। অর্কিমিডিস জ্যামিতির উপর অনেক কাজ করেছিলেন। তখনকার দিনে গ্রীস দেশে সবাইকে যুদ্ধ করতে হত। একবার যুদ্ধের সময় তিনি জ্যামিতির কিছু সমস্যার সমাধান করছিলেন আর ঠিক সেই সময় বিরুদ্ধ দলের সৈন্যরা অর্কিমিডিসকে চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে। এবার তাঁকে শত্রুরা মেরেই ফেলবে। অর্কিমিডিস তখন বলছেন 'দাঁড়াও! আমাকে আগে জ্যামিতির এই সমস্যাগুলো শেষ করে নিতে দাও আর আমার মৃত্যুর পর জ্যামিতির এই ফিগারগুলো তোমরা নষ্ট করে দিও না'। লোকগুলো ঠিক তাই করল, ফিগার গুলো তৈরী হয়ে গেল আর সঙ্গে সঙ্গে অর্কিমিডিসকে শেষ করে দিল। অর্কিমিডিসের জ্যামিতির ফিগার গুলোও নষ্ট করল না। বিদ্যার প্রতি কী প্রচণ্ড ভালোবাসা ভাবা যায়! আমি মরে যাই তাতে কিছু আসে যায় না, কিন্তু আমার যে আত্মা এই বিদ্যার যেন নাশ না হয়। কবিও চায় আমি মরে যাবো কিন্তু আমার কবিতা যেন অমর হয়ে থাকে। মা চাইছে, আমি না খাই কিন্তু আমার সন্তান যেন খেতে পায়। কারণ সন্তান মায়ের আত্মা। স্ত্রী মনে করে স্বামী আমার আত্মা। কিন্তু স্ত্রী যদি জানে তার স্বামী একটা চোর বদমাইশ, লম্পট, এই ভগবানের পূজো করে কী হবে? আমার লক্ষ্য যখন ঠিক তখন এই জিনিষগুলোর হিসেব কখন করতে নেই। ঠাকুর বলছেন, যদ্যাপি আমার গুরু শুঁড়ি বাড়ি যায়, তদ্যাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়। কেউ যখন কাউকে আত্মজ্ঞানে ভালোবাসছে তাতে তার উন্নতি হবে, যাকে ভালোবাসছে সে গোল্লায় চলে গেলে তার কী! তার নিজের আত্মজ্ঞান তো হয়ে যাচ্ছে। আমরা এখানে ঈশ্বর শব্দ আনছি না, আত্মজ্ঞান বলা হচ্ছে, অর্থাৎ সর্বোচ্চ ভালোবাসা দিয়ে যাচ্ছে।

সচরাচর আমরা নিজের দেহকেই বেশী ভালোবাসি। দেহের বাইরে আমরা সন্তানকে ভালোবাসি। আর বিরল ক্ষেত্রে দেখা যায় কেউ কেউ বিদ্যাকে ভালোবাসে, এরা অনেক উচ্চস্তরের। আর বিরল থেকে বিরলতম যাঁরা, তাঁরা ঈশ্বরকে ভালোবাসেন। কিন্তু তাঁর সত্যিকারের আত্মা কে? আমাদের ঋষিরা বলছেন সবারই আত্মা একমাত্র ঈশ্বর। তাহলে ঈশ্বর সবারই স্বামী, সবারই সুহৃৎ, সবারই সবচেয়ে প্রিয়। বাকি যাদের আমরা আত্মা ভাবছি, আমার দেহ বলুন, স্ত্রী বলুন, পুত্র বলুন, বন্ধু বলুন, টকা-পয়সা বলুন, এগুলো সবই আমাদের কল্পনা, আসল আত্মা যিনি তিনিই আছেন, তিনিই থাকবেন। গোপীদের বক্তব্য হল যদি একেবারে ব্যক্তিগত স্তরে ভগবান বলা হয় তাতেও কিছু আসে যায় না আবার যে অর্থে আমরা ভগবান বুঝি সেই অর্থেও যদি নিই সেই অর্থেও শ্রীকৃষ্ণ ভগবান। সেইজন্য সব স্বধর্ম ছেড়ে শ্রীকৃষ্ণের যদি পূজো করি তখন এর উপরে তো আর কোন ধর্ম হতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণ নিজের কথাতেই নিজে ফেঁসে যাচ্ছেন। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে যে বিবাহ বিচ্ছেদ হয় বলছি, এই বিবাহ বিচ্ছেদ তো তখনই হয়ে যায় যখন স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কের উপর তাদের শ্রদ্ধাটা চলে যাচ্ছে। বাকি যা কিছু হয় সবই সামাজিক প্রথা, এর কোন মূল্য নেই। সম্পর্কের উপর শ্রদ্ধা তখনই চলে যায় যখন সম্পর্কের মধ্যে আত্মজ্ঞান থাকে না। আত্মজ্ঞানের বোধ যখন থাকে, সে যেই হোক, বন্ধু হোক, স্ত্রী বা স্বামী হোক, বাবা বা মা হোক, তখনই সে সবচেয়ে প্রিয়জন হয়। আমাদের যত মূল্যবোধ, মনুস্মৃতির মত যত স্মৃতিশাস্ত্র এগুলো তৈরী হয়েছে আধ্যাত্মিক সত্যকে আধার করে। আধ্যাত্মিক সত্য বলছে তুমি স্বামী বা স্ত্রীকে কেন ভালোবাসবে, তোমার পুত্রকে কেন ভালোবাসবে? কারণ এরা তোমার আত্মা। আর সমাজ, দেশকে কেন ভালোবাসবে? কারণ সমাজ ও দেশ তোমার ব্যক্তিত্বেরই সম্প্রসারিত রূপ। এই যুক্তি দিয়েই শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের বলছিলেন তোমাদের উচিৎ তোমাদের স্বামী, পুত্র, পরিজনদের সেবা করা, তাদের ভালোবাসা। গোপীরা এই

একই যুক্তি দিয়ে বলছেন, আমরা তো সচেতন যে তুমিই আমাদের ভগবান, তাই তোমার থেকে আমাদের প্রিয় আর কে হতে পারে!

যদি কেউ মনে করে ইনিই আমার আত্মা, আমি আর সে এক। এই মনে করাটা ধরা পড়বে কোথায়? যদি পরে তার মধ্যে কোন পরিবর্তন হয়ে যায় তখনই ধরা পড়বে। হনুমান একবার শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে দেখা করতে যাবেন। শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গে সঙ্গে রুক্মিণীকে বলছেন, আমাদের এক্ষুণি রামসীতার বেশ ধারণ করতে হবে, তা নাহলে হনুমান মাথা নোয়াবে না। শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি হনুমানের এমনই ভক্তি! গোপীরা দ্বারকাতে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। শ্রীকৃষ্ণও দ্বারকাধীশের বেশে গোপীদের সামনে হাজির হয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণের ওই দ্বারকাধীশের রূপ দেখে গোপীরা মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে বলছেন 'আমরা এই কৃষ্ণের দিকে তাকাবো না, এর দিকে তাকিয়ে আমরা ভ্রষ্টা হতে চাই না। আমাদের সেই ময়ূরমুকুটধারী শ্রীকৃষ্ণকেই চাই'। এটাই নিষ্ঠা। এদের সবারই বিবাহ হয়ে গেছে, শ্রীকৃষ্ণও কত কিছু করে নিয়েছেন। কিন্তু গোপীরা সেই শ্রীকৃষ্ণকেই খুঁজছেন। গোপীদের আত্মাতে তিনিই বসে আছেন। এই বোধ যদি কারুর প্রতি থাকে তখন সে যেই হোক, সে তার সন্তান হতে পারে, তার স্ত্রী বা স্বামী হতে পারে, তার গুরু হতে পারে, তাতে কিছু আসে যায় না। এবার সে কিন্তু মহৎ হবেই, মহৎ হওয়া থেকে তাকে আরে কেউ আটকাতে পারবে না। এবার সে যদি বলে ভগবানই আমার শ্রেষ্ঠতম, এও একই ব্যাপার। তবে কেউ যদি সন্তানকে আত্মা রূপে ভালোবাসছে, তার সেবা করছে আর কাল যদি দেখে সেই সন্তান বখাটে হয়ে গেছে, অবাধ্য হয়ে গেছে, ড্রাগে আসক্ত হয়ে গেছে কিংবা একটা লম্পট মেয়েকে বিয়ে করে নিয়ে এসেছে, তখন তার মাথাটা খারাপ হয়ে যাবে। তখন মনে হবে আমার শ্রেষ্ঠ ভালোবাসাটা যদি ভগবানকেই দিতাম তাহলে আমার এই দুরবস্থা হতো না। সেইজন্য বলা হয় জাগতিক ক্ষেত্রে আত্মারূপে কাউকে ভালোবাসলে তোমার উন্নতি হবে এতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু জাগতিক সম্পর্কগুলি খুবই নড়বড়ে আর অস্থায়ী। আমরা আত্মবুদ্ধি দিয়ে তো জগতের সবাইকে ভালোবাসছি, কিন্তু তার থেকে বরং এই আত্মবুদ্ধি দিয়ে আত্মাকেই ভালোবাসব। আমি যদি কোন সন্ন্যাসীকে দেখে বলি, আমি ওনার মধ্যে ঠাকুরকেই ভালোবাসছি। ঠাকুরকে যদি সেই সন্ন্যাসী ভালোবাসতে পারে তাহলে আমিও ঠাকুরকেই কেন ভালোবাসব না! জগতের সবাইকে যদি আত্মারূপেই ভালোবাসি তাহলে আত্মাকেই ভালোবাসা ভালো। কিন্তু সাধারণ লোক শুধু আত্মাকেই আত্মা রূপে ভালোবাসতে পারবে না।

গোপীরা শ্রীকৃষ্ণকে খুব সুন্দর কথা বলছেন ***কুর্বন্তি হি ত্বয়ি রতিং কুশলাঃ স্ব আত্মন্ নিত্যপ্রিয়ে পতিসুতাদিভিরার্তিদৈঃ কিম্। তন্নঃ প্রসীদ পরমেশ্বর মা স্ম ছিন্দ্যা আশাং ভৃতাং ত্বয়ি চিরাদরবিন্দনেত্র।।১০/২৯/৩৩।।*** শুধু তাই নয়, যাঁরা আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত তাঁরা তোমাকেই ভালোবাসেন। কারণ তুমি নিত্যপ্রিয়, নিত্য আত্মা তুমি আবার ভগবানেরও আত্মা, জ্ঞানীরা সেইজন্য তোমাকেই ভালোবাসে। তাই এই অনিত্য দুঃখদায়ী পতি-পুত্রকে ভালোবেসে আমার কি হবে'? এর আগে শ্রীকৃষ্ণ যে স্ত্রীণাং স্বধর্মের কথা বললেন, কিছু কিছু ভাষ্যকারের মতে শ্রীকৃষ্ণের এই উক্তি অতি সাধারণ স্তরে যারা পড়ে আছে তাদের জন্য বলা হয়েছে। কিন্তু গোপীরা সাধারণ ছিলেন না, তাদের ভাষাই বলে দিচ্ছে তারা কত উচ্চমার্গের ছিলেন।

আত্মা অনেক রকমের হয়। যারা খুব ভোগী পুরুষ তারা নিজের সন্তানের মধ্যেই আত্মাকে অর্থাৎ নিজেকে দেখে, অনেকে আবার নিজের দেহকেই আত্মা দেখে, আবার অনেকে নিজের মন বা বুদ্ধিকে আত্মা দেখে। যারা আরও বিষয়ী তারা টাকা পয়সাতে নিজের আত্মাকে দেখে, নিজের স্ত্রীর মধ্যে নিজের আত্মাকে দেখে। যাজ্ঞবল্ক্যকে যখন তাঁর স্ত্রী মৈত্রেয়ী আত্মার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করছেন তখন যাজ্ঞবল্ক্য তাঁর স্ত্রীকে বলছেন 'মানুষ কখনই কাউকে ভালোবাসে না। সে যখন সুবর্ণকে ভালোবাসে তখন সুবর্ণের জন্য ভালোবাসে না। স্ত্রীকে যখন ভালোবাসে, স্বামীকে যখন ভালোবাসে, পুত্রকে যখন ভালোবাসে তখন স্ত্রী, স্বামী বা পুত্র রূপে ভালোবাসে না, আসলে সবাই অজান্তে আত্মাকেই ভালোবাসে। আত্মাই সবার একমাত্র প্রিয়তম বস্তু। কেউ যদি বলে 'আমি নিজেকে ছাড়া আর কাউকে ভালোবাসি না'। কেউ যদি শুধু নিজেকে ভালোবাসে তাহলে তো সে আত্মজ্ঞানী হয়ে গেল। এখনও বাইরের বস্তুর প্রতি ভালোবাসা আছে বলেই মানুষের নানা দুর্ভোগ। যাঁরা জ্ঞানী

তাঁরা সেই শুদ্ধ সচ্চিদানন্দকেই নিজের আত্মা বলে জানেন। যাঁরা ভক্ত তাঁরা ঈশ্বরকেই নিজের আত্মা বলে জানেন। গোপীরা বলছেন আমরাও তো তোমাকে আত্মা বলেই জানি, তাই তোমাকে ছাড়া আমরা আর কাকে ভালোবাসতে পারি।

মানুষ যখন নিজের স্ত্রী, পুত্র, স্বামীকে ভালোবাসে তখনও সে অজান্তে নিজের আত্মাকেই ভালোবাসছে। আয়নাতে মানুষ নিজের প্রতিবিম্বকে কত সময় ধরে দেখতে থাকে, একবার এদিক থেকে একবার ওদিক থেকে দেখতেই থাকে। সে কি তখন আয়নাকে ভালোবাসছে? কখনই না, নিজের প্রতিবিম্বকেই ভালোবাসছে। মানুষ যখন অপরকে ভালোবাসছে তখন সে কখনই তাদের ভালোবাসছে না, এগুলো শুধু object of reflection। আমরা সবাই নিজেকে নিজেই ভালোবাসছি, কখন পুত্র রূপে, কখন স্ত্রী রূপে, কখন টাকা-পয়সা রূপে। তারা প্রতিবিম্ব ছুঁড়ছে, সেটা তারই প্রতিবিম্ব, নিজেকে দেখেই সে অবাক হয়ে যায়। আবার জ্ঞানীরা যখন ভগবানকে ভালোবাসছেন তাঁরাও সেই আত্মাকেই ভালোবাসছেন। প্রতিবিম্ব তত্ত্বে তাহলে অজ্ঞানী আর জ্ঞানীর মধ্যে তফাৎ কোথায়? অজ্ঞানীরা একটা বিশেষ আয়নাতে নিজের প্রতিবিম্ব দেখে মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু জ্ঞানী যত প্রাণী আছে সবার মধ্যে নিজের প্রতিবিম্ব দেখছেন। সেইজন্য জ্ঞানী সম্পূর্ণ জগৎকেই গ্রহণ করতে পারেন। অজ্ঞানী নিজের স্ত্রী পুত্র ছাড়া কাউকে আত্মা রূপে গ্রহণ করতে পারে না। এটাই জ্ঞানী আর অজ্ঞানীর তফাৎ। মীরাবাঈয়ের জীবনে একটা খুব নামকরা কাহিনী আছে। একজন লোক এসে মীরাবাঈকে বলছে 'তুমি তো সবার মধ্যে কৃষ্ণ দেখছ'। মীরাবাঈ বলছেন 'হ্যাঁ তাই'। 'তাহলে আমার মধ্যেও কৃষ্ণ দেখছ'? 'হ্যাঁ তাই'। 'তাহলে চল আমি তোমার সঙ্গে শোব'। মীরাবাঈ বলছেন 'হ্যাঁ, চল এখানেই শুয়ে পড়ি'। 'এখানে তো লোকজন আছে'। 'কোথায় লোকজন! আমি তো সবাইকেই কৃষ্ণ দেখছি'। সেই লোকটি তক্ষুণি সেখান থেকে পালিয়ে গেল। এটাই আধ্যাত্মিকতার চরম অবস্থা, এখানে সে আত্মা বা ঈশ্বর ছাড়া কিছুই দেখতে পায় না। গোপীরাও ঠি এই কথাই বলছেন 'হে কৃষ্ণ! তুমি তো সবারই আত্মা। জ্ঞানীরাও তোমাকে আত্মা বলে জানেন বলে আত্মাকে ভালোবাসেন, আমরাও তোমাকে আত্মা বলে জানি। সেইজন্য তুমি আমাদের এইভাবে ধাক্কা দিয়ে তোমার কাছে থেকে আমাদের ঠেলে দিও না'।

ঠাকুরের কাছে এক পাগলী এসে ঠাকুরকে বলত 'ওগো! তোমার মন থেকে আমাকে ঠেলে দিচ্ছ কেন'? শুনে ঠাকুর বলছেন 'ওরে হৃদু! এ যে দেখছি ঠেলাঠেলির ব্যাপার চলছে'। এখানে পাগলীর সেই ভাব নেই, অথচ গোপীরা কি ভাষা ব্যবহার করছেন! যাঁরা আত্মজ্ঞানী, শ্রেষ্ঠতম, তাঁদেরও আত্মা তুমি, সেইজন্য তাঁরা তোমাকে ভালোবাসে। আর স্বামী, পুত্র, ভাই, বন্ধু সবই অনিত্য। অনিত্যকে ভালোবেসে কখন কেউ সুখী হতে পারেনা। অনিত্য দুঃখ ছাড়া আর কিছুই দেয় না। ঠাকুর বলছেন সবাই নিজের মাগের সুখ্যাতি করে, কেউ বলে না যে তার স্ত্রী খারাপ। অথচ সমাজে চারিদিকে দাবানল জ্বলছে, দুঃখের কোন পরিসীমা নেই। গোপীরা তাই বলছেন *তন্নঃ প্রসীদ পরমেশ্বর মা স্ম ছিন্দ্যা।* শ্রীকৃষ্ণকে গোপীরা দেহধারী মানব রূপে দেখতেন না, পরমেশ্বর ভগবান রূপেই দেখে এসেছেন। এটা কোন ভাষ্যকারের কথা নয়, মূল ভাগবতেরই বর্ণনা। সেইজন্য রাসলীলা, গোপী, শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে বিভিন্ন তাত্ত্বিকরা যে ধরণের মন্তব্য করে সেগুলো অত্যন্ত বোকা বোকা লাগে। এখানে গোপীরাই শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করছেন 'হে পরমেশ্বর' বলে। আপনি পরমেশ্বর তাই আপনি আমাদের উপর প্রসন্ন হন। আমরা চিরকাল ধরে তোমার প্রতি আমাদের এই ভালোবাসাকে সযত্নে পালন করে হৃদয়ে ধারণ করে রেখেছি। চিরকাল বলতে গিয়ে গোপীরা বলছেন *চিরাদরবিন্দনেত্র*, চিরকাল বলতে এখানে জন্ম জন্মান্তর ধরে হতে পারে বা শ্রীকৃষ্ণের জন্মকাল থেকে হতে পারে। 'এত দীর্ঘকাল যাবৎ আমরা মনের নিভৃতে এই ভালোবাসাকে কত আশা নিয়ে সুন্দর ভাবে লালন করে আসছি, তুমি এই ভালোবাসাকে এইভাবে ছিন্নভিন্ন করে দিও না'। ভক্ত যখন ভগবানের আরাধনা করে করে ঈশ্বরের দর্শন না পায় তখন যে ছটফটানিটা হয়, ঠাকুর যেমন ব্যাকুলতার চরম পর্যায়েও মাকালী দর্শন পাচ্ছেন না দেখে দেওয়ালে ঝোলানো খড়্গটা হাতে নিয়ে বললেন এই খড়্গ দিয়ে আমার গলাটা কেটে দেব, গোপীদের ঠিক সেই ভাবটাই এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। এইসব শ্লোক শব্দের দিকে দিয়ে বোঝা সেই রকম কঠিন কিছু নয়, কিন্তু ভাবের দিক দিয়ে বোঝা আমাদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব।

সুখ ও সুখস্বরূপের পার্থক্য, শ্রীকৃষ্ণই সুখস্বরূপ

গোপীরা খুব ব্যথিত হৃদয়ে নিজেদের দুঃখের কথা বলছেন ***চিত্তং সুখেন ভবতাপহৃতং গৃহেষু যন্নির্বিশত্যুত করাবপি গৃহ্যকৃত্যে। পাদৌ পদং ন চলতস্তব পাদমূলাদ্ যামঃ কথং ব্রজমথো করবাম কিং বা।।১০/২৯/৩৪।*** ‘এত দিন আমরা কোন রকমে মনকে সংসারের কাজে লাগিয়ে রেখেছিলাম, তখন আমাদের হাতটাও গৃহকর্মেই লেগে থাকত। কিন্তু আজ আমাদের চিত্তের সবটাই বিনা আয়াসেই তুমি হরণ করে নিয়েছ, তাই হাতটাও সরে চলে এসেছে। তুমিই যথার্থ সুখস্বরূপ, তাই সহজেই আমাদের পুরো মনকে তুমি টেনে তোমার কাছে নিয়ে এসেছ। তার ফলে এখন আমাদের দুটো পা তোমার কাছে থেকে সরার জন্য রাজী হবে না। আমরা চাইলেও এই পদযুগল চলতে অপারগ। আমরা এক পাও যদি না চলতে পারি তাহলে এখন আর কি করে আমরা ব্রজে ফিরে যাব? যদিও বা কোন ভাবে ব্রজে ফিরে যাই কিন্তু সেখানে গিয়ে এখন আমরা করবই বা কী? কারণ আমাদের মন চিত্ত সব এখন তোমার পায়ে পড়ে আছে। ব্রজে আর আমাদের ফিরে যাওয়া হবে না। হে কৃষ্ণ! তুমি আমাদের আর কষ্ট দিও না’।

মানুষ সেটাই করতে চায় যেটাতে সে সুখ পায়। আমরা বলি ঠিকই যে মানুষ পশু থেকে অনেক উঁচু স্তরে চলে এসেছে। কিন্তু এখানে পশু থেকে মানুষ কোন উঁচু স্তরে আসছে না, পশুরাও সেটাই করে যেটাতে তারা সুখ পায়। আমরাও সেটাই করি যেটা আমাদের ভালো লাগে। আপনি বলবেন বাচ্চাদের পড়াশোনা করতে ভালোবাসে না, তবুও তো তারা পড়াশোনা করে। ওরা তাহলে পড়াশোনা করছে কী করে? না, ওর মধ্যেও তাদের সুখ আছে। বাচ্চা জানে আমি যদি পড়াশোনা না করি মা আমাকে তিরস্কার করবে। মা যদি তিরস্কার করে তাহলে মায়ের কাছ থেকে যে সুখ পাই সেই সুখ থেকে আমি বঞ্চিত হয়ে যাব। এখানে ব্যাপারটা হল, কিছু কিছু কাজ হয় যে কাজ করাটাই সুখ স্বরূপ আবার কিছু কিছু কাজ হয় যে কাজের ফলটা সুখ স্বরূপ। দুটো কাজে পার্থক্য এসে যাচ্ছে। যেমন যারা রোজ কষ্ট করে অফিসে যাচ্ছে, চাকরি করতে যাচ্ছে, সেখানে অফিসের কাজ করছে, সেই কাজটা তাদের কাছে সুখ স্বরূপ মনে হয় না। কিন্তু কাজ করে মাসের শেষে যে অর্থ প্রাপ্তি হচ্ছে, এই অর্থটাই গিয়ে সুখে রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে। সেইজন্য জীবনের উদ্দেশ্য কখনই কাজ হয় না, টাকাও জীবনের উদ্দেশ্য হয় না, জীবনের উদ্দেশ্য সুখপ্রাপ্তি। কিন্তু কিছু কিছু কাজ আছে যেখানে কাজটাই সুখ স্বরূপ। যাদের কাছে কাজটাই সুখের তারাই সত্যিকারের ভাগ্যবান।

মার্ক টোয়েন খুব মজার একটা কথা বলতেন I never had to work for living in my life, writing is my hobby and I was paid for my hobby। যাদের কোন রকম হবি থাকে তার জন্য তাদের টাকা খরচ করতে হয়। যেমন ধরুন স্ট্যাম্প কালেকশন, কয়েন কালেকশন হবি যাদের আছে তাদের তার জন্য কত টাকা-পয়সা খরচ করে স্ট্যাম্প সংগ্রহ করতে হচ্ছে। মার্ক টোয়েনের হবি ছিল বই লেখা। বই লিখে উনি সেটা ছাপাতেন, ছাপাবার পর বাজারে বই বিক্রী হলে তিনি পয়সা পেতেন। লোকের খেটে পয়সা রোজগার করে সেই পয়সা হবিতে বা আনন্দে লাগায়। মার্ক টোয়েনের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম, তাঁর যেটা হবি, সেই হবির জন্য সমাজ তাঁকে পয়সা দিচ্ছে। তাই বলা হয় যাদের কাজটাই হবি তারাই ভাগ্যবান। মায়েরা যখন নিজের নবজাতক সন্তানকে লালন-পালন করছেন তখন ওই কাজটাই তাঁর সুখ স্বরূপ। যখন মায়েরা রান্নাবান্না করেন তখন রান্না করাটাই তাঁদের কাছে সুখের।

এখানে গোপীরা এটাই বলছেন, আমরা তো বাড়িতে রান্নাবান্না থেকে শুরু করে সব কাজই করছিলাম। তাতে একটু অসুবিধা, কষ্ট সবই হচ্ছিল কিন্তু করে তো যাচ্ছিলাম। কিন্তু তুমি এসে আমাদের সব সুখ অনায়াসে টেনে নিয়েছ, এখন তোমাতেই আমরা সব সুখ পাচ্ছি। যাকে পাওয়ার জন্য এত কিছু করে যেতে হচ্ছে, এত কাঠখড় পোড়াতে হচ্ছে, এবার তাকে যদি এমনিই পেয়ে যাই তখন তার কাছ থেকে আমরা সরে আসতে চাইবো না। গোপীরা বলছেন, আপনি হলেন সুখস্বরূপ আর বাকিরা সুখ। সুখ আর সুখস্বরূপের এটাই তফাৎ, যেখানে সুখ আছে সেখানে দুঃখ থাকবেই কিন্তু যেখানে সুখস্বরূপ সেখান দুঃখ তো কখন হবেই না বরঞ্চ সুখটাও কখন কমে যাবে না। যে ছেলের জন্য মা কত আনন্দে রান্না করছে সেই ছেলে কিছু দিন পরে হস্টেলে

চলে গেল, তখন নিজের জন্য রান্না করতে কত কষ্ট হবে। স্বামীর জন্য কত যত্ন করে রান্না করে স্ত্রী সুখ পাচ্ছে পরে দেখছে স্বামী আরেকটি মেয়ের সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়, তখন সেই স্বামীর জন্যই রান্না করতে কত কষ্ট হবে। সেইজন্য বলছেন, যেটা আমাদের সুখ দিচ্ছে সেটাই আমাদের দুঃখের কারণ হয়ে যেতে পারে। কিন্তু যে সুখস্বরূপ সে কখনই আমাদের দুঃখ দেবে না। ভগবানই একমাত্র সুখস্বরূপ, তাই সব শাস্ত্র বলছে ভগবানকেই ভালোবাস। ঠাকুর বলছেন জগতের সব কিছু, ঘরবাড়ি, স্ত্রীপুত্র সবই অনিত্য। এই আছে এই নেই, আজকে যাকে ভালোবাসছে কাল হয়তো মরে গেল বা সে অন্য কাউকে ভালোবাসছে। কিন্তু ভগবানকে ভালোবাসলে তিনি কখনই আমাদের দুঃখ দেবেন না, কারণ তিনি সুখস্বরূপ। সুখ আর সুখস্বরূপের এটাই পার্থক্য। সত্য আর সত্যস্বরূপেও এই একই ব্যাপার। যেমন গান্ধীজী ছিলেন সত্যবাদী, সত্যে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু ঠাকুর হলেন সত্যস্বরূপ, ঠাকুরের কাছে সত্য মিথ্যা বলে কোন কিছু নেই, মিথ্যা বলে যে কিছু হয় তিনি জানেনই না। স্বরূপ মানে ওইটাই, তিনিই সত্য। সেইজন্য বেদান্তে এই নিয়ে অনেক বিতর্ক হয়। বেদান্ত বলছে ভগবানের স্বরূপ হল তিনি সৎ চিৎ ও আনন্দ। অনেকে বলেন সৎ চিৎ ও আনন্দ ভগবানের গুণ। কিন্তু আচার্য বলছেন, না তা নয়, সৎ চিৎ ও আনন্দ এটাই তাঁর স্বরূপ, এটাই তিনি। সূর্যে আমরা অন্ধকারের কল্পনাই করতে পারি না। কেউ যদি প্রশ্ন করে সূর্যে কখন অন্ধকার হয় বা অন্ধকার হয় কিনা, এগুলো বোকার মত প্রশ্ন। ঠিক তেমনি যদি প্রশ্ন করা হয় যিনি সুখস্বরূপ তাঁর কখন দুঃখ হবে কিনা, তখন এই প্রশ্নেরও কোন অর্থ হয় না।

বস্তু রূপে ত্যাগ ও ব্রহ্ম রূপে গ্রহণ

হেমন্ত ঋতুর কার্তিক মাসে দিনের বেলাতে উষ্ণ ভাবটা বেশী থাকে আর সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতিতে একটা শীতলতার আমেজ নেমে আসে। বলে প্রেমিক-প্রেমিকাদের পক্ষে এই আবহাওয়া নাকি খুব অনুকূল। গোপীরা বলছেন ***সিঞ্চাঙ্গ নস্ত্বদধরামৃতপূরকেণ হাসাবলোককলগীতজহৃচ্ছয়াগ্নিম্। নো চেদ্ বয়ং বিরহজাগ্ন্যুপযুক্তদেহা ধ্যানেন যাম পদয়োঃ পদবীং সখে তে।।***১০/২৯/৩৫।। হে প্রাণসখা! তোমার এই মধুর হাসি, তোমার প্রেমস্নিগ্ধ চাহনি, তোমার আরোহ-অবরোহের মোহন সঙ্গীত এগুলো তোমার প্রতি আমাদের ভালোবাসার আগুন আরও অসহনীয় ভাবে লেলিহান শিখার মত জেগে উঠেছে। সেইজন্য তুমি আমাদের এভাবে রূঢ় কথা বলো না। আর তুমি যদি আমাদের কথা না শোন, আমাদের যদি তোমার সুখস্পর্শ থেকে বঞ্চিত করে ব্রজে ফিরে যেত বল তখন আমরা আর কী করবো বল সেখানে গিয়ে! *ধ্যানেন যাম পদয়োঃ পদবীং সখে তে*, ঘরে ফিরে ধ্যানযোগে তোমারই কথা চিন্তন করব আর সেখানেই মনে মনে তোমার চরণাশ্রয়ে চলে গিয়ে তোমার সঙ্গে এক হয়ে যাব। এর আগে বত্রিশ নম্বর শ্লোকে গোপীরা বলছিলেন তুমি হলে ভগবান, যত শাস্ত্রীয় কথা, কোনটা কর্তব্য কোনটা অকর্তব্য সব তোমার কাছ থেকেই এসেছে। সেইজন্য তোমাকে ভালোবাসাই শেষ কথা। এখানে গোপীরা শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান রূপে দেখছেন, আর দুটি শ্লোক পরেই এই শ্লোকে গোপীরা শ্রীকৃষ্ণকে তাঁদের প্রেমিক রূপে বর্ণনা করছেন। আমাদের মধ্যে প্রেমের যে আগুন জ্বলেছে, এই আগুন নির্বাপিত করার একটাই পথ, যদি তোমার আলিঙ্গন আমরা পাই, তোমার অধরের চুম্বন যদি পাই।

রাসলীলার প্রথমের দিকে আর যশোদার সাথে শ্রীকৃষ্ণের বাললীলার প্রসঙ্গ যখন এসেছিল সেই সময়েও অনেকবার একটা কথা বলা হয়েছিল যে আধ্যাত্মিক ভাবকে সাধারণ মানুষের কাছে উপস্থাপিত করা খুব কঠিন কাজ। সেইজন্য বিভিন্ন মানবিক আবেগের সাহায্যে জাগতিক ভাবগুলোকে আধ্যাত্মিক ভাবের খুব কাছাকাছি নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হয়। ভাগবতে অনেক রকম আবেগকে নিয়ে আসা হয়েছে, এর মধ্যে একটা হল সন্তানভাব যেটা আমরা যশোদার শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বাৎসল্য রসের মাধ্যমে পেয়েছি আর একটা হল প্রেমের ভাব। বালরস আর শৃঙ্গাররস এই দুটোর উপর ভাগবত খুব জোর দিয়েছে। আমরা যেন কখনই ভুলেও মনে না করি যে ভাগবতের উদ্দেশ্য হল কাম বা পরকীয়া প্রেমকে উৎসাহিত করা। আধ্যাত্মিক রাজ্যের একটা উচ্চ ভাবকে ধারণা করার জন্যই এই শৃঙ্গাররসকে অবলম্বন করা হয়েছে।

গোপীরা আবার বলছেন ***যর্হ্যম্বুজাক্ষ তব পাদতলং রমায়া দত্তক্ষণং ক্বচিদরণ্যজনপ্রিয়স্য। অস্প্রাক্ষ্ম তৎপ্রভৃতি নান্যসমক্ষমঙ্গ স্থাতুং ত্বয়াভিরমিতা বত পারয়ামঃ।।১০/২৯/৩৬।।*** ব্রজের সবাই তোমাকে

ভালোবাসে সেইজন্য তারা তোমার দুর্লভ চরণচিহ্নকে বুকে ধারণ করার সৌভাগ্য পেয়েছে। আমরাও তো অত্যন্ত সৌভাগ্যবতী, কারণ তোমার যে চরণের জন্য লক্ষ্মীদেবীও একান্ত কাতর হয়ে থাকেন, সেই চরণযুগলের স্পর্শ আমরা পেয়েছি। রাসলীলার এটাই মজার বৈশিষ্ট্য, একবার প্রেমের বর্ণনা আর তারপরেই আবার সেই ভগবানের প্রতি ভক্তের আর্তিকে এনে সেই প্রেমের সঙ্গে মিশিয়ে দিচ্ছেন। একবার শ্রীকৃষ্ণকে প্রেমিক রূপে দেখছেন আবার তাঁকে সাক্ষাৎ বৈকুণ্ঠের সেই ভগবান নারায়ণ রূপে দেখছেন। গোপীরা এখানে বলছেন, 'কিছু দিন আগে আমরা তোমার চরণ স্পর্শ লাভে ধন্য হয়েছিলাম, সেইদিন থেকে আমরা আর কিছুতেই তোমাকে ছাড়া থাকতে পারছি না। আর যত দিন যাচ্ছে তোমার সংসর্গ পাওয়ার তীব্র বাসনাগ্নি আরও বর্ধিত হয়ে চলেছে'। নারদের জীবনেও কিছুটা একই রকম অবস্থা এসেছিল। নারদের মা মারা যাওয়ার পর তিনি জঙ্গলে জঙ্গলে ব্যাকুল হয়ে ঘুরছিলেন, সেখান ঝট্ করে নারদের একবার ভগবান বিষ্ণুর দর্শন হয়ে যায়। ওই এক ঝলক দর্শন হতেই নারদের মনে ঈশ্বরের প্রতি প্রেম আরও গভীর ভাবে জেগে গেছে। দিগ্বিদিক শূন্য হয়ে নারদ পাগলের মত দৌড়াচ্ছেন। তখন দৈববাণী দিয়ে ভগবান নারদকে বলছেন, 'তোমাকে ওই অতটুকু দর্শন দিলাম যাতে তোমার মনে আমাকে পাওয়ার ক্ষুধাটা জাগে'। আমাদের কখনই দুজন সাধকের সাধনা আর তাদের ফলের মধ্যে মিল খুঁজতে যাওয়া উচিৎ হবে না। কিন্তু গোপীদের সঙ্গে নারদের এই কাহিনীর মধ্যে কোথায় যেন একটা মিল পাওয়া যায়, যাকে ভগবান ভালোবাসেন তাঁকে নিজের একটু স্বরূপ দেখিয়ে দিয়ে তার মনে সর্বক্ষণের ঈশ্বর সান্নিধ্য লাভের ক্ষুধাকে আরও তীব্র করে দেন।

এখানে শুকদেব একদিকে পরীক্ষিতের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন অন্য দিকে তিনি গোপীদের মানসিক অবস্থার বর্ণনাও করে যাচ্ছেন। কোন জিনিষকে আমরা যখন দেখি তখন তাকে হয় বস্তু রূপে দেখি নয়তো ব্রহ্ম রূপে দেখি। কিন্তু সাধনার সময় কোন জিনিষকে বস্তু রূপে ত্যাগ করা হয় আর ব্রহ্ম রূপে গ্রহণ করা হয়। এটাই নেতি নেতি আর ইতি ইতি সাধনা। ঠাকুর যখন টাকা হাতে নিয়ে টাকা মাটি, মাটি টাকা বলে টাকাকে ফেলে দিচ্ছেন তখন তিনি বস্তু রূপে টাকাকে ত্যাগ করে দিচ্ছেন। আবার ব্রহ্ম রূপে গ্রহণও করছেন, যখন মনে হল মা লক্ষ্মী যদি রাগ করেন তাহলে খ্যাঁট বন্ধ হয়ে যাবে তখন তিনি বললেন 'মা তুমি হৃদয়ে বাস কর'। অথচ শ্রীমার কাছে যখন কোন টাকা পয়সা আসত তখন তিনি সেটাকে মাথায় ঠেকিয়ে খুব সামলে রাখতেন। শ্রীমা টাকাকে টাকা বলে প্রণাম করছেন না, লক্ষ্মী রূপে প্রণাম করছেন, মানে ব্রহ্ম রূপে গ্রহণ করছেন। বস্তু রূপে সব সময় ত্যাগ হয় আর ব্রহ্ম রূপে সব সময় গ্রহণ করা হয়। শ্রীকৃষ্ণ আর গোপীদের রাসলীলাতে আশ্চর্যের ব্যাপার হল, এখানে প্রাথমিক পর্যায়ে গোপীরা তাঁদের শরীর মনকে বস্তু রূপে ত্যাগ করে এই শরীর মনকেই ব্রহ্ম রূপে গ্রহণ করছেন। তাই বলা হল চিদানন্দময় শরীর। অথচ এর একটু পরেই একই সাথে দুটোই থাকছে, ব্রহ্ম রূপেও থাকছে আবার বস্তু রূপেও থাকছে। শ্রীকৃষ্ণ আর গোপীদের রাসলীলাতে ব্রহ্ম রূপ আর বস্তু রূপ এই দুটো একই সাথে চলছে। প্রথমে গোপীরা শ্রীকৃষ্ণকে বলছেন আমরা জানি তুমি সেই পরমেশ্বর, তোমার ভক্তের উপর তুমি যেমন কৃপা কর আমাদেরও সেই রকম কৃপা কর। যদিও রাসলীলাতে এমন অনেক কিছুর বর্ণনা আছে যা আমাদের খোলাখুলি আলোচনা করা সম্ভব নয়, কিন্তু মূল কথা হল তুমি আমাদের ভালোবাস। কীভাবে? দৈহিক ভাবে। একদিকে ভাব ব্রহ্ম রূপে রয়েছে, কারণ শ্রীকৃষ্ণের শরীর চিদানন্দময় আর গোপীদের শরীরও চিদানন্দময়ী, অন্য দিকে মিলন হচ্ছে। মিলনের বর্ণনাও সেই ভাবেই দেওয়া হয়েছে। এখানে ব্রহ্ম রূপ আর বস্তু রূপ দুটোই এসে যাচ্ছে।

ঠাকুরের জীবনেও ঠিক এই ভাব অর্থাৎ ব্রহ্ম রূপ আর বস্তু রূপ যুগপৎ অবস্থিত ছিল, যখন মা কালী ঠাকুরকে বললেন 'তুই ভাবমুখে থাক'। ভাবমুখে থাকা মানে একদিকে ব্রহ্ম রূপও দেখতে পাচ্ছেন অন্য দিকে বস্তু রূপও দেখতে পাচ্ছেন। জাগতিক যে সত্তা সেটাকেও ঠাকুর চৈতন্যময় দেখছেন আবার ব্রহ্মই সব কিছু হয়েছেন সেটাও দেখছেন। এটাই ভাবমুখের মূল তাৎপর্য। রাসলীলাতে গোপীরা যখন এই জায়গাতে অবস্থান করছেন তখন তাঁদেরও সেই একই অবস্থা, এটাই তখন ভাবমুখে থাকা। শ্রীকৃষ্ণকে দেখছেন পরমেশ্বর রূপে কিন্তু তাঁর সাথে প্রেম যেটা নিবেদন করছেন সেটা যেন জীবের ভাব এসে যাচ্ছে। জীবের ভাব কি করে আসতে পারে? জীবতো ঐভাবে পরমাত্মাকে ভালোবাসতে পারে না। সচারচর যখন বস্তু রূপ হয় তখন বস্তু রূপই

দেখেন আর যখন ব্রহ্মস্বরূপ হন তখন ব্রহ্মস্বরূপই দেখেন। চৈতন্য সমাধিতে বস্তুও দেখছেন আবার ব্রহ্মও দেখছেন এই অবস্থা খুব বিরল। ঠাকুর বলছেন চৈতন্য সমাধি একমাত্র শুকদেবের হয়েছিল। এই জিনিষ সচরাচর হয় না, চৈতন্য সমাধিতে হয় তিনি ব্রহ্ম রূপে জগতকে উড়িয়ে দিয়ে বলবেন জগৎ মিথ্যা, আর তা নাহলে জগতটা সত্য হয়ে ব্রহ্মই মিথ্যা মনে হবে। কিন্তু ব্রহ্ম সত্যম্ আর জগৎ সত্যম্ এই জিনিষ কখন হবে না। এখানে শ্রীকৃষ্ণ পরমেশ্বর, তাঁকে পরমাত্মা রূপে দেখছি অথচ তাঁর সঙ্গে আমরা কেলিক্রীড়া করব। এটাই রাসলীলার বিচিত্রতা। সেইজন্য রাসলীলার সার্বিক ভাবকে ধারণা করা খুবই কঠিন। উচ্চকোটির সাধক না হলে এই ভাব ধারণা করা খুব দুঃসাধ্য। যিনি ব্যাখ্যা করবেন তাঁকেও সেই রকম উচ্চ আধ্যাত্মিক সম্পন্ন হতে হবে।

জীবের মধ্যে যে জাগতিক প্রেমভাব সেটা সীমিত, এই প্রেম দিয়ে পরমাত্মাকে কখনই ভালোবাসা যায় না। কঠোপনিষদে যমরাজ বলছেন *যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধমাসিক্তং তাদৃগেব ভবতি*, শুদ্ধ জলে যদি শুদ্ধ জল মিশিয়ে দেওয়া হয় তখন সেটা এক রসত্ব প্রাপ্ত হয়ে যায়। রাসলীলাতে গোপীদের এখানে এই দুটো জিনিষই চলছে, একদিকে তাঁরা শ্রীকৃষ্ণকে পরমেশ্বর রূপেও দেখছেন আবার প্রিয়তম রূপেও দেখছেন। অথচ ঠাকুরের জীবনে আমরা বর্ণনা পাই, একবার ঠাকুর এই মধুর ভাবে আলিঙ্গন করতে গেছেন তখন তিনি আটকে গেছেন, কারণ তুমি এখন দেহ ধারণ করে আছ এখন এটা হবে না। তার মানে এখানে গোপীরা অন্য দেহে ছিলেন। কিন্তু মূল ভাব ঐটাই, ভাবমুখে থাকা।

ভক্তি ও জাগতিক ঐশ্বর্য একসাথে থাকতে পারে না

এরপর গোপীরা তুলসীর প্রতি লক্ষ্মীদেবীর ঈর্ষাকে উল্লেখ করে বলছেন ***শ্রীর্যৎপদাম্বুজরজশ্চকমে তুলস্যা লব্ধ্বাপি বক্ষসি পদং কিল ভৃত্যজুষ্টম্। যস্যাঃ স্ববীক্ষণকৃতেহন্যসুরপ্রয়াসস্তদ্বদ্ বয়ং চ তব পাদরজঃ প্রপন্নাঃ।।২৯/১০/৩৭।।*** বড় বড় ঐশ্বর্যশালী দেবতারা লক্ষ্মীদেবীর কৃপা কটাক্ষ পাওয়ার জন্য কত তপস্যা করেন। শুধু যে দেবতারা শ্রীকে পেতে চাইছেন তাই নয়, এই জগতে সবাই শ্রী, মানে ঐশ্বর্য পেতে চাইছে। সাধু সন্ন্যাসীরাও সামান্য একটা কুঠিয়ায় থাকেন, কিন্তু তাঁরাও চান তাঁদের কুঠিয়ার যেন একটা শ্রী থাকে, শ্রী যেখানে থাকবে সেখানেই আকর্ষণ আসবে। শ্রী বলতেই টাকা-পয়সা বা লক্ষ্মীর কথা বলা হয় না। সুখ স্বাচ্ছন্দ্য, সচ্ছলতা থাকাটাই শ্রী। ঠাকুর ভক্তদের বলছেন ছেঁড়া বস্ত্র ও মলিন বস্ত্র পরতে নেই, এটাই শ্রীর অভাব। সেই শ্রীদেবী আবার নারায়ণের হৃদয়ে বাস করার একমাত্র অধিকারিণী, ভগবানের হৃদয়ে বাস করার অধিকারে তাঁর কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। শ্রীদেবী একাই ভগবানের হৃদয়ে বাস করেন। তা সত্ত্বেও লক্ষ্মীদেবী সপত্নী তুলসীকে হিংসা করেন, কারণ ভক্তপার্ষদবৃন্দ সেবিত ভগবানের ঐ চরণকমলেই তুলসীর স্থান। অধ্যাত্ম রামায়ণও ভগবানের চরণকমলের মহিমার এই ভাবটা ভাগবতের এই অংশ থেকে নেওয়া হয়েছে। যে কোন মানুষের কাছে তাঁর বক্ষের গুরুত্ব সব থেকে বেশী। প্রেয়সীর একমাত্র স্থান হল তার প্রিয়তমের বক্ষ, প্রেয়সীকে ছাড়া সে সেখানে আর কাউকে থাকতে দেবে না। ভগবান বিষ্ণুর বক্ষস্থলে একমাত্র লক্ষ্মী রয়েছেন, লক্ষ্মী ব্যতিরেকে আর কেউ সেখানে থাকতে পারে না। কিন্তু তুলসীকে ভগবান তাঁর চরণকমলে স্থান দিয়ে রেখেছেন। কিন্তু তাতেও লক্ষ্মীদেবী আপত্তি করছেন, যার জন্য লক্ষ্মীর মনে ঈর্ষা। শিবের ক্ষেত্রে তাও আপত্তিজনক হতে পারে, কেননা যদিও মা পার্বতী শিবের হৃদয়ে বাস করেন কিন্তু শিব আবার মাথায় গঙ্গাকে ধারণ করে আছেন। কিন্তু বিষ্ণুর ক্ষেত্রে তুলসী তাঁর চরণকমলে আছে, এখানে আপত্তি হওয়ার কথা নয়। কিন্তু তাও লক্ষ্মী দেবীর মনে ঈর্ষা, সেই থেকে লক্ষ্মী তুলসীকে তাঁর সতীন মনে করে। সেই থেকে বলা হয়, ভক্তি আর ঐশ্বর্য এক সঙ্গে হয় না। যাদের ঠিক ঠিক ঈশ্বরে ভক্তি আছে লক্ষ্মী কখনই তাদের কাছে যাবেন না।

এই ধরণের কাহিনী সব ধর্মের পরম্পরাতেই পাওয়া যায়। ইবনবতুতা নামে একজন পরিব্রাজক ছিলেন। তিনি সারা বিশ্ব ঘুরে বেরিয়েছেন আর সেখান থেকে তিনি অনেক ঘটনা লিপিবদ্ধ করে গেছেন। অনেকে মনে করে তিনি অনেক কিছু নিজের মত বানিয়ে বানিয়ে লিখে গেছেন। কিন্তু আমাদের কাছে তৎকালীন ইতিহাস না থাকাতে বলা মুশকিল কোনট ঠিক, কোনটা তাঁর নিজের বানানো। তা সত্ত্বেও ইবনবতুতার রচনা থেকে তখনকার দিনের অনেক ঘটনা জানা যায়। এমনকি মহম্মদ বিন্ তুঘলকের অনেক

ঘটনা তাঁর রচনা থেকেই পাওয়া যায়। যাই হোক, একটা কাহিনী আছে তাতে একজন মুসলিম ভক্ত ছিলেন, আল্লা ছাড়া দুনিয়াতে আর কিছু জানতেন না। একদিন সেই ভক্ত দেখছেন তাঁর কুঠিয়ার পাশ দিয়ে প্রবাহিত শীর্ণ নদীর নালা দিয়ে একটা আপেল ভেসে যাচ্ছে। আপেল নালা দিয়ে ভেসে যাচ্ছে, কার আপেল কে জানে, এই আপেলটা তুলে খেয়ে নেওয়া যায়। মনে মনে এই চিন্তা করে তিনি আপেলটাকে তুলে খেয়ে নিয়েছেন। খাওয়ার পর তাঁর মনে হল এটা হয়তো কারুর বাগানের আপেল, না বলে খাওয়াতে চুরি করা হয়েছে। তিনি এখন নদীর তীর বরাবর ধরে খুঁজতে বেরিয়েছেন কার আপেলের বাগান আছে। বাগান পাওয়া গেল। সেখানে দেখছেন একজন মহিলা পাহাড়া দিচ্ছে। মুসলিম ভক্তটি খুব করে সেই মহিলার কাছে ক্ষমা চাইল, আমার খুব অন্যায় হয়ে গেছে, আপনার বাগানের আপেল ভেসে যাচ্ছিল, আমি আপনাকে না বলে খেয়ে নিয়েছি, ইত্যাদি। মহিলাটি তখন বলছে, দেখুন এই বাগানের অর্দ্ধেক অংশ আমার আর বাকি অর্দ্ধেক অংশ এখানকার রাজার। আমার অর্দ্ধেক যে অংশ সেটা আমি ক্ষমা করে দিলাম, বাকি অর্দ্ধেক অংশ আমি ক্ষমা করতে পারি না। সেখানকার রাজা আবার থাকেন বারো কুড়ি দিনের হাঁটা পথের দূরত্বে। গরীব মুসলমান, ঘোড়া নেই, তিনি এখন হাঁটতে শুরু করেছেন। হাঁটতে হাঁটতে অনেক দিন পর রাজার কাছে পৌঁছেছেন। রাজার কাছে সব বলার পর বলছেন ‘আমি খুব অন্যায় করেছি, চুরি করে খাওয়ার অর্দ্ধেক দোষ আমার উপর বর্তেছে’। রাজা বললেন ‘ঠিক আছে, তুমি আগামীকাল এসো, কালই এর বিচার করা হবে’। এরপর রাজা অন্দরমহলে চলে গেলেন। রাজার একটি পরমা রূপসী কন্যা ছিল। সেই কন্য আবার বলছে কাউকে সে বিয়ে করবে না, কন্যাটিও আল্লার খুব ভক্ত। রাজা গিয়ে তার কন্যাকে বলছে ‘দেখো তোমার মনের মত বর পাওয়া গেছে’। তখন মেয়েটিকে সেই লোকটির কথা বলল, অর্দ্ধেক আপেলের জন্য ক্ষমা চাইতে লোকটি পনের দিন পায়ে হেঁটে এখানে এসেছে, তাও সেই আপেল আবার নদীতে ভেসে যাচ্ছিল। রাজকুমারী তখন বলল ‘এই ঠিক ঠিক আল্লার ভক্ত, আল্লার ভক্ত না হলে এত সৎ হওয়া যায় না’।

পরের দিন ভক্তটি এসেছেন। রাজা বললেন ‘আমি তোমাকে ক্ষমা করার বিচার করব কিন্তু তার আগে এই রাজকুমারীকে তোমায় বিয়ে করতে হবে’। ভক্তটির তো মাথায় বজ্রপাত! কিন্তু কিছু করার নেই, রাজার আদেশ। বিয়ে হয়েছে। বিয়ে হওয়ার পর ওদের দুজনকে ফুলশয্যার ঘরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। রাজা বলে কথা, বিরাট আয়োজন। লোকটি সেদিন থেকে রোজ রাজকুমারীর ঘরে যায়। ঘরে গিয়ে একটা কোণে চাদর পেতে সারা রাত আল্লার কাছে প্রার্থনা করে যায়। লোকটি আল্লার চিন্তায় হারিয়ে আছে। আর রাজকুমারী তার স্বামীর অপেক্ষায় শুয়ে শুয়ে রাত কাটিয়ে দেয়। রাজাও রোজ খবর নিচ্ছে। সাত দিন হয়ে যাওয়ার পর রাজা লোকটিকে ডেকেছে। ডেকে বলছে ‘শোন! এবার তোমার বিচার করা হবে, কিন্তু তুমি যতক্ষণ রাজকুমারীর সঙ্গ না করছ ততক্ষণ তোমাকে ক্ষমা করা হবে না। রাজকুমারীর সঙ্গ করে নিলেই তোমার অপরাধ ক্ষমা করা হয়ে যাবে’। বেচারী কী আর করবে! সে তার অপরাধের ক্ষমা চাইতেই তো রাজার কাছে এসেছিল। বাধ্য হয়ে রাজকুমারীর সঙ্গ করল। পরদিন ভোরবেলা উঠে স্নান করল, স্নান করে আসনে এসে প্রণাম করল, তারপর সেখানেই সে আস্তে করে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল। চারিদিকে হাহাকার পড়ে গেছে। কিন্তু আর কিছু করার নেই। তাতেই নাকি রাজকুমারীর একটি ছেলে হয়েছিল, পরে সে খুব নামকরা রাজা হয়েছিল। এই গল্পটা এই জন্যই বলা হল এটা দেখাবার জন্য যে, ভক্তি আর ঐশ্বর্যে মধ্যে কী সম্পর্ক। একজন ঠিক ঠিক ঈশ্বরের ভক্ত, তার কাছে একটা অর্দ্ধেক আপেলও বিরাট বোঝা হয়ে গেছে। আবার রাজকুমারী আর প্রচুর ঐশ্বর্য যখন তাকে দিয়ে দেওয়া হল, তখন সেই ঐশ্বর্যটা সে নিতেই পারছে না। একটা ছোট্ট অপরাধ করেছে, এই সামান্য অপরাধের ক্ষমা পাওয়ার জন্য সে নিজের অমূল্য জীবনটাই দিয়ে দিল। কাহিনী সত্যি না মিথ্যে আমরা জানি না, কিন্তু ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। কাহিনী যদি কাল্পনিকও হয় তাতে দোষের কিছু নেই। কারণ কাহিনীর ভাবটাই আসল। রাসলীলাতেও বলা হয় কাহিনীর দিকে না গিয়ে এর ভাবের দিকে যেতে হবে। রাসলীলার মাধ্যমে কী বলতে চাওয়া হয়েছে, সেটাকে ধরে নিজের জীবনকে সেই দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। এই কাহিনীতে বলতে চাইছে ভক্তি আর জাগতিক ঐশ্বর্য একসঙ্গে চলে না। আর ঠিক ঠিক ভক্তকে জোর করে

যদি জাগতিক সুখ ঐশ্বর্যের মধ্যে ফেলে দেওয়া হয়, তাহলে জল ছাড়া মাছের মত মরে যাবে। লক্ষ্মী আর তুলসীর ঠিক এই রকমই সম্পর্ক।

দেবতারা হলেন সমস্ত প্রাণীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম, তাঁরা আরাধনা করছেন লক্ষ্মীদেবীর। লক্ষ্মীদেবীর কৃপা না হলে দেবতাদের কোন ঐশ্বর্যই হবে না। মহাভারতেও এই ধরণের উল্লেখ আছে, বামন অবতারে বিষ্ণুর আদেশে বলিরাজ পাতালে চলে গেছেন। ইন্দ্র প্রজাপতিকে জিজ্ঞেস করছেন বলিকে কোথায় পাওয়া যাবে। প্রজাপতির কাছ থেকে খবর নিয়ে ইন্দ্র সেখানে গেছেন যেখানে বলি অবস্থান করছিল। ইন্দ্র দেখলেন বলির শরীর থেকে এক অতি সুন্দরী স্ত্রী বেরিয়ে এসেছেন। ইন্দ্র জিজ্ঞেস করছেন আপনি কে। তিনি বললেন আমি লক্ষ্মী। লক্ষ্মী যখন বলিকে ছেড়ে ইন্দ্রের শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে গেল, সেই সঙ্গে অসুরদেরও সব শক্তি শেষ হয়ে গেল, এবার দেবতাদের শক্তি বৃদ্ধি হতে থাকবে। আমাদের পরম্পরাতে বলা হয় লক্ষ্মীদেবীর আরাধনা করলে সুখ সমৃদ্ধি হয়। সেই লক্ষ্মী কোথায় থাকেন, তিনি তোমার বক্ষবিলাসিনী। সেই লক্ষ্মীদেবী, যাঁর সাধনা সবাই করছে, তিনিও মনের মধ্যে হিংসার জ্বালায় জ্বলছেন। কাকে তাঁর হিংসা? অতি সাধারণ এক তুলসীপাতাকে, যে কিনা লক্ষ্মীদেবীর সতীন। কেন তিনি তুলসীপাতাকে হিংসা করেন? কারণ তুলসীপাতা তোমার চরণকমলে অর্ঘ্য দেওয়া হয়। তোমার চরণের এমনই মাহাত্ম্য যে, যিনি তোমার হৃদয়কমলে বাস করেন তাঁরও মনে শান্তি নেই, কারণ তোমার চরণে তিনি স্থান পাচ্ছেন না। লক্ষ্মীদেবীর মনে তোমার চরণরেণুর কামনা আছে বলেই তুলসীপাতাকে তিনি হিংসা করছেন। তোমার ভক্তরাও তোমারই চরণরজের আকাঙ্খী। সেইজন্য গোপীরা বলছেন 'ওগো দুঃখহারী! হে শরণাগতবৎসল! এবার আমাদের প্রতিও তুমি প্রসন্ন হও, তোমার চরণে আমাদের স্থান দাও। রূপৈশ্বর্যে সমৃদ্ধময়ী লক্ষ্মীদেবী যিনি তোমার বক্ষ সংলগ্না তাঁকে তুমি উপেক্ষা করে থাক সেখানে আমরা আর কোথায়! কিন্তু তোমার এই রূপ মাধুর্য, তোমার ঐ অপরূপ হৃদয় উদ্বেলিত করা হাসি-মাখা চাহনি, তোমার ঐ মধুর বংশীধ্বণি শুনে জগতের কোন নারী আছে যে তোমার আকর্ষণে ছুটে আসবে না! তোমাকে ভালোবেসে পাগল হয়ে যাবে না! তুমি আমাদের প্রাণ দান কর, আমাদের গ্রহণ কর'। এইভাবে গোপীরা নানান ভাষায় তাঁদের অন্তরের প্রেমের আর্তি শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করে যাচ্ছেন।

ঈশ্বরের ক্ষণিক দর্শনই মানুষকে তার চরিত্র থেকে চ্যুত করে দেয়

পরের শ্লোকে গোপীরা আবার বলছেন ***তন্নঃ প্রসীদ বৃজিনার্দন তেঽঙ্ঘ্রিমূলং প্রাপ্তা বিসৃজ্য বসতীস্ত্বদুপাসনাশাঃ। ত্বৎসুন্দরস্মিতনিরীক্ষণতীব্রকামতপ্তাত্মনাং পুরুষভূষণ দেহি দাস্যম্।*** ।১০/২৯/৩৮। 'হে দুঃখহারী! যাঁরা তোমার উপাসনা করেন, যাঁরাই তোমাকে ভালোবেসেছেন, দেখা গেছে তাঁদের সব ধরণের বাসনা, তা সে যে বাসনাই হোক না কেন, সবটাই তুমি পূরণ করে দাও, এটাই তোমার স্বভাব। আমরা তো তোমার চরণেই আশ্রয় নিয়েছি, আমাদের হৃদয়ে যে অপূর্ণ বাসনা আছে, সেই বাসনাটা তুমি পূরণ করে দাও। আমাদের একটাই বাসনা, তুমি আমাদের দাসী রূপে গ্রহণ করে আমাদের কৃতার্থ করে দাও। আমরা তোমার কাছে আর কিছু চাই না। আমাদের ভেতরে তোমাকে পাওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষাকে জাগিয়ে দিয়ে যে আগুন জ্বেলে দিয়েছ, সেই আকাঙ্ক্ষাকে মিটিয়ে এই আগুনকে তুমি নির্বাপিত করে দাও'। ঠাকুরের জীবনের একটি ঘটনার সাথে এর কিছুটা তুলনা করা যেতে পারে। ঠাকুর যখন মা কালীর সাধনা করছেন সেই সময় মায়ের দর্শনের জন্য ঠাকুরের মধ্যে এত তীব্র ব্যাকুলতা যে তিনি খড়্গ নিয়ে মায়ের সামনে দাঁড়িয়ে বলছেন 'যদি দেখা না দিস তবে এই খড়্গ দিয়ে আমার গলা কেটে দেব'। দিনে দিনে ঠাকুরের ব্যাকুলতা বেড়েই চলেছে, কিন্তু একটা অবস্থার পর ঠাকুর আর মাকে ছাড়া থাকতে পারছেন না। এখানে যদিও অন্য রকমের বর্ণনা পাই, কিন্তু ব্যাপারটা একই। আমাদের ভেতরে তুমি যে আগুনটা জ্বালিয়ে দিয়েছ সেই আগুন তোমাকেই নেভাতে হবে। ঠাকুরও বলছেন 'মা! তুই কমলাকান্তকে দেখা দিয়েছিলি, রামপ্রাসাদকে দেখা দিয়েছিস, আমাকে কেন দেখা দিবি না'। গোপীরাও ঠিক এই কথা বলছেন 'অন্য ভক্তদের তুমি আশ্রয় দিয়েছ, আমাদের কেন তুমি দেবে না, আপনার আশ্রয় নিয়ে সব কামনা বাসনা মিটে যায়। আমরাও তাই আপনার আশ্রয় চাইছি। আমাদের কামনা বাসনা একটাই, তুমি আমাদের দাসী রূপে গ্রহণ করে তোমার সেবার অধিকার দাও। তোমার এই

পুরুষোত্তম রূপ, তোমার এই ভুবনভোলান মিষ্টি হাসি, তোমার শরীরর কোমল বাহু, ঋজু পদযুগলের দিব্য রূপ দেখে দেখে আমরা উন্মত্ত হয়ে গেছি, সেইজন্য আমরা তোমার দাসী হয়ে যেতে চাইছি'।

নিজেদের অন্তরের আর্তি জানাবার পর গোপীরা আবার বলছেন ***কা স্ত্র্যঙ্গ তে কলপদায়তমূর্চ্ছিতেন সম্মোহিতাহর্যচরিতান্ন চলেৎ ত্রিলোক্যাম্। ত্রৈলোক্যসৌভগমিদং চ নিরীক্ষ্য রূপং যদ্ গোদ্বিজদ্রুমমৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্।।১০/২৯/৪০।*** 'হে পুরুষভূষণ! তোমার বাঁশিতে যে কী তান্ বাজে, বাঁশির সেই আরোহ অবরোহের অলৌকিক সুরের মুর্ছনা শ্রবণ করার পর জগতে এমন কে আছে যার *চরিতাৎ ন চলেৎ*, যে তার চরিত্র থেকে চ্যুত হয়ে যাবে না'! চরিত্র বলতে বোঝায়, শাস্ত্র শুনে এবং গুরুবাক্য শ্রবণ করার পর আমাদের ভেতরে কিছু ভাবের ধারণা রূপ পেতে থাকে, জগতে কীভাবে চলতে হবে এই ব্যাপারে একটা ধারণা তৈরী হয়। শাস্ত্র আর গুরু এই দুজনই ব্যক্তি সাপেক্ষ। দুজন লোকের কাছে শাস্ত্র এক হবে না, গুরুও সমান হবে না। শাস্ত্রের কথা গুরুর মুখ দিয়ে আমরা যেটা শুনেছি বা শাস্ত্রও অধ্যয়ন করেছি আবার গুরুর কাছেও শুনেছি, শোনার পর আমরা একটা অবধারণা করে নিই যে আমাদের এই এই জিনিষ করতে হবে আর এই এই জিনিষ করা থেকে বিরত থাকতে হবে। এখান থেকেই আমাদের চরিত্র তৈরী হয়। আমাদের মূল্যবোধের শিক্ষায় বলছে কোন স্ত্রী পরপুরুষের দিকে তাকাবে না, আবার পুরুষরা অপরের স্ত্রীকে মাতৃবৎ দেখবে। সেখান থেকে আমাদের একটা চরিত্র তৈরী হচ্ছে। গোপীরা এটাই বলছেন জগতে এমন কোন স্ত্রী নেই যে তোমাকে দেখে সে তার চরিত্র থেকে চ্যুত হবে না।

আধ্যাত্মিক চেতনার একটু বিকাশ না হলে এই কথাগুলো বোঝা বা ধারনা করা খুব দুষ্কর। রামচরিতমানসে খুব সুন্দর বর্ণনা আছে যে শিবকে পতিরূপে পাওয়ার জন্য পার্বতী শিবের তপস্যা করেছেন। তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে শিব বিচিত্র সাজে সেজে একটা বলদের পিঠে চেপে পার্বতীকে বিয়ে করতে আসছেন। শিবের সারা অঙ্গে ভস্ম মাখা, মাথায় সাপ। তিনি আবার ইন্দ্রাদি সব দেবতাদের তাঁর সঙ্গী হতে আমন্ত্রণ করেছেন। ইন্দ্র বলছেন, আপনি আগে আগে যান আমরা আপনার পেছনে পেছনে আসছি। আসলে দেবতারা শিবের সঙ্গে যেতে চাইছেন না। শিব দেবতাদের মনের ভাব বুঝে গেছেন। সেইজন্য যত ভূত-প্রেতদের সঙ্গে নিয়ে চলেছেন। ভূত-প্রেতগুলোর আবার কারুর হাত নেই, কারুর পা নেই, কারুর মুণ্ডু নেই। তুলসীদাস শিবের বরযাত্রীদের খুব সুন্দর বর্ণনা দিয়ে বলছেন বর যে রকম তাঁর বরযাত্রীরাও সেই রকম। বরযাত্রীদের নিয়ে শিব যখন নগরে ঢুকেছেন তখন সব নরনারীরা বেরিয়ে এসেছেন বরযাত্রী দেখতে। ওই রকম ভূত-প্রেত দেখে বাচ্চাগুলো চিৎকার করে ভয়ে বাড়ির ভেতরে ঢুকে গেছে। ইতিমধ্যে মেয়েরা দৌড়ে গিয়ে পার্বতীর মা মেনকাকে সব খবর দিয়েছে। শিবের বিচিত্র বর্ণনা শুনে তো মেনকা খুব ভেঙে পড়েছেন। দৌড়ে দেখতে এসেছেন সত্যিই কার হাতে আমার পার্বতীকে দিচ্ছি। বর দেখে হতাশ হয়ে গেছে, এই রকম একটা লোকের হাতে আমার মেয়েকে দেব! তখন তিনি খুব হা হুতাশ করছেন, কান্নাকাটি করছেন আর নারদকে খুব করে গালাগাল দিচ্ছেন। তখন দেবতারা এসে মেনকাকে খুব করে বুঝিয়েছেন যে, শিব শিবই, ওনার সঙ্গে কারুর তুলনা করা যায় না, তিনি সম্পূর্ণ আলাদা। শিবও সব বুঝতে পেরেছেন। তখন তিনি মা মেনকার সামনে গিয়ে একটা মিষ্টি হাসি দিয়ে মেনকাকে নিজের স্বরূপটা দেখিয়ে দিয়েছেন। শিবের স্বরূপ দেখার পর এমন অবস্থা হয়ে গেল যে, এবার মেয়েকে সরিয়ে দিয়ে মেনকা নিজেই পারলে শিবকে বিয়ে করে নেন। আসলে শিব বলুন, শ্রীকৃষ্ণই বলুন এনারাই আমাদের স্বরূপ, মানুষ নিজের স্বরূপকেই ভালোবাসে। এই জিনিষটাই একটা কাহিনীর মধ্যে দেখানো হচ্ছে, ওই স্বরূপ দেখার পর মেয়েকে সরিয়ে দিয়ে মা নিজেই শিবকে বিয়ে করতে চাইছেন। ঠিক এই কথাই গোপীরা শ্রীকৃষ্ণকে উদ্দেশ্য করে বলছেন, ত্রিভুবনে এমন কোন মেয়ে আছে যে তোমার এই রূপ দেখে তার চরিত্র থেকে সরে যাবে না। এর আগে গোপীরা বলে দিয়েছেন, তোমাকে ভালোবাসাটাই ঠিক ঠিক চরিত্র। এখানে কিন্তু জাগতিক অর্থে চরিত্রের কথা বলা হচ্ছে। চরিত্র মানে নিজের স্বামীকে না ছাড়া বা পরপুরুষের দিকে দৃষ্টি না দেওয়া। গোপীদের বক্তব্য হল, কারুর ক্ষমতা নেই যে তোমাকে দেখে সে নিজের চরিত্রকে ধরে রাখবে। শুধু কি নারীরাই চরিত্র থেকে সরে যাবে? তা নয়, ব্রজে যত পাখি আছে, যত পশু

আছে, গরু আছে, যত গাছপালা আছে এরাই তোমাকে দেখে রোমাঞ্চিত হয়ে যাচ্ছে। সেখানে আমাদের কথা আর বলার কি বাকি থাকে!

একমাত্র ভগবানই জীবের সব দুঃখ, ভয় হরণ করেন

এরপরে আরও খুব মজার কথা বলছেন। ***ব্যক্তং ভবান্ ব্রজভয়ার্তিহরোঽভিজাতো দেবো যথাঽঽদিপুরুষঃ সুরলোকগোপ্তা। তন্নো নিধেহি করপঙ্কজমার্তবন্ধো তপ্তস্তনেষু চ শিরঃসু চ কিঙ্করীণাম্।। ১০/২৯/৪১।*** গোপীরা এতক্ষণ ধরে যা কিছু বলে এসেছেন তারই মূল বক্তব্য একটি শ্লোকে রাখছেন। গোপীরা বলছেন 'আমরা শুনেছি ব্রজভূমির সকল দুঃখ, সকল ভয় হরণ করার জন্যই তোমার জন্ম হয়েছে। যারা দীন-দুখী, যারা খুব কষ্টে আছে তাদের সব দুঃখ কষ্ট হরণ করার জন্যই যদি তুমি জন্ম নিয়ে থাক তাহলে তোমাকে আমরা বলতে পারি যে, আমরাও তো সেই রকম দীন-দুখী, আর্ত তাহলে আমাদের উপর তোমার কেন কৃপা হবে না'। এখানে গোপীরা যে যুক্তিগুলো নিয়ে আসছেন এগুলো আমাদের খুব ভালো করে বোঝা দরকার।

ছাপরাতে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন স্থাপিত হওয়ার পর সেখানে সরকারের একটা ডিপার্টমেন্ট থেকে যখন তখন এমনকি মাঝ রাতে মঠের জমির ভেতর দিয়ে গাড়ি নিয়ে যাতায়াত করতে শুরু করে। পরে যখন মঠের তরফ থেকে আপত্তি করা শুরু হল তখন তারা একটা লম্বা চিঠি দিল। তাদের বক্তব্য হচ্ছে আপনারা তো স্বামীজীর আদর্শকে সামনে রেখে চলছেন। স্বামীজীর আদর্শ হল সেবার আদর্শ, গরীব দুঃখীদের সেবা করা। আমরাও তো বিভিন্ন কাজের জন্য, বন্যা ত্রাণের কাজের জন্য, সাধারণ মানুষের সেবার জন্যই আপনাদের জমি ব্যবহার করছি। তাহলে আপনারা কেন আপনাদের জমিটা রাত্রে ব্যবহার করতে দেবেন না, ইত্যাদি। পরে ওখানকার অধ্যক্ষ তাদের খুব ভদ্র ভাবে কিছু কথা বলার পর ব্যাপারটা বুঝতে পারল। এই ধরণের যুক্তিকে আমরা অনেক সময় নিজের খেয়াল খুশির মত যেখানে সেখানে ব্যবহার করে ফেলি। সাধুদের অনেক সময় এসে বলে 'আপনার জীবন তো ত্যাগের জীবন, আপনি কেন গাড়ি করে যাবেন, পায়ে হেঁটে কেন যাবেন না? আপনার জীবন তো ত্যাগের জন্য, আপনি কেন ভালো দামী জিনিষ ব্যবহার করবেন, ভালো জিনিষ কেন খাবেন'? এখানে গোপীরা কিন্তু এই ধরণের বোকা বোকা যুক্তি দিচ্ছেন না, ওনার সাধারণ মানুষকে বোঝানোর জন্য এই যুক্তি গুলো নিয়ে আসছেন।

ঠাকুর বিয়ের কিছু দিন পর কামারপুকুরের কাছে শ্যামবাজারে যাওয়ার পর সেখানকার যে বর্ণনা পাওয়া যায় তাতে দেখানো হচ্ছে যে, ঠাকুরের আসার পর সেখানে আনন্দের হাট বসে গেছে। আর সারা দিন ধরে শুধু কীর্তন চলছে। ঠাকুরের একবার ইচ্ছে হল দেখি চৈতন্য মহাপ্রভুর কী রকম আকর্ষণ ছিল। এখানে অবশ্য ঠাকুর গোপীদের কথা বলছেন না। সেখানে সারাদিন কীর্তন চলছে আর ঠাকুরের মুহুর্মুহু সমাধি। গ্রামের লোকেরা জানে না সমাধি কাকে বলে। দূর দূর গ্রামে ছড়িয়ে গেছে যে একজন মানুষ এসেছে যে সারাদিনে একুশবার করে মরে আবার একুশবার করে বেঁচে ওঠে। তাই শুনে চারিদিকের সব গ্রামের লোকেরা কাতারে কাতারে এসে জড়ো হয়েছে। বাড়িতে, উঠানে, গাছে সর্বত্র শুধু লোক আর লোক। রাত্রিবেলা বাড়ির উঠানে মেয়েরা শুয়ে আছে। রাত্রিবেলা ঠাকুর প্রস্বাবে যাবেন। কোথায় যাবেন! মেয়েগুলো বলছে তোমাকে কোথাও যেতে হবে না, এখানেই কর। এই আকর্ষণের কথাই বলা হচ্ছে। এমন আকর্ষণ যে প্রস্বাব করার জন্যও তাঁকে ছাড়ছেন না। ঠাকুর তখন রেগে গেলেন। হৃদয়রামকে বলছেন 'ওরে হৃদু! এক্ষুণি এদের বল চলে যেতে, তা নাহলে এখনই কাপড় খুলে এদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে যাবো'। পরে হৃদয়রাম কোন রকমে ঠাকুরকে নিয়ে সেখান থেকে পালিয়ে এলেন। পরে অবশ্য ঠাকুর প্রার্থনা করে বলছেন 'মা! তুমি এই আকর্ষণকে সম্বরণ কর। এই রূপকে তুমি ভেতরে ঢুকিয়ে দাও'।

দেবো যথাঽঽদিপুরুষঃ সুরলোকগোপ্তা, স্বর্গে যখনই অসুরদের নিয়ে দেবতাদের কোন সমস্যা হয় তখন যেমন ভগবান আদিপুরুষ সুরলোকে গিয়ে সেই সমস্যার মধ্যে ঢুকে গিয়ে অসুরদের দমন করেন, ঠিক সেই ভাবে তুমি জন্ম নিয়ে এই ব্রজভূমির সব রকম ভয়, সব দুঃখ হরণ কর। আমরাও অতি দুখিনী নারী আর *তপ্তস্তনেষু চ শিরঃসু*, আমাদের বক্ষে, আমাদের মস্তকে তোমার বিরহে আগুন জ্বলছে, তোমার করকমল স্পর্শ

দ্বারা আমাদের বক্ষ ও মস্তককে তুমি শীতল করে দাও। তোমার আলিঙ্গন আর চুম্বন ছাড়া তোমার এই দাসীদের হৃদয়জ্বালা শান্ত হবার অন্য কোন পথ নেই।

শ্রীকৃষ্ণকে কেন '*যোগেশ্বরেশ্বরঃ*' বলা হয়

শ্রীকৃষ্ণ দেখে নিলেন গোপীদের আর কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই, তাঁরা সম্পূর্ণ ভাবে তাঁর শরণাপন্ন। তাঁদের এই শরণাগতি নিয়ে আর কোন সংশয় নেই। শুকদেব তখন বলছেন ***ইতি বিক্লবিতং তাসাং শ্রুত্বা যোগেশ্বরেশ্বরঃ। প্রহস্য সদয়ং গোপীরাত্মারামোহপ্যরীরমৎ।।*** ১০/২৯/৪২। শুকদেব শ্রীকৃষ্ণকে বারবার যোগীশ্বরের ঈশ্বর বলে সম্বোধন করছেন। যোগের সংজ্ঞা হল *চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ, চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ* এর অর্থ হল মনে অনবরত যত রকম ভাব ও চিন্তন উঠছে, সমস্ত ভাব ও চিন্তনের প্রবাহকে থামিয়ে দিয়ে মনকে পুরোপুরি শান্ত করে দেওয়া। যোগী তিনিই যাঁর মন পুরোপুরি শান্ত। তাহলে যোগীশ্বরের অর্থ কি হবে? যাঁর মন স্বাভাবিক রূপে শান্ত। আমাদের সবাইকে চেষ্টা করে মন শান্ত করতে হয়। আমি, আপনি চেষ্টা করে সৎ হব, কিন্তু স্বামীজীর মত লোক সত্যে প্রতিষ্ঠিত। স্বামীজীকে যদি অসৎ হতে হয় তাঁকে চেষ্টা করে অসৎ হতে হবে। ঠিক তেমনি যোগেশ্বর হলেন, যাঁর স্বাভাবিক অবস্থাই হল নির্বিকল্প সমাধি। মনের মধ্যে যে চাঞ্চল্যতা, সেটা তাঁকে চেষ্টা করে সৃষ্টি করতে হয়। শ্রীকৃষ্ণ হলেন যোগেশ্বরেরও ঈশ্বর। কিন্তু এখানে যে *যোগেশ্বরেশ্বরঃ* বলছেন, এর ঠিক ঠিক কোন অর্থ হয় না। কিন্তু যেহেতু ভাগবত এই শব্দ নিয়ে এসেছে সেইহেতু এর একটা অর্থ বার করা যায়। ভাগবত হল বিষ্ণুপুরাণ, সেইজন্য এখানে বিষ্ণুকে ভগবান রূপে দেখান হচ্ছে। এখানে শিব হলেন – যখন মায়ার আবরণের মধ্য দিয়ে সচ্চিদানন্দকে দেখা হচ্ছে তখন সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের ব্যাপারটা চলে আসছে। সেখানে লয়ের ব্যাপারের সঙ্গে যিনি জড়িয়ে আছেন তাঁকে শিব বলছেন। আর শ্রীকৃষ্ণকে সব সময় যুক্ত করা হচ্ছে নির্বিকার নির্বিকল্পের সাথে। নির্বিকার নির্বিকল্পের সাথে যাঁকে যুক্ত করা হয়েছে তাঁকেই বলা হচ্ছে *যোগেশ্বরেশ্বরঃ*, মানে যোগেশ্বরেরও ঈশ্বর। এই অর্থেই বলা হচ্ছে যে, সেখানে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করতে চাইলেও সৃষ্টি করা যাবে না। এইভাবে শাস্ত্রে কোথাও বলছে না ঠিকই কিন্তু *যোগেশ্বরেশ্বরঃ* এর অর্থ বার করতে হলে এভাবে অর্থ বার করা ছাড়া রাস্তা নেই। যোগ হল সাধারণ লোকেদের, যেখানে তারা চেষ্টা করে মনকে শান্ত করছেন, যোগেশ্বর যিনি তাঁর মন স্বাভাবিক ভাবেই শান্ত, তাঁকে চেষ্টা করে মনকে শান্ত করতে হয় না, কিন্তু তিনি চাইলে মনের মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে কিছু কাজকর্ম করে দিতে পারেন। আর যিনি সচ্চিদানন্দ, যিনি সাক্ষাৎ নিরাকার তাঁর চাঞ্চল্যটাও হয় না। যিনি অনন্ত তাঁর আবার চাঞ্চল্য কোথা থেকে আসবে! এই অর্থে যোগেশ্বরেরও ঈশ্বর বলছে। এখানে বলছেন চার কুমার সনক, সনন্দন, সনৎ ও সনাতন, এঁদের মত প্রসিদ্ধ যোগীশ্বরদেরও ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ। আবার দেবাদিদেব মহাদেবকেও বলা হয় যোগীশ্বর, শ্রীকৃষ্ণ তাঁরও ঈশ্বর। সেই শ্রীকৃষ্ণ যখন গোপাঙ্গনাদের এই ব্যাথিত, ব্যাকুল আর্তিভরা আকুতি শুনলেন তখন তাঁরও হৃদয় করুণা রসে আপ্লুত হয়ে গেল। শুকদেব খুব সুন্দর বর্ণনা করছেন – *প্রহস্য সদয়ং গোপীরাত্মারামোহপ্যরীরমৎ* ভগবান হলেন আত্মারাম। রাম শব্দের অর্থ বেশীর ভাগ সময় হয় রমণ, রমণ মানে মনটা যেখানে বাস করছে। আত্মারাম মানে যিনি নিজের আত্মার সাথেই রমণ করেন। আত্মারাম ভগবানেরই নাম। যোগীদের মধ্যে যাঁরা নির্বিকল্প অবস্থা লাভ করেন তাঁদেরও আত্মারাম বলা হয়।

সুখ ও আনন্দের সূক্ষ্ম তফাৎ

এখানে একটা কথা জেনে রাখা দরকার, সেই এ্যমিবা থেকে শুরু করে যিনি শ্রেষ্ঠতম পুরুষ যেমন বুদ্ধ, যিশু যত প্রাণী আছে তাদের সবার জীবনে একটা সাধারণ জিনিষ হল সবাই সুখ চায়, আনন্দ চায়। সুখকে যখন ইংরাজী অনুবাদ করা হয় তখন বলা হয় pleasure আর আনন্দের যখন অনুবাদ হয় তখন তাকে বলছি joy। আনন্দ আর সুখের মধ্যে পার্থক্য আছে। যে প্রাণী যত নীচু স্তরে তার আনন্দ নির্ভর করে একমাত্র তার অস্তিত্বের উপর, বেঁচে আছে তাতেই তার আনন্দ। যদি সে নিজের জীবন বিপন্ন মনে করে সে সেখান থেকে প্রাণপনে পালিয়ে যেতে চাইবে। ওদের মস্তিষ্ক এতই অনুন্নত যে নিজের খাদ্য ছাড়া অন্য কিছু বোঝে না। এ্যমিবা অবস্থায় সে তার নিজের খাদ্যটাই বোঝে, খাদ্যের বাইরে আর কিছু বোঝে না। আর ওকে

যখন বিভাজন করে দেওয়া হচ্ছে তখন নিউক্লিয়াস থেকে দুটো হয়ে যাচ্ছে, তাই এ্যমিবারা মেটিংটাও জানে না। এ্যমিবা থেকে একটু উপরে আসার পর তারা আহার আর মৈথুন ছাড়া কিছু জানে না। কোন রকমে তাকে বেঁচে থাকতে হবে। নিজের জীবনের উপর যখন আক্রমণের ভয় এসে পড়ে তখন হয় লড়াই আর তা নাহলে পালানো এই দুটোও এসে যায়। এর থেকে আরও উপরে স্তরে আসার পর, যেমন কুকুর বেড়ালে চলে আসার পর তার মধ্যে সুখের অনুভূতি এসে যায়। পশু স্তরে সুখটা বেশী গুরুত্ব পেয়ে যায় আর অস্তিত্বের ব্যাপারটা একটু নীচে চলে আসে। একটা কুকুরকে যদি ভালো মাংস খাওয়ানো হয় সে তখন এমন আনন্দে খায় যে ওর গলার আওয়াজটাই অন্য রকম হয়ে যায়। বেড়াল যদি গরম বিছানা পেয়ে যায় সেও তখন সুখে মুখ দিয়ে গরর্ গরর্ আওয়াজ করতে থাকে। আরও উচ্চ যোনিতে যৌন মিলনে যে আনন্দ হয় সেই আনন্দটাও তার নিম্ন স্তরে অনুভব করতে পারে না, সেখানে অস্তিত্ব রাখাটাই তার কাছে সব কিছু। মানুষের মধ্যে যারা অত্যন্ত নিম্ন স্তরের তারাও ইন্দ্রিয়ের সুখ ছাড়া কিছু বোঝে না। এখানে ইন্দ্রিয় সুখ মানে সব কিছুই, দামী পোশাক, টাকা-পয়সা, গাড়ি, বাড়ি সবটাই ইন্দ্রিয় সুখের মধ্যে পড়ে।

কোন মানুষের মানসিকতা কোন স্তরে রয়েছে যদি জানতে হয়ে তাহলে দেখতে হবে সে কোন জিনিষ থেকে বেশী সুখ পাচ্ছে। যদি দেখা যায় তার খাওয়া-দাওয়াতে অনেক আয়োজন আছে, কাপড়-জামার প্রতি আসক্তি আছে, গয়নাগাটির প্রতি প্রচুর আসক্তি আছে তখন বুঝতে হবে তার মানসিক স্তর এখনও অনেক নীচে। আমরা কখন কি তাকে পাল্টাতে পারবো? কখনই পারা যাবে না, আর পাল্টানোর কোন দরকারও নেই। বিবর্তনের স্কেলে এরা এখন অনেক পেছনে আছে, এই স্কেলে এদের এগুলো দরকার। সামাজিক অনুষ্ঠানে সবাই যখন এক জায়গায় জড়ো হয়, সেখানে কান পাতলেই শুনতে পাবেন বেশীর ভাগ লোক খাওয়া-দাওয়া, রান্নার গল্প, পোশাক-আশাকের গল্পই করে যাচ্ছে। ইন্দ্রিয় সুখের বাইরে অন্য কিছু চিন্তাই এরা করতে পারে না। মানুষের স্তরে এরা হল সব থেকে নিম্ন স্তরের। মানুষ ছাড়া প্রত্যেক প্রজাতির স্বভাব এক রকম হয়, একমাত্র মানুষ প্রজাতিতে প্রত্যেকের স্বভাব আলাদা আলাদা হয়ে যায়। কিছু মানুষ আছে যারা একমাত্র ইন্দ্রিয় জগতেই বিচরণ করে, আর তারা যে সুখ অনুভব করে সেটা সাংঘাতিক, কল্পনাই করা যায় না। এদের উপরের স্তরে আছে যারা সংস্কৃতির জগতকে নিয়ে থাকে। সংস্কৃতি মানে সংস্কার করা হয়েছে, অর্থাৎ পরিষ্কার করা। যারা যে কোন একটা সংস্কৃতিকে নিয়ে থাকে, যেখানে শারীরিক ও মানসিক দুই ধরণের শ্রম রয়েছে। যেমন একটা বাড়ি আর তাজমহল, বাড়ি যে কোন লোক বানিয়ে নিতে পারে কিন্তু তাজমহল সৃষ্টির জন্য দরকার একটা উচ্চ সংস্কৃতি। অনেক প্রজন্ম ধরে একটা জিনিষকে ঘষে মেজে নিখুঁত করার চেষ্টা হয়ে হয়ে তাজমহলের মত একটা জিনিষ দাঁড় করান হয়েছে। এই সংস্কারের লেভেলে খুব কম লোক থাকতে পারে। যার জন্য দেখা যায় সবাই হিন্দী ভাষা আয়ত্ত করে নিতে পারে কিন্তু সংস্কৃত ভাষা শিখতে গিয়ে তাদের প্রাণ বেরিয়ে যায়। কারণ সংস্কৃত ভাষা একটা পরিশুদ্ধ ভাষা। এই সংস্কৃতিকে নিয়ে যখন কেউ খাটাখাটনি করছে তখন বুঝতে হবে তার সুখের স্তরটা ভেতরের দিকে চলে যেতে শুরু করেছে। কিন্তু এই সুখটাও বহির্জগতের কিছু কিছু বিষয়ের উপর অতিরিক্ত মাত্রায় নির্ভর করে থাকে।

এর উপরের স্তরে আসে ধর্ম। ধর্মও এক ধরণের সংস্কৃতি বলা যায়। রোজ সকালে মন্দিরে যাচ্ছে, গঙ্গা স্নান করছে, পূজো করছে, রোজ গীতা পাঠ করছে। এগুলো অনেক বছর ধরে যখন করে যাচ্ছে তখন এখানেও একটা জিনিষকে অনেক দিন ধরে সংস্কার করতে করতে এই জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে, এটাও সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতি যার মধ্যে এসে গেছে সে তো অনেক উচ্চস্তরে চলে গেছে। একজন মুসলমান তিরিশ চল্লিশ বছর ধরে দিনে পাঁচ বার করে নমাজ পড়ে যাচ্ছে, সে তো মহৎ হয়ে গেছে। ধর্মের সংস্কৃতি থেকে যারা আনন্দ বা সুখ পাচ্ছে, যার অভাবে তার মন ভেঙে পড়ে, তখন বুঝতে হবে এরা অনেক উপরে চলে গেছে। কিন্তু আধ্যাত্মিক পুরুষ যাঁরা তাঁরা আর কোন কিছুর অপেক্ষা রাখেন না। আধ্যাত্মিক সম্পন্ন ব্যক্তিত্ববান পুরুষ পুরোপুরি সচেতন হয়ে গেছেন যে ঈশ্বরই আছেন, আর তাঁর রমণ, তাঁর আনন্দ সবটাই নিজেকে নিয়েই।

যারা সংস্কৃতবান পুরুষ তাদের কাছে সুখ আসে তার সংস্কৃতি থেকে। যেমন একজন শিল্পী একটা ভালো ছবি আঁকার পর খুব আনন্দ পায়, ছবির প্রশংসা শুনে একটা তৃপ্তি বোধ হবে। যে ধর্মে চলে এসেছে সে কাউকে দেখাতেও যাবে না। একজন ধার্মিক পুরুষ কখনই বলবেন না যে আমি ভালো পূজো করি তোমার এসে দেখে যেও। পূজোটাও তাঁর কাছে একটা শিল্পের পর্যায়ে চলে গেছে। পূজো আদি এগুলো খুব উচ্চ স্তরের কলা, কাউকে দেখাতেও যাবেন না। কিন্তু যখন আধ্যাত্মিকতায় চলে আসে, ঈশ্বরই আছেন এই বোধ যখন এসে গেল তখন কোন কিছুরই আর অবলম্বনের দরকার হয় না। এখন সে নিজেকে আর নিজের ইষ্ট এই দুটোকে নিয়েই আছে। এর উপরে আসে আত্মারাম, আত্মারাম হল যেখানে আমি বোধটাই পুরোপুরি চলে গেছে। আত্মারামে আমি বোধ নেই, কারণ আমি বোধ থাকলেই তুমি বোধও থাকবে। আমি-তুমি বোধ থাকলে আত্মারামও হবে না। আত্মারাম মানেই ঈশ্বর আর আমি এক। কিন্তু এটাও সাধকের একটা অবস্থা, সাধকের যে নির্বিকল্প অবস্থা সেটাই আত্মারাম।

আত্মারামের বৈশিষ্ট্য

কিন্তু যিনি সচ্চিদানন্দ, তিনি তো চির আত্মারাম। উনি ছাড়া তো অন্য কিছু নেই, উনি যে চিন্তা ভাবনা করে বলবেন যে আর কেউ নেই, সেই অবস্থাটাও নেই। সেইজন্য শ্রীকৃষ্ণ হলেন চির আত্মারাম। সাধারণ মানুষকে মুক্তির কথা বললে তারা মনে করে মুক্তি হলে অনন্ত কালের জন্য আমি একা হয়ে যাব। তোমার জীবনের উদ্দেশ্য হল আনন্দ পাওয়া, ওই আনন্দ কীভাবে তুমি পেতে পারো সেটা দেখো। জগতের সবাই একদিন আমাকে ছেড়ে চলে যাবে, সবাই একদিন আমাকে ধোকা দেবে কিন্তু ভগবান কোন দিন আমাকে ছেড়ে যাবেন না, তিনি কখন আমাদের ধোকা দেবেন না। যতক্ষণ আমরা ইন্দ্রিয় জগতে আছি ততক্ষণ আনন্দটা আমরা বাইরের বস্তুকে অবলম্বন করে পাচ্ছি। কিন্তু আত্মারামে চলে গেলে তখন কোন কিছুর অপেক্ষা থাকবে না। তখন চোখ খোলাই থাকুক আর চোখ বন্ধই থাকুক আপনি নিজের জগতে হারিয়ে আছেন। কোথায় কি হচ্ছে, কে কি করছে তাতে আপনার কিছু যায় আসে না। কিন্তু যখন নির্বিকল্পের অবস্থায় চলে আসছেন তখন আপনার শরীরও যদি খসে পড়ে যায় তাতেও আপনি গ্রাহ্য করবেন না। আর নির্বিকল্প থেকে নেমে যদি সবিকল্প অবস্থাতেও চলে আসেন তখনও তিনি ভগবানকেই ধরে থাকেন, তাঁর আনন্দকে ধরে রাখার জন্য বাইরের ইন্দ্রিয় জগতের কোন কিছুরই দরকার পড়ে না। কথামৃতে আছে ঠাকুর নরেন রাখালের জন্য ভেবে আকুল হচ্ছেন দেখে অনেকে বলছেন আপনি একটা কায়েতের ছেলের জন্য ভেবে এত অস্থির কেন হচ্ছেন! ঠাকুর তখন বলছে – ওরা হল শুদ্ধ আধার, ওদের উপর আমি মনটা নামিয়ে রাখি। এই দেখ আমি ওদের উপর থেকে মনকে তুলে নিচ্ছি। যেমনি বলছেন আমি ওদের উপর থেকে মনকে সরিয়ে নিচ্ছি তখন দেখা যাচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে তিনি নির্বিকল্প সমাধিতে চলে যাচ্ছেন, চুল দাড়ি, লোম সব সজারুর কাঁটার মত সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। দেখাচ্ছেন ঠাকুর এমনই আত্মারাম যে কারুর অপেক্ষা তার লাগে না। নরেন রাখালকে অবলম্বন করে তিনি মনকে জগতে নামিয়ে এনেছেন। কয়েকজন যে শুদ্ধ আধার ঠাকুরের কাছে থাকতেন, এনারা না থাকলে ঠাকুর থাকতেই পারতেন না, অনেক আগেই তাঁর শরীর চলে যেত। কুঠির উপর দাঁড়িয়ে ঠাকুর চিৎকার করে অন্তরঙ্গদের ডাকছেন ওরে তোরা কে কোথায় আছিস আয়, বিষয়ী লোকদের সাথে কথা বলে বলে আমি হাঁফিয়ে উঠছি। ঠাকুর শুদ্ধ সত্ত্ব ভক্ত ছাড়া থাকতে পারছেন না। ওনার নিজের জন্য দরকার নেই ঠিকই, কিন্তু জগতের কল্যাণের জন্য অবতারকে এই দেহটা রক্ষা করার জন্য দরকার আছে।

ইংরাজীতে দুটো শব্দ আছে, একটা হল Comfort Level আরেকটা Support System। স্ত্রী হল স্বামীর Support System, শুধু যে রান্নাবান্না করে দেখাশোনা করছে তা নয়, স্ত্রীর সঙ্গে সুখ-দুঃখের কথা, প্রাণের কথা বলছে। নিজের সন্তানদের সাথে মেলামেশা করে সুখ পাওয়ার পর হাল্কা বোধ করছে। এগুলো সবই Suppor System। Suppor Systemএর আরও উপরে আসে Comfort Level। যেমন একজন সন্ন্যাসী তিনি কিছু লোকের সাথে কথা বলে তৃপ্তি পাচ্ছেন, আবার যখন কোন কাজ থাকে না তখন শাস্ত্র পাঠ করে একটা শান্তি পাচ্ছেন। ঠাকুরেরও শান্তি নরেন রাখালাদির মত শুদ্ধ আধার থেকে আসছে। কিন্তু তাতে একটু তফাৎ আছে। সন্ন্যাসীর কাছ থেকে যদি সব কাজকর্ম, শাস্ত্র পাঠ, জপ-ধ্যান সরিয়ে দেওয়া হয় তাহলে

তাঁর মাথাটা খারাপ হয়ে যাবে। সারাটা দিন সময় কাটানো তাঁর পক্ষে সমস্যা হয়ে যাবে। সন্ন্যাসীরও অবলম্বন দরকার। ঠাকুরেরও অবলম্বন দরকার হচ্ছে। নরেন অনেক দিন দক্ষিণেশ্বরে আসেনি, তিনি দৌড়ে কলকাতায় ভক্তদের বাড়ি গিয়ে নরেনকে খবর পাঠাচ্ছেন, আমি এসেছি। কিন্তু তফাৎটা হল সন্ন্যাসী যদি Support System না পায় সন্ন্যাসীর মাথাটা খারাপ হয়ে যায়। ঠাকুরের ক্ষেত্রে যদি তাঁর Support Systemকে সরিয়ে নেওয়া হয় তাহলে তিনি নির্বিকল্প সমাধিতে চলে যাবেন। এটাই আত্মারামের প্রধান বৈশিষ্ট্য। বড় গ্যাস বেলুনকে যেমন একটা শক্তপোক্ত কিছুর সঙ্গে বেঁধে না রাখলে উড়ে যাবে, ঠিক তেমনি আত্মারাম হলেন বড় গ্যাস বেলুন। আমাদের রমণ সাংসারিক বিষয়কে নিয়েই হয়। যখন খুব উচ্চ কোন বিষয়ে চিন্তা করছি সেটাও জাগতিক চিন্তা। শুধু ঈশ্বর চিন্তা নিয়ে আছেন তখনও কিন্তু আত্মারাম অবস্থায় যাচ্ছেন না। কিন্তু ভক্তির যে শেষ কথা, ঈশ্বরের সঙ্গে তিনি এক হয়ে গেলেন, তখন তাঁর বাহ্য কোন কিছুর দরকার পড়ে না। খাওয়া-পড়ারও দরকার পড়ে না। অদ্বৈত সাধনা করার সময় ঠাকুরের মন হুহু করে নির্বিকল্প সমাধিতে চলে গেছে, ওই অবস্থায় ঠাকুরের ছ মাস কোন হুঁশ ছিল না। তখন কোন রকমে মাথায় আলতো করে মেরে মেরে মুখটা খুলিয়ে তাতে একটু করে দুধ ঢেলে দেওয়া হত। তা নাহলে শরীরই থাকতো না। শরীর আর উচ্চ চিন্তনে কোন সম্পর্ক নেই। আপনি ঈশ্বর চিন্তন করে করে খুব উচ্চস্তরে চলে যেতে পারেন কিন্তু তার জন্য আপনার শরীর ভালো থাকবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। শরীর শরীরের ধর্মানুসারে চলে, এর সাথে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের কোন সম্পর্ক নেই। আত্মারামের শরীরের প্রতিও কোন হুঁশ থাকে না। খাচ্ছেন কি খাচ্ছেন না, কোথায় পড়ে আছেন তিনি নিজেও জানেন না। ঠাকুর পরের দিকে বলছেন তখন হৃদু যদি না থাকতো তাহলে এই শরীর থাকতো না।

কিন্তু ভগবানের আত্মারাম ছাড়া অন্য কোন অবস্থাই থাকে না। তাঁর আনন্দের জন্য অন্য কিছুর অপেক্ষা থাকে না। কারণ তিনিই আছেন, তিনি ছাড়া তো আর কিছু নেই। গৃহীরা ভাবে সন্ন্যাসীরা একা একা থাকে কী করে, আবার সন্ন্যাসী ভাবে গৃহীরা এত লোকের সঙ্গে থাকে কী করে! এখানে যার যেমন মানসিকতা তৈরী হয়ে গেছে সে সেই অনুসারে চলছে। কিন্তু ভগবান যিনি তাঁর এসবেরও কোন দরকার হয় না। উপনিষদে বলছে, আমি একা আমি বহু হব। তিনি তো বহু হবেন, কিন্তু তিনিই তো আছেন। তাই তিনি নিজেই সব কিছু হয়ে যান। শ্রীকৃষ্ণকে গোপীরা আত্মারাম এই কারণেই বলছেন। তাঁর আনন্দ অতি উচ্চমানের, এই আনন্দের আমরা কল্পনাই করতে পারি না। হাজার টাকা খরচ করে, সময় নষ্ট করে কত দূর থেকে কষ্ট করে যিনি শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে আসছেন, তাঁর বাড়ির লোকেরা কি বোঝেন শাস্ত্র পড়ে তাঁর কী আনন্দ হচ্ছে! বাড়ির লোকেরাই বুঝতে পারছে না। আর রাস্তার ডাস্টবিনের পাশে যে কুকুরটা বসে আছে সে কি বুঝতে পারছে শাস্ত্র অধ্যয়ন করে, রাসলীলার কথা শুনে আপনাদের সবার মধ্যে কি আনন্দের অনুভূতি হচ্ছে! ঠিক তেমনি আমি আপনি কখনই ধারণা করতে পারবো না যিনি নির্বিকল্প সমাধিতে আছেন, যিনি সিদ্ধ পুরুষ বা যিনি অবতার তাঁর আনন্দের স্তরটা কোন উচ্চ পর্যায়ের! শুকদেব বলছেন শ্রীকৃষ্ণ আত্মারাম কিন্তু তাও তিনি গোপীদের সঙ্গে লীলা করতে শুরু করলেন।

গোপীদের মনের ইচ্ছানুযায়ী আত্মারামের আত্মক্রীড়া

যখন ভক্তির কথা আসে তখন বলা হয় *স আত্মারামো ভবতি*, তখন আনন্দ রসকে আস্বাদনের জন্য তাঁকে আর বাইরের কোন বস্তুর অবলম্বনের প্রয়োজন হয় না, নিজের আত্মার আনন্দেই বিভোর হয়ে থাকেন। ভগবান হলেন চির আত্মারাম, কিন্তু সেই আত্মারাম গোপনারীদের করুণ আর্তিযুক্ত বাণী শ্রবণ পর তিনিও বললেন 'আমি তোমাদের সাথে আজ ক্রীড়া করব'। ভগবান যে এখানে ক্রীড়া করবেন সেটা তাঁর নিজের কোন আনন্দের জন্য নয়, কারণ তিনিতো আত্মারাম, *আপ্তকামস্য কা স্পৃহা*, যিনি পূর্ণকাম তাঁর আবার কিসের স্পৃহা!

এই কথা বলার পরেই ব্যাসদেব বলছেন তখন ভগবান কী করলেন? ***তাভিঃ সমেতভিরুদারচেষ্টিতঃ প্রিয়েক্ষণোৎফুল্লমুখীভিরচ্যুতঃ। উদারহাসদ্বিজকুন্দদীধিতির্ব্যরোচতৈণাঙ্ক ইবোডুভির্বৃতঃ।।*** *১০/২৯/৪৩।* ভগবান তাঁর হাসি, তাঁর আচরণ-ভাবভঙ্গী সব গোপীদের মত করে দিলেন। এখানে এই অর্থও করা যেতে পারে, তিনি সব কিছু গোপীদের মনের ইচ্ছার অনুকূল করে দিলেন। গোপীদের মনের মত করে দিতেই,

গোপীদের যে মুখমণ্ডল দুঃখে, বিরহে শুষ্ক বিষন্ন দেখাচ্ছিল, সঙ্গে সঙ্গে গোপীদের মুখগুলি আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। শত শত গোপবনিতাদের মধ্যে ভগবান এখন যূথপতিরূপে বিরাজ করছেন, গোপাঙ্গনরা সুস্বরে ভগবানেরই কীর্তিগাথা গান করছেন, আবার তিনিও গানের মাধ্যমে গোপীদের প্রেমমাহাত্ম্য বর্ণনা করছেন, গলায় তাঁর শোভিত বনমালা। এইভাবে বনভূমির শোভা বর্ধণ করে গোপললনাদের সাথে নানান রকমের ক্রীড়া করে চলেছেন।

'অচ্যুত' নামের ব্যাখ্যা

শুকদেব এখানে বলছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হলেন অচ্যুত। অচ্যুত মানে, যিনি নিজের অবস্থা থেকে কখন চ্যুত হন না। কোন্ অবস্থা থেকে চ্যুত হন না? আত্মারামের অবস্থা থেকে। যাই হয়ে যাক, গোপীদের নিয়ে লীলাই করুন আর কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধই করুন, অসুর নিধনই করুন, দ্বারকাধীশই থাকুন, যাই থাকুন আত্মারামের অবস্থা থেকে কখনই তিনি চ্যুত হবেন না। এখানে ব্যাসদেব বলছেন, তিনি আত্মারাম হয়ে গোপীদের সঙ্গে ক্রীড়া করছেন কিন্তু তাও তিনি চ্যুত হচ্ছেন না, অচ্যুতই রয়েছেন। এই একই কথা গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে যেমন ভগবান বলছেন *ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে* আবার শেষ অধ্যায়ে গিয়েও সেই কথাই অন্য ভাবে পুনরুত্থাপিত করে বলছেন *হত্বাপি স ইমাঁল্লোকান্ন হন্তি ন নিবধ্যতে*, যদি আমাকে কেউ মেরেও দেয় আমি মরছি না আর আমিও যদি কাউকে মেরে ফেলি তখনও আমি কাউকে মারছি না। এটাই অচ্যুতের সঠিক সংজ্ঞা। রাসলীলাতে গোপীদের সঙ্গে ক্রীড়া করতে গিয়ে তিনি সব কিছু গোপীদের মত করে নিয়েছেন আর গীতায় যেটা বলছেন দুটো একই ব্যাপার। দুটো ক্ষেত্রেই তিনি অচ্যুত, কখনই কোন অবস্থাতে শ্রীকৃষ্ণের ভাব পাল্টাচ্ছে না। বাল ও বালবুদ্ধি সম্পন্ন লোকেরা বলে এই কৃষ্ণই মহাভারত যুদ্ধ করিয়েছিলেন আর এই কৃষ্ণই গোপীদের সঙ্গে ক্রীড়া করেছিলেন। আসলে দুটোর মধ্যে কোনটাই তিনি করেননি। যখন আমরা দেখছি উনি কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ করছেন, নানা রকম ছলচাতুরি করছেন, আসলে তখন তিনি কি করছিলেন? কিছুই করেননি নিজেকে অর্জুনের মত করে নিয়েছেন। আর যখন রাসলীলাতে নামছেন তখন তিনি গোপীদের মত নিজেকে করে নিয়েছেন।

স্বামীজীর জীবনে কতকগুলি ঘটনা আছে। স্বামীজী যখন নিউইয়র্কে ক্লাশ নিতেন, ক্লাশ নেওয়ার আগে তিনি বসে সবার সঙ্গে হাসিঠাট্টা করছেন আর তার সাথে নানান রকমের কাহিনী, অমুক রাজা ছিল যে শুধু কোকিলের মাংস খেতে ভালোবাসতেন, এই ধরণের কাহিনী বলে যেতেন। এইভাবে হাসাহাসি চলতে থাকত। এরপর ক্লাশের টাইম হয়ে গেল। নিউইয়র্কে যেখানে ক্লাশ হত সেখানে ওনারা দুটো ফ্লোর নিয়ে রেখেছিলেন। নীচের ফ্লোরে ক্লাশ হত আর স্বামীজী উপর থেকে নেমে পেছনের একটা সিঁড়ি দিয়ে সোজা ডায়াসে চলে যেতেন আর ভক্ত বা শ্রোতারা অন্য দিক দিয়ে হলে ঢুকতেন। স্বামীজী এতক্ষণ হাসিঠাট্ট করে যাচ্ছিলেন, তারপর ক্লাশে যাচ্ছেন যার জন্য শুধু একটা ফ্লোর নীচে নামছেন, শ্রোতারাও উপর থেকে অন্য দিক দিয়ে ঘুরে সামনে দিয়ে হলে আসছেন। মেরী লুই বার্ক লিখছেন, স্বামীজী এক পা, দু পা, তিন পা সিঁড়ি দিয়ে নামছেন আর ওনার পুরো চেহারাটা পাল্টাতে শুরু করে দিয়েছে। তারপর যখন ডায়াসে গিয়ে চেয়ারে বসেছেন তখন তাঁকে চেনাই যাচ্ছে না, ইনিই কি সেই ব্যক্তি যিনি মিনিট দুয়েক আগে আমাদের সাথে এই রকম হাসিঠাট্টা করছিলেন! কথামৃতেও পাতায় পাতায় এই ধরণের বর্ণনা পাওয়া যাবে। ঠাকুর অল্প বয়সী ছোকরা ভক্তদের সাথে ফচকিমি করছেন, তার মধ্যে একটু ঈশ্বরীয় কথা হতেই সঙ্গে সঙ্গে সমাধিতে চলে যাচ্ছেন। মাস্টারমশাইও প্রত্যেক জায়গায় লিখছেন ইনিই কি এতক্ষণ ছোকরাদের সাথে ফষ্টিনষ্টি করছিলেন। স্বামীজীর জীবনে এই ধরণের অনেক বর্ণনা আছে। আমেরিকাতে স্বামীজী কারুর বাড়ির অতিথি হয়ে আছেন। সেই বাড়ির পাঁচ-ছয় বছরের একটি মেয়ে স্কুল থেকে এসেছে। স্কুল থেকে আসাতে স্বামীজী বাচ্চা মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করছেন আজকে স্কুলে কি পড়লে। মেয়েটিও বলে যাচ্ছে এই এই পড়েছি। স্বামীজী আবার বলছেন আচ্ছা এর মধ্যে তোমার কি কি ভালো লেগেছে, কি কি ভালো লাগেনি, আচ্ছা কেন ভালো লাগলো না, ইত্যাদি। পরে সেই মেয়েটি বড় হয়ে স্মৃতিকথায় বর্ণনা করছেন, স্বামীজীর মত মানুষ যে বাচ্চাদের ওই স্তরে নেমে যেতে পারেন না দেখলে কারুর বিশ্বাসই হবে না। কিন্তু বাবা-মারাও তো নিজের ছোট্ট ছেলেমেয়েদের

স্তরে নামছেন। তাহলে স্বামীজীর সাথে বাবা-মায়েদের তফাৎটা কোথায়? বাবা-মায়েরা নিজের সন্তানকে ভালোবাসছে, তারা উপর থেকে নেমে এসে তার সন্তানের সঙ্গে মিশছে। শুধু বাবা-মায়েরাই নয়, যে যাকে ভালোবাসে সেও ঠিক এইভাবে উপর থেকে নেমে এসে কোন রকমে মিশছে। কিন্তু স্বামীজী সমান ভাবে সবার সঙ্গে তার স্তরে গিয়ে কথা বলতে পারতেন। একবার একটা বাচ্চা ছেলেকে স্বামীজী বলছেন Come! I will teach you how to die। ছেলেটি বলল না, আমার এটা শিখে কাজ নেই। অনেক বছর পর ছেলেটির যখন বয়স হয়ে গেছে, তখন খুব দুঃখ করে লিখছে, স্বামীজী আমাকে শেখাতে চেয়েছিলেন কী ভাবে মরতে হয়, আর আজকে আমি জীবনকে এত ভালোবাসতে শুরু করেছি যে মৃত্যুর নামে আমার ভয় করে, তখন যদি শিখে নিতাম কীভাবে মরতে হয়, তাহলে আজকে আমি ভয়ে কুঁকড়ে থাকতাম না।

আমাদের মন এত বেশী জাগতিক বিষয়ের সাথে জড়িয়ে রয়েছে, গাড়ি, বাড়ি, স্ত্রী, পুত্র, মান সম্মানের মধ্যে মনে এমন আসক্ত হয়ে আছে যে যার জন্য মনের শক্তি প্রবাহিত হতে পারছে না। মন যত বিষয়ের আসক্তি থেকে মুক্ত থাকবে তত মনের শক্তি বাঁধাহীন ভাবে প্রবাহিত হওয়ার সুযোগ পাবে। স্বামীজীর ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন মনের দিক থেকে সমস্ত কিছুর আসক্তি থেকে মুক্ত, আধ্যাত্মিক দিক দিয়েও মুক্ত। যার ফলে তিনি নিজেকে জগতের সবার সঙ্গে একাত্ম করে নিতে পেরেছিলেন। ঠাকুর বলছেন একজনের কাছে একটা রঙের গামলা ছিল, যে যা রঙ চাইছে তাকে সেই রঙে ছুপিয়ে দিচ্ছে। ঠাকুর স্বামীজী এনাদের ব্যক্তিত্বটা ঠিক এই রঙের গামলার মত। আমরা কোন দিন এই ব্যক্তিত্বের অধিকারী হতে পারবো না ঠিকই, কিন্তু দুটো জিনিষ আমাদের সবার পক্ষেই করা যেতে পারে। একটা হল শরীরকে যত বেশী আলগা রাখা, শরীরকে যত শিথিল রাখতে পারা যাবে শরীরের কষ্ট তত কম হবে, শরীরে প্রাণশক্তি অবাধে প্রবাহিত হতে পারবে, চলাফেরাও তত সহজে করতে পারবো। আর দ্বিতীয়তঃ মনের দিক থেকে যে যত বেশী আসক্তি মুক্ত হবে তার মনে তত জোর আসবে। ঠাকুর বলছেন, অনেক তো হল, অনেক তো দেখলে এবার সালিশী, মুরুব্বি করা এগুলো ছাড়ো। আমরা ছাড়তে পারি না তাই সব সময় অশান্তি পাই।

শ্রীকৃষ্ণ পুরোপুরি অনাসক্ত, অনপেক্ষ যার জন্য তিনি অচ্যুত আর আমরা সর্বদা চ্যুত। বড়লোকদের সামনে আমরা সবাই মাথা নোয়াই আবার আমার থেকে দুর্বল বা সাধারণ লোক দেখলে হম্বিতম্বি করি। স্বামীজী কক্ষণ এই জিনিষ করবেন না। আমেরিকার একটা সেলুনে স্বামীজী চুল কাটাতে গেছেন, সেখানকার নাপিত বলছে আমি নিগ্রোদের চুল কাটি না। কোন কথা না বলে স্বামীজী সেলুন থেকে চুপচাপ বেরিয়ে এসেছেন। স্বামীজীকে পরে বলা হল আপনি বললেন না কেন আমি নিগ্রো নই। স্বামীজী তখন বলছেন, আমি তো কাউকে ছোট করে বড় হতে আসিনি। এ ছোট, এ বড়লোক এই বোধ স্বামীজীর মধ্যে একেবারেই ছিল না, উনি সম্মান দেবেন সবই করবেন কিন্তু লঘু গুরু ভেদ বোধটা ছিল না। ঠাকুর বলছেন ঈশ্বর দর্শন হলে বড়লোককে বড়লোক বলে বোধ হয় না। শ্রীকৃষ্ণেরও তাই। একশটা মেয়ের সঙ্গে তিনি ক্রীড়া করছেন, এদের মধ্যে নিশ্চয়ই কালো মেয়ে ছিল আবার ফর্সা মেয়েও ছিল, রোগা মেয়েও ছিল, মোটা মেয়েও ছিল, লম্বা বেঁটে সব রকমই ছিল, কুমারী ছিল আবার বিবাহিতাও ছিল। কিন্তু উনি নির্বিকার ভাবে সবার মনের মত সব কিছু করে যাচ্ছেন। শ্রীকৃষ্ণ এখানে আকাশবৎ, যত পাত্র আছে সব পাত্রেই সেই পাত্রের আকার অনুযায়ী অবস্থান করে আছেন। গোপীরা যে যে রকমটি চাইছেন শ্রীকৃষ্ণ এখন সেই রকমটি করে তাঁদের প্রাণে আনন্দ ঢেলে দিচ্ছেন। এটাকেই কবীর দাস বলছেন, গোপীরা হাততালি দিতো আর কৃষ্ণ বানর নাচ নাচতেন। কিন্তু যে যতই ব্যঙ্গ করে বলুক একমাত্র অচ্যুত যিনি তিনি ছাড়া এই জিনিষ কেউ করতে পারবেন না, আর এটাই অচ্যুত নামের ঠিক ঠিক সার্থকতা।

তখন শ্রীকৃষ্ণের প্রসন্ন হাসিতে উদ্ভাসিত তাঁর মুখের ঝকঝকে শুভ্র দাঁতগুলিকে কুন্দফুলের কলির মত লাগছিল। অন্তঃস্থল বিদীর্ণ করা সেই মিষ্টি হাসি দেখে গোপীদের হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। চারিপাশে গোপীরা শ্রীকৃষ্ণকে যেভাবে ঘিরে রেখেছেন দেখে মনে হচ্ছে তারকারাজি দ্বারা চন্দ্রমা যেন পরিবৃত হয়ে আছে। এরপরে ব্যাসদেব বর্ণনা দিচ্ছেন ***উপগীয়মান উদ্গায়ন্ বনিতাশতযূথপঃ। মালাং বিভ্রদ্ বৈজয়ন্তীং***

ব্যচরন্মণ্ডয়ন্ বনম্।।১০/২৯/৪৪। শত শত গোপীদের মাঝখানে শ্রীকৃষ্ণ যেন যূথপতির মত বিরাজ করে আছেন। যূথপতি মানে, যেখানে অনেক লোক আছে সেখানে সবার যিনি দলপতি তাঁকে বলছেন যূথপতি। এখানে বলছেন *বনিতাশতযূথপঃ*, শুধু একজন দুজন নয়, শত শত নারীদের মাঝখানে তিনি যূথপতি রূপে বিরাজিত হয়ে আছেন, হাজারটা মেয়েকে নাচান যেন তাঁর কাছে কিছুই নয়। আর গোপীরা কখন সুললিত সুরে শ্রীকৃষ্ণের বর্ণনা করে গান করছেন আবার কখন শ্রীকৃষ্ণও গোপীদের ভালোবাসা, তাঁদের রূপের বর্ণনা করে গান করছেন। এইভাবে তাঁরা বনভূমি শোভা বর্ধন করে বিচরণ করতে থাকলেন।

গোপীদের সৌভাগ্যমদ ও শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধান

এরপরে গোপললনারা কী করলেন? ***নদ্যাঃ পুলিনমাবিশ্য গোপীভির্হিমবালুকম্। রেমে তত্তরলানন্দকুমুদামোদবায়ুনা।।১০/২৯/৪৫।*** এইভাবে নৃত্য করতে করতে এনারা সবাই শ্রীকৃষ্ণকে অনুসরণ করতে করতে যমুনার হিমশীতলযুক্ত বালুকাতটে এসে পড়েছেন। যমুনার তটে মাথার উপর চাঁদ আর নীচে শুভ্র বালুকারাশি, তার পাশেই যমুনার স্নিগ্ধ জলরাশি কুলু কুলু রবে প্রবাহিত হয়ে যাচ্ছে। এই রোমাঞ্চময় উদ্দিপন যুক্ত স্থানে শ্রীকৃষ্ণ এবার নানা রকম ভাবে গোপীদের সঙ্গে খেলা করতে শুরু করলেন। এখানে এনাদের প্রেম এখন শারীরিক স্তরে নেমে এসেছে। এইসব হওয়াতে গোপীদের মধ্যে কিঞ্চিৎ গর্বের ভাব সঞ্চারিত হল। ব্যাসদেব বলছেন, ***এবং ভগবতঃ কৃষ্ণাল্লব্ধমানা মহাত্মনঃ। আত্মানং মেনিরে স্ত্রীণাং মানিন্যোহভ্যধিকং ভুবি।।১০/২৯/৪৭।*** এতক্ষণ তো গোপীরা সবাই শ্রীকৃষ্ণকে সঙ্গে নিয়ে নৃত্য করছিলেন, গান করছিলেন। কিন্তু এবারে শ্রীকৃষ্ণ যেই গোপীদের শারীরিক ভাবে স্পর্শ করতে শুরু করলেন, কখন আলিঙ্গন করছেন, কখন আদর করছেন, শ্রীকৃষ্ণকে এইভাবে পেয়ে গোপীরা মনে মনে ভাবতে শুরু করলেন *মানিন্যোহভ্যধিকং*, আমার মত সৌভাগ্যবতী কে আছে! এই দেখুন কিছুক্ষণ আগে আত্মারাম, অচ্যুত নিয়ে কথা হচ্ছিল, আর কয়েকটা শ্লোক যেতে না যেতেই শৃঙ্গার রসে নেমে এসেছেন, এটাই রাসলীলার পরম বৈশিষ্ট্য। আমরা বার বার বলছি রাসলীলার উদ্দেশ্য ঈশ্বরের প্রতি প্রেমাভক্তি কোন পর্যায়ে যেতে পারে সেটাকে ঈশ্বরের ভক্তদের কাছে তুলে ধরা। ঈশ্বরের প্রেমাভক্তিকে তুলে ধরতে গিয়ে ব্যাসদেব একটা বিশেষ রসকে অবলম্বন করেছেন। এই ব্যাপারটা মাথায় ধরে না রাখলে রাসলীলার তাৎপর্য বুঝতেই পারা যাবে না। ঈশ্বরের প্রতি প্রেমাভক্তি ভালো বোঝা যাবে হয় বাল রসে আর নয়তো শৃঙ্গার রসে, সেইজন্য এনারা দুটোই ভাগবতে নিয়ে এসেছেন।

এর আগে আমরা বলছিলাম গোপীদের দুটি ভাব, একটি ভাব যেখানে তাঁরা শ্রীকৃষ্ণকে ব্রহ্মরূপে দেখছেন, তার সাথে শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর মানবিক রূপেও দেখছেন। এতক্ষণ সবাই শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বর ঈশ্বর করে গেছেন। এখন যেই শ্রীকৃষ্ণ ক্রীড়া শুরু করেছেন, শ্রীকৃষ্ণ একে এখানে আদর করছেন, ওকে সেখানে আদর করছেন, ব্যস্, গোপীদের সবার ভেতরে অহঙ্কার জাগতে শুরু হয়ে গেছে। গোপীরা মনে করছেন শ্রীকৃষ্ণ এবার আমাদের হাতে বানর নাচ নাচবেন। গোপীরা মনে করছেন আমাদের হাততালিতে শ্রীকৃষ্ণ এখন নাচছেন। যে অধস্তন সে সব সময় মনে করে আমাকে না হলে উপরওয়ালার চলবে না, কিন্তু যে অধস্তনের উপরে থাকে তার কোন দিকেই ভ্রুক্ষেপ নেই। এটাই নিয়ম। গোপীরাও মনে করতে শুরু করেছেন আমাদের ছাড়া শ্রীকৃষ্ণের চলবে না। শ্রীকৃষ্ণ যাঁর দিকে একটু প্রেমপূর্ণ নয়নপাত করছেন, যাঁকে একটু সোহাগ স্পর্শ দিয়েছেন, সেই গোপী মনে করছেন কৃষ্ণ শুধু আমাকেই ভালোবাসে, আমার মত জগতে আর কেউ নেই এই অহঙ্কার তাদের সবার মধ্যে উদয় হল।

শ্রীকৃষ্ণ দেখলেন গোপীদের মধ্যে অহঙ্কার জেগে গেছে তখন তিনি কি করলেন? ***তাসাং তৎ সৌভগমদং বীক্ষ্য মানং চ কেশবঃ। প্রশমায় প্রসাদায় তত্রৈবান্তরধীয়তে।।১০/২৯/৪৮।*** এই ধরণের শ্লোককে ভাষ্যকাররা যদি ব্যাখ্যা করতে চান তখন অনেক ভাবেই এগুলোর ব্যাখ্যা করে দিতে পারবেন। ব্যাখ্যার কোন শেষ নেই। কিন্তু একটা জিনিষ খুব সাধারণ ভাবে বোঝার আছে, প্রেমাভক্তিকে আরও গভীর ভাবে জাগানোর জন্য অনেক সময় তিনি এক ঝলক একটা দর্শন দিয়ে আকর্ষণটা বাড়িয়ে দেওয়ার পর নিজেকে সেখান থেকে সরিয়ে নেন। গোপীদের ক্ষেত্রেও শ্রীকৃষ্ণ ঠিক তাই করছেন, প্রথমে তিনি গোপীদের

প্রতি তাঁর প্রেমানুরাগকে একটু দেখিয়ে দিলেন, দেখে নেওয়ার পর এবার তোমার নিজের শক্তিতে আমাকে পাওয়ার জন্য লেগে পড়। শক্তি না থাকলে ঐটুকুও হাত থেকে চলে যাবে। ঈশ্বরের সাথে যে সম্পর্ক, ইষ্ট আর ভক্তের যে সম্পর্ক, এই সম্পর্ককে ধরে রাখার জন্য সবাইকে প্রচুর খাটতে হবে। যেমন বলা হয় বিয়ের পর স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে ভালোবাসার সম্পর্ক তৈরী হয় সেটাকে ধরে রাখার জন্য দুজনকেই প্রচুর খাটতে হয়। সমাজ তাদের একটা সুযোগ দিয়ে দিল, একটা ছেলেকে একটা মেয়ের কাছে এনে দিল। সেতো দুজনে জেনে গেল আমাদের মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক হয়ে গেছে। এই সম্পর্কটা ধরে রাখার জন্য এবার যদি না খাটা হয় তাহলে ভালোবাসার এই সম্পর্কটাও আলগা হয়ে আসবে। আগেকার দিনে ডিভোর্সের ব্যাপার ছিল না, ডিভোর্স হতও না। কিন্তু এখন বিয়ের কিছু দিন পরেই ডিভোর্স হয়ে যাচ্ছে, কারণ সেই খাটনিটা কেউ খাটছে না। ঈশ্বর দর্শন ক্ষেত্রেও ঠিক একই ব্যাপার, ঈশ্বর দর্শন যদি পেয়েও যাই, ওই দর্শনও থাকবে না যদি ঈশ্বর দর্শনকে সর্বক্ষণ ভাবে ধরে রাখার জন্য প্রচণ্ড খাটনিটা না দেওয়া হয়। ধর্মের ব্যাপারেও একই জিনিষ, ধর্মের কোন একটা ব্যাপারে একটু ধারণা হয়ে গেল, এরপর যদি না খাটে তাহলে ধীরে ধীরে ওই ধারণাটাও হারিয়ে যাবে। রাজা মহারাজ যখন বৃন্দাবনে খুব তপস্যা করছিলেন, তখন সেখানে এক সাধু তাঁকে বলছেন 'ঠাকুরের কৃপায় আপনার তো সব রকম আধ্যাত্মিক অনুভূতি হয়ে গেছে, তারপরেও কেন এত তপস্যা করছেন'? রাজা মহারাজ তাঁকে খুব সুন্দর কথা বলছেন 'ওগুলো ঠাকুরের কৃপায় পেয়েছি ঠিকই কিন্তু আমাকে এবার এগুলোকে নিজের করে নিতে হবে'। রাসলীলায় গোপীরা এমন ব্যাকুলতা নিয়ে, প্রাণের আর্তি নিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে খুব অন্তরঙ্গ ভাবে পেতে চাইছেন যে, সেই আর্তিতে শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের উপর সদয় হয়েছেন। একটু কৃপা করে এবার তিনি উধাও হয়ে গেছেন। এবার গোপীদের খাটতে হবে। শুধু আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রেই নয়, এই খাটার ব্যাপারটা জীবনের সর্ব ক্ষেত্রে সমান ভাবে সত্য। আমাদের সমাজ বলুন, কর্ম বলুন, ঠাকুর বলুন, যাই বলে থাকুন জীবন আমাদের একটা সুযোগ দিয়েছে। এই সুযোগ এসে যাওয়াটাই শেষ নয়, এখান থেকেই আপনার যাত্রা শুরু হচ্ছে। যাঁরা শাস্ত্র শুনতে এখানে আসছেন, শাস্ত্র শোনার সুযোগ পাওয়াটাই শেষ নয়, এটাই শুরু। এরপর শাস্ত্রের উপর যত খাটা হবে, যত পড়াশোনা করবেন তত আপনার উন্নতি হবে। এখন শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের কাছে নিজেকে উন্মোচন করে দিয়েছেন, কিন্তু তাই বলে শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের নিজস্ব সম্পত্তি হয়ে যায়নি। বিজ্ঞান মহারাজ একবার শিষ্যদের দীক্ষা দেওয়ার পর বলে দিয়েছেন সকাল বিকাল দুবেলা একশ আটবার জপ করতে। একজন শিষ্য বিজ্ঞান মহারাজকে জিজ্ঞেস করছেন 'মহারাজ! যদি জপ না করতে পারি তাহলে কী হবে'? মহারাজ বলছেন 'যেটা হওয়ার ছিল সেটা হবে না'। মন্দিরে ঠাকুরের কাছে আসা, শাস্ত্র পড়া, সাধুসঙ্গ করা, দীক্ষা হওয়া সবটাতে জীবন আপনাকে একটা সুযোগ দিল। এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে এর উপর যদি কাজ করা হয় তাহলে ভালো আর যদি কাজ না করা হয় তাহলে ওখানেই সুযোগটা হাতছাড়া হয়ে যাবে।

ভগবান যখন দেখলেন ব্রজরমণীরা গর্ববোধ করছেন তখন তিনি সেই গর্ব প্রশমনের জন্য সেখান থেকে অন্তর্ধান হয়ে গেলেন। গোপীরা আনন্দে নৃত্য করছেন হঠাৎ তাদের নজরে এল শ্রীকৃষ্ণ তাদের মাঝখান থেকে অন্তর্ধান হয়ে গেছেন। যোগীরা যখন আকাশতত্ত্বের সঙ্গে এক হয়ে যান তখন তাঁদের মধ্যেও এই অন্তর্ধান হওয়ার ক্ষমতা এসে যায়। অনেকে এর ব্যাখ্যা করেন যে, শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের থেকে লুকিয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু এখানে তা হচ্ছে না, তিনি হলেন যোগীশ্বর, সাক্ষাৎ ভগবান, আকাশতত্ত্বও তাঁর, তিনি ইচ্ছে করলেই নিজেকে অন্তর্ধান করে দিতে পারেন। এতক্ষণ যাঁর জন্য গোপীরা অহঙ্কার করছিল আমার মত জগতে কেউ সৌভাগ্যবতী নেই, সেই শ্রীকৃষ্ণই এখন উধাও হয়ে গেছেন। সেইজন্য ঠাকুর কথামৃতে বহুবার বলছেন, ঈশ্বর সব কিছু ক্ষমা করে দেন কিন্তু অহঙ্কারকে তিনি সহ্য করেন না। অহঙ্কার হল শেষ চৌকাঠ। দ্বিতীয় কথা হল, সাধনার সময় অনেকে মনে করেন আমি অনেকটা এগিয়ে গেছি, বাকিরা আমার থেকে পিছিয়ে আছে। কিন্তু কে কখন হুস্ করে এগিয়ে যাবে কে কখন পিছিয়ে যাবে বোঝা খুব মুশকিল, সব তাঁর হাতে। এগুলো হল আধ্যাত্মিক সাধনার বিভিন্ন স্তরের বর্ণনা, তাই এগুলোকে জাগতিক ভাব নিয়ে প্রেমকথা রূপে বিচার করতে গেলে খুব সর্বনাশ হয়ে যাবে। কেউ সৌভাগ্যবতী নয়, যাঁকে নিয়ে গোপীরা নিজেদের সৌভাগ্যবতী মনে করছিলেন, সেই শ্রীকৃষ্ণই এখন উধাও হয়ে গেছেন।

ধর্মের কিছু কিছু গুহ্যাতি গুহ্য কথা সর্ব সাধারণের কাছে কখনই বলা উচিত নয়। রাসলীলার বর্ণনাও সবার জন্য নয়। ধর্মের কিছু কিছু রহস্য, বিশেষ করে গুহ্যের ব্যাপার সব ধর্মেই আছে। সুফি সম্প্রদায়ের মধ্যেও এমন কিছু গুহ্যাতি গুহ্য কথা আছে যা গুরু-শিষ্য পরম্পরার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা হয়, অন্য কাউকে বলা হয় না, সুফিদের মধ্যে এর নাম সিলসিলা। রাসলীলাতে গোপীরা যখন শ্রীকৃষ্ণের সাথে ক্রীড়া করছিলেন তখন তাঁদের স্থুল শরীর ছিল না, কারণ শরীরে এই রাসলীলা হয়েছিল। তৃতীয় খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা হল, ঠাকুর যেমন ভাবমুখে থাকতেন, একদিকে আধ্যাত্মিক সত্তাকে দেখছেন অন্য দিকে জগতের স্থুল রূপটাকেও দেখছেন। এমনি সাধারণ অবস্থায় এই দুটোকে কখন মেলানো যায় না, অথচ ঠাকুর এই দুটো অবস্থাতেই থাকতেন। এই অবস্থাকে ঠাকুরের ভাষায় বলা যায় 'ভাবমুখে থাকা'। রাসলীলার বর্ণনাতে ঠিক একই কথা বলা হয়েছে। একদিকে গোপীরা শ্রীকৃষ্ণকে পরমাত্মা রূপে দেখছেন, তিনি ছাড়া কিছু নেই এবং তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের পারমার্থিক রূপের স্তুতিও করছেন। অন্য দিকে গোপীদের অন্তরের দীর্ঘদিনের চাহিদার পূরণ হচ্ছে জাগতিক রূপে। ঠাকুরের ভাবমুখে থাকাটা যেমন স্থায়ী রূপে অবস্থান ছিল, এখানে গোপীদের ক্ষেত্রে এই ভাবমুখে থাকাটাই ক্ষণিকের জন্য। গোপীদের মনে যে সামান্য জাগতিক ভাব ছিল, কাম, ক্রোধাদি, সেটা শ্রীকৃষ্ণই সরিয়ে দিয়েছিলেন। সন্তান যদি কাদা মেখে আসে তার মা'ই তার কাদা মাটি পরিষ্কার করে তাকে কোলে তুলে নেয়। শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের ক্ষেত্রে একই জিনিষ করেছেন।

আধ্যাত্মিকতার উচ্চ অবস্থায় অবস্থানের নিরিখে আমরা যতটুকু জানি গোপীরা ঠাকুরের মত উচ্চ অবস্থায় ছিলেন না, যদিও বিভিন্ন জায়গাতে কবিরা গোপীদের বলছেন বেদের ঋচারাই গোপীদেহ ধারণ করেছেন। আবার কোথাও বলা হয়ে থাকে বড় বড় ঋষি যাঁরা জ্ঞানমার্গে সাধনা করেছেন তাঁরাই ভগবানের ভক্তিরস আস্বাদনের জন্য ব্রজভূমিতে গোপী হয়ে জন্ম নিয়েছিলেন। কিন্তু গোপীদের নিয়ে এত কথা বলা হলেও রাসলীলাতে আমরা যে বর্ণনা পাই তাতে এটা মনে হয় না যে গোপীরা সত্যিকারের সেই উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিলেন। এখানে কাম, ক্রোধ ইত্যাদি বলার পর একটা যে জাগতিক ভাবকে নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে তা হল মদ।

শ্রীকৃষ্ণের সাথে নৃত্যাদি করার পর গোপীদের মধ্যে এই মদ ভাব এসেছে। এর আগে সাতচল্লিশ নম্বর শ্লোকে দেখানো হয়েছে গোপীরা নিজেদের কি ভাবছেন। গোপীরা নিজেদের ভাবছেন – *আত্মানং মেনিরে স্ত্রীণাং*, জগতে এমন কোন নারী নেই যে সে আমার থেকে শ্রেষ্ঠ। গোপীদের মধ্যে যে এই অহঙ্কার উদয় হয়েছে, এই অহঙ্কার এতই উচ্চ পর্যায়ের যে এর আলোচনা করা আমাদের ক্ষমতার বাইরে। কঠোপনিষদে যমরাজ নচিকেতাকে বলছেন *...স মোদতে মোদনীয়ং হি লব্ধ্বা*, আত্মজ্ঞানের পথে এগিয়ে গিয়ে যখন আত্মজ্ঞান লাভ করেন তখন তাঁর খুব আনন্দ হয়। মানুষ যখন নিজের মনের আকাঙ্খিত বস্তুকে পেয়ে আনন্দে নৃত্য করতে শুরু করে ঠিক তেমনি আত্মজ্ঞানীর সেই আনন্দটা আত্মজ্ঞানের উপলব্ধিতে হয়। অর্থাৎ যে বস্তু লাভের জন্য জন্ম জন্ম ধরে নিজেকে যিনি এই কঠিন ও দুর্গম আধ্যাত্মিক পথে নামিয়ে দিয়েছেন, সেই তত্ত্বটা তাঁরা পেয়ে গেছেন। যমরাজ বলছেন *স মোদতে মোদনীয়ং হি লব্ধ্বা*, *মোদনীয়ং* যেটা অর্থাৎ অত্যন্ত আনন্দের বস্তুকে পেয়ে গেলে তাঁর কি আনন্দই না হবে! ছোট শিশু মায়ের জন্য কাঁদছে, এখন মা এসে শিশুর সামনে হাজির হয়ে গেছে, শিশুর এখন কী আনন্দ! এখানেও গোপীদের ঠিক এই একই ভাব। তাঁদেরও বহু দিনের ইচ্ছা যে শ্রীকৃষ্ণ একদিন তাঁদের সাথে একান্তে রাসলীলা করবেন। সেই ইচ্ছাটা এখন পূর্ণ হতে চলেছে তাই গোপীদের সাংঘাতিক আনন্দ। তাঁদের আনন্দের আর শেষ নেই। কিন্তু এই আনন্দের আকরের মধ্যেও কোথাও যেন কিছু একটা ঘাটতি থেকে যাচ্ছিল। যদিও এটা ভাষ্যকাররা বলছেন না। তার ফলে তাঁদের মনে এই অহঙ্কারটা আসছে – জগতে কোন স্ত্রী নেই যে আমার মত সুখী। মনের মধ্যে যেমনি অহঙ্কার এসেছে তখন কি হল? *তাসাং তৎ সৌভগমদং*, সৌভাগ্য হল সুহাগের প্রতীক, সৌভাগ্য শব্দটা এসেছে সুহাগ থেকে। স্বামী যত দিন বেঁচে থাকে তত দিন স্ত্রীকে বলা হয় সৌভাগ্যবতী। ভগবান যখন দেখলেন গোপীললনাদের মধ্যে *সৌভগমদং*, সৌভাগ্যে তাঁদের *মদং* মানে অহঙ্কার এসে গেছে। সাধারণতঃ মেয়েদের যত অহঙ্কার তার স্বামীকে নিয়ে।

নদীয়াতে একজন খুব দরিদ্র ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিলেন, তাঁর নাম ছিল রামনাথ। গ্রামের বাইরে তিনি একটা কুঁড়ে ঘরে থাকতেন। গ্রাম থেকে কিছু চাল জোগাড় করে ভাত রাঁধতেন আর তেঁতুল পাতার ঝোল করে নিজেও খেতেন আর স্ত্রীকেও তাই খাওয়াতেন, আর যত ছাত্ররা তাঁর কাছে অধ্যয়ণ করত তাদেরও খাওয়াতেন। সেই থেকে তাঁর নাম হয়ে যায় বুনো রামনাথ। কোন কিছুতেই তাঁর কোন ভ্রুক্ষেপ ছিল না, কিন্তু নদীয়ার সবাই বুনো রামনাথকে একজন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বলে সম্মান করত। ব্রাহ্মণ এত গরীব ছিল যে স্ত্রী সব সময় তাপ্পি দেওয়া শাড়ি পড়তেন আর হাতে একটা লাল সুতো বাঁধতেন, মানে শাঁখা বা চুরি কেনারও পয়সা ছিল না। লাল সুতো বাঁধা মানে সৌভাগ্যের লক্ষণ। গঙ্গায় ব্রাহ্মণের স্ত্রী একদিন স্নান করছেন। নদীয়ার রাজা যিনি ছিলেন তাঁর রানীও তখন পাশেই স্নান করছিল। জলে ছপাৎ ছপাৎ করে নামতে গিয়ে রানীর গায়ে জলের ছিটে গেছে। রানী তখন বলছে 'হাতে লালসুতো তাতে আবার এত অহঙ্কার'! মানে তোমার শাঁখা-চুরি কেনারও পয়সা নেই তাতেই এত অহঙ্কার। ব্রাহ্মণী তখন বলছেন 'আমার হাতে লালসুতো আছে বলে নদীয়ায় আমার সম্মান আছে'। রানী ঐ কথা শুনে খুব অপমানিত বোধ করে রাজাকে গিয়ে নালিশ করেছে। রাজা শুনে খোঁজ নিয়ে জানলেন এ হল বুনো রামনাথের স্ত্রী। কিন্তু এত বড় কথা বলল কিসের জোরে? রাজা ছদ্মবেশে ব্রাহ্মণের কাছে গেছেন। রাজা গিয়ে আলাপ করে বুঝতে পারল ব্রাহ্মণ সত্যিই একজন বড় পণ্ডিত। এই পণ্ডিতের জন্যই নদীয়ার এত সম্মান। আরও সব খোঁজ নেওয়ার পর রাজা যেভাবেই হোক ব্রাহ্মণের পাণ্ডিত্যে আর এই সহজ সরল জীবনধারায় খুব প্রভাবিত হয়ে পণ্ডিতকে বলছেন 'আপনার যদি কোন কিছুর প্রয়োজন থাকে আমাকে বলতে পারেন'। ব্রাহ্মণ বলছেন 'না না, আমার কিছু লাগবে না। গ্রাম থেকে আমার স্ত্রী চাল-টাল যা পায় নিয়ে আসে আর এই তেঁতুল গাছ যত দিন আছে আমার কোন চিন্তা নেই। তেঁতুল পাতার ঝোল হয়ে যায় আর ভাতও হয়ে যায়, ব্যস্ এতেই আমার সব কিছু মিটে যায়'। রাজা শুনে হতবম্ব হয়ে গেছেন 'কিছু একটা আপনি নিন'। পণ্ডিত এখনও জানে না যে তিনি নদীয়ার রাজার সাথে কথা বলছেন। তখন পণ্ডিত অনেক ভেবে চিন্তে বলছেন 'আমি যা চাইব আপনি দিতে পারবেন'? রাজা সঙ্গে সঙ্গে বলছেন 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনি একবার বলে দেখুন না, আমি দিতে পারি কিনা'। তখন পণ্ডিত বলছেন 'ব্যাকারণে একটা সূত্র আছে যার অর্থ আমি কিছুতেই উদ্ধার করতে পারছি না। আপনি এই সূত্রটার অর্থ উদ্ধার করার ব্যবস্থা করিয়ে দিতে পারেন'? রাজা পণ্ডিতের কথা শুনে মাথা নত করে তাঁকে প্রণাম করে বলছেন 'এই ব্রাহ্মণের স্ত্রীর হাতে লালসুতো বাঁধা আছে তাই নদীয়ায় তাঁর এত সম্মান'। অভাবগ্রস্ত পণ্ডিত সেইজন্যই সম্মান। ভারতের যা কিছু সম্মান এই অভাবগ্রস্ত দরিদ্র ব্রাহ্মণদের জন্যই হয়েছিল। এই যে পাণ্ডিত্য, শুধু পাণ্ডিত্যই নয় কারণ পাণ্ডিত্য তো যে কোন লোকই অর্জন করে নিতে পারে, কিন্তু এই পাণ্ডিত্যের সাথে যে এই ত্যাগ, এই কৃচ্ছ সাধন আর কোথাও পাওয়া যাবে না, যেটা ভারতের ব্রাহ্মণদের মধ্যে ছিল। আর এই নিয়ে ব্রাহ্মণীদেরও অহঙ্কার ছিল, আমার স্বামী কত বড় পণ্ডিত।

এখানেও গোপীদের ঠিক তাই হয়েছে। কিন্তু কেশব বুঝে গেছেন। তিনি কি করলেন? *প্রশমায় প্রসাদায়*, মনটাকে শান্ত করে নিলেন আর *প্রসাদায়* চিত্তশুদ্ধি না হলে প্রসাদ হয় না, গীতাতে ভগবান বলছেন *প্রসাদে সর্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে*, চিত্ত প্রসাদ না হলে জীবনে শান্তি হয় না। প্রসাদ হল, কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ ইত্যাদি ষড়রিপুকে প্রশমন করে দেওয়ার পর চিত্তে যে একটা প্রসন্নতা আসে সেটাকেই বলা হয় প্রসাদ। গোপীদের আবরণগুলিকে একটা একটা করে শ্রীকৃষ্ণ সরাচ্ছেন। চীরহরণে গোপীদের লজ্জা নিবারণ করে দিয়েছেন। রাসলীলার দিন যখন গোপীরা শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বণী শুনে ব্রজ থেকে শ্রীকৃষ্ণের কাছে চলে এসেছেন তখন শ্রীকৃষ্ণ বলছেন 'তোমরা এভাবে চলে এলে? তোমাদের স্ত্রীদের স্বধর্ম ছেড়ে কেন এভাবে শ্বাপদাকীর্ণ বনে চলে এলে'? গোপীরা তখন বললেন তুমি ছাড়া আমাদের আর কেউ নেই। এখানে ভগবান গোপীদের আত্মসমর্পণ করালেন। আত্মসমর্পণের পরেই আসে সমর্পণের অহঙ্কার। সমর্পণের পর শ্রীকৃষ্ণের সোহাগ পেয়ে যেতেই গোপীদের অহঙ্কারকে আর কে সামলাবে! ভগবান দেখলেন এই অহঙ্কার নিয়ে তো এগোন যাবে না। তাই তিনি কি করলেন? *তত্রৈবান্তরধীয়ত*, হঠাৎ করে গোপীদের মাঝখান থেকে তিনি নিজেকে অন্তর্ধান করে দিলেন।

এই জায়গাতে এসে ব্যাসদের তাঁর কাব্য প্রতিভাকে উজার করে দিয়েছেন। আমরা এটা মেনেই চলছি যে ভাগবত ব্যাসদেবেরই রচনা। ব্যাসদেবের রচনা শুকদেবের মুখ থেকে নিঃসৃত হচ্ছে, যিনি জন্মসিদ্ধ ত্যাগী সন্ন্যাসী। এ জিনিষ কল্পনাই করা যায় না। ব্যাসদেব যিনি এত বড় একজন ঋষি, তাঁর সন্তান শুকদেব জন্মজাত সন্ন্যাসী, তিনি অনেকের সামনে, যেখানে সারা ভারতের বড় বড় মুনির ঋষিদের সমাগম হয়েছে, সেখানে গোপীদের রাসলীলার এই দৃশ্যের বর্ণনা করছেন। কত উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাব হলে তবেই গিয়ে এই দুর্লভ সংযোগ হতে পারে! মানুষ এগুলো চিন্তাই করতে পারেনা। সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের সাথে নর-নারীর প্রেমলীলা করছিলেন। কিন্তু তা নয়। রাসলীলা অত্যন্ত উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাব।

গোপীদের যদি ঠিক ঠিক শ্রীকৃষ্ণের প্রতি পূর্ণ সমর্পণ থাকত তাহলে কিন্তু এই *সৌভগমদং*, অর্থাৎ সৌভাগ্যের মদ আসত না। যখন ঠিক ঠিক একাত্ম বোধ হয় তখনই হৃদয় পরিপূর্ণ হয়ে যায়। হৃদয়ের এই পরিপূর্ণতা থেকেই অপরের প্রতি করুণার ভাব, সবার প্রতি ভালোবাসা, সবাইকে সংরক্ষণ দেওয়ার ভাব আসে, সবার প্রতি মাতৃভাব এসে যায়। গোপীদের মধ্যে এই ভাবের অভাবটা যেন থেকে গিয়েছিল, যার জন্য তাঁরা নিজেদের জগতের সব স্ত্রীদের থেকে আলাদা ভেবে সৌভাগ্যবতী ভাবলেন, জগতের সবার সাথে গোপীদের একাত্ম বোধ তখনও বাকী থেকে গিয়েছিল। গোপীদের এই ভাবকে পূর্ণ করার জন্যই শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের মাঝখান থেকে অন্তর্হিত হয়ে গেলেন। শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে অন্তর্ধান করতেই এবার গোপীদের অন্তরের মধ্যে তীব্র ছটফটানি শুরু হয়ে গেছে। কিন্তু অন্য দিকে ভগবানের প্রতি ভালোবাসা কাকে বলে সেখানে গোপীদের ধারে কাছে কাউকে নিয়ে আসা যাবে না। ঠাকুরও ভক্তির তুলনা করতে গিয়ে বারবার গোপীদের কথা বলছেন, ভক্তি হল গোপীদের, তোমরা গোপীদের শুধু ওই টানটুকুই নাও।

শ্রীকৃষ্ণ বিরহে গোপীদের মনের অবস্থা

গোপীদের এখন কি অবস্থা? ***অন্তর্হিতে ভগবতি সহসৈব ব্রজাঙ্গনাঃ। অতপ্যংস্তমচক্ষাণাঃ করিণ্য ইব যূথপম্।।১০/৩০/১।।*** *করিণ্য ইব যূথপম্*, হাতিরা দলবদ্ধ হয়ে চলাফেরা করে। হাতি একা হয়ে যাওয়া মানে হাতি এবার জংলী হাতি হয়ে গেল। যূথপতি, পুরুষ হাতি যদি দলের মধ্যে না থাকে মেয়ে হাতি, গজিনী তখন ছটফট করতে থাকে। এটা প্রমাণিত যে প্রকৃতি রাজ্যে সাধারণতঃ দেখা যায় পুরুষরা মেয়ে ছাড়া থাকতে পারে কিন্তু মেয়েরা পুরুষ ছাড়া থাকতে পারে না। গোপীদের হস্তিনীদের মত দশা হয়ে গেল।

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের বিরহ জ্বালায় দগ্ধ হয়ে গোপীদের ভেতরে যে ছটফটানি শুরু হয়েছে তাতে ভগবানের প্রতি তাঁদের ভেতরের যত ভাব, ভক্তি, ভালোবাসা ভেতরে জমা ছিল সব এখন তোড়ে বেরিয়ে আসছে। ***গত্যানুরাগস্মিতবিভ্রমেক্ষিতৈর্মনোরমালাপবিহারবিভ্রমৈঃ। আক্ষিপ্তচিত্তাঃ প্রমদা রমাপতেস্তাস্তা বিচেষ্টা জগৃহুস্তদাত্মিকাঃ।।১০/৩০/২।।*** বিরহজ্বালায় গোপাঙ্গনরা দগ্ধ হয়ে যাচ্ছেন, এই ছটফটানির ফলে তাঁদের অনেক রকম ভাব প্রকাশিত হতে শুরু হয়েছে। ক্রৌঞ্চ মিথুনের সময় বাল্মীকি যখন দেখলেন ব্যাধের তীরে পুরুষ ক্রৌঞ্চ নিহত হয়ে ভূতলে পতিত হয়ে গেছে তখনই তাঁর অন্তঃস্থল থেকে একটা তীব্র পীড়া বেরিয়ে এল। সেই পীড়া থেকেই কবিতার আকারে একটি শ্লোক বেরিয়ে এল। সেখান থেকেই কাব্যের জন্ম। শ্রীকৃষ্ণ বিরহে গোপীদের হৃদয়ে এখন তীব্র পীড়া। এই পীড়াতে তাদের ভেতর থেকে যে কত রকম নতুন নতুন ভাব বেরিয়ে আসছে, কল্পনাই করা যায় না। জগত প্রচণ্ড ধাক্কা আর আঘাত দিয়ে যতক্ষণ একেবারে নাড়িয়ে না দিচ্ছে ততক্ষণ ভেতর থেকে আধ্যাত্মিক ভাব বেরিয়ে আসবে না। মানুষ যখন জীবনে আঘাতে জর্জরিত হয়ে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে তখনই তার ভেতরের ভাবগুলো বেরিয়ে আসে। বাল্মীকি যে মুহুর্তে পুরুষ ক্রৌঞ্চের মৃত্যুতে তীব্র ব্যাথা অনুভব করলেন তখনই তাঁর ভেতরে যে কাব্য প্রতিভা সুপ্ত হয়ে ছিল সেটা বেরিয়ে এসেছে। যার ভেতরে যা ভাব আছে ঐ অবস্থায় সেই ভাবটাই বেরিয়ে আসবে। যার ভেতরে আধ্যাত্মিক ভাবে আছে সে আধ্যাত্মিক পথে চলে যাবে। এখানে গোপীদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের ভাব ছিল। ছোটবেলা থেকে কৃষ্ণকে দেখে দেখে কৃষ্ণের ভাবে তাঁদের মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার রঞ্জিত হয়ে গেছে। এই বিরহ জ্বালায় তাঁদের তাই কৃষ্ণের ভাবটাই বেরিয়ে এসেছে।

শরতের পূর্ণিমা রাতে যমুনার তীরে গোপীরা একাকী দাঁড়িয়ে আছেন। এতক্ষণ শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের সাথে ক্রীড়া করছিলেন, কিন্তু হঠাৎ করে তিনি গোপীদের মাঝখান থেকে উধাও হয়ে গেছেন। গোপীরা কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের সাথে তাঁদের মিলনের আশা ছেড়ে দেননি। তাঁরা তখন কী করলেন? শ্রীকৃষ্ণের জীবনের সাথে গোপীদের মন এমন একাত্ম হয়ে আছে যে, শ্রীকৃষ্ণের হাঁটাচলা, শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গভঙ্গি, শ্রীকৃষ্ণের কথা বলার ধরণ, সব কিছুর সঙ্গে গোপীরা এক হয়ে গেছেন। আমরা যাকে ভালোবাসি, যাঁকে খুব সম্মান করি আমরা তাঁদের আদব-কায়দা গুলোকে নকল করার চেষ্টা করি। শ্রীকৃষ্ণভাবের আবেশে তাঁরা শ্রীকৃষ্ণ যে ভাবে চলতেন সেই ভাবে চলছেন। শ্রীকৃষ্ণের চলন ছিল হাতির মত। হাতি একটু দুল্‌কি চালে চলে, ডান দিক বাম দিক একটু দুলে দুলে চলে। মেয়েদেরও বলা হয় গজগামিনী। গজগামিনী হল শ্রেষ্ঠ চলন। এইভাবে শ্রীকৃষ্ণের যা কিছু, প্রেমুমধুর হাসি, বিলাসপূর্ণ কটাক্ষপাত, তাঁর মনোমুগ্ধ বাক্যালাপ, বিভিন্ন প্রকার লীলা খেলা সব গোপীরা অনুকরণ করতে লাগলেন। তিরিশ অধ্যায়ের এই দ্বিতীয় শ্লোকটি খুব মারাত্মক শ্লোক, এই জায়গাতে এসে আসল নকল একাকার হয়ে যায়। যাঁরা প্রকৃত প্রেমিক ভক্ত তাঁরা তাঁদের ভাবের মত আচরণ করেন, আবার তাঁদের দেখাদেখি যারা নকল ভক্ত সেগুলোকে নকল করতে শুরু করে দেয়। স্বামীজীও বৈষ্ণবদের এই ধরণের অনেক কিছুর নিন্দা করতেন। কথামৃতে পাওয়া যায়, ঠাকুরের শরীর যাওয়ার পর ঠাকুরের ত্যাগী শিষ্যরা বরানগর মঠে কেউ শুয়ে আছেন, কেউ পায়চারি করছেন। সেখানে তাঁরা ঠাকুরের নকল করে আনন্দ উপভোগ করছেন। তার মধ্যে একজন বলছেন এখনও যখন ঈশ্বর দর্শন হল না তাহলে গলায় ছুরি দিই। পাশ থেকে একজন বলছেন 'পাশেই রাখা আছে নিয়ে নেনা'। একজন ভক্ত ঠাকুরকে নকল করে মজা করা নিয়ে আপত্তি করাতে স্বামীজী বলছেন 'মজা করতে গেলে আপনাকে নিয়ে করব নাকি! মজা করতে হলে তাঁকে নিয়েই করব'। ইয়ং ছেলেমেয়েরা ফিল্মের হিরো হিরোইনদের নকল করে। আবার মথুরা বৃন্দাবনধামে সবাই শ্রীরাধা আর শ্রীকৃষ্ণকেই নকল করে। তাঁদের মধ্যে আধ্যাত্মিক ভাব আছে। কিন্তু কীর্তন ও নৃত্যাদির সময় অনেকের মধ্যে নকল ভাবগুলো চলে আসে, এগুলো খুবই বিপজ্জনক। কিন্তু এখানে গোপীরা একেবারে শ্রীকৃষ্ণের ভাবেতে লীন হয়ে গেছেন। মন, প্রাণ, ইন্দ্রিয় যাবতীয় যা কিছু আছে সব শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে নিবিষ্ট হয়ে আছে।

ভাগবতের এই তিরিশ অধ্যায়ের তিন নম্বর শ্লোকের ভাবকে ঠাকুরও উল্লেখ করতেন। ***গতিস্মিতপ্রেক্ষণভাষণাদিষু প্রিয়াঃ প্রিয়স্য প্রতিরূঢ়মূর্তয়ঃ। অসাবহং ত্বিত্যবলাস্তদাত্মিকা ন্যবেদিষুঃ কৃষ্ণবিহারবিভ্রমাঃ।।*** ১০/৩০/৩। গোপীরা এমন কৃষ্ণময় হয়ে গেছেন যে গোপীদের প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত ভাব নেমে এসেছে তাঁদের শরীরের অঙ্গে, চলনে বলনে, কথাবার্তায়, হাসিতে। কি রকম ভাব গোপীদের মধ্যে এসেছে? বলছেন *গতিস্মিতপ্রেক্ষণভাষণাদিষু*, শ্রীকৃষ্ণের মতই পদক্ষেপ, শ্রীকৃষ্ণের মতই কথা বলা, শ্রীকৃষ্ণের মতই হাসি, চাহনি। গোপীরা ভুলেই গেছেন যে তাঁরা মেয়ে, এর ফলে মাঝখান থেকে গোপীরা নিজেদের পরিচয় ভুলে গেছেন, তাঁদের আমি বোধটাই উধাও হয়ে গেছে। যদিও এখানে বিরহ অবস্থার বর্ণনা করা হচ্ছে, কিন্তু ধর্ম জীবনের সাধনায় যে বলা হয় ঈশ্বর বা নিজের ইষ্টের প্রতি যে কোন একটা ভাব আরোপ করতে হয়ে, সেটাকেই এখানে জোর দেওয়া হয়েছে। ঠাকুরও ভাব আরোপের উপর খুব জোর দিয়েছেন। এখানে আমাদের অনেক কিছু বোঝার আছে।

ভাবের ঘরে চুরি

আসলে আমরা যতটা জটিল ভাবি সেই তুলনায় ধর্ম জীবন খুব একটা কঠিন কিছু নয়। আমাদের জীবনে চারটি দর্শন আছে, এই চারটে ছাড়া পঞ্চম কোন দর্শন নেই। প্রথম দর্শন হল, এই জগৎ কোন ভাবে সৃষ্টি হয়ে গেছে আর কোন কারণে আমার জন্ম হয়ে গেছে। আমি এই জন্মের আগেও কখন ছিলাম না আর মৃত্যুর পরেও থাকবো না। যত দিন বেঁচে থাকবো তত দিনই এই জগতে আমাদের থাকতে হবে। আমি আগে কখন ছিলাম না, কদিন পর আমি থাকবো না, এই মতে আমি যদি একেবারে স্থির চিত্ত ও দৃঢ় বিশ্বাসী হয়ে যাই তাহলে সঙ্গে সঙ্গে আমি সমস্ত রকমের শোক আর মোহ থেকে মুক্ত হয়ে যাবো। বাড়িতে কেউ মারা গেছে তাতে শোক করা, কান্নাকাটি করার কি আছে! আরে ভাই! এতো আগে কখন ছিল না। কিভাবে এসেছে? জলে

যেমন বুদ্বুদ্ হয় সেই রকম এসেছিল আবার মিলিয়ে গেল। এতে শোক করার কি আছে! টাকা-পয়সা এসেছে, চলে গেছে, তাতে হয়েছেটা কি!

দ্বিতীয় দর্শন, যেটা খ্রীশ্চান ও মুসলমানদের মত, আল্লা বা গডের ইচ্ছায় তোমার জন্ম হয়েছে, তুমি সৎ পথে থাকো, মৃত্যুর পর হেভেন কিংবা জন্নতের কোন একটায় তুমি চলে যাবে। তোমার আর কোন চিন্তা নেই। তৃতীয় দর্শনের বক্তব্য হল, তোমার ভেতরে যে জিন বা জীবাত্মা আছে সে ক্রমাগত মরছে আর জন্মাচ্ছে, এই শরীরটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, আবার তুমি আরেকটা নতুন শরীর ধারণ করে নেবে। কিছু দিন স্বর্গে থাকবে, তারপর অন্যান্য পশুপাখির যোনিতে থাকবে, সেখান থেকে আবার মানুষ হয়ে জন্মাবে। আর তুমি যেমনটি কর্ম করবে তেমনটি ফল পাবে। চতুর্থ দর্শন হল, তুমি হলে সেই শুদ্ধ আত্মা, তোমার জন্মও নেই মৃত্যুও নেই। আমরা যদি খুব ভালো করে লক্ষ্য করি তাহলে দেখতে পাবো, চারটের দর্শনের কোন দর্শনকেই আমরা ঠিক ঠিক ভাবে মানি না। তার মানে দৃঢ়তা আমাদের কোনটাতেই নেই। যুধিষ্ঠিরকে যক্ষ প্রশ্ন করছেন, এই জগতে আশ্চর্যের কী? যুধিষ্ঠির তার উত্তরে বলছেন, জগতে প্রতি মুহূর্তে আমাদের আশেপাশের মানুষগুলো মারা যাচ্ছে কিন্তু আমরা ভাবছি আমি কোন দিন মারা যাবো না। সত্যিই তাই, আমাদের কারুরই এক বিন্দু বিশ্বাস নেই যে আমি একদিন মারা যাবো আর মৃত্যুর পর আমি আর থাকবো না। আমাদের মধ্যে একজনেরও যদি দৃঢ় বিশ্বাস থাকে যে আমি একদিন মারা যাবো, তাহলে জানবেন তিনি একজন বড় মহাত্মা। এই দৃঢ় বিশ্বাস থাকলে আপনার আর কোন কিছু শোনার দরকার নেই, কোন কিছু করারও দরকার নেই। কিন্তু আমাদের সবারই মনের মধ্যে একটা ভাব আছে যে, কে মরল কে বাঁচলো জানিনা, কিন্তু আমি জানি আমি চিরন্তন। তার মানে প্রথম যে জড়বাদীদের দর্শন, যাতে বলছে ঘটনাচক্রে আমার জন্ম হয়েছে আর মৃত্যুর পর আমরা কেউ থাকবো না, এই দর্শনকে আমি মানছি না। তাহলে নিশ্চয়ই কোথাও আপনার বোধ আছে যে আমি আছি। আমি আছি এই বোধ যদি থাকে, তাহলে আমি আবার জন্ম নেব। তাহলে বাপু, তুমি যে আবার জন্ম নেবে, সেই জন্মটা কিসের দ্বারা নির্ধারিত হবে? নিশ্চয়ই তাহলে তোমার জন্মটা তোমার কর্ম দ্বারা নির্ধারিত হতে হবে। এই মতে যদি আপনার দৃঢ় বিশ্বাস থাকে, তাহলে আপনি কি সব সময় সচেতন যে আমি আমার কর্মকে ঠিক রাখবো? তাহলে তো এই পৃথিবীটা অন্য রকম হয়ে যেত, যেখানে কোন আইন প্রণয়নের দরকার হতো না, জেলখানা তৈরী করার প্রয়োজন থাকতো না। আসলে আমরা আমাদের নিজের জীবনের ব্যাপারে মনে করছি আমি চিরন্তন আর নিজের কর্মের ব্যাপারে মনে করছি আমি অচিরন্তন, আমাকে আর কখন জন্ম নিতে হবে না। পুরো সমস্যাটা এখান থেকেই সৃষ্টি হয়। আপনি প্রথমে ঠিক করে নিন, আপনার জীবনটা কি অনন্ত নাকি একবারের মত। যদি মনে করেন আপনার জীবন অন্তবান তাহলে সব কিছুকে আপনি অন্তবান হিসাবেই গ্রহণ করুন। আর যদি অনন্ত হয় তাহলে আপনার কর্মকেও অনন্ত রূপে নিন। তাহলে দেখবেন আর কোন সমস্যা থাকবে না। ঠাকুর সেইজন্য বার বার বলছেন ভাবের ঘরে চুরি করতে না।

আমাদের সমস্যা হল এই ধরণের রূঢ় বাস্তব চিন্তাধারাতে আমরা অভ্যস্ত নেই, মিষ্টি মিষ্টি ধর্মীয় কথা শুনতেই ভালোবাসি। এসব কথা না বলে যদি বলা হয়, আপনাদের কোন চিন্তা নেই, রোজ চরণামৃত পান করে যান আর ঠাকুরের খিচুড়ি ভোগ খেয়ে যান তাতেই আপনাদের রামকৃষ্ণলোকে সীট সুনিশ্চিত, তখন ভক্তদের প্রচুর করতালির ঘড়ঘড় আওয়াজে বক্তারও মন খুশীতে উদ্বেলিত হয়ে যাবে। কিন্তু ঠাকুর আমাদের জন্য বলছেন – তোমরা ভাবের ঘরে চুরি করো না। ভাবের ঘরে চুরি না করাটা কি রকম? ঠাকুরের জীবনের একটা ছোট্ট দৃষ্টান্তই বোঝার জন্য যথেষ্ট। অদ্বৈতমতে সাধনা করার জন্য ঠাকুর তোতাপুরির কাছে সন্ন্যাস নিয়েছেন। সন্ন্যাস নেওয়ার পর তিনি হৃদয়রামকে বলছেন ‘ওরে হৃদু আমি সন্ন্যাসী হয়েছি আমি আর ঘরে যাবো না’। ঠাকুর তখন দক্ষিণেশ্বরে কুঠি বাড়িতে গর্ভধারিনী মাকে নিয়ে থাকতেন। ‘তুই চাঁদনিতে আমাকে ভিক্ষা দিয়ে যাস’। ঠাকুরের তিথিপূজোর সময় বেলুড় মঠে ব্রহ্মচারীদের সন্ন্যাস দেওয়া হয়। দিনের বেলা তাঁরা চারিদিকে ভিক্ষা করতে বেরিয়ে যান। কিন্তু রাত্রিবেলা তো আর ভিক্ষা করা যাবে না। খুব কঠোর নিয়ম পালন করলে বলতে হয়, তোমার দিনে একবারই খাওয়া উচিৎ। কিন্তু উপায় নেই, রাত্রে না খেলে শরীর খারাপ হয়ে যাবে। তাই প্রথা অনুসারে রাত্রে বেলুড় মঠের তরফ থেকে তাঁকে ভিক্ষা দেওয়া হয়। মঠের ভেতরে তাঁকে ঢুকতে

দেওয়া হয় না। প্রথম ভিক্ষা যেটা মঠের প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে গ্রহণ করেন সেটা তাঁরা গঙ্গার পাড়ে বসে আহার করেন। তারপরে যে ভিক্ষা হয় সেটা গাছের তলায় বসে খান। আর রাত্রিবেলা যে ভিক্ষাটা পান সেটা মঠ অফিসের কাঁঠাল গাছের তলায় বসে আহার করেন।

একটা ভাবকে ধরে রেখে সেই ভাবানুযায়ী সব কিছু দৃঢ় ভাবে পালন করতে হয়। আধ্যাত্মিক জীবন খুব সাধারণ জীবন, শুধু ভাবের ঘরে চুরি না করলেই হল। আমার আপনার কি ভাব সেই ভাবটা আগে ঠিক করতে হবে। একটা খুব জনপ্রিয় গানে বলা হচ্ছে 'মায়ের ভাব কি ভেবে পরান গেল', আমরা নিজেরাই জানি না আমাদের কি ভাব। নিজের জীবনের ব্যাপারে মনে করি আমার জীবন অনন্ত কিন্তু কাজের ব্যাপারে মনে করি অন্তবান, আর ভাবছি, এগুলো কিছু না, সব ম্যানেজ হয়ে যাবে। কিন্তু কী করে ম্যানেজ হবে! তুমি যদি অনন্ত হও তাহলে তোমার কর্মগুলোও অনন্ত, তার যে ফল সেই ফলও অনন্ত। তোমার কর্ম তোমাকে কোন ভাবেই ছাড়বে না, তোমার গলা টিপে ধরে থাকবে, নিস্তার তুমি কোন দিন পাবে না। দুটো দর্শনের মধ্যে একটা দর্শনকে দৃঢ় করে ধরুন আর সেই অনুসারে আপনার জীবন ধারাকে পরিচালিত করুন। যতক্ষণ একটা ভাবকে দৃঢ়তার সঙ্গে ধরে না রাখতে পারছেন ততক্ষণ আপনার ভাবের গভীরতা আসবে না।

আশ্চর্যের হল, আগেকার দিনের বিধবাদের ভাবের ব্যাপারে প্রচণ্ড দৃঢ়তা ছিল, তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী পরিষ্কার থাকতো – ভগবান আমাকে একজন স্বামী দিয়েছিলেন, যে ভাবেই হোক তিনি চলে গেছেন, আমার কিছু করার নেই, কিন্তু এবার আমি অত্যন্ত সাদাসিধে জীবন যাপন করে যাবো। গ্রামের অশিক্ষিত মুসলমানদের দেখুন, তারা ভাবের ঘরে একেবারে দৃঢ়চেতা – পাঁচ বার যদি আমি নমাজ পড়ি, এক মাস যদি রোজা রাখি আর জীবনে একবার যদি হজ করে নিতে পারি আমার জীবন ধন্য হয়ে যাবে। এই এতটুকু ভাবকে দৃঢ় ভাবে পালন করে মুসলমান সম্প্রদায় পৃথিবীতে একটা শক্তিশালী জাতি রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল। এবারে আমাদের দিকে দেখুন, আমরা কোন একটা ভাব নিয়ে কি দৃঢ়চেতা হয়ে দিনের পর দিন, বছরের পর বছর কিছু পালন করছি? কোন কিছুই নেই। হিন্দু জাতির এটা একটা বিরাট ঘাটতি। কিন্তু আগেকার দিনের ব্রাহ্মণরা এই ব্যাপারে খুব দৃঢ় চিত্ত ছিল। সকালে উঠে স্নান করা, কোন একটা শাস্ত্র নিয়মিত পাঠ করা, পূজো, জপ, ধ্যান করা, বিভিন্ন দিনে উপোস করা, এগুলো নিয়মিত নিষ্ঠা নিয়ে পালন করে যেতেন। এত গেল ধর্ম জীবনের। কিন্তু আধ্যাত্মিক জীবনে ভাবের ঘরে দৃঢ় হওয়াটা প্রাথমিক শর্ত। যে কোন একটা ভাবকে দৃঢ় ভাবে না ধরে থাকলে আধ্যাত্মিক জীবনে এগোনই যাবে না। আধ্যাত্মিক জীবনের সাধনা মানেই অভাব থেকে ভাবে আসা। আমাদের সব কিছুরই অভাব, সব ফাঁকা, কোথাও কিছু নেই। এই সহজ একটা ভাব, ঘটনাচক্রে আমি জন্মেছি আর আমার মৃত্যুর পর সব শেষ। শুধু এই ভাবটাই মাথায় রাখুন। কিন্তু দুর্ভাগ্য এই সহজ ভাবটাও মাথায় রাখতে পারছি না। আর শাস্ত্র পড়ে বা আপনি যাঁকে খুব শ্রদ্ধা ভক্তি করেন তাঁর কাছে শুনে আপনার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে যে মৃত্যুর পর আমার আবার জন্ম হবে। মুসলমানরাও তাই মানে, মৃত্যুর পর জন্নতে মানে স্বর্গে গিয়ে আবার জন্ম নেবে। খ্রীশ্চানরাও তাই মনে করে। কোথাও কোন ভাবে আমার এই জীবনটা চলতে থাকে। জীবন যে চলবে, কিসের উপর ভিত্তি করে চলবে? আপনি খ্রীশ্চান হোন আর মুসলমানই হোন, পার্সিই হোন আর শিখই হোন, জৈন হোন কিংবা বৌদ্ধ বা হিন্দুই হোন, যে কোন ধর্মেই যান, ভিত্তি হল একটাই, যেমনটি কর্ম করেছেন তেমনটি পাবেন। কিন্তু এই বিশ্বাসেও আমাদের দৃঢ়তা নেই। যে কাজগুলো সব ধর্মশাস্ত্র করতে বলে দিয়েছে সেই কাজগুলো আমরা করছি না, যে কাজগুলো করতে নিষেধ করেছে সেগুলো করছি।

ভাগবতের তিরিশ অধ্যায়ের তিন নম্বর শ্লোকটি হল ভাবের পরাকাষ্ঠা। কথামৃতে ঠাকুর যেখানে যেখানে গোপীদের নিয়ে বা শ্রীমতিকে নিয়ে আলোচনা করছেন সেখানে একটু আলোচনা করতেই ঠাকুর নিজেকে সামলে রাখতে পারতেন না, একটু পরেই তিনি হয় সমাধিতে চলে যাচ্ছেন নয়তো তাঁর দু নয়ন দিয়ে প্রেমাশ্রু নেমে আসছে। গোপীদের প্রসঙ্গ উঠলেই তিনি এত গভীর ভাবরাজ্যে চলে যাচ্ছেন, যেখানে তিনি আর নিজের ভাব সম্বরণ করতে পারতেন না। গোপীদের ক্ষেত্রেও একই জিনিষ, শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় এমন গভীরে হারিয়ে গেছেন যে, যেখানে শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে অন্তর্ধান করে দিয়েছেন তাতে গোপীদের যেন কিছুই আসে যায় না, কারণ শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের শরীর মনে ঢুকে গেছেন। শ্রীকৃষ্ণ এমন ভাবে গোপীদের ভাবরাজ্যে ঢুকে গেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণের

যা কিছু, তাঁরা হাঁটা-চলা, হাসি, চাহনি, কথা বলার ভঙ্গি সব কিছু গোপীদের আচরণে প্রতিফলিত হতে লাগল। শুধু তাই নয়, *অসাবহং ত্বিত্যবয়াস্তদাত্মিকা* 'আমিই সেই কৃষ্ণ হয়েছি', এই ভাব এসে গেছে।

এই যে আমরা এতক্ষণ প্রসঙ্গান্তরে গিয়ে ভাবের ঘর নিয়ে এত দীর্ঘ আলোচনা করলাম এই একটি কারণেই, 'আমিই সেই কৃষ্ণ হয়েছি'। উপনিষদের ঋষিও একই কথা বলছেন অহং ব্রহ্মাস্মি, আমিই সেই পূর্ণব্রহ্ম। এগুলো অবশ্য আমার আপনার পক্ষে বোঝা বা ধারণা করা অত্যন্ত কঠিন। সাধারণ ভাবে গোপীরা একেবারেই অশিক্ষিত আর গ্রাম্য ললনা। গোপীরাই পরে দুঃখ করে বলবেন 'কৃষ্ণ এখন মথুরায় গিয়ে রাজা হয়েছেন, এখনতো বড়লোকের শিক্ষিত মহিলারা কৃষ্ণের কাছে আসবে, আমাদের মত গেঁয়ো অশিক্ষিত মেয়েদের কাছে তিনি কেন আর আসবেন'! গোপীরা শাস্ত্রের বড় বড় উচ্চ কথা কিছুই জানেন না। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের ভাবে এমন বিভোর হয়ে গেছেন, তাঁর চিন্তনে নিজেরা এমন হারিয়ে গেছেন যে, সেখানে উপনিষদের শেষ কথা কত সহজ ভাবে বলছেন 'আমিই সেই কৃষ্ণ হয়েছি'! আর এই ভাব কোন বিশেষ একজন গোপীর মধ্যে হচ্ছে না, যে কজন গোপী ছিলেন সবারই এই একই ভাব। সবাই নিজেকে দেখছেন তিনি কৃষ্ণ হয়ে গেছেন। ঠাকুর বলছেন, থিয়েটারে বা যাত্রায় যারা মেয়েদের অভিনয় করে তাদের সব কিছু দাঁত মাজা, চলা-বলা সব মেয়েদের মত হয়ে যায়। মেয়েদের ভাব আরোপ করতে করতে মেয়েদের মতই সব কিছু হয়ে যায়। সন্ন্যাসীরাও যে সন্ন্যাস নিয়েছেন, সেখানেও ভাব আরোপ করার জন্য। সেইজন্য সন্ন্যাসী হওয়ার জন্য যে প্রস্তুতি দরকার সেই প্রস্তুতি আমাদের মধ্যে নেই। কিন্তু এখানে গোপীরা ভাব আরোপ করছেন না, ভাবের মধ্যে সম্পূর্ণ হারিয়ে গেছেন। তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন লীলার অনুকরণ করে লীলাবিলাসে হারিয়ে গেছেন। আর সবাই শুধু বলে যাচ্ছেন 'আমি কৃষ্ণ হয়েছি'। আমাদের বিভিন্ন আচার্যরা অনেক রকম সাধনার কথা বলে গেছেন, কিন্তু তাঁরা ঠাকুরের একটা সাধনার উপরেই আমাদের জোর দিতে বলছেন, তোমরা ভাবের ঘরে চুরি করো না।

আমাদের দেশের এক বিশেষ ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের পরিবারে বাড়ির বাচ্চাদের প্রথম থেকে প্রশিক্ষণ দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া হয় পয়সার দাম আছে, তোমাকে পয়সা উপার্জন করতে হবে আর যারা অন্য সম্প্রদায়ের তারা তাদের বাচ্চাদের ক্রমাগত বলতে থাকে পয়সা একটা বাজে জিনিষ, মিথ্যে কথা বলবে না, চরিত্র ভালো রাখবে ইত্যাদি। অথচ বেচারীকে সমাজে সারা দিন মিথ্যে কথাই বলতে হয়, আর সমাজে চলতে গিয়ে দেখে পয়সার এত গুরুত্ব যে পয়সা না থাকলে জীবন চলবে না। সারাটা জীবন শিক্ষা পেয়েছে এক রকম আর জীবনের মুখোমুখি যখন হচ্ছে তখন পুরো অন্য রকম। কিন্তু যারা বৈশ্য পরিবারের তাদের একটাই উদ্দেশ্য, কীভাবে পয়সা আয় করা যায়, পয়সা আয় করাতে সৎ অসৎ বলে কিছু হয় না। মাদার টেরেসার বিখ্যাত উক্তির মতই এই কথাগুলো 'পয়সার আবার রঙ হয় নাকি! ব্ল্যাক মানি আর হোয়াইট মানি আবার কি?' যেভাবে হোক আমাকে টাকা জোগাড় করতে হবে, এ ব্যাপারে এদের স্থির বিশ্বাস। আবার বিজ্ঞানীদের দেখুন, একজন পদার্থ বিজ্ঞানী বলছেন 'আমি ফিজিক্স ছাড়া কিছু মানি না'। এটাই স্থির বিশ্বাস। ভাবের ঘরে চুরি না করা মানে মন মুখ এক করা।

ঠাকুর বলছেন ভাব পাকা করতে। ভাব পাকা করা মানে মৌমাছির মত হওয়া, মৌমাছি ফুল ছাড়া আর কোথাও বসবে না। তার মানে, যে ভাবকে তুমি বিশ্বাস করে এগোচ্ছে সেটাকেই আঁকড়ে থাকার কথা বলা হচ্ছে। কিন্তু আমরা হলাম মাছির মত, কখন সন্দেশে বসছি কখন পচা ঘায়েও বসছি। আমাদের কারুরই মন মুখ কখনই এক হয় না, মন মুখ এক না হওয়াটাই আমাদের স্বাভাবিক। মন মুখ যাঁর এক হয়ে গেছে সে তো মহাত্মা। ঠাকুরও জানতেন ভাব পাকা করা অত সহজে হয় না। কিন্তু আমাদের তো কোন ভাবই নেই, পাকা করার কথা কোত্থেকে আসবে! আমাদের জীবন গতানুগতিক ভাবে চলে যাচ্ছে, পড়াশোনা করতে হবে তাই পড়াশোনা করে যাচ্ছি, বিয়ে করতে হবে তাই বিয়ে করছি, সন্তানের জন্ম দিতে হবে সন্তান হয়ে যাচ্ছে। কখন নিজেকে মনে করছি আমি অনন্ত, আবার কখন মনে করছি অন্তবান, কর্মের ব্যাপারে মনে করছি অন্তবান। আবার মনে করছি ঠাকুরকে একবার পাঁচ পয়সার বাতাসা দিয়ে দিলে আমার সব সমস্যা সমাধান ঠাকুর করে দেবেন। আমাদের সমগ্র জীবনটাই incosistencyতে পরিপূর্ণ। যারা ধর্ম জীবনে চলে গেছেন, এদের inconsistency যে কী মারাত্মক ধরণের আমরা কল্পনাই করতে পারবো না। আমাদের প্রায়ই এই ধরণের

কথা শুনতে হয় 'অমুক এত বড় ভক্ত কিন্তু সব সময় এই রকম দু নম্বরী কাজ করছে কি করে'? সত্যিই তাই, ধর্ম জীবনে আসার পর এই inconsistency এত বেড়ে যায় যে ভাবাই যায় না। একটা রকেটকে উৎক্ষেপণ করে দিলে সেই রকেট চাঁদে পর্যন্ত চলে যেতে পারে, কিন্তু একবার যদি রকেট বিকল হয়ে যায় তাহলে সেই রকেটকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না, পুরোটাই ধ্বংস হয়ে যাবে, তার অস্তিত্বই আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। যে জিনিষের যত উপরে যাওয়ার ক্ষমতা থাকে সেই জিনিষের তত নীচে যাওয়ারও প্রচণ্ড ক্ষমতা থাকে। ঠিক তেমনি ধর্ম জীবন যেমন আমাদের ঈশ্বরের সাক্ষাৎ করিয়ে দিতে পারে বা মুক্তির দিকে নিয়ে যেতে পারে, উলটো দিকে তেমনি আমাদের মারাত্মক ধরণের অসাধুও বানিয়ে দিতে পারে। একজন ঘোর বিষয়ী লোকের consistency একজন সাধারণ ধার্মিকের তুলনায় অনেক বেশী। সেইজন্য যুক্তিবাদীরা, যারা মূলতঃ ঘোর বিষয়ী হয়, তারা ধর্মকে প্রচণ্ড আক্রমণ করার ক্ষমতা রাখে, কারণ ধার্মিক লোকদের inconsistency গুলিকেই ওরা আক্রমণের বিষয় করে নেয়। ধার্মিক লোকদের potentialityটা অনেক বেড়ে যায় ঠিকই কিন্তু তার সাথে সাথে তার বদমাইশ হওয়ার potentialityটাও বেড়ে যায়। আবার অন্য দিকে ধর্ম পালন করে যত মহৎ পুরুষ জগতে আবির্ভাব হয়েছে, জড়বাদীদের থেকে অত মহৎ পুরুষ কখনই আসবে না।

ধর্ম জীবন অত্যন্ত সহজ ও সাধাসিধে। ধর্ম জীবনে শুধু দরকার consistency। জাগতিক ক্ষেত্রে অনেক কিছুতেই আমাদের consistency আছে। আপনি একজন পুরুষকে বিবাহ করেছেন, আপনি আপনার স্বামীর প্রতি consistent, আপনার সন্তান হয়েছে, সন্তানের প্রতি আপনার ভালোবাসা consistent। এবার শুধু আপনার মনের যে ভাব, সেই ভাবের প্রতি আপনার consistency নিয়ে আসুন তাহলেই হয়ে যাবে। এখানে গোপীদের এমন তীব্র ভালোবাসা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যে, শ্রীকৃষ্ণ যে তাঁদের মাঝখান থেকে অন্তর্ধান হয়ে গেছেন তাতে ওঁদের ভাবের ঘরে কোন রকম বিঘ্ন হচ্ছে না, শ্রীকৃষ্ণের ভাবে বিভোর হয়ে বলছেন 'আমি কৃষ্ণ হয়েছি'। শ্রীকৃষ্ণের মতই হাঁটছেন, তাঁর মতই হাসছেন, তাঁর মতই কথা বলছেন।

ভক্তি মানে কাঁচা আমিকে পাকা আমি করা আর জ্ঞান মানে 'আমি'র নাশ

যাই হোক আমরা আবার ভাগবতের আলোচনায় ফিরে আসছি। একটু আগেই গোপীদের মদ হয়েছিল আমার মত সৌভাগ্যবতী কেউ নেই কারণ আমি আমার প্রাণের প্রিয় কৃষ্ণকে পেয়েছি। ভাগবতে গোপীদের যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে তাতে গোপীরা সবাই যে একেবারে perfect, তা নয়। গোপীদেরও নিজেদের অনেক দুর্বলতা ছিল, যার জন্য তাঁদের মধ্যে কাম ভাবও আসছে আবার 'আমি' 'আমার' ভাবও আসছে। তবে আমাদের মন বুদ্ধি দিয়ে এগুলো বিচার করা যায় না। বেদান্তের শেষ কথা হল অহং ব্রহ্মাস্মি। কিন্তু ভক্তিতে অর্থাৎ দ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে 'আমিই সেই' এই ভাব চলে না। ঠাকুর খুব সহজ ভাবে বলছেন, আমি চিনি হতে চাই না, চিনি আস্বাদ করতে চাই। এই উপমা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীরাই দিয়ে থাকেন। যখন বলবে আমি আস্বাদ করতে চাই, তখন আমি তুমি ভেদ রাখতে হবে। আমি তুমি ভেদ থাকা মানেই অজ্ঞানী থেকে যাচ্ছে। অজ্ঞান থাকা মানেই কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য সবটাই থাকবে। পৃথিবীতে যত ধর্ম আছে, সব ধর্মই ভক্তিকে আধার করে চলছে। তাহলে বড় বড় সন্ত মহাত্মা যাঁরা ভক্তি পথে আছেন তাঁদের মধ্যেও কি কাম, ক্রোধাদি এই রিপুগুলো আছে? জ্ঞানমার্গের সাধক আর কজনই বা আছেন! আসলে জ্ঞান আর ভক্তিতে কোন তফাৎ নেই, জ্ঞানও যা ভক্তিও তাই। এই যে পরাভক্তি, যেখানে আমিটুকু থেকে যায়, ওই আমিটা পাকা আমি। ওই আমিটা ঈশ্বরই রেখে দেন। ঠাকুর বলছেন, নুনের পুতুল সমুদ্র মাপতে গিয়ে সমুদ্রেই মিশে গেল, সমুদ্রের খপর আর দেবে কি করে! ঠাকুর নিজের ক্ষেত্রে বলছেন, সমুদ্রে মিশে যাওয়ার সময় কে যেন তাঁকে পাথর বানিয়ে দিলেন যাতে গলে না যায়। ভক্তিমার্গে যে আমিটা থাকে সেই আমিটা ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই থাকে। ফলে কাম, ক্রোধ এগুলো সবই থাকে কিন্তু পোড়া দড়ির মত হয়ে যায়। এই জগতে যে বলছে আমার কাম নেই ক্রোধ নেই, তাহলে বুঝতে হবে সে একটা পাথর, তাকে দিয়ে কোন কাজই হবে না। এই যে গোপীদের 'আমি' ভাব রয়েছে কিংবা উচ্চ আধারের ভক্ত যাঁরা তাঁদের যে 'আমি' রয়েছে, ওই 'আমি' দিয়ে কিন্তু সংসার কার্য হয় না। সংসার কার্য হয় না মানে, দড়ি আছে কিন্তু পুড়ে গেছে, পোড়া দড়ি দিয়ে বাঁধার কাজ হয় না, কিন্তু আকারটা থাকবে। গোপীদের মধ্যে আমরা যা কিছু দেখছি, তাঁদের যে কাম,

তাঁদের যে ক্রোধ, তার থেকেও বেশী তাঁদের মাৎসর্য আর অধিকার বোধ 'শ্রীকৃষ্ণ শুধু আমার' এগুলো সব পোড়া দড়ির আকার মাত্র। সেইজন্য এগুলোকে আক্ষরিক ভাবে গ্রহণ করতে নেই। আমরা আগেও বলেছি আর এখনও বলছি, শ্রীকৃষ্ণের সাথে গোপীদের এই লীলা কাহিনী সাধারণ মানুষ যাদের মধ্যে সামান্যতম বিষয় বুদ্ধি আছে, তাদের শোনাও পাপ। কারণ তারা রাসলীলার সব কিছুকে জাগতিক অর্থে নিয়ে নেবে।

এই *সৌভগমদং* আসাতে শ্রীকৃষ্ণও গোপীদের মাঝখান থেকে অন্তর্হিত হয়ে গেলেন। তিনি কিভাবে নিজেকে অন্তর্ধান করেছেন আমাদের জানা নেই। পরে দেখা যাবে তিনি আরেকজন গোপীকে সঙ্গে নিয়ে অন্তর্ধান করেছেন। আপনি বলতে পারেন শ্রীকৃষ্ণ হলেন যোগীশ্বর, তিনি অণিমা, লঘিমা দিয়ে নিজেকে অন্তর্ধান করেছেন। কিন্তু এখানে আমরা সেই ধরণের কিছুই বর্ণনা পাইনা। কৃষ্ণ প্রেমে গোপীরা এমন ডুবে আছে আর সেই অবস্থাতেই দেখছেন কৃষ্ণ নেই। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের এই অনুপস্থিতিকে সহ্য করতে না পেরে সবাই মিলে শ্রীকৃষ্ণের যাবতীয় ভাবগুলিকে নকল করতে শুরু করলেন। *অসাবহং ত্বিত্যবলাস্তদাত্মিকা*, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি এই রাগাত্মক ভাব এমন হয়ে গেছে যে তাঁরা বলতে শুরু করেছেন আমি কৃষ্ণ হয়েছি। এখানেই পোড়ো দড়ি আর আস্ত দড়িতে তফাৎ কোথায় বোঝা যায়। আপনার ছেলেকে যদি বলেন তিনটের সময় আমি তোমাকে স্কুল থেকে নিতে আসব। আপনি তিনটে পাঁচে যান, তারপর দেখুন আপনার ছেলে কি করে! আর প্রেমিক প্রেমিকার মধ্যে যদি এই ধরণের কিছু হয়ে যায়, তারপর যে কি হবে কল্পনাই করা যায় না। এখানে গোপীদের এই ধরণের কিছু হচ্ছে না। গোপীরা চাইছেন শ্রীকৃষ্ণ আমারই থাকবে। তাই না, গোপীদের আবার অহংকার হয়ে যাচ্ছে, আমার মত সৌভাগ্যবতী আর কেউ নেই। কিন্তু যেমনি দেখছেন শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের মাঝখানে আর নেই, এই নিয়ে তাঁদের মনে যে খুব হতাশা, রাগারাগির ভাব উপস্থিত হয়ে গেছে, তা কিন্তু হচ্ছে না। গোপীদের এই বোধ হচ্ছে যে আমিই কৃষ্ণ। তার সাথে বিরহের ভাবটাও থাকছে। একদিকে এই বোধ আছে আমি পরিপূর্ণ, আমি কৃষ্ণ আবার অন্য দিকে যাঁকে ভালোবাসছেন তাঁকে পাচ্ছেন না, এই তীব্র বিরহটাও হচ্ছে।

ঠাকুর খুব মন দিয়ে ভাগবত শুনতেন। রাসলীলার এই ভাব ঠাকুরের মধ্যে প্রবল ভাবে দেখা গেছে। যখনই গোপী প্রেমের প্রসঙ্গ আসতো ঠাকুরের চোখে জল এসে যেত। কথামৃত পড়তে গিয়ে যেখানে গোপীদের বর্ণনা আসছে সেই অংশটা পড়তে গিয়ে যদি চোখে জল আসে তাহলে বুঝবেন এবার তার মধ্যে ঠিক ঠিক ভাব জাগছে। গোপীদের বর্ণনা করতে গিয়ে কথামৃতে ঠাকুরও বলছেন গোপীরা শ্রীকৃষ্ণে এমন তন্ময় হয়ে গিয়েছিলেন যে তাঁরা নিজেকে কৃষ্ণ মনে করছেন, আমি কৃষ্ণ হয়েছি। এখানে কোন একজন গোপীর এই ভাব হচ্ছে না, সবারই মধ্যে এই বোধ হচ্ছে যে আমি কৃষ্ণ হয়েছি। আমি আপনি মনে করি এই শরীরটাই আমি, আমি আপনি মনে করছি এই মনটাই আমি। কিন্তু তা কখনই নয়, আমি আপনি হচ্ছি একটা ভাব, একটা বিচার। একটা ভাবের মূর্ত রূপ হলাম আমি আপনি সবাই। মাঝে মাঝে ইয়ং ছেলেমেয়েরা এসে জিজ্ঞেস করে 'আচ্ছা! ধর্মটা কি অটো হিপনোসিস নয়?'। তখন তাদের বলতে হয় 'ঠিকই বলছ, কিন্তু তোমরা ভুলে যাচ্ছ তোমরা যে নিজেদের শরীর মনে করছে এটাই পুরোপুরি হিপনোসিস। তুমি তো নিজেকে হিপনোটাইজ করে রেখেছ এই ভেবে যে আমি এই শরীর। যে ডি-হিপনোটাইজ করেছে সেই তো জানবে। এটা জানা খুব সহজ, তুমি চলতে ফিরতে ভেবে দেখ আমি সেই শুদ্ধ আত্মা। তখন দেখবে হুশ্ করে তোমার মধ্যে কখন শক্তি জেগে গেছে টেরও পাবে না'। এই জগতকে দারা সিং এর মত পালোয়ানরা চালিয়েছেন না বুদ্ধিমানরা চালিয়েছেন? রামায়ণের সময় কিংবা মহাভারতের সময় নিশ্চই অনেক মোচওয়ালা পালোয়ান ছিল, কিন্তু আজ কে তাদের মনে রেখেছে! তারা সমাজে কতটুকু পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছেন, ভেবে দেখুন। কারা সমাজে পরিবর্তন নিয়ে এসেছিলেন, যাঁরা কমাণ্ডারস্, যেমন অর্জুন, তাঁর বুদ্ধি আছে। যে মানুষ যত সূক্ষ্ম স্তরে যাবে তত তার ক্ষমতা বেড়ে যাবে। যেমনি আপনি নিজেকে মনে করবেন আমি সেই শুদ্ধ আত্মা, আমি ঈশ্বরের সঙ্গে এক, তার মানে এবার আপনি সূক্ষ্ম জগতে পা রাখলেন, আপনার ক্ষমতা এবার বেড়ে যাবে। তাহলে হিপনোসিস কোনটা? আমরা আপনাকে সম্মান দেব আপনার ক্ষমতা দেখেই। যখন আপনি নিজেকে শরীর মন ভাবছেন তখন আপনাকে কেউ পাত্তাই দিচ্ছে না। দুদিনের জন্য পাত্তা দেবে ঠিকই। যারা এখন দেখতে সুন্দর তখন

একটু লোকে তাকাবে, পরে বয়স হলে কেউ ফিরেও তাকাবে না। ঠাকুর যাত্রাওয়ালাদের বলছেন, এখন বয়স কম, দেখতে সুন্দর, লোকে খুব খাতির করছে। কদিন পর গাল তুবড়ে যাবে তখন আর কেউ তাকাবে না।

অদ্বৈত পথের যাঁরা সাধক তাঁদেরও চরম অনুভূতিতে এই ভাবটাই চলে আসে *অহং ব্রহ্মাস্মি*। জ্ঞানীর *অহং ব্রহ্মাস্মির* ভাবটা চিরস্থায়ী ভাব। কিন্তু এখানে রাসলীলাতে গোপীদের এই ভাব সাময়িক। সুফিদের সাধনাতেও এই ভাব পাওয়া যায়, সে আর আল্লা এক হয়ে গেছে। আমি আর আমার ইষ্ট এক, এই ভাবটা সাধনার খুব উচ্চতম অবস্থা। কিন্তু আমাদের মাথায় রাখতে হবে এই ভাবটা সাময়িক। কিন্তু যাঁদের জ্ঞান লাভ হয়, কঠোপিনষদে যেটা বলছেন *...স মোদতে মোদনীয়ং হি লব্ধা*, অহং ব্রহ্মাস্মি এই ভাবটা একেবারে স্থায়ী। এখান থেকে তাঁর আর কখন পতন হয় না।

কিন্তু গোপীদের ক্ষেত্রে কি হয়েছে, প্রথমে বাল্যলীলায় শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের বাড়িতে মাখন খেয়ে পরে একটু বড় হতেই বাঁশি বাজিয়ে গোপীদের তাঁর দিকে আকর্ষিত করলেন। এরপর চিরহরণ পর্বে গোপীদের যখন পূর্ণ সমর্পণ হয়ে গেছে, তারপর আর মুখের কথা দিয়ে নয়, দৈহিক স্পর্শ দিয়ে গোপীদের সঙ্গে বিনোদন করছেন। শ্রীকৃষ্ণ এইভাবে গোপীদেরকে নিয়ে বিনোদ করাতে গোপীদের মনে অহঙ্কার উদয় হয়ে গেছে। গোপীরা নিজেদের মনে করছেন আমার মত সৌভাগ্যবতী আর কেউ নেই। অহঙ্কার বশতঃ নিজেদের সৌভাগ্যবতী ভাবতে গিয়ে গোপীরা হঠাৎ দেখছেন তাঁদের মাঝখান থেকে তাঁদের প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্ধান হয়ে গেছেন। এখানে আধ্যাত্মিক ভাব যেমন আছে তেমনি আবার এর সাথে লৌকিক ভাবও মিলে মিশে আছে। এর আগের অধ্যায়ে ৪৭ নম্বর শ্লোকে শুকদেব বলছেন *আত্মানং মেনিরে স্ত্রীণাং মানিন্যোহভ্যধিকং ভুবি*, সংসারের সকল স্ত্রীলোকের তুলনায় নিজেদের শ্রেষ্ঠ মনে করে গোপীদের অহঙ্কার হয়ে গেছে। আমাদের আধ্যাত্মিক শাস্ত্র বলছে, ভগবান আমাদের মনের ভেতরে যত রকম দুর্বলতা আছে সবটাই তিনি ক্ষমা করে দেবেন, কিন্তু অহঙ্কার, সংস্কৃতে যাকে অভিমান বলে, এই দুর্বলতাকে তিনি কখনই ক্ষমা করেন না। অহঙ্কার সমাজও ক্ষমা করবে না আর ভগবানও ক্ষমা করবেন না। সাধুদেরও যদি কখন অহঙ্কার হয়ে যায় তাহলে সাধুর জীবনে বিপদ এসে যাবে। আপনার যত রকম দুর্বলতা আছে, চারিত্রিক দুর্বলতা, টাকা-পয়সা নিয়ে দুর্বলতা, ক্ষমতার জন্য দুর্বলতা, যে দুর্বলতাই থাকুক, আপনার আশেপাশের সব মানুষ সহ্য করে নেবে, কিন্তু আপনার যদি অহঙ্কার হয়ে যায় তাহলে আপনার যে প্রিয় সেও সহ্য করবে না, সমাজ সহ্য করবে না, ভগবানও সহ্য করবেন না। গোপীদের ঠিক তাই হয়ে গেল, আমার মত সৌভাগ্যবতী আর কেউ নেই। তোমার যেটা নিয়ে অহঙ্কার হয়েছে ভগবান সেটা দিয়েই তোমাকে মারবেন। শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে গোপীদের অহঙ্কার হয়েছে, শ্রীকৃষ্ণই গোপীদের মাঝখান থেকে অন্তর্ধান হয়ে গেলেন। কেন অন্তর্ধান হয়ে গেলেন? *প্রশমায় প্রসাদায় তত্রৈবান্তরধীয়তে*, সেই অহঙ্কার প্রশমনের জন্য তিনি সেই মুহুর্তেই নিজেকে গোপীদের মাঝখান থেকে অন্তর্ধান করে নিলেন।

তবে গোপীদের যে অহঙ্কার এই অহঙ্কার শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে অহঙ্কার, এই অহঙ্কার কোন জাগতিক অহঙ্কার নয়। কথামৃতে ঠাকুর বলছেন – অনেকে প্রচুর জপ-ধ্যান, তপস্যা করে মনে করে অনেক এগিয়ে গেছি, কিন্তু হারা জেতা তাঁর হাতে। কেউ হয়তো অনেকটা পিছিয়ে আছে, সাধন-ভজন করার সুযোগ পাচ্ছে না, ঈশ্বর হয়তো তাকে এগিয়ে দিলেন। আমি হয়তো অনেক দিন ধরে প্রচুর জপ-ধ্যান করে যাচ্ছি, তারপর একটা সময় মনে করছি আমি অনেক এগিয়ে গেছি। কিন্তু এই এগিয়ে যাওয়াটা সাপ-লুডো খেলার মত, নিরানব্বুইয়ের ঘরে পোঁছে আটকে আছি, পুট্ আর পড়ছে না। আরেকজন হয়তো অনেক নীচে আছে, আমি যতক্ষণ নিরানব্বুইয়ে আটকে আছি ততক্ষণে সে কয়েকটা দান দিয়ে মই বেয়ে উঠে বেরিয়ে গেল। জাগতিক জীবনে অনেক কিছুই আগাম বলে দেওয়া যায়, কিন্তু আধ্যাত্মিক জীবনে এই ভাবে আগাম কিছু বলে দেওয়া যায় না। গোপীদের ক্ষেত্রেও তাই কিছুই predict করা যায় না। অন্য দিকে গোপীদের অহঙ্কার জাগতিক অহঙ্কার নয়, তাঁদের এই অহঙ্কার একমাত্র শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে। তাই তাঁদের হৃদয়েশ্বর শ্রীকৃষ্ণ যে তাঁদের মাঝখানে নেই, শ্রীকৃষ্ণের জন্য এই বিরহ গোপীদের কাছে দুঃসহ। কারণ একটু আস্বাদ পেয়ে গেছেন কিনা। একদিকে শ্রীকৃষ্ণের জন্য ছটফটানি হচ্ছে অন্য দিকে শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনে যে বিরহ বহ্নি গোপীদের বুকে জ্বলছে, এই

বিরহটাও তাঁদের কাছে এক ধরণের অহৈতুকি আনন্দ। কাউকে তীব্র ভালো না বেসে থাকলে এই জিনিষগুলো বোঝা বা ধারণা করা খুব কঠিন। সন্তানের প্রতি মায়েদের যে প্রচণ্ড ভালোবাসা, এই ভালোবাসা দিয়ে কিছুটা বোঝা যায়। কিন্তু এখানে তো মা আর সন্তানের সম্পর্ক নয়, এখানে প্রেমিক আর প্রেমিকার সম্পর্ক, ভক্ত আর ভগবানের সম্পর্ক। রাসলীলাতে আধ্যাত্মিক আর জাগতিক ব্যাপার মিলেমিশে আছে বলে রাসলীলা বোঝা আমাদের পক্ষে খুবই কঠিন।

নিত্য ও লীলা দুটোকেই সত্য রূপে ব্যাখ্যা করা খুব কঠিন কাজ

একটা আছে নিত্য আরেকটি আছে লীলা। জগতে যা কিছু হচ্ছে এগুলো লীলা। ঈশ্বরের ব্যাপারে যা কিছু আছে সব নিত্য। যদি আমরা শুধু নিত্যকে নিয়ে চলি তাহলে আমাদের কোথাও কোন গোলমাল থাকবে না। যেমন উপনিষদ, বড় বড় সাধুদের উপনিষদের বাপারে প্রায়ই বলতে শোনা যায় যে, উপনিষদ হলো ঠিক ঠিক rational। Rational তো হবেই, কারণ উপনিষদ একটা জিনিষকে নিয়েই চলছে কিনা। যখন একমাত্র নিত্যকে নিয়ে কোন কিছু চলে তখন সেই জিনিষকে খুব rational খুব logical মনে হবে। উপনিষদ, বেদান্ত শুধু নিত্যকে নিয়ে অর্থাৎ সচ্চিদানন্দকে নিয়ে চলে, সচ্চিদানন্দের বাইরে কোন কথা বলবে না। আপনি যদি শুধু জগতকে নিয়ে চলেন তাহলেও আপনি খুব logical, খুব consistant থাকবেন, বিজ্ঞানীরা সবাই তাই নিজেদের খুব rational মনে করে। বিজ্ঞানীরা শুধু লীলাকেই নিচ্ছে, জগতকেই সত্য মনে করছে, নিত্যকে মানে না, ঈশ্বরের সত্তাকে মানে না। যখন শুধু নিত্যকে নিয়ে চলছেন তখন খুব consistant, বুঝতে কোন অসুবিধা হবে না। তাই উপনিষদকে বোঝা খুব সহজ, মনে হবে বিরাট কিছু, কিন্তু logically বুঝতে কোন অসুবিধা হবে না। ঠিক তেমন বিজ্ঞানকে যদি বুঝতে চান, যেটাকে আমরা লীলা বলছি কিংবা যে কোন দর্শনকে যদি বুঝতে চান কখনই কঠিন মনে হবে না। অথচ মজার ব্যাপার হল, যারা বলছে লীলাই সত্য তারা বলে নিত্যটা মিথ্যা। আবার যারা নিত্যকে সত্য বলে, তার বলে লীলাটা মিথ্যা। দুটোকেই ব্যাখ্যা করা যাবে। কিন্তু যেমনি বলে দেবে লীলাটাও সত্য আর নিত্যটাও সত্য তখন আর কিছু মেলানো যাবে না, দুটোকে মেলাতে আপনার প্রাণ বেরিয়ে যাবে। ভাগবত হল এমন একটি গ্রন্থ যেখানে নিত্যটাও সত্য আর লীলাও সত্য। কথামৃতেও ঠাকুর নিত্যকেও সত্য বলছেন, লীলাকেও সত্য বলে মানছেন। যার জন্য একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞানী ছাড়া কথামৃত কেউ বুঝতে পারবে না, সম্ভবই নয়। যদি কেউ বলে আমি কথামৃতের সব বক্তব্য বুঝে গেছি, তাহলে বুঝতে হবে হয় তিনি ব্রহ্মজ্ঞানী আর তা নাহলে তিনি পুরো মিথ্যা কথা বলছেন। গীতার ব্যাপারেও এই একই কথা বলা যায়। আমাদের এই তিনটি শাস্ত্র, গীতা, ভাগবত আর কথামৃত নিত্য আর লীলা দুটোকেই ব্যাখ্যা করছে। যে শাস্ত্র নিত্যা ও লীলা দুটোকে নিয়ে এগিয়ে গেছে আর দুটোকেই সত্য বলছে, সেই শাস্ত্রের বক্তব্যকে ধারণা করে দুটোকে মেলানো একবারেই অসম্ভব ব্যাপার, ব্রহ্মজ্ঞানী ছাড়া এ জিনিষ কারুর পক্ষেই সম্ভব নয়। বিশেষ করে ভাগবতের বক্তব্য বিশ্লেষণ করা আরও কঠিন, কারণ ভাগবতে নিত্য যতটা সত্য লীলা ততটাই সত্য, আর রাসলীলা পর্বে আগাগোড়া দুটোকে এক সঙ্গে বেঁধে রেখে দেওয়া হয়েছে। যেমন শ্রীকৃষ্ণ সহসা গোপীদের মধ্য থেকে অন্তর্হিত হয়ে যাওয়ার পর গোপীদের অবস্থাকে হস্তিনীর সঙ্গে তুলনা করে বলছেন হস্তিনীদের মাঝখান থেকে গজরাজ চলে গেলে হস্তিনীদের যে দুরবস্থা হয়, গোপীদেরও সেই দুরবস্থা হয়েছে। ভাগবতের মত গ্রন্থে এটি খুব প্রচলিত উপমা। তবে খুবই মজার ব্যাপার হল হাতীর দলে মেয়েরাই সব সময় দলপতি হয়। তবে সেখানে পুরুষ হাতিকে থাকতেই হবে। এখানে একটা জাগতিক উপমা দিয়ে গোপীদের বিরহ কেমন তারই বর্ণনা করা হচ্ছে। কারণ গোপীরা ইতিমধ্যে তাঁদের বহুকাঙ্খিত শ্রীকৃষ্ণের অকাতর ভালোবাসার আস্বাদন করে নিয়েছেন।

বাহিরে অন্তরে আকাশের মত সর্বব্যাপী ঈশ্বরকে কোথায় অন্বেষণ করবে!

এর পরের শ্লোকটিতে আধ্যাত্মিকতা আর কাব্যিক সৌন্দর্যের এক অপূর্ব যুগলবন্দী। ***গায়ন্ত্য উচ্চৈরমুমেব সংহতা বিচিক্যুরুন্মত্তকবদ্ বনাদ্ বনম্। পপ্রচ্ছুরাকাশবদন্তরং বহির্ভূতেষু সন্তং পুরুষং বনস্পতীন্।।১০/৩০/৪।*** এই ভাব যখন এসে গেছে তখন গোপীরা এক অপরের সাথে গলা মিলিয়ে উচ্চৈঃস্বরে

শ্রীকৃষ্ণের গুণগান করতে শুরু করেছেন। আনন্দের অন্য এক রাজ্যে সবাই বিচরণ করছেন। শুধু তাই নয়, তাঁরা সবাই কৃষ্ণ প্রেমে মত্ত। হরি রস পেয়ালা পিলেরে অবধূত, হরি রসের পেয়াল পান করে সবাই মত্ত হয়ে গেছেন। মত্ত হয়ে তাঁরা কুঞ্জে কুঞ্জে শ্রীকৃষ্ণকে অন্বেষণ করতে শুরু করেছেন। মনে করছেন এই কুঞ্জের আড়ালে হয়তো শ্রীকৃষ্ণ লুকিয়ে আছেন। একদিকে কণ্ঠে শ্রীকৃষ্ণের গুণকীর্তন অন্য দিকে নয়নে শ্রীকৃষ্ণের অনুসন্ধান, গান করে যাচ্ছেন আর উন্মত্তের মত শ্রীকৃষ্ণকে খুঁজে যাচ্ছেন। গোপীরা জানেন কৃষ্ণ কোথাও যাবেন না, তিনি এখানেই হয়তো কোথাও নিজেকে লুকিয়ে রেখেছেন। এখানে এসে ব্যাসদেব খুব সুন্দর ভাবে বর্ণনা করে বলছেন শ্রীকৃষ্ণ তো ভগবান, ভগবান কোথায় যাবেন! তিনি তো জড়-চেতন সমস্ত পদার্থের ভেতরে ও বাহিরে আকাশের মত সর্বদা অচঞ্চল ব্যাপকরূপে অবস্থিতই আছেন। তিনি গোপীদের কাছ থেকে অন্তর্ধান হয়ে গেছেন, চোখের দৃষ্টিতে নেই কিন্তু সেটা তো অহঙ্কারের আবরণ এসে গেছে বলে দেখতে পারছেন না। এটাই হল কাব্য আর ধর্মগ্রন্থের তফাৎ। এটাই যদি কোন বড় কবি বা সাহিত্যিকের রচনা হত তখন সেখানে এর বর্ণনা করতে করতে দুম্ করে আধ্যাত্মিক তত্ত্বকে ঢুকিয়ে দিতেন না। যাঁরাই জড়ের পূজো করেন, যাঁরা সৌন্দর্যের পূজারী তাঁরা কোন দিন আধ্যাত্মিক পুরুষ হতে পারবেন না। উল্টো দিক থেকে আধ্যাত্মিক পুরুষ কখনই জড়ের পূজো করেন না, সম্মানও দেন না। হৃদয়রাম যখন ঠাকুরকে দেখাচ্ছেন ‘মামা! এই হল লাটসাহেবের বাড়ি’। ঠাকুর বলছেন ‘আমি দেখলাম ইটের ঢিপি’। ঋষি যখন রাসলীলার বর্ণনা করছেন তখন সব কিছুর বর্ণনাই করছেন, গোপীরা কত সুন্দর, সেই রাত কত মনোরম, তাঁদের নৃত্যগীত কত ছন্দোময়, কত মধুরতম। কিন্তু তারই মাঝখানে ঢুকিয়ে দিলেন *পপ্রচ্ছুরাকাশবদন্তরং বহির্ভূতেষু সন্তং পুরুষং বস্পতীন্।* এই জগতে যাবতীয় যা কিছু আছে তার সব কিছুতে তার বাইরেও তিনি, তার ভেতরেও তিনি আকাশবৎ। আকাশ মানে ঈথার পার্টিকেলস্, যেখান থেকে সব কিছুর সৃষ্টি হয়েছে। যেমন এই বোতল, এই বোতলের ভেতরেও আকাশ বাইরেও আকাশ। আমি বলতে পারি বোতলের ভেতরে তো জল আছে। হ্যাঁ, জলটাও আকাশের পার্টিকেল দিয়েই নির্মিত। একটা ঘটিকে যদি গঙ্গায় নিয়ে গিয়ে ডুবিয়ে দেওয়া হয় তখন ঘটির বাইরেও গঙ্গাজল ভেতরেও গঙ্গাজল। ঠিক তেমনি আকাশ সব কিছুকে ব্যপ্ত করে আছে। জলের এক একটি পার্টিকেলের বাইরেও আকাশ আছে আর জলের ভেতরেও আকাশ আছে। আকাশ ছাড়া কোন কিছু থাকতে পারেনা। আত্মা ঠিক সেইভাবে সব কিছুর বাইরেও আছেন ভেতরেও আছেন। আত্মা আর ভগবান এক। যা কিছু আছে সব কিছুতে তিনিই ব্যপ্ত। যিনি সব কিছুতে ব্যপ্ত, তিনি কোথায় আছেন এই প্রশ্ন কাকে করবে! কিন্তু গোপীরা এমন উন্মত্ত হয়ে গেছেন যে শ্রীকৃষ্ণের শরীরটাকে খুঁজে চলেছেন – কোথায় কৃষ্ণ! কোথায় কৃষ্ণ!

ব্যাসদেব বলছেন, তিনি সব কিছুতে ব্যপ্ত, রাসলীলার ঐ স্থানে যত পাথরের টুকরো আছে তার মধ্যেও তিনি আছেন তার বাইরেও তিনিই আছেন, যত গাছপালা আছে তার ভেতরেও তিনি তার বাইরেও তিনি। সেখানে গোপীরা কি করছেন? *পপ্রচ্ছু*, ছোট ছোট যে গুল্ম দিয়ে কুঞ্জ আছে সেখানে গিয়ে তাদের শ্রীকৃষ্ণের কথা জিজ্ঞেস করছেন। এমন কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত হয়ে আছেন যে তাদের সবাইকে জিজ্ঞেস করছেন ‘তোমরা আমার কৃষ্ণকে দেখেছ কোথায় গেছে?’ কিন্তু তার আগে ব্যাসদেব শর্ত লাগিয়ে দিয়েছেন যিনি ভগবান, যিনি সর্বব্যাপী তিনি যাবেনটা কোথায়, তাঁর কথা কোথায় কাকে জিজ্ঞেস করছ? আমরা মন্দিরে গিয়ে ঠাকুরকে খুঁজছি, মসজিদে গিয়ে খুঁজছি, সন্ত কবীরদাস বলছেন মোঁক কাঁহা ঢুণ্ডো ম্যায় তো তেরে পাস হুঁ, ওগো তুমি আমায় কোথায় খুঁজছ, আমি যে তোমার ভেতরেই বসে আছি। ঠিক এই ভাবটা ব্যাসদেব এখানে নিয়ে এসেছেন। যতই আমরা শুনে যাই, যতই বুঝে নিই যে সর্বভূতে ঈশ্বর আছেন, *বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ*, তিনি চর অচর সব কিছুর বাইরেও আছেন ভেতরেও আছেন, এটাকে ধারণা করা এবং ধারণা করার পর সেই মত আচরণ করা অসম্ভব। তাও তো আমরা ঠাকুরের মন্দিরে গিয়ে প্রণাম না করলে শান্তি পাই না।

গোপীদের এই অবস্থা, একদিকে প্রেমের পরাকাষ্ঠা। আর ঠিক ঠিক যদি ধারণা হয়ে যায় আর এতেই যদি পুরো মনটা থাকে, বাইরেও তিনি ভেতরেও তিনি, তখন তাহলে কি করবেন? আর কোথায় খুঁজতে যাবেন? তিনি তো জ্ঞানী হয়ে গেলেন। আপনি যদি বলেন আপনার কৃষ্ণ বাইরেও আছেন ভেতরেও আছেন, আর তিনি সব কিছুতেই বিদ্যমান, অনুর ভেতরেও তিনি আবার অনুর বাইরেও তিনি, জগতের ভেতরেও

আছেন আবার জগতের বাইরেও আছেন। তাহলে তো আপনি জ্ঞানী হয়ে গেলেন, আপনি আর ভক্ত কোথায় থাকলেন! ভক্তের কাছে এই জিনিষ চলবে না। ভক্তের চাই দেহবান ইষ্ট। এক কাহিনীতে বলছে, পরে এই নিয়ে ভক্তিগীতিও রচিত হয়েছে, যেখানে বলছেন রাধারানী শ্রীকৃষ্ণের ছবি আঁকছেন, কিন্তু ছবিতে কোন পা আঁকছেন না। কারণ পা আঁকলে পাছে শ্রীকৃষ্ণ যদি পালিয়ে যান! এই হল ভক্তের ভগবানের প্রতি ভালোবাসার নিদর্শন, আমি তোমার ছবি আঁকবো কিন্তু তোমার কোন পা আঁকবো না, পা আঁকলে যদি তুমি পালিয়ে যাও! ছবি কি কখন পালাতে পারে! কিন্তু রাধারানী শ্রীকৃষ্ণের প্রেমে এমন তন্ময় হয়ে গেছেন যে ছবিটাই তাঁর কাছে জীবন্ত সত্য। শ্রীমাও বলছেন ছায়া কায়া এক। শ্রীরাধার কাছে শ্রীকৃষ্ণের ছবি আর শ্রীকৃষ্ণ আলাদা কিছু নয়। একদিকে তিনি ছবির সঙ্গে একাত্ম বোধ করছেন অন্য দিকে বাহিরে ভেতরে সর্বত্র তিনিই আছেন এই বোধটা তখন থাকছে না। তাহলে তো তিনি জ্ঞানী হয়ে যাবেন। আর এই যে বোধ 'আমি কৃষ্ণ হয়েছি', এই বোধে আমি বোধটা থাকছে। সেইজন্য 'আমি কৃষ্ণ হয়েছি' এই ভাবও ভক্তিরই অঙ্গ। গোপীরা তাই কখনই জ্ঞানীর স্বভাব অনুকরণ করে অভিনয় করতেন না। কিন্তু ভক্তির অভিব্যক্তি যত রকমের হতে পারে তার সবটাই এই রাসলীলাতে পাওয়া যায়। যাই হোক গোপীরা সমস্ত বনলতা, তরু, বৃক্ষ সবাইকে জিজ্ঞেস করছেন তোমরা কি আমার কৃষ্ণকে দেখেছ? কিভাবে কাকে কাকে প্রশ্ন করছেন এর উপর একটা দীর্ঘ বিবরণ দেওয়া হয়েছে। আমরা এর বেশী আর আলোচনায় যাচ্ছি না।

এরপর ব্যাসদেব পুরো কাব্য রসে নেমে যাচ্ছেন। এই জায়গাতে আবার বাল্মীকি রামায়ণেরর খুব প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। বাল্মীকি রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্র যা কিছু দেখছেন, হরিণকে দেখছেন, গাছ দেখছেন, পাহাড় দেখছেন সবাইকে জিজ্ঞেস করছেন তোমরা কি আমার সীতাকে দেখেছ? জিজ্ঞেস করার সময় সীতার বর্ণনা করে যাচ্ছেন, আমার সীতাকে এই রকম দেখতে, এই রকম ফুলের সাজ করত ইত্যাদি। এখানেও ঠিক সেই একই ভাবে গোপীরা তাঁদের প্রিয়তম কৃষ্ণের কথা জিজ্ঞেস করে যাচ্ছেন। ***দৃষ্টো বঃ কচ্চিদশ্বত্থ প্লক্ষ ন্যগ্রোধ নো মনঃ। নন্দসূনুর্গতো হৃত্বা প্রেমহাসাবলোকনৈঃ।।১০/৩০/৫।।*** প্রত্যেকটি গাছের নাম করে করে বলছেন, হে বটবৃক্ষ! তোমরা কি সেই নন্দ নন্দন শ্যামসুন্দরকে দেখেছ যিনি তাঁর মিষ্টি হাসি আর দৃষ্টিপাতে আমাদের মনকে হরণ করে নিয়েছেন? গোপীদের মনের অবস্থাকে এখানে কাব্যিক শৈলীতে বর্ণনা করা হচ্ছে। এইভাবে গোপীদের মনের অবস্থাকে বিস্তৃত করে বর্ণনা করে যাচ্ছেন। একটা জায়গায় গোপীরা বৃক্ষদের খুব করুণ স্বরে বলছেন 'তোমাদের জন্ম তো পরোপকারের জন্যই হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ বিনা আমাদের জীবন শূন্যময়, তাঁর বিরহে আমাদের চেতনা লুপ্ত হতে বসেছে। তোমরা দয়া করে আমাদের বলে দাও, কোন্ পথে শ্রীকৃষ্ণ গেছেন, কোন্ পথে গেলে শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্য পাওয়া যাবে'। হিন্দীতে খুব সুন্দর একটা দোঁহা আছে যার অর্থ হল বৃক্ষ নিজের ফল কখনই খায় না আর সরোবর নিজের জল কখনই পান করে না। ঠিক তেমনি সাধু সন্ন্যাসীদের শরীর ধারণ শুধু অপরের সেবার জন্যই, কোন কিছুতেই নিজের কোন স্বার্থ থাকে না। গোপীরা এই কথাই বলছেন, হে বৃক্ষ তোমরা তো নিজের জন্য কিছুই কর না, যা কর অপরের জন্যই কর। তোমরা ফল দান কর, শীতল ছায়া দাও, কাঠ দাও। আমাদের জন্য একটু পরোপকার করো না, একটু বলে দাও না আমাদের প্রাণনাথ কৃষ্ণ কোন দিকে গেছেন।

এই কথাগুলো বিরহের যে কি গভীর মর্মস্পর্শী অভিব্যক্তি, আমাদের অনুধাবন করা সত্যিই অসাধ্য। একশ কি দেড়শ বছর আগে ঠিক এই মানসিকতা নিয়ে যদি রাসলীলার আলোচনা আমরা করতাম, আমরা হয়তো তখন রাসলীলার ভাব এতটা বুঝতে পারতাম না। কিন্তু ঠাকুরের আবির্ভাবের পর তাঁর সাধনার যে ইতিহাস এখন আমাদের কাছে এসে গেছে, সেখানে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে তিনিও ঠিক এই ভাবকে তাঁর আধ্যাত্মিক সাধনার দ্বারা পরিপুষ্ট করেছিলেন, ঠাকুরের জীবনে গোপীদের এই ভাবই পুনারাভিনীত হয়েছে। শুধু তাই নয়, পরবর্তি কালে আগত ভক্তদের কাছে তিনি তাঁর সাধনজীবনের কথা বলছেন, যেটা কথামৃতের পাতায় লিপিবদ্ধ হয়ে আছে, সেখানে যখন তিনি গোপীদের প্রসঙ্গে কিছু বলছেন তখন তিনি ভাবে বিহুল হয়ে যাচ্ছেন, অশ্রুধারায় তাঁর বক্ষ সিক্ত হয়ে যাচ্ছে, এতই উচ্চ ভাব। যারা ঈশ্বরের জন্য দু ফোঁটা চোখের জল ফেলেনি, তাদেরকে ঈশ্বর বিরহে হৃদয়ের জ্বালা বোঝান অসম্ভব। খ্রীশ্চান পরম্পরাতে Dark night of the soul নামে

সাধকের একটা অবস্থার কথা বলা হয়, ঈশ্বর দর্শনের আগে সাধকের মনে হয় ঈশ্বর যেন তাকে ছেড়ে দিয়েছেন, তার সমস্ত কিছু যেন বিফল হতে বসেছে। তখন যে ছটফটানিটা হয় ঠিক সেই অবস্থার কথা কবি ব্যাসদেব এখানে নিজের মত বর্ণনা করছেন।

তারপর ব্যাসদেব একটা খুব সুন্দর দৃশ্যের বর্ণনা করে বলছেন ***কচ্চিত্তুলসি কল্যাণি গোবিন্দচরণপ্রিয়ে। স ত্বালিকুলৈর্বিভ্রদ্ দৃষ্টস্তেহতিপ্রিয়োহচ্যুতঃ।।১০/৩০/৭।*** তুলসিকে উদ্দেশ্য করে গোপীরা বলছেন 'হে তুলসী! সবার কল্যাণ সাধনই তোমার ব্রত আর শ্রীগোবিন্দের চরণযুগলেই তোমার পরম প্রেম, তাঁর চরণস্পর্শ ছাড়া তুমি অন্য কিছুই আকাঙ্খা করো না'। গোপীরা এখন শ্রীকৃষ্ণকে কৃষ্ণ রূপে দেখছেন না, তাঁকে ভগবান রূপেই দেখছেন। কারণ ভগবানের চরণেই তুলসী নিবেদন করা হয়। ভগবানের হৃদয়ে বাস করেন মা লক্ষ্মী কিন্তু তাঁর চরণকমলের অধিকারিণী হলেন একমাত্র তুলসী। গোপীরা বলছেন 'তুমি ভগবানের এতই প্রিয়তমা যে ভগবান যে তোমার মালা গলায় পরিধান করেন তার এমনই সুগন্ধ যে তোমার মালাকে ভগবান কখনই ছাড়তে চান না। তাই হে তুলসী! তুমি তোমার সেই পরম প্রিয় শ্যামসুন্দরকে কি দেখেছ'? তীব্র ভালোবাসা ও প্রেম কারুর প্রতি না থাকলে রাসলীলার এই শ্লোকগুলোকে ধারণা করা খুব কঠিন।

আরেকটি শ্লোকে বলছেন ***কিং তে কৃতং ক্ষিতি তপো বত কেশবাঙ্ঘ্রিস্পর্শোৎসবোৎ-পুলকিতাঙ্গরুহৈর্বিভাসি। অপ্যঙ্ঘ্রিসম্ভব উরুক্রমগবিক্রমাদ্ বা আহো বরাহবপুষঃ পরিরম্ভণেন ।।১০/৩০/১০।।*** এতক্ষণ গাছপালা, তরুলতাদের জিজ্ঞেস করার পর এবার পৃথিবীকে জিজ্ঞেস করছেন। এই যে পৃথিবীর চারিদিকে এত বৃক্ষ, তরুলতা উদ্ভিদ জন্ম নিয়েছে, গোপীরা ভাবছেন এরাই হল পৃথিবীর আনন্দোচ্ছাসের অভিব্যক্তি। প্রচণ্ড আনন্দে বা খুব আবেগে যেমন মানুষের শরীরের লোম সজারুর কাঁটার মত দাঁড়িয়ে যায়, পৃথিবীর লোম হল এই গাছ-পালাগুলো, আনন্দে লোম যেমন দাঁড়িয়ে যায় ঠিক তেমনি পৃথিবীর সব লোমকূপ গুলো দাঁড়িয়ে গেছে। গোপীরা তাই পৃথিবীকে জিজ্ঞেস করছেন 'হে পৃথিবী! তোমার এত আনন্দের কারণ কি? কি কারণে তোমার শরীর এত রোমাঞ্চিত হচ্ছে? নিশ্চয়ই তুমি শ্রীকৃষ্ণের চরণযুগলের স্পর্শ পেয়েছ'! গোপীদের ভাব কোন পর্যায়ে চলে গেছে! প্রকৃতির নিয়মে পৃথিবীর বুকে গাছপালা তো এমনিতেই দাঁড়িয়ে থাকার কথা। কিন্তু গোপীদের এমন ভাব যে তাঁরা দেখছেন পৃথিবী রোমাঞ্চিত হয়ে আছে আর তার লোমগুলো দাঁড়িয়ে গেছে। এর পরের লাইনেই আবার বলছেন, শ্রীকৃষ্ণ যখন বরাহ অবতার হয়ে এসেছিলেন তখন হিরণ্যাক্ষের আক্রমণ থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করার জন্য পৃথিবীকে ভগবান জলের নীচে লুকিয়ে রেখে দিয়েছিলেন। তারপর হিরণ্যাক্ষকে বরাহ রূপ ধারণ করে বধ করলেন, বধ করার পর আবার পৃথিবীকে জল থেকে তুলে যথা স্থানে রেখে দিলেন। গোপীরা বলছেন, ভগবান যখন তোমাকে একবার তুলে জলের তলায় রাখলেন আবার সেখান থেকে তুলে এনে তোমার নিজের জায়গায় রেখে দিলেন তখন তো ভগবানের সেই পূত শরীরের সম্পূর্ণ স্পর্শটাই তুমি পেয়েছিলে। ভগবানের দেহের ওই পবিত্র স্পর্শ পেয়ে তোমার যে রোমাঞ্চ হয়েছিল সেই রোমাঞ্চ এখনও তোমার দেহে মনে রোমাঞ্চিত হয়ে চলেছে বলে তোমার লোমগুলো বৃক্ষ রূপে সব দাঁড়িয়ে আছে। গোপীরা বৃক্ষগুলিকে পৃথিবীর শরীরের রোম কল্পনা করছে আর সেই রোমকূপ সব রোমাঞ্চ রূপে দাঁড়িয়ে আছে। তার মানে রোমাঞ্চের দুটো দিকে এসে যাচ্ছে। একটা হল চিরস্থায়ী রোমাঞ্চ এই মনে করে, যাঁকে ভালো বেসেছিলাম তিনি আমাকে বুকে জড়িয়ে ছিলেন। আর দ্বিতীয় সেই শ্রীকৃষ্ণ অবতারে তিনি তাঁর চরণ ধরণীর বুকে পড়েছে, ভগবানের চরণ স্পর্শ পৃথিবীর বুকে পড়েছে তাই এত আনন্দ। খুব সুস্বাদু জিনিষ খাওয়ার অনেক দিন পরেও যেমন বলে সেই স্বাদ এখনও মুখে লেগে আছে, গোপীরাও ঠিক এই কথাই পৃথিবীকে উদ্দেশ্য করে বলছেন। 'বরাহ অবতারে তোমাকে ভগবান তুলে এনে জলের নীচে রেখেছিলেন আর হিরণ্যাক্ষকে বধ করার পর আবার তোমাকে বুকে করে জল থেকে তুলে যথা স্থানে স্থাপন করে দিয়েছিলেন। তোমার তো ভগবানের সঙ্গে পুরো আলিঙ্গনটাই হয়ে গিয়েছিল, সেই আনন্দ এখনও তোমার মধ্যে রোমাঞ্চ সৃষ্টি করে যাচ্ছে। তুমি তো জানো আমাদের প্রাণবল্লভ ব্রজেশ্বর কোন দিকে গেছেন'। গোপীরা আবার বনভূমিতে হরিণাদি পশুদের শ্রীকৃষ্ণের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করছেন। এই ভাবে তাঁরা বনের মধ্যে কৃষ্ণ বিরহে উন্মত্ত হয়ে শ্রীকৃষ্ণের অনুসন্ধানে বিচরণ করে যাচ্ছেন। একটা জায়গায় এসে বলছেন 'দেখো! দেখো!

এখানে একটা বিশেষ গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে’। সেই গন্ধের আঘ্রাণ নেওয়ার পর বলছেন ‘এতো সেই মালার গন্ধ যে মালা শ্রীকৃষ্ণ গলায় পরিধান করে থাকেন। তাহলে নিশ্চয়ই তিনি এখানে কারুর সঙ্গে আলিঙ্গন করেছিলেন’।

এইভাবে গোপীরা নানান রকমের বর্ণনা দিয়ে যাচ্ছেন। সেই রকমই একটা দৃশ্যের বর্ণনা করছেন ***পৃচ্ছতেমা লতা বাহূনপ্যাশ্লিষ্টা বনস্পতেঃ। নূনং তৎ করজস্পৃষ্টা বিভ্রত্যুৎপুলকান্যহো।।১০/৩০/১৩।।*** *পৃচ্ছতেমা লতা বাহূ*, এই লতাগুলো বৃক্ষের শাখা বাহুগুলিকে নিজের পতিস্বরূপ ভেবে ভুজপাশে জড়িয়ে আছে। কিন্তু লতাদের যে আনন্দ হচ্ছে সেটা বৃক্ষদের জড়িয়ে রাখার জন্য হচ্ছে না, শ্রীকৃষ্ণ নখ দিয়ে এই লতাদের স্পর্শ করেছিলেন, সেইজন্য এদের এই রোমাঞ্চ হচ্ছে। এখানে অর্থ হল, যাজ্ঞবল্ক নিজের স্ত্রী মৈত্রেয়ীকে বলছেন মানুষ যখন কোন কিছুকে ভালোবাসে তখন সেই বস্তুর জন্য তাকে ভালোবাসে না, সেই বস্তুর মধ্যে সে নিজের আত্মাকে দর্শন করে বলে ভালোবাসে। ঠিক তেমনি আমরা যে আনন্দ পাই সেই আনন্দ কখন বস্তু দিয়ে আসে না, তার মধ্যে দিব্য ভাব না থাকলে সেই আনন্দ অনুভূত হবে না। বেলুড় মঠে খিচুরি প্রসাদ খেয়ে যে আনন্দ হয় সেটা খিচুরির জন্য হয় না, খিচুরিতে ভগবানের দিব্য স্পর্শ আছে বলেই ঐ আনন্দ অনুভব হচ্ছে। যে জায়গাতে আধ্যাত্মিক ভাব জড়িয়ে নেই সেই জায়গাতে যে আনন্দের অনুভূতি হয় সেই আনন্দটা সব সময় একটা সীমার দ্বারা বদ্ধ থাকে, ঐ সীমাটাকে সে কখনই ছাড়িয়ে যেতে পারেনা। এই কথাই ব্যাসদেব বলছেন, মানুষের কথা তো অনেক দূরে এমন কি লতা গুল্মাদিরও যে আনন্দ অনুভব করছে সেটা তাদের প্রিয়তম বৃক্ষকে জড়িয়ে রয়েছে বলে অনুভব করছে তা নয়, এখানে একটা আধ্যাত্মিকতা ব্যাপার রয়েছে কারণ শ্রীকৃষ্ণ তাদের স্পর্শ করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ওখানে গরু চড়াতেন, গোপ বালকদের সাথে খেলাধূলা করতে গিয়ে কখন সখন তাদের স্পর্শ করেছেন বা সেই রাত্রিতেই তিনি এদের স্পর্শ করে থাকতে পারেন। এই বনভূমিতে শ্রীকৃষ্ণের নিয়মিত আসা-যাওয়া ছিল।

জড়ের চিন্তনে আর চৈতন্যের চিন্তনে উন্মাদ হয়ে যাওয়ার মধ্যে পার্থক্য

গোপীরা এখন শ্রীকৃষ্ণের ভাবে একেবারে বিভোর হয়ে গেছেন। শুকদেব বলছেন ***ইত্যুন্মত্তবচোগোপ্যঃ কৃষ্ণান্বেষণকাতরাঃ। লীলা ভগবতস্তাস্তা হ্যনুচক্রুস্তদাত্মিকাঃ।।১০/৩০/১৪।।*** গোপীরা এইভাবে পরস্পর নানা রকম শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় আবেগমথিত বাক্যালাপ ও শ্রীকৃষ্ণের গুণগান করতে করতে সবার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের ভাব আরও গাঢ় রূপ ধারণ করেছে। যে কৃষ্ণকে তাঁরা প্রথম দিন থেকে ভালোবেসে আসছেন, সেই ভালোবাসার নিধিকে আজ কত নিবিড় অন্তরঙ্গ ভাবে কাছে পেয়েছিলেন, কিন্তু ক্ষণিকের অন্তরঙ্গতাকে নিমেষে হতাশার অন্ধকারে ফেলে দিয়ে শ্রীকৃষ্ণ গোপললনাদের মাঝখান থেকে অন্তর্ধান হয়ে গেলেন। কৃষ্ণ বিরহে প্রথমে তো গোপীরা শ্রীকৃষ্ণের চলন, হাসি, কথাবলা নকল করতে থাকলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের সব কিছু নকল করতে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণের জন্য তাঁদের ছটফটানিটা আরও বেড়ে গিয়ে তাঁরা একেবারে উন্মত্ত হয়ে উঠেছেন। কখন বৃক্ষকে জিজ্ঞেস করছেন, কখন লতাকে আবার কখন পশুদের কাছে শ্রীকৃষ্ণের ব্যাপারে জানতে চাইছেন। এটাই তো উন্মত্তার লক্ষণ। মনস্তাত্ত্বিক বিজ্ঞানে বলে একটা জিনিষকে অনেকক্ষণ ধরে ভাবতে ভাবতে মনের মধ্যে অনেক অলীক কল্পনা তৈরী হয়। আবার এও বলা হয় মানুষ কোন জড় জিনিষ, যেমন টাকা-পয়সা, গহনা, গাড়ি বাড়ি এসব নিয়ে খুব বেশী চিন্তা করতে করতে তার মাথাটা বিগড়ে যায়। জড়কে চিন্তা করে করে মানুষ যেমন পাগল হয়ে যায় তেমনি আবার জড় বস্তুকে পেয়েও মানুষ বদ্ধ পাগল হয়ে যায়। জড় জিনিষকে চিন্তা করে করে মানুষ যে উন্মাদ হয়ে যায় গোপীদের এই উন্মাদ সেই উন্মাদ নয়। গোপীরা চৈতন্যের চিন্তা করতে করতে উন্মাদ হয়ে যাচ্ছেন। এখানে বলছেন *তদাত্মিকা*, চৈতন্যের চিন্তা করে করে গোপীরা তদাত্মিকা হয়ে গেছেন। কথামৃতে বর্ণনা আছে, ঠাকুর এক জায়গায় বলছেন ‘অমুক বলছিল ঈশ্বর চিন্তা করে করে আমি নাকি একেবারে বেহেড হয়ে গেছি! আমি চৈতন্যের চিন্তা করে বেহেড হয়ে গেছি আর তুমি জড়ের চিন্তা করে দিব্যি আছ, তাই তো বলতে চাইছো’! মানুষ বেহেড হয় জড়ের চিন্তা করে। টাকা-পয়সা, কামিনী-কাঞ্চন, নাম-যশ, ক্ষমতা, পদমর্যাদা এগুলোকে যখনই কেউ চিন্তা করছে সে বেহেড হয়ে যাবেই যাবে। অথচ দক্ষিণেশ্বরে

ঠাকুরের নামই ছিল পাগলা বামুন। কিন্তু পরের দিকে যখন বিচক্ষণ পণ্ডিতরা ঠাকুরকে দেখছেন তাঁরা তখন বিস্মিত হয়ে যাচ্ছেন।

জড়ের জন্য পাগল আর চৈতন্যের জন্য পাগল হওয়ার মধ্যে তফাৎ আছে। তফাৎটা কোথায়? তদাত্মিকা, চৈতন্যের ভাবে পুরোপুরি নিজে রঞ্জিত হয়ে যান। শুধু তাই না, অপরকেও তিনি প্রেরণা দেওয়ার শক্তি রাখেন। একবার চিন্তা করুন, একজন একটি মেয়েকে চিন্তা করে করে সেই মেয়ের মতই আচরণ করতে শুরু করল, মেয়েদের মত জামা-কাপড় পড়ছে, হাঁটাচলা সব মেয়েদের মতই করছে। সে কি কখন অন্যকে প্রেরণা দিতে পারবে যে তুমিও আমার প্রেমিকার মত হয়ে যাও? এবার ঠাকুরের কথা ভাবুন। তিনি দিন রাত মা মা করে যাচ্ছেন, ঈশ্বর বই তিনি কিছুই জানতেন না, ঈশ্বরের কথা ভাবতে ভাবতে তিনি ওই ভাবে ভাবময় হয়ে যাচ্ছেন। এই তদাত্মিকা হওয়ার কি পরিণতি দেখছি? সেই তিনিই আবার অপরকে ঈশ্বর প্রেমের রস আস্বাদ করাবার জন্য প্রেরণা দিয়ে ওই পথে নিয়ে যাচ্ছেন। তখনকার দিনে সব নামকরা ব্যক্তিত্ব ঠাকুরের মত লেখাপড়া না করা মানুষের কথা শুনবার জন্য দক্ষিণেশ্বরে ছুটে আসতেন, সেই কথা শুনে তাঁরা উৎসাহিত হচ্ছেন। যুবকরা ঘরবাড়ি ছেড়ে সন্ন্যাসী হয়ে গেলেন, স্বামীজী রামকৃষ্ণ মঠ তৈরী করলেন, আরে এখনও লক্ষ লক্ষ লোক ঠাকুরের কাছে ছুটে আসছে, কত যুবক সন্ন্যাসী হয়ে যাচ্ছে।

জড়ের চিন্তন আর চৈতন্যের চিন্তনে এটাই তফাৎ। গোপীরা শ্রীকৃষ্ণের চিন্তা করে যে বেহেড হয়ে গেছেন এই বেহেড এখনও অগণিত ভক্তকে প্রেরণা দিয়ে চলেছে। গোপীরা যদি জাগতিক কোন বস্তুর জন্য বেহেড হয়ে এই রকম উন্মত্তের মত আচরণ করতেন তখন এই উন্মত্ততা কাউকেই প্রেরণা দিত না। তদাত্মিকাতে পুরো ব্যাপারটা অন্য রকম হয়ে যায়। ভক্তি কি রকম হবে, জ্ঞান কি রকম হবে, মানুষ যখন আত্মাকে নিয়ে চিন্তন করে তখন চৈতন্যের সঙ্গে কি রকম এক হয়ে যাবে সেটাকেই গীতাতে ভগবান খুব সুন্দর বিশ্লেষণ করে বলছেন *তদ্‌বুদ্ধয়স্তদাত্মানস্তন্নিষ্ঠাস্তৎপরায়ণাঃ*। যখন ভগবানের প্রতি মানুষের সত্যিকারের ভালোবাসা হয়ে যায় তখন সবটা তদ্ হয়ে এক হয়ে যায়। '*তৎ বুদ্ধয়ঃ, তদাত্মনঃ*' মন, বুদ্ধি, চিন্তা সব কিছু সেখানে একাকার হয়ে মিশে গিয়ে ওই ভাব এসে যায়। তখন তাঁর শরীরকে কেটে দিলেও কিছু মনে হবে না, আবার তাঁর শরীরকে কেউ খুব আদর যত্ন করলেও তাঁর কিছু যায় আসে না।

গোপীরাও ঠিক ওই ভাবে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তদাত্মিকা হয়ে গেছেন। তদাত্মিকা সবাইকেই হতে হবে, তদাত্মিকা মানে তৎ আত্মা, সেই আত্মার সঙ্গে এক হয়ে যাওয়া। আমাদেরও তদাত্মিকা হয়, তদাত্মিকা না হলে কিছু চলতেই পারবে না। কিন্তু আমাদের তদাত্মিকা হয় শরীরের সঙ্গে। শরীরের সঙ্গে আমাদের আত্মবোধ এত গভীর যে শরীরটাকেই সব কিছু মনে করছি। এক অপরকে আনন্দে রাখার জন্য সবাই অপরের শরীরকেই তুষ্ট করে, ভালো করে খাইয়ে দেবে, কিংবা ভালো পোশাক কিনে দেবে। বলে, স্ত্রী স্বামীকে ভালোমন্দ খাইয়ে বশে রাখে আর স্বামী ভালো শাড়ি-গয়না দিয়ে স্ত্রীকে বশে রাখে। মূল কথা হল এক অপরকে খুশী রাখতে হলে শরীর দিয়েই খুশী রাখতে হয়। কারণ সবারই শরীর ছাড়া আর কোথাও আনন্দ পায় না। অথচ মহাপুরুষদের খেয়ালই থাকে না, কখন কি খাবেন, কোথায় ঘুমোবেন, কি পরিধান করবেন। ঠাকুর কামারপুকুরে গিয়ে রোজ সকালে উঠে বাড়ির লোকদের জিজ্ঞেস করছেন আজ কি রান্না হবে। হঠাৎ একদিন তাঁর মনে হল ছিঃ এ আমি কি করছি! সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মাথা থেকে খাবারের কথা নেমে গেল, যা দেবে তাই খেয়ে নেবেন। তদাত্মানা সবারই থাকে, আমার আপনার সবারই মন, শ্রীরামকৃষ্ণের মন, গোপীদের মন একটা বৃত্তিকে তো নিয়ে থাকতে হবে। মনের ধর্মই হল কোন একটা জিনিষের সঙ্গে তাকে এক মনে করতে হবে। তফাৎ শুধু, যাঁরা জ্ঞানী তাঁরা আত্মার সঙ্গে নিজেকে এক মনে করেন, গোপীরা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে এক মনে করছেন, ঠাকুর কখন আত্মজ্ঞানে এক মনে করছেন আবার কখন মা কালীর সঙ্গে নিজেকে এক মনে করছেন আর আমরা নিজেদের দেহের সঙ্গে এক মনে করছি। সদ্যোজাত শিশুর শরীরের সাথে মা তার নিজের শরীরকে এক মনে করে। আসলে তো তাই, মায়ের শরীর থেকেই তো শিশুটি বেরিয়েছে। বাচ্চার যদি কোন কষ্ট হয় মা সেই কষ্ট সহ্য করতে পারে না। তাই তদাত্মানা ভাব সবারই আছে। আমরা সবাই কোন না কোন কিছুর সঙ্গে একাত্ম হয়ে আছি, শুধু

আত্মার পরিভাষাটা পাল্টে যায়। তবে কখন সখন দেখা যায়, যারা নিজেদের শরীরের বোধ থেকে বেরিয়ে এসেছেন তারা নিজের মনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে পড়েন।

এখানে একজন কি দুজন গোপী তদাত্মিকা হচ্ছেন না, যত জন গোপী ছিলেন সবারই এক অবস্থা, সবাই শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে একাত্ম বোধ করছেন। তার ফলে কি হয়েছে? *লীলা ভগবতস্তাস্তা*, এবারে এই ছটফটানির দাপটে সবাই শ্রীকৃষ্ণ ছোটবেলা থেকে যত লীলা করেছিলেন, তাঁরা এখন এক অপরের সাথে সেই লীলার অনুকরণ করতে শুরু করেছেন। শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা থেকে এতদিন যত লীলা কাহিনী আমরা আলোচনা করে এসেছি, সব গোপীরা সেই লীলাগুলো নিজেদের মধ্যে অভিনয় করতে শুরু করেছেন। যেমন একজন পূতনা হয়ে গেছেন, আরেকজন কৃষ্ণ হয়ে তাঁর বুকে মুখ রেখে যেন তাঁকে বধ করতে যাচ্ছেন। ***কৃষ্ণরামায়িতে দ্বে তু গোপায়ন্ত্যশ্চ কাশ্চন। বৎসায়তীং হন্তি চান্যা তত্রৈকা তু বকায়তীম্।।১০/৩০/১৭।।*** কেউ বা বলরাম হয়েছেন, কেউবা গোপগোপী হয়ে গেছেন, আবার কেউবা বকাসুর, কেউবা বৎসাসুর হয়ে শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন লীলার অভিনয় করছেন। অভিনয় করছেন মানে এখানে গোপীরা কোন নাটক পরিবেশন করছেন না, তাঁরা ভগবানের লীলার অনুকরণ করে চলেছেন। এমনই লীলার অনুকরণ করছেন যে ভগবানের ভাবে তাঁরা সবাই হারিয়ে গেছেন।

কিছু দিন আগে এক ভদ্রলোক খুব দুঃখ করে বলছিলেন তাঁর এক ভাইপো লণ্ডনে থাকে, সেখান থেকে সে তার দিদিকে খুব আক্ষেপ করে বলছিল ‘মুসলমানরা হিন্দুদের নিন্দা করে বলে তোমাদের দেশের যে কোন খবরের কাগজ খুললে শুধু ধর্ষণ আর ধর্ষনের খবর। তোমাদের দেশে ধর্ষণ তো হবেই, ভারতে ধর্ষণ না হওয়ার তো কোন কারণ নেই। কারণ তোমাদের ভগবানই মেয়েদের বস্ত্র হরণ করেছিল, তার ভক্তরাও তো তাই করবে’। ছেলেটি দিদিকে বলছে ‘আমি এর কোন উত্তর দিতে পারলাম না’। আসলে শুধু খবরের কাগজ আর কয়েকটা ম্যাগাজিন পড়ে এর উত্তর দেওয়া যায় না। আগে তুমি নিজে ঠিক করে নাও শ্রীকৃষ্ণকে তুমি কি রূপে দেখছ, তুমি কি তাঁকে ভগবান রূপে দেখছ নাকি একজন মানুষ রূপে দেখছ। কিন্তু তোমরাই তো বলছো ‘তোমাদের ভগবান’, ভগবান শব্দটা তো তোমরাই ব্যবহার করছো। ভগবান তো স্রষ্টা, যিনি স্রষ্টা তাঁর কাছে কাপড় আর কাপড় ছাড়ার মধ্যে কি তফাৎ! মা যদি তার বাচ্চাকে কাপড় পড়িয়ে দেয় আর কাপড় খুলেই দেয় তাতে হলোটা কি! একটা দুই এক বছরের বাচ্চাকে মা কাপড় পড়ালেও কি আর কাপড় খুলে দিলেই বা কি! কিন্তু একটা চার বছরের বাচ্চা অন্য লোকের কাছে কাপড় খুলতে চাইবে না, কিন্তু তার মায়ের কাছে কোন ব্যাপারই থাকবে না। আগে তুমি তাই ঠিক করে নাও, শ্রীকৃষ্ণ কি ভগবান নাকি মানুষ। তোমার দৃষ্টিভঙ্গীতে যদি তিনি মানুষই হন তাহলেও তোমার আর কিছু বলার নেই। যদি ভগবান হন তাহলেও কিছু বলার নেই। ভগবানের সামনে কাপড় খুলতে কারুর তো আপত্তি হওয়ার কথাই নয়।

খ্রীশ্চান নানরা বাথরুমে যখন স্নান করেন তখন তাঁরা সবস্ত্র স্নান করেন, তাঁদের ধারণা যে, যে ভগবান সর্বত্র আছেন সেই ভগবানের সামনে বস্ত্রহীন কিভাবে হওয়া যাবে! যাঁরা সমালোচক, তাঁরা এই নিয়ে অনেক সমালোচনা করেন। যে ভগবান সর্বত্র, সেই ভগবান তো তোমার কাপড়ের ভেতরেও আছেন। তোমরা বলছো ‘তোমাদের ভগবান’, তাহলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যদি গোপীদের বস্ত্র হরণ করেন তাতে আপত্তির কি আছে! সমস্যা হল আমরা মুখে ভগবান বলছি আর দেখছি মানুষ রূপে। এভাবে তো কোন কিছুর বিচার করা যায় না। যদি ভগবান বলেন তাহলে ভগবানের মত দেখুন, মানুষ যদি বলেন তাহলে মানুষের মত দেখতে থাকুন। এই সব জায়গায় এসে আমাদের সমস্যা হয়। কিন্তু এখানে যখন ভগবান এসে গেছেন তখন ভগবানের লীলাও এসে গেছে। ভগবানের লীলা আবার মানুষের লীলার মত চলে না। কোন সিনেমা বা যাত্রাতে কোন সামাজিক কাহিনী দেখার সময় আমাদের মধ্যে যে অনুভূতি হয় আবার যখন রামলীলা বা কৃষ্ণলীলা দেখছি তখন সেই একই অনুভূতি হবে না। এখানে অনুভূতি আলাদা হয়ে যায়। সামাজিক কাহিনীতে বিভিন্ন ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত চলতে থাকে। কিন্তু ভগবানের কাহিনীতে ঘটনা হয় না, সেখানে লীলা হয়। লীলার জন্য নানা রকমের চরিত্রকে আসতে হয় যাতে লীলা পোষ্টাই হয়। সেইজন্য সেই সময় কেউ বলে না যে আমি কৃষ্ণের অভিনয় করব কিংবা

আমি পূতনা হব, এখানে দুটোই সমান। ভাবের অবস্থায় এগুলো কোন সমস্যা তৈরী করে না। আধ্যাত্মিক জীবনে একটু পরিপক্কতা না হলে এই জিনিষগুলো বোঝা খুব মুশকিল। যিশুখ্রীষ্টকে ধরিয়ে দিয়েছিল তাঁরই এক শিষ্য জুডাস্। স্বামীজী এক জায়গায় বেদান্ত তত্ত্বকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলছেন 'আমিই যিশু, আমিই বিশ্বাসঘাতক জুডাস্'। উপলব্ধির এই স্তরে গিয়ে যখন সব কিছু কৃষ্ণময় দেখছে তখন এই তফাৎ থাকে না যে এটা পূতনা এটা কৃষ্ণ। তফাৎ থাকবে, যখন আমরা সিনেমা বা যাত্রা দেখছি। কিন্তু যখন রামলীলা বা কৃষ্ণলীলা হয় তখন এই তফাৎটা থাকে না, কারণ সেখানে যিনি কৃষ্ণ তিনিই কংস হয়েছেন, যিনি কৃষ্ণ তিনিই পূতনা হয়েছেন। আর যিনি ভাবে একেবারে বিভোর হয়ে গেছেন তাঁর কাছে এগুলোর কোন ভেদ থাকে না। এমনকি ছৌ নাচে ধর্মীয় কাহিনীকে আধার করে নৃত্যনাট্য তৈরী করা হলেও তার মধ্যে ঐ আধ্যাত্মিক ভাব থাকে না বলে এই তফাৎটা সেখানেও থেকে যায়। কিন্তু এখানে সবাই সত্যিকারের ঐ ভাব নিয়ে মত্ত হয়ে আছেন। এমনকি একজন গোপী বলছেন ***কস্যাংচিৎ স্বভুজং ন্যস্য চলন্ত্যাহাপরা ননু। কৃষ্ণোহহং পশ্যত গতিং ললিতামিতি তন্মনাঃ।।১০/৩০/১৯।।*** এক গোপী অন্য গোপীর গলা জড়িয়ে সবাইকে বলছেন 'দেখো তোমরা! আমি কৃষ্ণ হয়েছি। আমার চাল চলন দেখো কী মনোহর'! এই বলে শ্রীকৃষ্ণের গতিভঙ্গিকে অনুকরণ করে চলতে শুরু করেছেন। গোপীদের কোন হুঁশ নেই, তাঁরা নিজেদের গোপী বলে মনেই করতে পারছেন না। অন্য একজন গোপী বলছেন ***মা ভৈষ্ট বাতবর্ষাভয়ং তৎত্রাণং বিহিতং ময়া। ইত্যুক্তৈকেন হস্তেন যতন্ত্যুন্নিদধেহম্বরম্।।১০/৩০/২০।।*** শ্রীকৃষ্ণ গোবর্ধন পর্বত ধারণ করার সময় যেভাবে ব্রজের সবাইকে আশ্বাস দিয়েছিলেন ঠিক সেইভাবে এক ব্রজগোপী বলছে 'হে ব্রজবাসী! তোমরা ভয় পেও না। এই ঝঞ্ঝা থেকে বাঁচানর পথ আমি পেয়ে গেছি'। এইভাবে কয়েকটি শ্লোকের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের পুরো জীবনীটা সংক্ষেপে রেখে দেওয়া হয়েছে।

আবার কোন গোপী কালিয় নাগের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন, তখন অন্য এক গোপী শ্রীকৃষ্ণের মত তাঁর মাথায় পা রেখে বলছেন 'ওরে দুষ্ট নাগ! তুই এখান থেকে এক্ষুণি চলে যা, আমি দুষ্টদের দমনের জন্য আবির্ভূত হয়েছি'। ***এবং কৃষ্ণং পৃচ্ছমানা বৃন্দাবনলতাস্তরূন্। ব্যচক্ষত বনোদ্দেশে পদানি পরমাত্মনঃ।। ১০/৩০/২৪।।*** এইভাবে অভিনয় করতে করতে কৃষ্ণলীলা রসে মগ্ন হয়ে গোপীরা শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণে এগিয়ে চলেছেন। আর যেতে যেতে আবার তাঁরা বৃন্দাবনের তরুলতাদের কাছে শ্রীকৃষ্ণের কথা জিজ্ঞেস করছেন। যেতে যেতে গোপীরা হঠাৎ পূর্ণিমার স্নিগ্ধ মনোরম আলোতে মাটির ধূলিপথে শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন, মানে পরমাত্মার চরণচিহ্ন দেখতে পেলেন।

জ্যোতিষ বিদ্যা ও সামুদ্রিক বিদ্যা

ওই পদচিহ্নে কি দেখছেন? ***পদানি ব্যক্তমেতানি নন্দসুনোর্মহাত্মনঃ। লক্ষ্যন্তে হি ধ্বজাম্ভোজবজ্রাঙ্কুশযবাদিভিঃ।।১০/৩০/২৫।।*** জ্যোৎস্নার ওই ম্লান আলোতেও তাঁরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন পদচিহ্নে ধ্বজা, পদ্ম, চক্র, বজ্র, অঙ্কুশ, যব ইত্যাদির ছাপ রয়েছে। তার মানে শ্রীকৃষ্ণ এই পথ দিয়েই গেছেন। বর্তমানে জ্যোতিষ শাস্ত্র ভারতে দুই রকমের, একটাকে বলা হয় জ্যোতিষ বিদ্যা আরেকটিকে বলা হয় সামুদ্রিক বিদ্যা। হস্তরেখা বিচার করাটা সামুদ্রিক বিদ্যা। আমাদের পরম্পরাতে পণ্ডিতরা সামুদ্রিক বিদ্যাকে কোন গুরুত্ব দিতেন না। সামুদ্রিক বিদ্যা ভারতে পাশ্চাত্য জগৎ থেকে এসেছে। পাশ্চাত্যে কিরো নামে একজন জ্যোতিষী ছিলেন, তিনিই এই বিদ্যাকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। কিন্তু এখানে যেটা বলা হচ্ছে এটাই ঠিক ঠিক জ্যোতিষ শাস্ত্র। ভারতে জ্যোতিষ শাস্ত্রে কখন হস্তরেখা দিয়ে বিচার করার কথা বলা হয় না। হস্তরেখা বিচার করা হল সামুদ্রিক বিদ্যা, ভারতের পণ্ডিতরা এই বিদ্যা অনুসরণ করতেন না। কিন্তু মাঝখান থেকে পাশ্চাত্য দেশ থেকে সামুদ্রিক বিদ্যা আর ভারতের জ্যোতিষ বিদ্যা এই দুটোকে মিলিয়ে জগাখিচুরি বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। পাশ্চাত্য জ্যোতিষ বিদ্যা, সামুদ্রিক বিদ্যা আর জ্যোতিষ বিদ্যা এই তিনটেই পুরো আলাদা বিদ্যা। ভারতের ঠিক ঠিক জ্যোতিষ বিদ্যা হল শরীরের বিভিন্ন চিহ্নগুলিকে বিচার করা। নবজাতক শিশুর শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের চিহ্ন দেখে নবজাতকের সব কিছু বিচার করাটাই ভারতের প্রাচীন জ্যোতিষ বিদ্যার অন্তর্গত।

যেমন শরীরের বিভিন্ন জায়গায় তিল থাকলে বিভিন্ন অর্থ হয়। যারা রাজপুরুষ হন তাঁদের পায়ের নীচে কিছু কিছু বিশেষ চিহ্ন থাকে, হাতেও কিছু কিছু চিহ্ন থাকে। জ্যোতিষ পণ্ডিতদের মত ছিল যিনি অবতার হন তাঁর পায়ে এই চিহ্নগুলো থাকবে, যেটা এখানে শ্রীকৃষ্ণের পায়ের ছাপে গোপীরা লক্ষ্য করছেন। এই নিয়ে আমাদের পরম্পরাতে অনেক মজার মজার কাহিনীও সংযোজিত হয়ে আছে।

রাজা ভোজ একবার জঙ্গলে গিয়ে দেখছেন এক কাঠুরে কাঠ কাটছে। রাজা দেখেছেন এই কাঠুরে দেখতে রাজা ভোজের মতই দেখতে। তখন কাঠুরের শরীরের বিভিন্ন চিহ্নগুলো দেখতে শুরু করেছেন। দেখছেন রাজা ভোজের শরীরে যা যা চিহ্ন আছে কাঠুরের শরীরে সব চিহ্নই আছে। তার মানে রাজা হওয়ার যা যা চিহ্ন থাকার কথা সব চিহ্নই কাঠুরের শরীরে আছে। রাজা ভোজ তখন বলছেন 'হয় তুমি নকল ভোজ আর তা নাহলে আমি নকল ভোজ'। কারণে একই রাজ্যে দুজন রাজা থাকবে না। সব চিহ্নই মিলে যাচ্ছে। তারপর হঠাৎ দেখে কাঠুরের পায়ের তলায় একটা তিল। বলে, পায়ের তলায় তিল থাকলে ওপরে যত চিহ্ন আছে সব ব্যর্থ হয়ে যাবে। তাই ঐ তিলের জন্য কাঠুরের সব কিছুই ব্যর্থ হয়ে গেল।

বার্মাতে যখন বৃটিশ সৈন্যরা যুদ্ধ করতে এসেছিল জিম করবেট তাদের ট্রেনিং দিয়েছিলেন। পায়ের ছাপ দেখে বিভিন্ন তথ্য আবিষ্কার করার বিদ্যাটা জিম করবেট খুব ভালো জানতেন। জিম করবেট দেখাচ্ছেন, একটা রাস্তা, সেই রাস্তাটাকে অবশ্যই ধুলোর রাস্তা হতে হবে। ধুলোর উপর পায়ের ছাপ দেখে বলতে হবে কত জন সৈন্য এই রাস্তা দিয়ে গেছে। এরা দ্বারা শত্রুর পক্ষের সৈন্যবল কেমন বলে দেওয়া যাবে। তারা দৌড়ে দৌড়ে গেছে, না মার্চ করতে করতে গেছে সেটাও বলে দেওয়া যাবে। তারা কত ওজনের মালপত্র নিয়ে গেছে, কত লোক আছে সব হিসাব একেবারে পরিষ্কার করে বলে দিতেন। এগুলো পড়ে সত্যিই খুব অবাক লাগে। এর ব্যাখ্যাটা জিম করবেট অনেক পরে দিয়েছেন। বার্মার যুদ্ধে এই বিদ্যাটা খুবই কাজে লেগেছিল। এখানেও ভগবানের পায়ের ছাপের কথা বলা হচ্ছে। এইসব চিহ্নের বিচার করাটাই ভারতীয় জ্যোতিষ শাস্ত্রের অন্তর্গত।

যেমন ভক্তি তেমন তাঁর প্রকাশ

গোপীরা তো পদচিহ্ন দেখেই বুঝে নিয়েছেন যে, এই চরণকমলের ছাপ শ্রীকৃষ্ণ ব্যতিরেকে আর কারুর হতে পারে না। তারপরে কিছুটা এগিয়ে গোপীরা দেখছেন শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্নের পাশে পাশেই কোন নারীর পায়ের ছাপ। একদিকে শ্রীকৃষ্ণের চরণচিহ্ন দেখে গোপীদের যেমন আনন্দ হয়েছে, অন্য দিকে কিছুটা যেতেই সেই পায়ের ছাপের পাশে একটা মেয়ের পায়ের ছাপ দেখে তাঁদের মন খারাপ হয়ে গেল। গোপীদের মনটা আবার নীচে নেমে এসেছে। কারণ তাঁদের এই আমি বোধ, যে আমি বোধে মাৎসর্য্য থাকে, সেই আমি বোধ থেকে ভাবছে আমরা শ্রীকৃষ্ণকে পেলাম না এই গোপী তাঁকে পেয়ে গেল! গোপীরা বলছেন ***কস্যাঃ পদানি চৈতানি যাতায়া নন্দসূনুনা। অংসন্যস্তপ্রকোষ্ঠায়াঃ করেণোঃ করিণা যথা।।১০/৩০/২৭।।*** 'কে সেই নারী যে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে গেছে। এ হল পরম সৌভাগ্যবতী, হস্তিনী যেমন পুরুষ হস্তিকে নিয়ে চলে যায়, এও শ্রীকৃষ্ণের কাঁধে হাত রেখে তাঁকে নিয়ে চলে গেছে'। তার মানে, গোপীরা ভাবছেন, আমরা পড়ে থাকলাম আর কখন সে আমাদের মাঝখান থেকে শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে পালিয়ে গেছে। আমরা এর আগে গীতগোবিন্দের কথা বলেছিলাম। গীতগোবিন্দ খুব উচ্চ আধ্যাত্মিক গ্রন্থ, সাধারণ লোকেদের একেবারেই পড়া উচিত হবে না। সেখানে একটা বর্ণনা আছে, শ্রীরাধা একজন সখীকে শ্রীকৃষ্ণের কাছে খবর আনতে পাঠিয়েছেন, শ্রীকৃষ্ণ সেই সখীকেই ধরে নিজের কাছে রেখে দিয়েছেন। এখানে বলছেন, শ্রীকৃষ্ণের কাঁধে হাত রেখে একজন গোপী চলে গেছে। কাঁধে হাত রেখে গেছেন এই কারণে বলছেন যে, একজনের ডান পায়ের ছাপ আরেকজনের বাম পায়ের ছাপ খুব কাছাকাছি দেখা যাচ্ছে।

গোপীরা বলছেন ***অনয়াহহরাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ। যান্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্ রহঃ।।***১০/৩০/২৮। ভাগবতের এই শ্লোকটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। শ্রীকৃষ্ণ যাঁকে নিয়ে গেছেন ইনি অবশ্যই ভগবানের অনন্যা আরাধিকা। পুরো ভাগবতে এমনকি মহাভারতের কোথাও শ্রীরাধার কোন উল্লেখ নেই, রাধার একমাত্র উল্লেখ এইখানেই একটু আভাসে দেওয়া হয়েছে। *অনয়াহহরাধিতো*, যিনি আরাধনা করেন

তিনি রাধা। গোপীরা বলছেন ‘এই গোপী নিশ্চয়ই ভগবানের অনন্যা আরাধিকা’। সমগ্র ভাগবতে রাধা শব্দ কোথাও নেই, একমাত্র যেটুক ‘রাধা’ শব্দ পাওয়া যায় তা শুধু এই শ্লোকই পাওয়া যাচ্ছে। *অনয়াহহরাধিতো*, যিনি ভগবানের আরাধনা করেন তিনিই রাধা। এখানে রাধা পুরোপুরি নৈর্ব্যক্তিক কিন্তু পরের পরের কবিরা এই রাধাকেই ব্যক্তি রাধা রূপে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। গোপীরা তাই বলছেন ‘এই গোপী ভগবানের এমনই অনন্য ভাবে আরাধনা করেছেন যে ভগবান আমাদের ছেড়ে দিয়ে তাঁকে নিয়ে চলে গেছেন। এখানেও গোপীরা এককক্ষণের জন্যও ভুলে যাচ্ছেন না যে শ্রীকৃষ্ণ ভগবান। ভগবান আমাদের ছেড়ে দিয়ে আমাদেরই একজনকে যখন নিয়ে গেছেন নিশ্চয়ই উনি শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ আরাধিকা।

মানুষ যাকে ভালোবাসে সেই তো তাকে ভালোবাসবে। কিন্তু এখানে শ্লোকে বলা হচ্ছে *অনয়াহহরাধিতো*, কৃষ্ণ যাকে খুব ভালোবাসেন। *অনয়াহহরাধিতো* শব্দটিকে দুভাবেই ব্যাখ্যা করা যায়, কৃষ্ণ যাঁকে খুব ভালোবাসেন বা যিনি কৃষ্ণকে খুব ভালোবাসেন। শ্রীকৃষ্ণের ভালোবাসাতে তো কোন ধরণের কাম বাসনা থাকতে পারে না। আমাদের মধ্যে মানবীয় ভাব বেশী, ফলে আমি যদি কাউকে ভালোবাসি আর সে যদি আমাকে নাও ভালোবাসে তাও আমি তাকে ভালোবাসতে যাবো। ভগবান কার উপর কৃপা করেন? যে তাঁকে ভালোবাসে। এই ২৮শ শ্লোকে ভক্ত, ভগবান ও ভক্তির ব্যাখ্যা পরিষ্কার করে বলে দেওয়া হয়েছে। এত পরিষ্কার ভাবে রাসলীলার মূল ভাবকে আর কোথাও বলা হয়নি। যিনি অনন্য ভাবে তাঁর আরাধনা করেছেন ভগবান তাঁকেই বেছে নেবেন। ঠাকুর অন্য ভাবে বলছেন, তাঁর কৃপা বাতাস সব সময় বইছে, যে পাল তুলে দেবে সেই কৃপা বাতাস পেয়ে যাবে। ঠাকুর ও শ্রীমা অনেক সময় ভক্তদের উৎসাহ দেওয়ার জন্য বলতেন, ভগবান হলেন বালক স্বভাব, কখন কার উপর তিনি কৃপা করবেন কেউ বলতে পারে না। কিন্তু এখানে বলছেন *অনয়াহহরাধিতো*, যে মনে প্রাণে অনন্য ভাবে তাঁর আরাধনা করছে অন্যদের ফেলে দিয়ে তাকে নিয়ে তিনি বেরিয়ে যাচ্ছেন। গীতাতে যেখানেই ভক্তির কথা আসছে সেখানেও ভগবান ঘুরে ঘুরে একই কথা বলছেন। *অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং* অথবা *যে যথা মাং প্রপ্যদ্যন্তে* এই সব বলে বলছেন *তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্*, যেমনটি তুমি আমাকে ভক্তি করবে তেমনটি ভক্তি আমি তোমাকে করব। ভক্তের যদি ঈশ্বরের প্রতি অনন্য ভক্তি থাকে তাহলে ঈশ্বরের ভক্তিও অনন্য হবে। আসলে আমাদের শাস্ত্রে সব সময় অর্থবাদ আর তত্ত্ব মিলে মিশে এক হয়ে থাকে, যতক্ষণ আচার্যের কাছে শাস্ত্রের ব্যাখ্যা না শুনে পরিষ্কার হচ্ছে ততক্ষণ কোনটা অর্থবাদ আর কোনটা তত্ত্ব ধরা যাবে না। অর্থবাদ করার উদ্দেশ্য মানুষকে একটু উৎসাহিত করা, তা নাহলে তো মানুষ এদিকে আসতে চাইবে না। তুমি এক পা এগোলে তিনি দশ পা এগিয়ে আসবেন – এগুলো হল অর্থবাদ, ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি আনার জন্য বলা। কিন্তু আসল ব্যাপার হল, যেমন আপনার ভক্তি তেমন আপনার মধ্যে তাঁর প্রকাশ। কিন্তু অনন্যা ভক্তি এসে গেলে সংসার, মাগ, ছেলে, বাড়ি, টাকা-পয়সা এগুলো সব খড়কুটোর মত উড়ে যাবে। ভগবান তখন তাকে নিয়েই থাকবেন।

আমরা যতই শাস্ত্র কথা শুনি, যত যাই করি না কেন, উপরে রাজার মত সিংহাসনে একজন ভগবান বসে আছেন এই ভাব আমাদের মাথা থেকে কখন নামিয়ে দেওয়া যাবে না। বাচ্চা বয়স থেকে আমরা ভগবানের ব্যাপারে একটা ধারণা মনের মধ্যে তৈরী করে নিয়েছি, এই ধারণাকে পাল্টাতে আমাদের অনেক কাঠখড় পোড়াতে হবে। ভগবান হলেন সচ্চিদানন্দ, আমাদের যে শরীর মন, এই শরীর মনেতেই তাঁর প্রকাশ। যে যত উচ্চ আধার তার মধ্যে এই প্রকাশ তত বেশী। যখন কেউ এই প্রকাশকে সাক্ষাৎ অনুভব করতে পারেন, তখন তাঁর এই সাক্ষাৎ অনুভূতিকেই আমরা বলি ঈশ্বর দর্শন। সাধক যত অনন্য ভাবে তাঁর সাধনা করতে থাকবেন তত তাঁর চেতনা এগিয়ে যেতে থাকবে। এখানে রাধার যে বর্ণনা করা হচ্ছে তাতে রাধাকে ভগবানের একজন শ্রেষ্ঠ ভক্ত বলে দেখানো হয়েছে। একটা আধ্যাত্মিক সত্য, যার মধ্যে যেমন ভক্তি ঈশ্বরের প্রকাশ তার মধ্যে তেমন, এই সত্যকে এভাবে কাহিনীর মাধ্যমে এখানে ব্যক্ত করা হয়েছে।

যাই হোক, শ্রীকৃষ্ণ তাঁদেরই একজনকে নিয়ে উধাও হয়ে যাওয়াতে গোপীদের মাথা খারাপ হয়ে গেছে। গোপীরা বলছেন, দেখো! যাঁরাই শ্রীকৃষ্ণের চরণধূলা পেয়েছেন তাঁরাই ধন্য হয়ে গেছেন। বলছেন শ্রীকৃষ্ণ তো ভগবান, তিনি সব পাপ হরণ করেন আর ব্রহ্মা, শিব, লক্ষ্মীদেবী এনারাও শ্রীকৃষ্ণের পায়ের রজ অঙ্গে

লেপন করেন যাতে নিজেদের অশুভ নাশ হয়ে যায়। অন্য একজন বলছেন ***তস্যা অমূনি নঃ ক্ষোভং কুর্বন্ত্যুচ্চৈঃ পদানি যৎ। যৈকাপহৃত্য গোপীনাং রহো ভুঙ্‌ক্তেঽচ্যুতাধরম্।।১০/৩০/৩০।।*** যাই বলো ভাই, এই কৃষ্ণের পায়ের ছাপের পাশে অন্য এক নারীর পায়ের ছাপ দেখে আমার হৃদয়ে বড় জ্বালা অনুভব হচ্ছে। যে শ্রীকৃষ্ণের অধরসুধায় আমাদের সকল গোপীর অধিকার, সে কিনা চুরি করে নির্জনে এসে একাকী সেই অধরসুধা পান করছে! চল আমরা একটু খোঁজ করে দেখি কে সেই ভাগ্যবতী ললনা।

একটু এগিয়ে গিয়ে গোপীরা দেখছেন মেয়েটির পায়ের ছাপ আর পাওয়া যাচ্ছে না। ***ন লক্ষ্যন্তে পদান্যত্র তস্যা নূনং তৃণাঙ্কুরৈঃ। খিদ্যৎসুজাতাঙ্ঘ্রিতলামুন্নিন্যে প্রেয়সীং প্রিয়ঃ।।১০/৩০/৩১।।*** মেয়েটির পায়ের ছাপ দেখা যাচ্ছে না মানে, ভগবানের প্রেয়সীর সুকোমল পদতলে হয়তো কোন কন্টক বিদ্ধ হয়েছে, তিনি আর হাঁটতে পারছেন না, তাই শ্রীকৃষ্ণে সেই ভাগ্যবতী গোপীকে নিজের স্কন্ধে তুলে নিয়েছেন। আবার কিছুটা এগিয়ে গিয়ে দেখছেন শ্রীকৃষ্ণের পায়ের ছাপ মাটিতে গভীর ভাবে বসে আছে। কোন ভারী জিনিষকে কাঁধে বহন করলে পায়ের ছাপ মাটিতে গভীর ভাবে বসে যাওয়ারই কথা। গোপীরা বলছেন 'এই দেখো দেখো, এই জায়গাতে কৃষ্ণের পায়ের ছাপ মাটিতে গভীর ভাবে বসে গেছে। তার মানে নিশ্চয়ই যে মেয়েটি শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে আছে তাকে তিনি কাঁধে তুলে নিয়েছেন, শ্রীকৃষ্ণের ওজন বেড়ে গেছে বলে এখানকার মাটিটা ধসে বসে গেছে'। ওজন বেড়ে গেলে মাটি বসে যাবে এই কথা জিম করবেটও বলেছেন। আর এখানে পায়ের ছাপের সামনের দিকের মাটিটা যেন বেশী ধসে আছে। তার মানে এখানে যে ফুলের গাছ আছে, নিশ্চয়ই সেই মেয়েটির জন্য কৃষ্ণ পায়ের সামনের দিকটা চেপে উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে ফুল পাড়ছিলেন। এই দেখো পায়ের ছাপটা কেমন পাল্টে গেছে। এইসব শ্লোক পড়লে বোঝা যায় ব্যাসদেবের কি সুগভীর পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা ছিল ।

একজন গোপীকে নিয়েই শ্রীকৃষ্ণ কেন অন্তর্ধান হলেন?

শুকদেব এইভাবে বর্ণনা করে বলছেন ***রেমে তয়া চাত্মরত আত্মারামোহপ্যখণ্ডিতঃ। কামিনাং দর্শয়ন্ দৈন্যং স্ত্রীণাং চৈব দুরাত্মতাম্।।১০/৩০/৩৫।*** এই শ্লোকে শুকদেব আবার আধ্যাত্মিক ভাবকে নিয়ে এসেছেন। পরীক্ষিৎকে শুকদেব বলছেন 'পরীক্ষিৎ! যিনি অখণ্ড সচ্চিদানন্দ, যিনি আত্মারাম, আত্মারাম মানে যিনি নিজের আত্মাতেই আনন্দে থাকেন, তাঁর নিজের সন্তুষ্টির জন্য বাইরের কিছুই প্রয়োজন হয় না। তিনি কেন কোন মেয়েকে বেশী ভালোবাসতে, কোন মেয়েকে কম ভালোবাসতে যাবেন'! অপূর্ণতার ভাব যার মধ্যে আছে তবেই তো সে কাউকে বেশী কাউকে কম ভালোবাসতে যাবে। *আপ্তকামস্য কা স্পৃহা*, যাঁর সব কামনা বাসনা পূর্ণ হয়ে আছে, তাঁর আবার কিসের স্পৃহা হবে! আমাদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, শ্রীকৃষ্ণ হলেন ভগবান, ভগবান হলেন আপ্তকাম, তাঁর তো কোন রকম কামনা বাসনা থাকার কথা নয়। তাহলে রাধাকে কেন ভগবানের দরকার হল? শ্রীকৃষ্ণ তাহলে এগুলো কি করছেন, অন্য গোপীদের থেকে সরে গিয়ে যিনি একটি মেয়েকে কাঁধে নিয়ে হাঁটছেন? আমাদের সবার মনের সংশয় দূর করার জন্য শুকদেব বলছেন *কামিনাং দর্শয়ন্ দৈন্যং স্ত্রীণাং চৈব দুরাত্মতাম্*, লৌকিক জগতে নারী সম্ভোগেচ্ছু তৃষ্ণার্ত পুরুষ যখন কোন নারীর বশে চলে যায় তখন সেই পুরুষের কি চরম দুর্দশা হয়, সেটা দেখানোর জন্য শ্রীকৃষ্ণ এই লীলাটুকুর আশ্রয় নিলেন।

সীতা যেমনি বললেন 'আমার সোনার হরিণ চাই', তেমনি রামায়ণের কাহিনী অন্য রকম হয়ে গেল। ঠাকুর কি করলেন? প্রথম দিন থেকে তিনি কামিনী-কাঞ্চনকে ত্যাগ করে দিলেন। একবার ঠাকুরের খড়দার দিকে কোথাও যাওয়ার কথা ছিল। সেদিন তাঁর শরীর ভালো ছিল না। তাই তিনি নহবতে খবর পাঠিয়েছেন রামলালের খুড়িকে জিজ্ঞেসে করতে। মা শুনে বলছেন 'গিয়ে কাজ নেই'। সেদিন ঠাকুরের যাওয়া হলো না। পরে তিনি খুব দুঃখ করে বলছেন 'আমি কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগী সন্ন্যাসী, আমার মাগ আমাকে বললে গিয়ে কাজ নেই, তাই আমার আর যাওয়া হলো না। আমি তখন ভাবতে বসলুম আমারই যদি এই হাল হয় তাহলে সংসারীদের জানি কী অবস্থা'! শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরামকৃষ্ণ এনারা সবাই পূর্ণকাম, কিন্তু কামী পুরুষদের দুরবস্থা দেখানোর জন্য সবাই কিছু না কিছু লীলা করে গেছেন। শ্রীকৃষ্ণ কি লীলা করলেন? রাধা বলছেন 'আমার পায়ে ব্যাথা করছে আমাকে কাঁধে নিয়ে চলো', শ্রীকৃষ্ণ রাধাকে কাঁধে নিয়ে হাটছেন। কবীর দাস মজা

করে বলতেন 'গোপীরা হাততালি দিত আর কৃষ্ণ বানর নাচ নাচতেন'। শ্রীরামচন্দ্র সোনার হরিণ ধরবার জন্য বেরিয়ে গেলেন। ঠাকুর মাকে জিজ্ঞেস করলেন 'অমুক জায়গায় যাবো'। মা বলছেন 'গিয়ে কাজ নেই'। ঠাকুরের আর সেদিন যাওয়া হলো না। ঠাকুর কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগী পুরুষ, আপ্তকাম কিন্তু তাঁরই এই অবস্থা, তাহলে কামী পুরুষদের কী অবস্থা!

একজন লেখক বর্ণনা দিচ্ছেন ইস্তাম্বুল শহরে তুষারপাত হচ্ছে। একজন বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে দেখে বন্ধু বাড়িতে নেই। লেখক সেখানে খুব সুন্দর একটা কথা বলছেন A man leaves his home he must be a very unhappy person, বাড়ি ছেড়ে কে চলে যায়? যে অখুশী। আমার বর্তমান অবস্থায় যদি খুশী না থাকি তবেই তো আমি বাড়ি ছাড়ব। এই মুহুর্তে আমরা এখানে সবাই বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছি। কারণ আমরা অখুশী, অখুশী বলেই বাড়ি ছেড়ে এখানে শাস্ত্র অধ্যয়ণ করতে এসেছি। আমরা জানি এই শাস্ত্র পড়াতে আনন্দ অনেক বেশী যেটা আমি বাড়িতে বসে পাবো না। স্ত্রী কেন বাপের বাড়িতে যেতে চায়? কারণ শ্বশুড় বাড়িতে সে অখুশী। আর বিয়ে কেন করে? বাপের বাড়িতে অখুশীতে আছি। মানুষ তখনই তার বাড়ি ছাড়ে যখন সে খুশী থাকে না। আর যখন মুষল ধারে বৃষ্টি পড়ছে আর সেই সময় যদি কেউ বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায় তখন বুঝতে হবে সে খুবই অখুশী। কোন সন্ন্যাসীকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় আপনার বাড়ি কোথায় ছিল? সন্ন্যাসী তখন এই প্রশ্নের কি উত্তর দেবে! বাড়ি এমনই দুঃখদায়ক ছিল যে সন্ন্যাসী সেটাকে চিরদিনের মত ছেড়ে বেরিয়ে এসেছেন। যে জিনিষটা চিরতরে ছেড়ে বেরিয়ে এসেছেন তার কোন কথা সন্ন্যাসী কেনই বা মনে রাখবেন আর কেনই বা অপরকে বলতে যাবেন! বাড়িটা যদি সুখদায়ক হত তাহলে সন্ন্যাসী ওখানেই থাকতেন। মানুষ অখুশী না হলে বাড়ি ছাড়ে না। সন্ন্যাসীরা এমনই অখুশী যে তাঁরা চিরতরের মত বাড়ি ছেড়ে চলে আসেন। কিন্তু ভগবান হলেন আত্মারাম, তাঁর অখুশী হওয়ার কোন প্রশ্নই আসে না। তাই তিনি যাবেনটা কোথায়? ভগবান পূর্ণ আত্মারাম, তিনি আবার একটা মেয়েকে কাঁধে তুলে ফুল পাড়বেন, এটা কখন হতে পারে! তাহলে তিনি কিসের জন্য এগুলো করলেন? এই যে এখানে বলছেন *অনয়াহহরাধিতো নূনং*, দুটো অর্থেই হতে পারে, মেয়েটি শ্রীকৃষ্ণকে খুব ভালোবাসে বা কৃষ্ণ যাকে আরাধনা করছেন, কৃষ্ণ যাকে ভালোবাসছেন। এই আরাধিকাই পরবর্তি কালের ভক্তিশাস্ত্রে স্থান পেয়ে গেলেন শ্রীরাধিকা নামে। অথচ পুরো ভাগবতে আমরা কোথাও শ্রীরাধার উল্লেখ পাইনা। হিন্দু ধর্মে শ্রীরাধাই একমাত্র চরিত্র, যে চরিত্রকে সমস্ত হিন্দুরা পূজো করছে কিন্তু হিন্দু ধর্মের মূল শাস্ত্র গ্রন্থে কোথাও শ্রীরাধার অস্তিত্বই নেই। সেইজন্য জগন্নাথ ধামে শ্রীরাধা নেই। দ্বারকাতেও শ্রীরাধা অনুপস্থিত। শ্রীরাধিকা হলেন মথুরা বৃন্দাবনের, বৃন্দাবনে পরস্পরের সাথে দেখা হলে প্রথমেই 'জয় রাধে' বা 'রাধে রাধে' বলে সম্বোধন করে। ভারতের জনমানসের হৃদয়ে শ্রীরাধা এমন গভীর ভাবে বসে গেছে যে, কৃষ্ণের নামের সাথে একসাথে রাধার নাম উচ্চারিত হচ্ছে, কোথাও রাধাকৃষ্ণ, কোথাও রাধাগোবিন্দ ইত্যাদি।

কামী পুরুষরা একটু নারী সম্ভোগের জন্য কীভাবে নারীদের কাছে দীনতাপূর্বক আচরণ করে এটাকে দেখাবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ এই ধরণের আচরণ করছেন। এই দেখো কামী পুরুষরা মেয়েদের সামনে কি রকম হাতজোড় করে পড়ে থাকে আর মেয়েদের কথায় ওঠবোস করে। ঠাকুর বলছেন – ওখানে গিয়ে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরও হাবুডুব খান। তার সঙ্গে যুক্ত হয় মেয়েদের কুটিলতা, দেখাচ্ছেন মেয়েরা কত কুটিল হয়! এখানে সংস্কৃতে শব্দটা হল *দুরাত্মতাম্*, নারীর এই স্বভাবকে দেখানোর জন্য ভগবান এই লীলাখেলা রচনা করেছেন। এখানে খেলাটা দুটো অংশে হচ্ছে। প্রথম অংশে শ্রীকৃষ্ণের যিনি আরাধিতা, তাঁকে সঙ্গে নিয়ে শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের মাঝখান থেকে উধাও হয়ে গেলেন। তারপর তিনি সেই আরাধিতার সঙ্গে খেলা করছেন, তাঁকে কাঁধে উঠিয়ে ফুল পাড়ছেন। এখানে রাধার নাম কোথাও নেই, শুধু শব্দটা আছে। আসলে ব্যাসদেব রাসলীলাতে একটা বিশেষ ভাবকে তুলে ধরার জন্য এই অংশটা রচনা করে তার মধ্যে এই *অনয়াহহরাধিতো* শব্দটা নিয়ে এসেছেন, যেটাকে পরের দিকের সাধক কবিরা ভক্তিশাস্ত্রে শ্রীরাধা নাম দিয়ে দাঁড় করিয়েছেন।

বাকি গোপীরা তো শ্রীকৃষ্ণকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন, আর এদিকে শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের ছেড়ে দিয়ে যাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে গেছেন, এবার তার অহঙ্কারকে আর কে সামলাবে! এর আগে বলা হয়েছিল গোপীদের অহঙ্কার হয়েছে, আমাদের মত সৌভাগ্যবতী এই জগতে আর কেউ নেই। এবার গোপীদের মধ্য থেকে একটি মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে শ্রীকৃষ্ণ বেরিয়ে গেলেন, তার আর অহঙ্কারের শেষ নেই। সে নিজেকে মনে করছে আমি বাকি গোপীদের থেকেও শ্রেষ্ঠ, শ্রীকৃষ্ণ একমাত্র আমাকেই ভালোবাসেন। এই ভাবকে অবলম্বন করেই পরবর্তি কালে শ্রীরাধার লীলাখেলাকে ভক্তিশাস্ত্রে নিয়ে আসা হয়েছে।

প্রশ্ন হতে পারে এত গোপী থাকতে শ্রীকৃষ্ণ একজন গোপীকেই নিয়ে কেন অন্তর্ধান হয়ে গেলেন। এই ব্যাপারে আমাদের খুব সতর্ক থাকতে হবে, ভাগবতকে যেন আমরা কখনই মনে না করি এটি একটি ইতিহাস বা কাব্যগ্রন্থ। একটা আদর্শকে জনমানসে সংস্থাপিত করার জন্য ব্যাসদেব একটা কাহিনীকে মাধ্যম করেছেন মাত্র। এখানে সব গোপীদের মনে অহঙ্কার হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ এঁদের এই অহঙ্কারকে চূর্ণ করতে চাইছেন। কীভাবে চূর্ণ করবেন? গোপীদের মধ্য থেকে একজনকে বেছে নিয়ে তিনি সব গোপীদের মাঝখান থেকে অন্তর্হিত হয়ে গেলেন। এখন কীভাবে নির্বাচিত করেছেন আর কেন ঐ একজনকেই বেছে নিলেন তার কোন বর্ণনা ব্যাসদেব দেননি। আরাধিতা শব্দটা ব্যাসদেব বলছেন না, গোপীরা বলছেন। গোপীরা এক অপরকে বলছেন নিশ্চয়ই সেই গোপী শ্রীকৃষ্ণের আরাধিতা। তাই বলে তিনি কি শ্রীকৃষ্ণের আরাধিতা? আদপেই না। এটা গোপীদের নিজেদের ঈর্ষার কথা। বৈষ্ণব মতে যাই বলা হয়ে থাকুক, ভাগবত মতে বৈষ্ণবদের মত একেবারেই যুক্তিতে দাঁড়াবে না। এখানে দুটো সম্ভবনা থাকতে পারে, একটা হল ঝিকে তিরস্কার করে বউকে শিক্ষা দেওয়া। যে কোন একটা মেয়েকে তুলে নিয়ে বাকিদের শিক্ষা দিয়ে দিলেন। তারপর একেও শিক্ষা দিয়ে দিলেন। যখন চিতা জ্বালান হয় তখন বাঁশ দিয়ে খুব করে খোঁচান হয়, চিতার সৎকার কার্য শেষের দিকে চলে এলে ঐ বাঁশটাকেও চিতার আগুনে ফেলে দেওয়া হয়। আরাধিতাকে নিয়ে সব কটাকে পুড়িয়ে দিলেন তারপর একেও ফেলে দিলেন। এই একজনকে অবলম্বন করে সবাইকে শিক্ষা দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন হিংসা, দ্বেষ, ঈর্ষা, অহঙ্কার এই রিপুগুলো ঈশ্বরীয় ভালোবাসার বিপরিতার্থ।

তাকে সবার থেকে দেখতে সুন্দর ছিল কি ছিল না এই নিয়ে ব্যাসদেবের কোন মাথাব্যাথা নেই, কারণ সৌন্দর্যের বর্ণনা করা ব্যাসদেবের কাজ নয়। ব্যাসদেবের একটিই কাজ আধ্যাত্মিক ভাব জাগ্রত করা। কি ভাব? তুমি যদি অহঙ্কার কর তাহলে তোমার প্রিয় যিনি সেই ইষ্ট তোমার কাছে থাকলেও তোমাকে ছেড়ে চলে যাবেন। কি ভাবে দেখাচ্ছেন? গোপীদের মাঝ পথে ফেলে দিয়ে চলে গেলেন। শুধু ফেলে দিলে হবে না, এদের আচ্ছা করে পুড়িয়ে একেবারে দগ্ধ করে দিতে হবে। কীভাবে দগ্ধ করতে হবে? একটিকে নিয়ে পালিয়ে গেলেন। এরপর তার যে অহঙ্কার হল তখন তাকেও কাঁধে তোলার কায়দা করে উধাও হয়ে গিয়ে পোড়ালেন। অন্য গোপীদের শুধু মাত্র অহঙ্কার হয়েছিল, এই গোপী আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণকেই নাচাতে চাইছিল, 'ওগো! আমি না হাঁটতে পারছি না, আমাকে একটু কাঁধে করে নিয়ে চল না'। ভাগবত হল আধ্যাত্মিক গ্রন্থ এখানে গোপীদের সৌন্দর্যের বর্ণনার কোন মূল্য নেই। আধ্যাত্মিক ভাবের মূল্যই এখানে প্রাধান্য পেয়েছে। সাধনার পথে বিঘ্ন স্বরূপ আমাদের ষড়রিপু গুলো কীভাবে সরানো যায় সেটাকেই আখ্যায়িকার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। আখ্যায়িকা হলেও এর মধ্যে যুক্তির সামঞ্জস্য আছে, এলেমেলো খাপছাড়া কোন বর্ণনা নেই। এর আগে চীরহরণ হয়ে গেছে তাও এদের কিছু রিপু প্রবল ভাবে থেকে গেছে। আত্মসমর্পণ পর্যন্ত হয়ে গেছে তাও সম্পূর্ণ নিবেদন হচ্ছে না। কারণ অহঙ্কারটা থেকে গেছে। একটার পর একটা শিক্ষা দিয়ে শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের আধ্যাত্মিক পূর্ণতা লাভের আবরণ গুলিকে এক এক করে সরিয়ে দিচ্ছেন। ভাগবতের মত গ্রন্থের এটাই বৈশিষ্ট্য, এই ধরণের গ্রন্থগুলি এমন কিছু কিছু ভাব দিয়ে দেন, পরবর্তি কালে ঐ ভাবগুলোকে আরও বিস্তার করে নতুন নতুন গ্রন্থ লেখা যায়। এই রাসলীলাকে অবলম্বন করে পরের দিকে কত গ্রন্থ রচনা হয়েছে, দুদিকেই বিস্তৃতি পেয়েছে, ভক্তিশাস্ত্রের দিকেও বিস্তার পেয়েছে আবার প্রেমশাস্ত্রের দিকেও বিস্তার লাভ করেছে।

ভাগবত হল একেবারে খাঁটি আধ্যাত্মিক শাস্ত্র, শ্রীকৃষ্ণ কোন মেয়ের হাত ধরেছেন, কোন মেয়ের সাথে নৃত্য করেছেন এর বর্ণনা করা ভাগবতের কাজ নয়। ভাগবতের কাজ একটাই, মানুষের আধ্যাত্মিক চেতনার স্তরকে উন্নীত করা, যেখানে যেখানে দুর্বলতা আছে সেগুলোকে তুলে ধরে মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। প্রথমে কি হয়েছে? গোপীদের মদ হয়েছে, তিনি একজনকে নিয়ে উধাও হয়ে গেলেন। এবার এই মেয়েটি কিছুক্ষণ পর বলছে আমি আর হাঁটতে পারছি না। এখানে অবশ্য এর উল্লেখ নেই, এটা ধরে নেওয়া হয়েছে। যেতে যেতে ফুলের বাহার দেখে বলছে 'এই ফুলগুলো কি সুন্দর দেখতে'। তিনি আবার তাঁকে ফুল পেড়ে দিচ্ছেন। আরাধিতা যিনি, আমরা ধরে নিচ্ছি তিনিই রাধা, যদিও এখানে রাধার নাম উল্লেখ নেই। এরপর তাঁর অহঙ্কার হয়েছে আমার মত আর কোন গোপী নেই। রাধা মিষ্টি মিষ্টি করে বলছেন 'আমি না আর হাঁটতে পারছি না'। শ্রীকৃষ্ণ তখন বলছেন ঠিক আছে তুমি আমার কাঁধে এসে বস। রাধা তখন যেমনি শ্রীকৃষ্ণের পেছন থেকে কাঁধে উঠতে উদ্যোগ নিয়েছে সঙ্গে সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হয়ে গেলেন। এবার উনি পড়ে গেছেন একা। এখানে পরীক্ষিৎকে শুকদেব দেখালেন মেয়েরা কত কুটিল হতে পারে।

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ হলেন অখণ্ড সচ্চিদানন্দ আর আত্মারাম। তিনি সেই গোপীকে বললেন 'হ্যাঁ, হ্যাঁ! তুমি আমার কাঁধে এস'। কাঁধে ওঠানোর কায়দা করে শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গে সঙ্গে উধাও হয়ে গেলেন। এই গোপী এখন অসাধারণা গোপী থেকে হয়ে গেলেন সাধারণা গোপী। সাধারণা গোপী হয়ে এখন তিনি ক্রন্দন করতে শুরু করেছেন। ইতিমধ্যে অন্যান্য গোপীরা শ্রীভগবানের চরণ চিহ্ন ধরে ধরে সেখানে পৌঁছে এসে দেখলেন তাঁদেরই একজন সখী শ্রীকৃষ্ণ বিরহের দুঃখে অচেতন হয়ে ধূলায় পড়ে আছেন। শুকদেব বলছেন, এই ঘটনটা বর্ণনা করা হয়েছে এটা দেখাবার জন্যে যে, কামীদের দীনতা ও দুর্বদ্ধিতার দোষে তাদের কি করুণ শোচনীয় অবস্থা হতে পারে। স্ত্রী পরবশতায় কামী পুরুষের কি করুণ অবস্থা হতে পারে সেটাও দেখান হল। নারী তার মনোহারী মিষ্টি কথা দিয়ে পুরুষদের একেবারে নাচিয়ে ছেড়ে দেয়। যাই হোক এইভাবে শ্রীকৃষ্ণ এই গোপীকেও ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার পর মেয়েটি ব্যাকুল হয়ে কাঁদছে ***হা নাথ রমণ প্রেষ্ঠ ক্বাসি ক্বাসি মহাভুজ। দাস্যাস্তে কৃপণায়া মে সখে দর্শয় সন্নিধিম্।।১০/৩০/৪০।।*** হে নাথ! হে রমণ! কোথায় তুমি? আমি তোমার দীন-হীন হতভাগিনী দাসী। আমাকে ছেড়ে যেয়ো না, তুমি আমার কাছে থাকো।

একটা জিনিষ এর আগেও আমরা অনেকবার আলোচনা করেছি। ভাগবতের মত গ্রন্থ কখনই সরাসরি সব কিছু বলে দিচ্ছে না। এর মধ্যে অনেকগুলো স্তর বিন্যাস করা হয়েছে। যিনি যেভাবে বুঝতে চাইছেন তিনি সেভাবেই সেই স্তরের বক্তব্যকে বুঝে নেন। প্রথম স্তর হল সোজা সাপ্টা কাহিনীর বর্ণনা। দ্বিতীয় স্তরে জাগতিক মানুষের জন্য শিক্ষা দান। কিন্তু সব থেকে উপরে থাকছে মূল আধ্যাত্মিক দিকটা। তিনটে স্তরে বিন্যাস হওয়াতে অনেক জায়গায় এই তিনটে স্তর একে অপরের সঙ্গে মিলে মিশে যায়। ভাগবতের অনেক জায়গায় শুধু শিক্ষার কথাই বলা হয়েছে আবার অনেক জায়গায় শুধু আধ্যাত্মিক তত্ত্ব কথাই আছে। এখানে দেখানো হল কামী পুরুষ আর দুষ্ট স্ত্রীদের আচরণ কি রকম হয়। তবে আধ্যাত্মিক জীবনে এই ধরণের যে কিছু হয় না তা নয়, যতক্ষণ পূর্ণ অদ্বৈত জ্ঞানে না প্রতিষ্ঠিত হয় ততক্ষণ যে কোন সময় পতন হয়ে যাওয়ার সম্ভবনা থেকে যায়। ঠাকুরও বলছেন জ্ঞানী ভয়তরাসে। এখানে জ্ঞানী বলতে বিজ্ঞানী নন, জ্ঞানী বলতে বোঝাচ্ছেন যিনি এখনও অখণ্ড অদ্বৈত জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হননি।

যিনি জ্ঞানমার্গের সাধক তাঁর আমি বলে কিছু থাকে না। কিন্তু ভক্তিমার্গের সাধকদের আমিটা থাকে। এর আগেও আমরা আলোচনা করেছি যে, আমি থাকলে অজ্ঞান থাকবে, অজ্ঞান থাকলে কাম, ক্রোধ থাকবে। এখন আমরা যাঁকে রাধা বলছি, তিনিও কিন্তু চিনি আস্বাদ করতে চাইছেন। এখানে রাধার মধ্যে অজ্ঞান আছে আমরা বলতে পারি না, কিন্তু অজ্ঞানের একটা রেখা যেটা ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই থাকে। এই অজ্ঞানের রেখা থেকেই অহঙ্কারের একটা আকার এসে গেছে। কিসের অহঙ্কার? আমি তোমাকে যেমনটি বলবো তুমি তেমনটি শুনবে। আমাকে তুমি কাঁধে নিয়ে চল। কিন্তু অহঙ্কারের এই আকারটুকুকেও শ্রীকৃষ্ণ মুছে দিলেন। ৪২শ শ্লোকে খুব সুন্দর বলছেন।

তয়া কথিতমাকর্ণ্য মানপ্রাপ্তিং চ মাধবাৎ। অবমানং চ দৌরাত্ম্যাদ্ বিস্ময়ং পরমং যযুঃ।। ১০/৩০/৪২।। সব গোপীরা মিলে সেবা আর শুশ্রূষা করে এর চেতনা ফিরিয়ে আনলেন। চেতনা ফিরে আসতেই বাকি গোপীরা যত কাঁদছিল এই গোপী তাদের সম্মিলিত কান্নাকে ছাপিয়ে আরও বেশী জোরে কান্না জুড়ে দিয়েছেন। কেঁদে কেঁদে ব্যাকুল হয়ে বলছেন যে করেই হোক আমার প্রিয়তম গোবিন্দের দেখা করিয়ে দাও। আমার নিজের নির্বুদ্ধিতা আর কুটিলতার দোষেই গোবিন্দের প্রিয়-সমাদর থেকে ভ্রষ্ট হয়েছি, আমার অহঙ্কার হওয়ার জন্য সেই হৃদয়রাজ আমাকে ছেড়ে গেছেন। ৪৩শ শ্লোকে বলছেন ***ততোঽবিশন্ বনং চন্দ্রজ্যোৎস্না যাবদ্ বিভাব্যতে। তমঃ প্রবিষ্টমালক্ষ্য ততো নিবৃবৃতুঃ স্ত্রিয়ঃ।।১০/৩০/৪৩।।*** এরপর সবাই মিলে আরও এগিয়ে যাচ্ছেন কিন্তু জঙ্গল এত ঘন হয়ে আসছে যে সেখানে চন্দ্র কিরণও প্রবেশ করতে পারছে না। এই ঘন অন্ধকারে শ্রীকৃষ্ণকে আর খুঁজেই পাওয়া যাচ্ছে না, আর অরণ্যের যত গভীরে প্রবেশ করছেন ততই অন্ধকারের ঘনত্ব বেড়েই চলেছে। গোপীরা তখন ভাবছেন আমাদের দেখে যদি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আরও সেই অন্ধকারময় গভীর বনভূমিতে প্রবেশ করে যান তাহলে তাঁর অনেক বিপদ হতে পারে, তার থেকে বরং চলো আমরা সবাই ফিরে যাই।

রামকে না পেলে কি শ্যামকে নিয়ে ঘর করব!

এই অন্ধকারে শ্রীকৃষ্ণকে খুঁজে পাওয়া যাবে না বুঝতে পেরে সবাই এবার ওখান থেকে ফেরত চলে এসেছেন। ফিরে ওখান থেকে তারা গৃহে ফিরে গেলেন না। প্রকৃতপক্ষে নিজেদের গৃহের কথা তাঁদের মনেই পড়ল না। তাঁদের মনে শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া কিছুই নেই, সবাই কৃষ্ণময় হয়ে গেছেন। তাঁরা এখন যা কথা বলছে সবই সেই শ্রীকৃষ্ণের কথাই বলে যাচ্ছেন। শরীর, মন, বুদ্ধি সব শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছে। ঘরবাড়ি দূরে থাক, গোপীদের শরীর বোধই নেই, এমনই তাঁরা শ্রীকৃষ্ণে হারিয়ে গেছেন। বলছেন ***তন্মনস্কাস্তদালাপাস্তদ্বিচেষ্টাস্তদাত্মিকাঃ। তদ্গুণানেব গায়ন্ত্যো নাত্মাগারাণি সস্মরুঃ।।১০/৩০/৪৪।।*** তাঁদের মুখে শুধু কৃষ্ণকথা, তাঁদের শারীরিক সব রকম চেষ্টা সবটাই কৃষ্ণময় হয়ে গেছে। একদিকে যেমন তাঁদের মন শ্রীকৃষ্ণে পুরো তন্ময় হয়ে গেছে, কিন্তু তার সাথে ভাবছেন কখন কৃষ্ণ আমাদের কাছে ফিরে আসবেন। এইভাবে ভাবতে ভাবতে তাঁরা সবাই আবার যমুনার ধারে এসে গেলেন। বাড়িতে যখন কোন বাচ্চাকে শাসন করার পর বাচ্চা যদি নিজেকে লুকিয়ে ফেলে তখন তাকে বেশী খোঁজাখুজি করতে নেই, বেশী খুঁজতে গেলে সে আরও কোন দিকে চলে যাবে হয়তো পরে আর পাওয়া যাবে না। গোপীরাও শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণ বন্ধ করে দিলেন। বন্ধ করে কি এবার তাঁরা বাড়ি ফিরে যাবেন? বাড়িতে তো ফিরে যেতে পারছেন না, কারণ তাঁদের মন যে পুরো কৃষ্ণময় হয়ে গেছে।

এই জায়গায় এসে আমরা ভাবি, যখন তাঁকে নাই পাওয়া গেল তখন ফিরে চল, আর দ্বিতীয় হল কাম ভাব আছে বলে তাঁরা অপেক্ষা করতে থাকলেন। কিন্তু দুটোর কোনটাই এখানে হচ্ছে না। ঠাকুরের মহাসমাধির পর সবাই যখন তপস্যা করছেন তখন অনেকে বলছেন এত তপস্যা করেও তো কিছু হলো না, তাহলে কি আমরা আবার ঘরেই ফিরে যাবো। শুনে স্বামীজী বলছেন 'রামকে পেলাম না, তাই বলে কি শ্যামের সঙ্গে ঘর করবো নাকি'! স্বামীজীর এই কথা অতি উচ্চ মানের কথা, এই কথাকে ধারণা করাও একটু কঠিন। প্রত্যেক মানুষেরই নিষ্ঠার একটা মাত্রা আছে। একজন কাউকে ভালোবেসেছে, কোন কারণে তাকে সে পেলো না। এখন সে কি করবে? আরেকজনের দিকে কি সে হাত বাড়াবে কি বাড়াবে না? কিছু কিছু মানুষ আছে যাদের ভালোবাসা এতই গভীর যে, যাকে সে একবার ভালোবেসেছে জীবনে তাকে ছাড়া আর অন্য কারুর দিকে যাবেই না। একটা উর্দু কাহিনী আছে যেখানে একটি ছেলে ও একটি মেয়ের সাথে সেভাবে কথাবার্তা কিছু হয়নি, কিন্তু চোখাচোখি হয়েছে, তার থেকে দুজনের ভালোবাসা হয়েছে। দুজনে ভালো ভাবেই জানতো আমাদের এই সম্পর্ক বেশী দূর এগোবে না। পরে ছেলেটি বড় হয়ে বড় চাকরি পেয়েছে, আরেকজনের সাথে বিয়েও হয়েছে, ছেলেমেয়েও হয়ে গেছে। ছেলেটির বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর কিছু দিন পর থেকে মেয়েটি বলতে শুরু করে দিলে যে তার উপর জিন ভর করে। খবরটা সে এমন কায়দা করে চারিদিকে ছড়িয়ে দিল যে কেউই

আর তাকে বিয়ে করতে চাইছে না। আর এদের দুজনের এমন একটা সম্পর্ক ছিল যাতে ছেলেটি কখন মেয়েটির সঙ্গে দেখা করতে পারবে না। অনেক বছর পর মেয়েটি একটা চিঠি লিখে ছেলেটিকে পাঠিয়েছে। তাতে বলছে – আমি হজ করতে চলে যাচ্ছি, আর আমি ফিরবো না, একবার আমার সঙ্গে দেখা করে যাও। ভদ্রলোক মেয়েটিকে মনে মনে সত্যিই ভালোবাসত। একটাই রাত বাকি, কাল সকালে গাড়ি আসবে, তাতে করে আমি মক্কা চলে যাচ্ছি, আর ফিরবো না। ছেলেটি দেখা করতে এসেছে। মেয়েটি বলছে ‘দেখো আমি তোমাকেই ভালোবাসলাম। আর তুমি তো বেওবাফা হয়ে গেলে, তোমার বুকে অত পাটা ছিল না, তুমি বিয়ে করে নিলে। তোমার সব খবরই আমি রাখি’। সব বলার পর বলছে ‘আমাকে যাতে কাউকে বিয়ে না করতে হয় সেইজন্য আমি এই জিনের কাহিনী তৈরী করলাম। আর আমি এখন যেহেতু মক্কা চলে যাচ্ছি সেইজন্য সবাই আমাকে একজন ধর্মপ্রাণা নারী বলে জেনে গেছে। তাই তোমার সঙ্গে শেষ দেখা করার সুযোগ পেলাম’। কাহিনীটা এখানেই শেষ হয়ে যায়। এই স্তরের ভালোবাসার আদর্শকে ধরে রাখা খুব কঠিন। এই ধরণের প্রেম কাহিনীতেই পাওয়া যায়, বাস্তবে দেখা যায় না। তাই এগুলোকে বলে কিতাবী প্রেম।

এটাতো গেলে প্রেমের দিকে, কিন্তু আদর্শের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই হয়। একজন সন্ন্যাসী বুঝে নিয়েছে সংসার অসার। এবার সে ঘরবাড়ি ছেড়ে ঈশ্বরের পথে বেরিয়ে গেল। কুড়ি পঁচিশ বছর দেখা গেলে তাঁর কিছুই হলো না। তাহলে কি এবার সে পথ পাল্টে বিয়ে করে নেবে? তাহলে সেই সন্ন্যাসীর আদর্শে কোথাও ভুল আছে। আদর্শে যখন ভুল থাকে তখন এই গোলমাল গুলো হয়। কিন্তু আদর্শ যদি ঠিক থাকে, আমি ভেবে চিনতে এই কাজ করেছি, এই মনোভাবে যদি দৃঢ় থাকে, তখন সে সাফল্য না পেলেও আদর্শের সাথে কোন আপোষ করবে না। আমাদের সমস্যা হল, কোন একটা আদর্শকে ভালোবেসে সেটাকেই শেষ পর্যন্ত আমরা দৃঢ় ভাবে ধরে রাখতে পারিনা। ঠাকুর কথামৃতে বলছেন একজন কুয়ো খুঁড়ছে, যেই বালি বেরোতে শুরু করল সেই জায়গা ছেড়ে অন্য জায়গায় খুঁড়তে চলে গেল। সেখানে পাথর বেরোলে আরেক জায়গায় খুঁড়তে লাগল, সেখানে জল বেরোচ্ছে না বলে আরেকটা জায়গায় চলে গেল। আমাদের সবারই জীবন এই রকম। ভালোবাসার ক্ষেত্রেও তাই, আদর্শের ব্যাপারেও তাই আর যে কোন কাজের ব্যাপারেও তাই। রামকে পাইনি বলে শ্যামকে নিয়ে ঘর করবো, এই কথা শুনলে আমাদের খুব সাধারণ মনে হয়, কিন্তু স্বামীজীর খুব উচ্চ অবস্থা থেকে এই উচ্চ মানের কথা বলেছেন। ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর কথাগুলো শুনে সত্যিই খুব সহজ বলে মনে হয়। কিন্তু তাঁদের প্রত্যেকটি কথার কি গভীর তাৎপর্য, কথাগুলো কত সুদূর প্রসারী, এটাকে বোঝার জন্য সারা জীবনের সাধনা দরকার।

স্বামীজী এক সময় একজনকে বলছিলেন ঠাকুরের এক একটি কথার উপর ঝুড়ি ঝুড়ি গ্রন্থ লিখে দেওয়া যায়। যাঁকে এই কথা বলছিলেন তাঁর ভাব ভঙ্গিতে স্বামীজী বুঝলেন যে তাঁর সামনের লোকটির মনে বিশ্বাস হচ্ছে না। তখন স্বামীজী তাঁকে বলছেন ‘তুমি ঠাকুরের যে কোন একটা কথাকে নিয়ে এস’। তখন তিনি ঠাকুরের হাতি নারায়ণ আর মাহুত নারায়ণের কথা তুললেন। এরপর স্বামীজী এই একটি কথার উপর এক নাগাড়ে বলেই যাচ্ছেন। Free Will আর Divine Will এই দুটোর উপর উভয় পক্ষ থেকে যুক্তি চলতে লাগলো। তারপর স্বামীজী নিজের যুক্তি দিয়ে দিয়ে একটা জায়গাতে গিয়ে ঠাকুরের কথাকে সিদ্ধান্তে নিয়ে গেলেন। ঠাকুর, মা, স্বামীজী আর শাস্ত্রের কথা বোঝার জন্য যে সাধনার দরকার সেই সাধনাই আমাদের নেই। সেইজন্য কথাগুলো আমাদের খুব সহজ মনে হয়। কিন্তু যদি গভীরে যাওয়ার চেষ্টা করা হয় তখন তার আর তল পাওয়া যাবে না। এখানে শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণ ব্যর্থ হওয়ার পর গোপীদের যে মনের ভাব সেটাই স্বামীজী খুব সহজ করে বলছেন ‘রামকে পেলাম না বলে কি শ্যামকে নিয়ে ঘর করবো’! তাঁদের প্রাণারাম শ্রীকৃষ্ণকে কোথাও খুঁজে পেলেন না, তাই বলে কি গোপীরা ঘরে ফিরে যাবে? ঘরে ফিরে যেতেই পারতো, কোন সমস্যা ছিল না। কিন্তু গোপীদের মন, প্রাণ, আত্মা, শরীরের প্রতিটি অঙ্গ এমনকি রোমকূপ পর্যন্ত এমন কৃষ্ণময় হয়ে আছে যে তাঁরা অন্য কিছু দেখছেনই না। তাই গোপীরা এখন যাবেটা কোথায়! মানুষ কেন বাড়ি যায়? আশ্রয় নিতে, বাড়ির দেখাশোনা করতে। গোপীরা নিজেদের শরীরকেই সামলাতে পারছে না, তাঁরা বাড়ি কি করে সামলাবে! কিসের আশ্রয় নিতে তাঁরা বাড়ি যাবেন, যেখানে পরম আশ্রয় শ্রীকৃষ্ণ আছেন! সেইজন্য গোপীরা

সবাই মিলে আবার সেই যমুনা পুলিনে চলে গেলেন এই আশায়, শ্রীকৃষ্ণ কখনও না কখনতো ফিরবেন, আর তাঁকে এই পথ দিয়েই তো ফিরতে হবে।

গোপিকা-গীত

যমুনা পুলিনে এসে গোপীরা এখন বিরহ আবেশে গান করতে শুরু করলেন। ভাগবতের এই অংশের নাম গোপিকা-গীত। বিরহের গানের জন্য গোপিকা-গীত খুব বিখ্যাত। গোপিকা-গীত আসলে বিরহগীত। আগেকার দিনে যাঁদের মনে খুব বিরহের ভাব হত তাঁরা তখন এই গোপিকা-গীত, ভ্রমর-গীত পাঠ করতেন। বিরহে মনের কত রকমের অভিব্যক্তি হতে পারে তারই বর্ণনা এই গোপিকা–গীতে দেখানো হয়েছে। গোপিকা-গীতের মাধ্যমে গোপরমণীদের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আকুল ভালোবাসা ও বিরহ বেদনার আর্তি ঝরে পড়ছিল। গোপিকা-গীতের প্রথমেই গোপীরা এই বলে গান করছেন ***জয়তি তেঽধিকং জন্মনো ব্রজঃ শ্রয়ত ইন্দিরা শশ্বদত্র হি। দয়িত দৃশ্যতাং দিক্ষু তাবকাস্ত্বয়ি ধৃতাসবস্ত্বাং বিচিন্বতে।।১০/৩১/১।।*** গোপীরা শ্রীকৃষ্ণের মহিমার কীর্তন করছেন। মানুষের স্বভাবই হল, যাকে সে ভালোবাসে সে কাছে না থাকলে তার কথাই শ্রবণ, মনন, চিন্তন করতে ভালোবাসে। আবার কখন কখন তার প্রতি একটা কৃত্রিম রাগ প্রকাশ করে, এই রাগটাও ভালোবাসারই একটা রূপ। গোপীরা বলছেন 'ওগো প্রিয়তম! তুমি যে বৈকুণ্ঠ ছেড়ে এই ব্রজভূমিতে এসেছ তোমার সাথে তোমার বক্ষবিলাসীনি লক্ষ্মীদেবীও এই ব্রজভূমিতে নেমে এসেছেন। সেইজন্য ব্রজভূমির মহিমা এত বেড়ে গেছে'। ভক্তদের ঠাকুর এই তিনটে দ্রব্য রোজ নিয়ম করে খেতে বলতেন, জগন্নাথের আটকে প্রসাদ, গঙ্গাজল আর ব্রজের রজ।

অবতার বললেই আমাদের মাথায় এই ধারণাই প্রথমে আসে, বৈকুণ্ঠ আছে, সেখানে ভগবান থাকেন আর তিনি সেই বৈকুণ্ঠ থেকে এখানে নেমে এসেছেন। আমরা যেমন সবাই বাড়িতে ছিলাম আর এখন এখানে ভাগবত কথা শুনতে এসে গেছি, ঈশ্বরের ক্ষেত্রেও আমরা ঠিক এই রকমই ভাবি। যাঁরা দ্বৈত মতে ভক্তির অনুশীলন করেন তাঁদের চিন্তা ভাবনা এক রকম ভাবে চলে, কিন্তু যাঁরা অদ্বৈত ভাবে জিনিষটাকে বোঝার চেষ্টা করেন তাঁদের চিন্তা ভাবনা পুরো অন্য রকম। অদ্বৈতবাদীদের কাছে ঈশ্বর সর্বব্যাপী, তিনি সব জায়গাতেই আছেন। তাই বৈকুণ্ঠ ছেড়ে তিনি কি করে আসবেন! কিন্তু ভগবানের যে অবতার লীলা, নররূপ ধারণ করে তাঁর যে নরলীলা, তাতে তিনি শ্রীকৃষ্ণ হয়ে এখন ব্রজভূমিতে আবির্ভূত হয়েছেন। তাই ব্রজভূমি এখন ধন্য হয়ে গেছে। তাহলে যে বলা হয় তিনি বৈকুণ্ঠ ছেড়ে এখানে এসেছেন, সত্যিই কি তিনি বৈকুণ্ঠ ছেড়ে আসেন? তা কখনই নয়। যাদের মধ্যে ভক্তির আধিক্য তারা এই কথাগুলো বলেন নিজের ভাবকে প্রকাশ করার জন্য। এছাড়া আর কিছু নয়, কারণ তিনি সর্বত্র, সব জায়গাতে তিনিই আছেন। তবে যে জায়গাতে তিনি দেহ ধারণ করেন সেই জায়গার মাহাত্ম্যটা বেড়ে যায়। সেই কারণে ব্রজের মাটি এত পবিত্র। যাই হোক, গোপীরা বলছেন আমরা হলাম তোমার দাসী, তোমারই জন্য আমাদের এই দেহ ধারণ আর এখন তোমারই অন্বেষণে আমরা বনে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

পরের শ্লোকে বলছেন ***শরদুদাশয়ে সাধুজাতসৎসরসিজোদরশ্রীমুষা দৃশা। সুরতনাথ তেঽশুল্কদাসিকা বরদ নিঘ্নতো নেহ কিং বধঃ।।১০/৩১/২।।*** হে আমাদের হৃদয়স্বামী! তোমার দুটি নয়নের যে অপরূপ সৌন্দর্য সেই সৌন্দর্যের কাছে শরতের প্রস্ফুটিত পদ্মের সৌন্দর্যও ম্লান হয়ে যায়। আর তুমি তোমার ওই অপরূপ নেত্রের দৃষ্টি দিয়ে আমাদের বধ করে দিয়েছ। শুধু অস্ত্র দিয়ে বধ করাটাই বধ নয়, চোখের চাহনি দিয়েও তো বধ করা হয়, সেটাও অপরাধ। হে কৃষ্ণ! তুমি ভগবান হয়ে সবার প্রতি তোমার করুণা হওয়ার কথা। কারণ যখন তুমি তোমার ওই নয়নদ্বয় দিয়ে আমাদের দিকে দৃষ্টিবাণ নিক্ষেপ কর তখন তো আমাদের হৃদয় ক্ষত বিক্ষত হয়ে রক্তাত্ব হয়ে যায়। তুমি বলো! এই নিষ্ঠুর কর্ম করা কি তোমার উচিৎ কাজ হয়েছে? গোপীরা এখন অভিমানের সুরে এই সব বলে যাচ্ছেন। বলতে চাইছেন, তোমারই দৃষ্টিবাণে আমরা আহত, আমরা ক্ষত বিক্ষত হয়ে গেছি, তুমি ছাড়া এই জগতে কে আছে যে আমাদের এখন বাঁচাবে! তাহলে এর উপায় কি? সেটাই পরের একটি শ্লোকে বলছেন।

ন খলু গোপিকানন্দনো ভবানখিলদেহিনামন্তরাত্মদৃক্। বিখনসার্থিতো বিশ্বগুপ্তয়ে সখ উদেয়িবান্ সাত্বতাং কুলে।।১০/৩১/৪।। জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে যাঁরা মুক্তি পেতে চান, যে সাধক সাধনা করে করে সিদ্ধ পুরুষের অবস্থায় পৌঁছে গেছেন তাঁরা তখন তোমার শরণাপন্ন হন। উপনিষদে বলা হয় জ্ঞান না হলে মুক্তি হয় না। কিন্তু যাঁরা ভক্তিমার্গের সাধক, এমনকি গীতাতেও এই কথা বলা হচ্ছে যে, যাঁরাই ভগবানে পুরোপুরি শরাণাপন্ন হয়ে যান ভগবান তাঁকে জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে বার করে দেন। গীতাতে এই ভাবকেই সমন্বয় করে বলা হয়েছে যে, ভগবানকে ভালোবাসলে ভক্তিও পাওয়া যায় আর চাইলে মুক্তিও পাওয়া যায়। গোপীরা এখানে এই কথা বলছেন 'যাঁরা জন্ম-মৃত্যু চক্র থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছেন তাঁরা তোমার শরণাপন্ন হয়ে যান আর তুমি তোমার সেই সমস্ত দুঃখ-বিঘ্ন-বিপদ নাশকারি করকমলের শীতল ছায়ায় আশ্রয় দিয়ে সম্পূর্ণ রূপে তাঁদের অভয় প্রদান কর'। গোপীরা এই বলে শ্রীকৃষ্ণের কাছে কাতর ভাবে নিবেদন করে বলছেন 'এই যে তোমার করকমল, যে করকমল সদা লক্ষ্মীদেবী ধারণ করে থাকেন, যে করকমল স্থাপন করে দিলে সিদ্ধ পুরুষরা মুক্তির দিকে এগিয়ে যান বা চিরশান্তি পেয়ে যান, সেই করকমল তুমি আমাদের মাথায় রেখে দাও'। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গোপীরা তাঁদের প্রেমকে খুব উচ্চ পর্যায়ে নিয়ে গিয়ে বলছেন 'হে প্রিয়তমে! আমরা দোষ করেছি ঠিকই কিন্তু আমাদের সঙ্গে তুমি অভিমান করো না'। গোপীরা দোষ করেছিলেন। কি দোষ করেছিলেন?

গোপীরা মনে করেছিলেন আমাদের মত সৌভাগ্যবতী এই জগতে আর কেউ নেই। আর গোপীদের মধ্য থেকে একজন যাঁকে সঙ্গে নিয়ে শ্রীকৃষ্ণ উধাও হয়ে গিয়েছিলেন, সেই রাধার ভালোবাসা যেমন, তাঁর অধিকার বোধটাও তেমন। এই অধিকার বোধটাই অহঙ্কার। ফলে কষ্টও সেই রকমই পাবে। ভালোবাসার এই সমস্যা, ভালোবাসলে আনন্দ যেমন দেবে কষ্টটাও সেই মতই দেবে। মিলনে যেমন আনন্দ, বিরহে তেমনই কষ্ট। জ্ঞানীরা তাই দুটোর মধ্যে কোনটাতেই যান না। জ্ঞানী বলেন মিলন আর বিরহ এই দুটোর কোনটাই আমার লাগবে না। কিন্তু এখানে গোপীরা এই দুটোর বাইরে তো যেতে পারবে না। আর যার যেমন ভালোবাসা তার তেমন অধিকার বোধ। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তো কোন সাধারণ পুরুষ নন যে তিনি কারুর অধিকারের ছত্রছায়ায় নিজেকে বিসর্জন দিয়ে দেবেন! শ্রীকৃষ্ণ হলেন ভগবান, তাঁর অখণ্ড অবস্থা থেকে তিনি কখন চ্যুত হন না। সেইজন্য যেখানে পূর্ণ ভক্তির প্রকাশ হয় সেখানে এই অধিকার বোধ চলে না। আধ্যাত্মিক ইতিহাসে এমন অনেক নামকরা সাধক আছেন দেখা যায়, তাঁরা সাধনা করেন ঠিকই কিন্তু pattern না থাকায় অনেক কিছু এলোমেলো হয়ে যায়। তার কারণ অনেক দিন সাধনা করার পর তাঁরা মনে করেন আমি বিরাট কিছু হয়ে গেছি। ঠাকুরও বলছেন, একটু সাধনা জপ-ধ্যান করেই মনে করে আমি অনেক এগিয়ে গেছি, আমার মত আর কেউ নেই।

অহঙ্কারের অহং মানে আমি, এই আমি হল আত্মা আমি। যে যত মুর্খ সে তত অহঙ্কারী, আর যে যত জ্ঞানী তাঁর অহঙ্কার তত সূক্ষ্ম হয়। যে জিনিষ যত সূক্ষ্ম হয় সেই জিনিষ তত শক্তিশালী হয়। সেইজন্য বলা হয় যে কোন জ্ঞানীর অহঙ্কার সাংঘাতিক। আইনস্টাইন একবার একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়েছেন। সেখানে একটি ছাত্রকে নিয়ে এসে আইনস্টাইনকে সবাই বলছেন 'আমাদের এই ছাত্রটি ফিজিক্সের খুব কৃতী ছাত্র, আর এর একেবারেই কোন অহঙ্কার নেই'। আইনস্টাইন শুনে বলছেন 'কী বলছেন! এর এখনও কোন কৃতকৃত্যতা নেই, এ নিরহঙ্কারী কি করে হবে'! যার জীবনে কোন কৃতকৃত্যতা নেই সে যদি বলে আমি বিনয়ী নিরহঙ্কারী, তাহলে বুঝতে হবে ওই বিনয়ের ভাবটা হল তামসিক বিনয়ী। জ্ঞানী জ্ঞানের পথে যত এগোতে থাকে তত তার অহঙ্কারটা সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর হতে হতে শেষ অবস্থায় সেটা মারাত্মক আকার ধারণ করে। ঠাকুর এক সময় বলছেন 'অমুককে দেখে আমার ভয় হল, সে বুঝি আমার থেকে অনেক এগিয়ে গেছে'। কিন্তু এরপর যখন আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যান তখন ওই সূক্ষ্মটা জিরো হয়ে যায়। কিন্তু যত দিন যত সূক্ষ্ম থাকবে সেই অহঙ্কারকে ধরা তত খুব কঠিন হবে। সেইজন্য ঠাকুর বলছেন 'সাধুর সব কিছু চলে যায় কিন্তু সাধুত্বের অহঙ্কার যায় না'। সাধুত্বের অহঙ্কার মানে, অহঙ্কার এখন সূক্ষ্মতর হয়ে গেছে। সাধুকে আপনি মুর্খ, আপনার দ্বারা কিছু হবে না ইত্যাদি যাই বলে দিন সব মেনে নেবেন। কিন্তু যদি একবার বলে দিয়েছেন আপনি একটা ঢপ সাধু, সঙ্গে সঙ্গে ভেতর থেকে ফোঁস করে উঠবেন। কিন্তু যখন জ্ঞান হয়ে যাবে তখন সেই অহঙ্কার নিমেষে শূন্য হয়ে

যাবে। ঠাকুর নিজের ব্যাপারে কত কথাই বলছেন কিন্তু বলছেন 'মাইরি বলছি আমার একটুও অহঙ্কার নেই'। তবে অহঙ্কার দুটো স্তরে বিরাজ করে। একটা হল খুব স্থূল অহঙ্কার, যেটা আমরা সমাজে চারিদিকে দেখছি। তারপর আস্তে আস্তে ওই স্তর থেকে অহঙ্কারটা সূক্ষ্ম হতে শুরু করে। যত সূক্ষ্ম হয় অহঙ্কার তত তীক্ষ্ণ হয়। সাধু যদি কারুর উপরে একবার খেপে যায় তার বংশকে শেষ না করা পর্যন্ত সে থামবে না। সাধারণ লোকেদের অহঙ্কার ঢ্যামনা সাপের মত, শরীরটা বিশাল কিন্তু তাতে কোন বিষ নেই। গোপীরা অনেকটা এগিয়ে গেছেন কিন্তু এখনও আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হননি, তাই গোপীদের অহঙ্কারটা সূক্ষ্ম অবস্থায় রয়েছে। আর তাঁদের মধ্যে রাধার অহঙ্কার আবার আরও সূক্ষ্ম। কিন্তু যতই সূক্ষ্ম হোক ভগবানের কাছে সবটাই ধরা পড়ে যাবে। যাই হোক গোপীরা এখন বুঝতে পেরেছেন কেন শ্রীকৃষ্ণ তাঁদেরকে ফেলে রেখে উধাও হয়ে গেছেন। এখন সবাই মিলে শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করে কান্নাকাটি করছেন আর বলছেন আমাদের তুমি গ্রহণ করে আমাদের সব অপরাধ ক্ষমা করে দাও, সব দোষ মার্জনা করে দিয়ে তোমার পা আমাদের বুকে রাখ।

এই গোপিকা-গীতের নয় নম্বর শ্লোকটি কথামৃতাকার শ্রীম শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের ভূমিকাতে উল্লেখ করেছেন, যা কিনা কথামৃতের পাঠকরা গ্রন্থ পাঠের পূর্বে নিত্য পাঠ করেন – ***তব কথামৃতং তপ্তজীবনং কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্। শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং ভুবি গৃণন্তি তে ভূরিদা জনাঃ।।১০/৩১/৯।*** গোপীরা নিজেদের শ্রীকৃষ্ণ বিরহের আর্তি জানিয়ে বলছেন 'হে প্রাণবল্লভ! তোমার নিজমুখের কথা যেমন মধুর, তোমার লীলাকথাও তেমনি অমৃতস্বরূপ। ত্রিতাপ-দগ্ধ জীবের পক্ষে তা জীবনদায়ী পরমৌষধ, তাপিত জনের তৃষ্ণা নিবারণী শীতল জল। শ্রবণ মাত্রই তোমার কথামৃত শ্রোতার পরম মঙ্গল সাধন করে, সর্ব কলুষ ও সর্ব পাপ হরণ করে। আর তোমার কথামৃতের যাঁরা কথক তাঁরাই জগতের মহত্তম দাতা কারণ তাঁরাই তোমার অমৃতময় কথা মানবের কর্ণে পৌঁছে দিয়ে তাদের অমৃত দান করেন'।

গোপিকা-গীত হয়ে গেছে। গোপীরা আর কৃষ্ণ-বিরহের জ্বালা সহ্য করতে পারছেন না। সবাই খুব ক্রন্দন করে চলেছেন। ব্যাসদেব এর আগে বলেছিলেন গোপীরা তাঁদের সূক্ষ্ম শরীর বা কারণ শরীর নিয়ে বেরিয়ে এসেছিল। রাসলীলার শুরু থেকে গোপিকা-গীত পর্যন্ত দু তিন ঘন্টা অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। কোন গ্রামের বাড়ির মেয়েরা বা মায়েরা যদি বাড়ি থেকে দু তিন ঘন্টা নিরুদ্দেশ হয়ে থাকে তাহলে বাড়ির লোকরা কি ঘরে চুপচাপ বসে থাকতে পারবে! তারাও বাড়ির মেয়েদের অনুসন্ধানে বেরিয়ে পড়বে। আর শ্রীকৃষ্ণের বাঁশি শুনে শুধু মেয়েরাই কেন এল পুরুষরা কেন এল না? ব্যাসদেব তাই বলছেন গোপীদের স্থূল শরীর আসেনি তাঁদের সূক্ষ্ম শরীর চলে এসেছিল। গোপীরা বিরহ কাতর হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে ভাবে, ভাষায়, ছন্দ মাধুর্যে, ব্যঞ্জনায় গভীর ভাবে আর্তি নিবেদন করে রোদন করতে থাকলেন ঠিক সেই সময় হঠাৎ শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের মধ্যে পুনরায় আবির্ভূত হলেন। তখন মৃত মানুষে যেন প্রাণ জেগে উঠল। তারপর যা হওয়ার সেই ভালোবাসার অভিব্যক্তিকে বিভিন্ন ভাবে প্রকাশ করতে শুরু করলেন। সেই বর্ণনাতে আমরা যাচ্ছি না।

কিন্তু বত্রিশ অধ্যায়ের ১৩শ শ্লোকে গোপীরা শ্রীকৃষ্ণকে বলছেন ***তদ্দর্শনাহ্লাদবিধূতহৃদ্রুজো মনোরথান্তং শ্রুতয়ো যথা যযুঃ। স্বৈরুত্তরীয়ৈঃ কুচকুঙ্কুমাঙ্কিতৈরচীক্৯পন্নাসনমাত্মবন্ধবে।।১০/৩২/১৩।।*** শ্রীকৃষ্ণ বিরহে গোপীরা এতক্ষণ কান্নাকাটি করছিলেন, কিন্তু হঠাৎ শ্রীকৃষ্ণকে নিজেদের মাঝখানে আবির্ভূত হতে দেখে তাঁদের মনে যে আনন্দের বহিঃপ্রকাশ হতে লাগলো, এখানে তারই বর্ণনা করা হয়েছে। এর আগেও আমরা বলেছিলাম খ্রীশ্চানরা এটাকেই বলে Dark night of the soul। এতে তিনি এক ঝলক দর্শন দিয়েই আবার উধাও হয়ে যান। তখন সাধকের মনে প্রচণ্ড এক ছটফটানি হতে শুরু হয়ে যায়। সাধক তখন ভাবে সব ভুল, অলীক। বিভিন্ন সাধকদের ক্ষেত্রেই এই জিনিষ দেখা যায়। ঠাকুরের সাধনার জীবনেও একই জিনিষ হতে দেখা গিয়েছিল। হঠাৎ একটু দর্শন হওয়ার পর আর কোন দর্শন পাচ্ছেন না। তারপর ঠাকুরের সে কী ব্যাকুলতা! তারপর আবার দর্শন, তখন শান্তি। ব্যাকুলতা বেড়ে যাওয়ার পর এই যে দ্বিতীয়বার দর্শন হয়, এই দ্বিতীয় দর্শনে যে এত আনন্দ হয় তাতে বলছেন, হৃদয়ের যত রকম ব্যাধি হতে পারে, ব্যাধি মানে ভবরোগ (কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহাদি), তৎক্ষণাৎ এই ভবরোগ দূর হয়ে যায়। এখানে শুকদেব তুলনা করে বলছেন – বেদে

যে কর্মকাণ্ড রয়েছে, সেই কর্মকাণ্ড করতে করতে তাঁরা যেমন জ্ঞানকাণ্ডে প্রবেশ করে যান, ঠিক সেই রকম শ্রীকৃষ্ণকে পেয়ে গোপীদের মনে এমন আহ্লাদ হয়েছে যে ভেতরে যা কিছু আবর্জনা ছিল সব পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। এরপর গোপীরা তাঁদের কুমকুমে রঞ্জিত উত্তরীয় মাটিতে বিছিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে বসতে দিয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণ এখনও আগের মত গোপীদের সাথে বিভিন্ন ভাবে মজা করে যাচ্ছেন।

‘ভালোবাসা’র বিশ্লেষণ

এই ভালোবাসার বর্ণনার মধ্যে গোপীরা শ্রীকৃষ্ণকে বলছেন ***ভজতোঽনুভজন্ত্যেক এক এতদ্বিপর্যয়ম্। নোভয়াংশ্চ ভজন্ত্যেক এতন্নো ব্রূহি সাধু ভোঃ।।***১০/৩২/১৬। ‘হে কৃষ্ণ! এই জগতে তিন রকমের প্রেম দেখা যায়, এক ধরণের লোক আছে যারা তাদের ভালোবাসে তাদেরকেই তারা ভালোবাসে। এরা বলে ভালোবাসা এক তরফা হয় না, তুমি আমাকে ভালোবাসবে আমিও তোমাকে ভালোবাসব। দ্বিতীয় কেউ কেউ আছে ঠিক এর বিপরীত তাদের যারা ভালোবাসে না সে তাদেরকেও ভালোবাসে। এদের মনোভাব হল তুমি আমাকে ভালোবাস আর নাই বাস আমি তোমাকে ভালোবাসি। আবার তৃতীয় শ্রেণীর লোক আছে যারা এই উভয়ের কাউকেই ভালোবাসে না। হে কৃষ্ণ! এই বিষয়ে ভালোমন্দ তুমি আমাদের ভালো করে বুঝিয়ে দাও’। গোপীরা তিন ধরণের ভালোবাসার কথা বললেন। প্রথম হল, তুমি যদি আমাকে ভালোবাস তাহলে আমিও তোমাকে ভালোবাসব। দ্বিতীয় হল, তুমি ভালোবাস আর নাই বাস আমি তোমাকে ভালোবেসে যাবো। আর তৃতীয় হল, তুমি ভালোবাস কিন্তু আমি তোমাকে ভালোবাসি না। গোপীরা সবাই মিলে কৃষ্ণকে ভালোবেসেছে। গোপীরা শ্রীকৃষ্ণের কাছে অভিমান সুরে জানতে চাইছেন ‘হে কৃষ্ণ! তোমার ভালোবাসা কোন ধরণের। আদপেই তোমার মধ্যে ভালোবাসা আছে কি নেই। যদি তোমার মধ্যে ভালোবাসা থাকে তাহলে এই ভালোবাসা তোমার কার প্রতি? যারাই তোমাকে ভালোবাসে তাদের প্রতিই কি তোমার ভালোবাসা যায়? কি তারা তোমাকে ভালো না বাসলেও তোমার ভালোবাসা তাদের প্রতি যায়? স্বামীজী ভক্তিযোগে ঠিক এই প্রশ্নগুলো নিয়ে খুব সুন্দর আলোচনা করেছেন।

শ্রীকৃষ্ণ তখন গোপীদের কাছে ভালোবাসার বিশ্লেষণ করছেন। গোপীরা যেমন তিন ধরণের ভালোবাসার কথা বললেন, তার উত্তরে ভালোবাসার বিশ্লেষণ করতে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের সাত রকমের ভালোবাসার কথা বলছেন। প্রথম হল ***মিথো ভজন্তি যে সখ্যঃ স্বার্থৈকান্তোদ্যমা হি তে। ন তত্র সৌহৃদং ধর্মঃ স্বার্থার্থং তদ্ধি নান্যথা।।১০/৩২/১৭।।*** **(১)** প্রথম ধরণের ভালোবাসায় উভয় উভয়কে ভালোবাসে। এই ভালোবাসা পুরো স্বার্থের ভালোবাসা এর মধ্যে লেনদেন থাকে। ভালোবাসাতে ব্যবসা বাণিজ্য চলে না। স্বামীজী এর খুব সুন্দর উপমা দিচ্ছেন, আমি হিমালয়কে ভালোবাসি কিন্তু হিমালয় সেই ভালোবাসার বিনিময়ে আমাকে ফেরত কিছু দেয় না। তুমি আমাকে যদি ভালোবাস তাহলে আমিও তোমাকে ভালোবাসব এই ভালোবাসা হল পুরোপুরি বেচাকেনার ভালোবাসা। এই ভালোবাসায় কোন সৌহার্দ্য থাকে না আর এতে কোন ধর্মও থাকে না। এটা কোন ভালোবাসাই নয়, পুরো ব্যবসায়িক ভালোবাসা। এদের ধর্মটাও ব্যবসায়িক বুদ্ধিতে প্ররোচিত হয়। হে ভগবান! আমি তোমাকে এই এই দিয়ে পূজো করলাম, তার বদলে তুমি আমার এই এই ভালো করে দাও। এই ধরণের ভালোবাসায় না আছে কোন সৌহার্দ্য না আছে কোন ধর্ম, আর না আছে প্রেম। স্বার্থসিদ্ধি ছাড়া এই ভালোবাসায় কিছু নেই।

(২) দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বলছেন তুমি আমাকে ভালোবাস আর নাই ভালোবাস আমি তোমাকে ভালোবাসি। এই ধরণের ভালোবাসা একমাত্র করুণাশীল সজ্জনদের মধ্যেই থাকে। এখানে শ্লোকে বলছেন ***ভজন্ত্যভজতো যে বৈ করুণাঃ পিতরো যথা। ধর্মো নিরপবাদোঽত্র সৌহৃদং চ সুমধ্যমাঃ।।১০/৩২/১৮।।*** মা-বাবা সন্তানের প্রতি যে রকম করুণাশীল হন তাঁরাই এই ভালোবাসা দিয়ে নিজের সন্তানকে ভালোবাসতে পারেন। আর স্বভাবতঃ যাঁরা সবারই প্রতি করুণাসম্পন্ন, সমস্ত প্রাণীর প্রতি স্নেহ ভালোবাসা পরায়ণ, যেমন সাধু সন্ন্যাসীরা বা আচার্যরা যে রকম ভালোবাসেন, তাঁরা অকাতরে সবাইকে সমান ভাবে ভালোবেসে যান, ভালোবাসার প্রতিদানে তাঁরা কোন কিছু প্রত্যাশা করেন না। স্বামীজী সেইজন্য ঠাকুরের প্রণাম মন্ত্রে বলছেন

আচণ্ডালাপ্রতিহতরয়ো যস্য প্রেমপ্রবাহঃ। ঠাকুরকে আমরা ভালোবাসছি কি বাসছি না, ভজনা করছি কিনা তাতে ঠাকুরের কিছু আসে যায় না কিন্তু সবারই প্রতি চণ্ডাল পর্যন্ত তাঁর ভালোবাসা সমান ভাবে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। এই ভালোবাসা খুব উচ্চস্তরের ভালোবাসা। এই ভালোবাসা খুব কঠিন, সহজে হয় না। একটু আধ্যাত্মিক ভাব না থাকলে মাও নিজের সন্তানকে সহ্য করতে পারে না। সাধারণত মা-বাবার সন্তানের প্রতি, গুরুর শিষ্যের প্রতি আর যাঁরা সন্ত মহাপুরুষ তাঁদের স্বভাবের মধ্যেই এই ধরণের করুণার ভাব থাকে। পাড়ার কিছু কিছু বিধবা মহিলাদের দেখা যায় তারা রাস্থার কুকুর, বেড়ালকেও ভালোবাসে। অনেক সময় দেখা যায় কোন বয়স্কা মহিলা রাস্থা দিয়ে যাওয়ার সময় পাড়ার যত কুকুর দৌড়ে এসে তার গায়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তিনি হয়তো কুকুরকে বিস্কুট বা অন্য কিছু খাওয়ান। উনি কাউকে কিছু বকাবকি করছেন না। কুকুরগুলোও জানে আমি এখানে আশ্রয় পাই। শ্লোকের শেষ লাইনে বলছেন *ধর্মো নিরপবাদোঽত্র সৌহৃদং চ সুমধ্যমাঃ*, এই ভালোবাসা হল নিশ্চল সত্য আর ধর্মে পরিপূর্ণ, এর থেকে উচ্চ ভালোবাসা জগতে পাওয়া যায় না। সেইজন্য মা-বাবার ভালোবাসা, সাধু মহাত্মাদের ভালোবাসা বা যেখানে করুণার ব্যাপার জড়িয়ে আছে, এই ভালোবাসাই শ্রেষ্ঠ ভালোবাসা। এই ভালোবাসাই প্রত্যেক মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য হওয়া উচিৎ।

ভজতোঽপি ন বৈ কেচিদ্ ভজন্ত্যভজতঃ কুতঃ। আত্মারামা হ্যাপ্তকামা অকৃতজ্ঞা গুরুদ্রুহঃ।।১০/৩২/১৯।। আবার কিছু লোক হয় যাদের কেউ ভালোবাসছে কিন্তু তাও সে ভালোবাসতে পারে না, আর না ভালোবাসলে সেখানে তো ভালোবাসার কোন প্রশ্নই নেই। এই তৃতীয় ধরণের যে ভালোবাসা, যেখানে প্রতিপ্রেম নেই, অর্থাৎ প্রেমের প্রতিদান যেখানে নেই। এই তৃতীয় ধরণের ভালোবাসা আবার চার ধরণের। এর প্রথমটা অর্থাৎ সাত রকমের হিসাবে **(৩)** তৃতীয় হল যিনি আত্মারাম, অর্থাৎ যিনি পূর্ণজ্ঞানী, তাঁকে আপনি যতই ভালোবাসুন, উনি আপনাকে কখন ভালবাসতে যাবেন না। উনি হলেন আত্মারাম, নিজেই নিজের মধ্যে মত্ত হয়ে আছেন, কোন দিকেই তাঁর কোন হুঁশ নেই। **(৪)** দ্বিতীয় অর্থাৎ চতুর্থ হল আপ্তকাম, এনাদের দৃষ্টিতে এখনও দ্বৈতই সত্য। আত্মারামের আমি তুমি বোধই নেই। তিনি যখন আমাদের দেখছেন তখন আমাদের মধ্যে তিনি নিজেকেই দেখছেন, আমিই তো সব কিছু হয়েছি। তাঁর পক্ষে আলাদা করে কাউকে ভালোবাসা সম্ভবই নয়। ঠাকুর যখন তোতাপুরির কাছে অদ্বৈত সাধনা করছিলেন তখন তিনি যে সমাধিতে চলে যাচ্ছেন সেখানে তাঁর কোন হুঁশই নেই। তিনি তখন অখণ্ডে অবস্থিত, সবটাই এক দেখছেন, তাঁর পক্ষে কোন দিকে তাকানো সম্ভবই না। কিন্তু পরের চতুর্থ যে ভালোবাসার কথা বলা হচ্ছে তাতে আপ্তকামের কথা বলছেন। আপ্তকামে আমি তুমি বোধ আছে কিন্তু তিনি কৃতকৃত্য হয়ে গিয়ে জ্ঞানের এমন অবস্থায় চলে গেছেন যেখানে তাঁরও আত্মারামের মত কোন দিকে দৃষ্টি নেই। ঠাকুর যখন নির্বিকল্প সমাধি থেকে নেমে দ্বৈত ভাবে থাকতেন তখন তিনি এই অবস্থাতেই থাকতেন। তবে এখানে যে আপ্তকামদের কথা বলা হচ্ছে, এনারা ভক্তি সাধনা করে একটা উচ্চ অবস্থায় চলে গেছেন। যদি এনারা আমাদের প্রতিপ্রেম নাও দেন তাতে কোন দোষ হবে না, কারণ তাঁদের কিছু করার থাকে না। আত্মারাম আর আপ্তকাম পুরুষদের জগতের ব্যাপারে কোন হুঁশই নেই। কিন্তু যিনি সংবেদনশীল, তিনি অবতারই হন আর সজ্জন বা সৎপুরুষ যাই হন না কেন, যদি তিনি দেখেন আমাকে কেউ ভালোবাসছে, তাঁকে তিনি সদ্গুণ দিয়ে ফেরত দেবেন, কৃতজ্ঞতাকে কখন তাঁরা ভুলে যাবেন না। এই যে বলে, তুমি এক পয়সা দিলে ভগবান তোমাকে এক লাখ দেবেন, এর অর্থ এটাই – সৎপুরুষ কখন কোন কিছু রাখবেন না। আপনি একজন সৎ পুরুষকে ভালোবাসছেন, আর সৎ পুরুষ কোন দিন সেই ভালোবাসা ফেরত দিতে পারবেন না এই অর্থ বলা হয় যে, ভালোবাসা মানে নিজেকে অর্পণ করে দেওয়া। যখন একজন নিজেকে অর্পণ করে দেয়, এটাই হল সব থেকে উচ্চ ত্যাগ। একজন মানুষকে দুটো বা দশটা টাকা দেওয়া কিছুই না, কিন্তু নিজেকে দিয়ে দেওয়া এ খুব উচ্চ কথা। বাল্মীকি রামায়ণে আছে শ্রীরামচন্দ্র হনুমানকে বলছেন 'হে হনুমান! তুমি সীতার সংবাদ এনে আমাকে যে ঋণে আবদ্ধ করলে এই ঋণ শোধ করা যাবে না। সেইজন্য হে হনুমান! আমি আমার সর্বস্ব তোমাকে দিয়ে দিচ্ছি'। কি সর্বস্ব দিচ্ছেন! শ্রীরামচন্দ্রের আলিঙ্গন। তিনি হনুমানকে আলিঙ্গন করে বুকের মধ্যে জড়িয়ে নিলেন। আলিঙ্গন করা মানে, আমি আমার সর্বস্ব তোমাকে দিয়ে দিলাম।

(৫) এবারে পঞ্চম ধরণের কথা বলছেন। এরা হল অকৃতজ্ঞ, ভাষ্যকাররা অকৃতজ্ঞের অনুবাদ করছেন যারা জানেই না যে তাকে কেউ ভালোবাসছে। মানে অবোধ বা অবুঝ, সে জানেই না যে আমাকে কেউ ভালোবাসছে বা ভালোবাসাটা বুঝতেই পারে না। সিনেমার হিরোদের অনেক মেয়েরাই ভালোবাসে, সেই হিরো বেচারী জানেও না যে অমুক গ্রামের একটি কিশোরী তাকে ভালোবাসছে, তাহলে সে এই ভালোবাসার কী প্রতিদান দেবে! তবে এখানে সাধারণতঃ তাদের কথাই বলা হচ্ছে যারা অবুঝ বা জানে না যে তাকে কেউ ভালোবাসছে। **(৬)** আর ষষ্ঠ হল গুরুদ্রোহী, এরা বাবা-মার থেকে, সমাজ থেকে সমস্ত রকমের সাহায্য, সুবিধা, সুযোগ নিয়ে যাবে কিন্তু প্রতিদানে কিছুই করবে না। এই রোগটা অনেক আগে পাশ্চাত্য দুনিয়াকে আক্রমণ করেছিল, ইদানিং আমাদের এখানেও এই রোগ ভয়ঙ্কর রূপে দেখা দিচ্ছে, এই রোগের নাম Border line personality disorder। এতে ছেলেমেয়েরা পাগলের মত আচরণ করে, আবার পুরো পাগলও নয়। এরা বাবা-মার কাছে সব রকম প্রত্যাশা করে, তার খাওয়া-দাওয়া যেন ঠিক থাকে, তার পোশাক যেন ঠিক থাকে, হাত খরচাটা যেন ঠিক থাকে কিন্তু নিজেরা পারিবারিক কোন কর্তব্য পালন করবে না, বাড়ির কোন সংস্কৃতি, আদব-কায়দা অনুসরণ করবে না, হয়তো রাত দুটোর সময় বাড়ি ফিরছে, বেলা বারোটা পর্যন্ত ঘুমোচ্ছে। এদেরকে বলছেন গুরুদ্রোহী। আমরা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কত কথা বলছি, কিন্তু দেখুন এনারা অর্দ্ধেক শ্লোকে পুরো জিনিষটাকে বলে দিচ্ছেন – আত্মারামা, আপ্তকামা, অকৃতজ্ঞ ও গুরুদ্রোহী। প্রথমে দুটো বলে দিয়েছেন – একটা হল স্বার্থের ভালোবাসা আর দ্বিতীয়টা বাবা-মার ভালোবাসা বা সাধু মহাত্মাদের ভালোবাসা। এই হল মোট ছয় ধরণের ভালোবাসা।

এরপর ভগবান বলছেন ***নাহং তু সখ্যো ভজতোহপি জন্তূন্ ভজাম্যমীষামনুবৃত্তিবৃত্তয়ে। যথাহধনো লব্ধধনে বিনষ্টে তচ্চিন্তয়ান্যন্নিভৃতো ন বেদ।।১০/৩২/২০।।*** গোপীদের যে প্রশ্ন ছিল সেই ব্যাপারে এবার শ্রীকৃষ্ণ নিজের ব্যাখ্যাটা দিচ্ছেন। হে সখীগণ দেখো! আমার যে ভালোবাসা তা এই ছয় ধরণের কোন ভালোবাসার মধ্যেই পড়ে না। **(৭)** 'আমার ভালোবাসাটা সপ্তম ধরণের ভালোবাসা। এই ভালোবাসাটা কি রকম? *অমীষামনুবৃত্তিবৃত্তয়ে*, আমার প্রতি যাদের ভালোবাসা আছে, তাদের সেই ভালোবাসা যাতে আরও বেশী আমার প্রতি হয়, সেইজন্য মাঝে মাঝে এমন ব্যবহার করি যাতে দেখাই আমি যেন তাদের প্রেম করছি না, তাদের প্রতি আমার যেন কোন ভালোবাসাই নেই'। এই বলে ভগবান উপমা দিচ্ছেন, যখন কোন নির্ধন মানুষ প্রচুর টাকা-পয়সা পেয়ে যায় তারপর তার সব টাকা-পয়সা যদি চলে যায় তখন তার পুরো মনটা ওই টাকা-পয়সাতেই পড়ে থাকে। আমার টাকা নেই বলে খুব মজায় আছি, আমার ক্ষমতা নেই তাই খুব মজায় আছি, কিন্তু কোন কারণে যদি হাতে প্রচুর টাকা-পয়সা আর তার সাথে ক্ষমতা এসে যায়, তখন আমাকে আর সামলানো যাবে না। সেইজন্য বলে গাছে ওঠা খুব সোজা কিন্তু গাছ থেকে নামা খুব কঠিন। আপনি গরীব আছেন, তাই আপনার কোন সমস্যা নেই। কিন্তু একবার যদি কোন ভাবে প্রচুর টাকা পেয়ে যান, আর তারপর সেই টাকা হাত থেকে যদি কোন কারণে বেরিয়ে যায় তখন আপনার যে কষ্ট হবে, সেই কষ্ট সহ্য করা খুব দুষ্কর। ঠাকুর খুব সহজ করে বলছেন, মিস্রির পানা খেলে চিটে গুড়ের পানা আর ভালো লাগে না। যত দিন আস্বাদ হয়নি তত দিন ঠিক ছিল, একবার আস্বাদ হয়ে গেলে অন্য কিছু আর মুখে রুচবে না। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন 'আমি তাকে একটু আস্বাদ দিয়ে দিই, এই কারণেই আস্বাদ দিয়ে দিই যাতে ওর মন অন্য কোন দিকে আর না যায়। কামিনী-কাঞ্চনের দিকে, জগতের কোন কিছুর দিকে যাতে আর মন না যায়। তার পুরো মনটা যেন আমার দিকেই পড়ে থাকে। তাই তো যারা আমাকে ভালোবাসে তাদেরকেও আমি সেইভাবে ভালোবাসি না। কেন ভালোবাসি না? যাতে তাদের চিত্তবৃত্তিটা আমার উপর লেগে থাকে। যখন আমি কারুর উপর কৃপা করে তার সামনে চলে আসি তার খুব আনন্দ হয়। আর একটু কাছে আসার পর আমি যখন তার কাছ থেকে সরে আসি তখন তার মনটা পুরো আমার উপর পড়ে থাকে। আমি চাই এদের মন যেন সব সময় আমাতেই পড়ে থাকে। সেইজন্য আমি তোমাদের সাথে লীলা করলাম আবার তোমাদের কাছ থেকে অন্তর্ধান হয়ে গেলাম, যাতে তোমাদের মন প্রাণ সবটাই আমার উপরই লেগে থাকে'।

বাইবেলে একটা গল্প আছে যাতে এক ভদ্রলোকের দুই ছেলে। ছোট ছেলে ঝগড়া করে বলল আমার হিস্যে আমাকে দিয়ে দাও। সেই টাকা নিয়ে ছোট ছেলে চলে গেল ব্যবসা করতে। অনেক বছর ব্যবসা করে তার সব টাকা-পয়সা নষ্ট করে বাড়ি ফিরে খুব কান্নাকাটি করছে। ইতিমধ্যে বড় ছেলেটি খুব খেটেখুটে আগের থেকেও প্রচুর সম্পত্তি বানিয়েছে। ছোট ছেলেটির মঙ্গলার্থে বাবা ওদের একটা বাছুরকে বলি দিয়েছে। বড় ছেলেটি ফিরে এসে যখন জানতে পারল তাদের একটা বাছুরকে জেবা করা হয়েছে তখন সে খুব রেগে গিয়ে বাবাকে বলছে 'বাবা! তুমি তো আমার জন্য কোন দিন এই ধরণের কাজ করলে না। যে ছেলে আমাদের এত জ্বালাল, সব সম্পত্তি বিক্রী করে চলে গেল তার জন্য একটা বাছরকে জেবা করে দিলে'! তখন বাবা বললেন 'দেখ বাবা! তুমি তো সব সময়ই আমার কাছে আছ। কিন্তু আমার এই সন্তান পথভ্রষ্ট হয়ে ঘুরে ঘুরে আবার আমার কাছেই ফিরে এসেছে, তার ভালোর জন্যই এটা করা হয়েছে'।

এতে কি হয়, আমরা যখন সব মিলে মিশে যাই তখন সেই সম্মানটা আর থাকে না। সেইজন্য একটু দূরে দূরে রাখতে হয়। দুই বন্ধু এক পাড়াতেই মিলেমিশে থাকছে, কিন্তু যখন কোন বন্ধু বাইরে ছিল সে হঠাৎ এসে গেছে তখন তার খাতির বেশী হয়। জামাই যখন শ্বশুড় বাড়ি আসে তখন তার আদর যত্ন বেশী হয়, আর জামাই যখন ঘরজামাই হয়ে থাকে তখন কোন পাত্তা পায় না। এটাই এখানে শ্রীকৃষ্ণ বলতে চাইছেন, আমি কারুর ঘরজামাই হচ্ছি না। তাই মাঝে মাঝে আমি এই রকম আচরণ করে থাকি।

গোপীদের ভালোবাসার ঋণ থেকে ভগবানও মুক্ত হতে পারেন না

শ্রীকৃষ্ণ বলছেন ***এবং মদর্থোজ্ঝিতলোকবেদস্বানাং হি বো ময্যনুবৃত্তয়েঽবলাঃ। ময়া পরোক্ষং ভজতা তিরোহিতং মাসূয়িতং মার্হথ তৎ প্রিয়ং প্রিয়াঃ।।১০/৩২/২১।।*** 'হে অবলা গোপীরা! আমি জানি তোমরা আমার জন্য লোকমর্যাদা, ধর্মের পথ, কলঙ্কের ভয়, নিজের পরিজন সম্বন্ধী সব কিছু ছেড়ে আমার কাছেই এসেছ, এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু নানান রকমের বিক্ষেপের জন্য তোমাদের মন যাতে আমার কাছ থেকে না সরে যায় সেইজন্য আমি যে এই রকম ব্যবহার করেছি তাতে আমার কোন দোষ নেই'। শেষ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ খুব সুন্দর করে বলছেন ***ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ। যা মাভজন্ দুর্জরগেহশৃঙ্খলাঃ সংবৃশ্চ্য তদ্ বঃ প্রতিয়াতু সাধুনা।।১০/৩২/২২।।*** 'তোমরা আমাকে পাওয়ার জন্য জগতের সব বাঁধন ছিঁড়ে চলে এসেছ, ঘরবাড়ি, লোকমর্যাদা, বেদমর্যাদা, যত রকমের মর্যাদা হতে পারে সব মর্যাদা ভেঙে দিয়েছ শুধু আমাকে পাওয়ার আশায়। তোমরা আমাকে যে ভালোবাসা দিয়েছ এই ভালোবাসা কেউ পায় না। এই ভালোবাসার জন্য আমি তোমাদের কাছে চিরদিন ঋণী থাকব। এই ঋণ কোন দিন শোধ করা যাবে না। আমি তোমাদের যাই করে দিই না কেন, তোমাদের এই ভালোবাসার ঋণ কোন ভাবেই মেটান যাবে না। তবে তোমরা হলে সৌম্য আর মিষ্ট স্বভাবের, তোমরা যদি কৃপা করে আমাকে ঋণমুক্ত করে দাও তবেই এই ঋণ থেকে আমি মুক্ত হতে পারবো, তা নাহলে আমি কোন দিন তোমাদের এই ঋণ পরিশোধ করতে পারবো না'।

ঠাকুর বলছেন, ভক্ত কখন ছুঁচ হন আর ভগবান চুম্বক হন আবার কখন ভগবান ছুঁচ হন আর ভক্ত চুম্বক হন। কখন ভগবান ভক্তকে টানছেন আবার ভক্ত কখন ভগবানকে টানছেন। শ্রীকৃষ্ণও তাই বলছেন, তোমরা আমাকে যে ভালোবাসা দিয়েছ এই ভালোবাসা একেবারে আত্মীক সংযোগ, এই প্রেম আত্মার প্রেম, আত্মার সাথে আত্মার মিলন, দেহের সাথে কোন সম্পর্ক নেই। গোপীদের ভালোবাসা অত্যন্ত নির্মল আর সর্বথা নির্দোষ। শ্রীকৃষ্ণ তাই গোপীদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন, সব ধরণের ঋণ পরিশোধ করা যায়, কিন্তু তোমাদের এই ভালোবাসার ঋণ আমি কোন দিন মেটাতো পারবো না। সেইজন্য দেখা যায় কোন সাধুপুরুষকে যদি কেউ ভালোবাসে সে কিন্তু জীবনে কোন দিন সেই ভালোবাসার কথা ভুলবে না। এর আগে আমরা আত্মারাম আর আপ্তকাম পুরুষদের ভালোবাসার কথা আলোচনা করেছি, আত্মারাম আর আপ্তকাম সব সময় আপনাকে এড়িয়ে চলবেন, কারুর ধারে কাছেই যাবেন না। কোন কারণে যদি তাঁরা কাউকে গ্রহণ করে নেন তাহলে তার থেকে

তাঁরা কোন দিন আর বেরোতে পারবে না। এই কথাই শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের বলছেন তোমরা সামাজিক বন্ধন, নিজের দেহ, নিজের মন সব কিছু আমাকে সমর্পণ করে দিয়েছ।

গোপীদের পূর্ণ ভালোবাসায় ভগবানের ভালোবাসা যেন পূর্ণ দুধের পাত্রে চিনি ঢালা

তার আগে শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের বোঝাচ্ছিলেন, 'তোমার আমাকে ভালোবাস ঠিকই, কিন্তু আমার প্রতি তোমাদের ভালোবাসা যাতে আরও বাড়ে, তোমাদের ভালোবাসা যাতে আরও পরিপূর্ণতা লাভ করে, আমার প্রতি যাতে তোমাদের তীব্র ব্যাকুলতা হয়, তোমাদের ভালোবাসার মধ্যে যাতে কখন আমি ছাড়া অন্য কোন কিছু ঢুকতে না পারে, সেইজন্য আমি তোমাদের থেকে দূরে চলে যাই'। কিন্তু যেটা পূর্ণ সেটা আর কি বাড়বে। পার্সিদের উপর একটা খুব সুন্দর গল্প আছে।

পারস্যে মুসলমানরা যখন খুব অত্যাচার করছিল তখন পার্সিরা ইরান থেকে পালিয়ে ভারতবর্ষে এসে আশ্রয় নিল। প্রথমে গুজরাতের রাজার কাছে তারা আশ্রয় চাইল। গুজরাতের রাজা দেখলেন সত্যিই এরা খুব কষ্টে পড়েছে। তিনি পার্সিদের জিজ্ঞেস করলেন 'তোমরা কি চাও বল'। এরা তখন বলল, আমরা যাতে নিজেদের ধর্ম পালন করতে পারি আর আমাদের সংস্কৃতি যেন রক্ষা করতে পারি। রাজা বললেন 'তোমরা এখানে থেকে তোমাদের ধর্ম ও সংস্কৃতি পালন করতে পার কিন্তু কোন ধর্মান্তর করতে পারবে না'। পার্সিরাও রাজী হয়ে গেল। তখন পার্সিদের একজন বড় নেতা নিজের লোকদের বলে এক পাত্র দুধ আনিয়েছেন। দুধ আনা হলে তিনি ওই দুধের মধ্যে একটু চিনি ঢেলে দিলেন। রাজা সেই নেতাকে জিজ্ঞেস করলেন এর কি তাৎপর্য। তখন সেই পার্সি নেতা বললেন 'আপনারা হলেন দুধের মত আর আমরা হলাম চিনি। দুধ আর চিনি দুটো আলাদা, কিন্তু দুধে চিনি এসে মিশে গেল। ঠিক তেমনি আমরা সবাই আপনাদের মধ্যে বিলীন হয়ে যাবো। আমাদের আলাদা কোন সত্তা থাকবে না। কিন্তু তাতে আপনাদের মিষ্টত্ব বেড়ে যাবে'। সত্যিই তাই গুজরাতে বা ভারতের অন্য প্রদেশে পার্সিদের দেখে বোঝা যাবে না যে ওরা পার্সি। জামশেদপুরে স্টীল কারখানা পুরো পার্সিদের করা, টাটারা সবাই পার্সি, কিন্তু না বলে দিলে কেউ বুঝতেই পারবে না যে ওরা পার্সি। তাই বলছিলেন, আমরা হলাম চিনির মত আপনার হলেন দুধের মত, আমরা আপনাদের মধ্যে বিলীন হয়ে যাবে, আমাদের আলাদা কোন identity থাকবে না, কিন্তু মাঝখান থেকে আপনাদের মিষ্টত্বটা বেড়ে যাবে'। রামকৃষ্ণ মঠ মিশনের ত্রয়োদশ অধ্যক্ষ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী পার্সিদের এই গল্পটা প্রায়ই বলতেন। গোপীদের যে ভালোবাসা এও সেই পূর্ণ পাত্র দুধের মত, এতে আর কত দুধ ঢালবে! কিন্তু তা না, শ্রীকৃষ্ণ যে গোপীদের ভালোবাসা জাগিয়ে দিচ্ছেন এটা যেন ওর মধ্যে চিনি ঢেলে দেওয়া হল, ভালোবাসাটা আরও মিষ্টি হয়ে গেল। কারণ এরপরে দুধ ঢাললে তো উপচে পড়বে। এটাই বলছেন উপচে পড়বে না, আসলে একটু চিনি দিয়ে দেওয়া হয়েছে এতে গোপীদের প্রেম ও ভালোবাসায় মধুরতা আরও বেড়ে যাবে।

তীব্র ভালোবাসায় সব বিধি-নিষেধ উড়ে যায়

সব রকম মর্যাদাকে মানুষ কখন ভাঙে? যখন সত্যিকারের ভালোবাসা হয়। যেখানে ভালোবাসা নেই সেখানেই ধর্ম আর অধর্মকে জীবন চালানোর জন্য থাকতে হয়। কিন্তু যেখানে ভালোবাসা সেখানে ধর্ম আর অধর্ম থাকে না। বেদে একটা খুব সুন্দর কাহিনী আছে। অনেক কাল আগে এক ব্যক্তির ইচ্ছে হল সোমরস পান করবে। সোমরস তৈরী করতে সোম পাতা চাই, আর সোমরস হল দেবতাদের অর্ঘ্য। এক দোকানে গিয়ে জিজ্ঞেস করছে সোম পাতা আছে? দোকানদার বলছে, হ্যাঁ আছে, তুমি কত টাকা দেবে? লোকটি বলছে দশ টাকা দেব। দোকানদার বলছে – *সোমরাজা ততোহভূয়াৎ*, মানে তুমি যে দাম দেবে বলছ সোমরাজার দাম তার থেকেও বেশি। বলেই লোকটিকে ভাগিয়ে দিয়েছে। আরেকটা দোকানে গেছে সেই দোকানদারও লোকটির দাম শুনে বলছে *সোমরাজা ততোহভূয়াৎ*। এইভাবে কয়েকটা দোকান ঘোরা হয়ে গেছে, যেখানেই যাচ্ছে সেখানে যত দাম বলছে দোকানদার এই একই কথা বলে যাচ্ছে, সে যত দাম দিতে চাইছে দোকানদার বলছে সোমরাজার দাম তার থেকে বেশি। শেষ যে দোকানে গেছে সেখানেও এই একই কথা বলতেই লোকটি ঝাঁপিয়ে পড়ে বলছে – নিকুচি করেছে তোমার ততোহভূয়াৎ, আমার সোম পাতা চাইই চাই। বলেই সে যেখানে

সোম পাতা রাখা ছিল সেখানে ঝাঁপিয়ে পড়ে টেনে সোম পাতা যা পেরেছে নিয়ে এসেছে। লোকটি আস্তে আস্তে দাম বাড়িয়ে যাচ্ছে, প্রথমে দশ টাকা, তারপর কুড়ি টাকা, তিরিশ টাকা এইভাবে দাম বাড়াতে বাড়াতে যখন তার সর্বস্ব সোম পাতার জন্য দিতে প্রস্তুত হয়ে গেছে তখনও যখন বলছে সোমরাজা ততোহভূয়াৎ, বলছে নিকুচি করেছে তোমার ততোহভূয়াৎ, আমার চাইই চাই। বলেই সে ঝাঁপিয়ে পড়ে সোম পাতা নিয়ে এসেছে। এখানে প্রথমের দিকে কুড়ি টাকা, তিরিশ টাকা করে যে দাম বাড়াচ্ছিল এটা হল তার ইচ্ছা আকাঙ্খা। ততক্ষণ সে বিধি নিষেধের মধ্যে চলছিল, ঈশ্বরের জন্য এটা করছি, ঈশ্বরের জন্য এটা ছাড়লাম ইত্যাদি। কিন্তু যখন শেষ এই অবস্থায় চলে গেছে আমার চাইই চাই, তখন আর বিধি নিষেধ চলে না। তুমি আমাকে হাতকড়া পড়াবে? পড়িয়ে দাও। এইভাবে একটা অবস্থার পর ভক্ত বা সাধক বলে ঈশ্বর ছাড়া আমি থাকতেই পারবো না, তখন সে সব কিছু ছেড়ে দিয়ে, সংসার ফংসার সব ফেলে দিয়ে ঈশ্বরকেই চাই বলে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তখন আর কোন মর্যাদা, কোন বিধি নিষেধই তাকে আটকে রাখতে পারে না।

শ্রীকৃষ্ণ ঠিক এই কথাই বলছেন, আমার প্রতি তোমাদের যে ভালোবাসা, এই ভালোবাসার জন্য তোমরা সব কিছুকে লঙ্ঘন করে বেরিয়ে এসেছ। ঠাকুর অষ্টপাশের কথা বলছেন, লজ্জা, ঘৃণা, ভয়, কুল, শীল, জাতি, শোক ও জুগুপ্সা, ঈশ্বরের প্রেমে এগুলোর কোন কিছুকেই সে আর দেখে না। একটা বাচ্চা ছেলে মার কাছে যাবো বলে কেঁদেই যাচ্ছে, তখন অপরিচিত কেউ এসে যদি তাকে বলে 'চল আমি তোকে তোর মায়ের কাছে নিয়ে যাবো', তখন বাচ্চা তার লজ্জা, ঘৃণা, ভয়, লোকটি অজানা, অচেনা এসবকে কোন গ্রাহ্যই করবে না। কিন্তু এমনি সাধারণ অবস্থায় কখনই সে তার কোলে যাবে না। সাধারণ ক্ষেত্রে মায়েদের এই তীব্র ভালোবাসাটা নিজের সন্তানের প্রতি দেখা যায়। সন্তানের জন্য সেই মহিলা সব কিছু করে দিতে পারবে, সন্তানের জন্য তাকে চুরি করতে বলুন, সে চুরি করে দেবে, সন্তানের জন্য ঝিয়ের কাজ করতে হবে, করে দেবে। সন্তানের জীবন ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য যদি কেউ তার শীলহানি করতে চায় তাতেও সে রাজী হয়ে যাবে। সন্তানের জন্য আপনি যা খুশী তাকে দিয়ে করিয়ে নিতে পারবেন। এরজন্য তার কোন অপরাধ বোধ আসবে না। যেখানে বিধি নিষেধের ব্যাপার থাকে সেখানেই অপরাধ বোধ আসে। অপরাধ বোধ না আসার জন্য তাকে একটা জিনিষের প্রতি তীব্র ভালোবাসা থাকতে হবে। মানুষের যেমন টাকা-পয়সার প্রতি তীব্র আকাঙ্খা থাকে, সেইজন্য সে যে কোন উপায়ে, সৎ ভাবেই হোক বা অসৎ ভাবেই হোক টাকা রোজগারে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু এগুলো হল অত্যন্ত স্থূল অবস্থার। কিন্তু জগতের স্তর থেকে এবার সে ভাবের জগতে চলে গেছে, একজন মা যখন সন্তানকে ভালোবাসছে কিংবা একজন প্রেমিককে ভালোবাসছে, তখন সে ভাবের জগতে ঢুকে গেছে। আমরা অনেক সময় এর মধ্যে শারীরিক চাহিদা জড়িয়ে থাকার কথা ভাবি, কিন্তু তা কেন হবে! তাহলে সন্তানকেই বা কেন এত ভালোবাসবে। তখন ওই একটাই দৃষ্টি, তোমাকে যখন ভালোবেসেছি তখন আর কারুর দিকে আমি তাকাবো না। তবে জগতের ভালোবাসায় এটাই সমস্যা, ভালোবাসার পাত্রটা কদিন পর পাল্টে যায়। পরে যখন গোপীরা দ্বারকায় গিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে দেখছনে রাজবেশ আর রাজমুকুট পরিধান করে আছেন, তখন গোপীরা বলছেন 'আমরা এ কাকে দেখছি! এর মুখ দেখে কি আমরা ভ্রষ্টা হয়ে ধর্ম হারাবো'! তাঁদের কাছে সেই কৃষ্ণ, যতক্ষণ ময়ুরমুকুটবিহারী কাননকুঞ্জচারী কৃষ্ণকে না দেখছেন ততক্ষণ তাঁরা তার মুখই দেখবেন না। যখন সেই শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের সামনে আছেন তখন তাঁরা ধর্মাধর্মের পারে, আর সত্যি সত্যিই পারে।

শ্রীকৃষ্ণ তখন গোপীদের সব বৃত্তিগুলোকে সরিয়ে দিলেন, এরপর যমুনার তীরে গিয়ে শুরু হল মহারাস। সবার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ নৃত্য গীত করতে শুরু করলেন। দেবতারাও আকাশ থেকে এই দুর্লভ মহারাস দর্শন করলেন, দেবতারা দেখছেন ভগবান নিজে এই সব লীলা করছেন। আমরা রাসলীলার কথা যা বলি, সেই রাস হল এর আগের রাস। কিন্তু এবার হচ্ছে মহারাস। মহারাসের বৈশিষ্ট্য হল, শ্রীকৃষ্ণ ও গোপীদের মধ্যে আর কোন বাঁধন রইল না। শুধু তাই নয়, শ্রীকৃষ্ণ এখন কায়ব্যুহ, যত জন গোপী আছেন তত শ্রীকৃষ্ণ হয়ে গেছেন। যে কজন গোপী ছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ সবার সাথে লীলা করছেন। একজন প্রেমিক ও প্রেমিকার সঙ্গে যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হয় তার সবই বর্ণনা মহারাসে করা হয়েছে।

শ্রীকৃষ্ণের ব্যাপারে পরীক্ষিতের প্রশ্ন এবং ব্যাসদেবের উত্তর

এই মহারাসের বর্ণনা করছেন আজন্ম ব্রহ্মচারী আত্মারাম শুকদেব। কাকে বর্ণনা করছেন? রাজা পরীক্ষিৎকে, যে পরীক্ষিতের শিয়রে মৃত্যু এসে করাঘাত করছে। মহারাসের বর্ণনা পরীক্ষিৎ যেন গ্রহণ করতে পারলেন না। মহারাসের সব বিবরণ শোনার পর পরীক্ষিৎ সংশয়পূর্ণ চিত্তে শুকদেবকে প্রশ্ন করছেন ***সংস্থাপনায় ধর্মস্য প্রশমায়েতরস্য চ। অবতীর্ণো হি ভগবানংশেন জগদীশ্বরঃ।।১০/৩৩/২৭।।*** 'হে মহামুনে! শ্রীকৃষ্ণ হলেন সমস্ত জগতের স্বামী, আর তিনি তো তাঁর অংশে বলরাম সহ ধর্ম সংস্থাপনের উদ্দেশ্যে পৃথিবীর বুকে অবতরণ করেছেন'। ***স কথং ধর্মসেতূনাং বক্তা কর্তাভিরক্ষিতা। প্রতীপমাচরদ্ ব্রহ্মন্ পরদারাভিমর্শনম্।। ১০/৩৩/২৮।।*** 'কিন্তু তিনি মর্যাদাপুরুষ হয়ে অপরের স্ত্রীদের কি করে এই ভাবে স্পর্শ করলেন? তিনিই তো ধর্ম বানিয়েছেন যে, পরস্ত্রীর স্পর্শ তো দূরে থাক দৃষ্টিপাত করাও পাপ'। গোপীরা সবাই যে কুমারী ছিল তা নয়, এঁদের মধ্যে অনেকে বিবাহিতা ছিলেন। 'আপনি ঋষি এবং জন্ম থেকেই ব্রহ্মচারী, আপনি আমাকে এই ব্যাপারটা পরিষ্কার করে বলুন'। ***আপ্তকামো যদুপতিঃ কৃতবান্ বৈ জুগুপ্সিতম্। কিমভিপ্রায় এতং নঃ সংশয়ং ছিন্ধি সুব্রত।।১০/৩৩/২৯।।*** 'ভগবন্! যদুপতি আপ্তকাম, তিনি ভগবান আমি মানছি, আপনিই শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে এই কথাগুলো বলেছেন, আপনার সব কথাই মানছি। তাহলে তিনি কি অভিপ্রায়ে এই নিন্দনীয় কাজ করলেন? আপনি আমার এই সংশয় দূর করুন'।

পরীক্ষিতের প্রশ্ন শোনার পর ব্যাসদেব যে উত্তর দিচ্ছেন তার আলোচনা করার আগে এখানে সংক্ষেপে দুটো কথা বলে নেওয়ার প্রয়োজন আছে। প্রথমে আমাদের বুঝতে হবে শ্রীকৃষ্ণকে আমরা ভগবান বলে মানছি, নাকি মানুষ রূপে মানছি। যদি তাঁকে মানুষ বলে মনে করি তাহলে তিনি অতিমানব, অতিমানব হলে তিনি তো অনেক কিছুই করতে পারেন। যদি ভগবান বলে মনে করি তাহলে সব কিছু তো ওনারই সৃষ্টি। গোপীরাও তো তাহলে ভগবানরই সৃষ্টি। ভগবান আর তাঁর সৃষ্টি তো আলাদা নয়। ভগবানের সৃষ্টি কুম্ভকার আর কুম্ভের মত নয়। আমি যদি একটি কবিতা রচনা করি সেই কবিতা আর আমি আলাদা। কিন্তু ঈশ্বর আর ঈশ্বরের সৃষ্টি ঈশ্বরের থেকে কখনই আলাদা হতে পারে না। তাহলে তিনি আর গোপীরা কি আলাদা? যদি আলাদা নাই হয় তাহলে ধর্ম আর অধর্মের প্রশ্ন কোথা থেকে আসবে! আমি আমার মুখে হাত রাখবো কি রাখবো না সেটা আমার ব্যাপার, তাতে অন্যের মাথা ব্যাথার তো কিছু নেই। এগুলো এর আগে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি। ভাষ্যকাররা বলছেন, প্রেমাভক্তি বা পরাভক্তি কাকে বলে দেখাবার জন্য রাসলীলাকে নিয়ে আসা হয়েছে। দ্বিতীয় হল, ভক্তির গভীরতা নিজের স্বামীর প্রতি ভালোবাসা দিয়ে বোঝান যায় না। যতক্ষণ পরকিয়া প্রেম না হয় ততক্ষণ ভক্তির গভীরতা বা পরা ভক্তিকে বোঝান যাবে না। পরকিয়া প্রেম মানে নিজের মর্যাদার বাইরে গিয়ে যে ভালোবাসা হয়। ঠাকুরও বলছেন সব মেয়েদের কাছে নিজের স্বামী এমনি যা হোক ধরণের মনে হয় আর পরের স্বামীকে রসরাজ মনে হয়। কিন্তু এখানে একটা জিনিষ আমাদের সব সময় মনে রাখতে হবে, যাদের মধ্যে জাগতিক বুদ্ধি আছে, যারা জগৎকে জড় রূপে দেখছে, এই জিনিষগুলো তাদের শোনাও পাপ। যাদের মধ্যে ঈশ্বরের প্রতি একটু ভক্তি ভাব না জেগে থাকে, যাদের মধ্যে ঈশ্বরের চৈতন্য ভাব না জেগে থাকে তাদের জন্য রাসলীলা শোনাও পাপ।

ধর্মের দুই রকম সাধন – একটা বহিরঙ্গ সাধন, আরেকটি অন্তরঙ্গ সাধন। অন্তরঙ্গ সাধনের কথা সবার সামনে বলতে নেই। দীক্ষা দেওয়ার সময় সব গুরুই খুব কঠোর ভাবে নিষেধ করে বলে দেন ইষ্টমন্ত্র কাউকে বলবে না। ঠাকুর বলছেন আমার ইচ্ছে করে সব তোদের বলে দিই, কিন্তু কে যেন আমার মুখ চেপে ধরে। আরেক দিন বলছেন, আজ তোদের আমি সব ফাঁস করে দেব। একটু বলতে বলতেই তিনি সমাধিতে চলে গেলেন, আর বলা হলো না, কে যেন তাঁর মুখ চেপে দিচ্ছেন। আমরা হলাম অতি সাধারণ লোক, এসব কথা আমাদের বোঝা তো অনেক দূরের কথা, শোনারও পাত্রতা নেই।

শুকদেব এইবার পরীক্ষিৎএর এই প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন। ভাগবতের এই অংশটাকে মন দিয়ে অনুধাবন করলে রাসলীলার তাৎপর্যটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। শুকদেব বলছেন ***ধর্মব্যতিক্রমো দৃষ্ট ঈশ্বরাণাং সাহসম্।***

তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্বভূজো যথা।।১০/৩৩/৩০।। ‘যাঁরা খুব তেজস্বী হন যেমন সূর্য, অগ্নি, যাঁদের মধ্যে ঈশ্বরীয় সামর্থ আছে, কখন কখন দেখা যায় এনারা প্রকৃতির নিয়মকে উল্লঙ্ঘন করে যান। কিন্তু তাতে তাঁদের কোন দোষ দেখা যায় না। যাঁদের মধ্যে ঐশ্বরীয় শক্তি আছে তাঁরা অনেক সময় তাঁর যে ধর্ম সেটাকে উল্লঙ্ঘন করে বসেন। এতে তাঁদের কোন দোষ হয় না। বলা হয় যে, সামর্থবান পুরুষের কোন দোষ হয় না’। স্বামীজী লিখছেন *কৃত্যং করোতি কলুষম্*, ঈশ্বরীয় শক্তি যখন ভেতরে চলে আস তখন যেটা কলুষ সেটাও কৃতকৃত্য হয়ে যায়। সূর্য ও অগ্নির মত ঈশ্বরীয় শক্তিতে সামর্থবান পুরুষদের কখন কখন ধর্মের উল্লঙ্ঘন এবং অনুচিত হঠকারিতা করতে দেখা যায়। যেমন অগ্নি অনেক সময় দুঃসাহসের কাজ করছে, অগ্নির সেবা করা হচ্ছে তাও দাবানল লাগিয়ে দিচ্ছে, বাড়ি ঘর পুড়িয়ে দিচ্ছে। এর জন্য অগ্নিকে কেউ দোষ দেয় না। অগ্নি সব কিছুকে গ্রাস করে নেয়, অগ্নির এই কাজ অগ্নির জন্য ভালো, এতে মন্দ বলে কিছু নেই। ঠাকুর এই কথা একমাত্র স্বামীজীকে উদ্দেশ্য করে বলছেন ‘নরেন হল দাবানল, ওর মধ্যে কলাগাছ ফেলে দিলে সেই কলাগাছও দাউ দাউ করে পুড়ে ভস্ম হয়ে যাবে’। কিন্তু আমরা আমাদের উপযোগী খাদ্যের বাইরে অন্য ধরণের খাদ্য খেলে উল্টে পড়বো। এখানে *তেজীয়সাং* বলতে রাবণ, হিটলার এদের বোঝাচ্ছেন না। এরা নিজের এলাকার মধ্যে সামর্থবান। যেমন রাবণ বিরাট ক্ষমতাবান পুরুষ। রাবণ বলছে, আমার রাজ্যে কোন মেয়েকে যদি পছন্দ হয়ে যায় আমি তাকে আমার রানী করে রাখবো, সীতা আমার রাজ্যে এসেছে, তাকে আমার পছন্দ হয়েছে, তাই আমি তুলে নিয়ে এসেছি, এতে আমার দোষ কোথায়! সত্যিই রাবণের দোষ ছিল কিনা বিচার করলে বলা খুব কঠিন হয়ে যাবে। যদি কেউ মনে করে আমি তেজস্বী তাহলে ওর এলাকায় সে যেটা করবে সেটাতে তার দোষ হয় না।

এই কথা বলেই শুকদেব বলছেন ***নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ। বিনাশাত্যাচরন্ মৌঢ্যাদ্যথারুদ্রোঽব্ধিজং বিষম্।।১০/৩৩/৩১।।*** কিন্তু যাদের সামর্থ নেই তাদের সামর্থবান পুরুষের কর্ম করা তো উচিতও নয় এমন কি চিন্তা করাও উচিত নয়। ঈশ্বরীয় শক্তিতে হনুমান এক লাফে সমুদ্র লঙ্ঘন করে এক দুঃসাহসের কাজ করে দিলেন। অসামর্থবানদের এই জিনিষ নকল করতে নেই, নকল করার চিন্তাও করতে নেই। শ্রীরামচন্দ্রও হনুমানকে আলিঙ্গন করে বলছেন ‘তোমার মতো এই কাজ কেউ করতে পারে না’। এখানে বলছেন এই রকম কাজ করা তো দূরের কথা চিন্তাও করবে না। বাল্মীকি রামায়ণেই আছে সবাই যখন সমুদ্র অতিক্রম করে লঙ্কায় পৌঁছেছে তখন রাবণকে দেখতে পেয়ে অঙ্গদ রাবণকে মারার লোভ সামলাতে না পেরে এক ঝাঁপ দিয়ে রাবণের কাছে পৌঁছে গিয়েছিল। রাবণকে মারতে পারেনি কিন্তু অনেক ঝগড়া বাক্ বিতণ্ডা করার পর অঙ্গদ আবার ফিরে এসেছে। তখন শ্রীরামচন্দ্র অঙ্গদকে খুব তিরস্কার করেছিলেন – ‘তুমি এটা কি করলে! অরক্ষিত অবস্থায় তুমি এভাবে রাবণের মুখোমুখি হয়ে হঠকারিতার কাজ করেছে। তোমার কখনই এই ধরণের কাজ করা উচিত হয়নি। আজ তুমি যদি রাবণের হাতে মারা যেতে আমাদের কলঙ্ক হয়ে যেত। আর কী মুখ নিয়ে আমরা তোমার মা তারার সামনে গিয়ে দাঁড়াতাম’! হনুমান এক লাফ দিয়ে সমুদ্র লঙ্ঘন করে সীতার খোঁজ নিয়ে ফিরে আসার পর শ্রীরামচন্দ্র হনুমানকে বুকে জড়িয়ে নিচ্ছেন। অঙ্গদ হনুমানের থেকে অনেক কম দুঃসাহসের কাজ করেছে, এক ঝাঁপ মেরে রাবণের প্রাসাদে উঠে গেছে রাবণকে মারবে বলে। কিন্তু কোন রকমে ছাড়াছাড়ি হয়ে অঙ্গদ ফিরে এসেছে। শ্রীরামচন্দ্র অঙ্গদকে খুব তিরস্কার করছেন। কারণ হনুমান হলেন ঈশ্বরীয় শক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব, অঙ্গদ কিন্তু তা নয়। ঈশ্বরীয় শক্তিসম্পন্ন না হলে মর্যাদাকে কখনই লঙ্ঘন করতে নেই। রোজ খবরের কাগজে কত রকমের স্ক্যাম বেরোচ্ছে আর যারা এর সঙ্গে জড়িত তারা দিব্যি তাদের পদমর্যাদা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু আমি আপনি একটা চুরি করি, পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে জেলে ঢুকিয়ে দেবে। তারা সামর্থবান পুরুষ তাদের কিছু হবে না, হবে আমাদের কারণ আমরা সামর্থবান নই। এটা ঠিকই তারা যে আচরণ করে সেটা সব সময় ধর্ম পথ অনুযায়ী নাও হতে পারে, তাদের অধর্মীয় আচরণ যে সবাই অনুসরণ করে তাও নয়। কিন্তু দেখা যায়, যেমন আমেরিকা একটা অন্য সার্বভৌম রাষ্ট্রের অজান্তে তাদেরই দেশে একটা স্পেশাল টাস্কফোর্স পাঠিয়ে বিন লাদেনকে শেষ করে দিল। এটা অত্যন্ত দুঃসাহসের কাজ। এই কাজ যদি ভারত করতে যেত তাহলে নিউক্লিয়ার বিশ্বযুদ্ধ লেগে যেত। পাকিস্থান বলে দিয়েছে ভারত যেন এই

ধরণের দুঃসাহস কাজের কল্পনাও না করে। কিন্তু আমেরিকাকে কিছুই করতে পারল না। সামর্থবান পুরুষরা অনেক কিছু করতে পারেন কিন্তু তাতে তাঁদের দোষ কিছু হয় না। যারা সামর্থহীন পুরুষ তাদের করা তো দূরের কথা মনে মনে চিন্তাও করতে নেই। সেইজন্য শুকদেব পরীক্ষিৎকে বলছেন শ্রীকৃষ্ণ যেটা করেছেন সেই কাজ আমার তোমার কল্পনাও করতে নেই। শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ ভগবান, সামর্থবান পুরুষ।

শুকদেব উপমা দিচ্ছেন সমুদ্র মন্থন করতেই এমন হলাহল বেরিয়ে এল যাতে সমস্ত জগৎ পুড়ে ছাই হয়ে পুরো ধ্বংস হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। কে এই বিষকে ধারণ করবে? তখন ভগবান শিব সেই হলাহলকে কণ্ঠে ধারণ করে জগতকে রক্ষা করলেন। কিন্তু কোন মুর্খ যদি বলে শিব আমার গুরু আমিও একটু পান করে দেখি তাহলে সে তৎক্ষণাৎ ভস্মীভূত হয়ে যাবে। পরীক্ষিৎকে বলছেন 'হে পরীক্ষিৎ! তুমি এটা মাথায় রেখো ভগবান হলেন সত্য সঙ্কল্প, উনি যেটাই সঙ্কল্প করেন সেটাই চিন্ময়ী লীলা হয়ে যায়। এই দিব্য রাসলীলার মধ্যে কোন কাম ভাব ছিল না, এই ব্যাপারে তুমি কখনই অন্য রকম চিন্তা ভাবনা করতে যেও না'।

এখানে পরীক্ষিতের প্রশ্ন ছিল 'শ্রীকৃষ্ণ তিনি ধর্মের পূর্ণ অবতার। তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য হল ধর্মের সংস্থাপন করা। কিন্তু তিনি এই অধর্ম কাজ কি করে করতে পারলেন, সেখানে যে কুমারী মেয়েরাই ছিল তা নয়, অনেক বিবাহিতা রমণীরাও সেখানে ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ভগবান, তাঁর কাম ভাব না থাকতে পারে কিন্তু ধর্ম তো উল্লঙ্ঘন হয়েছে'। রাসলীলার ব্যাপারে এই প্রশ্নটা প্রায়শই জাগতিক মনোভাবাপন্ন লোকেরা করে বসে। এই প্রশ্নের উত্তরে শুকদেব যা বলেছেন সেটা আমরা এর আগে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করেছি। যাঁরা ঈশ্বরীয় শক্তিতে শক্তিমান হয়েছেন তাঁদের কখন কখন দেখা যায় তাঁরা নিজেদের মর্যাদাকে উল্লঙ্ঘন করে থাকেন। এর উদাহরণ হল হনুমান, সূর্য, অগ্নি ইত্যাদি এনারা মাঝে মাঝে কিছু দুঃসাহসের কাজ করে বসেন যেটা সাধারণ লোকেদের পক্ষে করা তো দূরের কথা চিন্তা করাও উচিত নয়।

শুকদেব বলছেন ***ঈশ্বরাণাং বচঃ সত্যং তথৈবাচরিতং ক্বচিৎ। তেষাং যৎ স্ববচোযুক্তং বুদ্ধিমাংস্তৎ সমাচরেৎ।।১০/৩৩/৩২।।*** এই ধরণের সামর্থবান পুরুষের বচন সত্য বলে জানতে হবে, তাঁরা যে কথাগুলো বলেন সেটাই ঠিক ঠিক উপদেশ এবং এই উপদেশই জীবনে অনুসরণ করে চলতে হয়। তিনি যে রকম আচরণ করেছেন *তথৈবাচরিতং ক্বচিৎ* কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁদের এই আচরণেরও অনুকরণ করা যেতে পারে। কিন্তু সব ক্ষেত্রে করতে নেই। যারা বুদ্ধিমান পুরুষ তাদের পক্ষে উচিৎ কাজ হল ঈশ্বরীয় ব্যক্তির যে যে আচরণগুলি লোকশিক্ষার্থে প্রদত্ত উপদেশের অনুরূপ শুধু সেগুলোকেই অনুকরণ করা। তার বাইরে অন্য আচরণ অনুকরণ করা কখনই উচিৎ নয়। যেমন শিব হলাহল পান করেছিলেন। একদিকে উপদেশ দেওয়া হচ্ছে অপরের দুঃখ-কষ্ট দূর করতে সচেষ্ট হবে। এটা গেল প্রথম দিক। দ্বিতীয় হল তুমি বেঁচে থাকলেই ধর্ম সাধন হবে, মরে গেলে আর ধর্ম সাধন হবে না। আর তৃতীয় হল দুঃসাহস করবে না। এই উপদেশ শোনার পর আমি দেখলাম আমার ইষ্ট ভগবান শিব হলাহল পান করে বিষের জ্বালায় জর্জরিত জগতকে রক্ষা করলেন, আর আমি এও দেখছি যে আমার সামনের লোকগুলো এত দুঃখ-কষ্ট পাচ্ছে, আমারও ইচ্ছে এই দুঃখ-কষ্টকে দূর করি কিন্তু আমার সাধ্যের বাইরে। দূর করতে গিয়ে হয়তো আমার জীবনহানি হয়ে গেল। এই ধরণের কাজ করতে নিষেধ করা হচ্ছে। বলছেন, ঈশ্বরীয় ব্যক্তিকে বিভিন্ন কারণে অনেক কিছুই করতে হয়। কিন্তু সেটাকে কখন আচরণ করতে নেই। তাহলে কি আচরণ করতে হবে? ওনার যে আচরণ গুলো তাঁর উপদেশের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ও সামঞ্জস্য আছে শুধু মাত্র সেটাই অনুকরণ করতে হবে, তার বাইরে কিছু করতে নেই। এই শ্লোকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের সব্বাইকে উপদেশ দেওয়া হয় বড়রা বা গুরু যে রকম আচরণ করবেন সেই রকম করবে, এই উপদেশ নিয়ে অনেক বিতর্ক আছে। এই ব্যাপারে বিভিন্ন জন বিভিন্ন মত দেন। অন্যান্যদের যে মতই হোক না কেন ভাগবত এই ব্যাপারে তার খুব বলিষ্ট সিদ্ধান্ত জানিয়ে বলে দিচ্ছে। অধিকারী পুরুষ যাঁরা তাঁরা যা উপদেশ দিয়েছেন শুধু সেটাই অনুসরণ করবে। আর তাঁরা জীবনে যা কিছু করেছেন তার মধ্যে সেগুলোই অনুকরণ করবে যেগুলো তাঁর উপদেশের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

এখানে এই কথাই বলে দেওয়া হচ্ছে *বুদ্ধিমাংস্তৎ সমাচরেৎ*, বুদ্ধিমান পুরুষদের পক্ষে এটাই করা উচিৎ। কারণ মুর্খরা তো কখন উপদেশ শুনবেই না, ঠাকুর যে কথাগুলো বলেছেন সেগুলো পালন করবে না কিন্তু তিনি যেগুলো করেছেন সেগুলো মুর্খরা নকল করতে যাবে। শাস্ত্র এখানে পরিষ্কার ভাবে নিষেধ করছে, ওরকমটি করো না। স্বামীজী এক জায়গায় বলছেন, 'আমি যা বলছি কর, আমি যা করছি সেটা করতে যাবে না' এই উপদেশ দেওয়ার দিন চলে গেছে। আসলে স্বামীজী যারা খুব সাধারণ গুরু তাদের উদ্দেশ্যে এই কথা বলছেন, তুমি নিজে গুরু হয়ে চারিদিকে গোলমাল করে বেড়াবে আর শিষ্যদের বলবে তোমরা এই কাজ করতে যাবে না, এইভাবে কখন ধর্মাচরণ হয় না। ঠাকুরও বলছেন তুমি যদি ঘরে গুড়ের নাগড়ি রাখ তাহলে অপরকে কক্ষণ তুমি বলতে পারবে না যে তুমি গুড় খেও না। এখানে যেটা বলছেন এখানে কিন্তু সাধারণ গুরুর কথা বলা হচ্ছে না। ঠাকুর তো সাধনার সময় নিজের বিষ্ঠা জিভে ঠেকিয়েছিলেন, আমরা কি কেউ পারবো এই জিনিষ করতে? অথচ অন্য সময় বলছি ঠাকুর তো এই করেছিলেন, সেই করেছিলেন তাহলে আমাদের করলে দোষ কোথায়। কিন্তু আমরা কি নিজেদের বিষ্ঠা মুখে দিতে পারবো? আমরাও ভাবছি শ্রীকৃষ্ণ তো রাসলীলা করেছিলেন, আমরা করলে আপত্তি কেন হবে! ঠিকই তো, ঠাকুরও তো মধুর ভাবে সাধন করেছিলেন। কিন্তু ঠাকুর তো অদ্বৈত ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য পঞ্চবটীর ধারে অপরের মল জিভ দিয়ে আস্বাদ করেছেন। যখন নিজের মল আস্বাদ করছিলেন তখন ঠাকুরকে বলা হল 'ওটা তো তোমার নিজের, অপরেরটা আস্বাদ কর তবে তো অদ্বৈত ভাব আসবে'। আমরা তা কোন দিন পারবো না। স্বামীজী সাধুদের খুব কড়া করে বলে দিয়েছেন মেয়েদের থেকে দূরে থাকবে। কিন্তু তিনি যখন বিদেশে গেছেন সেখানে অনেক ভক্ত মহিলা বা তাঁর শিষ্যারা, অনুরাগীণিরা তাঁর পাশে পাশে ঘুরতেন। স্বামীজীর এই আচরণ সন্ন্যাসীদের কখনই নকল করা উচিৎ নয়। এনারা হলেন *তেজয়ীসাং*, তেজস্বী পুরুষ, ভেতরে প্রচণ্ড শক্তি। মহাপুরুষদের যে আচরণগুলো তাঁর উপদেশের সঙ্গে খাপ খাচ্ছে না সেগুলো কখন অনুকরণ করবে না। কেন করবে না? একটা বিশেষ পরিস্থিতিতে তিনি একটা কিছু করেছেন, আর তিনি হলেন সামর্থবান পুরুষ। ঈশ্বরীয় শক্তিতে যাঁরা সামর্থবান তাঁরা কিছু বিশেষ পরিস্থিতিতে এমন কিছু করেন যেটা দুঃসাহস মনে হবে। স্বামীজী একবার অমরনাথ দর্শনে গিয়েছিলেন। সঙ্গে নিবেদিতাও ছিলেন। স্বামীজীর তাঁবুর পাশেই নিবেদিতার তাঁবুও লাগান হয়েছিল। তখন অন্য সম্প্রদায়ের একজন সাধু স্বামীজীকে বলছেন 'স্বামীজী! আমি জানি আপনি জিতেন্দ্রিয় পরমহংস। কিন্তু এভাবে একটি মেয়ের তাঁবু যদি আপনার তাঁবুর পাশে থাকে তাতে অন্য সাধুরা যাঁরা অমরনাথ দর্শনে যাচ্ছেন, আপনার অবস্থা না বুঝে তাঁরাও আপনাকে নকল করতে শুরু করবে। এতে ধর্মের হানি হবে'। স্বামীজী কিন্তু শোনার পর সঙ্গে সঙ্গে তাঁবু সরিয়ে নিলেন। অন্য দিকে স্বামীজীর মধ্যে কখনই নারী পুরুষের ভেদ ছিল না।

লাটু মহারাজ স্বামীজীর সঙ্গে কাশ্মীরে ডাল লেকে বোটে আছেন। রাত্রিবেলা খাওয়া-দাওয়ার পর বোটের মুসলমান মালিকের তেরো চোদ্দ বছরের মেয়ের হাত দিয়ে মহারাজদের জন্য পান পাঠান হয়েছে। রাত্রিবেলা লাটু মহারাজের কাছে একটা মেয়ে পান নিয়ে তাঁর কাছে এসেছে, ওই দেখেই লাটু মহারাজ রাতের ডাল লেকের ঠাণ্ডা জলে ঝাঁপ দিয়েছেন। সে এক যাচ্ছেতাই অবস্থা। মাঝিরা কোন রকমে তাঁকে জল থেকে তুলে নিয়ে এসেছেন। অথচ স্বামীজী দিনরাতই ওদের সাথে কাটাচ্ছেন। কিন্তু লাটু মহারাজ নিজের ব্যাপারে খুব পরিষ্কার এবং সতর্ক, আমার এই শক্তি নেই। স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ একবার স্বামীজীকে জিজ্ঞেস করছেন 'ঠাকুর কামিনী-কাঞ্চন থেকে দূরে থাকতে বলেছেন কিন্তু আপনি এইভাবে মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা করেন কেন?' ঠাকুর স্বামী বিজ্ঞানানন্দকে খুব নির্দিষ্ট করে বলে দিয়েছিলেন মেয়েদের একেবারে কাছে আসতে দিবি না। স্বামীজী হেসে বললেন 'ঠাকুর তোকে ওই রকম বলেছেন আমাকে অন্য রকম বলেছেন'। স্বামীজী পরমহংস অবস্থায় ছিলেন, ওই অবস্থায় তাঁর নারী-পুরুষের কোন ভেদই ছিল না। তাই তিনি কাজকর্মের স্বার্থে এই ধরণের কিছু আচরণ করতে পারেন, যেগুলো আপাতদৃষ্টিতে একজন সন্ন্যাসীর পক্ষে দুঃসাহসের কর্ম বলে মনে হবে। কিন্তু অন্য সন্ন্যাসীদের পক্ষে এগুলো নকল করতে যাওয়া একেবারেই উচিৎ কাজ হবে না।

ইসলামে প্রথম অবস্থাতেই এই সমস্যা হয়েছিল আর এখনও এই সমস্যা চলছে। পয়গম্বর মহম্মদের কাছে যে আদেশগুলো এসেছিল, সেই উপদেশগুলো ছিল মক্কা মদিনার মাঝে ছোট্ট মরুভূমি অধ্যুষিত এলাকার

আদিবাসীদের জন্য। এরা বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল, এবার ইসলামের নামে সবাই একত্রিত হয়ে গেল। একতাবদ্ধ হয়ে এখন তারা একটার পর একটা জাতি, সম্প্রদায় দেশ জয় করতে শুরু করল। বিভিন্ন দেশ জয় করে যখন তারা এগিয়ে গেল তখন দেখল কোরানে যা যা উপদেশ দেওয়া আছে সেগুলো যদি সব পালন করা হয় তাহলে সর্বনাশ হয়ে যাবে কারণ এই দিয়ে প্রশাসন চালানো যাবে না। একটা গোষ্টির বিশেষ সংস্কৃতি সারা দেশের সবার জন্য প্রযোজ্য হতে পারে না। হিন্দুরা গোমাংস খায় না। এখন হিন্দুরা যদি কোন মুসলিম দেশে রাজত্ব করতে গিয়ে ফতোয়া জারি করে বলে দেয় – এখন থেকে গোমাংস খাওয়া নিষিদ্ধ। এই ধরণের নিষেধাজ্ঞা সেখানে দেওয়া চলবে না। এর থেকে অনেক কিছু প্রতিকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে। এরাও দেখল কোরানের সব কথা সব জায়গায় চালানো যাচ্ছে না। তখন নতুন করে কিছু করতে হবে। কিন্তু কোরানের পরে নতুন আইন করবে কি করে? সেটা তো কখন করা যাবে না। ইসলামের পণ্ডিতরা তখনও রয়েছেন। ইসলাম ধর্ম তখন সবে পত্তন হয়েছে, সবে পঞ্চাশ ষাট বছর অতিক্রম করেছে। তখন এরা সংগ্রহ করতে লাগলেন, কোরানের বাইরে পয়গম্বর বিভিন্ন পরিস্থিতিতে কি কি করেছেন এবং কি কি বলেছেন। এগুলোকে তারা পরম্পরা মারফৎ বিভিন্ন সূত্র ধরে বার করতে থাকলেন। যেমন একটা সূত্র মারফৎ জানতে পারলেন পয়গম্বর একবার সফরে যাচ্ছিলেন, যেতে যেতে তার জল পিপাসা পেয়েছে। তখন ওই রকম পরিস্থিতিতে মহম্মদ কীভাবে জল পান করেছিলেন? তিনি এই ভাবে জল পান করেছিলেন। কিন্তু এগুলো কে দেখেছে বা কে জানে? তখন বলা হল ওনার সঙ্গে যিনি ছিলেন তিনিই জানেন। তিনি এনাকে বলেছিলেন। মোটামুটি দেখা যাচ্ছে তিনটে ধাপ থেকে এগুলোকে সংগ্রহিত করা হয়েছিল। মহম্মদের কাজ সেটাকে একজন দেখেছেন, তিনি বলেছেন আরেকজনকে, সে আবার বলেছে তাদেরকে যারা সংগ্রহ করে লিখছে। এর মধ্যে এমন কেউ যদি থেকে থাকে যার কথা বিশ্বাস যোগ্য নয়, সেই কথাগুলোকে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই ভাবে অনেক কিছু সংগ্রহ করে তৈরী হল হাদিস। ইসলাম আইন হাদিসের উপরেই আধার করে চলে। হাদিসকে সরিয়ে দিলে ইসলামিক আইন চলা খুব মুশকিল হয়ে যাবে। কোরানে যদি কোন সমস্যার সমাধান না পাওয়া যায় তখন এরা হাদিসে দেখবে সেখানে এই ব্যাপারে কিছু বলা আছে কিনা। পরের দিকে নিজের নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য এরা নতুন নতুন হাদিস দিতে শুরু করল। তখন আবার একটা সীমারেখা বেঁধে দেওয়া হল, এই সীমার বাইরে যাওয়া যাবে না।

বর্তমানে দিনকাল সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে, সময় ও যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে নতুন নতুন সমস্যা এসেছে। যেমন সিনেমায় নায়ক নায়িকাকে বিয়ের অভিনয় করতে হয়েছে, এখন এই বিয়েকে সত্যিই বিয়ে বলে গণ্য করা হবে, নাকি নতুন করে বিয়ে করতে হবে? এই সমস্যা আগে ছিল না, আর এর সমাধান হাদিসেও পাওয়া যাবে না। আরবে যখন পয়গম্বর এসেছিলেন তখন তো সিনেমাই ছিল না। এখন মৌলবীরা কোরান হাদিস ঘেঁটে খুঁজে খুঁজে নিজের বুদ্ধির মত সমাধান দিচ্ছেন। সেই সমাধানে আবার অনেক মৌলবীরা আপত্তি করছেন। এইভাবে ইসলামে তিন ধরণের কথা পাওয়া যায়। প্রথম আল্লার নিজের কথা, দ্বিতীয় মহম্মদ যা যা করেছিলেন এবং তৃতীয় মহম্মদ যে কথাগুলো বলেছিলেন সেগুলো কেউ শুনেছে, সেটাকেই তিনি পরে গিয়ে বলছেন মহম্মদ আমাকে বলেছিলেন অমুক পরিস্থিতিতে অমুক জিনিষ করা যেতে পারে।

কোরানে বলা আছে চারটে বিয়ে করতে পারবে। কেন বলেছিলেন? আগে আরব দেশে বিয়ে বলে কোন জিনিষই ছিল না। বিবাহ ব্যাপারটাকে মহম্মদই একটা সামাজিক নিয়মে বেঁধে দিলেন। বেঁধে দিয়ে বলে দেওয়া হল, চারজনকে বিয়ে তখনই করবে যখন চারজনকেই সমান ভালোবাসতে পারবে। কিন্তু অন্য দিকে মহম্মদের চারের অধিক বিয়ে ছিল। এখন যদি বলা হয়, কোরানে চারটে বিয়ের কথা বলা হয়েছে কিন্তু মহম্মদের তেরোটা বিয়ে। না, এখানে সেই আপত্তি করা যাবে না। ওনার সেই অধিকার ছিল, এখানে শুকদেব ভাগবতে এই কথাই বলছেন। মহম্মদ ঈশ্বরীয় শক্তিতে সম্পন্ন সামর্থবান পুরুষ। তাছাড়া কোন একটা পরিস্থিতিকে মোকাবিলা করার জন্য মহম্মদকে এই কাজটা করতে হয়েছিল। কিন্তু অন্যরা তা করতে পারবে না। অন্যরা তাহলে কি করবে? যেটা তাদের আদেশ দেওয়া হয়েছে। যারা মহৎ পুরুষ যারা সামর্থবান পুরুষ তাদের কোন দোষ হয় না। মহাভারতেও বলা হয়েছে গুরুজন যেটা করতে বলেন সেটা করতে হয়, গুরুজনরা

যেটা করেন সেটা করতে নেই। আবার অনেকের মনে হতে পারে তিনি যেটা করেছেন আমিও সেটাই করব। এগুলো খুব পুরনো বিতর্কতিত বিষয়। যেমন মহাভারতেই বলা হয়েছে মহাপুরুষরা যে পথে গেছেন সেটাই পথ, *মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ*। গীতাতেও ভগবান বলছেন *যদ্ যদাচারতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ*। শ্রেষ্ঠ পুরুষ যেমন যেমন আচরণ করেন বাকিরা তাঁদের দেখাদেখি সেই রকমই আচরণ করে। সেইজন্য এখানে শুকদেব পরীক্ষিৎকে আগে 'বুদ্ধিমান' এই শব্দটা ব্যবহার করেছেন। আগে দেখ তোমার বুদ্ধি আছে কি নেই। বুদ্ধি থাকলে তখন সেই আচরণ গুলোই করবে যেটা তাঁর উপদেশের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ আর বাকি যা কিছু তিনি যেভাবে করতে নির্দেশ দিয়েছেন সেইভাবেই করবে। যারা মূর্খ তারা নিজের মতই আচরণ করবে। যারাই বুদ্ধিমান তারা আচার্যরা যেটা করেছেন সেটা কখনই করতে যাবে না।

সেইজন্যই শুকদেব বলছেন এই রাসলীলাকে যদি কেউ নকল করতে যায় তাহলে তার সর্বনাশ হয়ে যাবে। রাসলীলাকে অনুকরণ করতে গিয়ে অনেকেরই পতন হয়ে গেছে। কারণ শ্রীকৃষ্ণের যে উপদেশগুলো আছে সেই উপদেশের সাথে এই রাসলীলা সঙ্গতিপূর্ণ নয়। এই রাসলীলা কেন করেছিলেন সেটা তিনিই জানেন, আর এটা তাঁর ব্যাপার। কারণ সামর্থবান পুরুষের কোন দোষ হয় না। কিন্তু কোন সাধক যদি রাসলীলার অনুধ্যান করেন তাহলে তাঁর কাম ভাব চিরদিনের মত চলে যাবে। জয়দেব যখন গীত গোবিন্দ রচনা করছিলেন, গীত গোবিন্দ আসলে রাসলীলারই বিস্তার, তখন জয়দেব আর তাঁর স্ত্রী পদ্মাবতী রাত্রিবেলা সব দরজা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর সারা রাত ধরে নৃত্য করতেন আর গীত গোবিন্দের গান করতেন। গীত গোবিন্দের মধ্যে যে বর্ণনা করা হয়েছে, যদিও তার মধ্যে দশাবতার চরিতের মত অনেক কিছু রয়েছে, কিন্তু এর পরে পরে যা বর্ণনা আছে পড়লে গা শিউড়ে উঠবে। অথচ এনারা দুজনই খুব উচ্চমানের সাধক ছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ ও রাধার ভাবে তাঁরা এমন বিভোর হয়ে যেতেন যে ওনারা ওই কাম ভাবের পারে চলে গিয়েছিলেন। এখানে সাধারণ লোকের কথা বলা হচ্ছে না, কোন সাধক যদি রাসলীলার অনুধ্যান করেন তাহলে তিনি কাম ভাবের পারে চলে যাবেন। ঠাকুর যে মধুর ভাবে সাধনা করেছিলেন তিনি সেখানে কাম ভাবকে জয় করার জন্য করেননি, তিনি ভক্তিমার্গের পথগুলো দেখাবার জন্য সাধনা করেছিলেন।

শুকদেব আবার বলছেন ***কুশলাচরিতেনৈষামিহ স্বার্থো ন বিদ্যত। বিপর্যয়েণ বানর্থো নিরহংকারিণাং প্রভো।।১০/৩৩/৩৩।।*** এই যে যাঁরা সামর্থবান পুরুষ এনারা সবাই অহঙ্কারশূন্য পুরুষ। শুভকর্ম আচরণের দ্বারা তাঁদের নিজস্ব কোন সাংসারিক স্বার্থ সাধিত হয় না, অশুভকর্মের দ্বারাও কোন অনর্থ হয় না। সেইজন্য দেখা যায় শুভকর্মে তাঁদের কোন সাংসারিক স্বার্থ থাকে না আর অশুভ কর্ম করার সময় অনর্থের কোন ভয় থাকে না। মহাপুরুষরা সব সময় স্বার্থের ঊর্ধ্বে আর অনর্থের পারে থাকেন। কোন কর্মের পেছনেই তাঁদের কোন কামনা-বাসনা থাকে না। ফলে তিনি অনেক কিছুই করতে পারেন। কোন শুভ কর্ম করার সময় তাঁর মনে এই ধরণের কোন সঙ্কল্প থাকে না যে এই কর্মের ফল তিনি পাবেন। ঠিক তেমনি যখন কোন অশুভ কর্ম করেন তখন তাঁর মনে এই ভয় থাকে না যে এই কর্মের জন্য আমার অনেক অনর্থ হবে। শ্রীরামচন্দ্রের বালিবধকে অনেকে একটা অশুভ কর্ম, অনর্থক কর্ম বলে মনে করতে পারে। তিনি আড়াল থেকে লুকিয়ে বালিকে বধ করেছেন, বালি আবার শ্রীরামচন্দ্রের শত্রুও নয়। এই ধরণের কাজ আমরা করতে পারি না। কিন্তু শ্রীরামচন্দ্র যখন বালিকে বধ করেছেন তাতে তাঁর কোন অশুভ কর্ম হয়নি। কারণ, এই কর্মের মধ্যে শ্রীরামচন্দ্রের কোন অহঙ্কার জড়িয়ে নেই। এই ব্যাপারে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাকে মনে করা যেতে পারে, রানী রাসমণির গায়ে ঠাকুরের চাপড় মারা। এই কাজে ঠাকুরের কোন অহঙ্কার জড়িয়ে ছিল না। এখানেও নিজের কোন স্বার্থ নেই আর তাতে কোন অনর্থের ভয়ও নেই। ঈশ্বরের কাছে এসে মনটা বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে, এতে রানীর অমঙ্গল হচ্ছে, তাই ঠাকুর একটা চড় মেরে রানীকে সজাগ করে দিলেন। কিন্তু নিজের মালিককে চড় মারা অতি দুঃসাহসের কাজ। যদি কেউ মনে করে, নিজের বসের সাথে কীভাবে আচরণ করতে হয় ঠাকুর পথ দেখিয়ে গেলেন, ঠাকুর পথ দেখিয়ে গেছেন নিজের মালিককে চড় মেরে কি করে সিধে করতে হয়। ঠাকুর একটা বিপ্লব করে গেলেন, ঠাকুরই প্রথম বিপ্লবী। তারপর গীতার *যদ্ যদাচারতি শ্রেষ্ঠঃ* এই ভাব নিয়ে যদি কেউ মালিক বা বস্‌কে চড় মেরে ঠাকুরের মত শিক্ষা দিতে যায় তখন তার সর্বনাশ হতে কিছু বাকি

থাকবে না। পাপ-পূণ্যের বোধ তখনই আসে যখন আমার কর্মের সাথে আমি নিজেকে জুড়ে দেব। এই গুরুত্বপূর্ণ কথাটা বুঝে নিতে পারলে শাস্ত্রের অনেক কথা আমাদের কাছে খুব সহজ হয়ে যাবে।

শুভকর্মও যখন তিনি করেন তখনও তিনি কোন ফলের আশা করেন না আর অহঙ্কারশূন্য হয়েই সেই কাজ করেন। শ্রীমা বাগবাজারে থাকাকালীন প্রায়শই গঙ্গায় স্নান করতে যেতেন। গঙ্গার ঘাটের কাছে এক কাঙালী ব্রাহ্মণকে শ্রীমা ফল দিয়েছেন। ফল দিয়ে তিনি ব্রাহ্মণকে বলছেন 'এই ফল তোমার আর এর ফলও তোমার'। শ্রীমার এই কথার তাৎপর্য হল, এই ফল তো তোমাকে দেওয়া হল আর এই দানের যা ফল সেটাও তোমারই। এটাই নিরহঙ্কার। অহঙ্কারই আমাকে অন্য কিছুর সঙ্গে জুড়ে দেয়। রেলের বগিগুলো যেমন একটার সাথে আরেকটা কাপ্লিং দিয়ে জুড়ে থাকে। মন ও বুদ্ধির সাথে কার্য আর তার ফলের সঙ্গে জুড়ে দেওয়ার কাপ্লিংএর কাজটা করে অহঙ্কার। মহাপুরুষদের এই অহঙ্কারটা অর্থাৎ কাপ্লিংটা খুলে গেছে। দুটো নৌকা পাশাপাশি দড়ি বা শেকল দিয়ে বাঁধা আছে, দুটোই চলছে। এখন বাঁধনটা খুলে দেওয়া হয়েছে। নৌক দুটো এখনও পাশাপাশি যাচ্ছে কিন্তু বাঁধনটা খুলে গিয়ে আলাদা হয়ে গেছে, দুটো নৌকার মধ্যে আর কোন সম্পর্ক নেই। অবতার বা মহাপুরুষদের সাথে জাগতিক ও মানবীয় শুভ অশুভকে যোগ করে দেওয়া যায় না। গোপীদের স্বামীরা এবং যারাই শরীর ধারণ করে আছে তাদের অন্তঃকরণে যে আত্মা বিরাজমান, তিনি হলেন সাক্ষী পরমপতি, তিনিই দিব্য চিন্ময় রূপকে অবলম্বন করে এই লীলা করছেন।

আমরা সবাই আলাদা আলাদা, আমাদের শরীর আলাদা, মন আলাদা কিন্তু চৈতন্য সত্তা রূপে আমরা সবাই এক। শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের আত্মাই শুধু নন, তিনি আমার আপনার সমস্ত প্রাণীর আত্মা। সেই কারণে শ্রীকৃষ্ণ স্বাভাবিক ভাবেই গোপীদের স্বামী, শুধু স্বামীই নন, তিনিই প্রকৃত স্বামী ও চিরন্তন স্বামী। আমরা সবাই কার কথাতে চলি? স্ত্রী স্বামীর কথায় চলে, স্বামী স্ত্রীর কথায় চলে, সন্তান বাবা-মার কথায় চলে। কিন্তু আসল মালিক কে? ভগবান। ভগবান যখন ভার নিয়ে নেন তখন বাকি সবাই নিষ্প্রভ হয়ে পেছনের দিকে চলে যাবে। থানার ওসির উপরে মহকুমা শাসক আছে, মহকুমা শাসকের উপরে জেলা শাসক আছে সব জেলা শাসকের উপরে আছেন মুখ্যমন্ত্রী। এখন থানার ওসিকে মহাকুমা শাসক একটা আদেশ দিয়েছে, আর ঠিক সেই সময় মুখ্যমন্ত্রী এসে গেছেন। তিনিও ওসিকে একটা অন্য আদেশ দিয়েছেন। এখন ওসি কোন আদেশটা পালন করবে? কোন প্রশ্নই নেই, মুখ্যমন্ত্রী সবার উপরে তাই তাঁর আদেশকেই শিরোধার্য করে আগে কার্যকর করতে হবে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণই আসল মালিক, বাকিরা সবাই ডেলিগেটেড ক্ষমতাতে সীমাবদ্ধ। গোপীদের আসল মালিক হলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আর তাঁদের স্বামীরা হলেন ডেলিগেটেড ক্ষমতার লোকদের মত। সবারই ভেতরে যিনি অন্তর্যামী হয়ে চিন্ময় শক্তি রূপে বিরাজ করছেন তিনিই হলেন আসল মালিক। তিনি তাঁর নিজের জিনিষকে চেয়ে নিয়েছেন এতে আপত্তি করার কি আছে! এক এক গোপীর আলাদা মালিক নন, সবার মালিক সেই এক ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। তিনিই এখন তাঁর নিজের জিনিষকে নিয়ে চিন্ময় লীলা করছেন। সেইজন্য এখানে কোন প্রশ্ন করা যাবে না। পরীক্ষিৎকে শুকদেব এটাই বলছেন, তুমি যে মনে করছ গোপীদের স্বামীরা গোপীদের মালিক, তা নয়, ভগবানই মালিক। তাই এই প্রশ্ন করা চলে না।

শুকদেব বলছেন, ভগবান যখন অবতার হয়ে আসেন তিনি তখন এই রকম নানান রকমের লীলা করেন। ভগবান এই ধরণের লীলা কেন করেন? কারণ ভগবানের এই সব লীলাকথা শ্রবণ ও অনুধ্যান করতে করতে মানুষ ঈশ্বরভক্তি পরায়ণ হয়ে যায়। এই জিনিষগুলো আধুনিক যুগের শিক্ষিত যুব সমাজকে বোঝানো যাবে না, আর তারা শুনলেও বুঝতেও পারবে না। কিন্তু বৃন্দাবনে এখনও রিক্সা চালকরা হর্ন না বাজিয়ে মুখে রাধে রাধে করে। ওখানে সবাই রাধে রাধে করে, সবারই রাধারানীর ভাব, আমার মালিক সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। বৃন্দাবনে রাধাকে নিয়ে মজা করে কোন শব্দও উচ্চারণ করা যায় না। বৃন্দাবনে যে এই ভক্তিভাব এসেছে এটা এইভাবেই অবতারের লীলা মাহাত্ম্য শ্রবণ মনন করেই এসেছে। ঈশ্বরের লীলা কোন মানবীয় নয়, তাঁর সব লীলাই চিন্ময়ী লীলা।

আরও ব্যাখ্যা করে শুকদেব বলছেন যাঁর পাদপদ্ম চিন্তা করলে যোগীরা, মহাপুরুষরা সমস্ত কর্ম বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যান, সেই যিনি ভগবান তাঁর মধ্যে কর্ম বন্ধনের কল্পনাই করা যেতে পারে না। আমাদের বলা হল লক্ষ্মীর উপাসনা করলে তোমাদের টাকা-পয়সা হবে, কিন্তু যদি এমন হয় লক্ষ্মীর চিন্তা করলেই আমাদের টাকা-পয়সা হয়ে যাচ্ছে, তাহলে ভাবুন লক্ষ্মীর কাছে কত অগাধ ধনরাশি থাকলে পরে তিনি তাঁর চিন্তা করলেই সঙ্গে সঙ্গে তাকে ধন সম্পদ দিয়ে দিচ্ছেন! যে যোগী ও মহাপুরুষ ভগবানের চিন্তন করছেন তিনি কর্ম বন্ধন থেকে মুক্তি পেয়ে যাচ্ছেন, তাহলে সেই ভগবানের কর্ম বন্ধন কোথা থেকে আসবে। যদি ভগবানের কর্ম বন্ধনের কথা না আসে তাহলে শুভ অশুভের কথা কি করে আসবে! তাহলে রাসলীলা নিয়ে আপত্তি কি করে হতে পারে! এই কথাই শুকদেব শ্লোকে বলছেন ***গোপীনাং তৎপতীনাং চ সর্বেষামেব দেহিনাম্। যোঽন্তশ্চরতি সোঽধ্যক্ষঃ ক্রীড়নেনেহ দেহভাক্।।১০/৩৩/৩৬।।*** গোপীদের সবার পতি, তাঁদের সবার সন্তান তাদের সবার অন্তর্যামী যিনি, তিনিই নিজের বিগ্রহ সামনে নিয়ে এসে তাঁদের সাথে এই লীলা করছেন। এই কথাটা ধারণা করা আবার খুব কঠিন। আমার ভেতরে যিনি অন্তর্যামী আছেন, তাঁকে শ্রীরাম বলুন, শ্রীকৃষ্ণই বলুন আর শ্রীরামকৃষ্ণই বলুন, সেই শুদ্ধ চৈতন্য সত্তা আছে বলেই আমার এই শরীর চলছে। এখন সেই সত্তা যদি বাইরে চলে আসেন আর একটা দেহ ধারণ করেন, তখন আমার আর সেই শুদ্ধ সত্তার মধ্যে কি সম্পর্ক হবে? সম্পর্কের তো কোন প্রশ্নই নেই, কারণ আমি আর সেই শুদ্ধ চৈতন্যের সত্তা তো এক। গোপীদের ক্ষেত্রে তো তাই হয়েছে। গোপীদের যিনি অন্তর্যামী তিনি বাইরে চলে এসেছেন, বাইরে এসে তিনি এই লীলা করেছেন। এতে আপত্তি করার কি আছে! আপত্তি কেন করছো? তোমার বোঝার ক্ষমতা নেই, এছাড়া আর কোন কারণ নেই। আমাদের বোঝার ক্ষমতা নেই বলে এত অশান্তি। শুকদেব তাই এত দিক ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বলছেন।

শুকদেব বলছেন ***অনুগ্রহায় ভূতানাং মানুষং দেহমাস্থিতঃ। ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ।।১০/৩৩/৩৭।।*** মানবজাতির উপর যখন ভগবানের অশেষ কৃপা হয় তখনই তিনি এই ধরণের লীলা করেন, তা নাহলে তিনি করেন না। এই ধরণের লীলা মানেই জীবের উপর ভগবানের বিশেষ কৃপা। এই যে বলা হল যিনি অন্তর্যামী হয়ে ভেতরে বিরাজ করছেন, তিনিই কৃপা করে তাঁর লীলা দেখাবার জন্য ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে দেহ ধারণ করেন। কথামৃতেও আমরা এই ধরণের অনেক বর্ণনা পাই। ঠাকুর বলছেন আমার ভেতর থেকে একজন বেরিয়ে এলো। কে বেরিয়ে এলো? যিনি শুদ্ধ চৈতন্য সত্তা তিনিই বেরিয়ে আসেন। কখন এই রূপ কখন সেই রূপ ধারণ করেন। ঠাকুর বলছেন, তিনি রাস্থা দিয়ে আসছেন তখন দেখেন তাঁর ভেতর থেকে দুটো বাচ্চা ছেলে বেরিয়ে এল। বেরিয়ে আবার তারা ফচকিমি করতে লাগল। ফচকিমি করাটা কি আপত্তিজনক? অবশ্যই আপত্তিজনক। কাদের কাছে আপত্তিজনক? আমাদের মত মুর্খদের কাছে। কিন্তু যখন বুঝে যাবেন, আরে সেতো তাঁরই অন্তর্যামী। অন্তর্যামী মানে, তিনিই তো আছেন, তিনি ছাড়া আর কি আছে! আমি আমার হাত আমার গালে রাখি আর মাথায় রাখি তাতে কার কি আপত্তি! আমি আর আমার হাত, গাল আর মাথা আলাদা নাকি! আমরা ভাবছি শ্রীকৃষ্ণ আর গোপীরা আলাদা আলাদা সত্তা, শ্রীকৃষ্ণ একজন ভদ্রলোক আর গোপীরা ভদ্রমহিলা। কিন্তু তা নয়, তিনি তো সবারই অন্তর্যামী।

শেষে শুকদেব বলছেন ব্রজবাসী গোপ যাঁরা ছিলেন তাঁরা তো তাঁদের ঘরের মহিলাদের কাণ্ড স্বচক্ষে দেখেছিলেন, কিন্তু তাঁরা তো কোন দিন এই নিয়ে কোন আপত্তি করেননি। কি করে আপত্তি করবেন? তাঁরা তো দেখছেন তাঁর স্ত্রী, তাঁর মেয়ে বাড়িতেই বসে আছে। কিন্তু তাঁদের সূক্ষ্ম শরীরটা বেরিয়ে শ্রীকৃষ্ণের কাছে চলে গিয়েছিল। এই বর্ণনা এর আগেও করা হয়েছিল। এখানে এসে আমাদের একটা জিনিষ খুব ভালো করে বোঝার আছে। যিনি অন্তর্যামী তিনি যখন বাইরে এসে এই রাসলীলার মত কিছু করেন তখন যা কিছু হচ্ছে, সেটাকে গোপী আর শ্রীকৃষ্ণকে আধার করে একটা নৃত্য শৈলীতে পরিবেশন করে বেরিয়ে গেছেন। সেইজন্য রাসলীলাকে পুরোপুরি শাব্দিক অর্থে নেওয়া যায় না। এর যে একটা বাচিক তাৎপর্য আছে সেটার দিকে আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে। পরাভক্তিতে সব কিছু কি রকম হয় আর কথামৃতে ঠাকুর যখন নিজের অনুভূতির বর্ণনা করছেন তখন তাঁর অনুভূতিতে যা কিছু হচ্ছে, এখানেও ঠিক তাই হচ্ছে। এই কারণে রাসলীলা সাধারণ লোকের পক্ষে বোঝা খুব কঠিন হয় যায়।

শ্রীকৃষ্ণের এই ধরণের চিন্ময়ী রাসলীলাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে শুকদেব পরপর কতকগুলি যুক্তিকে সামনে নিয়ে এসেছেন। প্রধান কয়েকটি যুক্তি হল যিনি ঈশ্বরীয় শক্তি সম্পন্ন সামর্থবান পুরুষ তাঁরা অনেক সময় দুঃসাহসের কাজ করেন। আর যিনি ঈশ্বরের অবতার তিনি যে কোন জিনিষ করতে পারেন। দ্বিতীয় যুক্তি হল, যিনি আচার্য, অবতার তিনি যা করেছেন সেটা সাধারণের করতে নেই। উপদেশ দানের ছলে তিনি যা বলেছেন সেটাই করবে। আর তাঁর সেই আচরণকেই অনুসরণ করা যাবে যেগুলো তাঁর উপদেশের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। তৃতীয় যুক্তি হল, এনারা সবাই অহঙ্কার হীন পুরুষ। অহঙ্কারহীন হওয়ার জন্য কোন শুভকর্ম যেমন তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না তেমনি কোন অশুভ কর্মও তাঁকে স্পর্শ করে না। তাঁর না থাকে কোন স্বার্থ আর না থাকে কোন অনর্থের ভয়। সেইজন্য পাপ বা পূণ্য কোনটাই তাঁর লাগে না। চতুর্থ যুক্তি হল, তিনি হলেন আসল মালিক। আসল মালিক যখন এসে গেছেন তখন তো আর কোন কথাই উঠতে পারে না। তুমি যে মনে করছ গোপীদের আসল মালিক হল তাঁদের শ্বশুড়, স্বামী, পুত্ররা, কিন্তু এরা সবাই ডেলিগেটেড মালিক, আসল মালিক শ্রীকৃষ্ণ। তাঁর জিনিষ তিনি নিয়েছেন, এখানে আর কোন সন্দেহ করা যাবে না আর সন্দেহ করাও উচিতও নয়। আর শেষ কথা হল তিনি এই লীলাখেলা করেছেন এই কারণে যাতে সাধারণ মানুষ এই দিব্যলীলা শ্রবণ মনন করে তাদের মনে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিভাব জাগ্রত হয়। যোগীরা যখন যোগের দ্বারা সাধনা করেন তখন তাঁদের মনে ভক্তিভাব থাকে না, জ্ঞানীদের সাধনার পথেও ভক্তিভাব হয় না। কর্মযোগেও ভক্তি থাকে না। একমাত্র যাঁরা ভক্তি পথকে অবলম্বন করেন তাঁদেরই ভক্তিভাব থাকে। কিন্তু যোগীরা বা জ্ঞানীরা বা কর্মযোগীরা যখন এই লীলাকথা আস্বাদন করবেন তখন তাঁর ভেতরেও ঈশ্বরের প্রতি ভক্তভাবের উদয় হয়ে তাঁর সাধনাকে আরও পরিপুষ্ট করতে সাহায্য করবে।

এই সব বলার পর সব একেবারে শেষে শুকদেব গ্রন্থস্তুতি করছেন, যদিও ভাগবতে খুব কম গ্রন্থস্তুতি আছে। গ্রন্থস্তুতি করে শুকদেব বলছেন ***বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদং চ বিষ্ণোঃ শ্রদ্ধান্বিতোহনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্ যঃ। ভক্তিং পরাঃ ভগবতি প্রতিলভ্য কামং হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ।।১০/৩৩/৪০।।*** যে ধীর পুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই মহারাসলীলাকে চিন্ময় রাসবিলাস ভেবে শ্রদ্ধার সঙ্গে বারবার শ্রবণ করবে, মনন করবে আর বর্ণন করবে ভগবানের শ্রীচরণে তার পরাভক্তি জাগ্রত হবে। সাথে সাথে তার হৃদয়ে যত রকমের রোগস্বরূপ বিকার আছে, কাম, কামিনী-কাঞ্চনের প্রতি আসক্তি এগুলোর বন্ধন থেকে সে চিরতরে মুক্ত হয়ে যাবে। এই কথাগুলো এখানে সাধকদের উদ্দেশ্যেই বলা হচ্ছে, সাধারণদের জন্য নয়। ভাগবতের দশম স্কন্ধের রাসলীলার পাঁচটি অধ্যায়, যেটাকে ভাগবতের হৃদয় বলা হয় থাকে, এই পাঁচটি অধ্যায়কে সে যদি নিয়মিত পাঠ করে যায়, এর শ্রবণ করবে, ব্যাখ্যান করবে, চিন্তন করবে, তার ফলে তার হৃদয়ে যত রকমের বিকার আছে সব চলে যাবে আর কাম-বাসনা যা কিছু ভেতরে জমে আছে সব চিরতরের মত নাশ হয়ে যাবে। এই উদ্দেশ্য নিয়েই ভাগবতে রাসলীলার বর্ণনা করা হয়েছে। একদিকে ভগবানের নানা রকমের দিব্যলীলার চিন্তন মনন করা হচ্ছে অন্য দিকে এর ব্যবহারিক উপযোগিতাও সাধিত হচ্ছে, কারণ ভাগবত মূলতঃ মোক্ষশাস্ত্র, কথা-কাহিনী জানার জন্য ভাগবত নয়, আধ্যাত্মিক জ্ঞানলাভের জন্যই ভাগবত। এখানেই ভাগবতের রাসলীলার বর্ণনা শেষ হয়ে যাচ্ছে।

রাসলীলার সারমর্ম

মধুরভাবে যখন সাধনা করা হয় তখন সাধক নিজেকে স্ত্রী রূপে ভেবে শ্রীকৃষ্ণের গোপী ভাবছেন। পুরুষ বলতে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই। যখন নিজেকে গোপী রূপে চিন্তা করে শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলার কথা মনন করা হয় তখন পুং ভাবটা চলে যায়। প্রত্যেক সাধককে ঈশ্বরের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য নানা রকমের ভাব আরোপ করতে হয়। যিনি সন্ন্যাসী তিনিও নিজেকে একজন পুরুষ বলেই প্রথম থেকে চিন্তা করে আসছেন, কারণ জন্ম থেকেই তাঁর মাথার মধ্যে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে যে তুমি একজন পুরুষ। পুরুষ মাত্রেরই ভাব আছে যে সে একজন পুরুষ। মনের এই ভাবগুলিই শরীরে রাসায়নিক বিক্রিয়াতে পরিবর্তন এনে দিচ্ছে, তার ফলে তার পুরুষ ধারণা আরও দৃঢ় হয়ে উঠছে। এই অবস্থায় পুরুষের বিপরীত ধর্মা নারীর প্রতি স্বাভাবিক

ভাবেই একটা আকর্ষণ ভাব জাগবে। এই ভাবকে কাটানর পথ হল এর বিপরীত সাধনা। বিপরীত সাধনা হল নিজেকে নারী রূপে চিন্তা করে ঈশ্বরের প্রতি প্রেমাভক্তির ভাব নিয়ে আসা। নারী ভাব আনলে নারীর প্রতি আর কোন আকর্ষণ থাকবে না। এখানে পুরুষ কে? পুরুষ হলেন একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ।

এই সাধনা সাধারণ সাধকদের জন্য নয়। অধ্যাত্ম বিদ্যা সব সময়ই রহস্য বিদ্যা। *নিহিতং গুহায়া*, হৃদয়ের গুহার মধ্যে যে জিনিষটা লুকিয়ে আছে, সেটা হল আমার আপনার আধ্যাত্মিক সত্তা। এই রহস্য বিদ্যাকে নিয়ে সব জায়গায়, সর্ব সাধারণের সামনে আলোচনা করতে নেই। সাধারণ লোক যখন আসে তখন তাদের সাধারণ রকমের কথা বলতে হয়। যারা বিশিষ্ট লোক, যারা আধ্যাত্মিক চেতনা সম্পন্ন তাদেরকেই একমাত্র বিশিষ্ট কথা বলতে হয়। রাসলীলা হল বিশিষ্ট লোকেদের জন্য।

রাসলীলার সারমর্ম এতই কঠিন যার জন্য এই ধরণের শাস্ত্রগুলোকে ঠিক ঠিক বোঝা যায় না। একদিকে আমরা দেখছি শ্রীকৃষ্ণ ভগবান অন্য দিকে দেখছি শ্রীকৃষ্ণ পুরুষ। ঠাকুরের অন্তরঙ্গরা যখন ঠাকুরের কাছে গেছেন তখন তাঁরা ঠাকুরকে দেখছেন ভগবান আবার অন্য দিকে দেখছেন মানুষ। দুটো ভাবই যুগপৎ ছিল। এখন ভগবানের সঙ্গে তাঁদের যে সাক্ষাৎকার হবে তার জন্য অনেক কিছু করছেন। ঠাকুর একজনকে বলছেন 'তোকে রাগালুম কেন জানিস? ওষুধটা ঠিক পড়বে'। উপদেশ যেটা দেওয়া হয়েছে সেটা ঠিক ধারণা হবে। ঠাকুরের মত অবতার পুরুষদের কয়েকজন অন্তরঙ্গ থাকেন। এই অন্তরঙ্গদের অবতার পুরুষরা অন্য ভাবে শিক্ষা দেন। যিশু তাঁর বারো জন শিষ্যকে অন্য ভাবে শিক্ষা দিয়েছিলেন। মহম্মদও তাঁর কয়েকজন মুষ্টিমেয় অন্তরঙ্গকে অন্য ভাবে জ্ঞান দিয়েছেন। বাকিদের আবার অন্য ভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়। শ্রীকৃষ্ণও ঠিক তাই করেছেন। গোপীরা ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ, সত্যিকারের অন্তরঙ্গ শিষ্যা। তাঁদের তিনি অন্য ভাবে শিক্ষা দিলেন। এই যে গোপীদের সাথে ভগবানের একত্ব ভাব আসবে, যেমন বলা হয় গোপীকৃষ্ণ বা রাধাকৃষ্ণ, কারণ গোপী আর শ্রীকৃষ্ণ এক, রাধা আর শ্রীকৃষ্ণ এক। রুক্মিনীকৃষ্ণ কোথাও বলা হয় না। ভগবানের সাথে এক হওয়ার পথে যে বিঘ্নগুলো আছে, শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলার মাধ্যমে সেই বিঘ্নগুলি সরিয়ে দিচ্ছেন। শুধু রাসলীলাতেই নয়, চীরহরণ থেকেই সরাতে শুরু করেছিলেন। আবার রাসলীলার সময়ও সরিয়ে যাচ্ছেন। গোপীদের মধ্যে যে সব সময়ই আধ্যাত্মিক ভাব ছিল তা নয়। ভাগবতের বর্ণনানুযায়ী গোপীদের মধ্যে আগে থেকেই দুটো ভাব ছিল। একদিকে মনে করছেন শ্রীকৃষ্ণ বুঝি ঈশ্বর আবার অন্য দিকে যশোদার আদরের ব্রজদুলাল বলেও ভাবছেন। কিন্তু সবারই মনের মধ্যে যে সাধারণ ভাবটা ছিল তা হল শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রচণ্ড ভালোবাসা, দুর্বার প্রেম। শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের এই দুর্বার প্রেমকেই ধীরে ধীরে আধ্যাত্মিকতার দিব্য ভাবে উন্নীত করে দিচ্ছেন। ভালোবাসার টানে ঠাকুরের কাছে কালীপদ ঘোষ নিয়মিত আসা যাওয়া করছেন। কালীপদ ঘোষ তখন প্রচুর মদ্য পান করতেন। ঠাকুর কি করলেন? কালীপদ ঘোষকে বললেন 'যেটাই খাবে মাকে অর্পণ করে খাবে, আর পা যেন না টলে'। ঠাকুর প্রথম থেকেই তাকে মদ খাওয়া ছাড়তে বললেন না। আস্তে আস্তে তিনি তাকে পাল্টে দিলেন। ঠিক তেমনি গোপীদের মধ্যে যে কাম ভাব ছিল সেটাকে শ্রীকৃষ্ণ একটা দিব্য ভাবে পরিবর্তিত করে দিলেন। আজ তাই আমরা গোপী আর কৃষ্ণ আলাদা বলি না, বলি গোপীকৃষ্ণ।

তাই বলে এই রাসলীলা সবার জন্য নয়। যাঁরা ভক্তিমার্গের সাধক, যাঁদের প্রেমাভক্তি আছে, তাঁদের সেই ঈশ্বরের প্রতি প্রেমাভক্তি বা পরাভক্তি কি রকম হতে পারে, ঠাকুর বলছেন ঈশ্বরের জন্য প্রাণ আটুপাটু করে, কি রকম আটুপাটু করে সেটাকে দেখানোর জন্য ব্যাসদেব ভাগবতে গোপীদের মাধ্যমে দেখালেন। যখন শ্রীকৃষ্ণ অদৃশ্য হয়ে গেলেন তখন গোপীদের যে অবস্থা হয়েছিল, ঈশ্বরের অদর্শনে সাধকের মনেও ঠিক সেই দুরবস্থা হয়। তাই রাসলীলা শুধুমাত্র তাঁদেরই জন্য যাঁরা ভক্তিমার্গের সাধক। সাধনার শেষ ধাপে তাঁদের মানসিক অবস্থা কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় সেটাকেই এখানে দেখান হয়েছে। যেমন, ঠাকুর যখন দক্ষিণেশ্বরে সাধনা করছিলেন তখন সেখানে একজন জ্ঞানী সাধু এসেছেন। ঠাকুরেরও তখন জ্ঞান সাধনা চলছে। যেখানে খাওয়া-দাওয়া হচ্ছে সেখানে ঐ জ্ঞানী সাধু খেতে গেলেন না। যেখানে এঁটো পাতা ফেলা আছে সেখানে কুকুররা খাচ্ছে, ঐ জ্ঞানী সাধু কুকুরদের মধ্যে ঢুকে গিয়ে তাদের গলা জড়িয়ে খাচ্ছেন, কুকুরগুলো কিছু বলছে না। ঠাকুর ঐ দেখে কাঁদছেন। হৃদুকে বলছেন 'ওরে হৃদু আমারও কি এই অবস্থা হবে'? হলও তাই। ঠাকুরেরও

একই অবস্থা হয়েছিল। যখন জ্ঞানমার্গ দিয়ে যাবেন তখন এই অবস্থাই হবে। তখন আর শুদ্ধ আর এঁঠো খাবারে এই তফাৎ থাকবে না। আর যারা ভক্তিমার্গ দিয়ে যাচ্ছেন তাদের কি অবস্থা হবে? এখানে রাসপূর্ণিমাতে গোপীদের যে বর্ণনা করা হয়েছে এই অবস্থাই হবে। ঈশ্বরের জন্য ভিজে গামছা নিংড়ানোর মত হৃদয়কে মোচড়ানো হবে। এই অবস্থা যখন হয় তখন তিনি শেষে গিয়ে তাঁর ভক্তকে দেখা দেন।

শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে গোপীদের সঙ্গেই ছিলেন, পরে তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন। যখন গোপীদের অনেক কান্নাকাটি, ছটফটানি হল তারপরেই তিনি আবার গোপীদের মাঝখানে ফিরে এলেন। এই একই জিনিষ নারদের জীবনেও হয়েছিল। নারদ যখন প্রথম তাঁর ইষ্টের দর্শন পেলেন তখন ইষ্ট নারদকে বললেন তোমার মনে এই ভাব জাগানোর জন্য এই ঝাঁকি দর্শন লাভ করতে পারলে। এরপর তুমি আর দর্শন পাবে না, এবার সাধনা করেই তোমাকে আমার দর্শন পেতে হবে। ধ্রুবেরও একই জিনিষ হয়েছিল। প্রথমে এক ঝলক দর্শন দিয়েই তাঁর ইষ্ট হারিয়ে গেলেন। এরপর তুমি খেটেখুটে লাভ কর। গোপীরাও প্রথমের দিকে খুব সহজেই শ্রীকৃষ্ণকে পেয়ে গেলেন। তারপরে তিনি তাঁদের খুব করে কাঁদালেন, খুব করে কান্নাকাটি করাবার পর আবার তাঁদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হল। এবার গোপীদের কাছে শ্রীকৃষ্ণ চিরস্থায়ী হয়ে গেল। আধ্যাত্মিক সাধনাতে এই জিনিষ সবার ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে। সাধনার প্রথমের দিকে একটু সাধনাতেই একটু ঝলক পেয়ে যায়। এই ঝলকটুকু দেওয়া হয় সাধকের মনে একটা অদম্য ইচ্ছা তৈরী করার জন্য। কিছু দিন সাধনা করে অনেকেই বলে আমার ঈশ্বরের অনুভূতি হয়েছে, আমার অমুক দর্শন হয়েছে। হতে পারে কিন্তু এগুলো কখন স্থায়ী হয় না। এগুলো দিয়ে আমাদের মনের অদম্য ইচ্ছটাকে জাগিয়ে দেওয়া হয়। গাধা প্রথমে চলতে চায় না। কিন্তু গাধা গাজর খেতে খুব ভালোবাসে। গাধার কাঁধে একটা লম্বা ডাণ্ডা বেঁধে দিয়ে ডাণ্ডার সামনে একটা গাজর ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। গাধা ঐ গাজরটাকে খাওয়ার জন্য এগিয়ে পড়ে। গাধা যত এগোয় গাজরটাও তত এগিয়ে যাচ্ছে, গাজরটা খাওয়ার জন্য গাধাও চলতে থাকে। আধ্যাত্মিক জীবনে ঠিক তাই হয়, ভগবান তাঁর রূপমাধুর্যের রূপছটার একটা ঝলক দেখিয়ে সামান্য একটু দিব্য আস্বাদ দিয়ে দেন, এরপর ওই দিব্য আস্বাদকে চিরস্থায়ী করার জন্য ভক্তের মনে অদম্য ইচ্ছাকে জাগ্রত করে তাকে তীব্র সাধনার পথে ঠেলে দেন। সাধক তখন জগতের সব কিছুকে ফেলে দিয়ে ভগবদ্ আস্বাদ লাভের পেছনে চলতে থাকে। এই রাসলীলা পাঠ তখনই সার্থক হবে যখন ভক্তের হৃদয়ে ঈশ্বর সান্নিধ্য লাভের এই অদম্য ইচ্ছাটা জাগ্রত হবে।

রাসলীলার আলোচনায় আধ্যাত্মিকতার কয়েকটি মূল জিনিষকে বোধগম্য করার চেষ্টা করা হয়েছে। রাসলীলা হল ঈশ্বরের প্রতি প্রেমাভক্তির শেষ অবস্থার বর্ণনা। ঈশ্বরের প্রতি ভক্তের যখন প্রেমাভক্তি জন্মায় তখন ঈশ্বরকে পাওয়ার জন্য তাঁর ভেতরে যে কি সাংঘাতিক ছটফটানি হতে থাকে, এই জিনিষটাকে কখনই জাগতিক ভাষায় প্রকাশ করে বোঝান সম্ভব নয়। প্রেমাভক্তি বা পরাভক্তিতে ঈশ্বর লাভের জন্য ছটফটানিটা কী সাংঘাতিক পর্যায়ে হতে পারে সেটাকে আমাদের মনের মধ্যে ধারণা করাবার জন্য ব্যাসদেব একটা জাগতিক প্রতীককে অবলম্বন করলেন। এইভাবে জাগতিক প্রতীকের মাধ্যমে ব্যাসদেব যদি না বোঝাতেন তাহলে ঈশ্বরের জন্য ভক্তের ছটফটানিটা কি রকম পর্যায়ে যেতে পারে এই ভাবটা আমাদের মত সাধারণ ভক্তের ধারণার বাইরেই থেকে যেত। এই কারণে রাসলীলাতে যে প্রতীকগুলিকে নেওয়া হয়েছে সেগুলো সবটাই জাগতিক। ঠাকুরও এই প্রেমাভক্তির তীব্রতা অনুভব করেছেন, শুধু ঠাকুরই নয়, যিশু, মহম্মদ, চৈতন্য মহাপ্রভু, মীরাবাঈ সবাই এই প্রেমাভক্তির আস্বাদন করেছেন। কিন্তু আমাকে আপনাকে প্রেমাভক্তি কি রকম হতে পারে যদি বুঝতে হয় তখন আমাদের ভাষাতেই বোঝার চেষ্টা করতে হবে। কিন্তু জাগতিক ভাষায় এর ব্যাখ্যা কোন ভাবেই ঠিকমত করা যায় না বলে জাগতিক বা প্রাকৃতিক প্রেমের যে কিছু কিছু প্রতীক আছে সেগুলোকে মাধ্যম করে আমাদের মনের মধ্যে প্রেমাভক্তির একটু ধারণা করাবার চেষ্টা করা হয়েছে। আধ্যাত্মিক সাধনার যে শেষ অবস্থা এবং সেই সময় ঈশ্বরের জন্য যে ছটফটানিটা হয় এবং সেই ছটফটানির পর যে আনন্দটা অনুভূত হয়, যারা সাধনা করেনি তাদের পক্ষে এই জিনিষ বোঝা কখনই সম্ভব নয়। পরাভক্তির ওই শেষ অবস্থায় তাঁর কি সাংঘাতিক ছটফটানি হয় আর আনন্দটাও কি রকম হয়, এটাকে আমাদের সামনে তুলে ধরার জন্য ব্যাসদেব রাসলীলাকে মাধ্যম করেছেন।

রাসলীলাতে আরেকটি খুব গুরুত্বপূর্ণ দিক হল, ঈশ্বরের প্রতি প্রেম, ভালোবাসা, অনুরাগ সবটাই ভাবের ব্যাপার। যেখানে ভাবের ব্যাপার থাকে সেখানে শুধু অনুভূতিটাই প্রাধান্য পায়, কথায় বলে বোঝে প্রাণ বোঝে যার। এই অনুভূতিকে শব্দ দিয়ে প্রকাশ করা অত্যন্ত কঠিন। রাসলীলার এটাই বৈশিষ্ট্য, যে অনুভূতিকে বোঝান প্রায় অসম্ভব সেই অনুভূতিকে ব্যাসদেব রাসলীলায় শব্দে নামিয়ে এনে ঈশ্বরীয় প্রেমের ধারণা করার পথটা সুগম করে দিয়েছেন। সাধারণ লোক যারা তারা এই ব্যাপারগুলোকে ভুল বুঝবে। সেইজন্য বার বার বলা হচ্ছে রাসলীলা সাধারণ মানুষের জন্য নয়। যাঁরা সত্যি সত্যি এই পথে এগোতে চাইছেন আর জানতে চাইছেন ঈশ্বরের প্রতি প্রেমাভক্তিতে কী হয়! বোবাকে সন্দেশ খাইয়ে যদি বলা হয় সন্দেশ খেতে কি রকম লাগলো, বোবা তখন কি করে বোঝাবে সন্দেশ কি রকম খেতে! এখানেও ঠিক তাই হয়। কিন্তু ব্যাসদেবের এটাই বৈশিষ্ট্য, বোবার অভিব্যক্তিকে ব্যাসদেব শব্দে নামিয়ে দিয়েছেন।

মানুষ সাধারণ অবস্থা থেকেই মহৎ হওয়ার চেষ্টা করছে। ভক্তেরও প্রথমে মনের মধ্যে এমন অনেক কালিমা থাকে, যে কালিমাকে ভক্তের পক্ষে পরিষ্কার করা সম্ভব নয়, ভগবান নিজে এই কালিমাগুলো পরিষ্কার করে না দেওয়া পর্যন্ত এগুলো থেকেই যাবে। সেইজন্য দেখানো হচ্ছে, গোপীরা সত্যিই হৃদয় দিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে ভালোবাসতেন, কিন্তু সেই ভালোবাসার মধ্যেও একটু কামগন্ধ ছিল আর তার সাথে লজ্জা, ঘৃণা ও ভয় এই তিনটেই তাঁদের মধ্যে ছিল। রাসলীলাতে ভগবান নিজের থেকে গোপীদের মধ্য থেকে এই কালিমাগুলো সরিয়ে দিলেন। অপরা ভক্তি ও পরা ভক্তি – ভক্তি এই দুই প্রকার। অপরা ভক্তিতে যে কেউ সাধনার দ্বারা ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করতে পারেন, কিন্তু পরা ভক্তিতে যে একত্ব হওয়া, ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়াটা তাঁর কৃপা ছাড়া হয় না। কঠোপনিষদেও যমরাজ একই কথা বলছেন, *যমেবৈষে বৃণুতে তেন লভ্যঃ*, আত্মা যাঁকে বরণ করেন সেই আত্মাকে পায়। চেষ্টা করে, পুরুষাকারের দ্বারা একটা অবস্থা পর্যন্ত চলে যাওয়া যাবে, কিন্তু একটা জায়গায় গিয়ে সব থেমে যাবে, এই জায়গাটাকে শত চেষ্টা করেও ভাঙা যাবে না, ভগবান নিজে না ভাঙলে কখনই ভাঙা যাবে না। ভগবান এসে শেষ বন্ধনটা ভেঙে দিলেন, তারপর কি হবে? আমি তুমির ভেদটা মিটে যায়। এই আমি তুমির ভেদ মিটে গেলে কি হয় তারই বর্ণনা রাসলীলাতে করা হয়েছে। এই কারণেই আধাত্মিকতার নিরিখে রাসলীলা ভাগবতের একটি অত্যন্ত মূল্যবান বিষয়, রাসলীলার পাঁচটি অধ্যায়কে তাই বলা হয় ভাগবতের পঞ্চপ্রাণ। ভাগবত থেকে রাসলীলাকে সরিয়ে দিলে ভাগবত আর ভাগবত থাকবে না, তখন একটা যে কোন পুরাণ হয়ে থাকবে। ভাগবতের এত মাহাত্ম্য শুধু এই রাসলীলার জন্যই। আমরা রাসলীলার আধ্যাত্মিক দিকটা নিয়ে আলোচনা করলাম।

আধ্যাত্মিক জগৎ পুরো একটা আলাদা জগৎ, আমি তুমির ভেদ মিটে যাওয়া মানে সচ্চিদানন্দ ছাড়া, ভগবান ছাড়া কিছু নেই। ঈশ্বর আর আমার মধ্যে তফাৎটা কোথায়? তফাৎ শুধু আমি বোধে। একজন খুব সুন্দর বলছেন – জগতের পুরো লড়াইকে এই দুটো শব্দের মধ্যে ফেলে দেওয়া যায় 'আছি' আর 'আছেন'এর মধ্যে। যারা জাগতিক জীবনের মধ্যে পড়ে আছে তারা বলে 'আমি আছি' আর যাঁরা আধ্যাত্মিক জগতে চলে যান তাঁরা বলেন তিনিই আছেন। এই 'আছি'টা যখন 'আছেন'এ পাল্টে যায় তখন সাংসারিক জীবনটা আধ্যাত্মিক জীবনে রূপান্তরিত হয়ে যায়। যতক্ষণ 'আমি' 'আমি' থাকে ততক্ষণই যত অশান্তি, 'আমি'টা মুছে গেলেই শান্তি। এই আমিটা মুছে যায় জ্ঞানের অবস্থায়। কিন্তু উপনিষদে যে কঠোর কৃচ্ছসাধন, প্রাণপাত করা তপস্যা ও সাধনার কথা পাওয়া যায় তাতে সাধারণ মানুষের জ্ঞানের অবস্থাতে যাওয়াটা খুব কঠিন। তাহলে সহজ পথ কোনটা? ঠাকুর বলছেন ভক্তি পথ সহজ পথ। ভক্তি পথে এই 'আছি' ব্যাপারটা সহজে চলে যায়, ভক্তি পথে তিনিই আছেন। রাসলীলা হল ভক্তিমার্গে শেষ অবস্থার বর্ণনা। এই রাসলীলাকে হৃদয়ঙ্গম করাও খুব কঠিন। কিন্তু যাঁরা আধ্যাত্মিক পথে এগোতে চাইছেন তাঁরা যদি রাসলীলার ভাব একটু বুঝে নিয়ে মনন চিন্তন করেন তখন তাঁদের সাধনার মধ্যে একটা তেজ আসে। ভক্তিমার্গের অনেক রসদ রাসলীলার মধ্যে দেওয়া হয়েছে। তারই কিছু কিছু ব্যাপার আমরা এখানে আলোচনা করলাম।

রাসলীলার জন্য গোপীদেরও দরকার নেই আর শ্রীকৃষ্ণেরও দরকার হবে না। রামায়ণে যেমন রাবণ বধের জন্য শ্রীরামচন্দ্রের দরকার আর রাবণেরও দরকার। রাসলীলা একটা প্রতীক। সেইজন্য শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন কিনা, গোপীরা ছিলেন কিনা, রাসলীলাতে আদৌ এই রকম হয়েছিল কিনা তাতে কাহিনীর কোন হেরফের হয় না। কিন্তু অর্জুন যদি না থেকে থাকেন, দুর্যোধন যদি না থাকতেন তাহলে কিন্তু মহাভারত চলবে না। রাসলীলা যে অবতারের লীলা বলে মানতে হবে তা নয়, পরা ভক্তির জন্য কি কি দরকার আর ঈশ্বর আর ভক্তের মধ্যে আমি তুমির ভেদ মিটে গিয়ে যখন একত্ব অনুভব হয় তখন কি রকম অনুভূতি হয় এই দুটির বর্ণনা শব্দ দিয়ে ব্যাখ্যা করলে কি রকম দাঁড়ায় রাসলীলায় তারই একটা প্রয়াস ব্যাসদেব করছেন।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ। হরি ওঁ তৎসৎ।
ওঁ শ্রীরামকৃষ্ণার্পণমস্তু ।।

সূচীপত্র